

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMEER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLM LGK 2000	Place of Publication কলকাতা, ১৮ ম টামের লেন, কলকাতা
Collection KLM LGK	Publisher —
Title স্মরণ	Size 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number	Year of Publication : ১৯৭০
	Condition : <input checked="" type="checkbox"/> Brittle <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor —	Remarks :

C/D Roll No. KLM LGK

কলিকাতা লিটন ম্যাসজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতের অস্বতম একনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক—

মৃত্যুব করেকদিন পূর্বে—“সংস্করণের” প্রতি—“আমার আশীর্বাদ—ভূভেদা লিখে দিতে পারলাম না,
তবে মনে কামনা করছি।”



৩রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম—২০শে মে, ১৮৬৪।

মৃত্যু—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩।

বিজ্ঞানের বাহাদুরী !

জাতীর জীবনে নিত্যব্যবহার্য বস্তু

বাতি—“বেকল ল্যাম্প”—কম খরচে বেশী দিন উজ্জ্বল আলো দিতে অস্বীকার।

পাখা—ও, এম, সি, (ডি, সি,) সিং—কম খরচে ভাল কাজ দিতে অতুলনীয়।

ও, এম, সি, “স্যানিট কন্সলিড” ব, খাত, কংক্রিট, ইট, পাথর ইত্যাদি সকল জিনিসকে সব অবস্থাতে ক্ষয় থেকে রক্ষা করার সর্বশ্রেষ্ঠ।

ও, এম, সি, অটোমোবাইল ও ট্রোরেল ব্যাটারী—ক্ষত ইঞ্জিনের তেল ও বতরিন স্বাধী হয়।

আই, এম, সি, বেকলাইটের পয়েন্ট কাউন্সিলিট, প্রাইস, সিং—বোজ ইত্যাদি কড়ি-সমস্ত ঘরের শোভা বাড়ানোর অগ্রদূত।

রোগের কবল হইতে বাঁচিতে হইলে
এইগুলি সংগ্রহ করুন—

আই, সি-এল—(আইডিয়াল স্যানিটেশনিক)।

সু-কোড—(মেডিসিনাল)—বলকণিক ও পুষ্টিক

ডিটারজেন্ট—ম্যালেবিয়া ঘরের মহৌষধ।

এক্সিক্লোলেট—এছমা ও যাবতীয় কাশরোগের
ঔষধী।

স্ট্রাইকিং সার্কেলিং—স্বাক্ষরকার নিয়মিত
কবিত্তে অপরিহার্য।

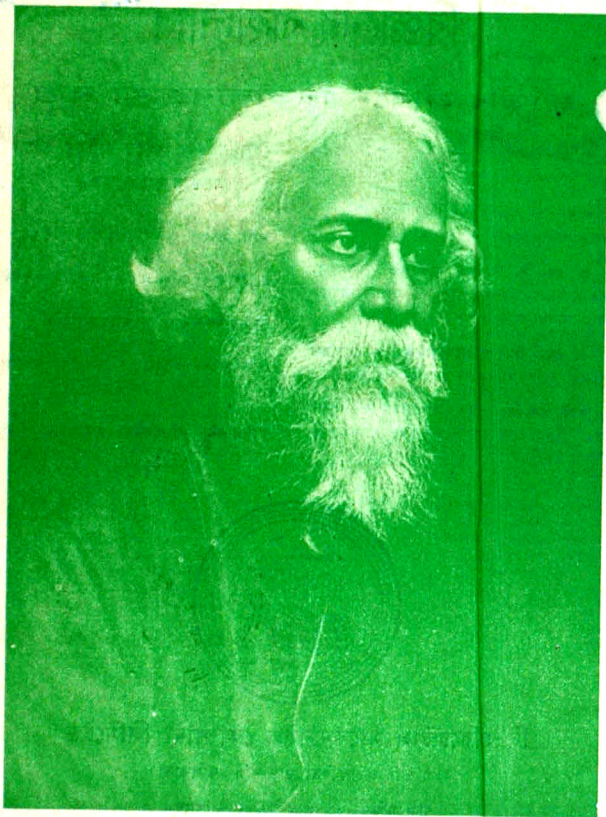


দি ওরিয়েন্টাল মার্কেনটাইল কোম্পানী লিমিটেড

৩৬এ ও বি প্রতাপাদিত্য রোড, দক্ষিণ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ অফিস—১১, ব্যাংক স্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বে।

ফোন { লাইন ২৬৭৪ (২ লাইন)
বোম্বে ৩১৩৩৯



জাতিসংগঠন—দ্রুদীক্ষন(১)

কলিকাতা ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১০/এম, ট্যামার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

সংস্করণ

নবমুগের সচিব মাসিক পত্রিকা

শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিনোদন সমালোচনা (ছাত্রিক প্রবন্ধ)	১১০
আমাদের কথা	...	কলিকাতার ইতিহাস সমতা (বোম্বাই)	১১৫
বীজব্রাহ্মণের জাতিগত ও বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ)	...	বাংলায় আদিবাসিক বৈশিষ্ট্য—এক আবেশ	১১৬
—কবিশ্রমের কলিঙ্গের রায়	...	কলিকাতার মার্চে—বোম্বাই শিষ্টাচার সমতা—“দিব”	১১৭
বিলাসন (গল্প)—অনিক বন্দোপাধ্যায়	১২৭	গেমসের বিকাশ (বোন বিজ্ঞান)—ইউজ	১২০
মহাশয় (কবিতা)—বিমলকান্ত ঘোষ	১৩০		
গুহাট নিহিত (গল্প)—প্রবোধকুমার সাক্তাল	১২৭, ১২৮		
পুত্রের কান-বেটোয়ন (কবিতা)—ডাঃ কালিদাস নাথ	১২৮, ১২৯		
চাঁচা চোখুদী (গল্প)—সুধোদ-ঘোষ	১২৭		
বর্তমান মহাসময়ের চতুর্থ বসন্ত (প্রবন্ধ)	...		
—গোপেশচন্দ্র পাশ	১৩০		
মোড়াকার (গল্প)—আশাপুর্ণি দেবী	১৩১		
নাথাল মোহন (কৌতুক কবিতা)	...		
—সাহিত্যিকের চট্টোপাধ্যায়	১৩২		
আশার আলোক (কবিতা)—সাহিত্যিক গুহ	১৩৩		
শরতের আবহাওয়া (কবিতা)—কবিশ্রমের কালিদাস রায়	১৩৪		
মল্লীজ (গল্প)—সৌভাগ্যমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩৫		
অনুগ্রহপুস্তকের ভূমি (ঐতিহাসিক প্রবন্ধ তৃতীয়) *	...		
—সত্যজিৎ প্রসন্ন ঘোষ	১৩৬		
সংস্কৃতি (কবিতা)—বিজয় পাল	১৩৭		
বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় নারীর কর্তব্য (প্রবন্ধ)—বোম্বাই	১৩৮		
দেশা (গল্প)—শক্তি বসু	১৩৯		
সম্মা (কবিতা)—বিমল কল	১৪০		
ত্রিকাল (গল্প)—জ্যোতিষ বসু	১৪১		
সাহিত্য (গল্প)—মেঘদূত	১৪২		
গল্পের গুণ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক সরোজনাথ জগ	১৪৩		
জি টি সপ (কবিতা)—কামাক্ষীমল্লার চট্টোপাধ্যায়	১৪৪		
মোনোপিসা কীবে (কবিতা)—বীজ চট্টোপাধ্যায়	১৪৫		
বলন হয়ে আসে নিশিচ রাত (কবিতা)—বলম্বালা দিতা	১৪৬		
ছাত্রিক মক ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় তত্ত্বী	...		
—আট গোট	১৪৭-১৪৮		
বর্তমান স্কলী পরিচিতি ও ত্রিশন (ছাত্রিক প্রবন্ধ)	...		
—বল্লী চট্টোপাধ্যায়	১৪৮		
ছাত্রিকের বোম্বাইয়ের বসোতিষ ইতিহাস	...		
(ছাত্রিক প্রবন্ধ)—বিমল কল	১৪৯		
কবিতার কলিকাতা (ছাত্রিক প্রবন্ধ)	...		
—গোপেশচন্দ্র পাশ	১৫০		

‘সংস্করণ’র নিয়মাবলী

- ১। আদিনি হইতে সকলনের বর্গ আবেশ।
- ২। প্রতি সংখ্যা মাসের ১০ তারিখে প্রকাশিত হইবে।
- ৩। কোন মাসে যদি ১০ তারিখের মধ্যে কোনো গ্রাহক কার্ড না পান এবং ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদের বা জানান তাহা হইলে আমরা তাহার মজ দাবী হইবে না।
- ৪। কোন মাস হইতেই গ্রাহক হওয়া চলিতে পারে—কলিকাতা টাঙ্ক ও বারিক টাঙ্ক ৯, টাঙ্ক। অত্রিক মূল্য জমা না দিলে কার্ড পাঠান হইবে না।
- ৫। সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা।
- ৬। উপরুক্ত ডাকটিকিট না থাকিলে অমনোনীত লেখা লেখক লেখক হইবে না।
- ৭। টাঙ্ক পাঠাইবার টিকানা—ম্যানেজার ‘সংস্করণ’-জম না ৩০এ, ১৪এ, ক্রাইস্ট ট্রিট, কলিকাতা।
- ৮। বিজ্ঞাপনের কপি প্রতিবার প্রকাশের দশ দিন পূর্বে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	প্রতিমাসে	...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬
...	৩৬

(বিশেষ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র)

হারবর্ধের সর্বক উচ্চ কমিশন একটি আবেশক।

১৪এ, ক্রাইস্ট ট্রিট, কলিকাতা।
কণ্ড মাসিক
কলিকাতা।



অলঙ্কার নির্মাণে—ডিজাইনের
সৌন্দর্য, মনোরম কাজ এবং
বর্ণের বিস্তৃততাই আমাদের
বৈশিষ্ট্য। আমাদের সৌকর্যে
মিলিত কারখানার প্রস্তুত একমাত্র
গিনি স্বর্ণের নানা বিধ হাল
কাষ্মের অলঙ্কার ও সৌপার্য
হাসলমি সর্বত্র। বিরূপা মনুত
থাকে এবং অর্ডার দিলেও আর
সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী
করিয়া দেওয়া হয়। মনুষ্যের
অর্ডার কি পি. ডাকে পাঠান
হয়। পুরাতন বর্ণের পরিবর্তে
নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়।
কাজের তুলনায় মনুতী তুলত
এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের
জন্ম যায় তাই থাকে।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার পেন, কলিকাতা-৭০০০



সঞ্চয়ন

আমাদের কথা

ঈশ্বরের আলো যখন তাঁর হাতে পড়ে তুমিয়ার সবই তখন মনে হয় একটা বিরাট কুয়া। সভ্যতাই হোক আর রুস্তাই হোক, শিক্ষাই হোক আর সাক্ষ্যই হোক, নিজীব কঙ্কালের দৃষ্টবিকাশের মতই সব যেন একটা আন্তঃজনক বিজ্ঞপত্রাসিতে পরিণত হয়। মানব ইতিহাসের সেই কলমর অখ্যাত/অজ্ঞ রচিত হয়ে চলেছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রগতি আশ্চর্যের মত আর কখনো বোধহয় এতটা নিরর্থক ও ব্যর্থ বলে মনে হয়নি। মানুষের মুখে অল্প নেই, পরশে বস নেই, একদিন নয়, কি একজনদের নয়—কোটি কোটি মানুষকে আজ অমর্যব সফটের শেষ পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। আজ সময় বাঙলাদেশ মৃত্যুর মহোৎসব কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং আশঙ্কা হয়, ভারতের প্রতি প্রদেশেই বোধহয় এটিবেই এই সমুদ্র সঞ্চারিত হয়ে যাবে।

মহাশক্তির এই অন্তর্ভাগে 'সঞ্চয়ন'-এর প্রকাশ জন-পদের স্তম্ভজ প্রণোদিত নয় নিশ্চয়ই, হয়তো তাকে বরণ করে নেবার ক্ষেত্রে মনঃহস্ত কোন দিক থেকেই আসিয়ে আসবে না; হয়তো তার প্রকাশ একদল গাম্ভীর্যবাহী বেরদরীর জুই বিলাস বলেই পরিণতি হবে, কিন্তু যে বিলাস ও মুক্তিকে নিতর করে আমরা এগিয়ে এশেছি তার মূলে রয়েছে যৌবনের কণ্ঠ শক্তির প্রেরণা—যে প্রেরণা শোভন অশোভন, বিচার করার ক্ষমতা প্রদায় না, নিজেই বিকসিত করার তাগিদে অমর্য উৎসাহ নিয়ে পথ চলে। তারপরই আসে তার অস্তিত্বকে মুক্তিকর করে তোলার দায়িত্ব। 'সঞ্চয়ন'-এর বর্ধমান সংখ্যা যে দায়িত্ব পালনে নানাকারণে অক্ষমতারই হ'য়েতা পরিচয় দেবে। এর ভিত্তে যা কিছু তুল, যত কিছু কেউ লক্ষ্যের বিষয় হ'লেও, আমরা স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। আজ আমরা আমাদের সব পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে পারিনি। দেশের পরিস্থিতি নানাভাবে আমাদের সমুদ্রকে কাঁচাকরী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রেছে, কিন্তু তবুও দুঃভাবেরই এ বিলাস আমরা পোষণ করি যে, আজকের সমগ্র তুলনাতীক সশোধান ক'রে 'সঞ্চয়ন'-কে সর্গজনের আদরপীয় ক'রে তুলতে আমাদের উদ্যম এতটুকুও সফল হ'তে দেবে না। 'সঞ্চয়ন' নিজের পৌরবেই সর্গজনের বরণীয় হবে এবং সর্গজনের আদরভোর দাবীতে আবার ক'রে নেবেই নেবে।

'সঞ্চয়ন' আবার আত্মপ্রকাশ ক'রে আগামী মাস থেকে তার থা পরিচালিত ক'রে নিয়ে। আগামী সংখ্যা থেকে সম্পাদন ভার গ্রহণ ক'রবেন—পত্রক দর এই সংখ্যা থেকেই তার যোগ দান করার কথা ছিল কিন্তু খুন্স-নির্ভারিত কাগ্যগতীক তিনি সে ভার গ্রহণ ক'রতে সক্ষম হননি।

ইতিবাদের আমরা পূর্নোপায়ক, গ্রাহক ও অধ্যায়িক বর্গকে শারদীয়ার সম্মান জানাচ্ছি।
এই পত্রিকার প্রকাশ বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন—শ্রীসীতাপ্রভা সিংহ, শ্রীপরজ্ঞানর সন্ত, শ্রীবোধ সরকার ও শ্রীমন্মন্মন্ম দত্ত। এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এদের সাহায্য ব্যতিক্রমে পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হত না।

বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস

সিণ্ডিকেট লিমিটেড

"শেয়ার ডিলাস হার্ডস"

১২, চৌরঙ্গী স্টোরার কলিকাতা।

অনুমোদিত মূলদন	২৫,০০,০০০	লক্ষ টাকা
গৃহীত মূলদন	১৮,০০,০০০	"
আদায়ীকৃত মূলদন	৯,২৬,০০০	"

টাকার নিরাপদ
সমরক্ষণের জন্য আমাদের
—স্বামী আমিন—
২য় ২ বৎসরের জন্য
শতকরা বার্ষিক ৫%

এই সিণ্ডিকেট স্থাপিত হওয়ার প্রথম দুই বৎসরেই শেয়ার-
হোল্ডারগণকে শতকরা ১৬% হিসাবে ফেরত দেওয়া হইয়াছে।
আমরা সকল প্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য
আমাদের "মাসিক শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" পড়ুন।
নমুনা সম্বন্ধে বিনামূল্যে পাঠান হইবে।

উৎসব মুখরিত ১৮বৎসে
পরশ্রী-বিমণ্ডিত রূপ শ্রীর-

দম্পতি

গজাংশ ও সলোপ
প্রবেশ সন্মিলন

হিন্দুধর্মের যা চিরন্তন
কামনা, যা চিরকালের
আদর্শ ভারিই চিত্তহারী
আলেখ্য এই দম্পতি।



কলিকাতায় এই লক্ষ্যপ্রথম,
৪টি চিত্রগৃহে একত্রযোগে প্রদর্শন।

শ্রী = পুরবী = রূপালী = আলেখ্য।

[এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটর্স]

রবীন্দ্রনাথের জাতিপ্রেম ও

দেশাত্মরাগ

কবিশেষের কাগিদাস রায়

(১)

সেদিন একজন গোড়া হিন্দু বাবসারী বলিয়াছিলেন—
"রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, কিন্তু দেশের কল্যাণ তিনি কি
কিছু করেন?" বাবাবাহলা বলিলেক মাঝদেও বা শুভক্ষরীর
আখ্যায় হিসাবে রবীন্দ্রনাথের শুভকর দান পরিমিত হয় না।
তাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় জাতিতে সকেটিস, মেটো,
হেটো, বসো, ডল্টোয়ার, লিওনার্দোদাত্তিকি, টলষ্টয়, শেক্-
সপিয়ার ইত্যাদির খারা তাঁহাদের দেশের কি মঙ্গল সাধিত
হইয়াছে? রবীন্দ্রনাথ ১টাও মিল স্থাপন করেন নাই, জীবন
বীমা প্রতিষ্ঠান খোলেন নাই, একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন
একটা বড় কলেজও গুড়েন নাই, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের
মত একটা হাসপাতালও খোলেন নাই—কিন্তু এসকলের
চেয়ে চেয়ে বেশি তিনি করিয়াছেন। তিনি একটা ভাবের
সাম্রাজ্য দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার নিজের জীবনব্যাপী সারথিত
সাধনাই একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়—বাস্তবী জাতির
মনোলাোককে তিনি ভাষিয়া গড়িয়াছেন—জানাজন শলাকায়
আমাদের শতাব্দী উজ্জীলিত করিয়াছেন—অধঃপতিত মৈত্রাজ
হত জাতিকে আশার বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন—আমাদের
বুক যেমন দিয়াছেন আশা—আমাদের মুখে তেমনি
দিয়াছেন ভাষা—আরও কত কি সব কথা বলিতে গেলে
গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। সভামাহুয়ের পক্ষে ভাবের জগৎটা

দৈন্ত হরণ করিয়া তিনি কি ক্রুবেরের সম্পদ দান করেন
নাই? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঙ্গলের চাব তিনি করেন নাই—কিন্তু
তিনি বৃহত্তর, মহত্তর, অতাবনীয়া আশাতীত মঙ্গলের জন্য
স্নেহ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথাতেই উত্তর
বোধ হয় অসম্ভব হইবে—

কহিল মনের খেদে মাঠ সমস্ত।
হাট ভরে দিই আমি কত শক্ত ফল।
পল্লত পাড়তে বুন কি জানি কি কাজ।
পাখানের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
গিরি বলে সব হ'লে সমস্তমিয়ার।
নামিত কি করণার অমূল্য ধারা?

কবি ভাগ্যের নব ভগীরথ।
শিবজী হইতে হরের স্বরূপী ভাবের মন্দাকিনী ধারাকে
মুক্ত করিয়াছেন।

চিত্তানায়ক

এই জাতির নৌকালের তপস্কার ফলে রবীন্দ্রনাথের
জন্ম। জাতির অন্তর্মহিত তপোলক মহাশক্তিই রবীন্দ্রনাথে
পরিপূর্ণরূপ লাভ করিয়াছিল। কবি তাই কৈশোর কাল
হইতেই এই বৈশেষ্য প্রাপ্ত করিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন।
দেশের ভাষা সংস্কৃত ও প্রকৃতিব প্রকৃতি গভীর অত্মরূপ
হইতেই তাঁহার জাতিপ্রেমের স্রবস্রাব। যৌবনে তাঁহার

কোকোলা কেশ তৈল

দৃষ্টি জাতির সর্বাংশের উপর নিশ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন তাহার সর্বাংশই কৃত। ইহাতে তিনি যে বেদনা অনুভব করিয়া ছিলেন তাহা তাহার তৎকাল রচিত গদ্য পদ রচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আছে। প্রৌঢ় জীবনে তাহার এই বাস্তবিক জাতিগ্রন্থ অল্পভাবে দৃষ্টান্ত ও ঘনীভূত হইয়াছে।

আমাদের এই পরাধীন দেশের সামাজিক জীবনের সাক্ষীকরণের আমাদের ব্যক্তিগত অভিমান কিংবা জাতিহীন-বংশগত অভিমানই সখল। সর্বপ্রকার জাতিজাত্যের মধ্যে জাত ও লালিত ব্যক্তির এই অভিমান অল্প-সকলের চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু সমগ্র জগৎ বাহার বিহারেক্ষক—সমগ্র মহাদেশ বাহার চিত্রাঙ্গ বিধীকৃত ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির সবে বাহার ভাব বিমিশ্র, ওঁহার পক্ষে সেই অভিমান আর ব্যক্তিগত বা বংশগত হইয়া থাকে না—তাহা জাতিগত বা সমগ্র দেশগত হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অভিমান তাই কোন সাক্ষী গণকে আশ্রয় করে নাই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সর্ববিধ দীনতা হীনতা ও পরাধীনতা সবেও অতীতযুগের বিপুল আধ্যাত্মিক গৌরব বর্ধমান ছিল—প্রাচীনমভ্যতার আদর্শ জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের অভিমান তাই একটা সত্য সমস্ত ও ধ্রুব আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জগৎ এই জাতীয় অভিমানকে নিজের ব্যক্তিগত অভিমান বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সমগ্র জগতের গর্ভোত্তর সভ্যতার কাছে ভারতের গৌরবকে হ্রস্তাভিত করিবার জ্ঞান এত সূক্ষ্ম হইবে কেমন করে নাই। দেশের বা জাতির প্রতি উপেক্ষা নয়নিরে বীকার করিয়া লইয়া তিনি কোথাও ব্যক্তিগত কবিরোগকে শিরোধার্য করেন নাই। জাতীয় বাস্তব্য ক্ষয় করিয়া কোথাও তিনি ব্যক্তিগত বাস্তব্যের অর্থাৎ গ্রন্থ করেন নাই।

আমাদের জীবনের ক্ষেত্র পরিসর এতই সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র যে আমরা অনেক সময় পরাধীনতার মানি উপলব্ধি করিবার সুযোগই অবশ্য পাই না—সাক্ষ্যভাবে পরাধীনতার জঙ্কট আদ্যাদিগকে বিদ্ধ করে না। তবে যে আদ্য

পর্যায়ের জ্ঞান এত চীৎকার করি—তাহা বই বা খবরের কাগজ পড়িয়া বিশেষদেহের অল্পবয়সে এবং আর পাঁচজনদের দেখাদেখি। কবির পক্ষে তাহা নয়। সমগ্র জগৎ তাহার বিহারক্ষেত্র। দেশদেশান্তর ঘুরিয়া প্রবল পরাধীন জাতির মধ্যে জীবনযাত্রা করিয়া পরাধীনতার মানি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অনেকস্থলে পরাধীন জাতির লোক বলিয়া তাহার ব্যক্তিগত অভিমানও আহত হইয়াছে। তাই কেবলি তাহার মনে হইয়াছে—“ভারত তবু কই?” তুলনার ক্ষেত্র তাহার বিরাট। ক্রমব্রমণে পদে পদে তিনি জাতীয় পরাধীনতার মানিও হীনতা অনুভব করিয়াছেন সে জ্ঞান কবির দেশপ্রেমি পদম সত্য ও অক্ষপট।

বাস্তব্য যোগা করিয়া বিবর্তন মত প্রচার করিয়াছেন। এজন্য ও তাহার যথেষ্ট সাহস ও বিবর্তন প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এজন্যও বারবার তাহার মূলত জনবলভ্যতাকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে, অনেক দিক্কার সঙ্ক করিতে হইয়াছে। কবি নিজেরই বলিয়াছেন—

চুপের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী

জানিয়াছি দাক্ষিণ্য বৈরাগী

কত দিন সন্ধিয়া কবি রাত্রি দীপালোকহারা

তরির মাঝে অস্বপ্নেতে পেয়েছি ইসারা।

নিদ্রার কটকমালো বন্ধ বিধিয়াছে বারে বারে
বরালা জানিয়াছি তারে।

যে শৌধ্য ও শূন্য তিনি যদ্যে দেখাইয়াছেন তাহার চেয়ে ঢের বেশী সাহস তাকে বিশেষ দেখাইতে হইয়াছে। জাপান, কানাডা, আমেরিকা, ইংল ও ইতালি দেশের বুকের উপর পাড়াইয়া সে সব দেশের জনারোগ্য বনস্পতিত্ব ভ্রাম্য শীর্ণ উন্নত করিয়া তাহাদের চির-পোষিত রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি আশ্রয়ত যোগা করিয়াছেন। এজন্য তাহাকে নানা লাঞ্ছনা, শিকার ও উপেক্ষা বরণ করিতে হইয়াছে। দন্যপ্রাণিতা, সামাজ্যবাদ, বাণিজ্যত্ব, সাক্ষী জাতীয়তাবাদ, বার্তিক সভ্যতা ও রণভবনবাদের বিরুদ্ধে মহত্বের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাহার বিশ্বজগতের প্রধান ব্রত। তাহার বিশ্বজগত

ইতিহাসের সহিত বাহাদের পরিচয় আছে তাহারা জানেন, রবীন্দ্রনাথের এই অকপট জাতিপ্রেমের সহিত অসাধারণ শৌধ্য ভেদমিতা ও নিভীকতা জড়িত আছে। যেমন হইতেই তিনি ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজের গভ্যগতগতিকা মিথ্যাতার, কণ্ঠচাপ ও ভ্রান্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্বাভাব্য শৈলীনী চাচনা করিয়াছেন ইহাতে তিনি মূলত ব্যক্তি ও জনবলভ্যতাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এদেশে রবীন্দ্রনাথের যথা-যোগ্য প্রতিষ্ঠার যে বিশেষ গতিমাছিল ইহা তাহার একটি কার্য। জাতির কল্যাণের জন্তই তিনি অসাধারণ সাহস দেখাইয়া আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন। এ পথে তিনি সঙ্গী-হীন যাত্রী। কবি চিরদিন সত্যের পূজারী। সমস্ত জীবনই তিনি সত্যের কণ পতিব্রাজ্য করিয়াছেন। দেশের বর্তমান পক্ষের কোন অবিচার, অন্যায় ও অসঙ্গত শাসন বিধান তিনি নীরবে সহ্য করেন নাই। তিনি যেরূপ ভীতভায়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার কাছে তাহার স্যার উপাধিভাণ্ডা তুচ্ছ ব্যাপার। বাহারা রবীন্দ্রনাথের সমাজ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছেন—তাহারা একথা ভাল করিয়াই জানেন। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাহার অস্বপ্নের যোগ ছিল। সত্য-নিষ্ঠ কবি যেখানে সেগুলির মধ্যে অসত্য, অবিচার বা স্বার্থপরতা দেখিয়াছেন—সেখানে তিনি আপনাদের জন-বলভ্যতা অর্জনে করিতে তিনি বিশ্বজগত করেন নাই জন-বলভ্যতাকে পদদলিত করিয়া ভারতের বাণী এবং নিজের সমাজপ্রেম প্রচার করিতেই তিনি দেশে দেশে ভ্রাম্য করিয়াছেন।

সব চেয়ে বড় সাহস ও বিক্রমের কথা—পরাধীন দেশের একজন লোক হইয়া তিনি জগতের সমস্ত পরাধীন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহাদের বিহীনসমাজের মর্মস্থল পাড়াইয়া তাহাদেরই ভাষায় বীরপদে তাহাদের পদে বাহাদুর্য করিয়াছেন—তাহাদের আদর্শ ও মতবাদের বিরুদ্ধে আশ্রয়ত প্রচার করিয়াছেন—এবং বহুকণ্ঠে ভারতের সাধনার বাণী যোগা করিয়াছেন। কোথাও পরাধীনজাতিহীনত শূন্যমনোভাব বা দৈহিক তাহার কণ্ঠে

স্থাপিত করেন নাই—কোথাও তিনি আত্মার পরাভব বীকার করেন নাই। পশ্চতলনিয়ন্ত্রিত পরাধীনতাকে তিনি বৈদিক পরাধীনতা মাত্র মনে করিয়াছেন—তাহাতে আধ্যাত্মিক পরাধীনতা ক্ষয় হয় না। নথ, দাঁত, অঙ্গ বা শর শ্রেয় আত্মাকে পরাধীন করিতে পারে না—সেই আত্মার পরাধীনতা তিনি সর্বত্রই যোগা করিয়াছেন। ভারতীয় সাধনার এই আদর্শ কোন দিন তিনি বিশ্বত হন নাই। তিনি জগতের চিন্তানায়কগণ ও বর্ধমান জড়বাদ্যাক সভ্যতার কর্ণধারগণের সভায় অধিত তেজোপ্রেমের যতই শীর্ণ উন্নত করিয়া পাড়াইয়াছেন—সমগ্র ভারত ততই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সভায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। একটি মাত্র স্বকীয় সাধনা ও তপস্যাবলে সমগ্র দেশকে এতটা উর্ধ্বে তুলিয়া দরিতে পারে—ইহা স্বপ্নাতীত। এ যেন “রসাতলা-দাদিভবেন পুষ্পা” শশিনি ফলক কল্পের দশনশিখরে লগ্না-নিমগ্না—দরগীর উত্থান। রসাতল হইতে দরগীর উত্থানের জায় ভারতের উত্থরণ।

সমগ্র বিশ্বের বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার ঐশ্বর্যের পুনঃউল্লস, মহাশক্তি বিপুল বিস্তার, ঐকিত্যের ঘটা ছটা সমগ্রোহা অধঃপতনের মহাশক্তি নীরব পড়াইয়াও তিনি নিজের দেশকে হীন, ধৈর্য, নগণ্য—হুজু মনে করিতে পারেন নাই—ইহাতে একদিকে যেমন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সারবত্তা ও বিপুলতা স্ফুটিত হয়, অন্য দিকে তেমনি কবির নিজের অনন্তসাধারণ দেশপ্রেমি, ব্যক্তিক এবং গভীর আত্ম-প্রত্যয় স্ফুটিত হয়।

(২)

এই অদ্বৈতজাতিক জ্ঞান তাহার উৎকর্ষার অবধি ছিল না। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক সমস্যায় তাহার চিন্তা ও চিত্তকে লীন করিয়াছে।

প্রত্যেক সমস্যাট লইয়া তিনি চিন্তা আলোচনা বাহাদুর্য করিয়াছেন, চিন্তা করিয়াছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন—তার প্রচলিত ও অপ্রচলিত গদ্য-প্রবন্ধগুলিই প্রধানতঃ ইহারই সাক্ষী। দেশের জসকট, অক্ষকট, সবলের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ

কাপুরুষতা, সামাজিক মানি, দেশবাসী অশিক্ষা, জাতিসমগ্রতা, হিন্দু-মুসলমান সম্রাট, জাতির পরনির্ভরতা, অদৃষ্টভাব, ইত্যাদি সমস্ত সম্রাট লইয়াই তিনি চিন্তা করিয়াছেন। দেশের প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল—যদিও তিনি কোথাও আত্মবাস্তবতা বলি দেন নাই। দেশের প্রত্যেক অবিচার অত্যাচার তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। দায় ও সত্যের জন্ত তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন, সত্যবাণী তাঁহার রচনায় ও “রসনায যর থলু সমাই” লীশামান হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংসার সাধনের একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা নিষিদ্ধ ছিলেন; প্রজাদের সম্পর্কে ভূখানীদের দায়িত্ব ও দেশীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের দেশের মূল সাধনের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন, স্বদেশী ভ্রবা প্রচারের জন্ত সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—স্বদেশী মেলার উদ্বোধন করিয়াছিলেন—সত্যগ্রহণ আন্দোলনের পরিকল্পনা তাঁহার মনে ছিল। পরিচালনা-নাটকের দ্বন্দ্ব বৈরাগী সত্যগ্রহ আন্দোলনের অঙ্গভূত। দেশে শিক্ষাবিভাগ শিক্ষা ও প্রচারের জন্ত তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনে তিনি একজন অগ্রণী হইয়া চিন্তা, বাক্য, কর্মে, রচনায়, উদ্ভীপনায় জাতীয়তাবোধ জাগরণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন আশি ও তাহা দেশাশ্রয়বাদ উদ্ভীপিত করিয়াছে।

দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি নতিহারিকা বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। দেশে আদর্শ শিক্ষা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাবিভাগের লোক ছিলেন না এবং প্রচলিত শিক্ষায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন না বলিয়া দেশের লোক তাঁহার কথা তখন শোনে নাই—এখন তাঁহার আদর্শের মধ্যদ্বা দেশের লোক-ক্রমে উপলব্ধি করিতেছে।

দেশের মধ্যে পড়াশুনার ক্রম, কৃষিকার ও আচার সর্বস্বতা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। এই সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং বহু বালাভাব করিয়া ছিলেন এবং সত্যদর্শ ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব অবস্থানে তিনি

নাট্যরচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের “লোক ছিলেন না বলিয়া হিন্দুসমাজ তাহাকে হিন্দুত্বের বিপক্ষ-বাদী বলিয়াই মনে করিত। নির্মিতার হিন্দুসমাজের প্রত্যেক সমস্যারকে হিন্দু চন্দন লেপনে রক্ষা করবার দিকে হিন্দুসমাজের অগ্রণীদের জেদ ছিল। ক্রমে লোকের তাঁহার দ্বন্দ্বমতের সারকতা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ হিন্দু জননেতা বলিয়াই তাহারা মনে করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজের লোক ছিলেন না বলিয়া অনেক মুসলমান মনে করেন তাহাদের সমাজের জন্ত তিনি কিছুই করেন নাই। ইহার উত্তর দিয়াছেন কাজী আবদুল ওদুল সাহেব—“মুসলমানীর অর্থ যদি হয় সত্যপ্রীতি, মানব-প্রীতি, জগৎপ্রীতি, জ্ঞানের সমর্থন ও সত্যের প্রতিরোধ, তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় মুসলমান এগুণে আর কেউ লোকের কি না সে কথা এই সকল সমালোচকদের গভীর বিচার-বিস্মরণের বিষয় হওয়া উচিত।”

কবির ক্রীড়িকা, শিক্ষার আদর্শ, একাল-সেকালের দ্বন্দ্ব, বৈবাহিক সম্রাট, হিন্দু-রাষ্ট্র-সম্রাট, বালাবিবাহ, জাতিভেদ, সমুদ্রযাত্রা সম্রাট, আচারের ও বিচারের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়—এ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন সমস্যারের জন্ত কবি কত গভীর ভাবেই না চিন্তা করিয়াছেন। এ সকল প্রবন্ধ সাহিত্যিক রসাবেগ অপেক্ষা দেশের জন্ত উৎসাহী শব্দভর। সে জন্ত চাতুর্য অপেক্ষা মুক্তিহই প্রাথমিক দেখা যায়। গভীর সত্য-নিষ্ঠা তাঁহার কবিত্বকে যে তুলাইয়া দিয়াছে। তিনি এই সকল প্রবন্ধ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—তাঁহা এখন সবই ফলিতেছে। হৃৎকের বিষয় সাধারণ পাঠকদের মনে এ সকল প্রবন্ধের বিশেষ পরিচয় নাই। এই সকল প্রবন্ধ যদি এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইত—তাঁহা হইলে দেশের কি মঙ্গল হইত! পারিত—তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জাতীয় চরিত্র গঠনে ইহার চেয়ে বড় সহায়ক প্রবেশের ভাণ্ডারে ছিল না। এগুণের শিকিত লোকেরা সাধারণ ভাবে স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষিত করিয়াছে (ক্রমশঃ)

বিলাসমন

মাসিক বাল্যোপাধ্যায়

টিকেন এক বিলাসনের মনটা সবল, কেবল বুদ্ধিটা একটু পাঁচালো, জাত বেধের যেমন হয়। দরকার না হলে অকারণে কখনো সে পাঁচ কখনো না এবং পাঁচ যাতে পড়ীর হয় সে বিষয়ে সাধন থাকে। মিথ্যাকে সে আমল দেয় না। সাধারণ যদি বা কালো বলে, এমন জ্বরের সঙ্গে বলে এবং এতখানি তেজ আর আশ্চর্যকতা থাকে তার বলে মনে, যে লোকের পতমত খেয়ে ভাবে তারই বোধ হয় জ্বল হইতেছে। বিলাসনের সাহস দুর্জয়। যেখানে ভয়ের কিছু মেই, যেখানে প্রতিপক্ষ তার চেয়ে দুর্বল, সেখানে সে জুসাসহী। শঙ্কার কারণ থাকিলে শঙ্কিত না হয়ে সে উদার-বিরহ সাহস দেখাতে বিরত থাকে, ভাত তার দৈর্ঘ্য ও সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়। অত্যাচার সে কখনো করে না, অত্যাচার করত হলে আগে ইশরের, কর্তব্যের, মহত্বের দোহাই দিয়ে সে বিশ্বজগতের কাছে ঘোষণা করে নেয় যে সেটা অত্যাচার নয়, অতিশয় দায়।

সাতার বছর বয়স হয়েছে বিলাসনের। মেহেরি রঙের চুলে সাদার ছোপ ধরেছে। মিসেস বিলাসনের বয়স হবে ছেচলিশ, তবে বয়স গোপন করার কৌশল জন্মহিলা এক ভাল জানেন এবং ওই সাধনায় প্রতিদিন এত সময় ব্যয় করেন যে মনে হয় দ্বিশ বছরের বৌবনে যেন ভীটা ধরেন। তবে ঘোষারের জল প্রচীর তুলে আটক মিলে ভাত দেয়ন-জাওলা জ্বায়া, জল খাণ্ড হয়ে পচাণ্ডা দেখায়,

মিসেস বিলাসনের রূপও তেমনি দিয়ে গেছে। বিশ বছরের মেয়েটির পাশে বিশেষ করে বদ দেখায়। মেয়েটির নাম অরেলো। অরেলো যে খুব বেশী রূপসী তা নয়, নীল চোখ, গালের উঁচু হাড় আর বৈচিত্র্যহীন চিপচিপে গড়নে রূপ স্পষ্ট হয় না। তবু, ছেচলিশের সঙ্গে জুড়ির তকনা অনেক।

একটি ছেলে আছে বিলাসনের, আর্থার। অরেলোর চেয়ে আর্থার কিছু বড়। আর্থারের তেজাগুলি বিভিন্ন রকমের টাই আছে।

বিলাসন সম্প্রতি সপরিবারে নগরগড়ে মহীধর রাধের বাড়ীতে বাস করছে। বাস করছে অনেকদিন, যদিও মহীধর তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল দিন কয়েকের জন্ত। মহীধর অত্যন্ত অতিথি বৎসল, তাদের বংশে চিরদিন এই বাৎসল্যের প্রবল প্রকোপ দেখা গিয়েছে। বিলাসন নড়বার নামও করত না, তবু মহীধর প্রত্যেক সপ্তাহেই ছাত্রার বার ভাতক আরও কিছুদিন খেতে যাবার জন্ত অহরোহ করত।

বিলাসনেরা সপরিবারে তাকে দখবাজ জানিয়ে বলত, ‘অন্ত করে বলবার দরকার’ নেই রায়। ‘আমরা নিশ্চয় থাকব।’

কতগুলি সপ্তাহ অতিথি হয়ে বাস করবার পর বিলাসন মহীধরের মানেজার হয়ে বাস করছে। সেকালে বিশাল

বিনমহাল বাড়ীটার গায়ে লাগিয়ে দশিণে নদীর দিকে
মহীর ঘে একেলে খাচে নতুন বাড়ী তুলছে, তাকে।
বাড়ীটিতে শোবার ঘরের মাঝাই হবে ডজনগানেক।
অতিথি পরিবারেরে প্রথমে মহীর তিনখানা শোবার ঘর
আর একটি বন্যার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর বিলাম-
সন নিকে কাজ করবার জন্ত একটি অফিসঘর, আর্থারের জন্ত
একটি পড়ার ঘর এবং অয়েলোর জন্ত একটি বন্যার ঘর
চেষ্টে নিয়েছে। তারপর আরও একটি বাড়ি তৈরি তার কি-
কারেপে নরকার হয়েছিল মহীর ঠিক বুঝতে পারে নি। তারও
পরে মহীরঘর বাড়ীর এই আদুনিক অংশটির সমস্তটাই
বিলামসন আরম্ভ করে দেবেছে।

মহীধরের একটি বন্ধুর সপরিবারে আসবার কথা ছিল, নতুন বাড়ীর একাংশেই তারা থাকবে। এ বাড়ীতে পাঁচ সাতটি পরিবার একসঙ্গে আরামে বাস করে গেছে।

মহাপ্রবাসের বন্ধু পরিবার এসে পৌছবার আগে বিলম্বিত
বলল, 'আমার একটা অরোহণ রাত্রত' হবে রায়। অন্য
কোথাও গুসের যদি থাকবার ব্যবস্থা করে দাও, বড় ভাল
হয়। ভেবে না, দেশী লোক বলে 'আশ্রিত' করছি।
যোটেই তা নয়। তোমার এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার বনে
না। তা ছাড়া তোমার ও বাড়ীতে ছে। বাগদার অভাব
নেই।

তারপর আরও অনেকবার মহীশয়ের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-
বান্ধব এসেছে কিন্তু বাড়ীর নতুন অংশে বেড়ী স্থান পায়নি।
কয়েকবার বিলাসন নতুন নতুন দ্রব্যাদি মুক্তি দেখিয়ে
জ্ঞানীর ঘরেছে তার অংশ সে যেন একলা থাকতে পায়।
এখন আর বিলাসনকে মুক্তি দেখাতে হয় না, কিন্তু বলতেও
হয় না। অতিথি যারা আসে পুরাণো বাড়ীর সাতাশটি
ঘরের সব চেয়ে ভাল খান দেশক ঘরে তাদের থাকতে দেখেছে,
হয়, বিলাসনের শক্তি ভগ্ন করার কথা মহীশর মনেও
আনে না।

জেলার কালেক্টর জ্যাকসন সাহেব যখন সপ্তাহিক তিনদিন
মহীধরের অতিথি হয়েছিলেন, তখন পুরাণে বাড়ীতেই
তাদেরও থাকতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, বিলামসন অকাটা

যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'ও মিষ্টার জ্যাকসনের সঙ্গে আমার সর্বদা নানা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে বৃথতে পারছ না, রায়? নতুন রাস্তা, স্কুল, কারখানা, আরও কত বিষয়ে কত কথা বলতে হবে। ওরা আমার বাড়ীতেই থাকবে।'

এই প্রথমবার বিলাসন মহাদেবের নতুন বাড়িতে
আমার বাড়ী বলে ঘোষণা করল। কিন্তু কথাটা যেন
মোটের উপর পাপছাড়া শোনাল না তার মুখে।

জ্যাকসন সারেবের পর এসেছিলেন দ্বিতীয় সারেব বেনেট সারেব। এদের দুজনেরই পত্নীরা মিসেস বিলাম সনের এবং ছেলেমেথেরা আর্থার ও অয়েলোর প্রাপের বন্ধু স্বতন্ত্র এবং যে বিলামসনের বাড়ীতে বাস করে মাঝে সেট খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল সকলের।

একটা রাজ্যের সমান মহীধরের জমিদারী — বিলাসমানে
তদ্বাবধানে দিন দিন জমিদারীর উন্নতি হতে লাগল।

লোকটা বিলম্ব কর্তৃক এবং উৎসাহী সন্দেহ নাই
নাইবা হবেন বেন। পুষ্টিগত, উত্তেজক বাত ও পানির
অবশ্য নাই, বিশ্রাম সে কারণেই অল্প হিমায়ে নেয়, অবশ্য
বিনোদন তার অপরিহার্য। নিত্যকর্ম, হস্তিরিয়রিত কর্মে
দিয়ে যখনক সর্বদা তাজা বাত, তার উপর বেশের
বাতবাহী বসে মানসিক কর্মের অধিক সে যোগ্যে না
মহীধরের বাড়ীতে এ এটোটে সে যে কতক করেছে এ
করছে তার বিবরণ সত্যই চমকপ্রদ। পদ্মচাঁটের সমস্ত

দিয়ে কাজ শুরু হয়। আবেগপাশের গায়েন লোক আবেগপাশের নতুন পিচ ঢালা করে উইবার আগে ভাল করে আবেগপাশের কাবা দুয়ে নেয়। গরুর গাড়ী চললে এভাবে গরুর বাবার বড় বাস্তার দক্ষা নিকিধ করে তিরি, তিরি, পাঁচেরে বাস্তার এখন গরুর গাড়ীর বাস্তার বহু হয়ে গেলে পাবে ওপথে এখন মাইবের, 'তার অতিথি অভ্যাগতদের এ বিলাসবহন মেটাগাড়ী হু হু করে চলে—থানা ভেঙে গেল। জনা টিপে টিপে সাবধনে চালাতে হয় না। গরুরগাড়ীও চালাক করে অন্য পথে। একই ঘুর হু, সমথ বেশী হানে গিয়ে আকন অস্থবিতা নেই। রাসপুর থা থেকে হানোই গিয়ে তিন জেগুনামেকের ঘর, এখন তিন জেগুনের সামান্য

सकयन

বেশী কি কম হবে। নগরগড় থেকে সদরের দূরত্ব গুরু গাড়ীতে সাত মাইল বেড়ে গেছে। তবে বিলামসনের বন্ধু শ্বিথের কোম্পানী নগরগড় থেকে মালপত্র সরিয়ে যাবার জন্য আট দশটি লরী কাজে লাগিয়ে দেওয়ায় অনেক গুরু গাড়ীর এখন আর খাটর খাটর করে সদরে যাবার দরকারই হয় না।

মহীধরের রাজ্যী কাছাকাছি নদী ধারে একটা বিছাত
তৈরীর কল বসানো হয়েছে। মহীধরের বাড়িতে বাড়বাতি
লন আর টানাপাথার পাট গেছে উঠে। জিপবছর প্রতি
সন্ধ্যা আলো জালায় ভার বে লোকটির ছিল, তাকে
ছাড়ানো হয় নি। পাগা টানার এগারটি ছেলেকুড়োর কার
গেছে। বিছাতের কল বানানো আর চালানার পর উত্তর
বাড়ি কিছু ন্যাকসে সে বাহাদুর বিশালমান করছে। নগর-
গড়ের অধিবাসীসের নিজের নিজের কাঁচা পাক। বাড়ীতে
বৈদান্তিক আলো জালাতে রাজী করণার সময়টা তাকে
মোটেই কাঙ্ক্ষতে পারে নি। অর্দ্ধেক লোক বৃষ্টিমারের
মত নিজেরাই রাজী হয়েছিল। কাজেই, রাজী করাতে
হয়েছিল মোটে বাকী অর্দ্ধেককে। নগরগড়ের সে বাড়ীতে
সন্ধ্যার পর এক খণ্ডার মধ্যে বাড়ি নির্ভিয়ে সকলে ঘুমিয়ে
পড়ত, এমন রাতে বাহটা পথ্য বাল্য জালিয়ে সে বাড়ীতে
সকলে থেকে গেলো।

আলো জলুক বা না জলুক, টাকা মাসে মাসে দিতে হবে। আলো না জালিয়ে টাকা দেবার কথা ভাবতে অনেকের গা জালা করে।

ভিনটে কাঁথানাও বিলামসন বসিয়েছে। তার মধ্যে কাঁচের কাঁথানাটিই সব চেয়ে বড়,—গ্রামফোন, শিটার আও ভেজিউসন কোম্পানী ন্যানেজিং এজেন্টস। অশ্বতঃ একটা কোম্পানীর মূলদন মদীদরের দেবার ইচ্ছা ছিল। তার এজেন্টে তার জমিতে কাঁথানা বাসতে বিলামসনের বন্ধুর শুণু পকেট থেকে টাকা ঢালবে, সহায়তা করা ছাড়া সে কিছুই করবে না, এটা তার কাছে কেমন লজ্জাকর মনে হচ্ছিল। ক্যামিফেক্সের কাঁথানার সমস্ত মূলদন, অশ্বতঃ অর্থেচ্ছ, দেবার জন্য মদীদর উৎসাহ হতে উঠেছিল। কিন্তু হা বরান নয় তা তো আর হয় না।

বিলাসন তাকে বুঝিয়ে বলল, 'সত্য কথা বলি রায়, এতবড় দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তোমার নেই। কি দরকার তোমার অত হাদ্দামায়? তোমার যথেষ্ট লাভ থাকবে। তোমার এটোটির কত উন্নতি হয়েছে, আরও কত উন্নতি হবে ভাব তো!'।

আরও অনেক কিছুই বিলাসমান করেছো এবং করছো।
এটোটার বিনি বন্দ্যোবস আদারপত্র হিসাবনিকাশ ইত্যাদি
ব্যবহার্য যেখানে যতটুকু ছিল সব এমন-অর্থাৎ করে
দিয়েছো যে সমস্ত এটোটা সে টানের চোটে টন টন করছে।
নিয়ম হয়েছে অসম্ভাব্য এবং নিয়মসম্মততার কড়াকড়ি হয়েছে
বিষয়ক। দেহ আনার গোলমাল নিয়ে নড়ে উঠান চিঠি
সেখানেগিছে হয়, প্রশ্ন, কলিফোণি, মন্তব্য, ব্যাখ্যা ইত্যাদি
হট্টোমেন্টে দেহ দিতা কাগজ লিখে, দেড়দিন ইতো একজন
করাগি স্বামী কাইল তৈরী করে। কারও প্রতি বেআইনী
অজ্ঞার হবার উপায় নেই, আইন ছাড়া এক পা চান নিষেধ।
সামাজ্য বলে কোন ব্যাপারকে তুচ্ছ করা হয় না, বিচারের
জ্ঞান সোহা। আদালতে পারিয়ে দেওয়া হয়। এক ধমকেই
মাড়ে চার টাকা রাজনা আদায় হয় বটে কিন্তু ধমক দেওয়া
হবে আইনসম্মত নয়। হুঁতো মিঠি কথায় আশোনে অনেক
ব্যাপারেই যৌমালা হয় বটে, কিন্তু তাতে তো প্রেজিড
থাকে না।

বিলামসন বলে, 'প্রেমিষ্টি বজায় থাকার ওপর সব নির্ভর করে যায়, এটা কখনো ভুলো না। প্রেমিষ্টি বজায় রাখা চাই, প্রেমিষ্টি।'

এত কাজ ও দায়িত্বের বিনিময়ে বিলামসন মাসে মাসে মোটো বেড় হাজার টাকা নেয়। মইধর অবশ্য তাকে থাকবার বাড়ি দিয়েছে। আসবাব দিয়েছে, চাকর বাকর দিয়েছে, খাশ এবং শানীয় হোগাচ্ছে, মাঝে মাঝে সে যে পার্ট দেয় তার খরচটাও দিচ্ছে, শুধু খরতে গেলে বিলামসন যত কিছু করেছে এবং করছে তার তুলনায় মাসে বেড়হাজার টাকা কিছুই নয়।

দূর থেকে তাকে আসতে দেখলে গাঁয়ের ছেলে বড়ো

দ্রী-পুঙ্খ চোখের পলকে উধাও হয়ে যেত বলে গোড়ার দিকে বিলামসনের বড় আপশোষ ছিল। পালিয়ে বাবে কেন? কি দরকার পালিয়ে যাবার? যে যেখানে ছিল সেইখানেই পাড়িয়ে থাক, সে কাছাকাছি গেলে সেলাম করুক, পালিয়ে গিয়ে বেড়ার দাঁক নিয়ে উকি দেওয়ার মত অসভ্যতা করা কি উচিত? মাঝে মাঝে দু'চারজনকে ঘরের ভেতর থেকে টানিয়ে এনে বিলামসন তাদের সঙ্গে আলাপ করত।

সুন্দর আদিলিক বলত, 'সেলাম করনে বোলো। বাতলা দো।' সেলাম করা হলে কয়েকবার মাথা হেলিয়ে বলত, 'ভরতা কাহে? ভরো মং।' বলে আলাপ সাধ করে এগিয়ে যাবার আগে হাতের সৰু বেতগাছা দিয়ে সপাং করে পথের ধারের আগাছার গুগাটি উড়িয়ে দিয়ে আড়-চোখে চেয়ে দেখত, অল্প পায়ের লোকটি কেমন চমকে উঠে জড়কে যায়।

যুব বেশী রকম বেয়াসদি না করলে বেতগাছা সহজে মাছখের গিঠে পড়ত না। দীহ বাপ্পী একদিন আরেলোর ঘোড়ার চড়া দেখে রোকার মত হাসছিল, লম্বা লাঠীটা ছ'হাতে দুটা করে ধরে সিঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হাওয়ারমের মত হাসছিল। বিলামসন কি আর্, জানত না একমু করে হাসাটা যে অপমানের অসভ্যতা দীহ তা জানে না। তাই রাগ করে নয়, দীহ যা জানে না তাকে শুধু সেটা জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তার নিকম্ব কালা পিঠের চামড়ায় বিলামসন চার পাঁচটা লম্বা দাগ একে দিয়েছিল। দাগগুলি থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ার আগেই দীহ বাপ্পী গিয়েছিল পালিয়ে।

আরেকদিন বিলামসন সশরিবারে নদীর ধারে বেজাতে আর শাবী শিকার করতে গেছে বিলাসের দিকে। পাঁচু গোয়ালার ছেলে মধু মাঠের গর নিয়ে ফিরছে বাড়ী। কালী নামে পাঁচুর একটি গরু ছিল একটু বেশী রকম চপল, মাঠ থেকে বাড়ী কোয়ার সময় তার চা যেত বেড়ে। এদিকে যেত, ওদিকে যেত, থমকে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কয়ে পাঁজত, হঠাৎ শিং নেড়ে চার পা তুলে ছুট দিত লিগুবিদগু, জান হারিয়ে। তবে গুঁতোনোর খভাব তার ছিল না,

দু'বছর বয়সের মধ্যে একটি নাহয়কও সে গুঁতোয় নি। শিং নেড়ে যথিক লম্বা করে সে ছুটছিল ভাতে বিলামসন দেহ হাত দশকে তফাৎ দিয়েই সে বেড়িয়ে যেত। কিন্তু মিসেস বিলামসন আর আরেলো ভয় পেয়ে এত ভোরে আর্মারিয়ার কার উঠল যে বিলামসন ও আর্মারিয়ার ছদ্মনেই ছ'ননা দুটি বন্ধুরে চারটি টোটা ছদ্মরাগুলি কালীর গায়ে ঢুকিয়ে দিল। মধু হাউমাউ করে ছুটে এলে এমন বিপজ্জনক হিসেব জড়কে দড়ি ছাড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য হাতের বন্ধুক দিয়ে বিলামসন কয়েক ঘা এবং আর্মারিয়ার কয়েক ঘা মারল। আর এমনি কৌশলবি ব্যবক ছিল মধু যে সেই কয়েকটা ঘায়েই সেইখানে সে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

জিলাটন তরফদারের ছেলে পুঙ্খটিকে বিলামসন এক দিন খালি হাতেই মেরে বসেছিল। পুঙ্খটি সহরে কলেজে পড়ে, সিগারেট খায়। নদীর ধারে বাগানে নালায় বসে বিলামসন পরিবার আখিনের বিড় বাতাস উপভোগ করছে, বলা নেই কওয়া নেই একহাত তফাতে বসে পড়ে পুঙ্খটি ফুস ফুস সিগারেট টানতে লাগল, ধোঁয়া উড়ে আসতে লাগল মিসেস এবং মিস বিলামসনের মুখে। আর্মারিয়ার টান ছিল সিগার, বিলামসন টানছিল শাইপ। ছেলের হাত থেকে সিগারটা টেনে নিয়ে বিলামসন তার জলজ প্রান্তটি চেপে ধরেছিল পুঙ্খটার গরায়।

এই ইশ্টিতুই যথেষ্ট হবে ভেবেছিল বিলামসন, হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কলেজে বিশেষী শিক্ষার ফুল প্রমাণ করতে পুঙ্খটি বিনা বিদায় সংকারে বিলামসনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল।

বাগ বাটার তখন চার হতে পুঙ্খটিকে মারতে লাগল। কিন্তু একালের বাপু ছেলে শুধু ঘোরাধব হওয়া নয় পায়েও যেন তারা কি করে ভয়ানক জোয়ার বাগিয়ে ফেলেছে, মুখি মায়ার কৌশল শিখেছে অকাটা। ছাঙ্কনে তাকে যত না মারল, একা সে কিরিয়ে দিল তার বিগুন।

বিলামসনদের সঙ্গে গেমিন বন্ধু ছিল না।

পুঙ্খটি কোচার গুটে নাকমুখের রক্ত মুছতে লাগল আর বিলামসনের নাকে কদাল চেপে ধরে পা বাড়াল বাঁদীর

দিকে। বিলামসনের দুটি প্রকাও দুর্ভর প্রকৃতির কুকুর, অতি প্রভুভক্ত কৌব। কিন্তু বিলামসনের কুকুর বলেই ছিল, চাকরের সঙ্গে তারাও প্রতিদিন হাওয়া খেতে বার হত। একটু এগিয়েই কুকুর দুটির সঙ্গে বিলামসনদের দেখা হয়ে গেল।

বিলামসন চিরদিনই চটপটে। কুকুর দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের গলার বানন খুলে একটু তফাৎ থেকে পুঙ্খটির দিকে ক্লেপিয়ে দিল। তীরের মত ছুটে গিয়ে বাঘের মত সেই দুটি কুকুর পুঙ্খটিকে একবারে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

বিলামসন ভেবেছিল ছোকরাটাকে একটু নাস্তাছব্দ করে কুকুর দুটিকে ভেঁকে নেবে। পুঙ্খটি মারাত্মক রকমের নাগানায়ুল হল বটে, কুকুর দুটিকে বিলামসনের আর ভেঁকে নেওয়া হল না। এখান থেকে গোয়ালপাড়া বেশী দূরে নয়। নদীর ওপারেই বাগানের এক বস্তি, অগ্রহাণের গোড়ায় এখন হাটু ভুবিয়ে হেঁটে নদী পারাপার করা চলে। চারিদিকে কাছে ও দূরে বিশিষ্ট দর্শকের সমাগম বিলাম-



সনের সঙ্গে পুঙ্খটির হাতাখতির সময়েই হয়েছিল। এইবার তারা হেঁটে কবে ছুটে এল। দশ বার জনের হাতে ছিল লাঠি, লাঠির খায়ে বিলামসনের কুকুর দুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল।

কুকুর দুটিকে না মেরেও পুঙ্খটিকে বাঁচান যেত। কুকুর

অতি প্রভুভক্ত কৌব। কিন্তু বিলামসনের কুকুর বলেই ছিল, চাকরের সঙ্গে তারাও প্রতিদিন হাওয়া খেতে বার হত। একটু এগিয়েই কুকুর দুটির সঙ্গে বিলামসনদের দেখা হয়ে গেল।

বিলামসন কিন্তু অস্বীকার করে বলল, 'ওসব মিছে কথা। ভয়ে ওর দিশে হারা হয়ে গিয়েছিল।



বিলামসনের ভাবগতিক দেখে কারো সন্দেহ রইল না যে তার কুকুরপ্রেম সত্যই বড় গভীর ছিল। কুকুরের শোকে সর্বদা মুখে সে গরুর গরুর আওয়াজ করতে লাগল পাগলা কুকুরের মত। যখন তখন বাকে তাকে সপাং সপাং বেত মারছে, কথায় কথায় পাইকপেয়া। আমলারা বরখাস্ত

হচ্ছে, জরিমানায় জরিমানায় মাইনে কেউ পাচ্ছে না অজেকের বেশী। চাপ দিয়ে দিয়ে কাবু করে লোক ঢুকিয়ে ঢুকিয়েও কারখানাগুলিতে কিছুতেই লোকের অভাব মিটছিল না, এবার একেবারে সোজাইছি ধরে ধৈর্ষে কারখানায় নিষিদ্ধারে লোক ঢোকানো শুরু হয়ে গেল,—নিজে না গেলে ক্ষেতে যার চাষ হবে না তাকে পর্যাপ্ত।

গোয়ালপাড়া উঠে গেল এক মাইল তক্তাতে একটা জলার ধারে, ওখানে ছাড়া অন্য কোথাও তাদের ঘর তুলতে অসম্ভবিত দেবার উপায় বিলামসন বুজে গেল না। নদীর ওপারের সেই বাগীচাভাঙ্গার সকলকে পুরো একমাস মাটি ফেলে নদীর ধার উচু করার কাজে লেগে থাকতে হল। অতি ক্লান্ত সে নদী, বছরে ছুঁমাসের বেশী জল থাকে না, আর পর্যাপ্ত এ নদীতে কোনদিন বন্যা হচ্ছে বলে কেউ স্বপ্ন করতে পারে না। কিন্তু বিলামসনের দহকভাঙ্গা পণ, একটা মাস বেগার খেতে বন্যার হাত থেকে নিজেদের তারা বাঁচাবেই বাঁচাবে।

দিন এমন মিন কিমনে তারা আধপেটা সিকি পেটা খেত, তিনদিন বিনা পদশায় মাটিকাতার পর তাদের উপোস শুরু হয়ে গেল। যে হাতে লাঠি ধরে বিলামসনের কুহুর ঠোঁড়িয়ে মেরেছিল সেই হাতে কৈদাল ধরার জোরও আর রইল না। তখন বিলামসন একটা কারখানা থেকে অগ্রিম মজুরী আ নিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল—কিন্তু মাটিকটা বন্ধ হল না। ওখা দরোয়ানেরা ঠায় পিড়িয়ে থেকে পুরো একটা মাস তাদের দিয়ে নিজেদের মজল করাল।

একমাস শয্যাপাশী হয়ে থেকে দুর্ভিক্ষ পেয়ে উঠল। মনে হল, বিলামসনের কুহুরের কান্ড খেয়ে তার মাথাটাও বিগড়ে গেছে। শোভায় বিচির এই যে একটা হুমকি জগৎ আছে, বৃষ্টি শান্তি আরামের মত অপুর আশীর্বাদ আছে কীবনে একশ' দেড়শ' টাকার চাকরী আর হুমকী বো প্রভৃতি বিশ্বাসের সম্ভাবনা আছে অদূর ভবিষ্যতে, এসব সে যেন বোঝে তুলে গেল। বিবাবাজি টো টো করে ঘুরে ঘুরে অন্য সব মাথাগুলি বিগড়ে দেবার চেষ্টা ছাড়া তার যেন আর কাজ রইল না।

মাথা প্রায় সকলরই কবরশী খারাপ হয়েছিল, তবু সে মাথাগুলি বিগড়ে দিতে কী পরিশ্রমটাই যে করতে হল, দুর্ভিক্ষ। এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল মাথাগুলি।

কমকল্প শিশু জোটায অতি কষ্টে সেগুলিকে দুর্ভিক্ষি কাছাকাছি এনে ফেলল। কি যেন ঘটে গেল তখন নদীই গোবেচারী মন্থরাগুলি মথো, চারিধিক, অভিযাপ শোণা যেতে লাগল, বিলামসন নিশাত যাও!

ব্যাপার দেখে মদীর বিস্তৃত হয়ে বলল, 'তুমি বরং কিছু দিন বাইরে থেকে ঘুরে এসো বিলামসন'।

বিলামসন মৃত্ত হেসে বলল, 'ভেঙো না রায়। ছ'চারজন অক্লান্তকর্ম বন্দ্যায়স যদি চেষ্টাতে চায়, চেষ্টা'ই শাও। বেশীর ভাগ লোক আমাকে পছন্দ করে, 'আমাকে চায়'।

'তবে একটু নরম হও'।

'ক্ষেপেছ? এই তো শঙ্ক হওয়ার সময়!'

মদীর তবু ইতস্ততঃ করছে দেখে আরেলো তাকে ইসারা করে নিজের বদবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল। তাকে কোঁচে বসিয়ে পিছন থেকে ছুঁহাতে তার গলা, জড়িয়ে ধরে মাথা মাথা রাখল। মদীরের রং কালো, রীতিমত কালো। তাকে আরেলো এইভাবে পিছন থেকে আলস করে। কারণ, মদীর তার মূখ দেখতে পায় না বলে মূখের ভাব গোপন করার কষ্টটা তাকে করতে হয় না।

'আমায় দেখলেই এইটুকু এইটুকু বাঁধা ছেলেলা ঢিল ছুঁড়ে মারছে। কত বিস্মৃত আমি বাইয়েছি ওদের! সেদিন কে কান্নকে চাপা দিয়েছিলাম, সেটা কি আমার প্রেম? বাস্তব মাথানো ওখা গেলা করবে, দুখ থেকে হুঁ দিলে সরবে না, কাছাকাছি এসে স্ত অশ্রুভের মাথায় কেউ গাড়ী খামাতে পারে? তাই বলে আমাকে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে মারবে! কি বলে তুমি বাবাকে চলে যেতে বলছ, ওদের অত্যাচার চূপচাপ সহ্যে বলছ?'

মদীরের মাথা যুগতে থাকে। আরেলো তার কাছ থেকে দাঁখা ভাব কতি কতি রাব হোটেল গিনোয়া টেব মোটর

এরোগ্রেন বিদ্যুৎ বেতার সিভিল কোড পেনাল কোড ভেমোফেনী প্রভৃতির অভ্যস্ত চেন্টনার মত। মনে হয়, আরেশের অভাবে যে অচেতন হয়ে যাবে। বিলামসনের ভয় তো আছেই, আরেলোকে হারাবার ভয়ও তার কম নয়। ডম্ভটি কমেতে চায় না কিছুতেই। মদীর কাবু হয়ে থাকে।

মদীর ব্যাকুল হয়ে উঠলেও বিলামসনেরা কিছু যা কিছু ঘটতে লাগল সমস্তই তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে লাগল। গুলি করে, লাঠি মেরে, বেতিয়ে, বেঁধে রেখে, লুট করে, আগুন

মদীর কাতর হয়ে বলল, 'বাঁকু না বিলামসন?'
বিলামসন বলল, 'ক্ষেপেছ? তাই কখনো যেতে দেখা যায়'।

মদীর তবু ইতস্ততঃ করছে দেখে আরেলো তাকে ইসারা করে নিজের বদবার ঘরের নির্জনতায় ডেকে নিয়ে গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় পরপর পাঁচশোখানা গরুর গাড়ী বিপুল কাঁচার কাঁচার আগুয়াজ তুলে নগরগড় থেকে সদরে রওনা হল। বিলামসনের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা



দিয়ে বিলামসন জনপ্রিয়তা বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। উৎসাহ উদ্দীপনাও উত্তেজনার নেশায় সে যেন হয়ে গেল নতুন মাতঙ্গ। মুখে শুধু তার মুটে উঠতে লাগল, আরওও আপশোধের কতগুলি রেখা।

একদিন রাতে খবর এল, পরদিন সকালে নিষিদ্ধ পথে পাচশো গরুর গাড়ী চলবে। সাধারণের রাস্তা সেটা নয়, দখা করে বৈরাগ্য সাধারণকে দিয়ে হেটে অথবা রবার টায়ারের গাড়ীতে যেতে দেওয়া হয়, বিলামসনের সেই পথে বিলামসনের হুহুম তুচ্ছ করে কাঁচের চাকগুলা পাচশো গরুর গাড়ী একসঙ্গে সদরে রওনা হবে।

[১২৭ পৃষ্ঠায় অব্যাহত]

ছিল, মাইল দুই এগিয়ে যাবার পর গাড়ীগুলি খামিয়ে প্রত্যেক গাড়ীতে পেট্রোল টেলে আগুন দরিয়ে দেওয়া হল। গাড়ী শিখু গড়পড়তা পেট্রোল খরচ হল তিনগ্যালান। আরও কম পেট্রোলেই কাজ হত কিন্তু এসব ব্যাপারে কার্যপা করা বিলামসনের স্বভাব নয়।

গোয়ালারা কদিন থেকে তাদের পুরোপো ডিটেম ছোট ছোট চালা তুলতে আরম্ভ করেছিল। বিলামসন ভেবেছিল

স্থাপিত—১৯৩০

ফোন :—ক্যালকাটা—২০৫৪

ইষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট ইনসিয়োরেন্স কোং লিঃ

চীফ, এজেন্টস :—মোহন এণ্ড চৌধুরী

১০, ক্লাইমেন্ট রো, কলিকাতা।



মমত্ব

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আরো কত আপকায় কালরাত্রি যাবে ?
কবে দেখা দেবে—
প্রলয়োগ্নি সিদ্ধপারে শুভ্র মহাতট
অক্ষর প্রাণময় দীপ্ত জীবনের ?
হে ! বন্দিনী জন্মভূমি
অকাল জরায় মাতঃ বিগত যৌবনা
আজ একী দুঃসহ লাঞ্ছনা
তোমা সর্বত্র ঘিরে !
শতশত রিক্মমাই জনপদ বিঘ্ন তিমিরে
প্রাবন জর্জর পল্লী কৃষকায় কৃষাণ-কন্ডাল
সর্বদাশী এদেছে অকাল !
জলময় গ্রামে গ্রামে বজ্রাহত বৃক্ষের শাখায়
নিরাশ্রিত শিশুরকৈ শব্দের লাঞ্চিত পাখায়—
স্বপ্নের সোনালী বাগ থর থর কাঁপে
ধুমরিত বাপ্প জমে থর রৌদ্র তাপে
শিশল আকাশ জুড়ে
শত শত রক্ত চক্ষু কৃষ্ণকাক চলে উড়ে উড়ে।
জগ গর্ভে দাঙশিশু মরে পক্ষতলে
হে বঙ্গ, তোমার ঘোলা জলে
দিকে দিকে অবিরত অশ্রুর কন্ডাল
লক্ষ লক্ষ ভয়ঙ্কর বঙ্গের হিদোলা,
মম্বর প্রভাত আসে রাস্তা সন্ধ্যা নামে
দারিद्र্য পীড়িত গ্রামে গ্রামে।

বিকলাশ শ্রামবধ মৃগীমুগ্ন অতিশাণ ভূমি
তোমার চোখের জলে বঙ্গোপসাগর
উবেলিত লবনাক্ত
দক্ষিণের তটপ্রান্ত জুড়ে
মারি মারি শাল তাল খুঁদরী দেওদার
শত মৌম শতাব্দীর উন্মত্ত বিবাদ
অবিরত আদিগন্ত স্তম্ভ আর্তনাদ !
তবু দেখি জীবনের অমূল্য মহিমা
প্রাকার্ভে, পোষ্টারে, বিজ্ঞাপনে,—
পদাতিক বৈমানিক সামুদ্রিক বীরের জীবনে।
অতলাস্ত বাধীনতা আসে ঘন তমিস্র বিদারি,
আসে ঝড় মেলদগু মুক্ত নরনারী
প্রাণকর্মে, পোষ্টারে, বিজ্ঞাপনে,—
তোমার মাশানে তার কোথা একাতন
আবাহনী মাসলিক ?
হে দেশ মাতৃক,
সহরের রাজপথে বুকুয়ার মমত্বের শিখা
কৃষ্ণকায় শবদেহে অসাড় কন্ডালে
রগোদ্যাত সভ্যতার চিতাবহি জলে।
সে আঙুনে জনারণ্যে ধুময়িত জলে দাবানল
প্রবলিত নরগোষ্ঠী মরে ধূকে ধূকে
পোড়া মাটি শুকে
অরণ্যে মানুষ কীদে, মানুষ অরণ্যে কীদে মরে।

গুহাঙ্গ নিহিত প্রবোধকুমার সান্যাল

ঘর ওই মাত্র তিনটি। রান্না-ভাঁড়ার সবজ্ঞ আলাদা,—
আর দক্ষিণে একফালি বারান্দা,—কিন্তু কলকাতা শহরে
এই স্ট্রাটটিরই মাসিক প্রণামী চলিণ টাকা।

তিন-চারটি প্রাণীর হাত পা ছড়িয়ে থাকার পক্ষে এমন
একটি স্ট্রাট সামান্য কথা নয় ! অবশ্য অতিথি-অভ্যাগত
এসে ক্ষুধার সন্তাবনা হালে একটু সমস্তা দেখা দেয়
বৈকি।

তা হোক—বয়সার ঘরের দেয়ালে পেরেক টুকতে
টুকতে প্রতিমা বলে, দেবী দিদি একলা আসছেন, কোনো
স্বপ্নাট তাঁর নেই। বদবার খবর থাকলেই বা—?

প্রিয়কুমার বলেন, দিঁড়ি দিয়ে লোক যাভায়াত করবে
না ? তেভালাব লোক যাওয়া-আসার সময় তোমার দেবী-
দিদির দিকে কেউ যদি উকি-ঝুঁকি মারে ?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে স্বামী মূখের দিকে তাকায়।
বড়-বড় টানা চোখ, কপালে রেখা নেই, মুখে স্মরণের চিহ্ন
নেই। বলে, সে কি, তাই কেউ করে বৃষ্টি ?

করে না ?—প্রিয়কুমার বলে, স্ট্রাটগুলা বাড়ীতে থাকার
বৌতুক তোমার চোখে এখনো পড়েনি। সাথে কি আর
বলি, পেঁগো ভূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে !

আচ্ছা—আচ্ছা, আমি না হয় গেঁষো ভূত, আর ভূমি
কলকাতার ছেলে, হয়েছে ত ? এমন তা হলে কি করবে
তাই বলা।—প্রতিমা আবার ছবি টাঙানোর পেরেক

টুকতে থাকে। অতিথি এসে পৌছবার আগে ঘরখানা
সাজিয়ে তুলতে না পারলে আর চলছে না।

প্রিয়কুমার বলে, ভীষণ সমস্তা ! কি করা যায় বলে
দেখি এখন ?—এই বলে সে মুখ টিপে হাসে।

স্বামীর মুখ-চাওয়া-স্ত্রী নিষ্পেষ কল্পনায় কোনো প্রতি-
বিধান করতে না পেরে শেষকালে বলে, বলা না, কি
করব ?

ওরে বোকা, এই জ্বাখো—বলে প্রিয়কুমার স্বীর কাছে
সরে গিয়ে বলে, এই যে দিঁড়ির খাবের জানুলাটা, এটা
পূর্বা একটা ফুলিয়ে দিয়ে, আর এই দরজাভেতর একটা—
বৃকলে ? সেই যে আমি ফুলকাটা রঙীন বন্ধরের থান
এনেছিলাম—?

এক মুখ হেসে প্রতিমা এইবার স্বামীর দিকে তাকায়।
এত সহজে সমস্তার বে সমাধান হয় আগে কে জানতো !
বলে, ঠিক বলেছ, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু আমি
যে সেলাই জানি নে ? কে করবে ? কী চমৎকার ফুল
কাটা পর্দা করেছে, ও বাড়ীর হরবমা ! আমাকে যদি
কেউ শিখিয়ে দিত !

প্রিয়কুমার বলে, ভূমি একটু আন্ত শিমুল ফুল। কত
লোকের বউ কত রকম জানে। ভূমি কী জানে ? জানে—
কৈবল্য—

মুখের কথাটা প্রিয়কুমারের মুখেই থেকে যায়। হু ?

জনেই হাসিমুখে তাকায় দুজনের দিকে। চারটি চোখের মধ্যে ছুটিতে চতুর বুদ্ধির দীপ্তি, আর ছুটি চাহনিতে নদীয়া জেলার কোন এক অখ্যাত গ্রামের একটি প্রাচীন সর্বোৎকৃষ্ট রম্য ছায়া। প্রতিমা হাসিমুখ করিয়ে আনতে আনতে পিঠের দিককার ঝাঁকলটি কাঁধের উপর টেনে নেয়।

—আরে, সরো সরো, পেনেক পুঁতে পুঁতে ঘরখানাকে ভরিয়ে ফুললে। কী হবে সত ছবি টাঙিয়ে? দেখালে আর মণা-মাছি বসবার জায়গা নেই। তোমার দেবীবিদী এমন কী মংরাণী ডিক্টোরিয়া আসছেন দার জনো এত শাস্তসজ্জা?

তুমি চুপ করো—প্রতিমা, গ্রীষ্মা হুলিয়ে বলে, ওরা কত লোপাড়া জানা মেয়ে, কত ইংরিজি বই পড়ে! খবর চেহারা দেখেও কি মনে করবে বলা ত?

প্রিয়কুমার বলে, ও এমন ঢের-ঢের গ্রান্ডফট মেয়ে কলকাতায় গড়াগড়ি যায়। তোমার মতন লম্বীর ঘরে তাঁর মতন খুবজি মেয়ে জাপা পাবেন, এটা তাঁর ভাগি মনে করবেন!

ই—কি মনে করবেন, শুনি? লোপাড়াতে তুমিই কোন কন্ম? তুমিও ত ছোটবেলায় পড়েছিলে শিশুশিক্ষা?

স্বামী গভীর বসিকতা প্রতিমা বৃত্তে পাবেন না। মূখ করিয়ে বলে, কিন্তু তুমি যে বনো শিশুশিক্ষা পড়লেও মাছর মুখা থাকে? দেবীবিদী যে ইংরিজিও জানেন!

প্রিয়কুমার বলে, ছো, ইংরিজি! ইংরিজির শিশু-শিক্ষাই লোক পড়ে, তা জানো? তোমার দেবীবিদী যদি বিদ্বান হন তবে তুমি আর তিনি একই—নাও, হয়েজে, টুল থেকে এবার নামো। ওই ত, বেশ ছবি মানিয়েছে! তোমার দেবীবিদী এমন ঘরে ঢুকলে আর বেরোতেই চাইবেন না, দেখো।

স্বামীর কথায় প্রতিমার মন খুশি হয়ে যায়। বলে, থাকলে তা ভালোই, কতদিন দেখিনি। ও-বছরে এক-বারটি এসেছিল, সেই যে তুমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলে? সেই যে গো কীটা তুললাম আমরা, মনে নেই? বজ

তুলে যাও তুমি, বাপু। সেই যে তোমাকে তিনি একই পশমের গেঞ্জি বুনে দিয়ে গেলেন?

প্রিয়কুমার বলে, হ্যা, হ্যা, একটু একটু মনে পড়ছে তোমার দেবীবিদী দেখতে ট্রিক কেমন, বলা ত? মনে ট্রিক মনে পড়ছে না আমার। আমাদের বনমালীর মত গায়ের বটী হবে বোধ হয়, না?

ওমা—প্রতিমা চোখ কপালে তুলে নিউয়ে ওঠে—তোমার তাহলে একটুও মনে নেই! একেবারে দখলে রং, নাক-চোখ কি স্থান্ডার, কেমন গড়ন-পেটন, কেমন চুল—

প্রিয়কুমার একমুখে গভীরভাবে চিন্তা করে বলে, হ্যা, হ্যা, তাইত। তা বয়স হোলো বৈ কি, মতল মনে পড়ে বোধ হয় বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি—

কি বলো?

আঁ?

অন্ততঃ পয়তালিশ?

সহসা একঘর হেসে উঠে প্রতিমা তাড়াতাড়ি মুখ আঁচল চাপা দেয়, এবং তেজনিভাবে হাসতে হাসতে বাম গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে বলে, পয়তালিশ! তাঁর এগনো পচিশ হয়নি গো।

ও একই!—প্রিয়কুমার বলে দাঁড়াও, দরজাটা ভেজি দিও, তারপর দুজনেই হাসবো খুব করে।

চট করে প্রতিমা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। রক্তবলে, না, থাক, দরজা খোলো, তোমার চালাকি জানি। এই সকাল বেলায় তোমার—ছিঃ কী হচ্ছে?

বাইরে খুঁড়িয়ার গলার আগুয়াজ পেয়ে দুজনেই সহ হয়ে স'রে দাঁড়ায়। তারপর দরজার কাছে এসে প্রিয়কুমার নিজেই বলে, পিসতুতো বাবোনের নন্দ, তার জ আবার এত! আমি বাপু তোমাদের জুটিপ মংকো মধ্যে নেই, আমার অনেক কাজ। বসবার ঘরটা না ছেড়েই বিলু, কিন্তু বৃষ্টিবান্দ্র এসে বাবো কোথায়?

মাথায় থোমটি টেনে চাপা গলায় প্রতিমা বলে, এক কষ্ট করো, লম্বীটি—

কদিন তিনি থাকবেন, শুনি?

তিনি দিন গো—

অন্যভাবে দিগে যেন ফাই-ফরমাস পাঠিগো না। মেয়ে-ছেলের ফরমাস পাটাও অক্ষমার।

খুঁড়িমা বান্দ্রাধার ধরে থেকে এগিয়ে এসে বলেন, তা আনছে, ভালোই ত? করে আসবে গো, বোনা?

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুঁড়িয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ঘূর্ণকণ্ঠে বলে, আছই বিকলে!

আমাজনের আর কোনো কটি রইলো না। অতিথির কাছে স্বামীর পরিচয় আর অর্থব্যকে উজ্জল ক'রে তুলে ধরার জন্য সারাদিন প্রতিমার পরিশ্রমের আর অন্ত নেই।

বনমালীর সাহায্যে সমস্ত ফ্রাটিটা জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে সে তত্বকণ্ঠে করে তুললো। শোবার ঘর তিনখানার আদমার সজ্জাগুলি কেড়ে-মুছে চেহারা করিয়ে দিল। দ্বিধার বাড়ী থেকে দরজা ও জানলার পর্দা উঠিয়ে এলো। এদিকে দখবে চাদর উঠলো বিছানায়, আলর-দেওয়া বালিশ, নিট-এর মশারি,—টেবলে চীনাঘাটির তুলদানি,

প্রিয়কুমারের প্রিয় কয়েকখানি বই, টিপাইয়ের উপরে ঘণ্টাচীরে ভুস-বাসানো টেবল্‌ল্যাম্প,—ওদিকে একটি শুল্ণে স্থগ্ধী তেল, ভালো সাবান, ধাতের মাজন, মাথার

নুহু ফিতা ও কীটা, দেওয়াল ঝোলানো বড় একখানা সোনালি ফ্রেমে ঝাঁকানো আয়না, তারপাশে শাড়ী তুলিয়ে রাখার একটি আনলা। মহিলা অতিথির অভ্যর্থনা ও

বাঁধনের কোথাও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই। স্বামীর রুচি আর সমসিকার স্থখাতি হবে এই আনন্দ-গৌরবে সারাবার

প্রতিমার মুকুর ভিতরটা টলমল করতে লাগলো। তার মনে স্বামী-ভাগ্য ক'রবেন?

ভালো শাড়ী আর জামা প'রে বেলা চারটে নাগাং

বেলায় সে পায়ে আলতা প'রে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময়

নিচের দরজা মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

প্রিয়কুমারের বহু আপত্তি থাকলেও স্ত্রীর অমুরোহে

তাকে যেতে হয়েছিল টেনে। মোটরের আগুয়াজ শুনে

প্রতিমা খুঁড়িয়ার হাসিমুখে এসে দাঁড়িলো। খুঁড়িমা

বেরিয়ে এলেন। বনমালী জিনিসপত্র ব'য়ে আনার জন্ত

নীচে নেমে গেল।

অতিথির মতো অতিথিই বটে। মুখে অপরিপাক

গাছীয়া, কিন্তু তবু হাসিমুখ। পরনে দামী শাড়ী, কিন্তু

তার চাকচিক্য নেই, যেমন-তেমন করে জড়ানো। হাতে

কয়েকটি ফিনিক্সে চুড়ির সঙ্গে একটি ছোট সোনার হাত-

ঘড়ি, গলায় চিকচিক হার, পায়ে বাদামী রঙের ফিতা

বাঁধা একজোড়া দ্বিধার। দীর্ঘ উন্নত দেহ, শব্দের মতো

সে দেহ মৃদু, মৃদু।

প্রতিমার চিবুক নেড়ে আদর ক'রে দেবীবাণী খুঁড়িয়ার

পায়ের ধূলা খালো। প্রতিমা বললে, এবারে-কিন্তু তিন-

দিনের বেশি থাকতে হবে তোমাকে, দেবীবিদী।

বকশিস?—ব'লে দেবীবাণী হাসিমুখে দ্বিধার চাইলেন।

—বকশিস না পেলে অতিথির চলবে কেন?

প্রতিমার হয়ে প্রিয়কুমার উত্তর দিল, তা বকশিস দেবো

টাকি। আমাদের অকুণ্ঠ সেবা, ঈশ্বরের ঐকান্তিক—মানে

যাকে বলে—

আপনি কে, মশাই? চিনিবেন ত?

খুঁড়িমা হাসলেন। প্রতিমা মুখে আঁচল চাপা দিল।

প্রিয়কুমার বললে, বেশ লোক যা হোক, ঈশন থেকে

আনন্দম মাথায় করে, তার জন্তে, একটু রক্তজ্ঞতাও নেই।

উটে বাড়ী বয়ে এসে বাড়ীওলাকে বলেন, আপনি কে

মশাই! ঘোর কলিগুণ!

দেবীবাণীর হাত ধ'রে প্রতিমা তা'কে ঘরে নিয়ে

এলো। প্রিয়কুমার ভিতরে এসে বললে, বিশিষ্ট অতিথির

জন্তে আমরা স্বামীজী মিলে সারাদিন ঘর সাজিয়েছি। দয়া

ক'রে মেরিকে একটু প্রসন্ন সৃষ্টি দেওয়া শ্রেক।

প্রতিমা বললে, ওমা, তুমি আবার কখন কি করলে?

করিনি? কেব আবার স্বামীর অবধা হওয়া?

কখন আমি আবার অবধা হলাম গো তোমার?

হওনি?—কুড়িম বোধ প্রকাশ ক'রে প্রিয়কুমার বললে

অতিথির সামনে আমাকে অপমান?

প্রতিমা অবাক হয়ে বললে, আচ্ছা দেবীদিদি, এতে অপমান হোলো কোথায়?

দেবীরাণী তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, মামী লোক কিনা ওরা, তাই ওরা পরে পরে মান খোয়ায়? তুমি ভাই রাগ করো না।

প্রিয়কুমার বললে, আপনার একধার মানে? মানে এই যে, সারাদিন আমি ঝেঁপে এসেছি, এখন বিবার বাগানে আশানাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে। প্রতিমা হেসে দৃষ্টিয়ে পড়লো।

দেবীরাণী পুনরায় বললে, যান চা আছেন, বসে বসে কৌলন করবেন না।—না, না, তুমি থাকো ভাই, ঠকে একটু খাটিয়ে নিই। ফাই-করমাস করলে উনি বিশেষ ক্রমভিত্ত হবেন না।

নিভান্ত অস্তিত্বি বলেই—এ রকম তাক্সিলা সয়ে রইলুম।—বলি প্রিয়কুমার হাসিমুখে বাইরে চলে গেল। গুঁড়িমা এসে অবজ্ঞা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, বনমালীর হাতে তিনি চা ও জলখাবার পাঠালেন। মিনিট দুই পরেই প্রিয়কুমার আবার ফিরে এসে বসলো।

দেবীরাণী হাসিমুখে বললে, স্বীকে একটু ভালো-টালো বাসেন? না, কেবল কথাব চাটুভীতে গ্রামের মেয়েকে কুণিয়ে রাখেন?

প্রায়টিতে একটু অবশিষ্ট আছে বৈ কি। প্রতিমা উঠে পালাবার চেষ্টা করলো। প্রিয়কুমার বললে, পাপ মুখে বলতে নেই। আমাদের ভালোবাসা কি আর অজ্ঞানোকে বুঝবে?

এসেই ফে-শাসন দেখলুম তা'তে বিশ্বাস করা একটু কঠিন।—বলে দেবীরাণী বক্রদৃষ্টি করিয়ে হাসলো।

প্রিয়কুমার বললে, মেয়েমাছদের দৃষ্টি বেশি দূর পৌঁছায় না।

দেবীরাণী বললে, তাই নাকি? কথাটা শুনেও মন ঠাণ্ডা হয়। কই, আমার দিকে মুখ তুলে কথা বলুন ত?

প্রিয়কুমার কিন্তু মাথা তুললো না। মুখ নামিয়েই চামচা করে বললে, জী ছাড়া আর কোনো মেয়ের

দিকে আমি মুখ ফেরাইনে। এইটি আমার তপস্যা।

দেবীরাণী গুণিমুখে বললে, ওরে বাবা, এত? যু যে তোষামোদ করতে শিখেছেন? গভ বহুদের চেয়ে এক উন্নতি হয়েছে দেখছি। চকু সার্থক হলো।

বেশ ত, থাকুন না কিছুদিন, আরো বেগতে পাবেন। রকে করুন, আমার বাজার-হাট করা হয়ে গেলে এখন থেকে পালাবো।

কোথা পালাবেন?—প্রিয়কুমার মুখ তুললো।

কেন, লজ্জাতে? যেখানে চাকরি করি?

প্রতিমা বললে, চাকরি করেই তুমি চিরদিন কাটাও

দেবীদিদি?

কি আর করি ভাই, বলা? বিয়ে করবে না বুঝি?

দেবীরাণী নিউয়ে উঠে বললে, সর্লানশ, বিয়ে? এম পুরুষ মাছের চিরকাল আলাবে, আর তাই সম্ব করব?

ঘরমুখ সবাই হেসে উঠলো।

প্রতিমা বললে, তুমি বড়লোকের মেয়ে, চাকরি তোমার স্বী হয়ে?

বিয়ে করেই বা কি স্বর্ণলাভ?

প্রিয়কুমার সেখান থেকে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গে

প্রতিমা সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীরাণীর প্রী স্বীলোকের বিবাহের দিকে মন নেই, বিয়ে না হলে তা স্বর্ণলাভ হয় না, বরা স্বামী ছাড়া আর কোনো পরি সংসারে বেঁচে থাকতে পারে, এমব কথা তার কা

নেই! স্তব্ররাস সর্লগ্রথম যে-কথাটা তার মনে সেইটি সে প্রকাশ করলো। বললে, কিন্তু স্বামী?

মেয়েমাছকে দেখে কে, দেবীদিদি?

এতদিন কে দেখলো রে?—বলে দেবীরাণী এক মলিন হাসি হাসলো।

প্রতিমা বললে, কিন্তু যখন বয়স হবে? বুকে: হ

বেশ ত, তোমারই তা' আছিস। বলে দেবীরাণী

হেসে উঠলো। কথাটা ওর থেকে প্রিয়কুমার কান

শুনলো। তার মনের একল থেকে একল অবশিষ্ট একটা তরল আলোড়িত হয়ে উঠলো।

দেবীরাণীর কেমন একটা চাকলা দেখা যায়—সেটা অনেকটা যেন অস্বাভাবিক। তিনধারা ঘর জুড়ে যখন তখন তার অস্বভাবিক পদচারণা লক্ষ্য করে প্রতিমা তা'কে কি যেন একটা প্রশ্ন করে বসেছিল কিন্তু একটুখিনি হাসি ছাড়া আর কোনো বিশেষ সহস্রতর পায়নি। উঁচুর ঘর থানায় ঢুক প্রত্যেকটি সামগ্রী লক্ষ্য করা, অন্যত্রস্তকভাবে রান্নাশাখের ভিতরটা পর্যবেক্ষণ করে একটা অস্বাভাবিক মন্তব্য করা, গৃহসজ্জার খুঁটিনাটি আলোচনা করে নিজের মতামতটা জানানো, হঠাৎ বাধকমতায় ঢুকে নিঃশব্দে কত-ক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—এই রকম বিভিন্ন প্রকার খেয়াল লক্ষ্য করে প্রতিমা অনেক সময়ে হেসেই অসির।

এক সময়ে আড়ালে গিয়ে স্বামীকে সে প্রশ্ন করে, হ্যাগো, দেবীদিদির মনটা এমন উড়-উড় কেন, বলা ত?

প্রিয়কুমার বলে, তোমার দেবীদিদিকে জিজ্ঞাস করলেই পারো?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা প্রতিমার আর হয়ে ওঠে না।

লোপাশা জানা মেয়ে ওরা, ওদের মনের ভাব জানতে গিয়ে কি সে শেষ কালে নির্গুণিতার পিচিরে দেবে?

গুঁড়িমা এক সময়ে দেবীদিদিকে ধরলেন। বললেন, হ্যাঁ গা, রাহু? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করছিলুম, যা।

দেবীরাণী খুঁদী হয়ে বললে, কি বলুন?

তোমাকে বাজার হাট করবে কলকাতায় আসতে হোলো

লক্ষ্যে শব্দে কিছু পাওয়া যায়না বুঝি?

দেবীরাণী বললে, সবাই কি সেখানে সব পায়, গুঁড়িমা?

তাই ত এতদূর ছুটে এলুম।

কথাটা শুধিসমত বৈ কি—গুঁড়িমা চুপ করে গেলেন।

কিন্তু তাঁর সন্ধিস্ত প্রশ্ন আর অব্যক্ত মনোভাবটি লক্ষ্য করে

দেবীরাণী যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। একটু পরে

গুঁড়িমা আবার কথা পাড়লেন। বললেন, বিয়ের পরে

আমরা জাননুম, তোমাদের সঙ্গে বৌমাদের আত্মীয়তা

আছে! কিন্তু তুমি নাকি আগে কলেকে পড়তে প্রিয়- কুমারের সঙ্গে?

দেবীরাণী একটু চমকে উঠলো। কিন্তু ভাবলোপান ক'রে বললেন, সেটা আমার ঠিক মনে পড়েনা। তবে বহুর মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রিয়কুমারবাবু পড়তেন সেই সময়টাতে।

তোমার মনে নেই?

একটু আধটু অস্পষ্ট মনে পড়ে। অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল কিনা—

গুঁড়িমা তাঁর মন্তব্য জানানলেন। বললেন, আমি ঠিক ভালো বুঝিনে যা—ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া অনেক রকম কথা ওঠে কিনা—

দেবীরাণী বললে, তা ঠিক বলেছেন আপনি। অনেকের জীবন ভেগেচুড়ে ও তখনই হয়ে যায় শুনেছি!—এই বলে সেখান থেকে সে সরে গেল। প্রতিমা তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সরল, নির্দোষ ও গ্রাম্য তার দৃষ্টি চোখ।

সমস্ত স্নাতটীর মধ্যে মাছদের মনোবিকলনের একটা

স্বপ্ন নাকীটা যাত-সংঘাত চলছে উপরে সেটা প্রত্যক্ষ নয় খটনায় তার কোনো প্রকাশ নেই, বায়বতায় সেট আন্দোলিত নয়—কিন্তু চলকেরা, চারনিচে, জঙ্কনে ঐক্য হোতে—সেটা প্রকট। প্রতিমার সাধ্য নেই সেটাকে স্পর্শ করে, গুঁড়িমার সাধ্য নেই সেটাকে আবিষ্কার করেন এ নটিক সকলের জ্ঞান নয়।

দেবীরাণী এসে দাঁড়ালো এ ঘরে। প্রিয়কুমার তখন একথানা বই মুখ দিয়ে বসে রয়েছে। মুখ না তুলেই সে বললে, তোমার দেবীদিদির কোনো অবজ্ঞা হয় না যেন দেখো।

তুমি নয়, আপনি! দেবীরাণী শিঙন থেকে হেসে উঠলো।

সলম্ব বিশ্বয়ে প্রিয়কুমার বললে, বৃকতে পারিনি আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেবীরাণী বললে, কিন্তু যত কলকেও যদি আমি খুঁ

না হই?

তাহলে বলুন কিপে আপনি খুশী হবেন?

যদি বলি, হে বলিরাজা, তুমি স্বর্গ আর মর্ত্যের অধীশ্বর—মন্ত বড় ভাতা তুমি। কিন্তু স্বর্গ আর মর্ত্যলোক আমার কে দান করুন—পারবেন?

প্রিয়কুমার বলবে, আপনি অস্ত্রধার্মী নারায়ণ হ'লে পাতালে যেতে পারতুম বৈ কি।

দেবীরাণী বললে, না, পারছেন না। কোনো যুগেই পুরুষ মেঘেদের রক্তে সর্পস্বাণ্ড হয়নি। মেঘেদের প্রাণ নিয়ে তারা জীবন-মরণ খেলায় যেতেছে। হেরেছে, কিবা জিত্তেছে, এইমাত্র!—শেষের কথাটায় তার গলা একটু ধরে এলো।

প্রিয়কুমার নতমুখে চুপ করে রইলো, আর কোনো জবাব দিল না।

দেবীরাণী বললে, আপনার যুদ্ধিমার প্ররবণে আমি জর্জরিত। তিনি বলেন, লক্ষ্যে থেকে এতদূরে এসে বাজার-হাট করা? সেখানে কি-কিছুই পাওয়া যায় না?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি কি জবাব দিলেন?

ঈশ্বর উচ্চকণ্ঠে দেবীরাণী বললে, সে কথা শোনাবার কি কোনো দরকার আছে আপনার? আপনি কি মনে করেন, আপনার যুদ্ধিমার কাছে কথার চাতুরী খেলতেই আপনার এখানে এসেছি?

এই বলে সে স'রে গেল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রিয়কুমার রক্ত নিশ্বাসে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলো। ঘরের বাতাসটা যেন থমথম করছে। কে যেন একটা মন্ত কামার গলা টিপে ধরেছে।

এমন সময় ভটিমা এসে পাঁজালো দেবীরাণীর কাছে। মুখ ফিরিয়ে দেবীরাণী বললে, এসেছি? অতিথিকে কোথাও যেন একলা ফেলে রাখিসনে, তাকে ভুলে পায়, জানিস ত?

প্রতিমা খিল খিল করে হেসে উঠলো। দেবীরাণী সম্মেহে তার গলা ধ'রে বললে, হা'রে ভাই, সতি! আজ্ঞা প্রতিমা, একটা কথা ঠিক করে বলতে পারিস?

কি বলো তা?

যক্ষকুমির ওপর যদি বুকের রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তবে কি সে-মক্ষকুমি উর্জর হয়?

কথাটা থাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সে তখনো বইখানা সামনে ধ'রে শুক হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রতিমা জবাব দিল, আমি তা ভাই বলতে পারিনি?

দেবীরাণী বললে, পারিনি, কেনম? বেশ। আজ্ঞা, বলতে পারিস, ত্রৈতাযুগে কোনো চলনাময়ী রাজা রামচন্দ্রের মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিল? বোধ হয় করেনি, কি বলিস?

সরলভাবে প্রতিমা বললে, আমি ভাই ছোটদের রামায়ণ পড়েছিলাম, তা'তে এসব ছিলনা।

দেবীরাণী সহসা অস্ত্র জানালটার কাছে স'রে গেল। তারপর বললে, তোদের এমিকটা বড় ঝাঁক। এত ঝাঁকায় তোরা থাকিস, মন হ হ করেন? কোথাও পাছশালা নেই, কেবল প্রকাণ্ড একটা শূভ্র!—তার'গলাটা যেন শাশ্ব হয়ে এলো।

প্রিয়কুমার আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেইদিকে একবার লক্ষ্য করে দেবীরাণী বললে, আমার একপ্রকার কি মনে হয় জানিস, প্রতিমা? মাছের জীবন হোলো ঈশ্বরের মন্ত একটা জিজ্ঞাসা,—আমরা কেবল তারই উত্তর হাঁটতে—হাঁটতে বেড়াই। সে উত্তর যুদ্ধে পাবেনা কোনোদিন।

সমস্ত শুনে প্রতিমা বললে, তুমি এবার চালা করবে চলো, দেবীদিদি।

প্রস্তাবটা শুনে সহসা অধেভুক্ত বাস্তবতা সহকারে দেবী-দিদি বলে উঠলো, তাই চলু। খেয়ে দেহেই আমাকে একবার বেগতে হবে। কি জানিস ভাই, মধ্যে আমার মন কিছুতেই টিকতে চায়না।

অস্থযোগের সঙ্গে প্রতিমা বললে, কি করে টিকবে? ঘরকমার খাব যে তুমি পাওনি?

পিছন ফিরে হাসিমুখে দেবীদিদি প্রতিমার গাল ছুটি নেড়ে দিয়ে বললে, বোকা মেয়ে! ঘরকমার আবার খাব

কি রে? প্রাণটাই যদি খুঁজে না পাই, দেহটোর দাম কত-টুকু?—এই বলে সে দান করতে চ'লে গেল।

দেদিন কোনোমতে ছুটি আঁহাটাদি সেয়ে দেবীরাণী বেরিয়ে পড়লো। যখন সে ফিরলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। তার পিছনে পিছনে একটা ছোকরা এসে জিনিসদজ সমেত একটা চাঙারি রেখে চ'লে গেল। দেবীরাণী সিঁয়েছিল মার্কেটে। চাঙারীতে এক গোছা রজনীগন্ধার সঙ্গে ছুটি অস্ত্রাঘ ফুলের ভোড়া। কতগুলি মরুতমী হুস্বাঘ ফল, একখানি অপরাধিতা রংয়ের শাড়ী, এবং নানাবিধ প্রস্রাঘন সামগ্রী। দেবীরাণী নিশ্চের হাতেই সেগুলি ঘরে তুলে নিয়ে এলো।

চাঙারিট দেহেই প্রতিমা গিয়ে ঘরে লুকিয়েছিল। দেবী-

স্থাপিত—১৯১০

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইনসিয়োরেন্স কোং লিঃ

চীফ্ এজেন্টস্ :—খোব এণ্ড চৌধুরী

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

রাণী হাসিমুখে ঘরে ঢুকে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে আনলো। প্রতিমা রাগ করে বললে, বছর-বছর এসে তুমি এমনি করে বেহিসেবী খরচ করে বাবে, এবার আমি আর শুনবোনা, দেবীদিদি!

দেবীরাণী বললে, তোকে না সাজালেই আমার চলবেনা রে। কেন, শুনি?

আজ্ঞা শোনাবো একদিন। এই বলে দেবীরাণী তাকে প্রিয়কুমারের পড়ার চরে টেনে নিয়ে এলো। পুনরায় বললে, যদি বলি ঈশ্বরীয় পর্বা মহাভারত তোকে শোনাবো,—তার খুম পাবেনা?

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, দেবীদিদি? কেন রে?

তোমার কথা কোনোদিন আমি বুঝতে পারিনি।

তাহ'লে নিশ্চয় আমি একটা শাপলা!—ব'লে দেবীরাণী হেসে উঠলো। কিন্তু সে-হাসিতে এবার প্রতিমা যোগ দিতে পারলেনা।

দেবীরাণী প্রতিমার হৃদয় ও হৃদয়ার খেহখানিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামা ও কাপড় পরিয়ে দিল। চোখের পাতায় কাছলের মোহ একে বিল, তার বোঁপায় বিল ফুল, পায়ের দিল আলতা। তারপর বললে, পারবিনে ভোলাতে?

প্রতিমা হেসে বললে, কাকে?

দেবীরাণী বললে, স্বামীকে নয়, পুরুষকে।

ওমা, সে কি?

হ্যা রে। স্বামীত' ভুলতে বাধ্য—কিন্তু শ্রীমীর মধ্যে যে পুরুষের বাস, তা'কে ভোলানো বড় কঠিন, প্রতিমা। কিন্তু সিঁয়েই তা'কে ভোলানো যাবেনা—মেয়ে মাছের সমস্ত জীবনের তপস্বীতাও তাদের কাছে কিছু নয়। তারা নির্দয়, গুদহরীণ,—তার' হিমালয়। যদি ভোলাতে পারিস, যুববো আমার এই সাজানো সার্থক। এই বলে সে গলাটা একবার ঝেড়ে নিল।

প্রতিমা বললে, একবা কেন বলছ, দেবীদিদি? উনি ত' তেমন মাছ নন যে, আমাকে অনাদর করবেন? অনেক পুথোর জোরে আমি ঊঁকে গেছি।

দেবীরাণী পিছন দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিমার আলুগা খোঁপাটা ঠিক করে দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিমার কথায় স্ফূর্ত

শাপদের মতো তার চোখ ছুটো। পলকের ভঙ্গ অলে উঠলো, সেটা আর দেখা গেল না। কেবল শান্ত কণ্ঠ বললে, নিশ্চয়, সে একশোবার। তার মতন পুণ্যবতী ক'জন আছে ভাই?

প্রতিমা স্বত্তিবোধ ক'রে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তারপর, সাজসজ্জার শেষে, দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক পরেই প্রিয়কুমার এসে হাজির। স্তব্ধ দিকে চেয়ে সে বললে, একি? ইচ্ছা হয় আজ নাটের ফরমাস আছে নাকি?

প্রতিমা হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল উঁচুঘরের দিকে। দেবীরাণী পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো প্রায় প্রিয়কুমারের মুখোমুখি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রিয়কুমার বললে, কলঙ্ক থেকে বেরিয়ে আজ যেতে হয়েছিল এক চায়ের পাটিতে। জানি, অতিথির আদর কিছু অন্যায় ঘটে গেছে।

পাথরের পুতুলের মতো দেবীরাণী বরজার গাঘরের উপর নতমুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুকুটের বাঁলে বসলো, কেবল আজ তা নয়—চিরদিন।

কথার সঙ্গ একটা চাবুকের আঘাত ছিল, কিন্তু প্রিয়কুমার সেদিকে জ্ঞপ্তি করলো না। একরাশ বই টেবলের ওপর রেখে মুখ ফিরিয়ে সে স্বপ্ন বললে, আপনায় কি কালই যাওয়া স্থির?

না।

আর কতদিন থাকবেন?

যতদিন খুশি।

প্রিয়কুমারের গলায় কাছে আতঙ্কের মতো কি যেন একটা টেনে উঠলো। কিন্তু সেটাকে চেপে হাসিমুখে সে বললে, কিন্তু বাসনার ঠিক প্রতিমার সঙ্গীতে একে একেই কি এখানে-দিন কাটবেন!

দেবীরাণী চুপ করে রইলো।

প্রিয়কুমার পুনরায় বললে, পুরুষকে যত্ন। দেবার নিছক পথ এটা নয়!

দেবীরাণী মুখ তুললো। সজ্জার অঙ্ককারে বেগা গেলনা, তার তীর চোখ ছুটো বাপাঙ্ঘর হয়ে এসেছিল কিনা। সে

কেবল অক্ষুট আঁর্জনায় ক'রে বললে, তবে কোন্টা—বলে দিতে পারেন?—এই বলে সে ছুটে সেখান থেকে চলে গেল।

নিজের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে প্রিয়কুমার পড়া-শুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেদিন সে মাথার কাছে টেবল-ল্যাম্পটা রেখে বিজ্ঞানায় শুয়ে একখানা মোটা ইংরেজি বই মূগের কাছে নিয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। রাত তখন অনেক। ওপরে প্রতিমা আর দেবীরাণী নিশ্চিন্ত। তার পাশের ঘরে খুঁড়মা। এঘরে আলোটা জ্বলছে, দরজাটা, খোলাই রয়েছে।

পড়তে পড়তে কখন যে তার চুই চোখে ঘুম এসেছে,

“লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ,

সেই কল্যাণের ঘরা ধন শ্রীলাভ করে;

“সুখের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ,

সেই সংগ্রহের ঘরা ধন বহুলস্বলাভ করে।”

—রবীন্দ্রনাথ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিন্টিং কলিকাতা

দেশে দেশে চলে জেনে

জানাই সাদর সম্মুখণ

নিরঙ্গ দেশের মাকে

অঙ্গসত্তে শুভ আমন্ত্রণ



লুডভিগ্ ভ্যান বেটোফন

ডাঃ কালি দাস নাগ।

Beethoven এর পিতামহ Antwerp নগরে জন্ম গ্রহণ করেন স্বতরাং জাতি হিসাবে তাঁরা Flannish, জাৰ্মান নয়। Belgium দেশ ছেড়ে তাঁর পিতামহ জাৰ্মানীর Bonn সহরে বসতি করেন এবং Prince Elector এর গিৰ্জায় সঙ্গীত বাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। তাঁর পিতাও স্বকণ্ঠ গায়ক ছিলেন কিন্তু মদের নেশায় নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন। অর্থাভাবে সংসার প্রায় অচল। শিশু Beethoven-এর মধ্যে সঙ্গীত প্রেরণা দেখা দিবা মাত্র, তাকে সাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে, বাজনা শুনিতে, টাকা উপায়েয় ফলী নেশা খোর পিতা আবিষ্কার করেন। শৈশবে তাঁর একমাত্র আনন্দের আধার ছিলেন বেটোফনের জননী। তাঁর সম্বন্ধে শিল্পী বলেছেন “আমার সব চেয়ে আদরের বন্ধু ছিলেন আমার মা; শুধু ‘মা’ বলে ডাকতেই আমার কী আনন্দ হ’ত। মা সেটা জানতেন। হঠাৎক্রমে তিনি যখন ১৭ বছরের বালক তখনই মাকে হারান—সে ছুপের তুলনা হয় না! সেই বছরই তিনি জাৰ্মানী ছেড়ে Austria’র রাজধানী (Vienna) সহরে আসেন এবং সঙ্গীত বিদ্যার চরম বিকাশ তাঁর এখানেই হয়। হু’জন জগৎ বিখ্যাত গুস্তাভ হরজমার সঙ্গ এক সময়ে তাঁর দেখা হয়, প্রথম Haydn : যিনি বেটোফনকে অনেক অপ্রমার্শ দেন। দ্বিতীয়, মনীষী Mozart; এর সঙ্গে ১৮৩৭ সালে, অর্থাৎ করাসী বিপ্লবের সঙ্গিকালে, এখন

দেখা হল, মোজার্ট, ১৭ বছরের বালক বেটোফনকে, যেন পরীক্ষার জন্য, একটি বাগিনীর আলাপ (improvisation) করতে বলেন; অথচ বালক দমে যাবার পাত্র নয়! বেটোফন যেন এক দৈব প্রেরণায় শিখানো বাজিয়ে এমন আলাপ শোনালেন যে মোজার্ট মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন : “এ হোকবার আলাপ শুনে দেও তোমরা”; এর সম্বন্ধে অনেক কথাই একদিন লোকে বলবে।” মোজার্টের এই ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হয়েছিল।

ভিয়েনায় তখন সঙ্গীতের ভাল সমজ্ঞার হুঁচার জন যথা—Archduke Leopold, Prince Lichnowski, Baron van Swieten প্রভৃতি—বেটোফনের মুকলি হয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। আর্থিক সাহায্য ছাড়া যে পাশ্চাত্য জগতে স্ব-শ্রুতি (composer) হওয়া যায় না তা’ বলাই বাহুল্য। কারণ প্রত্যেক রচনাটি বাজিয়ে গাইয়ে সাধারণের জন্ম আকর্ষণ করতে হলে চাই অর্থের। অর্থাৎ যথবাদক ও গায়ক গোষ্ঠীর সম্মেলন ও অপ্রচিচালন, তবেই একাত্তান সার্থক হয়। কারণ আমাদের দেশে যেমন একটি সেতার বা বীণায় রাগরাগিনীর পূর্ণ আলাপ চলে, melody পছন্দ সঙ্গীত বলে, ঠিক তার উল্টো ভিত্তি স্ব-বৈচিত্র্য বা Polyphonyই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রাণ। স্বতরাং বহু যত্ন ও যত্নীয় সমন্বয়ে ও সাহায্যে হর সঙ্গীত বা একাত্তান (Harmony) গড়ে উঠেছে একেবারে বেটো-

ভন হুজ্জাত মণীষা দেখিয়ে গেছেন। যে যুগে তিনি রচনা করেছেন তার এক শতাব্দি পরেও ওস্তাদরা স্বীকার করেছেন যে প্রেরণায় ও নৃনসেবে সেগুলি যেন কালকের রচনা। একটুও পুরান হয়নি, এখন মৌলিকতায় ভরপুর হয়ে ছুঁচ্ছে নবনবীরা সঙ্গী হয়ে বৈটোফনের সঙ্গীত মাহুয়ের প্রাণে আজ্ঞা ও আশা আনন্দ ও প্রেরণা দিয়ে চলেছে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতন হুরলোকে অমর হয়ে আছেন।

১৭৯০ সালে, মাত্র ২০ বছর বয়সে বৈটোফন দেখি হর গুরু Haydan এর কাছে চরম শিক্ষা পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন, তিনিও শুধু শিক্ষার কাজাল হয়ে যাননি, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সার্থক করতে সঙ্গীত রচনায় নেমেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের যুগে যখন চারিদিকে দেখি ক্ষমতের লীলা, সেই যুগেই বৈটোফন সৃষ্টির প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে লিখেছিলেন—

“সর্ব কর্ম প্রচেষ্টার মূলে

ধাঁক শুধু কল্যাণ প্রেরণা

ভালবাসি স্বাদীদতা সবার উপরে।

যদি কেউ লুক করে।” সিংহাসন দিয়ে

তবু যেন সত্য দর্শে না করি লাক্ষিত—

সত্যদর্শী না হই জীবনে”

এই নীপবাসী যে ২২ বছরের যুবক বৈটোফন লিপে-
ছিলেন তার অমরত্বের দাবী স্বীকার করতে হয়। ২৫
বছর বয়সেই (৩০ মার্চ ১৭৯২) তাঁর প্রথম কনসার্ট Vic-
enna সহরে বসেও প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। ২৫ থেকে
৩০ তার জীবনের একমাত্র যুগ যুগের যুগ (১৭৯২-১৮০০)
এ যুগে তার প্রাণপূর্ণ করেছিলেন তাঁর প্রিয়া Theresa
Brunsvik কিন্তু শুভ পরিণয়ে এ মিলন সার্থক হয়নি।
শিল্পী হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে তাঁর কাণ খারাপ হয়ে
আসছে। কাণের ভিতর দিগাহী বিশপ্রাণ যার সঙ্গে কথা
বলে, সে ইন্ট্রিটিকে হারাবার আশঙ্কায় বৈটোফন যেন
পালক হয়ে ওঠেন। অনেক চিকিৎসায়ও কোন ফল হয়নি;
স্বাধী হয়ে শেষ জীবনে তিনি কী যন্ত্রণা পেয়ে গেলেন
তা সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু দৈবকবে পুরুষকার জয় করতে পারে। এটি
বৈটোফন যেন প্রমাণ করবার জন্যই আশ্রয় সংগ্রাম করে
গেছেন। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধেও যিনি হার মানেননি
সেই অপরাঙ্কে Promethenাকে অবলম্বন করে তিনি
সঙ্গীত রচনা করেন ১৮০০ সালে; ১৮২৭ সালে যখন
বৈটোফন মারা যান, তার মধ্যে ২৫ বছর ধরে বিরারায়
তিনি সাধনা করেছেন, সৃষ্টি করে গেছেন, মাহুয়কে দিতে
সংগ্রামে শক্তি, নৈরাশ্রে “আশা ও জীবনে অনন্ত প্রেম,
অথচ সেই প্রেম তাঁর নিজের জীবনে মেলিনি। ১৮২০
সালে তার জীবনের মধ্যাহ্নিক ইতিহাস যেন তিনি এই
কথাগুলির মধ্যে লিখে গেছেন—“জীবনে আনন্দ করবার
মত আর কিছুই নেই, আছে একমাত্র আমার শিল্প।
ভগবান! শক্তি দাও যেন নিজেকে জয় করতে পারি।”
দর্শে বিশ্বাস তার দুঢ় ছিল তার অনেক পরিচয় পাই:
বিশেষ করে Christ on mount olive রচনার মধ্যে।
Honier, Shakespeare ও Plutarch ছিলেন তার
জীবনের সঙ্গী; সর্গদ্বা তাদের রচনা পাঠ করে বৈটোফন
প্রেরণা লাভ করতেন। King Lear এর মত বৈটোফন
স্বচ্ছ স্বাক্ষর মধ্যে তার জীবন শেষ করেন। অথচ তার
রচনার মধ্যে পাই একদিকে যেমন মস্তকের উচ্চায় অন্তরিকে
অপূর্ণ দাক্ষিণ্য ও প্রশান্তি। গায়টে (Gorthe)র চরম
সৃষ্টি Faust এর সঙ্গে বৈটোফনের এখানে মিল আছে
তাই তিনি Faust এর হর সংযোগ করে যেতে চেয়ে
ছিলেন। ১৮১২ সালে Gorthe ও Beethoven এর
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৮১৪ সালে, Vienna Congres
এর যুগে শিল্পী তার পৌরস্বের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠেন
তারপর থেকে যেন অন্তঃস্বপ্নের পাল্লা। ১৮১৬ সালে
তার শ্রবণশক্তি প্রায় লোপ পায় এবং শরীরও ভেঙে
পড়তে শুরু করে। অথচ এ সবের মধ্যেই তার জীবনে
হ’একটি চরম সৃষ্টি তিনি রেখে যান, প্রমাণ করতে তার
বাণী: Joy through suffering: বেধনার ভিত
বিদ্যে আনন্দ লোকে পৌছাতে হবে। কত বিভিন্ন Hero
Symphony, Pastoral Symphony প্রভৃতি স

হুজ্জাত গোবিন্দ

• সুবোধ হোষ •



ওদের ছ’জনকে পাশাপাশি এক
দেখলে কিছু ক্ষণের জড় তাকিয়ে থা
হয়। জীবনের খাতায় অলকা আর প্র
চুটি কবিতার চরণের মত এসে মিলে গে

হুজ্জাত পাশাপাশি থাকলে তবেই ওদের ছ’জনকেই এত
দেখায়। বর্ধকালের জলভরা পুষ্করের পাশে একটা পু
স্কমকে ভাবার গাছের মত ওরা নিজেই ওপেই যেন পরস্প
রকু ধার দিয়ে এতটা স্বন্দর করে মিলিয়ে নিয়েছে। নইলে
একটা জলভরা পুষ্কর কীই বা এমন স্বন্দর। একটা স্বন্দরো

গাছের একলা রূপের মধ্যে তাকিয়ে দেখার মত কীই বা আছে!

বিয়ের পরেই আগ্রাতে বেড়াতে গিয়েছিল হুজ্জাত। ভাঙ্গমহলের সিঁড়ি দিয়ে না
সময় একটা আমেরিকান টুইস্টে আচম্ভিতে সামনে এসে দাঁড়ালো। ইদারায় অ
জানালা—একটা মিনিটের জড় একটু থেমে যেতে। ক্রিক ক্রিক! উৎসর্গ পাখীর
টুইস্টের ক্যামেরা যুগল-রূপের দিকে তাকিয়ে একবার ভেঙে উঠলো।

জোরদীতে বাসের প্রতীক্ষায় ওরা ছ’জনে একটা ঠপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ছ’
একরোখা কেউটার মত শিশু দিতে দিতে এগিয়ে আসে। একবারে সামনে এসে পড়তেই, অলকা ও প্রশান্ত একদলে তা

কেউতে টিম চকিতে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। ঘুরে এগিয়ে গিয়ে আর একবার, ঝাড়-ফিরিয়ে ভীল চোখ তুলে দেখে—কালো আদরিণ দেহের কোন শিল্পী-যাদুকরের তৈরী এককোন্ডা ভাঙি যেন পথের গুপের ধড়িয়ে আছে।

গুপ্ত চেহারা রক্ত নয়—গুপ্ত গুণ মান শিকার ও বিস্তার রক্ত নয়, গুণা সব চেয়ে সুখী ওদের ভালবাসার রক্তই। এই ভালবাসাকে ক্ষণিকের রক্ত বিচলিত করতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোন ছলনা আছে বলে ওরা বিশ্বাস করে না।

এই কারণে প্রশান্তের আত্মধারণা যদি তার মনের ভেতরে একটি স্থানভাঙে—স্বাভাব্য যৌবন বড় হয়ে উঠতে থাকে, তবুও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। অলকা যদি আত্মবিশ্বাসে একটু বেশী সাহসী হয়ে উঠতে থাকে, তবে তাতে নিশ্চয় করার মত বিশেষ কিছু থাকতে পারে না।

প্রশান্ত এক এক সময় বলে—অলকা, তুমি করনা করতে পার, আমার রক্ত তোমার বিয়ে হয়নি। আর একজন ভুলোকালের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে, তার হাতটা একরকম ভাবে তোমার গলা জড়িয়ে আছে?

অলকা প্রশান্তের হাতটা সজোরে টেনে নামিয়ে দেয়। —একরকম বিশ্রী কথা বলবে তো আমার ছুঁতে পারে না।

প্রশান্ত হেসে থাকে। তার নিঃসংশয়ে পৌরুষের প্রসন্নতাকে অলকার কাছে, মাঝে মাঝে এইভাবে নেহাৎ রসিকতার ছলেই যে ঘাটাই করে নেয়। অলকা রাগ করে; কিন্তু প্রশান্তের বেশ লাগে।

প্রশান্তের একবার জ্বর হয়েছিল। একটা নাস' রাত জেগে প্রশান্তকে তত্ত্বাবধায় রাখতো। নাস্টি দেখতে হৃদয় তার গুপের ভেতর আর লাঞ্ছ। গুপ্ত খাওঁরাবার সময় নাস্টি প্রশান্তের মাথাটা একটা হাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরতো। আয়তন ভরা চোখ দুটো প্রশান্তের মুখের গুপের ফুঁকে থাকতো। অলকা সবই দেখতো; তবু মনের কোনো কোন মেলেরী অভিমানে একটুও অস্থির হোঁচা নাগেনি। অলকার কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অলকা জানে,

প্রশান্তের মনে একতিল জায়াগাও আর খালি পড়ে নেই। সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে স্বপ্ন অলকা। টায়ে বাসে অলকার চোখে কতবার কত সত্যিকারের রূপশী চোখে পড়েছে। অলকা দেখেছে, প্রশান্ত ক্রমশঃও করে না।

দেশ বিদেশের নাম-করা আত্মপ্লেটের ছবির একটা অ্যালবাম এনে প্রশান্ত অলকার দিল। নাস্টি, যবে দেখে। এক একটা চেহারা দেখে চোখ জড়িয়ে যাবে তোমার।

অলকা অ্যালবামটা একবার উন্টিয়ে দেখেই টেবিলের গুপের ছুঁতে ফেলে দেয়।—ভাবি সব ছিঁরি! এসব দেখ-বার কোন গরজ নেই আমার, তোমার সাথ থাকে তুমি দেখ।

প্রশান্তের চোখে অসুস্থ এক তপ্তির উদ্ভাস ফুটে ওঠে। এই রসিকভাঙলি নেহাৎ তুচ্ছ—কিন্তু তার মধ্যে এক পূরম বিশ্বাস বার বার পরীক্ষায় মাস্তাঘসা হয়ে খাট দোখার মত আরও উজ্জল হয়ে ওঠে। তাই প্রশান্ত এত সুখী! প্রশান্তের ব্যক্তির অলকার সমারদের জলবাতাসে স্নেহে চারাপাছের মত উজ্জ্বল মাথা ঠেলে উঠছে। একটা হৃদয়ী তরুণীর কাছে পৃথিবীর সব পুরুষ মিথ্যা হয়ে গেছে। রূপগুণে ব্যক্তিকে ও প্রেমিকতার সত্য হয়ে মাত্র একটা পুরুষ অলকার কাছে নিখামায়ায় মত মনপ্রাণ ছেড়ে আছে। সে হলো অলকার স্বামী প্রশান্ত। এই উপলব্ধি প্রশান্তের কথাবার্তায় ঠাট্টায় রসিকতায়—এক সবিনয়—উদ্ভাসের নেশা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত সেটা বুঝতে পারে না বোধ হয়।

প্রশান্তকে যদি পুরুষোত্তম বলা যায়, তবে প্রশান্তের বন্ধু শব্দকে অপৌরুষেয় বলতে হয়। রোগা কালো টাক-পড়া চেহারা, কপালের গুপের চার পাঁচটা বসন্তের শাণ-জীবন বীমার লালনি করে শব্দ—সামান্য রোগা যোগ্যতার লেখাপড়া হয়তো সামান্য কিছু জানে।

শব্দকে নিয়ে প্রশান্ত প্রায়ই বগড় করে। বিয়ের প-থেকে প্রশান্তের এই খোয়ালটা আরও বেশী প্রবল হয়ে

উঠেছে। শব্দ প্রায়ই সন্ধ্যার সময় প্রশান্তের বাড়ী এক-বার ঘুরে যায়। প্রশান্তের সঙ্গে অনেক পদস্থ ও সম্পন্ন লোকের জানাশোনা আছে। তাদের একটু বলে ক'য়ে দিলেই শব্দ তু'একটা জীবন বীমার বেশ পেয়ে যায়।

শব্দর করুণার পাঁজ সন্দেহ নেই। প্রশান্ত তাই এই গরীব বন্ধুকে সাহায্য করতে কুঠী করে না। অলকাও তার খবরাখবর করে—চা-জানখাবার না বাইরে সে কখনো শব্দকে উঠতে দেয় না।

অলকা ও প্রশান্ত এক একদিন বেড়িয়ে ফিরে দেখে, শব্দর বৈঠকখানার ঘরে একা একা বসে আছে—রাত নটা বেজে গেছে যদিও। ওরা আসা মাত্র শব্দর গায়েলান করে। প্রশান্ত বলে—আরে এতক্ষণ যখন দৈর্ঘ্য ধরে বসেই আছ, তখন আর পাঁচটা মিনিট বসে যেতে রোষ কি? বসো বসো।

অলকা প্রশান্তের একটা ইসারা বুঝতে পারে। একটা ডিসে কিছু খাবার সাজিয়ে এনে শব্দরের সামনে রাখে।

এক একদিন প্রশান্তের মাথায় যেন বগড়ের ভূত এসে ভর করে। শব্দর ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তবু অসুস্থ এক আলোকে মাতাল হয়ে প্রশান্ত বলতেই থাকে।—যদি নেহাৎ বিয়ে করতে হয় শব্দর, তবে প্রেম করে বিয়ে করবে। নইলে আমার মত পত্তাতে হবে।

পত্তাতে হবে। বদ করেই এত বড় একটা মিথ্যা না বলে নিলে প্রশান্ত যেন তার পরিণয়ে কৃতার্থ জীবনের সত্যিকার তত্ত্বভব করতে পারে না।

অলকা গুপে ঘরে ঢোকে। প্রশান্তের রসিকতা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুমি জাননা অলকা, শব্দর এমাবৎ তিন তিনবার প্রেমে পড়েছে। ওর দোষ নেই। নাস্টিরাই মিথ্যা হয়ে ওর পছন্দে লেগেছিল। শব্দরের উপেক্ষায় একটা ভয়-জ্বর তরুণী তো আত্ম পর্যাভ-বিষয়ে করলেন না।

সবই মিছক মিথ্যা, উঠরী করা কাহিনী মাত্র। শব্দরের নগণ্যতার পাশে এই কাহিনীর ছবি যেমন বিশদ তেজসি অসম্ভব মনে হয়, এর মধ্যে প্রশান্ত কী যে আনন্দ পায় তা সেই জানে।

অপ্রস্তুত শব্দর সত্যিই লজ্জার আরও ফুসিট হয়ে ওঠে। অলকা নামনে বসেই সব শুনেছে—হয়তো সুব বিশ্বাস করে ফেলবে। শব্দর প্রশান্তকে ধমকের স্বরে আপত্তি জানায়।—কী সব বাজে বকছো প্রশান্ত। তোমার আস মাজাজান নেই।

অলকার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে—শব্দর চোখ নামিয়ে নেয়। অলকা শান্ত ভাবেই শব্দরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতুকে তার চোখ ছুঁচী হাসতে থাকে। একটা অদ্যপতিত স্বককারের দিকে তাকিয়ে দু'দ নক্ষত্রের দরদর মত হাসিটা যেন নিটিনিটি জলে।

প্রশান্ত একদিন বললো।—তোমার সৌভাগ্যের চক্র-কলা এতদিনে বর্ণা হলো অলকা।

অলকা—কী হলো? —তুমি মনে করছে, শব্দর এখানে শুধু খাবার খেতে আর জীবন বীমার কেনের খোঁজ নিতে আসে?

—তা মনে করবে কেন? তোমার বন্ধু মাস্টি, তুমি ওকে ভালবাস তাই আসে।

—না গো বিশ্বাসেরমা, তোমাকেই দেখতে আসে।

—কী যে বল! এসব বিদুষ্টে কথা আর শুনে পাবি না।

প্রশান্ত যেন এতদিনে তার করুণার মধ্যে আর একটা গুণও হাতকর কার্যিকের আর আবিষ্কার করেছে। হাসি থামতে পারে না প্রশান্ত।

প্রশান্ত প্রস্তাব করে। একটা মস্কা করতে হবে অলকা। তোমাকে রাজী হতেই হবে।

অলকা একটু ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু ভয় খাবার মত মন তো তার নয়।—আমাকে আবার কী করতে হবে?

—তুমি শব্দরকে একদিন প্রেম নিবেদন কর। আমি কাশের ঘরে থাকবো। আমি শুধু গবেষ্টার ঘরের ডাবটুকু খুঁজি করবো। দেখি, ও কী মনে, কী করে।

অলকা বিরক্তির সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানায়। এসব কী কথা! তোমার বন্ধুকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা বগড়

কর, সেটা ধারণা কিছু নয়। কিন্তু আমি এসব করতে যাব কেন? ছিঃ।

—আরো, শুধু একটু খিরতারা চড়ে অভিনয় করবে।

—কী করতে হবে?

—বলবে: শব্দর বাবু, আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আজও কি বুঝতে পারছেন না। ওগো জয়রহীন...। অলকা যুগাণ্ড ও লঙ্ঘায় সিঁড়ির ওঠে। রামো রামো! অভিনয় করেও কি এসব কথা বলা যায়! তার চেয়ে বরং শুভ জাইন্ডের ছুটিতে বাণু যখন এখানে আসবে, তেঁোমা শালী ভীতাপিত্তে বড়দর করে শব্দরকে নিয়ে যত খুশী মজরা কর, আমি বাবা দেব না। বাণু নাকমুখে কথা বলতে পারে—এসব ওই ভাল পারবে।

প্রশান্ত—গুরুকে দিয়ে এসব করালে আমার কী লাভ হলো? আমি যেটা এগারপরিমেই করে দেখতে চাই, আসলে সেটাই হলো না।

অলকা বোকার মত তাকিয়ে রইল। আবার আর এক কোনে দেখাল নিজে মগ্‌গল হয়ে আছে প্রশান্ত? না, প্রশান্তের প্রেমিকতার প্রাণা মনের ভেতর থাকলেই ভ্রমর ছিল। যেটা নিঃসংশয়ে সত্য তাকে ব্যবহার নানা তুচ্ছ প্রসঙ্গে খুঁটে খুঁটে যাচাই করািব কোন অর্থ হয় না। অবশ্য এসব বৃগড়গণ। সেটা প্রশান্ত জানে, অলকাও বোকে।

অলকা—বড় বেশী ছেলোমাহু করছে তুমি। লোকটাকে নিয়ে জিনিষিনি কবে কী হুখ পাও বুঝি না। যাই হোক, আমি কিন্তু কথাগুলি বলেই পাগিয়ে যাব। যা বলতে হবে লিখে দাও, মুগ্‌গল করে নেবে।

একটা কাগজ টেনে নিয়ে প্রশান্ত লিখলেন। এই কথা কটা বলবে, শব্দর, প্রাশংস আমাব। আমাব বাইশ বছর বয়সের সকল কামনা শুধু তোমাকেই যে লতার মত জড়িয়ে ধরবে চাইছে। ওগো ভিক্টোরো.....

অলকা দেখাটা পড়ে নিয়েই বললো—ভাবি বগড় করছো! এসব ভাষা শুনে কে না বুঝবে যে ভান করা হচ্ছে।

প্রশান্ত একটু সমজাতি পড়ে আমতা আমতা করে উত্তর দিল—হী, কথাটা ঠিক। যাই হোক একটু উদ্ভাস্তের মত বলবে, তা হলেই শুনতে বেশ লাগবে। যাবচ্ছ যাবে।

বৈঠকখানাটা সেদিন সন্ধ্যায় এত ভাল করে সাজানো হলো কেন? ফুলদানির ওপর এত বড় ছোটো গন্ধরাজের তোড়া রাখবার কৌহা প্রয়োজন ছিল? একগুচ্ছ ধূপ-কাঠি পুড়িয়ে ঘরের বাতাস এত সুব্রতিতে বহেই বা পু?

হবে? প্রশান্ত অলকার দিকে তাকিয়ে উৎসাহে হাসতে লাগলো।—বাপ রে, ঘরে ঘেন সত্যই রোমাঞ্চ ঘুমঘম করছে।

শব্দরের পায়ের শব্দ শুনে প্রশান্ত পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে গিয়ে বসল।

বৈঠকখানার দরজা পধ্যস্ত এসেই শব্দর থামলো।—

প্রাণ্ট নেই?

অলকা—না, কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবে?

—আজ ফিরতে রাত হবে অনেক।

—খাচ্ছা, আমি আজ তাহলে যাই।

—সে কি কথা? নতুন করে আপনাকে অতঃপর করতে হবে নাকি? চা খেয়ে তারপর যাবেন।

চা-খাওয়া শেষ করে শব্দর একটা বই তুলে নিয়ে এক মনে পড়ে। আর অলকা উল্লেখ করে, ঘরের ভেতর আসে আর যায়, পাইচারী করে, চেয়ারের ওপর বসে কিছুক্ষণ, তারপরেই ছটফট করে উঠে পড়ে। আলোর সামনে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল করে মুঠো থেকে কাগজটা ধুলে লেগাগুলি একবার পড়ে নেয় অলকা।

অলকা বললে—শব্দর বাবু।

শব্দর—বসুন।

ছুটি মিনিট সুখাই শুরু হয়ে রইল। অলকা মনে মনে কথাগুলি গুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

অলকা—শব্দর বাবু, আপনি রোজই এখানে আসেন কেন?

শব্দর বই পড়া বন্ধ করে বিস্মিত হয়েই অপ্রস্তুতের মত বললো—আমাব আসাটা কি আপনাবা পছন্দ করেন না?

—শুধু জিজ্ঞাসা করছি, কেন আসেন?

—কাজের দায়েরি আসতে হয়। প্রশান্ত—ছাঃ একটা পাটির বোঁজ দেয় তাই। তা না হলে এত ঘন ঘন আপনাদের বিরক্ত করতেন.....

—সেই সামান্য বোঁজ নিতে কতখান সময় লাগে? কিন্তু ফটার পর ফটা বসে থাকেন কেন? কী দরকার?

—দরকার কিছুই নয়। আপনাবা কিছু মনে করেন না বলছি বসে থাকি।

—তা বলে কি রোজই আসতে হয়। রোজ এখানে আসতে এত ভাল লাগে আপনাবা?

—তা, ভাল লাগে বৈকি! এত সচ্ছন্দ আপনাবা!

পাশের ঘরের ঢাকলা প্রকট না হয়ে পড়লো, বোকা

যাচ্ছে অশুট একটা প্রতিবাদ কিছুকাল করে উঠছে। মেজাজে প্রশান্তের দুধার ঘসা লেগে বেশ জ্বরে শব্দরলো। নৈপথ্য থেকে মনে কত-যেত অলকার তুল ধরিয়ে দিচ্ছি—অভিনয় ঠিক হচ্ছে না।

লকা বললো—আপনাব বন্ধ সচ্ছন্দ হতে পারেন, কণ্ড প্রশংসা করছেন কেন? আমি তো আপনাব উপকার করিনি!

হু—বন্ধ তো সচ্ছন্দ হবেনই, তার জ্ঞ তাতে কী? আমার কী আছে? বরং আপনি কেউ না হয়েও নি.....

লকা—কী?

হু—যতখানি বাতির করেন, আপন জনের মত লেন.....

লকা—আমি বাতির করি? আমি আপন জনের থাবালি? সত্যি বলছো শব্দর?

চন চান মিনিট ঘরে ঘরের ভেতর একটা মুজ্‌গাপুত

র মধ্য দেখাল ঘড়িটা শু শু চিক্‌চিক করে বাজতে

প। কৌতুহলের আবেগে উদ্ভল প্রশান্তের চোখ

দীর আড়াল থেকে সহসা চোরা টেলিফোনের মত

দল।

ক হঠাৎ গোপুলির ছোঁয়া লেগে বৈঠকখানার ঘরটা

মগ্‌গল হয়ে আকাশ পটের মত ঘুরে সবে গেছে।

প্রশান্ত আবার বই পড়তে আরম্ভ করলো।



জাতীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ

নদীর্ণ ব্যাক্স লিঃ

(স্থাপিত - ১৯২৯)

হেড অফিস - ৫ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

শাখাসমূহ

হাওড়া। বালু গঞ্জ. পাবনা, মেদিনীপুর.

সম্বলপুর।

ব্যাক্স সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজকর্ম
করা হয়।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এ, রায়চৌধুরী

বাঙ্গলার গৌরব
বাঙ্গালীর গৌরব

ইতিয়া

এমিকেবল

প্রভিডেন্ট

ইন্সিওরেন্স লিঃ

স্থাপিত - ১৯১১

হেড অফিস -

৫ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি অফিস

ভারতের সর্বত্র

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

এ, রায় চৌধুরী

বর্তমান মহাসমরের চতুর্থ বৎসর

ত্রিগোপেন্স লাক্স পাল

১৯৩০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বুটেন ও ফ্রান্স জাৰ্মানীর
বিকল্পে যুদ্ধ ঘোষণা করে হুতরাং গত ৩রা সেপ্টেম্বর বর্তমান
মহাযুদ্ধ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে
জাৰ্মানী পর পর পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবুর্গ,
হাঙ্গাও, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স দখল করে। দ্বিতীয় বৎসরে
কমানিচা, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস এবং জুটিট জাৰ্মানীর
কবলগত হয়। হুতরাং যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর জাৰ্মানীর
অধ্যবসায় অস্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকে।

তৃতীয় বৎসরে যুদ্ধের গতি অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু
যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে যুদ্ধের গতি অনেকটা পরিবর্তিত
হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমগ্র রণাঙ্গনেই এলিস
বাহিনীর পরাজয় ঘটয়াছে।

এই বৎসরে রুশ রণাঙ্গনে ঐতিহাসিক স্টালিনগ্রাদের
যুদ্ধে জাৰ্মান বাহিনীর বিপর্যয় ঘটিল, আফ্রিকা হইতে
এলিস বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিভাঙিত হইল, মির বাহিনী
কর্জুক সিসিলি অধিকৃত হইল এবং সিনর মোসোলিনীর পদ-
ত্যাগ ঘটিল। বর্তমান যুদ্ধ ঘোষণার চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার
দিনে মিরপক্ষীয় বাহিনী ইতালী আক্রমণ করিল। উহার
শাচরিন পরেই ইতালী আত্মসমর্পণ করিল। ফলে ইউরো-
পীয় যুদ্ধে অবস্থা পূর্বের তুলনায় মিরপক্ষের অসুস্থ হইয়া
উঠিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ নিয়ে প্রবৃত্ত
হইল :-

রুশ রণাঙ্গন - আলোচ্য বর্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য
ঘটনা হইল স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ। স্টালিনগ্রাদে যে যুদ্ধ চলে,
ইতিহাসে কখনও কোন লোকালয়ে বোধ হয় সেরূপ প্রচণ্ড
যুদ্ধ হয় নাই। প্রায় সাড়ে চারি মাস প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইয়াও
জাৰ্মান স্টালিনগ্রাদ দখল করিতে অসমর্থ হয়। স্টালিন-
গ্রাদেই জাৰ্মানদের প্রথম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে।

১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে মার্শাল ফন বক্সের পরি-
চালনায় প্রায় দশ লক্ষ ফ্যান্সিষ্ট সৈন্য স্টালিনগ্রাদের বিকল্পে
অভিযান শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি জাৰ্মানরা
প্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে সহরের উপকণ্ঠে প্রবেশ
করে; সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক
হইতে চাপ দিতে থাকে। সৈন্য, বিমান প্রভৃতি বিষয়ে
সাধারণতঃ সবেও রুশরা অনমনীয়ভাবে প্রতিপক্ষকে প্রতি-
রোধ করে। সহরের প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর
রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রতিগজ জমির জঙ্গ যুদ্ধ-চলে এবং
প্রত্যেক পদ অগ্রসর হইতে জাৰ্মানপক্ষকে বিপুল সংখ্যক
সৈন্য বলি দিতে হয়। সহরের সমস্ত বাড়ীঘর ও ময়দান
গোলা ও বোমা বর্ষণে কংকিত হয়। ইহার মধ্যেই
নগরবক্ষীরা প্রতিরোধ করে; শুধু প্রতিরোধ নয়, তাহার

পাক্টা আক্রমণও চালায়। জাৰ্মানরা বাস্তা ও বাড়া দখল করিলে কশ বাহিনী আক্রমণ চালাইয়া তাহা আবার তিনাইয়া লয়। তদুপরি দুইপক্ষে কামানের লড়াই চলে। জাৰ্মানরা নগর অবরোধে ব্যবহার্য বড় বড় "সীজ" কামান আনিয়া বাহির হইতে সহরে গোলা বর্ষণ করে; পক্ষান্তরে ভলগার পূর্ব তীর হইতে কশরা বড় বড় কামান হইতে গোলা ছুড়ে। ভলগার পূর্ব তীর হইতে ক্রমাগত নতুন নতুন সোভিয়েট সৈন্য প্রেরণ করা হয়।



চাঙ্কিল

জাৰ্মানরা একটিকে ষ্টালিনগ্রাদ সহরের অভ্যন্তরে আক্রমণমূলক সংগ্রাম চালায়, অপরদিকে তাহারা সহরের উত্তরে মার্শাল টিমোশেভের বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালায়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে জাৰ্মানরা ক্ষয়ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া সহরের মধ্যে আরও প্রবেশ করে। এদিকে মার্শাল টিমোশেভের উত্তর-পূর্ব দিকে একটা আক্রমণ চালায় এবং তাহার সৈন্তেরা স্কাচালিনস্ক এর নীচে ভনের তীরে গিয়া পৌঁছে।

অক্টোবর মাসে জাৰ্মানরা ষ্টালিনগ্রাদ সহরের উত্তর উপকণ্ঠে শ্রম শিল্প এলাকায় প্রবেশ করিয়া দারুণ আক্রমণ চালায় এবং ভলগা তীরে পৌঁছিবার চেষ্টা করে। মার্শাল

টিমোশেভের বাহিনী সহরের উত্তর-পশ্চিম-দিকে জাৰ্মান বাহিনীর বামপার্শ্বে প্রবল আক্রমণ চালায় এবং দশদিন ধরিয়া জাৰ্মান বাহিনীর বামপার্শ্বে আঘাত করিয়া তাহারা ভন নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়।

অক্টোবর ২৪শে নবেম্বর তারিখে ষ্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে কশরা তিনদিক হইতে আক্রমণ শুরু করে এবং ত্রিভুজ ষ্টালিনগ্রাদের অবরোধ অবস্থা হইতে মুক্তি ঘটে। জাৰ্মানদের সমুদয় প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করিয়া দিয়া কশ বাহিনী ষ্টালিনগ্রাদের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে সাফল্যের সহিত অগ্রগতি হইতে থাকে। কয়েকদিন তুম্‌গুজের পর সোভিয়েট বাহিনী কয়েকস্থানে প্রতিপক্ষের ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করে এবং জাৰ্মানরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়া কশ বাহিনী ভনের পূর্ব তীরে অবস্থিত কালচা এবং জিভোমুভিনস্ক স্টেশন দখল করে। দক্ষিণের কশ বাহিনী উত্তর ককেশাস রেলপথ অবস্থিত আবগারনেভো দখল করে। ইহার ফলে ভনের পূর্ব তীরে অবস্থিত জাৰ্মানদের নিকট সরবরাহ বাইবার দুইটি রেলপথই বিচ্ছিন্ন হয়।

২৮শে নবেম্বর সোভিয়েট বাহিনীর সাদাশী অভিযানে দুইটি বাহু কালচের দক্ষিণে ভনের তীরে আসিয়া মিলি হয় এবং ফলে ষ্টালিনগ্রাদ অঞ্চলে এক্সিস পক্ষীয় এক বিরাট বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। এই দিন কশরা স্লেটস্কা পুনরবিধার করে এবং ষ্টালিনগ্রাদের সমগ্র কারখানা অংশ জাৰ্মান কবলমুক্ত হয়।

৩০শে নবেম্বর ষ্টালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যে জাৰ্মানদের প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করিয়া দিয়া শত্রুর আ রক্ষাবাহ ভেদ করে এবং পরশ্রম পর শত্রুসৈন্যের পক্ষান্তরে সময় তাহারা আরও কতকগুলি জনপদ পুনরুদ্ধার করে।

ডিসেম্বর মাসে ভন ও ভলগার মধ্যে পরিবেষ্টিত ভিভিসন জাৰ্মান সৈন্যকে মুক্ত করিবার জন্য তাহারা অস্ত্রহীন সৈন্যেরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে খুব চেষ্টা করে কোটেল-নিকোভা হইতে ক্রমাগত প্রবল পাক্টা আক্রমণ চালাইয়া প্রথম দিকে জাৰ্মানরা কিছু হ্রস্বািব্য করে এবং

সোভিয়েট বৈহীনীর ঐ দিকে কীলকাকারে অল্প প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু লালফৌজ এই কীলক হটাইয়া দিয়া নতুন আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণে তাহারা জুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং ২০শে ডিসেম্বর কোটেল-নিকোভা রেলগুয়ে স্টেশন ও সহর পুনরবিধার করে। এই সময়টি ষ্টালিনগ্রাদ নরবোরিস্ক রেলগুয়ের উপর অবস্থিত। কোটেলনিকোভা হাডছাড়া হওয়ায় পরিবেষ্টিত জাৰ্মান বাহিনীর উদ্ধারের আশা হ্রদ পড়াইত হয়।

অক্টোবর ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভন এলাকায় লালফৌজের ছয় সস্ত্রাযোদ্ধা আক্রমণের কলাকল সঞ্চয় মধ্যে হইতে এক বিশেষ যোযাণা প্রচারা করিয়া বলা হয় যে, ছয় সস্ত্রায়ে লালফৌজ মোট ১৫৮০টি জনপদ দখল করিয়াছে, ১,৫০,০০০ ফার্সিট সৈন্য নিহত হইয়াছে, প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী করিয়াছে, ষ্টালিনগ্রাদের সমুদ্রে ২২ ডিভিসন সৈন্যকে ঘেরাও করিয়াছে এবং ৩৬টি ডিভিসনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। তাহারা প্রভূত জাৰ্মান সমরোপকরণ হস্তগত এবং ধ্বংস করিয়াছে। মার্শাল টিমোশেভের স্থলে ক্রেনারেল জুকভ লালফৌজের এই অভিযান পরিচালনা করেন।

জাৰ্মানরা মাসে ষ্টালিনগ্রাদের দক্ষিণে জাৰ্মান সৈন্যের পাক্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সোভিয়েট সৈন্যেরা অপ্রতিহতগতভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা কোটেল-নিকোভা দখল করার পর চার্লিকোভস্কায়া, মজরভিক, মিলিল্যানস্কায়া ও অন্যান্য ঘাটি দখল করে। ভন প্রান্তরে এবং জেনস্কা অববাহিকার পূর্বে সমস্ত ঘাটিই জাৰ্মানদের হাডছাড়া হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজ ককেশাসে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং দুইটি কশ বাহিনী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

ভন দিকের কশ বাহিনী ঘোজানী ভৈলধনিগামী পথে মজরক সহর দখল করে এবং বামদিকের বাহিনীটি মধ্য ককেশাসে প্রবান জাৰ্মান ঘাটি নালচিক দখল করে। মধ্য রণাঙ্গনে কশ বাহিনী ২২ জাৰ্মানরা গুরুত্বপূর্ণ সহর ও রেলগুয়ে সহরে ভেলিকিগুর্কি পুনরবিধার করে। ১৩ই

জাৰ্মানরা উত্তর ককেশাস হইতে কশ বাহিনী বৃহন্নোভস্ক এর পূর্ব দিকে কালমুক প্রান্তরের সৈন্য বাহিনীর সহিত মিলিত হয়।

১৮শে জাৰ্মানরা লেনিনগ্রাদের অবরোধ অববাহক অবদান হয় এবং কশ সৈন্যেরা নুয়েসেদবুর্গ অধিকার করে। ২৫শে জাৰ্মানরা কশ বাহিনী ভেরোনেজ সহর সম্পূর্ণ দখল করে। সহরের পশ্চিমে ও দক্ষিণ পশ্চিমে ভনের পূর্ব তীর হইতেও জাৰ্মানদিককে বিভাজিত করা হয়।



গ্রেসিভেট কজভেট

ভেরোনেজ হইতে কুবাণ ষ্টেপানি পর্যন্ত বিস্তৃত ৬০০ মাইল বাণী রণাঙ্গনের সকল অঞ্চলেই লালফৌজ নতুন সাফল্য অর্জন করায় দক্ষিণ কশিয়ায় হিটলারের ১০২ ডিভিসন সৈন্যের অবশিষ্টাংশ অধিকতর জটগতিতে পশ্চিম দিকে পিছু হটিয়া যায়।

১লা ফেব্রুয়ারী এক বিশেষ সোভিয়েট ঘোষণায় বলা হয় যে, ষ্টালিনগ্রাদের মধ্য অংশের পশ্চিমে পরিবেষ্টিত জাৰ্মানদের উচ্ছেদকার্গ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ২৩শে নবেম্বরের মধ্যে ৩,৩০,০০০ জাৰ্মান সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়। কিন্তু দার্পা পাউশুগকে বন্দী করা হইয়াছে। সবতত্ত্ব মোট ১৬ জন ক্রেনারেল বন্দী হইয়াছেন।

এরা ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ষ্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের অবসান হয়। মস্কোর ঘোষণায় বলা হয় যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদ বেষ্ট্রীর উপর ১৫ই জানুয়ারী আক্রমণ চালানার পর মোট বন্দীর সংখ্যা পাঁচতাইল ২১ হাজার। সরকারীভাবে জানান হয় যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদ এলাকায় এক্সিস বাহিনীর বিলোপ সাধন সম্পূর্ণ হইয়াছে। জেনারেল স্ট্রিখের বন্দী এবং আরও আটজন জেনারেল গৃহ হইয়াছেন।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ শেষ করিয়া লালফৌজ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোষ্টভ দখল করে।

রোষ্টভ, জলিগ স্বাক্ষরনে জাৰ্মানদের মূল ঘাঁটি ছিল। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে জাৰ্মানরা রোষ্টভ দখল করে এবং উৎকোচ চাষিকাটি করিয়া উত্তর ককেশাসে, কুবানে ও



ষ্ট্যালিন

ষ্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে অভিযান চালায়। সেই রোষ্টভ হাতছাড়া হওয়া জাৰ্মানীর সময় গ্রীষ্মাভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। অতঃপর ১৬ই ফেব্রুয়ারী লালফৌজ ধাববদ্ধ দখল করে।

অতঃপর মার্ক্স মাল্লে জাৰ্মানরা খারকভ দখল করার অপ্রচণ্ড পাৰ্শ্ব আক্রমণ স্বরূপ করে। এরিকে মস্কো রণাঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যদল ভিষাভ্রম ও যোমালেনকের জাৰ্মান ঘাঁটি দিকে দৃষ্টার গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

১১ই মার্চ লালফৌজের হস্তে ভিষাভ্রমার পতন ঘটে। ১৪ই মার্চ সোভিয়েট সৈন্যদল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর উল্লেখ কৰ্পক্ষের আদেশে খারকভ বন্দরী ত্যাগ করে। উহার পর প্রায় সাড়ে তিনমাস কাল রুশ রণাঙ্গনে নিশ্চলতা বিরাজ করে।

অতঃপর ৫ই জুলাই তারিখে জাৰ্মানরা ওরেল বিয়েলগোরদ হইতে তাহাদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সোভিয়েট বাহিনী তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়। তারপর ২০শে জুলাই সোভিয়েট বাহিনী গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করে।

৫ই আগষ্ট লালফৌজ বিয়েলগোরদ এবং ওরেল দখল করিয়া লয়। ২৩শে আগষ্ট ইউক্রেনের দ্বিতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার দখল অধিকৃত হয়। খারকভ পুনরধিকার কর লালফৌজ একটি বিশেষ সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লক্ষ্য করিল এবং জাৰ্মানরা দক্ষিণ কুশিয়ার বৃহত্তম হ্রদবিঘাটিটা হারাছিল। ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম নীপারের পর খারকভই ছিল জাৰ্মানদের শেষ আশ্রয়স্থল। খারকভ পুনরধিকার করার লালফৌজ সময় দক্ষিণ কুশিয়ার প্রতিপত্তি লাভ করিল। অতঃপর ৩০শে অক্টোবর অধিকার করিয়া রুশ বাহিনী সময় রষ্টভ অঞ্চল জাৰ্মান কবলমুক্ত করিল।

আফ্রিকার যুদ্ধ

মিশর—আলোচ্য বৎসরে মিশরের যুদ্ধে বৃটিশ আর্মি সেক্সপ সাফল্য অর্জন করে বর্তমান মহাযুদ্ধে সামরিক লড়াইতে ইংরাজদের এরূপ সাফল্য আর কখন হয় নাই। জেনারেল আলেকজান্ডার মধ্য প্রান্তের পক্ষীয় বাহিনীর অধিনায়ক এবং জেনারেল মন্ট গোয়া মিশরে বৃটিশ অষ্টম আর্মির নোনাপতা গ্রহণ করার ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে জেনা

রোমেল তাহার প্রায় সমগ্র সৈন্য বাহিনী লইয়া আবার মিশর আক্রমণ করেন। জাৰ্মান ও ইতালীয় সৈন্যেরা এল আলমেইন-এ বৃটিশ ব্যূহের দক্ষিণ পাশ দিয়া আট মাইল অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু নতুন ভাবে সংগঠিত বৃটিশ বাহিনীর প্রতিরোধের ফলে রোমেলকে সাতদিনের মধ্যে তাহার পূর্ণস্থানে হটিয়া আসিতে হয়।

রোমেলের এই ব্যর্থতাকে বৃটিশ পক্ষের একটা বড় জয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অতঃপর ২৩শে অক্টোবর রাতে মিশরে বৃটিশ অষ্টম আর্মি এক্সিসবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে। বৃটিশ সংবাদে বলা হয় যে, আক্রমণ এমন আতঙ্কিত ভাবে করা হয় যে, জাৰ্মানরা হয়ত সেজন্ত প্রস্তুত ছিল না। ২৪শে তারিখে প্রত্যুষে বৃটিশ সৈন্যেরা এল আলমেইন এলাকায় জাৰ্মান ব্যূহ কয়েকটি স্থানে ভেদ করে। তারপর তাহারা এল আলমেইন-এর পশ্চিমে অল্প অগ্রসর হয়। ইহার পর ১লা নবেম্বর রাত্রে অষ্টম আর্মি প্রতিপক্ষের উপর মারাত্মক আঘাত করে। ফলে এক্সিস বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে। কয়েকদিন মধ্যেই ১৩০০০ জাৰ্মান ও ইতালীয় সৈন্য বন্দী হয়।

জাৰ্মান আফ্রিকান বাহিনীর নামক জেনারেল রিটার ফন টোমা বন্দী হন এবং রোমেলের অস্থগতিহিতে যে সেনাপতি এক্সিস বাহিনীর অধিনায়ক করেন—তিনি নিহত হন। এল আলমেইনে এক্সিস বাহিনী পরাস্ত হয় এবং জাৰ্মান ও ইতালীয় সৈন্যেরা ভূমধ্যসাগর উপলব্ধ ও দিয়া পুরানমে পশ্চিমদিকে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে। বৃটিশ সৈন্যেরা তাহাদের পশ্চাদগ্রসরণ করে এবং আকাশে বৃটিশ প্রান্তিক শাখা বৃটিশ বিমান তাহাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

অতঃপর পশ্চিম মরুভূমিতে রোমেলের বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। তাহাদের ৫২০০০ সৈন্য হতাহত হয় (তন্মধ্যে ৩৪০০০ জাৰ্মান ও ১৮০০০ ইতালীয়), ৩০,০০০ সৈন্য বন্দী হয় (তন্মধ্যে ২ জন ইতালীয় জেনারেল) এবং মরুভূমিতিক ট্যাক হার্স হয়।

অবশিষ্ট এক্সিস সৈন্যেরা মিশর হইতে বিতাড়িত হয়

এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জেনারেল মন্ট গোয়েবীর সৈন্যেরা লিবিয়ায় প্রবেশ করে।

লিবিয়া—অষ্টম আর্মি লিবিয়ায় প্রবেশ করার পর নরদ্বীপে তিনশত মাইল অতিক্রম করে। ১২ই নবেম্বর প্রান্তে বৃটিশ অষ্টম আর্মি সোদ্রাম এবং ঐদ্রিন অপরদিকে বান্দিয়া পুনরধিকার করে। উহার পরদিনই তত্রক অষ্টম আর্মির করতলগত হয়। ২২শে নবেম্বর এক্সিস বাহিনী বেনগাজী পরিত্যাগ করে।

অতঃপর ২৪শে জানুয়ারী অষ্টম আর্মি লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি অধিকার করার পর সমগ্র লিবিয়া দখল করিয়া লয়। রোমেল ও তাহার বাহিনী তিউনিশিয়ায় প্রবেশ করে।

আফ্রিকায় মার্কিন সৈন্যদল—এদিকে, ৮ই নবেম্বর মার্কিন অভিযানকারী বাহিনী ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করে। পেট্রো গার্নমেট মার্কিন অভিযানে বাগদাদ দিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আমেরিকানরা প্রথম চোটাই উত্তর আফ্রিকার কয়েকটা বন্দর ও বিমান ঘাঁটি দখল করিয়া লয়। ভূমধ্যসাগরে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার বন্দরের উপর প্রথম হইতেই সবচেয়ে বেশী চাপ দেয়; আলজিয়ার ১৬ ফেব্রুয়ারী আত্মসমর্পণ করে।

তারপরই তাহারা চাপ দেয় ওরানের উপর। ১০ই নবেম্বর ওরান তাহাদের দখলে যায়। এইদিন পশ্চিম মরুভূমিতে মার্কিন সৈন্যেরা ফারাফা, ফেখালা, লুকি বন্দর ও রাবাতের বিমান ঘাঁটি দখল করে। ১১ই নবেম্বর মার্কিন বাহিনী মরুভূমিতে ফরাসী নৌঘাঁটি কাসাব্লাঙ্কা প্রবেশ করে। কাসাব্লাঙ্কা অদূরে ফরাসীদের সহিত মিশ্রপক্ষের এক প্রবল জলযুদ্ধ হয়। এই নৌযুদ্ধে ফরাসী নৌবাহরের গুরুত্ব ক্ষয় হয়।

তিউনিশিয়া—আলোচ্য বৎসর নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি প্রায় দশ হাজার এক্সিস সৈন্য তিউনিশিয়ায় অবতরণ করে। এদিকে জেনারেল এণ্ডারসনের অধীনে বৃটিশ প্রথম আর্মি তিউনিশিয়ায় প্রবেশ করে এবং আমেরিকান সৈন্যেরাও তাহাদের সহিত যোগ দেয়। ১৬ই নবেম্বর

বিজেতার নিকট আশ্রয় সৈন্যদের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থন গ্রহণ হয়।

অতঃপর রুটিশ প্রথম আশ্রি এবং কিছু মার্কিন সৈন্য বিজেতা ও ডিউনিসের মধ্যে উপকূল অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জাফানগার পান্টা আক্রমণ চালাইয়া মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর গতি রুদ্ধ করে; শুধু তাহাই নয়, ডিউনিসের দক্ষিণ-পশ্চিমে মিত্রপক্ষ সৈন্যদের অবস্থিত জেদে ও ভেতুবা জাফানগার ছিনাইয়া লয়। অতঃপর ডিউনিসিয়ায় উভয় পক্ষের সামরিক কণ্ঠ-তৎপরতা শুধু টহলদারী কাণ্ডে সীমাবদ্ধ রহে।

এদিকে রুটিশ অষ্টম আশ্রি তাড়ায় পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে রোমেলের বাহিনী ত্রিগোপালিতানিয়া হইতে দক্ষিণ ডিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে এবং মাঘের লাইনে সমবেত হইতে থাকে।

পশ্চাৎপরে সিবিয়া হইতে রুটিশ অষ্টম আশ্রি ডিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে।

জেনারেল আলেকজান্ডারের বাহিনী সিবিয়া হইতে ডিউনিসিয়ায় আসায় মিত্রপক্ষের সমস্ত বাহিনীই যুদ্ধ কমাও সংগঠনের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইসেন হাওয়ার সমস্ত সৈন্যের সর্বোচ্চ অবিনাশক নিষ্ফল হন এবং জেনারেল আলেকজান্ডার তাহার সহকারী হন।

ফেব্রুয়ারী মাসে রোমেলের বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া গাফকা, ফেরিয়ার ও কাসারিগে দখল করিয়া লয়। এই কয়েকটি স্থান মধ্য ডিউনিসিয়ায় অবস্থিত। উহার কয়েকদিন পরেই ইঙ্গ-মার্কিন পান্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়। এই পান্টা আক্রমণে জাফানগার হইতে থাকে এবং মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কাসেরিগে সিবিরবা পূর্ব হইয়া কাসেরিগে সহর দখল করে। অতঃপর মার্কিন বাহিনী কয়েকদিনের মধ্যেই ফেরিয়ার, বেইটলা এবং গাফকা পুনরধিকার করে।

২২শে মার্চ ডিউনিসিয়ায় দখলের জন্য মিত্রপক্ষীয় বাহিনী তিনবিধ হইতে বিরাট অভিযান শুরু করে। ২৩শে মার্চ রুটিশ অষ্টম আশ্রি মাঘের লাইন ভেদ করে।

৩০শে মার্চ রুটিশ বাহিনী এল হাম্মা ও গ্যাবেস অধিকার করে। উহার পর অষ্টম আশ্রি নূতন পথ দিয়ে আবার আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ডিউনিসিয়ার সমস্ত বদাশ্রমেই এক্ষিণ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। মট-গোমারীর সৈন্যেভা রোমেল বাহিনীর পশ্চাদপসরণ করিয়া দক্ষিণ ডিউনিসিয়ার বৃহত্তম এক্সিস ঘাঁটি স্বাক্ষর দখল করে; তাহার পূর্বে গাফকা-গাবেস রাস্তার উত্তরে দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চল হইতে উপকূল অভিমুখে অগ্রসর মার্কিন বাহিনীর সহিত অষ্টম আশ্রির সংযোগ ঘটে। এপ্রিল মাসে সমগ্র দক্ষিণ ও মধ্য ডিউনিসিয়া মিত্রপক্ষের করতল-হয়; কিন্তু রোমেলের বাহিনীকে তাহারা আটক করিতে অসমর্থ হয়।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ডিউনিসিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে চূড়ান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পূর্বে উপকূলে এন ফিভাভিল হইতে উত্তর উপকূলে সেরোও অন্তরীপ পর্য্যন্ত রুটিশ, মার্কিন ও কুরানী সৈন্যেভা আক্রমণ চালায়। জাফানগার সমস্ত পান্টা আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

অতঃপর যে তারিখে আমেরিকান সৈন্যদের মেজুর অধিকারের পর রুটিশ প্রথম আশ্রি ও মার্কিন বাহিনী ডিউনিস ও বিজেতা অভিমুখে যে ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে, তাহার ফলে অধিকাংশের মধ্যেই জাফানগারের অবস্থা কাটিল হইয়া পড়ে। ৮ই মে এক্সিস বাহিনীর দুই প্রধান ঘাঁটি ডিউনিস ও বিজেতা মিত্রপক্ষের করতলগত হয়, পূর্বাংশ ও তাহার দখল করে এবং ডিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্বে কোণে সমস্ত জাফান ও ইতালীয়ান সৈন্য বিপদাপন্ন হয়। তাহাদের কয়েক হাজার বন্দী হয় এক অবশিষ্ট সৈন্যের বন উপদ্বীপে গিয়া শেষ আশ্রয় লয়। রুটিশ প্রথম আশ্রি এবং অষ্টম আশ্রির কয়েকটি ডিউনিস পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে দ্রুত অগ্রসর হইয়া বন উপদ্বীপে এক্ষিণ বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে। মিত্রপক্ষের সৈন্য, জাহাজ ও বিমান স্থলে, জলে ও আকাশে এমন ভাবে প্রতিপক্ষকে অবরুদ্ধ করে যে, তাহাদের পক্ষে পলায়ন অসম্ভব হয়।

১২ই মে জাফান ও ইতালীয়ান বাহিনীর অবিনাশক জেনারেল ফন আনিম আত্মসমর্পণ করেন এবং তাহার সহচরী অন্যান্য জাফান ও ইতালীয়ান জেনারেলগণও বন্দী হন। মোট দেড়লক্ষ এক্সিস সৈন্য বন্দী হয়; তন্মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ জাফান। এদিন উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ডিউনিসিয়ায় এক্সিস বাহিনীর চূড়ান্ত পরাক্রম যুদ্ধের সময় ট্যাটিজির দিক হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ডিউনিসিয়া ছিল আফ্রিকায় এক্সিসের শেষ ঘাঁটি। উহা হাতছাড়া হওয়ায় সমগ্র আফ্রিকা হইতে তাহার নিষ্কল হইল।

ভূমধ্যসাগর—উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ সমাপনান্তে মিত্র পক্ষীয় বাহিনী ১২ই জুন ভূমধ্যসাগরে অভিযান শুরু করে। ১১ই জুন পাত্তেলারিয়া দ্বীপ আত্ম সমর্পণ করে এবং পাত্তেলারিয়ায় পতনে মিত্রপক্ষের বাহিনী সিসিলির ৬৩ মাইল ও ইতালীর ২৫০ মাইলের মধ্যে বাইয়া পৌছে এবং ষাণ ইতালীর ৩০ বর্গ মাইল স্থান মিত্রপক্ষের করতলগত হয়। উহার পরদিন ল্যাম্পেডুসা দ্বীপ আত্মসমর্পণ করে। সেখানে ১০ হাজারের অধিক ইতালীয়ান সৈন্য বন্দী হয়। ১৫ই জুন ল্যাম্পেডুসার অহম্যান ৩০ মাইল উত্তর পূর্বে লিনোসা নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আত্ম সমর্পণ করে। এই ভাবে সিসিলিয়ান প্রণালীতে ইতালীয়ান দ্বীপ দুর্গগুলির পতন ঘটে।

সিসিলি—১৫ই জুলাই মিত্র পক্ষের সেনাদল সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করে। ২৩শে জুলাই পশ্চিমে সিসিলির রাফানী পালের্মো দখলের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম সিসিলি মার্কিন বাহিনীর হস্তগত হয়। পালেমেদার পতনের পর জাফানীয়া সিসিলির উত্তর-পূর্বে কোণে জমায়েত হয় এবং একমাত্র ডিউনিস বন্দরই এক্সিসদের হাতে থাকে। ১৫ই আগষ্ট তারিখে মার্কিন বাহিনী মেনিয়ায় প্রবেশ করে এবং ৫ দিন বালিন হইতে এক বিলম্বিত হস্তাধারে এক্সিস বাহিনীর সিসিলি ত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়। ইতি মধ্যে ২৬শে জুলাই সিনর মুসোলিনী

ও তাহার ফ্যাসিষ্ট পার্টির পতন ঘটে এবং মার্সাল বাদোনিও ইতালীর শাসনভার গ্রহণ করেন।

প্রাচ্যের যুদ্ধ—আলোচ্য বৎসরে প্রাচ্যের যুদ্ধে বিশেষ কোন গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটে নাই। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী রুটিশ সৈন্তেভা আশ্রাকান হইতে দক্ষিণ ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া আফ্রিকাবের দিকে অভিযান করে। তাহার আফ্রিকাবের ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মংস-বুডিং এলাকা দখল করে। কিন্তু জাপানীরা বাদা দেওয়ায় তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অতঃপর যে মাসে রুটিশ বাহিনীকে সেথান হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে।

কলিকাতায় বিমান হানা—রুটিশ বাহিনী বঙ্গের আশ্রাকান অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী বিমান সমূহ ২০ ডিসেম্বর রাতে কলিকাতায় হানা দেয়। অতঃপর পরপর ২১শে, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে ডিসেম্বর ও ১৯শে জানুয়ারী রাতে কলিকাতায় বিমান হানা হয়। ২৪শে ডিসেম্বর রাতের হানা সীমান্তবর্তী হয়; ৫ দিন বিপদ সংঘেত তিন ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল।

আলোচ্য বৎসরে জাপ বিমান বহর চট্টগ্রাম এবং ফেনী বিমান ঘাঁটিতে কয়েকবার হানা দেয়। ইহা ছাড়া উত্তর-পূর্বে আসামে কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতেও জাপ বিমান আক্রমণ হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ—আলোচ্য বৎসর ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্র পক্ষের বাহিনী বহু যুদ্ধ চালাইয়া বুন গোমা দখল করিতে সমর্থ হয়।

অতঃপর ৩১শে মে মার্কিন বাহিনী আন্ত দ্বীপ দখল করে। অতঃপর ১লা জুলাই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী নিউগিনির উত্তর উপকূলে নাসাউ উপদ্বীপ এবং রেখিয়াম ও উল্লাক দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। এই দিন মিত্রপক্ষের সৈন্তেভা নিউগিনিতে মালামাউয়ার নিকট এক স্থানে অবতরণ করে। ৮ই জুলাই মার্কিন বাহিনী নিউজিল্যান্ডের জাপ অবস্থিত মুণ্ডা

আশার আলোক

শান্তি রঞ্জন গুহ

আজ শরতের শেফালী সরারাতে
সে কই?

যাকে আমি ভালবাসি।

অনন্ত আকাশে জ্যোছনা বুটায়,

ডানায় ভর করি করি চাতক আকাশে উড়ে

সন্ধানী আঁখি মিলিতে চাহে।

আগমনী! লতায়, পাতায়, ফুলে

সবুজ সতেজ প্রাণরস বহুধরা হতে

টেনে নেয় যবে? অঙ্গ রূপ উথলে পরে।

এই নিষ্ঠুর জ্যোছনার আলো অসহনীয়।

আজ প্রাণে আমার নতুন জোয়ার,

সে যদি নাই থাকে ক্ষতি কি?

আমিই স্মৃতি করেছিলাম

আমার অসীম প্রেম দিয়ে -

নবরূপ দিব সত্যজ প্রাণরস সঞ্চার করি।

এই হৃন্দর উজ্জল রাত্রি আর চাইনা

রূপলি আকাশ অন্ধকার হয়ে যাক,

মন্দিরে যদি প্রতিমাই নাহি থাকে

কিবা প্রয়োজন রাত্রি জাগরণে।

যদি মৃত্যু হয়, সেত মৃত্যু নয়

সে জয় নব জন্মের, নব জাগরণের মহোৎসব।

শরতের আবাহন

কবিশেখর কালিদাস রায়

ফিরে এস পুন মধুর শরৎ মরতভূমে

স্বরগ হইতে মুছায়ে মুছায়ে মেঘলা ধূমে।

এস তুমি পুন গগনে গগনে জ্যোছনা বানে,

এস তুমি ঘন গগনে গগনে অলির গানে।

ফিরে এস নদ তড়াগে তড়াগে মরাল দলে

কলস কাঁকণে বল কণে কণে নীলোৎপলে।

মেফালিবনের সৌরভে এস মুচুলবায়ে,

আসিয়া দাঁড়াও ছাতিম পাতার ছাতার ছায়ে।

এস ঝিকঝিক রোদের খেলায় পাতার ফাঁকে,

এস চিকচিকে নদীর বেলায় বকের ঝাঁকে।

এস কাশবনে গাঙশালিকের মহোৎসবে

এস বাঁশবনে রক্ত বায়ুর বাঁশরী রবে।

এস ফিরে পুন গেছে শুভ শঙ্খনাদে।

আমিই এই আকাশের অপেক্ষায়

দক্ষিণায়নের

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের

অভিনব কাব্যগ্রন্থ

দ্বিপ্রহর

সমবায় পাবলিশার্স

৩৩২, শ্রীভূষণ দে ষ্ট্রট



যজ্ঞের বিপাশ—বয়স ৩০৩২ বৎসর—রায় বাবুদের
খোলা ব্যাকে কেশিয়ার। মাহিনা বাঁধা—অখচ যজ্ঞের
পুত্র দেখে—অগাধ ঐশ্বর্য, বাড়ী গাড়ী, রূপসী-বিভূষী
‘আপ-টু-ডেট’ মনের স্ত্রী—আরাম-স্বাস্থ্যদা,—এমনি কত
কি!

কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে?

পরের টাকা প্রতাহ রাশি-রাশি নাড়াচাড়া করে—
পাঁচ টাকা দশ টাকা থেকে বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক-
নিজের হাতে ব্যাঙ্কের টাকা ভুলে দিলে দশজননের হাতে—
আবার দশজননের দেওয়া হাজার হাজার টাকা প্রতাহ
নিজের হাতেই ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা করছে! ভাবে
হায়রে, চিনির বলদ হয়েই ইহলক্ষ কেটে যাবে। ‘অপরে
কত স্নেহপথ্য ভোগ করছে—রেশের মাঠে, সিনেমার
হাউসে, শেয়ার মার্কেটে টাকা নিয়ে মাছুষ জিনিষিনি
ঘেলেছে—তার ভাগ্যে বাঁধা-বরাদ্দ যে মাইনে,—সে মাইনে
থেকে কি করে তার মনের পুত্র সফল হবে?

নৈরাশ্রভের মন আঁধার ভোলে—উপায় নেই, উপায়
নেই!

ভালো, তবু মন মচকাই না! বলে, কেন উপায়
পাকবে না? আছে উপায়। শুধু একটু বুদ্ধিকৌশল,
একটু সতর্কতা, একটু বৈধা!

মনের মধ্যে সে বরণ করে বসালো আরবা উপভাসের
আলাদীনের গল্পের সেই প্রদীপ-পৈতাঁকে—যার দৌলতে
গরীব আলাদীনের দৌলতখানা ধনদৌলতে পরিপূর্ণ হয়ে
উঠেছিল—এবং সেই দৈত্যের সঙ্গে মরণ করে প্রতাহই
যজ্ঞের সবার ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে দশ পঞ্চাশ
একশো টাকার খুচরো নোট। কোনোদিন নোটশস্যানোর
বিষায় ঘটে না—যেন সভ্যযুগের মতো যজ্ঞের অর্থবজ
সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে, তারি নৈতিক সাধনায়
নিজেকে সতর্কভাবে নিয়োজিত করে তুললো!

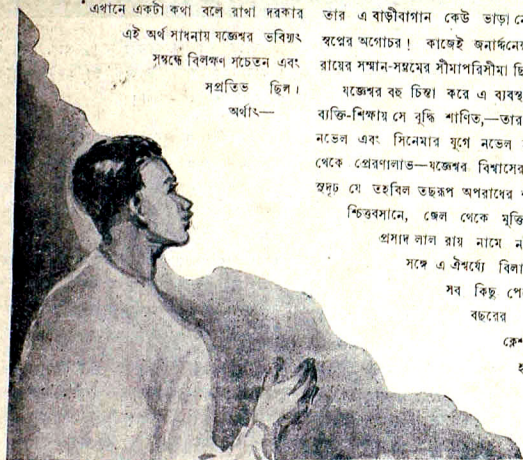
ছ তিন বছর পরে হঠাৎ রব উঠলো, ব্যাঙ্কের
তহবিল থেকে সরে গেছে প্রায় এক লক্ষ টাকা—এ টাকা
কে সরিয়েছে তার প্রমাণও মিলে গেল হাতে হাতে।
পুলিশ এলো এবং যজ্ঞের অকপটে স্বীকার করলো সকলের
কাছে—হাঁ, আমি এ টাকা সরিয়েছি—

তারপর তহবিল-তছরূপের অপরাধে দা হয়—আদালতের হাকিম যজ্ঞেশ্বরকে জেলে পাঠানেন। পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা—তার সঙ্গে ছ'বছর সশ্রম কারাবাস। জরিমানার টাকা দিতে না পারলে আরো একবছর তাকে জেলে থাকতে হবে।

যজ্ঞেশ্বর জেলে গেল। জরিমানা বাবদ এক কুপর্দক সে সরকারে আদায় দিল না—পাঁচ হাজার টাকা যদি গরম মজুত থাকে, তাহলে আরো এক বছর জেলে বাস করা—গায়ে লাগবে না! বরং শ্রীঘর ঘানিগুর্ন-কষ্ট—ন পুনর্বন্ধুমধ্যে ধনহীন জীবিত! যজ্ঞেশ্বর বুঝেছিল, তিন বৎসর পরে জেল থেকে বেরলে ঐ লক্ষ টাকার ছোরে বাকী জীবনকে সর্ব্বকমে সে মোহনীয় এবং কমনীয় করে তুলতে পারবে!

* এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার এই অর্থ সাধনায় যজ্ঞেশ্বর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন এবং মগ্ধাতি ছিল।

অর্থাৎ—



টাকা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে সহর থেকে বহুমাইল দূরে এক অল্প-পল্লীগ্রামে বাগান-সমেত একখানা জীর্ণ একতল বাড়ী সে ভাড়া নিয়েছিল। সে বাড়ীতে নিজের খরচে মিস্ত্রী লাগিয়ে সিমেন্ট দিয়ে ঘরিয়ে গুপ্ত ভোষণাঘর বানিয়েছে—সেই ভোষণাঘরায় অপহৃত খুচরো-নোটের প্রায় লক্ষ টাকা পুঙ্খভে—প্রতি শনিবারে সে সে বাড়ীতে আসে—এবং শনিবার-রবিবার সেখানে বাস করে জাবার সহরে ফেরে শোমবারে—অফিসের কন্ড সাধনা নিয়েকে নিয়োজিত করতে—

বাড়ী সে ভাড়া নিয়েছিল ছদ্মনামে অর্থাৎ এ বাড়ী ভাড়াটিয়া যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস নয়—ভাড়াটিয়া প্রসাদলাল রায় এ বাড়ীর মালিক কাছাকাছি থাকেন—জ্ঞানজীর্ণ বৃদ্ধ জনাৰ্দ্দন দত্ত। জনাৰ্দ্দনের সংসার অচল—অল্পপাড়াপাড়ার তার এ বাড়ীবাগান কেউ ভাড়া নেবে, এ ছিল তার স্বপ্নের অগোচর! কাজেই জনাৰ্দ্দনের কাছে প্রসাদলাল রায়ের সম্মান-সম্মের সীমাপরিসীমা ছিল না।

যজ্ঞেশ্বর বহু চিন্তা করে এ ব্যবস্থা করেছেন—দুইমাস ব্যক্তি-শিক্ষায় সে বুদ্ধি শাবিত, তার উপর ভিটেকটিং নভেল এবং সিনেমার যুগে নভেল নাটক আর সিনেমা থেকে প্রেরণালাভ—যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের মনে বিশ্বাসময় হৃদয় যে তহবিল তছরূপ অপরাধের শাস্তি-ভোগের প্রায় ষ্টিত্বসানে, জেল থেকে মুক্তিলাভ করে এগারে প্রসাদ লাল রায় নামে নবজীবন লাভ সঙ্গে এই ঐশ্বর্য্যে বিলাস পাছন্দ্য-আগার সব কিছু পেয়ে জৈলের তিনে বছরের দুঃসহ তপশ্চর্যা রূপে অপনোদন করি হবে না।

তাই হলো।

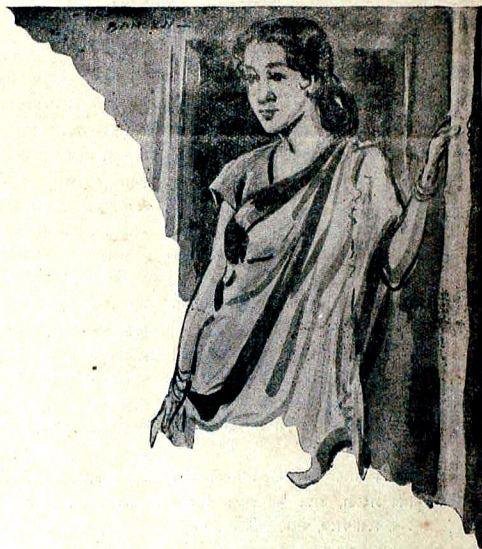
জেলে থাকা
বেনিয়ে চেহারা

ভোল ফিরিয়ে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস পল্লীভবনে এসে আবিস্কৃত হলো প্রসাদলাল রায় রূপ! এসে বেগে মালিক জনাৰ্দ্দন দত্ত ইহলোকের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে চলে গেছেন যে জীর্ণ কুঠারে তিনি বাস করতেন সে কুঠার বাড়ির আঘাতে পঞ্চাশ লাভ করেছে—জনাৰ্দ্দনের বিদ্যা পড়ী এবং কিশোরী কন্ডা আশ্রয়ের অভাবে তারি সেই ভাড়া নেওয়া বাড়ীতে এসে বাস করছে!

যজ্ঞেশ্বর গরমে প্রসাদ শিউরে উঠলো! তাইতো, এ বাড়ীতে কোন্ অধিকারে সে এখন প্রবেশ করবে? তিন বছর আগে সে ছিল ভাড়াটিয়া হিসাবে, এগুয়ে প্রবেশের অধিকারী—এ তিনবছর একট পয়সা ভাড়া দেয়নি—কাজেই তার সঙ্গে এ বাড়ীর সম্পর্কও হয়েছে বিচ্ছিন্ন!

সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে কিন্তু চলবে না তো! এই বাড়ীর ঐ দক্ষিণদিককার ঘরের ঘেরের নীচে তার ভোষণা-ঘরা তারি পয়সায় তৈরী এবং সে ভোষণাঘরায় আছে তার এই চৌধা এবং কারাবাস-তপশ্চর্য্যার পুরস্কার—পরমার্থরূপ সেই লক্ষ টাকা!

অতএব যেমন করে হোক, এ গৃহ ছেড়ে তার যাবার উপায় নেই—তার সমস্ত পৃথিবী এই বাড়ীটিতেই কেন্দ্রিত হয়ে আছে!



জীর্ণ মলিনবেশ প্রসাদ রায় এসে ভাকলো—কে আছে ন বাড়ীতে?

ঘার খুলে এক তরুণী এসে পাড়লো সামনে—তরুণী বললে,—কে?

প্রসাদ রায়ের মনে পড়ে গেল কবির সেই পুরাণো কথা, উজানলতাব পরাঙ্ঘ বনলতার কাছে! নিবাভরণ এই পরীতরুণীর সিদ্ধকাস্তিরীপ্তি—এ যেন অপরূপ! কিন্তু তার এখন কাব্যচর্চার সময় নয়, তার নাম শিকায় বুলছে মিহি হস্তায় নির্ভর করে!

প্রসাদ রায় বললে—আমি চাকরি খুঁজে বেড়াছি। তরুণী বললে,—এ গায়ে কি-বা চাকরি মিলবে?

প্রসাদ রায় বিমিত্ত হলো। পত্নী তরুণীর বাক্যে শুধু
সহজ, বন্ধন হইবে নয়—বৃদ্ধির দীপ্তি!

প্রসাদ রায় বললে—আমি একেবারে নিরাশ্রয়—
আমার কেউ কোথাও নেই!

ভাগ্যবশত চোখের অবচল দৃষ্টি প্রসাদের মুখে নিবন্ধ
রয়েছে তরুণী রূপ করে দাড়িয়ে রইলো থামিকণ্ঠ...

হঠাৎ ভিতর থেকে প্রোচারণ কণ্ঠ নিঃসৃত হলো—
কে বেলাতু?

তরুণী জবাব দিলে—একজন চাকরি চাইছে!
—এ গায়ে চাকরি! বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন
এক প্রোচারণ বিধবা।

প্রসাদ লোক দেখে বিধবা বললেন—ভদ্র লোক বলে
মনে হচ্ছে!

মহিল হাতে প্রসাদ রায় বললে—ভদ্র লোকই মা!
দুঃস্বপ্নের সীমা নেই! বেশী কিছু চাইনে মা...খাবার
আশ্রয় আর ছুটি অন্ন! এমন চাইছি না, কাজ করবো।
তখনম, আপনার জমিতে ভরীভরকারী ফলাচ্ছেন—সেজ্ঞ
লোক চান আপনি।

প্রোচারণ তরুণীর পানে চাইলেন—কি মনে হলো,
বললেন—আশ্রয় চাইছে, তাতে 'না' বলতে পারি না
তো! তা বেশ, করো কাজে, মানে, আমরা ছুটি মেয়ে-
মাছ শুধু এ বাড়ীতে বাস করছি। চানবাদের কাজ যদি
করতে পারো তাহলে আমাদেরও ভালো, তোমাকেও পয়সা
কড়ি তাহলে দিতে পারবো। ঐ কি!

প্রসাদ খুশী হলো—তাইলেন, এখানে থাকতে পাবে—
একবার যদি আশ্রয় পায়, তারপর, দক্ষিণ দিককার ঘরের
মেশের নীচে থেকে লাথ টাকা উদ্ধার—শক্ত হবে না।
তবে সেজ্ঞ চাই ঐখান...এবং সময়!

প্রসাদ রয়ে গেল। বাড়ার পত্নীগ্রাম এখানকার
মাছবের মন থেকে মায়ামত্তা এখনো শুকিয়ে ঝরে
যাচ্ছে!

তরুণী ওনারের কণ্ঠ। লেখাপড়া কিছু শিখেছে।
পানীয় মুড়ার পর জমিতে চাষ করিয়ে ফল ফলিয়ে

মায়েতে-মেয়েতে কোনোমতে অন্নবস্ত্রের সংস্থান
করছেন—

প্রসাদ কাজ করে—কাজে তার নিষ্ঠার সীমা নেই
কারণ এই নিষ্ঠার উপর নির্ভর করছে তার জীবনের দ্বিতীয়
অধ্যায় রচনার স্বপ্নে!

প্রোচারণ বললেন প্রশংসক—তোমায় পয়সা দিতে পারি
না বাবা,—শুধু ছুটি খেতে পাচ্ছে,—তবু কাজে তোমার
কতখানি আঁঠা। আর পয়সা দিয়ে জম খাটাইছি, তাদের
দেখছো তো কাজে আলোকাড়া! যেন দয়া করুছে।

প্রসাদ বলে—দেখছি, মা!

তরুণী বলে—পানের গায়ে মিল খুলেছে, মত জোগান
লোক সেখানে ছুটোছে কাজ করতে—নিজেদের বাগান
পুকুর সমেত থামার হেঁজে মজা খাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই!
তা তুমি মিলের কাজ করতে যাও না গো, পয়সা পাবে!

মহিল হাতে প্রসাদ বলে—চানবাদের কাজ আমার
ভালো লাগে। বাণিজ্যে লক্ষ্যের বাস, শায়ে বলে—
শায়ে আরো বলেছে, তরুণী কৃষিকর্ম। তা বাণিজ্য
করবার মতো দ্রব্য নেই, কৃষিকর্মে এখন সুবিধা এখন
কখনো পেয়েছি তখন দেখি, লক্ষ্যকে যদি এই কৃষিকর্ম
সাধনায় লাভ করতে পারি।

প্রোচারণ খুশী হলেন একথা শুনে,—বললেন—তা লক্ষ্য
তুমি লাভ করবে, বাবা যে রকম তুমি ভালো, কাজে
তোমার যে রকম মন তোমার কাজের দাম দিতে পারছি
না, তার জ্ঞান আমার লজ্জার সীমা নেই! তিনিও শে
বয়সে দেশে এসে ঠিক করেছিলেন চানবাস করবেন—ত
বরাত হলো মন্দ—প্রোচারণ নিখাস ফেললেন। আবার
বললেন, লভ্য বলে, এত ভালো লোক ভদ্র লোক—অথ
তিনিজন জোয়ার লোকের কাজ করেন মা, উনি!

প্রসাদের মনের মধ্যে যেন তরঙ্গ কলো! সে ভালো
দে ভদ্র! হাছ রে, এরা তো জানেন না, সারা বাড়ার
মেশের মাছবাট ত্যাগ করে, এই হৃদয় বিগলন কোনটুকু
দে এসে আশ্রয় রেখে কিসের লোভে!

চুরি করা সেই লক্ষ টাকা—ব্যাঙ্কের তবিল-ভাড়া লক্ষ

টাকা—তার ভবিষ্যতের সমস্ত আশার প্রকাণ্ড ইমারত
আছে সেই লক্ষ টাকাকে বিজড়িত হয়ে!

এক একবার মনে হয়, প্রোচারণে বধন বা বলে ভেঙেছে,
—তার এখন রেহে...তরুণী লভ্যর মমতা...বলবে না কি
প্রোচারণ কাছে সব কথা বলে,—সে আমার লক্ষ টাকা
পোতা আছে ঐ খবর মেয়েকে তোরাখানায়—পাই যদি
লভ্যকে জীবনের সহচরী সন্ধানী—তা হলে স্বপ্নে স্বাক্ষর
তাকে রাখতে পারবো!

কিন্তু বলতে পারে না! ভয় করে, কামাঙ্গী একটু বেশ
বুকে দিয়েছে, দরিদ্র হলেও অভাবে বিপর্যাস হলেও অসমু-
তার নামে মায়ের আর মেয়ের মন দু'ঘর আতকে নিউরে
ঠেঁ!।

বৃত্তে পারলো আরো অনেক কথা। বৃত্তে পারলো,
এ বাড়ীবাগানখানি দেবার দায়িত্ব বন্ধক আছে। বৃদ্ধ জ্ঞানদেবের
আশা ছিল, চানবাস করে ফল ফলিয়ে তারি বৈশাখি
ক'রে বন্ধকী দায় থেকে একটু মুক্ত করবে, কিন্তু বাবার
ভায়ে এলো চরম-আবিলতা, কাজেই স্বপ্নভার বেড়ে
পাছের মতো গুরু হয়ে উঠেছে দিনে দিনে!

প্রসাদ বললে তরুণী লভ্যকে—টাকার জোরে ছিল না,
কি বলে! আপনার বাবা ভরসা ক'রে বন্ধক দিয়ে স্বপ্ন গ্রহণ
করেছিলেন?

লভ্য বললে—পেঙ্গন নেবার সময় বাবা পেয়েছিলেন
প্রভিডেন্ট ফণ্ডে জমায়ে নগদ তিন হাজার টাকা। সে
টাকা তার জানা রায় বাবুদের ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন জমা!
ব্যাঙ্কের কেমিস্টর যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস লক্ষ টাকা চুরি করার
ফলে অনেক টাকা ভুলে নিলে ব্যাঙ্ক ফেল হলো, বাবার
সর্বস্ব লক্ষ তিন হাজার টাকাও গেল সেই সঙ্গে! ঐ
তিন হাজারের জোর চলে যেতে বাবার অস্থখ আরো বেড়ে
উঠলো—দুষ্টিদায় তিনি আর স্বস্থ হতে পারলেন না।

প্রসাদ বায়ের বুকে যেন এক লক্ষ ছুট কে সবগে
ফুটিয়ে দিলে—যে লক্ষ টাকায় সে সর্বগ্রন্থ আয়ত করে
আরাম পাবে—সে টাকায় এই ছোট শাদু সং পরিবারটিকে
একেবারে মধ্যস্থিত আঘাতে অজ্ঞবিত করে দিয়েছে!

প্রসাদ রায় বললে—তুনেছি সে কেমিস্টরের খেল হয়ে-
ছিল! কিন্তু এত লোকের সর্বস্বনাশ যে করে, তাকে জেলে
না দিয়ে ভালকৃত্য দিয়ে বাওয়ালে তবুই বা শাস্তি হতো
যোগ্য!

লভ্য বললে—সে যখন টাকা নেজে তখন কি এত ভেবে-
ছিল যে, ও টাকা চুরির জ্ঞান কতদিকে কত লোকের কত
কষ্ট হবে! হুতো তার টাকার দরকার হয়েছিল শুধু বেশী
—তা ছাড়া ভদ্রলোক তিন তিন বছর জেল পেতেছেন—
তাতে কতখানি অপমান! ভদ্রসমাজে ইনি জন্মের মতো
মুখ দেখাবার উপায় রাখেননি—যদি বেঁচে থাকেন তাহলে,
এ বাঁচা বেঁচেও তিনি মরে আছেন।

প্রসাদ রায় বললে—কি অভিপায় দেন না?
লভ্য বললে—না। কি ছুখে পড়ে, কি বিধানের মুখে
ভদ্রলোক টাকা হরণ করেন, তার কতটুকু স্বপ্ন আমার
রাখি, বলুন?

প্রসাদ রায় আশ্চর্য হলো! মাছবের মন এমন দাতুতেও
গড়া হতে পারে?

তার মনে যেন লক্ষ লক্ষ বুদ্ধির দংশন—মাথার মধ্যে
লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম কিলবিল করে বেড়াচ্ছে! স্বস্তি নেই,
শান্তি নেই—এ কি বিশ্ব বিপর্যাস চলছে বুকের মধ্যে
অবহর!



নিদ্রা বিধাতা কেননা আমরা,
জগতে পার্থালি

রমণী করের...

— বিজ্ঞানসন্ধান

‘প্রভাতী’

চেক, ডুরে, রবিন্সন
সুতী শাড়ী
এমনই লোভনীয়!

‘প্রভাতী’

জার্জট, ফ্রেপ
ও আর্টসিল্কও
তৈখবচ



প্রাপ্তিস্থান — দি সিলকটন লিমিটেড ৪ নং গণেশচন্দ্র এডিনিউ (পাইকারি) • ১৪০ দি. কণ্ডুমালিস স্ট্রীট
(হাতিনুগাপার মার্কেট) • ৫৭-১২, কলেজ স্ট্রীট (কলেজ স্ট্রীট মার্কেট) • ৭০ নং আশ্রমমন্ডালি রোড (৩৩৩৩৩
নাজার)

জালিয়া টেলারিং কোং লিমিটেড ২৭৫ নং ২৩নম্বার স্ট্রীট, লোকনাস্তানোর কাছে)

ইক ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৬৭ দি. মাদারিয়ার এডিনিউ (গেডুমাসহাট মার্কেট)

প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর - কে. সি. বিশ্বাস কোং

সংস্করণ

জ্বিন পরে কি একটা পর্প উপলক্ষে মা চললেন মেয়েকে নিয়ে পাশের গ্রামে গদাশ্রমে—এ গ্রামে গদা। সেই—
পাশের গ্রামের বৃদ্ধ মেয়ে মা গদা বীকা। পথে নব্বাশের দিকে গেছেন—জ্বিনে গেলেন পাশের গায়ে। বাড়ীঘরের চাকি হইলো প্রসাদের উপর...

প্রসাদ এ সুযোগ হারালো না—দক্ষিণ দিককার ঘরের মেয়ে বৃদ্ধ আবিষ্কার করলো সেই তোষাপাশা—নোটের সেই তালু—গুণে দেখে, লক্ষ টাকা!

নোটের তালু একধাণা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে সোজা সে এলো নিজের ঘরে—সমস্ত কটা প্যাকেটে নোটগুলো ভরে নিলে এবং একরাশ প্যাকেট বয়ে পোষ্ট অফিসে গিয়ে প্যাকেটগুলো প্যাটিয়ে দিলে ডাকে বলকাতায় পুলিশ কমিশনারের নামে!

এক হাজার মধ্যে দেশে ১৫ হৈ কলরব পড়ে গেল—
কাগজে কাগজে ববর বেবলো—

রায় বাবুদের ব্যাধের তবিল-ভান্ডা সেই লক্ষ টাকা কটি প্যাকেটে ভর্তি হয়ে পুলিশ কমিশনারের নামে হঠাৎ সেদিন ডাকে এসে পৌছেছে! জাঁইম হিষ্টিতে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না!
এ-টাকা পেয়ে ব্যাধ আবার নিজের অক্ষম পা ছুটাকে যত্নবৃত্ত করে পাড়া হয়ে উঠলো—

বনান্দিন দত্তর বিধবা পেলেন তাঁর মৃত স্বামীর জমা দেওয়া তিন হাজার টাকা!...

লতু বললে—আশ্চর্য চোর কিন্তু—নয় প্রসাদ বাবু?
প্রসাদ বাবু বললে জগতে কিছুই আশ্চর্য নেই।

লতু বললে—এ টাকা এত কাল পরে সে ফিরিয়ে দিলে কেন, বলতে পারেন? তিন-তিন বছর জেল খেটে কলহ মাখবার পরেও!

প্রসাদ রায় বললে—এতদিন পরে হয়তো বুঝতে পারলে যে, অপরাধকে বঞ্চিত করণে সক্ষম—সে সকলে স্বপ্ন নেই—মানি-অংশোচানুর যাতনা হয়তো অনেক বেশী!

হেসে লতু বললে—জেলখানার সব চোর যদি এমন হতো!

গৌড়া বললেন—মনের দুর্বলতায় একাজ করেছিল,—
তারপর মান তার স্বপ্ন হয়েছিল, নিশ্চয়।

লতু বললে—কিন্তু হঠাৎ এমন স্বপ্ন হলো!
তার কণ্ঠে প্রচুর বিশ্বাস!

প্রসাদ বললে—হঠাৎ হয়তো নয়!...আমি বোধ হয় বলতে পারবো, কেন—প্রসাদ তখন বললে সব কথা গুলে—
গৌড়া শুনলেন, লতু শুনলেন!

প্রসাদ বললেন—আমি এসেছিলাম মিথ্যা পরিচয়ে, ছদ্ম নামে, সেই লক্ষ টাকা ঘরের মেয়ে থেকে তুলে তা নিয়ে যেতে...ও টাকায় আরাম বিলাস-ঐর্ধ্য ভোগ করবো...
তারি বাসনায়...

লতু বললে—তারপর?

প্রসাদ বললে—এসে দেখলুম, দুজন স্ত্রীলোক দেবার ভাব মাথায় বসে কি পরিশ্রম করছেন সংপথে থেকে জীবন-যাপন করতে—যে লোক টাকা চুরি করেছে—তার উপর বিদ্যে নেই, তাকে অভিশাপ দিচ্ছে না!—দেখে নিজের উপর দিকার জমালা! চুরি করে পরকে বঞ্চিত করে ফাঁকি দিয়ে স্বইর্ধ্য ভোগ করতে চেয়েছিল চিরকাল...এ মানির বিদ্যে মন জর্জরিত হইছিল, দারুণ অশান্তি ভোগ করছিলুম—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল জেল খেটে—এখন তুলের প্রায়শ্চিত্ত করলুম চুরির টাকা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে—
একাগ্রমনে লতু শুনলো—প্রসাদের কথা শেষ হলে বললে—তারপর?

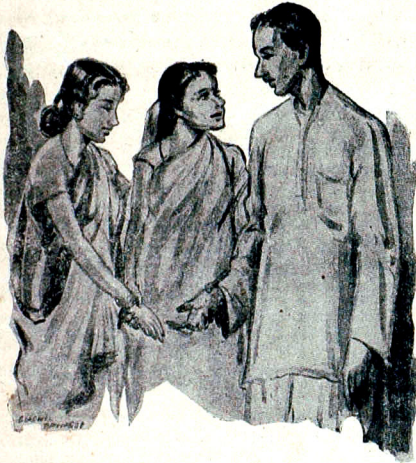
প্রসাদ বললে—তারপর যত্নের বিবাস ওরফে প্রসাদ রায় এখান থেকে বিদায় চাইছে।

লতু বললে—মাকে বলি—
মেয়ের কাছে সব কথা শুনে মা এলেন। বললেন—

তোমার যাওয়া হতে পারে মা, বাবা! আমাদের কি মায়া পড়েছে—পৃথিবীতে তোমাকে যতখানি বিশ্বাস করেছি, এতখানি বিশ্বাস আর কাকেও করতে পারবো না তো! আমি আর কদিন! তারপর লতু একা—ওকে কে দেখবে, কার হাতে ওকে দিয়ে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো বলে!?...লতুর ভাব তোমাকে নিতে হবে।

প্রসাদ চাইলো লভুর পানে—লভুর গৌর কপোলে পড়ছে—তোমার সেই শাস্ত্র বচন !
লক্ষ্যার রক্ত রাগ—তার মোহ সামান্য নয় ! প্রসাদ বললে—কি শাস্ত্রবচন ?

প্রসাদ বললে—কিন্তু—আমি দাগী—
প্রোচা বললেন—খুঁজে দেখলে বেদাগ মাহুষ পৃথিবীতে
একটিও মিলবে না, বাবা ! যে দাগ দেখা যায়, তার
হেসে প্রসাদ বললে—বাঙলা দেশে কৃষিক্ষমকেই লক্ষী
লাভের প্রথম এবং প্রধান উপায় বলে আমি প্রচার করবে



মেসামত চলে—কিন্তু যে দাগ চোখে দেখি না—সে বড়
সর্ব্বদেশে !

বিদায় নিয়ে যাওয়া হলো না—যাওয়া যায় না ! নিতে
হলো লভুর ভার ।

ফুলশয্যার রাতে লভু বললে—একটা কথা খালি মনে

—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার !
হেসে লভু বললে—তাই করো—এককাঠি করে
বাঙালীকে বলো—লক্ষী যদি লাভ করতে চাও, তাহা
কৃষিক্ষমি—কেমন ?

প্রসাদ বললে—O. K.



অনুরাধাপুরের স্মৃতি

[ঐতিহাসিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত]

প্রভাতপ্রস্থান মোদক

ভারতমাতার চরণোগ্রাস্তে শতদল সদৃশ যে দ্বীপটি
বিরাজমান, তাহারই নাম সিংহল। ভারতের সহিত ইহার
ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সন্ধি অতি নিকট। যে অগভীর
সমুদ্রমাধ্যম ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহাও দ্বীপময়। মূল
দ্বীপটি হইতে যে পথিক সিংহলে গিয়াছেন তিনিই পথের
মৌলিক বিমোহিত হইয়াছেন। স্থানীয় জনগণ হুচায়া
মেদিনীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। তাহার উপর সেতুবন্ধ
রেলপথ, তাহার পর একটি দ্বীপ, দখলোটি হইতে—নাতি-
বৃহৎ জাহাজে যোশোর, বিলীমান ভারত সৈকত—এসকল
যেন পথের মত ভাসিয়া যায়। মানার উপসাগরের পর-
পারের এই যে নারিকেল বৃক্ষস্থূল বিভিন্ন দ্বীপটি ইহা অর্ধা-
সভ্যতার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাই
রামায়ণের লঙ্কা, গ্রীকদের Taprobane, মুসলমানদের
সেরেন্দিবু ও পর্তুগীজদের Zealan। বরষন্তান বিজয়সিংহ
খৃঃ পূঃ ১০৪ সালে সমুদ্রযাত্রা করিয়া এই সিংহলে রাজ্য
স্থাপন করিয়াছিলেন। অতীতের বকে সে কীর্তি আজিও
অক্ষয়।

সিংহলের আদি সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অম্বরাদ্বীপ
Kandry পরমভালার প্রাচ্যে অবস্থিত। রাজ্যটির
পর অম্বরাদ্বীপ সিংহলে দীর্ঘ স্থান লাভ করে। খৃষ্টাব্দের
পর নবম শতকে এই নগরী পরিত্যক্ত হইয়া অরণ্য ও ক্ষস-
ত পের অরণ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ইহার
পুনরাবিষ্কার হয়। কিন্তু উদ্ধারান্তে যে বিশ্বমকর ক্ষসাব-
শেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা মনকে অভিভূত করিলেও,
ইতিহাস সংগঠনে পূর্ণ সহায়তা করে না। অতুলনীয় ঐতি-
হাসিক পালিগ্রন্থ “মহাবংশ” কিংবদন্তিমাণে এই দৈন্য দূর
করিয়াছে সিংহলের ঐতিহাসিক বিবরণ রক্ষা করিয়া।

কদম্ব (Nalwater Oya) নদীর তীরে খৃঃ পূঃ পঞ্চম
শতাব্দীতে অম্বরাদ্বীপের প্রথম সভ্যতা হয়। পাণ্ডুভাষ্য
তাহার খুলভাতদের দীর্ঘ যুগে পরাণ্ড করিয়া অম্বরাদ্বীপ
অধিকার করেন। তখন অম্বরাদ্বীপ লগনের দ্বার বিস্তৃত,
৫০০ জন সমাজজ্ঞী ইহার স্থানান্তিত পথভাল পরিষ্কারে
নিযুক্ত, মহত্ত্বনিষ্ঠিত বিশাল জলাশয়, প্রমোদোদ্যান ও কৃত্রিম
তৃণভূমিতে নগর স্থাপিত।

অম্বরাদ্বীপের গরিমাময় ইতিহাস আরম্ভ হয় বৌদ্ধধর্ম
প্রবর্তনের পর খৃঃ পূঃ ৩০৭ সালে যখন দেবানামপিয় তিত্ত
অম্বরাদ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন অপেক্ষা নন্দন
অরহৎ মহেশ্বর ধর্মবিজ্ঞাণে সিংহলে আগমন করেন এবং
বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম প্রচার করেন। নৃগতি তিয়া এই নব-
বিশ্বাসে অম্বরাদ্বীপ হইয়া সিংহলবাসীদের এক নব জাগরণে
উদ্ভূত করেন। সিংহলীয় আর্ট নব নবরূপে ও ধারায়
আয়প্রকাশ করিতে থাকে। শিলাময় স্তূপ (Dagoba),
অলঙ্কৃত তড়াগবিপুল মঠমন্দির, রাজপ্রাসাদ ও কৃত্রিম ত্রুণ-
বলীতে অম্বরাদ্বীপ বিকশিত হয়।

মহাবংশে সিংহল নৃপতিরের অস্তিত্ব প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতিরূপের বিজয়পতাকা তাহাদের সূর্য্য অঙ্গ করিয়াছে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে চোল সেন্যীয় তামিল নৃপতি ইলার। সিংহলে অভিযান করিয়া অম্বরাদিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রজাপালনে তৎপর ও সংহতভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু ইলারার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দিন হ্রস্ব ছিল না।

দক্ষিণ ভারতের আর একজন সাহসী সৈনিক দ্রুতজেমুহ খৃঃ পূঃ ১২০ সালে ইলারাকে পরাস্ত করেন। ইলারার সহিত দ্রুতজেমুহর যুদ্ধ, দক্ষিণে ইলারার মৃত্যু, পবিত্র শঙ্কর শ্রুতি বীরবাহুচক্ৰ শ্রদ্ধা, শতাব্দীর পর শতাব্দী সিংহলীয় লেখকগণ কাব্যে ও নাটকে অবিরত করিয়া গিয়াছেন। দ্রুতজেমুহ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, পরিশেষে ও শ্রমণসম্মত। বিশ্বকর ও অন্তর্ভুক্ত কাহিনী ছিল তাহার প্রীতি। তাহার সুবিশাল মঠ, কাক্ষয় বিচিত্র নরতলা রাজপ্রাসাদ, স্বর্ণচূড় ধবলগাভ রুমালওয়ালা তুপ (দাগোবা) জনসাধারণকে বিশ্বাস বিস্তার করিয়াছিল। তাহার শিল্পের প্রাসাদ পঞ্চাচারীদের চক্ৰবিহীন ঘটাঁহিত। ইহার রাজহেই অম্বরাদিপুত্র পরিমাণিকরে আরাধন করে। প্রজাগণ স্থবী ও উন্নত হয়, দক্ষ দূত হয় এবং বৈদেশীক আক্রমণ বিভীষিকা নিবৃত্ত হয়।

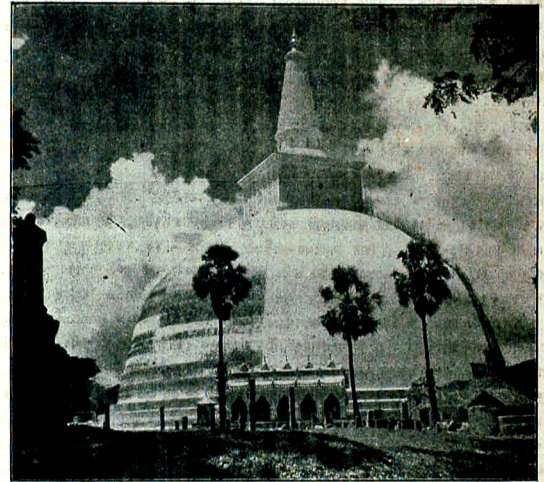
দ্রুতজেমুহর পর ৯২ জন নরপতি অম্বরাদিপুত্রের সিংহাসনে আরুঢ় হন। তাহাদের কেহ কয়েকদিন মাত্র, কেহ দীর্ঘ অধিব্যবস্থিতির প্রজাপালন করেন। এই একোন শত নৃপতিসমষ্টির মধ্যে অনেকেরই ছিলেন অগণ্য ও কলহ পরায়ণ ও নগণ্য আবার কেহ কেহ অরণীয়। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ভটগামিনী অভয় বিশাল অভয়গিরি দাগোবা নির্মাণ করেন। আজিও ইহা সর্বদা তাহার মহিমা কীর্তন করে। কিন্তু ইহার সময়ে ধর্মনিগ্রহ ও মতভেদ আরম্ভ হয় এবং খেরবাদী ও ধর্মকৃতি রাজকবর্গের মধ্যে বিসবাদের ফলে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ মৌখিক অবস্থা হইতে লিপিত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

ইহার কিছুকাল পরে অম্বলা নামী এক রাজ্ঞী রাজত্ব করেন। তাহার অপ্রাকৃত জীবন ছিল বিঘ্ন চাকলাব্যব

পক্ষ স্বামীকে একে একে বিধি প্রদান করিয়া চারিজন্য তিনি বরিশতি উপপতি লইয়া পরিত্ত ভোগে লিপ্ত হন ও অবশেষে কুটিলক তিসোর হস্তে নিহত হন। কুটিলক অম্বরাদিপুত্রের চতুর্দিকে প্রাচীর এবং মিহিনটেলে একটা স্থপ নির্মাণ করেন। তাহার পরবর্তী ভটিকাভয় মৃতনখে অযোগ্যে কথানওয়ালা তুপকে মূইফলের সমাধি দিয়াছিলেন গজবাহু ভারতবর্ষে এক সাফল্যমণ্ডিত অভিযান চালন করিয়া ২২ সহস্র বন্দী আনয়ন করেন। ভোহারিক তির ইহার শত বৎসর পরে দখলিকরণ হইতে কুপ্রাধা অপনয়ন ও দখলীতির সংস্কার সাধন করেন। তৃতীয় খৃঃ অঃ খ্রিস্টাব্দে (১৩০) ছিলেন সাক্ষ্য রাজর্ষি, কিন্তু অধিক দায়িত্বভার জ্ঞা রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অতঃপর মহাসেন খেরবাদী মাজবের মনোরম মঠগুলি ধ্বংস করিয়া তাহাদের সর্বস্বৎস্ব করেন। কিন্তু একতা হওয়ার পর পুনরায় মতভেদ হওয়া তাহাদের মহাবিহারের চত্বরে বিশাল স্থপ নির্মাণ করান—ইহাই জেতবনগ্রাম। মিনেরি বেওয়া নামক একটি বিশুজ্জাশয় ও তাহার কীর্তি। শ্রীমৎসবর্গের সময়ে বিখ্যাত Tooth Relic সিংহলে লইয়া যাওয়া হয়। Kandy জরমা lake এর তীরে Tooth Relic মন্দির দর্শনীয় স্থান চতুর্থ খৃঃ অঃ বিখ্যাত রাজভিক্ষু বুদ্ধদাস রাজশাসনভার গ্রহণ করিয়া দেশময় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা করেন। দশগ্রাম সমষ্টি জ্ঞা একটি করিয়া চিকিৎসক প্রমা সিংহলে আজি প্রচলিত। ইহার পর পুনরায় বৈদেশীক শাসনে সিংহল বাসী উৎখলিত হয়। দ্রুতসেন এই তামিল উৎখলিত উচ্ছেদ করেন। ইনি কাল বেওয়া নামে এক বৃহৎ বনন করিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই জলাশয় ৫০ মাইল দূর হইয়া আজিও অম্বরাদিপুত্রের জল সরবরাহ করে। দ্রুতসেনে গুল্যভাত পুরোহিত মহানামই মহাবংশের রচয়িতা। দ্রুতসেনের পিতৃহত্যা পুত্র সিগিরিয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কিন্তু অপর পুত্র যোগগলান পুনরায় অম্বরাদিপুত্রের বিরুদ্ধে আসেন। কিন্তু অম্বরাদিপুত্রের সৌভাগ্যার্থে তখন অসুস্থতায় বাহিরের নানা উপদ্রব ঘন, ঘন, ২২ শতাব্দী অম্বরাদিপুত্রের ইতিহাসকে বিবৃদ্ধ করিয়াছে। সেই বয়

বাতের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অম্বরাদিপুত্রের পতন হয়। ২২ শতাব্দীতে যখন পোলোনাকদা রাজধানী হয় তখন অম্বরাদিপুত্র পরিত্যক্ত হইয়া বিশ্বস্তির গর্তে বিলীন হয়। একদা প্রাসাদ সমাচ্ছন্ন, মঠ মন্দিরশোভিত স্থপতিভূষিত, শিল্পময় সৌন্দর্যের অম্বরাদিপুত্র অম্বরাদিপুত্র বিপত পরিমা

৫৯
অট্টালিকার উপরিভাগ কাঠনির্মিত হওয়ার প্রথমেই তাহা বিনষ্ট হইয়াছে—বাকী আছে কেবল ভিত্তির ভগ্নাংশ। প্রথমেই মনে পড়ে ১৩০ বৃক। যে তৎকালে বুদ্ধদাস প্রাসাদ সমাচ্ছন্ন, মঠ মন্দিরশোভিত স্থপতিভূষিত, শিল্পময় ইহা একটি স্থান। দেবানামগিরি তিসোর সময়ে মহাসেনা



কথানওয়ালা সিংহ
অম্বরাদিপুত্র, সিংহল।

হতশী অরবাকীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু আজিও তাহা "কানের কপালতলে স্তম্ভমুচ্ছল" আছে।

অম্বরাদিপুত্রের ঐক্য আশ্রয় ভগ্নভাঙের, বিলস্ত অশ্বে ছিন্নাভি পড়িয়া আছে। সে রূপশী আর নাই—আছে তাহার কদাল। তুণ্ড তাহার আকর্ষণ কত তীর।

রাহে বৌদ্ধ-সিংহলে ইহাকে আনয়ন করিয়া রাখা করা হয়। মহাবংশ উল্লাসজনে ইহার আদিমৈবিক আগমনবার্তা যোগ্য করে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন এই বৃক Bronze বেড়ার অশায়ে Bronze দপ্তে ছাপ হইয়া অমর প্রাণের জয়গান করিতেছে তাহার পল্লব মধ্যরে।

পরিষ্কৃত Bo বক্ষের মনোহর ভোরণের সমুদ্রে ১০০-টি শিলাস্তম্ভ বিস্তারিত—ইহাই তুতুকেমুখের পিতল প্রাঙ্গণের ভরাবসন। কঠোর উপরিভাগ ও পিতলের ছাদের আর আর চিত্রও নাই।

Post Office এর নিকট একটি সুদৃশ্য Jantaghar বা উল্লেখের মানও আছে। তথায় Conjeeboat নামক জলাধার ও kesakutiyagola বা closet stone আছে। এইসকল closet stone ও jantaghar আরও কয়েকস্থানে পাওয়া যায়।

শিরামিজাকার রৌদ্রকণ্টক ইষ্টকনির্মিত স্তূপকে দাগোবা বা সেথা কহে। কোন স্মৃতির বা যুগাবতারের দেহাবশিষ্টের উপর ইহা সুরক্ষিত আচ্ছাদন ও স্থাননির্মিত। ইহার তিনটি নিম্নতর। তাহার উপর একটি চতুস্তম্ভ কক্ষ অক্ষকনা ধারণ করে। একটি গোলাকার গুহু এই কক্ষকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে। তাহার উপর কীলকাবর একটি শিখর। সর্কোপরি ধাতুসম শূণ্য। গুলগাম সিংহলের সর্ক-প্রথম দাগোবা। ইহা দেবানামপিয় ভিত্তের প্রতিষ্ঠিত ও ইহা বৃক্ষের দক্ষিণ জঙ্ক (collar bone) বহন করিতেছে। গুল-গামের পাশেই moon stone বা সূক্ষ্ম কাঞ্চিত প্রবেশ পথ (door step)। এখান হইতে মঠ আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে সোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। যখন এই ছ মহলা মঠশ্রেণী বাস্তব ছিল তখন অম্বরাধাপুরের আকৃতি কেমন ছিল তাহা অজ্ঞেয়।

করানওয়ালা সেয়া স্তূপগুলির মধ্যে সর্কোপেকা অধিক লক্ষ্য আর্জন করে। ইহাই বৃহত্তম স্তূপ এবং তৃতীয় শিরামিজ অংশো উচ্চতায় ও ঘনত্রে প্রোয়। কয়েক মাইল দূর হইতেই দেখা যায় ইহার বেতগাত্র নীল দিগন্তে লয়। ইহা বৃগতি তুতুকেমুখের কীর্ণি। একটির পর একটি দুইটি পূর্ণতন স্তূপের উপর ইহা পুননির্মিত। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র সসবরণ কীর্ণি। এই স্তূপ পাদমূল অর্ধাচরণায় বৃগতিবদ প্রতিবন্ধিতা করিয়াছেন। স্তূপ বেটন করিয়া আছে বৃহৎ পুষ্পবন্দী, তাহাতে ঞ্জকর্ষাণ, কার্ণিসে খোঁজিত গম্বক। আনুগিক সন্সারহেতু ইহার অবস্থা অজ্ঞাত পরিত্যক্ত স্তূপের জায় শোচনীয় ও দৃশ্যবিধারক নহে।

স্তূপের নিকটেই মঠের সারি, সাধুদের আবাস, এবং কতকগুলি moonstone ও নাগধারাল।

বৈজ্ঞানিকগি, গুহা গুহ ও ধ্বংস পূর্ণ কয়েকটি শিলাস্তম্ভের একটি বিরাট সমষ্টি। এখানে সিংহলের আদিম অধিবাসী বৈদ্যদের গুহা আছে। অরহতেরা যে সকল মন্থন প্রস্তর শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন তাহাও বর্তমান। একটি শিলা-স্তম্ভের উপর ছোট দাগোবাটি মনোমুগ্ধকর।

ইহুস্মরণীয়। এখানে অরহৎ মহেশ্ব ৫০০ ষ্টপার বা রাজপুত্রকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মকরতোষণের কাক-কাণ্ডটি বিস্ময়বহ। একটি গাধাধময় ধানী বৃক্ষ, অশ্বারোহী ও একটা প্রথমমূলক চিত্র ইহার ও পারায় প্রচলিত। ইহার অল্পত গিরিশিখরে একটি দাগোবা চিত্রাঙ্গিতের জায় শোভা পায়।

মিরিসমতীয় বৃহৎ দাগোবার মধ্যে অজ্ঞতম। ইহার কার্ণিস-গুলি অভুলনীয়। বর্তমানে ইহা ধ্বংসের করালগ্রাসে পতিত।

মহাসেনে নির্মিত জেতবনরায় স্তূপও পরিবেষ্টিত মঠক অম্বরাধাপুরের আর একটি সম্পদ। এই ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ১০টি মঠের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে সর্কোপেকা চিত্রাঙ্কক "Buddhist-railling"। ইহা সর্গীয় ও বৃগধার মন্দিরের পার্শ্ববর্তী Railing-এর ন্যায্য হ্রাক। ভারতীয় ভাষ্যের প্রভাব ইহাতে স্থানিষ্ঠ। নিকটেই ২৬ ফুট উচ্চ প্রস্তর ভোরণ ও বৃহৎ কক্ষ; এখানে একটি ২৮ ফুট বৃক্ষ মূলি ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার নিকটে Halpanu Ella অথবা পুরিত্যক্ত অন্ননির্গমন পথ ইহা drain ও হইতে পারে। জেতবনরায় সিংহলের খে বৃহৎ স্তূপ। প্রবেশ ইহা বৃহত্তম। ইহাতে অনেক নাগ ধারাল ও হুন্দর হুন্দর কার্ণিস—কাঞ্চকর্ষাণ আছে। নিকটেই jantaghar, conjeeboat, এবং mulutenge বা রায়ার আছে।

Kuttan Pokuna অথবা পুষ্করীদীঘ অম্বরাধাপুরে মধ্যে একটি হরম্য স্থান। ইহার দক্ষ শিল্পকৌশল মনে হারিনী। একটি সরসী এখনও প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। Outer Circular Rd. এর নিকট যে অরণ্যময় অক্ষ

তাহার মধ্যেও সাধুদের গুহার চিত্র, অল্পকর্ণ কাঞ্চকর্ষাণ খচিত ধ্বংসকর্ষ, গুহাধ্যাণ, ব্রহ্মচারিণীদের মঠ প্রভৃতি ধ্বংসকর্ষ ইত্যস্তক বিবিস্ত আছে।

ভট্টগামিনী অভয়ের কীর্ণি অজগিরি দাগোবা ও বৈদ্যল্য সস্ত্রাধারের মঠ আদিও তাহারে পূর্ণমাহাত্ম্য প্রচার করে। এই মঠের গর্ভগৃহ (imagehouse) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শুভশোভিত। নিকটেই একটি rocket বক্ষর গুহা ও ধ্যানগর্ভীর বৃহত্তম। বৃক্ষের সমুদ্রে দীর্ঘ পায়ালগি যাক্কদের আচরণ, নিয়ম পালন প্রভৃতির নির্দেশ দিচ্ছে। এখানেও jantaghar, নাগপ্রস্তর moon stone, আবাস, গির্জা ভরাণ, প্রভৃতি আছে। মঠের বক্ষিণে অজগিরি দাগোবা সগর্বে ১৩০ হত উচ্চ শির ভূমিয়া আছে। সৌন্দর্য্যে ইহা জেতবন রায়ের সমকক্ষ।

অম্বরাধাপুরের প্রান্তদেশে হইতে বিজয়রায় ও অশোক রায় দুই মাইলের মধ্যে। দুইটা পৃথক পথেই নানা ভাষা-শেষে পড়িয়া আছে। সিংহমুর্তি, প্রস্তরমুর্তিকা গঠিত মুর্তি ও কাঞ্চকর্ষ, মকরতোষণ, ত্বণমণ্ডিত মাটির চিপি, ইষ্টকনির্মিত বহুপুস্তান দাগোবা (প্রস্তর সন্সার রহিত) প্রভৃতি সামগ্রী ইহাদের অন্তর্ভুক্ত।

Malwater Oya নদী (পুরাতন কদম্ব) তীরে আদিম সভ্যতার নির্দেশ একটি বিচিত্র প্রস্তরসেতু দৃষ্ট হয়। এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব রমণীয়। দীর্ঘ বনপতি

তীরভূমিকে সৃজ ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। একটি ক্ষুদ্র-বীণ, তাহার পরই স্থর করিয়া চলিরাছে জলপ্রবাহ, তাহার উপর ভাসমান। এককালে ইহার ১০টি বৃত্তাকার শিলান ছিল, বর্তমানে দুইটি মাত্র অবশিষ্ট, তিনটি চূর্ণবিচূর্ণ, অপর গুলি সম্পূর্ণ বিধৌত হইয়া গিয়াছে। অন্যতমূহ আর একটি সেতুর আরও দৈর্ঘ্যাবস্থা। অতীতে কদম্ব নদীই অম্বরাধাপুরের বাসী বাগিচার কারণ ছিল।

পুর্নশিলাস্থল একটি হুর্শ্রম মঠ। ইহার গর্ভগৃহ মাঝে মাঝে উচ্চ হইয়া বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এতদ্ব্যতীত গর্ভগৃহ অম্বরাধাপুরের আর নাই। একটি একক ২০০ ফুট দীর্ঘ শুভ, বিচিত্র পাদমূল, ও কাঞ্চকর্ষিত ধ্বংসরূপ অতীতের এক অল্পদম মন্দিরকে কল্পনায় ভাস্বর করিয়া তোলে।

আজিকার অম্বরাধাপুর অতীতের সে মহিমাময় চিত্রের দাক্ষিণ বিস্তৃতি সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি এই প্রাচীন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবেন, তিনিই মানসচক্ষে ইহার সৌভাগ্য গিনে দ্রবণ করিয়া অল্পের আশাও পাইবেন। তপসে অধিবাসন কিছুই নাই। পোলোনাঙ্গা, সিগিরিয়া, মিহিন্-টেল, কাণ্ডি ও এজামশিখর নিজ নিজ ঐতিহাসিক সম্পদ ও খ্যাতি লইয়া আজও পৃথিবীর বিস্ময়কর্ষণ করে, কিন্তু ভারতবর্ষে ভীষণাখ্যাত বা পর্যটক যদি বারগঙ্গীতে পদার্পণ না করেন, তবে যখন তাহার উদ্দেশ্য অসমাপ্ত থাকিবে, মিহিন্-টেল ও যদি অম্বরাধাপুরের পূর্ণাভূমিতে বিচরণ না করেন তবে তাহার অভিমান বার্থ হয়।



SWIKA
"DOG"
BRAND

LINSEED OILS

THE FOUNDATION OF GOOD PAINTS AND VARNISHES. ALSO MANUFACTURERS OF CASTOR OIL, GROUND-NUT OIL, COCOANUT OIL, MUSTARD OIL, TIL OIL, AND OTHER VEGETABLE OILS AND DISINFECTANTS (Phenyle).

Phone : Cal 6171 :: SWAIKA OIL MILLS :: CALCUTTA.
(2 lines).

সংক্ষুব্ধতা

নিকুণ্ড পত্রী

অধর দৃষ্টায় ক্রুদ্ধ দেহাতীত মমমন্দাকিনী
স্তনগ্র-চূড়িত তব ঋটিকার হিরোলতা ছুটে
বিধের মালকে আজি কুহুমের ঘন অ'রাণ
সিদ্ধর তংগাবুল-ফেন ছুয়ে ক্রিম তটু'মি,
চিনেছো কি রূপমুগ্ধা পরিচয় পেয়েছ কি মন ?
ক্রান্তির মেঘর তটে বিভ্রান্তির বিদগ্ধ গিঞ্জিয়া ?
সংক্ষুব্ধ শংকার স্তরে নেমে আসে বিভ্রান্তির হাশি
আজ শুধু চকলতা চটুলতা, ভাল বাসাবাসি।
বলাকার ছিন্ন ক্রিষ্ট পাখাগুলি উড়ে উড়ে পড়ে,
রূপশীর কটিতে চন্দ্রহার বংকিম বিলোলা,
কামনার সৌধ চূড়ে বাতাসের দ্রুত মার্ত্তন—
নেমেএসো ধরণীর বেদনার বিবস্ত্র-কান্তারে।

এ দো পড়া নদ'বার মলিন গন্ধিত বীভৎসতা
জীবনের মজ্জাতলে সাহারার ধূধ বালুকণা—
মরণের উজ্জয়িনী বেদনার যক্ষা বহুগ্রাসে
ক্রিমে, হীম পরিপুষ্ট মানবতা, কাঁদিয়ে আক্রোশে
নিরুপায় ? নানা বন্ধু, এটা শুধু পাগল প্রলাপ-
ব্যর্থতার সম্ভারগণে—আত্মাহুতি বেপণু মনের
হে রূপশী মাদকতা ? তোমার কুটিল আঁখি হ'তে
অব্যাহতি পাবেনাকি কুধাতুর সন্তানের দল ?
বিধের পুঞ্জিত শাস্তি মন্ত'হার অগ্নি দাবদাহে
পুড়িয়া হয়েছে লাল, ছপুর রোদের মত ঘনতীর
বন্ধের কোঠর-তলে আজ নয় অনন্ত বিশ্রাম—
আজ শুধু অভিশাপ, প্রতিকার ভীত ব্যর্থতার।

এবার পূজায় নিপুল আহোজন,

পাল ব্রাদাস

উচ্চ শ্রেণীর প্রসিদ্ধ পোশাক বিক্রেতা

৭, ৮, নং চান্দনী-চক্, ৪র্থ গেটের ভিতর—কলিকাতা

বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় নারীর কর্তব্য

বেলা দে



আজ আমরা একটা নবযুগের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে
পিছন ফিরে তাকাব। এগিয়ে চলার পথে সকলের চেয়ে
বড় সম্পদ হচ্ছে অতীতের অভিজ্ঞতা—তাই 'চলুর চন্দ'
বলে বেরিয়ে পড়ার আগে পিছু ফিরে তাকাই। পর্দা এক
হাতে সরিয়ে দেখতে পাই সে দুঃখ—সে যেন কোন, ক্রমশঃ
উজ্জীলিত অবগতনের মত অপসারিত হয়ে এক নবরূপ
প্রকাশিত করে। স্বদুর অতীত পর্য্যন্ত চলেছে যে পর্দা—
দেখতে পাই তাতে নিজেদের নিজেকে—কোথায় সে
ব্যাবিলন! কোথায় মিশর! কোথায় রোম—কোথায়
আফ্রিকা—হস্তিনাপুরের অশ্বপুত্র যেন হাতছানি দিয়ে
থার ও অতীতে টেনে নিয়ে যায়। হুম্বর সে দেশ—মুগি,
ঋষি, তাপস-বালক 'ও হরিণ শিশুর দেশে দেবি সীতা,
সাবিষ্ট্রী, জ্যোতী, শকুন্তলা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে
সোথানে। অশ্বপুত্রের সে জড়তা ই বা কোথায় ও অধুনা
হলত ভীতি ই বা কোথায়! একটা আনন্দ যেন নারীকে
নির্ভর করেছে। সমাজে তার সমান অধিকার—জীবন
উত্তেগা করে নরনারী সমানভাবে; নারী ব্যক্তিতা ও নয়
অবহেলায় দুরীকৃত ও নয়।

তারপর পশ্চিমের গিরিসঙ্কটে বেড়ে ওঠে দস্যুর জয়ভঙ্কা।
ঐ দিশন্ত ধুজ্জর করে শত শত, সহস্র সহস্র দেশের সম্পদের
দিকে তত্বের লোভাতুর দৃষ্টি ফেলে এগিয়ে আসে—বিশেষ
শক। লুণ্ঠন, হত্যা ও রক্তপাত ভারত ইতিহাসে এক নতুন

যুগ আনয়ন করে। তত্বর রাজ লুণ্ঠনে পরপরকে পাজা
দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে 'সিকন্দর, তাইমুর, চেন্সিস,
মাহমুদ' পবে যোরা ও বাবর; সবলেই গেই এক মশ্বের
পুজারী। যে ভীতি সঞ্চারিত হল, নারীর শাস্তিগ্রন্থ মন
বাত্তে সস্ফুর্ভিত হয়ে গেল—নিজের ওপর ভরসা কমে গেল।
এল অশ্বপুত্রের রাজ্য, এল পরদা। কত শত বছর এই
অশ্বপুত্রের গুণ্ডাই না নারীকে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

আজ দীর্ঘের দীর্ঘ পর্দা অপসারিত করে, অবগতন তুলে
ফেলে নারী দিখালোকে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করছে।
এই বিশ্বের মাঝে দাঁড়িয়ে সমান আলো, সমান বাতাসের
দাবী করছে—কেউ বলতে পারে কি যে এ অত্যাচার? আজ
এক নতুন আশা, এক নতুন আদর্শের জন্ম জগতে জীবন
যুদ্ধ বেধেছে। যে পরিকল্পনা স্বাধীনভাবে জগতে আনার
জন্ম আমাদের পিতা, স্বামী, ভ্রাতা, দল দলে প্রাণ দিতে
এগিয়ে চলেছে—তার জন্ম কি আমাদের কর্তব্য কিছুই
নেই? যবে যবে কি ভূগ্ন আমরা নির্দান কর্তে পানি না?
রাশিয়া বা ইংলণ্ডের নারীদের দিকে তাকালে আমরা
দেখতে পাই যে প্রায় সব কাজে আজ নারী তার সাথীর
পাশে দাঁড়িয়ে সমান ভাগ গ্রহণ করছে। কোন বিশেষ
যুদ্ধে একদল পুরুষ আর একদল পুরুষকে পরাজিত করে কিন্তু
কোন জাতিতে জয় কর্তে হলে তার নারী-পুরুষ-আবাল-
বল-বাণিতার ক্রয় বণীকৃত কর্তে হবে। তাই এমন ক্রয়

আজকের দিনে নারীর কর্মক্ষেত্রের দ্বার নানানিকেই উন্মুক্ত রয়েছে। A. R. P. অথবা Redcross প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যোগের নানাভাবে সহায়তা কর্তে পারেন। বিশেষ

প্রকৃতি নর এবং নারীর কর্মভূমি ভিন্নভাবে
করেছেন; কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের কাজ করে
যায় তবে হৃদয়ের কর্মের পরিণতি একস্থানে মিলে শুভফল
প্রাপ্ত করবে সন্দেহ নেই।

না। না মোহা না। ভোলা পাঁচাৰে ধোয়াৰ এখন
না। না মোহা না। মাটি কৰে দিও না।" ঘৰেৰে অগ্নিৰ কোণ
কোণে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত ছোজ কৰে বল্লভ উল্লাস
সময়েই ঘোষণা দিলে, "বহনি! হল কোন ফালতহে গিয়ে-
না পাছ পুৰী—তাৰ বহু চহমে ত' আমাৰ অস্তিৰ হয়ে
গৈছে।" অগ্নিৰ কথা চাপা দিয়ে ভোলাৰ শব্দখনে
লক্ষ্য উঠিল সিগুৰেই ধোয়াৰ আঁচাল দেখিলে, "এ
বহু বাহনায় ভমবে প্ৰেত ভূতৰ গল্প। তাই যদি কান্ধ
না থাকে ত বহমে পাৰ, অম্ম কিছু চলবে না।" "অথবা
নাটকেই নিৰ্জলা গাটী untouched by the hand
of কণ্ঠ-একোৰেও আপত্তি নেই।" যোগ দিলে
কণ্ঠ-একোৰ। পিগাৰেট ধোৱাৰ খবৰতে, সৰলৰ দৃষ্টি
বহু হল কুমাৰেৰে মুখে, কাণৰ সাহিত্যিক ছাড়া কেই বা

কবে গল্প বলত পেয়েছে নিজের মন থেকে ঠৈকী করে।
কুমার এক্ষণ ঘরের এককোণে বসে সিগারেটের ধোঁয়ার
সিং প্রাকৃষ্টি করছিল। এখন সকলের দৃষ্টি তার চশমায়
আটক গেছে দেখে, কার্ক পেরলের ঠাইলে চেয়ে বসলে
আবেগে আশ্বে, "প্রেমের ত নয়ই, ভ্রুতেরও নয়, এ রকম
একটা গল্প শোনাতো পারি আজ তোমাদের যদি আপত্তি
না থাকে। গল্প টিক নয়, একটা পুরানো ডায়েরীর
কথেকথা তোমাদের পক্ষে শোনার, এ রকম আবহাওয়ায়
সেটা ভ্রমবে কিনা তোমারাই সেটা বিচার করো। পরে।
না, না, রাগে তোমায় হতভাঙ্গ হবার কিছু নেই, সম্পূর্ণ সত্য
ঘটনাই আমি বলছি। একজন বিখ্যাত চিত্রায়কর,—
নামটা তোমরা নাও বা শুনলে—জীবনের শেষের কয়েকটা
আধ্যাত্মিক পড়বে। এই ডায়েরীটা হস্তান্তর 'ধা নিবি ত্তা
দোষণসগর' কাছে থেকে আমার কেনা। গোপী, জানলাটা
বন্ধ করে দাও, বড় ঠাণ্ডা হওয়া আসছে। আর তোমার
আর একবার চাটী রিপিট করলে যুগী হবে। গোপী
উঠে গিয়ে খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিলে। বাইরের
প্রচণ্ড বৃষ্টি ষিগুণ যাকোশে জানলাধার গায়ে মাথা-খুঁজে
লাগল। ঠিক গুদের কানালার সামনের যেমত দেওয়া গ্যাসট
গলিটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার সিয় মিলে পোষ হঠাৎ গালিতে
বৃষ্টির জমা জমে ঢেট তুলে বাড়কে গতি জ্ঞাতত হলে উড়ল

পকেট থেকে একটা ছেঁড়া ভাইরী বার করে, কুমার গভীর ভাবে সেটার পাভা কটতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে সে বললে, "সবটা শোনাবার দরকার নেই; যেখান থেকে প্রয়োজন সেখান থেকে পড়ছি।" মাঝে মাঝে বার শেষ দরকার মত। আর নাম ধাম যে কাল্লানিক বাবুধার করব এ বোধহয় তোমাদের বলে দিতে হবে না।" চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে, কুমার কোণের ইঁচি-চোষারটায় গিয়ে বসল। কোটের কলারটা উল্টে দিয়ে রামহেতের ডিগে থেকে রাহু একটিন র' নন্দা টেনে নিলে নাকে।

"১৯শে জুন, ১৯—আজ আমার কোর্টে একটা বড় অদ্ভুত খুনের মামলা—এল। আসামী বলছে, সে নাকী নিজেই আনন্দের জন্য খুন করেছে। 'অনা' কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এরকম 'আবার' হয় না কি? খুন করে কেউ কি আনন্দ পায়? কি জানি, কিছু বুঝতে পারছি না। কাল বার দিতে হবে। কীসী কি ওর হওয়া উচিত?"

"২০শে জুন ১৯—কীসীই দিল্লাম লোকটার। কিন্তু টিক বিচার করলাম কি না বুঝতে পারছি না। মনটা ছাল নেই।

"২১শে জুন—নিখিল ভাবে কটলো আমার দিন। কোন নতুন খবর নেই।

"২২শে জুন—ভুতের মত খাড়ে চেপে বসেছে কথাটা, কিছুতেই মনকে মুক্ত করতে পারছি না। সত্যি কি মাহুর আনন্দ পেতে পারে খুন করে? দেখব নাকি একবার পরীক্ষা করে।

"২৬শে জুন—মন আমার বড় ঢকল হয়ে উঠেছে। কিছুতেই স্থির করতে পারছি না। শরীরও অস্থির লাগছে, ছুটি মনে ভাবছি কয়েক দিনের।

"৩০শে জুন—আঃ পাশের বাড়ীর ওই মেয়েটার পাখী-টার চীৎকার বড় অসহ্য লাগছে। আমার কোন কাজ করতে দিচ্ছে না। কেন ওটা অত চীৎকার করছে? পারে না কি কেউ গল্প খামচে? না, আমিই একে চুপ করাব। ওকে চীৎকার করতে আমি দেব না, দেব না

আমি ওকে ওর মনের আনন্দ বাস্তব করতে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যখন ভুতের কাতর হয়ে আছে, তখন সামান্য একটা পাখী কেন তার উদ্ভাস প্রকাশ করবে? হবে না, তা হবে না, আমি ওকে সে অধিকার দেব না।

ওরা জুলাই—পেয়েছি আজ পাখীটার। উড়ে এসে বসেছিল আমাবই জানলায় একটা আগে। আর একটা পরেই কেউ এটাকে খুঁজে পাবে না। ওই মেয়েটার মন হৃদয় চোখ যখন জলে ভরে যাবে পাখীটাকে খুঁজে না পেয়ে, ও তখন কি হৃদয়ই না ওকে দেখাবে। কি মজার না তখন। কিন্তু কি দিয়ে-মারি এটাকে! ছুরি! না ছুরি গলায় বসালে ত এখনি শেষ হয়ে যাবে। সে আমার ভাল লাগছে না। অনা কিছু চাই। ওর আশ্রয় আনন্দের সব শোধ তুলব আমি আঁধা। এই যে টিক হয়েছে! এই আলপিনটাকেই হবে.....কেননা! কেননা হয়েছে! তোমার ডাক একেবারে শেষ করে দিচ্ছি কি না আমি? তুমি তা' আর আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। উঃ হত ছটকি করোনা, কোন লাভ হবে না বন্ধ। বা: কি হৃদয়র লাল রক্ত! এ-এ যে গলগল করে বেরিয়ে আসছে। আরে আমার আদুলভণে কি হৃদয় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন চুপী দিয়ে গড়া। আঃ সামান্য একটা পাখীর রক্ত যে মাহুকের এত তৃপ্তি দিতে পারে কে জানত! আঃ! আঃ!!

৪ঠা জুলাই—কাল পাখীটাকে ওদের বাড়ীতে ছুঁতে ফেলে দিচ্ছিলাম। মেয়েটাকে কি কামা। আমাকে একে করলে—"তুমি কি জানে একে কাজ করছে? কার কি ক্ষতি করেছিল এই ছোট পাখীটা। কে একে মারল?" মনে মনে হাসলাম আমি 'কার কি ক্ষতি করেছিল? বোকা মেয়ে! নাই বা করলে কোন ক্ষতি, তাই বলে ও বিনিময়ে, আমি যদি একটা আনন্দ পাই কেন তা ছেড়ে হবে?"

"১০ই জুলাই—গার সি, কে, চ্যাটার্জীর কুকুরটাকে তারই বাগানে মৃত অবস্থায় কাল দেখে, তার বাড়ীতে বো একটা সোরগোল উঠল। আমাকে তিনি প্রশ্ন করলেন—

'কে এ কাণ করলে?' হায় রে! আমার কাছেই সকলে প্রশ্ন করে কেন? আমি মনে মনে হাসলাম শুণু।

২৪শে জুলাই—বিকলে চিন্ময় বেড়াতে এসেছিল আমার কাছে, ওর মেয়েকে সঙ্গে করে। তার কোলে ছিল ওর পোষা আদরের খেড়াল 'ছবি'। হায়, তোমারা আমার কাছে কেন এলে 'ছবি'কে নিয়ে? তার ফলও তাই ভোগ করতে হল তোমাদের। যাবার সময় ছবিকে দেখা গেল গেটের পাশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। মাথাটা তার একেবারে ভেদে গেছে। ওরা বুঝলে না কি করে ভেদেছে কিন্তু আমি জানি। আমাকে বেশী কষ্ট করতে হয় নি। কীচা ভাঙ্গা হাড়ডিক্টাইটে কাজ হয়েছে। চিহ্নর মেয়ে কীচছে দেখলাম। চিহ্নর চোখ তটো ছলছল করছে। আজ তোমাদের চোখ কীচছে বটে, কিন্তু এ নেশার বার যদি পাও তা' আর তোমারা কীচবে না। এ বড় ভাণ্ড, বড় ভীরা নেশা।

৩০শে জুলাই—পাড়াঘর বেশ একটা ভয়ের সাড়া পড়ে গেছে কেন। সকলের মতই একটা আতঙ্কের ছাপ লেগে গেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, একটা প্রতিকারের জন্য কিছ্ণ ঘর ওরা জানে না যে, আমি কি করব! শয়তানের কাছে ওরা ওদের মিনতি জানাক, ফল হতে পারে? আমি কি করব। ওরা ত জানে না, কি অধম আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে আমার মধ্যে, কোন জীবন্ত প্রাণী দেখলেই তাকে শুদ্ধ করে দিতে। মাহুর দেহলেই তার গলা টিপে ধরতে কি অসীম আগ্রহ আমার হয়, ওরা তার কি বুঝবে। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে আমার নিজেই গলা টিপে ধরতে, ইচ্ছে করে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে।

৩রা আগস্ট—রাত পৌনে একটা। ভারী মজার একটা ঘটনা ঘটে গেল আজ। বিকলে বার হয়েছিলাম পথে আজ অনেক দিন পরে। উদ্বেগহীন ভাবে চলতে চলতে গিয়ে পড়লাম একা সন্ধ্যা গলির মাঝে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী পদার্থটা কণা-কণা হয়ে আসছে তখন। দেখলাম ভারী হৃদয় একটা শিশু চলছে একলা টলতে টলতে।

'কে এ কাণ করলে?' হায় রে! আমার কাছেই সকলে প্রশ্ন করে কেন? আমি মনে মনে হাসলাম শুণু।

২৪শে জুলাই—বিকলে চিন্ময় বেড়াতে এসেছিল আমার কাছে, ওর মেয়েকে সঙ্গে করে। তার কোলে ছিল ওর পোষা আদরের খেড়াল 'ছবি'। হায়, তোমারা আমার কাছে কেন এলে 'ছবি'কে নিয়ে? তার ফলও তাই ভোগ করতে হল তোমাদের। যাবার সময় ছবিকে দেখা গেল গেটের পাশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। মাথাটা তার একেবারে ভেদে গেছে। ওরা বুঝলে না কি করে ভেদেছে কিন্তু আমি জানি। আমাকে বেশী কষ্ট করতে হয় নি। কীচা ভাঙ্গা হাড়ডিক্টাইটে কাজ হয়েছে। চিহ্নর মেয়ে কীচছে দেখলাম। চিহ্নর চোখ তটো ছলছল করছে। আজ তোমাদের চোখ কীচছে বটে, কিন্তু এ নেশার বার যদি পাও তা' আর তোমারা কীচবে না। এ বড় ভাণ্ড, বড় ভীরা নেশা।

৩০শে জুলাই—পাড়াঘর বেশ একটা ভয়ের সাড়া পড়ে গেছে কেন। সকলের মতই একটা আতঙ্কের ছাপ লেগে গেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে আবেদন জানাচ্ছে, একটা প্রতিকারের জন্য কিছ্ণ ঘর ওরা জানে না যে, আমি কি করব! শয়তানের কাছে ওরা ওদের মিনতি জানাক, ফল হতে পারে? আমি কি করব। ওরা ত জানে না, কি অধম আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে আমার মধ্যে, কোন জীবন্ত প্রাণী দেখলেই তাকে শুদ্ধ করে দিতে। মাহুর দেহলেই তার গলা টিপে ধরতে কি অসীম আগ্রহ আমার হয়, ওরা তার কি বুঝবে। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে আমার নিজেই গলা টিপে ধরতে, ইচ্ছে করে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে।

১০ই আগস্ট—সেই যুবকের আজ কীসী হয়ে গেল আমার বিচারে।

২০শে আগস্ট—বিকলে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে। মনে হচ্ছে এ যেন আর থামবে না কোন দিন। আজ বৃষ্টি মহাপ্রাণ। আমার সব পাশের বিচার আজ হবে না কি? হুঃ হুঃ (বিশি) লাগেছে শরীরাটা। নিশ্চয়ই রাতে বড় একলা মনে হচ্ছে নিজেকে। কত বেজেছে? ওঃ মায় পৌনে এগারোটা। সবাই কি এখন ঘুমের কোলে নিমগ্ন? আর শুণু আমিই জেগে আছি? ওঃ আর পারছি না। আমি ঘুমোব। হে ভগবান! আমি য় একটা করুণা কর। আমাকে ঘুমোতেই হবে। কি আশ্চর্য, কামাবার কুরটা এই টেবিলের ওপর পড়ে কেন? ইমঃ কি অজ্ঞান। এটা ভুলে রাখি। Sweet sleep. মনে হচ্ছে জয় জয় আমি যেন জেগে বসে আছি। আমাকে ঘুমোতে হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটা ঘুমের অস্থব। টিক হচ্ছে

এই আমার যুগের ঔষধ। একেবারে চিরনিদ্রা। কোন দিন ভাঙবে না। ঠিক হয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ—
ভাইটীটা এখানেই শেষ হয়েছে। কুমারের পড়া শেষ হলো, সমস্ত ঘরটা হঠাৎ নিস্তব্ধতার মাঝে ডুবে গেল। একটু পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিখিলেশ বললে, “কিন্তু শেষকালে কি হল বিচার্যুত্তির?” গভীর গলায় কুমার উত্তর দিলে, “পরদিন সকালে তাঁকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর কামাবার কুরে তাঁর গলাটা একেবারে চেরা।”

বিশী আশ্চর্য করে একটা হাই ডুলে রাজু বলে উঠে “কি বাবা, বুড়ি খামলো? রাত যে এদিকে রবাবের মত বেড়েই চলেছে। এখনও বাড়ী না গেলে, বাড়ী থেকে ভাড়িয়ে দেবে যে বাবা!”
তার কথায় সকলেরই দুটি পড়ল ক্লাবের ঘড়িটার দিকে দেখা গেল এগারোটা বাজতে শোনেবোঁ মিনিটে ঘড়িটা ক হতে গেছে।
‘অগ্রগামী’ ক্লাবের অগ্রগামী সভাপতি একে একে সকলে পলের মাঝেই নেমে পড়ল বুড়ি মাথায় করে। *

* মোশাশার একটি বিশ্রামের সঙ্কল্প-অভ্যুত্থান।

সন্ধ্যা

শ্রী বিমল কর।

বোধিকুজের শাখার পরতো
করিয়া গিয়াছে বেলা,
তবু পান্থ! পথ প্রান্তে
খেলিছ কিসের খেলা?
উত্তল সিদ্ধ আপনার মনে
ভাবিয়াছে কারে জানি,
বন মন্দির আধারের কাছে
কী যে করে কাণাকাণি?
আকাশের তলে পাগল বাতাস
কত কিসে কয়ে গেলা,
কদমে পলাশে জিজ্ঞাসে তারে
সে কি এলো? সে কি এলো?

ত্রিকাল

লজিকা দত্ত

লক্ষী উঠনে ভাল চাপাইয়া পার্শ্বের ভাড়ার ককে এক-
খানা বই-লইয়া পড়িতে বসিল। বইখানা শরৎবাণুর
‘পরিণীতা’। পূর্বে একবার পড়িয়াছে। হাতের নিকট
আসিয়াছে বলিয়া পুনরায় লইয়া বসিয়াছে।

দেবর মৃণীন্দ্র রায়চন্দ্র ও ভাড়ার ঘরের সম্মিলিত
ছোট অলপটুকু অতিক্রম করিয়া তাহার শয়ন ককে প্রবেশ
করিল। ঘাইতে ঘাইতে রত্ননগরে তথাক দৃষ্টিপাত
করিয়া কহিয়া গেল, “উঃ, ভালপোড়ার গন্ধে সারা বাড়ী
ভরে গেল। ভাল ত অপার হয়ে গেল।” লক্ষী প্রথমটা
চমকিত হইল। পরে বইখানার খবর হইল সে সধ্য ভাল
চাপাইয়া আসিয়াছে তখন সে একটু অপ্রতিভ হইল।
সঙ্গারের পটিনাটিতে সঙ্গল ব্যাপ্ত না থাকিয়া গৃহলক্ষী-
সের কেতাব লইয়া বসিয়া থাকার ব্যাপারটা মৃণীন্দ্র পবি-
পাক করিতে পারে না। অনাগতক কানার দৃষ্টিতে
আকিরা লক্ষী সতর্কতা অবলম্বন করিল।

কিন্তু আহা! বসিয়া মৃণীন্দ্র ভালের পোড়া গন্ধে এক-
বার নাসিকা কুঞ্চিত করিল। বলিল, “নিজা এমন ভাল
খবিয়ে ফেললে কুন্নিগুণি করে কি করে মাহুখ?”

অগ্রজ কহিল, “ভাল আবার কবে বরলো?”
“আপনার নাকে তো এ গন্ধ লাগবেই না!”

উজ্জ্বল এমন স্বপ্নষ্ট কুংসিত ইন্দ্রিতের পরে অগ্রজের
আর কথা কহা হইল না।

কিছুক্ষণ পরেই মাছ মুখে দিয়াই পুনরায় এক চত্বার—
মাছে লবণ দেওয়া হয় নাই কেন?

এইবার ভাতৃপুত্রী লীলা কহিল, “আর ছুপ দিলে যে
কটা হয়ে যেত!” সে রত্ননের সময় কোল চাখিয়াছিল।
মৃণীন্দ্র বলিল কোলের উল্লেখ সে করে নাই। মাছের
ভিতরে লবণ যায় নাই। সব মেমসাহেবের দল। এমন
অবহেলার সহিত খাদ্য প্রস্তুত লাটসাহেবের গম্বীও করে
না।

লক্ষীর কল্পনা রূপ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বৈত নয়!
সে নীরব রহিল।

অপরাজেবের দিকে জুতা পায়ে দিতে গিয়া একজোড়া
নতুন ফ্র্যাঙ্কল মৃণীন্দ্রের নজরে পড়িল। লক্ষীকে উদ্দেশ
করিয়া কহিল, “আপনার পুরাতন ফ্র্যাঙ্কলটা যেন কিছুই
হয়নি। মৃতি ভেঙ্গে সেলাই করে নিলেই হতো। Stand-
ard of living যা বাড়াজেনা!” পুরাতন ফ্র্যাঙ্কল কিছুই
ছিল না উপরন্তু মৃণীন্দ্রের চারি ফ্র্যাঙ্কল জুতা। মৃণীন্দ্র বলিয়া
চলিল “খাওয়া দাওয়াও এখানে এমন নবাবী হালে হচ্ছে
ওদিকে বাড়ীতে সব অনাহারে থাকে।”

সেইদিনই সন্ধ্যায় একটা ভাল ছবি আসিয়াছে বলিয়া
লক্ষী দেখিতে গেল। বরাবরই রাব্রির আহারের পাট
বিলম্বে আরম্ভ হয় এবং বিলম্বে শেষ হয়। সন্ধ্যার ‘শো’
দেখিয়া আসিয়াও তাহা আরম্ভের পূর্বে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা
সময় পাওয়া যাইবে— কিন্তু মৃণীন্দ্রের কি সেইদিনই
সন্ধ্যা আহারের স্বাস্থ্যাহমোদন মনে পড়িল? গৃহে প্রত্য-
বস্তন করিয়া দেবিল অনর্থ বাসিয়াছে। লাটপট্টরাও নাকি
এমন বিলাসিনী নহে। বিবাহের পূর্বে কত ছবি দেখি-

হাছে তাহা মূখীঃ জানে। জানিবে না কেন? লক্ষ্যীরা দরিদ্র সে জানাই যে বৃহৎ জানা। উপরন্তু এমন বাবীরা ভাবে চলাকোরার কী অর্থ? ও, পরিবারের সকলেই কৃত্তী উপরিতন যখন সম্বন্ধি দিয়াছে তখন দরকার শেষ নহে।

লক্ষী অনভিবিধে আহার্য দিলে আহার্যন্তে ময়রহীন কাকিকটা সাজিয়া মূখীঃ বাহির হইয়া গেল। তাহার ধ্বান্দ্বলিত কৃষ্টিত বৃত্তীর ভাঁজে ভাঁজে প্রগতি লীনাচল। কিন্তু এই বে পীড়ন সর্কারিক হইতে ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? লক্ষী ভাবিল।

তোমার মনে নহে। কেন না এই তো সবে উপলব্ধি যুগ। এখনই প্রতীকারের বিলাপ কেন? জান না, এই উপলব্ধি অস্বস্ত অসন্তোষ যুগ যুগ ধরিয়া অগণিত অশ্রুরে ধুই উপলব্ধি করে। পরে এই অহুত্বিত এমন তীক্ষ্ণতা ও ব্যাপকতা লাভ করে যে-এই দুঃখাশি আল বিলীর্ণ করে। পরিবর্তনের বীজ চেতনাত্তে সবেমাত্র উক্ত হইয়াছে। তোমার ভ্রুতগা সমাজ ছোড়া এমন একটা আনন্দ পরিবর্তনের অপরিহার্য আদি ক্ষতিতে (inevitable initial loss) সাহারা জঙ্ঘর হইবে তুমি তাহাদের অন্যতম। বীজ বপন করিলে কিন্তু ফললাভের দীর্ঘায় তোমার নহে। হোবের তুমি পুরোহিত, ফললাভকারী অশ্রুরে। হোমার চিত্তায় প্রগতির উক্ত সবেমাত্র অরুণ আলোর আভাসপাত করিয়াছে। জান না কি, চতুর্দিক যখন প্রগতিতে সাদ্যাহীন, তখন তোমার মত অবলার চিত্তায় ইহার আবির্ভাব অশেষ বয়সার উৎস? বয়সার দীর্ঘায়দ্যবৃত্তি এই ধারণার মূল যে বতকালের জলসিকনের ফল হ্রুত, বিবৃত। ইহা কি এত শীঘ্র উৎপাটিত হইবার?

অরিন্দমের অগ্রজ সাক্ষ্যবিহারের নিমিত্ত গাজীতে উত্তীর্ণার সময় প্রকাশ করিলেন, "অহুজাকেও নিলে হতো না। সাদ্যাদিন ঘরে থাকে।"

"নিশ্চয়ই সে তো উক্তয় কথা।" উৎসাহে যুগ কালী করিয়া অরিন্দম পশ্চৎ ফিরিল। অগ্রজের কথা শুনিয়া

সে দূত নিশ্চয় হইল অহুজা-ই দাদাকে এই ময়ে দীক্ষিত করিয়াছে। বিবাহের পরে দাদাদের ব্যক্তিধ থাকে না তাহা হইলে! ব্যক্তিবিশেষের নিকটই লোকের প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায় এবং অবিরাহিত কনিষ্ঠের নিকট বিবাহিত জ্যেষ্ঠের গুণ প্রচ্ছন্ন থাকে না। অরিন্দম ভাবিল অহুজার কী বিবেচনাই নাই! অরিন্দমের বৃদ্ধ পিতা গৃহে আছেন। মোটরের হাওয়াতে তাহার আবার কানি বৃদ্ধি পায়। এমন বুদ্ধকে একাকী ফেলিয়া ভ্রমণ! সে ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ানাই কষ্ট হইল। কষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় সন্দেহ অরিন্দম যখন এখানে থাকে না তখন নিশ্চয় অহুজা বুদ্ধকে ফেলিয়া বামীর সহিত ভ্রমণে বাহির হয়।

কিন্তু বৌদির সমুপে পড়িয়া অরিন্দম প্রীত হইয়া কহিল "তুমি নাকি ঘায়ে? চল।" যেন অহুজা পূর্ণ হইতে জানে। এমনই তাহা সে কথা কহে। কারণ তাহা হইলে অহুজা সমুদ্রে ফলপূর্ণে গঠিত ধারণার সত্যাসত্য প্রমাণিত হয়।

অহুজা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"
"কেন, বেড়াতে।"
"তুমি পাগল-স্বপ্নেছো, এই বুদ্ধকে একাকী রেখে?" বলিয়া যুগ টিপিয়া হাসিল। অরিন্দমের কথার ভঙ্গী তাহার নিকট অর্থভ্রমার মত চৈকিল। সে অরিন্দমের উভয় সশব্দেই হ্রস্বতর করিল। কিন্তু বলিল না। অরিন্দম চতুরতার সহিত কথা বলে অবজ্ঞা কিন্তু তাহারও inferiority complex আছে। একদা অহুজার উপস্থিতিতে কদাছলে কাহাকে বলিতেছিল 'মেয়ে মাহুয়ের বেশী বুদ্ধি ভাল নহে।' অরিন্দম কিন্তু অহুজার বুদ্ধিতে কর্ণপাত করিল না। কহিল, "আহা, তা চল না। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমরা নয় আজ শীর্ণগীর ফিরবে।"

অহুজা ভাবিল পরীক্ষা এখনো শেষ হয় নাই। বলিল, "না। আমার সমুদ্রে তোমাকে আনন্দ দান করে যে কি আমি জানি না, কিন্তু কি করবে?"

কথা শুনিয়া অরিন্দম কুপিত হইল অগ্রজ অন্তরে। মুখে বলিল, "তোমার নিকটে বাবা থাকলে সত্যি একে-বারে নিশ্চিন্ত থাকি।"

মাছের পরের উপরে যায়ই শুনিয়াছিল কিন্তু নিজে যা যা কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা এমন নিশ্চয় পূর্বের স্বপ্নে ছাড়িয়াও দেয় তাহা হইলে।

অহুজা গেল না বটে অরিন্দম কিন্তু নিঃশব্দে হইল না। সে দাসীকে এক সময়ে ডাকিয়া কহিল, "তোমার মাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেই পার। সাদ্যাদিন ঘরে পড়ে।"

"বান তো।"
"ওঃ নিয়মিত যান তাহলে! বেশ, বেশ।"

দাসী 'নিয়মিত' শব্দার্থ বুঝিল না। বলিল, 'হাঁ।' কিন্তু কবীর জ্ঞান ছোটবাবুর জ্ঞানও প্রীতিটাকে আসিয়া মায়েব নিকট বিরত করিল। অহুজা বুঝিল। এই লোকটার পরীক্ষা করার একটা ঝোঁক (tendency) আছে। এই সশব্দ তাহার নিজের স্বপ্নের কটকট না হয়।

অহুজা সেদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সামান্য শিরঃপীড়া অনুভব করিল। বৃদ্ধ পুত্রের প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হইলে তাহার হস্ত যুগ প্রক্ষালন করিয়া সে দাসীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। এবং অর্ধঘণ্টাপ্রায়ের বাদে প্রত্যাবর্তন করিল। ভোরের বায়ুতে মাথাটা ভাল বোধ হইতেছে। আসিয়া দেখিল অরিন্দম শয্যাভাগ করিয়াছে অহুজা ভ্রুতাকে কহিল, জল দিয়েছিলি তো?" নিজা ভ্রুত শয্যাতেই অরিন্দম একসঙ্গে জল পান করে। সে নিজে জল রাখিয়া যাইতে কুলিয়া গিয়াছিল।

"দিয়েছিলাম।"
অহুজা প্রাতঃকৃত্যের মনোনিবেশ করিল।

একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমরা নয় আজ শীর্ণগীর ফিরবে।

"বিটা আবার কোথায় গিয়েছিল?"

"আমার সঙ্গে।"

"ওঃ।"

অরিন্দম আসিল। বলিল, "এমনই রোজ যদি প্রাতঃ-অমণ কর'তো শরীরাটা বেশ মারে তোমার।" বাস্তবিকই সাদ্যাদিন ঘরে বদ্ধ থাক। তোমাদের বড় কষ্ট।"

অহুজা কহিল, "দরিদ্রকে পাশ্চাত্য-পথেতে দেখে রাষ্ট্রার যেমন অহেতুক ভ্রূণ হয়েছিল। আজও যেমন না। মাথাটা ভাল বোধ হচ্ছিল না তাই গিয়েছিলাম। জল সময় মত পেয়েছিলি?"

অগ্রজের উপর হাড়ে চটিয়া অরিন্দম কহিল, "দাদাটাই নয় নিমিনি, তা'রলে জলটাও কি ভরতে পারবে না?"

অরিন্দম কোপের অধিকারে ভাবিয়াছিল উত্তর দিবে না কিন্তু পরশুণেই হ্রদয়ঙ্গম করিল কথা কহিয়া গুরুত্ব হ্রাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

অহুজা কহিল, "অনভ্যাশে 'সুস্থ কাজও বৃহৎ হয়ে দেখা দেবে এবং অনিচ্ছার উদ্বেক করে।"

অরিন্দম কঠে উত্তরে ঢালিয়া মুহূর্ত্তে কহিল, "কিন্তু তোমার মাথায় কি যুব বেশী যত্ন হচ্চে?"

"না।"
"তা হলে আজ আর উদ্যানের ধারে কাছে দেও না।"

"জীতির আবার এই আর এক উপসর। যতবার যতবার পরিমাপটা কখনো দেখতে পায় না।" অহুজা হাসিয়া কহিল।

কথা শুনিয়া ও হাত দেখিয়া অরিন্দম বোধ হয় মনে মনে কহিল, "মেয়েমাহুয়ের অধিক বুদ্ধি ভাল নহে।"

আহারের বসিয়া অরিন্দম কহিল, "মাছের কোলটা কিন্তু ভালো ঠিক তোমার মত রাধতে পারে নি।"

অগ্রজ মন্তক কুলিয়া কহিল, "ভোলা কেন?" তুমি রাধো নি?"

অরিন্দমের জরয়ে পটকা বাবিল—বৌদির শিরঃপীড়া দাদা জানে না? পরশুণেই ভাবিল বৌদির সব চতুরতা।

মুখে বলিল, আপনি তো বৌদির খোঁজ নেন না। সকাল থেকে মাথাব্যথা কষ্ট পাচ্ছেন।

"সে কি।"

অহুজার একবার ইচ্ছা হইল অবিন্দমের কথাই সৌধকে একবারে ভূমিসাৎ করে কিন্তু তাহার ফল ভাল হইবে না। তাই অবিন্দমের কাছে বিদায়ের কৃত্রিম সহায়কৃতিটাকে বাধা করিবার চেষ্টা করিল, "আহা, ঠাকুরপোরা তাতো আনন্দ দের না।"

অবিন্দম মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির উপরে শক্তি হারাইল।

অহুজা গিল গিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ঈশ, আবার রাগ হচ্ছে।"

অবিন্দম ইতিমধ্যে ভ্রম সংশোধন করিয়াছে। কহিল, "তোমার অহুজে আনন্দ করার-ই ছেলে কথা আমার।"

শব্দে অহুজে আনন্দ, হলেও সুকিমান প্রকাশ করে না। সে কথা নয়। আমার অহুজে তোমার আনন্দের কথা তো বলছি না। বলছি, আমার অহুজা, দাদা খোঁজ গবর নিচ্ছেন না, ভূমি খোঁজগবর মাত্র নয় ব্যবস্থাপক পর্যায় করলে। দাদার বদলে ভূমি বিয়ে করলে পারত।"

স্বীকারের এত বুদ্ধি 'ভাল কি?' অবিন্দমের ভিতরে অপ্রত্যাশিত হইল।

অহুজা কহিল, "মাছের কোল আমিই বেঁধেছি।"

অবিন্দম-সমিবার নহে। কহিল, "তোমার দেহের অহুজা তাতেই প্রমাণিত হয়।"

অপ্রত্যাশিত নহে—হাইবার পূর্বদিন অবিন্দম অহুজাকে ডাকিয়া ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা আরম্ভ করিল। পিতার প্রসঙ্গ উঠিলে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, এই বৃদ্ধদের লড়াই আর এক জালা। সর্দার আওয়ালি থাক। নবীন বয়সটাই হইল সব কিছু আনন্দ-আশ্বাসের সময়। তাহাকে তখন এই বৃদ্ধদের জ্ঞান নিবৃত্ত রাখিতে হইবে। অহুজা যেন নিয়মিত ভ্রমকে, চর্চিতে যায়। কেননা যে সময় চলিয়া যায় তাহা আর প্রত্যাবর্তন করে না। পিতার আহার পরিচ্ছদের কষ্ট না হইলেই হইল।

অহুজা মনে মনে কহিল, idea একটু radical কিন্তু

আদর্শনপন্থী। নিজের জ্ঞান অহুজার ও পরের জ্ঞান বহুতারা বৃদ্ধ। অর্থাৎ গানের চরণ মুখস্থ করিয়াছে হয়, হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। He can say but cannot be said. অহুজার মুখে এই idea শ্রবণমাত্রে অবিন্দমের মরিতে ইচ্ছা করিল।

এমন কি অবিন্দম তাহার জীবনের একটি প্রেমের কানীয়েও প্রকাশ করিল। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধির অহুজার স্নেহে ভাসমান অবিন্দম প্রকাশে আর বাধিল না। বলিল যেহেঁটা ১৯০০ সনে সরোজিনী বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়িত—নাম হেমপ্রভা দাসগুপ্ত। শ্রবণে অহুজা মনে মনে হাস্য করিল। অবিন্দমের উদ্দেশ্য নয় হইয়া পড়িল। উল্লিখিত বিদ্যালয়ে সেই বয়সে সেই শ্রেণীতে অহুজা পড়িয়াছে। হেমপ্রভা নানী কোন সৌন্দর্য পায় নাই। অবিন্দমের অহুজাকে ঘনিষ্ঠতা দ্বারা প্রীত করা—তাই এই মিথ্যার অবতারণা।

অহুজা ইচ্ছা করিয়া প্রতিবাদ করিল না। কেননা আত্মবুদ্ধিজ্ঞানী অবিন্দম নিজের বুদ্ধিহীনতা কখন পরিপাক করিবে না—আর রাগবিহারীও ভ্রম করিয়াছিল।

অবিন্দম গাড়ীতে উঠিলে অহুজা কহিল, "তোমার পরিবর্তে খিটাকে আমি-ই বখশিশ দিয়া দিয়াছি।"

মুহূর্তে অবিন্দম বরফ হইয়া গেল। নামিয়া পড়িয়া কষ্টকে সন্ধ্যা করিয়া কহিল, "কিসের বখশিশ বৌদি?"

"ওরা তোমাদের মত প্রবাসী লোকের নিকটে এটা প্রত্যাশা করে কিনা?"

"না না। বখশিশ আবার কি?"

অহুজা সখরে হাসিয়া উঠিল, "পাগল আর কি? ওরা সময় সময় আমাদের যা উপকার করে তার ভুলনায় বেতন কিছুই নয়। বখশিশের মত সামান্য দান ও অকিঞ্চিৎকর।"

বুদ্ধির এই সংঘাত বড় জালাময়ী। কেননা অহুজার করে সব বলিবার সাধা নাই, প্রমাণ কোথায়?

অহুজার চোখের একটা তীর আলো অবিন্দমের দৃষ্টি

এড়াইল না। মনমুগ্ধ কবীর মত কথা নামাইয়া গাড়ীতে দিয়া বলিল। মনে মনে কহিল, 'মেয়েমাছের বৈদ্য বুদ্ধি' জ্ঞান নয়।'

লক্ষীর অহুজার মূমরাশি অহুজার রূপের অতিশয় ঘনময়ান। মূমির মত অবিন্দম কৃত্রিম প্রগতির স্রোতে ভাসমান নহে। সে আসল প্রগতির নব্য সভা। পঙ্ক-প্রাণের বলক সহরে আসিলে যেমন দুই দিকের পক্ষ মেলে তেমনই সে নতুন চতুর হইয়াছে। বাক্যে আর বিশ্বাস নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধিভাবে বাক্যাতীত মনের পরিচয় গ্রহণে উদ্বৃত্ত। তাই এমন সংশয়ের জালা, বাক্যের গাঁথুনি, মুক্তি অবতারণা। সর্বোপরি বুদ্ধির তিনদিকে নিজের মনের উপরে ক্রম পড়া টানিয়াছে। কিন্তু ভিতর বাহির এক কি?

অহুজা ভাবে, সংশয়ের কীট প্রীতির কোরককে বিনষ্ট করিল। যে এমন করিয়া সংশয়ের প্রবাহকে জাগ্রত রাখে সে কি অহুজা পাহারা হইতে নিজেও অব্যাহতি পায়। বলে, এখনো আমাদের যথেষ্ট সাহস হয় নাই এবং তোমাদের ধারণায় এখনো আত্মদেহপন্থীতার বর্জমান, নতুবা এই ঠাকি ভূমিসাৎ হইত।

ছেলেদের প্রগতি। বধূরা আবহমান কাল হইতে সমালোচনার সামগ্রী। প্রগতি এখন বসনায়, হৃদয়ে নহে। মুন্সের আসে নাই। তাহার বখচক্কের নির্ঘোষ শব্দা যায়।

বেলা প্রায় আট ঘটিকা। ভূতা আসিয়া দ্বারপ্রান্তে গড়াইল। ভূতা মাংস ব্যতীত আসিয়াছিল। ভূতের উপরে অহুজা ছিল শিখ হইলে যেন ভূতকে আশ্বাস করে। ভূতা বহন কর্তৃক উদ্দেশ্যে প্রাণ প্রদান করিল।

মাংস রান্না সমাপনাতে সে প্রতীক্ষমান দেবের পুরককে চাখিত দিল। পুরক প্রথমবার আহার গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিতে পাবিল না খোঁলটা আরও গারির কিনা। ভূতা বিড়িয়াবার মাংস প্রদান করিল। বিড়িয়াবারে পুরক বৃষ্টিয়া উঠিতে পাবিল না লবণ সঠিক হইয়াছে কিনা। ভূতা ভূতীয়ার মাংস দান করিল। চাখিয়া পুরক বৃষ্টিতে

অক্ষম যে আরও দি গালা ব্যাহত হইল কিনা। এইবার ভূতা বৃষ্টি হতে পুরককে তাড়া করিল। পুরক একদিকে কক্ষ বহির্ভূত হইল।

আচমনান্তে পুরক তাড়া দিল "বৌদি জলদি।" ভূতা ভূতাকে বহন বাধিবার নির্দেশ দিয়া হাত মুখ দুইয়া দিতে উঠিয়া গেল।

ভূতা একটা টিলা পায়জামা পরিধান করিয়া রেকটাউ-কলার অহুজা কলারমুত একটা বেজি কোট পরিল এবং দর্পণের সমুখে গড়াইয়া বেশ বিন্যস্ত করিতে লাগিল। কবীর বালাই নাই। কেননা লম্বা বেশ ভূতা একবারে পছন্দ করে না। তাই ছোট করিয়া দাঁটা। এমন সময়ে বাহির হইতে পুরক ডাকিল, "বৌদি হ্যাঁয়ো?"

"হ্যাঁয়ো এসো।"

প্রাকটিক প্রবেশ করিয়াই পুরক কহিল, "সুটটা তোমায় বেশ মানিয়েছে।"

"এবার থেকে সাজী 'বয়কট' করো। ভাবছি।" ধামিয়া কহিল, "কিন্তু 'ফটো' যদি ছিক আমার মত না হয় তবে—"

"ঠিক তোমার মত হ'লে যে আবার পছন্দ হবে না।" চিকিৎসা রাখিয়া পুরকের প্রতি কৃপিত দৃষ্টিপাশ করিয়া কহিল, "বাও, আমি ভুলবো না ফটো। রূপের কাজিকটী একবারে।"

"না, না। আমি যদি আর সভা কথা বলি।" "আবার!" ভূতা খুলিবার জন্য কোঁচের বোতামে হাত দিল।

পুরক দৌড়াইয়া গিয়া হাত চাখিয়া ধরিল। কহিল, "বৌদি, লক্ষীটা আর কদাশি এমন কৃত্রিম না।" ভূতা পালঙ্কের উপর বসিল।

পুরক পুকেট হইতে রাখি বাহির করিয়া ভূতাকে বলিল, "দেখি বিছাওগুস্ত উর্ধ্বশীল রামহাভ্যন্তর।" "কেন রূপাভ্যন্তর দক্ষিণ হতে অকচিৎ কেন?" "ওটা দাদার জন্য থাক।" বলিয়া ভূতার রামহাভ্যন্তর টানিয়া লইল।

তু ভলিল, "এ আবার কি।"

"আজ রাশি পুনিয়া।"

"তুমি এসেছো আমার হাতে রাশি পরাতে?"

"কত কি?"

"হতেন যদি তোমার দাদা জ্যোত্স্নগের শ্রীরামচন্দ্র তবে—"

পুলক শুভার লখনাম চরণ-মুগল ধরিয়া সজোরে মচ-কাইয়া দিয়া কহিল, "চোদ্দবৎসর idiotটা পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাদের পা ফুলিয়ে দিয়েছে।"

শুভা পায়ের উপর প্রবল পীড়নে কাতর হইয়া কহিল, "কিন্তু পুলক, আমার পায়ের একটুও কোলা নেই।"

"পায়ের কোলা কত দিন থাকে? সে ছিল সীতা-দেবীর। তেতের জলভাষা তো, dropsy থাকে বলে। তার আঘাতে বেশী নয়। সেই জল তারপরে তোমাদের brain-এ সঞ্চিত হচ্ছে।"

"Brain-এ জল? সে যে মহাখ্যাতির লক্ষণ।"

"মেয়েদের নয়। তেকের আবার সন্ধি।"

"আর তোমাদের ফুলি—"

পুলক ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না বৌদি, এসো চটপট পাগড়ীটা বেঁধে দিই। রামচন্দ্রের আগমনকাল সমাগত প্রায়।"

"বেশ কিন্তু তুমি আগে ঐকিক দেখে এসো।"

রক্ত মাতা পূজাকক্ষে ঢুকিয়াছেন কিনা দেখিতে পুলক ছুটিল। কেননা বহুদায়ার ছাঁটা চুল হজমী বটিকা গলাধঃকরণ করিয়াও তেমন পরিণাপক করিতে পারেন নাই; acid হইয়াছিল—ঈর্ষার পরিণাপক করিতে পারেন নাই; acid হইয়াছিল—হজম শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, acidও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই বধূর এই নব বেশটা দর্শনের পরে acute উদরাময় গতিয়া জীবনাশঙ্কা হইতে পারে।

অতএব উভয়ে স্থির করিয়াছিল বৃদ্ধা পূজাকক্ষে প্রবেশ করিলে অশ্রুনে শিখা বধু ফুটো ভুলিয়া আসিবে। পুলক কিরিয়া আসিয়া কহিল, বৃদ্ধা এখানে পূজাকক্ষের বাহিরে, শীঘ্র চুকিবার সভাবনা নাই। কী করা যায়! উভয়েই

নীরব। কেহই কিছু উদ্ভাবন করিতে পারিতেছে না। অবশেষে পুলক কহিল, "তোমাকে বেশ smart দেখাচ্ছে। জ্যোত্স্নগ তো বহু পশ্চাতে। এসো একটু প্রেমের অভিনয় করি।"

শুভা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু কৌতুক অমূল্য করিল প্রস্তুত হইয়া পানকে বসিল। পুলক চেয়ারটা ঘুরাইয়া অনতিদূরে শুভার সম্মুখীন হইয়া বসিল। শুভা ব্রিজাসির "চা খায়েন?"

পুলক উত্তর করিল, "সব লোভ সামলাইতে পারি কিং এইটা কত নয়।"

শুভা মুখ টিপিয়া কহিল, "আরও একটা লোভ জা করতে পারেন না।"

"কী সেটা।"

শুভা গ্রীবা বন্ধিত করিয়া মুখ মধুর হাসিল।

"কী বলুন?" পুলকের কণ্ঠে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ পাইল।

শুভা সরসে রক্তিম হইয়া উঠিল।

পুলক রুমাল বাহির করিয়া ললাট মুছিয়া কহিল, "সাহস যখন দান করলেন তখন বো। সত্যি, আপনাদের সঙ্গ আমার আর একটা অবিক্রিত লোভ। আপনাদের কি তাই নয়?" বলিয়া প্রসারিত দৃষ্টি মেলিয়া শুভা প্রতি চাহিল। শুভা দৃষ্টি অবনত করিল। তাহার ওষ্ঠে কী কথাই তাহার ইচ্ছা কাঁপিল। কিন্তু কিছুই বলিল না। আনন ঘুরাইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিবন্ধ করিল।

পুলক সম্মুখে হুকিয়া পড়িয়া কহিল, "বলুন।" কণ্ঠ অশ্রুদগ্ধ।

শুভা উঠিয়া পাড়াইল "আপনার চা নিয়ে আসি।"

"আপনার ভৃত্যকে বলুন। আপনি নিজে এখন চা করতে গেলে আমার চায়ের প্রয়োজন নেই।"

শুভা মুদ হাসিয়া কহিল, "চায়ের লোভও ত্যাগ করতে পারেন তা'হলে।" বলিয়াই সে অগ্রসর হইল।

"পারি—" অপরিখ্যমানা শুভার কোটের প্রান্ত ধরিয়া কহিল, "তবু একটাই পারি না।"

শুভা ঝট চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "অম, ছাড়ুন।" বলিল, "ও, কমা করবেন।"

শুভা এদিক ওদিক সতর্ক নয়নপাত করিয়া বারান্দায় শিখা ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, "চায়ের জল, দুধ, চিনি প্রস্তুতি দিয়ে যাও।"

বহুতে চা প্রস্তুত করিয়া সে পুলককে দিল। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া চায়ে চিনি সংযোগ করিতে ভুলিল। পুলকের প্রায় অর্ধকাপ শেষ হইয়াছে, শুভা গভীর উদাসকণ্ঠে ব্রিজাসি কহিল, "আরো চিনি লাগবে কি?"

"No. thanks."

চা পানান্তে আশ্রম বোধ করিয়া শুভাকে পুলক তাহার ভালবাসা জ্ঞাপন করিল।

শুভা বলিল, "আমি আপনার যোগা নই।"

"যোগাতর কাজকে তো দেখি না। আমার জীবনকে বিষাদ ক'রে তুলে না।"

"তুমি সম্বোধনে শুভা চকিত, সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিল। কহিল, "সত্যি বলছেন?"

"সত্যি। কিন্তু এখনো 'আপনি' কেন?"

আনন্দে শুভার আখির কোণ চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

পুলক হস্ত প্রসারণ করিয়া শুভার হাত ধরিল। শুভার হাত ষ্টবৎ কশ্চিত হইল। সে মুখ কিরাইল।

পুলক উঠিয়া আসিল এবং ভূই করে শুভার মুখ ঘুরাইয়া তাহার ললাটে মুদ চুম্বন আঁকিল।

মাথা তুলিতেই দেখিল অগ্রজ দ্বারে পাড়াইয়া। দেখিয়াছেন ঠিক। পুলক শুভার অকৃত বেশ গোপন করিবার প্রয়াসে শুভাকে চিম্টি কাটিয়া অগ্রজের দৃষ্টি হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া পাড়াইল।

অগ্রজের এই হুঁচকি নর-নারীর প্রগাঢ় প্রীতির কথা অবিকৃত ছিল না। তিনি সহযোগে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কী হচ্ছে ছুটীতে মিলে?"

শুভা অশ্রুতে তাহার পাশ্চাত্য সাড়িটা জড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। এই বেশ স্বামীর নিকট এমনই প্রকাশ করা তাহার অভিপ্রেত নয় এবং পুলকও তাহা হইলে বিস্তর

হৃদিত হইবে। সে বলিল, "জান, মার ঘরের হুঁচকিটা শব্দ লাগে।"

"তাই নাকি? পুলক ওর মধ্যে হাত দিস নাই তো?"

"আর শুভা হাত দিয়েছিল তো?" শুভা যোগ করিল।

পুলক শুভাকে সমর্থন করিল, "না বুদ্ধিমান দেখে গেছে।"

অগ্রজ শুভার ললাটে মুদ করাঘাত করিয়া কহিল, "হ্যা, দিয়েছিল তো?" এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধ ত্যাগ করিল।

শুভা স্বর বোধ পরিবর্তন করিল। বলিল, "চিনি ছাড়া চাগুলিকে গিললে তো?"

"পাড়াও না, তোমাকে মজা দেখাবো।"

"আমি তোমাকে আগে দেখাচ্ছি।" বলিয়াই পাশ্চাত্য কক্ষাভিমনে ছুটিল। স্বামীকে কহিল, "তুমি কি? মাতাল যেমন গন্ধে দিক্‌বিদিক জানশুভ হ'য়ে ছোটে electricityর বিকার শুনে তুমি তেমনই ছোট। তার পুথিবীতে আছে electricity আর তুমি। আর আমার তো এমন অবস্থা হয়েছে একটাকে দেখলে অপরটাকে না ভেবে পারি না।"

"কেন কী হ'লো?"

"ভাই সে এদিকে প্রেম বিকারের চোটে আমার সঙ্গে প্রেমাভিনয় করলেন।"

অগ্রজ মহাশয় ইত্যাবসরে বৃত্তিতে পারিয়াছে হইতে একান গোল নাই। কিরিয়া পাড়াইয়া কহিল, "প্রেম-বিকার? সে আবার কি?"

"শুভা রাগ করিল, "রাবান, কী মাহব!"

পুলক অগ্রজের বেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া বৌদির ব্রত-কেশ আকর্ষণ করিয়া কহিল, "আর বলবে?"

শুভা জননের ভগ্নীতে চীৎকার করিল।

পুলক ছাড়িয়া বিল। অগ্রজকে কহিল, "বৌদি আমাদের চায়ে চিনি দেয় না।"

"শুভা এটা তো সঙ্গত হয়নি।"

তুভা পুলকের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টি ক্রোধান্বিত করিয়া বলিল, “ইহাশেষক আয় যে কি সম্ভব হ'তো জানি না। বলিয়া সে ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, “এইবার ভায়েক বিবাহ দাও।”

অগ্রজ কিছু স্বরসিকের মত কহিয়া উঠিল, “তা'হলে আমাকেও যে প্রবাসে গিয়ে বাস করতে হয়।”

কিছুদিন পূর্বে অগ্রজের সম্মুখে পুলক ও তুভা স্বামীর বৈয়াকাল পরে প্রবাস হইতে আগমন দিবস অভিনয় করিয়া ছিল। এবং অগ্রজের মতে তুভার অভিনয় নৈপুণ্য পুলকের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। পুলক কহিল “ঠিক হয়েছে।”

তুভা কহিল, “বাঃ, তুমি ওর দলে যেতে পারবে না।”

পুলক কহিল, “আজ্ঞা বেশ দাদাকে যে পাঠায় হারাবে পারবে তার দলে দাদা যাবে।”

তুভা কহিল, না না বন্ধনে।

“ওসব মেয়েলি কথা রাখ। ‘আমরা ছুজ’ন পুজ। Majority must be granted. হয় পাঠা নয় হার।”

তুভা কহিল, “দাদার sex ধরবে কেন?”

“কেন দাদার কি?”—“পুলক সরবে হাসিয়া উঠিল।” সে একজনে sex পরিগণিত হবে কেন?” এবং কেন না তাহার অকাটা প্রমাণ বলিবার করে হা করিয়া পঙ্কাজের দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। পঙ্কাজ তা পূজা শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।



(১)

নিখিল নিরুদ্ধ নীল আকাশে নিমেষের মধ্যে তারা-চলিকে রান-করিয়া দিয়া কোথা হইতে একরশ কালমেঘ ক্রমা হইল। বোধ হয় নীলই বড় উঠিবে। প্রকৃতির এই অপূর্ণ পরিবর্তনে সতের বছরের মেয়ে সাবিগা বেশ একটু বিস্ময় হইয়া পড়িল।

গাড়ী বারাতার নীচে প্রকাণ্ড একখানি মিনার্ভা গাড়ী আসিয়া থামিল। শিবনাথ বাবু নামিষে সফর একরশ বারাগদী, ঢাকাই, পারশী ও রংবেরঙের শাড়ীর মোট নামাইয়া দিল।

সাবিগা পিতার মলিন মুখ লক্ষ্য করিল, কিন্তু সে কথার কোনও উল্লেখ না করিয়া বলিল—তোমার এত কিছতে দেরী'হল যেমত? শিবনাথ অগ্রমগ্ন ছিলেন, বলিলেন—না না ও কিছু নয়, কাহিল হয়ে পড়েছি বলেই এমন বেরাচ্ছে।

এই অমলয় কথায় বেশ একটু চক্কল হইয়া সাবিগা বলিল মুখে হাতে জল দিয়ে এখন একটু বিশ্রাম করবে চল। শিবনাথ নিজের অগ্রমগ্ন অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—তাই চল মা, উপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করিগে—মুখে সঙ্গে তোমার মাকে বল কাপড়গুলো পছন্দ করে নিতে বাকীগুলো আবার আজকালের মধ্যেই ফেরত দিতে হবে। সাবিগা হঠাৎ একটু লক্ষিত হইয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ীর নগদী মুখে দিয়া,

তাকিয়া হেলান দিয়া শিবনাথ ক্রাসের উপর শুইয়া পড়িলেন—কি যে ভাবিতে লাগিলেন, তাহার আশি'অন্ত নাই। এখন সময় নারায়ণী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—

—বোধ কি সব নিয়ে এলে সাবীরী বন্ধ? শিবনাথ কোনও রকম ভূমিকা না করিয়াই বলিলেন—কাপড় ত সব ওইখানে রয়েছে, দেখবারও সময় অনেক আছে। এখন মহাসমস্যা'র পড়ে গেছি, কি করা যায় বলত। নারায়ণী বলিলেন—এরই জগৎ আদ্যন্তলব। তোমরা জমিদারী দেখ, রাভারদিনিই কত সমস্যা সমাধানের ভার আচ্ছা তোমাদের উপর আর এ এমন কি সমস্যা'র পড়ল যার জগৎ একেবারে আমার মত কৌশলিক মনে পড়ল।

শিবনাথ কোনওরূপ আড়খের না করিয়াই বলিলেন—প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দাও, জলে যে ডুবে মরতে বসেছে তার কাছে সামান্য ঋণ ভেলে এলে তাকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তখন সে ভাবিয়ে দেখেনা যে সেই অবলম্বন যন্ত্রণার কতটুকুই বা শক্তি।

নারায়ণী বলিলেন—তোমার সমস্যা এখন হগিত রাখ—পরে ভেবে দেখা যাবে। আপাতঃ সাবীরী বিয়ের দিন ত এগিরে এল, মাত্র পনের দিনের মধ্যে সব গোছগাছ করে ফেলতে হবে। এইত আমাদের একমাত্র সমস্যা।

শিবনাথ বলিলেন—সেইজগৎ সমস্যা এত কঠিন হয়ে উঠেছে। আমি ভাবছি, এই বিয়ে হতে পারে কিনা?

নারায়ণী একেবারে বিম্বিতা হইয়া বলিলেন—অবাক

কুবের ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :

৩৩ ৪, হেনার স্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : কলিকাতা-৩১১

পাঠসমূহ

ঢাকা, শান্তিপুর, বড়ুয়া, বালী, রাজসাহী, শিলিগুড়ি, কালিম্পাং, কুমিল্লা, ভারতবর্ষ ও রাণীগাট

আধুনিক সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

মি: এল. কে. চন্দ্রসেন।

হিন্দুস্থান

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

স্থাপিত :—১৯২৮

হেড অফিস :—

৫ ও ৬ হেনার স্ট্রীট, কলিকাতা।

পাঠসমূহ

বদরগঞ্জ, কাটোয়া, তবানীপুর ও বারগড় (উড়িষ্যা)।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

মি: এল. এল. রায় চৌধুরী।

করলে যে, আশীর্বাদ হয়ে গেছে, সকলই বলা কওয়া হয়ে গেছে—অমন সোণার চাঁদ ছেলে—তুমি যে কি বল তার ঠিক নেই।

—শিবনাথ একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন—সত্যিই আমি কি বলছি, তা নিজেই বিবাস করতে পারছি না। সত্যি সত্যিই সোণার চাঁদ ছেলে কিছ ববর পেশুম, তার অনেকখানিই কলহ ধরেছে। নারায়ণী থাকিতে না পারিয়া বলিলেন বহুত রাথ, তুমি কার কাছে এ কথা শুনেছ বল।

শিবনাথ গড়গড়ায় একটা ছোর টান দিয়া বলিলেন—তনবেরই শব্দ শোন, আর না বলেও উপায় নাই। বাজার করে কিছ, হরিহরের সঙ্গে দেখা। সে বললে কিছ মেয়ের বিয়ে নাকি? কোথায় হচ্ছে? আমি বয়স ঘাটশিলার অঙ্ক অমিয়ারের একমাত্র পুত্র জ্ঞান সত্যাবানের সঙ্গে।

তনবের হরিহর একপা পিছিয়ে গিয়ে বললে—সে কিছ, শেষকালে একটা বগুটারে সঙ্গে?

আমি বয়স—তাই নাকি? আশীর্বাদ ত হয়ে গেছে, আর সকলেই যখন একমত হয়ে ক'রেছি, তখন আর কি উপায় আছে বল?

হরিহর বললে—তুমি যা ভাবছ তাকে আসল না দিলেই চপুবে। তোমার ভাই পরসর অভাব নেই—কেন কড়ি মাথ ভেল। গুকে নাকচ কর দেখবে কত ছেলের বাপ তেমনকার বাড়ী দাড়াইতে করছে। তুমি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও।

নারায়ণী প্রথমটা কোনও কথা বলিতে পারিলেন না, কেমন যেন হইয়া গেলেন, পরে বলিলেন—ও লোকের হিঙ্গ হইলে তাই এমন কথা বলছে, তুমি ভাল ক'রে খোঁজ নিয়েছ? আমার ত বিবাস হয় না এমন ছেলে ব'য়ে যেতে পারে।

শিবনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—সেই ধারণাই ত ছিল। তনব বাপ একমাত্র পুত্রসেই অঙ্ক হয়ে কোনওদিনই শাসনের মধ্যে রাখেন নি। উপরন্তু নিজের অঙ্কও এর অঙ্ক বিশেষ দায়ী।

নারায়ণী বেশ একটু চিন্তাঘ্রিত হইয়া পড়িলেন—কি ক'রবেন আর বলবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায়ের মত বলিলেন—তা হ'লে কি ওখানে বিয়ে হয়ে না।

শিবনাথ একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন—না হলেই ত হয় ভাল, কিন্তু সারী বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তা আবার সে বিন Botanical garden-এ সত্যাবানের সঙ্গে দেখা। অস্থগণ যে তাদের খেতেই হয়েছে। তার মতভার নেওয়াটা ত দরকার। তার এ বিয়েতে সম্পূর্ণ মত আছে তা সে আগেই জানিয়েছে।

নারায়ণী চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—সারা জীবনটা যার ছুঃখ যত্নসার মধ্যে দিয়ে যাবে, তার সঙ্গে বিয়ে কোনও রকমে হতে পারে না। কেনে শুনে কি করে একটা উচ্ছ্বালের হাতে সঁপে দিই। এ হতে পারে না, তুমি এ বিয়ে ভেঙ্গে দাও।

শিবনাথ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—আমি কিছুই নেই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই, যে যার স্বপ্নের অঙ্ক চোটা সেইটেই যে অস্থগণের পেছু হ'য়ে উঠবে না, এমন ত কোনও কথা নেই। নরনারীর মিলনের পক্ষে কখন যে কোনটা স্বপ্নপ্রণ হ'য়ে ওঠে এ কথা কেই ছোর ক'রে বলতে পারে না।

নারায়ণী কেমন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—চিরন্তন যা হয়ে আসছে তাই হবে। আজকালকার মেয়েরা চুপা ইয়ারী পড়ে একেবারে যিহী হ'য়ে উঠেছে। এ বিয়ের তার আবার মতামত কি?—ভয়ানক রুড় উঠবে, যাই জানালা দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দিই, বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবনাথ সজোরে গড়গড়ায় একটা টান দিলেন, কি তাহার অজ্ঞাতে তামাক অনেকগুণ পুড়িয়া ছাই হইয়া মিছাছে।

(২)

সাবিত্রী গান শিখিতেছিল। ললিতা আসিয়া বলিল—সারা বাড়ী খুঁজে হায়রাণ আর তুমি বেশ নিশ্চিন্দমনে গান শিখছ।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল—বন্ধু আমি ত সবজানো নাই, তোমার খেয়াস থাক! উচিত, আমি এমন সময় একটু সন্ধ্যা জোঁক করে থাকি। একটু বস, এই গানটার আর একটু বাকী আছে।

বলিয়া আবার গানে মন দিল—কিন্তু সমতাই যেন মেয়েরা হইয়া উঠিল, অথ চোয়াও আঁতড় করিতে পারিল না। বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল—আজ এমন সময়ে?

ললিতা কোনওরূপ ভূমিকা না করিয়াই হাসিয়া বলিল—সত্যাবানকে পছন্দ হয় কিনা সেই খবরটা জানতে এলুম।

সাবিত্রী মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল—পছন্দ অপরূহর কথা বলতে পারি না, তবে ঠেকে পেলে আমি স্বীকৃতি দিব।

ললিতা বলিল—বলতে নেই, তোমার বরাতে বোধ হয় ঠিক উক্টোয়াই ঘটবে।

সাবিত্রী বলিল—তোমার কথাটা ঠিক বুলতে পারলুম না। সেদিন যখন Botanical Garden-এ বেড়াতে যাই, উনিও গেলেন। কি মিষ্ট স্বভাব, আর কী স্মরণ-বাবা মূহ হয়ে যেতে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনিই যেন আমাদের কত পরিচিত এই রকম ভাব দেখালেন। সত্যিই সে দিন তাঁর মধ্যে যে রূপের পরিচয় পেয়েছিলুম তাতে বাবা মা মুহূর্ত্ত হয়ে ছেলেছেন।

ললিতা নিঃশব্দে সমস্ত রাখিতে না পারিয়া বলিল—আর তুমি? তুমি বৃষ্টি চোখ বৃষ্টি অত কিছু ধ্যান করছিলে?

সাবিত্রী বলিল—আমার কথাটা নাইবা বয়স। বৃদ্ধির চৌড় ত তোমাদের অনেকখানি। হা না করতে করতে তোমরা পেটেকথা ক'রতে পার, তোমাদের চোখে কি গুলো দেওয়া যায়।

ললিতা বলিল—দেখছি তোমার তা হলে বেশ মনে থাকে। আচ্ছা মনে কর যদি এ বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

সাবিত্রী কোনওরূপ চাক্ষুষ প্রকাশ না করিয়াই বলিল—আশীর্বাদ হয়ে গেছে, এখন ত আর ভাবতে পারেনা, আর যি ভাবে তাহ'লে আমি কুমারীই থাকব।

ললিতা বলিল—কত লোকেরই ত আশীর্বাদ হয়ে বিয়ে

ভেঙ্গে যাচ্ছে তাদের কি আর বিয়ে হচ্ছে না? তোমাদের আর ভাবনা কি বল বাপমায়ের একমাত্র সন্তান, অগাধ সম্পত্তি একমাত্র মালিক।

সাবিত্রী একটু নীরব থাকিয়া বলিল—একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে কর না। একজনকে শারীর পদে বরণ ক'রে আর একজনকে আত্মী বলে মনে নেওয়া যায়? এই হ'লেই কি জীবনটা সার্থক হয়ে যায়? জীবন যে অধিকতর বার্থত্বের ভরে উঠবে না এমন কি কথা আছে!

ললিতা বলিল—অত শত বৃষ্টিনা, তোমার বাবা মা এ-বিষয়ে দিতে রাজী নন। একটা উল্লেখল চরিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। এরকম বার্থ জীবন যাত্রা করতে দিতে কিছুতেই তোমার গুরুজনের মন সরবে না।

সাবিত্রীর মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল, প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না। পরে বলিল—না কেনে ভালবাসাটা হয়ত অস্ত্রায় হতে পারে বন্ধু, কিন্তু একবার যখন ভক্তি ভরে আসন পেতেছি, তখন একদিন তাকে বসতেই হবে। না হ'লে আমার সকল সাধনা মিথ্যা, সকল পূজাই অর্থহর মাত্র। জয় আমার নিশ্চিত, তা যদি না হয় কেনে সাবিত্রী অসত্য।

ললিতা বৃষ্টিতে পারে নাই যে বিঘটনটি অন্তর গড়াইবে। যখন একবার উঠিয়াছে তখন সেও বলিল—লেখা পড়া শিখে শেষকালে কি সত্যই সম্বন্ধে এই ধারণা হ'ল।

সাবিত্রী কথাটাকে একরূপ চাপা দিয়া বলিল—সে কথার আলোচনার কাজ নেই, শিক্ষার কথা যদি তুললে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে এ শিক্ষা পাওয়া ভারতের মেয়ের কোনও মন অভাব হবেনা। শিক্ষার কথা ভাল বৃষ্টিনা। বৃষ্টি বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বাদ দিলে তার কতটুকুই বা সাহস থাকে। কুটো নিয়েই কি আমাদের জীবনের সব দিন গুলো কেটে যাবে? বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে কিসের ওপর দাঁড়াব বলতে পার।

হীরা উত্তর করিল। হৃদয় অনেক কিছু বলিতে পারিত, কিন্তু খোঁচাটাই বড় করা তাহার প্রবৃত্তি নয়। কথাটাকে

ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—বাপ মার প্রতিভা ত একটা কর্তব্য আছে।

সাবিত্রী বলিল—এ বিয়ে ভেঁকে গিলে কি তাঁদের খুঁ পৌরষ বাড়কে?

ললিতা বলিল—গৌরব না। বাড়তে পারে, কিন্তু এর বিচ্ছেদ কেউ কিছু বলতে ভরসা পাবে না।

সাবিত্রী বলিল সেই ভরসারতির ওপরই যদি চলতে হয়, তা হ'লে ভরসারতিই থেকে যাক, কিন্তু যার জ্ঞান এ সব, তারই সম্বন্ধ বেশা দুসর হ'বে ওঠে।

ললিতা বলিল—কথায় কথা বাড়তে, তোমার মত মত কানতে মা পারিয়েছিলেন, তবে এখন আসি।

সাবিত্রী হ্যাঁ না কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অগত্যা সাবিত্রীর সত্যাবানের সহিত বিবাহ হইয়া গেল।

বঁধুর শাতভীর খুব আদরের বন্ধু হইয়াছে। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে বামী যে জীবন নিকট কি তাহা সে বসিতে পারে নাই। যতটুকু পরিচয় পাইয়াছে তাহা শাতভীর অশ্রুবর্ণনের মধ্যে। নিজের অধিকারের মধ্যে তাহার নিজের ইচ্ছামত খরচ ও কাজ করিবার স্বাধীনতা পাইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সাবিত্রী আদরের ঘরে বসিয়া একখানি ছবিকে খুব ঘর করিয়া ফুল দিয়া সাজাইতেছিল। ললিতা আসিয়া দেখিয়া হইল, কোলে একটি থোকা। সাবিত্রীকে দেখিয়া তাহার দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মনে হইল—আলোকপ্রাণী হইয়াও কেমন করিয়া সে একটি উজ্জ্বল আলোক পাইয়া সমুদ্র। কত রকমেই না আজ নিজের জীবনকে বার্থ করিতে বসিয়াছে। যে তাহার ফুল গ্রহণ করিবে না, তাহাকেই ফুল দিবার ক্ষমতা কতই না বার্থ আলগত।

প্রমত্ত করিল—তোমার নিবেদন কি দেবতার কাছে পৌছবে? বলিয়া ললিতা—কেমন যেন একটু সমুচিত্তা হইয়া পড়িল।

সাবিত্রী ফুল দিতে দিতে বলিল—নিবেদন যে কখন সার্থক হ'বে ওঠে সে কথাত ভাই কিছু স্পষ্ট করে বলা যায় না। কবির নিরাকারের কাছে নিবেদন চলতে পারে।

আমার নিবেদন না হয় হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, তা জ্ঞান দুঃখ করবার কিছু নেই, বরং এটুকু ত সত্য। তা আমার নিবেদন করা হ'য়েছে।

ললিতা কথটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—ঘরখানি ত বেশ! বই কাগজ দেখছি অনেক, লেখা পড়া হয় বুঝি।

তাহার কোল হইতে ছেলোটাকে কাছিয়া লইয়া, আদর করিতে করিতে সাবিত্রী উত্তর করিল—হুসর ত সবই, কিন্তু সৌন্দর্য উপভোগের মালিকেরই খবর নেই। লেখা পড়া একটু আদৃত করতে হয়, সময়ত কাটা চাই। তাছাড়া মার কাছে শুনেছি—ছেলেবেলায় ঠাণ্ডা দেখাশুনার দিকেই কোঁটা ছিল বেশী।

এই কথাগুলোর মধ্যেই থোকাটা সাবিত্রীকে গু আপনায় করিয়া লইয়াছে। এবং সাবিত্রীও যেন তাহারে পাইয়া যেমন একটা নৃতন চিন্তাধারার মাঝে নিজেকে ফিরা অন্তরঙ্গ করিয়া ফেলিয়া। উভয়েইই এমন অবস্থা, যে কোনও কথা কহিতে পারে না, বাহাওবা কয় তাহার মধ্যে অসংলগ্ন কথাই বেশী। তবুও সাবিত্রী যেন ক্রিষ্টিভিত্তির আর একটু ঘনি বসে, তাহ'লে সে থোকাকে লইয়া ঘনিষ্ঠতা আদর করে।

এমনি কথার পর কথা কহিতে কহিতে সাবিত্রী গ্রা করিল—আচ্ছা, আমাদের পাড়ার সিংহাসীপীর ঘরের বিতা কি হ'ল? ললিতা হাসিয়া বলিল—ছোটলোকের শ্রমের কথা বল কেন। জামাই মাতাল হ'লে মেয়ের বিয়ে দিলে না। আরে তোমার ঘরে সবাই ত কম বেশী মাতাল। এটা সিংহ বুললেনা, মেয়েটার ইহকাল পরকাল একেবারে যা করে ক'রে দিলে।

সাবিত্রী বলিল—কেন, অত্যাচারী বিয়ে নিজেই হ'ল? ললিতা বলিল—সে আর হ'ল কে। ছোটরা কি আ কিছু বাকী রেখেছিল, হাজার হোক খর্চের ভয়ত গিয়া আছে। কে আর বাপস্তা থেকেই নিজে সমাজচ্যুত হ'বে যাবে বল?

ধর্মশাস্ত্রী হঠাৎ এমন টনটন হ'য়ে উঠল করে থেয়ে। বলিয়াই সাবিত্রী থিঁপু থিঁপু করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সকল

ললিতা ইচ্ছিততা। বুলিল, কোনও কথা বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী তেমনই হাসিয়া বলিল—সে কথা যাক, এখন সে মেয়েটার ব্যবস্থা কি হবে?

সে কথায় আমাদের কাল কি? যা হবার তা হবেই। ছোট লোকের ঘরে মেয়ে বড় হ'য়েছে, সোমন্ত হ'য়েছে। বৃদ্ধদের নাকি ওর ওপর নজর পড়েছে। চাটুয়া বাবুদের ছেলের নাকি একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

সাবিত্রী চক্ক বিফারিত করিয়া বলিল—এত খুব ভাল কথা। চাটুয়া বাবু বড় ঘর, তাদের বাড়ীর লেখাপড়া জানা ছেলে, মহাশয় উপলব্ধি করবার মত শিক্ষা সে পেয়েছে। বনেনী ঘরের মত কাজ হবে যদি সে মেয়েটিকে বিয়ে করে।

ললিতা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল—তুমি যে ক'বল, তার না আছে মাথা, না আছে মুখ। বনেনী ত্রাঙ্কণের ছেলে হ'য়ে সে কিনা একটা বাপীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে মান ইচ্ছা, জাত সব জ্ঞানহীন দেবে?

সাবিত্রীর মুখ দিয়া ফস করিয়া দু একটা কড়া কথা বাহির হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু নিজেকে সন্দেহ করিয়া বলিল—বুধও দেখবে কলাও বেচবে, এত আর হয় না। হাতটা বুজি বিয়ে করবেই নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু যার মাত ধর্ম দুইই নষ্ট হবে তাকে রক্ষা করবার কি উপায় রয়েছে। তার ধর্মশাস্ত্রিত খুব খুবই প্রহরশাস্ত। সমাজের মধ্যে বাধ্যবৃত্তি বোধ হয় নই বললেই হয়। তাদের পাণ্ডনা কেবল টল্লম আর কুংসিং ইচ্ছিত।

ললিতা সহ করিতে পারিলনা, বলিল—সমাধি কি ক'রবে বা কি না ক'রবে, সে সব কথায় আমাদের কাজ কি? ছোট লোকের আবার জাত ধর্ম কি?

সাবিত্রী—বল-খল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ঠিক কথা, কিন্তু আমি কি বলি জান ও ছোটের কোনোর ওপর আমার বিশেষ আস্থা নেই। এদের নিজস্ব কোনরূপ নেই। বস্তু বস্তুতে এখন আমাদের প্রয়োজনক ছাড়িয়ে উঠতে পারি না, নিজের মনকে ফাঁকি দেবার আর কোনও পথ পাইনা। তখনই আমাদের ধর্ম আর জাত এসে মহাশয়কে বজায় করে।

ললিতা ইহাকে উপহাস বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না, বলিল—অনেক বেদা হ'য়ে গেল, তোমার মত বেধর্মীর সঙ্গে আলাপ করলে ত আর সগার চলবে না।

সাবিত্রী সে কথা একেবারে গ্রাহ্য না করিয়াই হাসিয়া বলিল—থোকাকে যাবার আগে একবার কোলে করি, ভয় নেই বেধর্মীর মত তার কাশে দোব না। আমার যে কি ধর্ম তাহা পরিচয় একদিন নিশ্চয় পাবে। চল, এগিয়ে দিয়ে আসি। রাগ করে তুলে যেওনা ভাই।

ললিতার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কোনও কথা বলিতে পারিল না, শুধু বলিল—আর বন্ধুকে লজ্জা দাও কেন? কাম্যমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার যেন একটা—

সাবিত্রী শুব আকাশের দিকে তাকাইয়া থোকাকে ডাকিয়া বলিল—ঐ দেখ থোকা কেমন সোপার চাঁদ উঠেছে, তুমি দেবে? দুঃখ থোকা কি বুলিল, ক্যাল ক্যাল করিয়া সোপার চাঁদ দেখিতে দেখিতে মার কোল আলো করিয়া গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়া গেল—

সাবিত্রীর চোখ দিয়া দুই বিম্ব তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রইয়া অবধি কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। কেবলই ললিতার সেই ছেলের কথা মনে পড়িতেছিল। এত ভাবনার মধ্যেও কখন যে ডোর রাখে ঘুমায়া পড়িয়াছিল তাহার খেয়াল ছিলনা। কাম্যমনি আসিয়া ডাকিল—কিগো বোমা, এখনও ঘুমাচ্ছে? তুমি যে বলেছিলে আমার সঙ্গে গলাগলান যাবে, সে কথা কি একেবারে ভুলে গেছ।

সাবিত্রী এই পাড়া সম্পর্কীয়া শিশুটার কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। পাড়াও শিশুমাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আসি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল—মার যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীর খারাপ যেতে পারবেন না। আমরা তোমার সঙ্গে যেতে বসলাম।

সেদিন কি একটা খেপ ছিল, ঘাটে স্নানার্থীর খুবই ভীড়। স্নান করিয়া শিশু দিয়া উঠিতেছে এমন সময় কাম্যমনি একটা রথবীকে বসুন্ধর করিয়া বলিল—এই সেই মলিনা গো, সেই মলিনা!

শাবিত্রী কিছুমাত্র বিবলিত হইল না। ইহারই সন্ধান সে কতবার গণ্যমান করিতে গিয়াছে, কখনও ধর্ম পায় নাই। অথচ কাণাখুয়া জ্ঞানিত মলিনা—প্রায়ই এইখানে আসে। মনে মনে কি ভাবিল, পরে মলিনার দিকে আগ্রহ হইয়া থপ করিয়া হাত ঢুটা ধরিয়া বলিল—দিদি, বহু সাধনার ফলে যে আমার সঙ্গে দেখা, আমার চিন্তে শরৎ? বলিয়াই কেমন যেন মগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িল।

মলিনা একবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল, মনে করিল তাহাকে বুঝি কেহ উপহাস করিতেছে। কিছু বুঝিতে পারিল না, বিম্বিত হইয়া শাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ওকি কথা ভাই, ওতে যে পাণ হবে।

ক্যাস্তমণি এদৃশ সঙ্ঘ করিতে পারিল না, খুণায় বিরক্তিতে তাহার সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া দাড়াইয়া গেল। কোথায় ইহার প্রতি কিছু কুসংসিদ্ধি বিজ্ঞপ্ত করিয়া গণ্যমানের পুণিষ্ঠা পুরা করিয়া একটি নিম্নক আনন্দ উপভোগ করিবে তা' নয়, এ আবার সব কি ছিটখিটাতা কাণ্ড, কত উই জানে আজকালকার বিবিয়া! মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারিল না। তুণ বলিল—বোমা, সকালে রাত্তায় পাড়িয়ে গল্প করলেও চলে না, তোমার আবার সবেম আনন্দ বাড়্যা আছে।

শাবিত্রী সহজভাবে বলিল—ভাই চল ক্যাস্তমণি, গাড়ীতে গিয়েই গল্প হবে, তাতে কারও ক্ষতি হবে না। মিসি তোমাকে কিছু আমার সঙ্গে একবার আশ্রমটা দেখে যেতে হবে।

ক্যাস্তমণি কিছু মলিনাকে বিদায় করিবার জুই কপাটা পাড়িল। কিছু হিতে বিপরীত হইল। মুখটা কেমন বিকৃত করিয়া উঠিল, হাটিয়া যাইবার সার্থক্য নাই, শাবিত্রীকে চটাইবারও ইচ্ছাও নাই। উপায়স্বরূপ না দেখিয়া হরিনাম করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিল।

মলিনা কিছু শাবিত্রীর কথাবাণী ভাল বুঝিল না, যেন ইহা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হইল। কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল নির্নিমেষ মগনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ী দেখিয়া সে শাবিত্রীকে চিনিল। গাড়ীতে উঠিয়া কেহ কোনও কথা কহিল না, উভয় উভয়কে দেখিতে লাগিল।

মলিনা যতই শাবিত্রী সংঘর্ষে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—সত্যই শাবিত্রী অপূর্ণ! সে সত্যতাবলি মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু শাবিত্রী তাহারই সহিত আচরণ একেবারে নারী চরিত্রের ঘোরতর বিরুদ্ধে। কিছুই জোর করিয়া ভাবিতে পারিল না। একবার মনে করিল, বুঝি বা এ ভোগে নির্নিপুণতা—না ব্যাগের মধ্য দিয়া ভোগের সবা উপলব্ধি করিবার অদ্বাধ্যায়! হঠাৎ নিজের দেহের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। এরূপ সে জীবনে একবারের উপলব্ধি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আর ইহাতে প্রভেদ অনেক। প্রহেলিকার মাফে চুপ করিয়া রহিল।

শাবিত্রী ভাবিল—যে তাহার জায়া অস্বীকার হইবে স্বামীকে বসিত করিয়াছে, শত্রু হইলেও তাহার শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাক! বায় না। যতই অজ্ঞা, অশোভন হোক না। মলিনাকে যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—অভ্যাচারে যতই জান হোক না, এরূপ সে কখনও মানবীর মধ্যে দেখে নাই। চিন্তাধারা তাহার সমস্ত এলোমেলো হইয়া গেল। এ জগতে মূল নিরুপণ করিতে যাওয়াই বুঝা, প্রতি মানবের অন্তরে কত রকমের বেদনার না জন্ম রহিয়াছে, কত রকমের শূন্যতাই না তার পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ করিয়া দিয়া, ন্যায়োপায়ের বর্ধ্যতাকে লোকচক্রের সমুদ্রে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিতেছে। লজ্জা দেওয়াই বুঝি এর আনন্দ, চুপে বসিয়া দেওয়াই বুঝি শাস্তি, নিন্দা ও কটুক্তি করিয়া আত্মতুষ্টি করাই বুঝি এর ধর্ম। কত প্রশ্নই না তাহার মনে উদয় হইতেছিল, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ক্যাস্তমণি কিছু আর চুপ করিয়া বসিতে পারিল না, বলিল—কেবলমাত্র পথে আবার গণা চানচী করে যেতে হবে। আজকের দিনটায় তোমার কুষ্ঠাশ্রমের আর ঐ অনাদ আশ্রমের আশ্রয়ভূমি যেটো বাড়ী যাবার প্রযুক্তি হচ্ছে না।

মলিনা কিছু তাহার কথাবাত্তা বুঝিল, যেমন নীরব ছিল, তেমনই রহিল। কেবল মাথাটা একটি নোয়াইয়া পড়িল।

শাবিত্রী অস্থমনস ছিল, বলিল তার আর কি, তুমি না হয় গাড়ীতেই থেক, আমার ঘরে আসি।

ক্যাস্তমণি দেখিল এতবড় একটা রিপেট হাতছাড়া হইয়া যায়। নিজের মনভাব গোপন করিয়া বলিল—তা অনেক দিন দিক পা হিঁদিনি, যখন এদেশি একবার দেখেই বাই—এমন সুযোগও আর হবে না।

শাবিত্রী ভাই না কোনও উত্তর করিল না। আশ্রমের ঘরে আসিয়া গাড়ী খামিল। আশ্রমে প্রবেশ করিতেই সকলের কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি মলিনাকে ছাইয়া ফেলিল। না পারিল সে দৃষ্টির উত্তর দিতে, না পারিল মাথা তুলিতে।

ক্যাস্তমণি মলিনার এ ভাব সঙ্ঘ করিতে পারিল না, মনে মনে বলিল—ইহার আবার লজ্জা, কত উই না জানে!

একটা বছর পাঠেচরণে ছেলে আসিয়া শাবিত্রীর আঁচল ধরিয়া মলিনাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিল—আ এ কে?

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা একেবারেই খেয়াল ছিল না, কিন্তু কোনওরূপ বিচলিত না হইয়া শাবিত্রী বলিল ও হল তোমাদের বড় মা।

ছেলেটা মুখ বিকৃত করিয়া উঠিল, ক্যাস্তমণি একহাত হিঁদ, বাহির করিয়া অশ্রুটররে বলিল—পোড়া জিভ খসে পড়ে না গা।

মলিনা কিন্তু এই পরিচয়টা একেবারেই সঙ্ঘ করিতে পারিল না। তাহার মনে কত কথাই না উঠিল। ঠিক এই পরিচয় শাবার জুইই না তাহার এত অধঃপতন। এত বড় পরিচয়ের লালসাই আজ তাহাকে বিরাট অশ্রুয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। থাকিতে পারিল না, বলিল—তোমরা যত বড় প্রহরকরই আবার মনে কর না কেন, আমি ঠিক তা নই, এতো আমার সত্য পরিচয় নয়। জীবনটা আমার কল্পনাতীত অভ্যাচার বেদনার মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছে, সত্যি বলছি এত নিখম্ম অভ্যাচার, ক্রুর পরিহাস, মধ্যস্থিত আঘাত জীবনে কখনও পেয়েছি কিনা বলতে পারি না। বোন, তুমি নিইরের নিইরতাকেও হার মানিয়েছ।

শাবিত্রী কোনও উত্তর করিতে পারিল না, কিইবা

বলিবে। কতকটা আনন্দনা হইয়া বলিল—প্রহরকর যে তুমি নও, সেই সত্যটাও আজ ঘাটাই করতে চাই।

ইহার পর আর বিশেষ কথাবাণী কিছু হয় নাই। বাড়ী যাইবার পথে মলিনাকে নামাইয়া দিবার সময় শাবিত্রী বলিল—তোমারা ভাই এই ছেলেগুলো তার নিতে হবে।

মলিনা বলিল—সে কি হয়? একদিনেই কি বশা যায়—একটু ভেবে দেখি। পারিত খবর পাবে।

মলিনা মাথিমা গেলে ক্যাস্তমণি যেন হাফ ছাড়িয়া বাচিল। বলিল মাগীর আর খবর দিয়ে কাজ নেই, আপন বলাই বিদেয় হয়েছে, বাচা গেল।

শাবিত্রীর সৈদিক কর্ণপাত করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। কোলাহল মুখরিত বাজারের পথেও পানে তাকাইয়া, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সর্ববাহরে ভীড়ের দিকে তাকাইয়া মানবজীবনের প্রতি ইতিহাস, প্রতিরহস্যই আজ নূতন রূপে দেখা দিয়া আবার তাহা তুচ্ছ-প্রতিপত্তি হইয়া কোথায় যে মনের আনন্দে কান্দে মিলাইয়া যাইতেছিল, তাহার কিনারা করিবার জুজ একেবারেই মন নাই। এমনি করিয়াই সৈদিকার গণ্যমানের পাল শেখ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

(৫)

সৈদিক ছপুবে কার্পেট বসিয়া কিছুতেই আর বোনায় মন বসিতেছিল না। কোথা হইতে একরূপ চিন্তা আসিয়া শাবিত্রীর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই যে ললিতা তাহার খোকাটিকে গইয়া আসিয়াছিল, তাহার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিত ছিল না। সে আজ কি হইবে না আছে। নিজের মনে একটা দিকার আসিল, নিজেই ত নিজের শায়ে জুড়ল মারিয়াছে। গুজবনের কথা না তুমিয়া এমন হুমকি মসার পায়ে টেলিয়াছে।

মনে পড়িল সিত্তবাহীর মেয়ে টেপীর কথা, মলিনার কথা। ইহারের জুথের অবস্থা বিপর্যয়ে কথা, ভাবিলে, নিজের কথা আর তেমন করিয়া মনে হয় না। সপারের কতটুকুই বা সে জানে কিন্তু যতটুকু জানে বুঝিতে পারিয়াছে

প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান
পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস :

১০, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা সমূহ

ঈশ্বরদি, হাটখোলা, সাটুরিয়া
গড়বেতা, জয়নগর-মজিলপুর ও
নারায়ণগঞ্জ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ পি. এন. রায় চৌধুরী।

সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্য করা হয়।

জাতীয় সেবায়

উইনার ইঙ্ক কোম্পানীর অবদান

পি, আর, ইঙ্ক

পি, আর, ফাউন্টেন পেনের কালি আপনাদের

মূল্যবান কলমের একমাত্র সাথী। আর

এই কালির উপর আপনাদের কলমের

জীবন অনেকখানি

নির্ভর করবে।

উইনার ইঙ্ক কোম্পানী।

১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র স্প্রিং প্রস্তুতকার

কলিকাতা

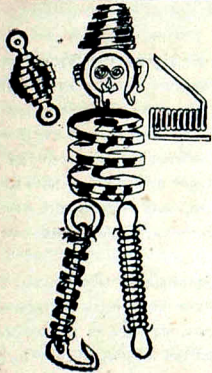
স্প্রিং ম্যানুফ্যাকচারিং কো

৮৪এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন :—ক্যালকাটা ৩১৭০

আমরা সকল রকম স্প্রিং অর্ডার মত সম্ভার

প্রস্তুত করিয়া থাকি।



—টেপীর যেন সংসারে স্থান নেই। যদি কিছু থাকে—
অপটের পরিহাস।

ললিতার কথা ভাবিয়া চিত্ত যখন তাহার দুর্দশ হইয়া
গড়িতেছিল তখন ইহাদের কথা ভাবিয়া নিজেকে সংযত
করিয়া বলিল—দুঃখ ছাঁই মিছে ভাবিয়া কি লাভ। আমার
নিবেদন যদি কবাই হ'য়ে থাকে, একদিন তাকে মুখ তুলে
চাহতে হবে। জীবনের এখনও অনেক বাকী, এখন থেকে
দেখা হারালে সংসারে চলাই দুঃখর হয়ে উঠবে।

এমনি সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বেলা হইয়া গেল।
বাঙালীর কাছে চুল বাধিয়া কাপড় কাচিয়া ফিরবার পথে
ওঁততে পাইল—ক্যান্ডমনি সকালবেলার ঘটনাটা উঁহাদের
কাছে বলিতেছে—কিন্তু তিনি সবটা না শুনিয়াই বলিলেন—
—যদি সন্ধ্যার রক্তমণ্ড প্রকাশে পুরুষের সঙ্গে বাড়ীর বো-
ঝদের নিয়ে প্রণয়ভূমিকা করলে সমাজের কিছু হয় না,
কোথায় গম্ভীর ঘাটে কে মলিনার সঙ্গে ছুটো কথা ক'য়েছে,
তাতে দোষ ধরবার কি আছে বুঝতে পারি না।
আমায় আজ আর বকিও না। মনটা তেমন ভাল
নেই।

সাবিত্রী ব্যুহিল, মুখে তিনি যাই বলুন না কেন মনে মনে
বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

কাপড় ছাড়িয়া ভাঁড়ারের সব পোছ করিতেছিল, এমন
মুগ্ধ স্থিতি আসিয়া বলিল—বোহা! শাখা নেবে, শাখাউলী
এসছে। সাবিত্রী বলিল—মাকে বলগে যা, মার যদি
করও জন্তে দরকার থাকে।

মিঃ একগাল হাসিয়া বলিল—তিনি তোমাকেই ঐ
আশ্বস্তের ছেলেমেয়েদের জন্ত কিনতে বস্বেলেন। নিজে এখন
আর নাবতে পারবেন না।

আচ্ছা বসতে বল বলিয়া হাতের কাজ সরিয়া
সাবিত্রী উঠানে আসিয়া দেখিল, একটা যুবতী শিখন ফিরিয়া
আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে।

জিহালা করিল—দেখি কি চুড়ী আছে?
চমকিয়া উঠিয়া যুবতী মুখ ফিরাইয়া বলিল—এই মা
নানারকমের কাণ্ড করা শাখা আছে। নেবে?

সাবিত্রী তাহাকে চিনিতে পারিল, বলিল—টেপী তুই
যে মস্ত হ'য়ে গেছিল। আজকাল কি করিস?

কথটায় কি জানি টেপী কেমন লজ্জা পাইল, বলিল—
সবই জানতে মা, নতুন ক'রে বলবার ত কিছু নেই।

সাবিত্রী তাহার অন্তরের বেদনা কতকটা ব্যুহিল।
কোথায় সে আজ শাখা পড়িয়া সিঁথের সিঁদুর থিয়া গরুড়ের
সংসারের মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইবে—না, না শড়িল তার সিঁথের
সিঁদুর, না হইল তার সোণার শাখা। কেবল ভাগ্যবতীদের
হাতে পরাইয়াই তার জীবনটা কাটিয়া যাইবে। প্রশ্ন করিল—
তা বাড়ীতে না থেকে পাড়ায় পাড়ায় চুড়ী ফেরী করে বেড়াই
কেন?

টেপু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, পরে দীর্ঘনিশ্বাস
ফেলিয়া বলিল—কি করব, চুপ ক'রে বসে থেকেই আর
থেকে পারি না, আর সে ভালও লাগে না। ভ্রমকে কদের
ছেলেদের জন্ত ত ঘরে থাকবার যো নেই। সেইজন্মেই
ফেরি ক'রে বেড়াই। এমনি ক'রেই দিন কাটে মা।

সাবিত্রী বলিল—কিন্তু সেইটা কি খুব হৃদয়ের?
টেপী পূর্বেকার মতই বলিল—সুখিা যে কোনটা মা,
যতদিন না অসুখিা হয়, ততদিনই সেইটাকে আঁকড়ে চলতে
শিখিছি।

তারপর কি যেন ভাবিল এবং হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বলিল
—আচ্ছা আমি যত ভাল কাজই করি না, ফ্রান্স আর
সম্ভেই এরা বোধ হয় আমাকে ছাড়তে পারবে না। তাই
এক একবার মনে হয় মা, কার গুজুই বা মায়া, আর কিসের
শিঙেদেশেই বা থাকা। এর বেশী যখন আমার দাম নেই,
তখন এসব দেনাপাওনার কথা না ভেবে এক কাজ করলে
হয় না?

সাবিত্রী তাহার কথায় যেন একটু ভয় পাইল, বলিল—
সে কথা ত কিছুই হবে না। কারণ যাই হোক, মিথাকে
প্রশ্রয় দিয়ে ত কোনও লাভ নেই। সংগ্রাম ছাড়া জীবনে
কেউ কখনও শান্তি পেয়েছে শুনেছি।

টেপী হাসিয়া বলিল—লড়াই করব কার সঙ্গে? সমাজের
সঙ্গে? টাকা নেই ত মা। থাকলে এ সব করতেই হাত

না। লড়াই যদি কারও সঙ্গে করতেই হয় সে আমার নিজের অবস্থার বিবেকে।

সাবিত্রী ইংরাজ কোনও উত্তর করিল না, নীরবে শাখা-গুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল—আজ ত আর শাখা কেনা হবে না। কার হাতে হবে না হবে, তার চেয়ে তুমি একদিন আশ্রমে যাস। সেইখানেই সব কষ্টে তুমি নবের।

টোপী খেন কিসের সন্ধান পাইল, বলিল সেই ভাল যা। একটা কথা অনেকদিন ভেবেছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারিনি। আজ মনে হচ্ছে, তাই যদি আমি করতে পারি, তা হ'লেই ভাল হয়।

সাবিত্রী বলিল—‘কিন্তু’ হবার কিছু নেই, বলুন না।

টোপী বলিল—যত্নে ভরসা হয় না, যদি তুমি না ক'রে দাও। আমার ইচ্ছা হয় তোমার ঐ কুষ্ঠাশ্রমের সেবার ভার আমাকে কিছুটা দাও।

সাবিত্রী বলিল—তা হলে ত আমি বেচে যাই। তা কি তুমি পারবে? সে যে বড় কঠোর।

টোপী কুষ্ঠরোগীদের চোয়ারা কথা ভাবিয়া শিরহিয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহুর্তেই বলিল—সেই ভাল। এত কষ্ট ত আমার সহ করতে হবে না। ভরসাবাদের দাত থেকে ত নিজের পাব। নারী জীবনের একটা ধার হস্ত পালন হবে। সেবাঘরের ভিত্তি আমাদের দৃষ্টি। এটাও ত তুমি যে নিজের জীবনটাকে একবারেই ধরে ধরে দেয়নি।

সাবিত্রী মনে মনে হাসিল। কি বলিতে যাইতেছিল বলা হইল না। ভূতা আসিয়া বলিল—কোথা, মালাবাবু একবার আপনার চামিটে চাইলেন। সাবিত্রী একটু বিস্মিত হইল, টোপীকে আসিতে বলিয়া নিজেই চাবি লইয়া উপরে গেল। বহুকাল পরে এই প্রথম সত্যবান তাহার কাছে কিছু চাহিয়াছে। সাফল্য করিবার কথা বলিবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না, কিন্তু একেবারে যাচিয়া যাইতে মন সরিল না। বিনিময় লইবার অস্থিলায় ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে ভীত গন্ধ।

মন্দের ঘোরে নিজের ছবিগানার দিকে একদৃষ্টে ফাল্

ফাল্ করিয়া চাহিয়াছিল, পদশব্দ শুনিয়া আপনাদের ঘোরেই সত্যবান বলিল—চাবি এনেছি, দে। বলিয়া হাত বাড়াইল। চোখ ফিরাইতেই নিজের ভুল বৃত্তিতে পারিয়া একেবারে চূপ হইয়া গেল।

সাবিত্রী কিন্তু সেই কথার দ্বন্দ্ব খরিয়াই বলিল—চাবিও এনেছি। কেথায় কি আছে, তোমার ত জানা নেই, সবই হস্তে ছড়িয়ে ফেলবে, তার চেয়ে বল—আমি বার ক'রে দিচ্ছি।

সত্যবান চাহিতে পারিল না। সে যে আজ কপর্দক-শূন্য এক কথাও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। আমতা আমতা করিয়া বলিল—তোমার দীরের নেকলেসটা একবার দাও, আমার এক বন্ধকে দেখাব।

সাবিত্রী এক কথার দ্বন্দ্ব বৃত্তিতে পারিল, কিন্তু আজ এই প্রথম তাহার স্বামী মুখ ফুটিয়া চাহিয়াছে। সাবিত্রী আশ্রিত করিতে পারিল না। নেকলেসটা বাহির করিয়া দিল।

লইবার সময় সত্যবানের হাত কাঁপিয়া উঠিল। সাবিত্রী কিন্তু বিশেষ কিছু বলিতে ভরসা করিল না। সত্যবান টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

সাবিত্রী সেইখানেই নিস্তব্ধ পাড়াইয়া রহিল। শলিতার কথা সত্য বলিয়া মনে হইল কিন্তু মানিয়া সহিতে পারিল না। নিজের একাগ্রতা যেন ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ঠিক এমনি সময় যেন চাঁদের বাঁদ ভাবিয়া এক স্বপ্নের জ্যোৎস্না তাহার ঘরে আছাড় গাইয়া পড়িল। মনে হইল উঠাই ত জীবনের আনো। এই যে শূন্য পূর্ণের এককথ কালমেঘ উহার দীপ্তিকে মান করিয়াছিল, তাহাকেই অতিক্রম করিয়া এই যে দরজ প্রকাশ, ইংরাজি কি স্নাতক। কিছুই বৃত্তিতে পারিল না। ইতস্তত মেরাক্ষিপ্ত আকাশের দিকে নির্ভাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

(৬)

সেই যে সকালে সাবিত্রীর সঙ্গ দেখা হইয়াছিল, তাহার সেই একান্ত পরিচিত ভাব এ সকল মলিনা কিছুতেই ক্রমিতে পারিল না। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, ঠিক এমনি করিয়া মাগুনে আশাত করিতে পারে। মন

তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বারে বারে সেই অনাথ আশ্রমের ছলেমেয়েদের কণ্ঠ অবস্থার নিরবলম্বন হাসি। নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া পৃথিবীর দৈনন্দিন ব্যাপারেও পরম্পরের হাসি কান্নার অংশীদার হইতেছে। ইংরাজি আবার যেদিন সঙ্গসারে মাহুখ বলিয়া পরিচয় দিবে, সেদিন সাবিত্রীর নামে বেশ ছাইয়া ফেলিবে। তাহাদের মত অভাগাদেরই মাহুখ করিবার ভার তাহার মত ভীত মস্তীর উপর দিল। সমাজ যাহাকে চায় না, কেবল নিজেদের কাম চরিতার্থ করিয়া করদ্যা আমোদ উপভোগ করিবার সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে তাহাকেই এত বড় দায়িত্ব দিবার কথা সে একেবারে কল্পনা করিতে পারে নাই। একজন যদি দিতে পারে সে দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কি তাহার নাই? সাহায্যের মধ্যেই ত দায়িত্ব বোধ, তাহার সে সম্বন্ধ কোথায়?

নানা চিন্তার মধ্যে পড়িয়া না হইল তাহার ভালরূপ আহার না হইব প্রমাণ। ঐখণ্ডের মোহ যেন তাহার কাটিয়া গিয়াছে। পানের খায়া যাহা অর্দ্ধন করিয়াছে, তাহা সমুদ্রই এই আশ্রমের ছেলেগুলিকে মাহুখ হইবার জুজ্বলাইয়া দেয়। কেঁবা তাহার ভোগ করিবে!

অনেক দিন পরে সে এত চিন্তা করিয়াছে, অবসর হইয়া গিয়া পড়িল। এমন সময়ে পরিচিত সত্যবানের পদশব্দ পাইল।

সত্যবান ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—কি, এখনও যে গুয়ে রয়েছ, আজ যে আসরের কোনও আয়োজনই নেই।

মলিনা অশ্রুমনক হইয়া বলিল—ও সব আর ভাল লাগে না, মনে ক'রেছি একেবারে ছেড়ে দেব।

সত্যবান নেশার ঘোরের হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তোমরা আবার কবে থেকে ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে উঠলে—এটা বুঝি একটা নতুন রসিকতা।

মলিনা মান হাসিয়া বলিল—এতদিন বোধ হয় রসিকতা কববার অবসর ছিল, সত্যি বলছি আজ থেকে তা কববার আর প্রস্তুতি নেই, অবসরও হবে না।

সত্যবান পকেট হইতে দীরের নেকলেসটা বাহির করিয়া

বলিল—এমনিতে বুঝি আর মন উঠেছে না, এই দেখ আজ তোমার মন কি এনেছি।

মলিনা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া বলিল—এতে ওর মূল্য কমে যায়। যাকে সেওয়া হয় তার মূল্য বাড়ে না। এই ভেবেই দিয়েই এতদিন জড়িয়ে রেখেছিলেন। তার আর প্রয়োজন হবে না। বরং যার বিনিময় তাকেই পরিবে দেবেন। আমাকে আর অপমান করবেন না।

মলিনার আবার মান অপমান, সেই আবার তাহাকে অবজ্ঞা করিল। ইহা কিছুতেই সহ করিতে পারিল না, সত্যবান মলিনার প্রতি অগ্রসর হইল।

মলিনা উত্তিয়া বলিল—কেন আশনি বাদা, দিচ্ছেন। জীবনের কোনও মুহূর্তকেই কি উপলব্ধির অবসর দেবেন না? আশুভঙ্কির প্রায়সীত ত আশুভ্রটিতার একটা উদ্যায়। ভগবান এ বোধশক্তি সকলকে দিচ্ছেন, আপনাকেও বসিত করেন নি। সব মাছদের কাছেই এর সাড়া আছে। কেউ পায় আরও কেউ পায় শেষে। একেই বল উত্তর করল।

সত্যবান আর এক মিনিটও সেখানে পাড়াইতে পারিতেছিল না, বোতল হইতে মদ খাইতে খাইতে বলিল—এখানে বুঝি আর মন লাগে না। ভৈরবী হ'য়ে ছড়ন ভৈরবের সন্ধানে চলেছ।

মলিনা বলিল—কি যে করব, তার ত কিছুই ঠিক করতে পারিনি, তবে মনে করছি কালকেই বদামন রঙনা হব। কিছু যদি নাই পাই শেষ পর্যন্ত ত আপনারা আছেন।

দেখিতে দেখিতে মন্দের বোতল শূন্য হইয়া গেল, যাইবার সময় একপ্রকার বিকট হাস্য করিয়া বলিল—তোমাদের আবার ব্রহ্মচারী!

(৭)

সাবিত্রীর শয়ন অবস্থি ঘুম আসিতেছিল না। গভীর রাতে কার জড়িত আস্থানে চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িল, বুঝিল। তাড়াহুড়ি ছাড়ার মূল্য দিল, সত্যবান টাল সামলাইতে না পারিয়া ঘেকের উপর আছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জান লুপ্ত হইল।

সাবিত্রী কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন—অধিক যত্নপানই ইহার হেতু। যদি বার ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান হয় তবেই এ ব্যাধি রক্ষা।

সাবিত্রীর সহ কবিরার বাধ ভাঙিয়া গেল। সত্যবানের মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে ক্রটিবাদ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল—যে শক্তির উপর বিবাস করিয়া, সমসারের সকলকে হুৎ ঘিয়াছে নিজেও হাতার যত্নবায় বিনাশি জলিতেছে—তাহাকেই চূর্ণ করিয়া দেওয়াই কি শক্তিবানের একমাত্র পরিচয়।—মলিনার কথা মনে পড়িতেই চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া যেন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া পড়িতে চাহিল—রাক্ষসী! শিশাচিনি! কি করছিস চেষ্টে দেখ।

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, কতকটা প্রকৃত্তি হইয়া সত্যবানের মাথায় জলপট দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বাড়ী বিবাদে ভুরিয়া গিয়াছে, একমাত্র পুরের কথা ভাবিয়া জনক জননী আজ অস্থির হইয়া পড়িলেন। শিবনাথ নারায়ণ এ সবেরে মাথা ঘাত দিয়া বলিলেন—আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাল।

কিন্তু সাবিত্রী তেমনিই স্থির, নিশ্চল। একদৃষ্টে সত্যবানের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। রূপুর হইয়া গেল তখনও জ্ঞান হইল না। রক্ত অক্ষ কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। একবার শেষ নিবেদন করিল—সত্যাই কি বেতুণ আসন পাতিয়াছিল—সকল আয়োজনই কি বুঝা আত্মবশে পরিণত হইবে? তার সকল পরাই চূর্ণ হইয়াছে। বড় মুখ করিয়া ললিতাকে একদিন যে বলিয়াছিল—তা কি আশ মিথ্যা হইবে?

ইহারই কিছুক্ষণ পরে সত্যবান একবার নয়ন মেলিয়া আবার মুদ্রিত করিল। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল, যেহেতু ঈশ্বরের ঈচ্ছিত পদক্ষেপ। সাতদিন সাতরাতি পতির সেবার নিমিত্তে নিশ্চয় করিল। জীবনের দেশায় পাগল হইয়া একদিন যে সেবা, বৈধর্ম্যের পরিচয় দিল তাহা সত্যই অপূর্ণ। সাবিত্রীর পরিচর্যার গুণে সাতদিন পরে যখন

সত্যবানের বেশ জ্ঞান হইলে একদিন প্রশ্ন করিল—আমি কি করছিলুম?

সাবিত্রী বলিল—বড় পরিষ্কার হয়েছিলে বলে আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সত্যবান বলিলেন—বুঝলে সাবি, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে একটা হৃদয় লোক, মুখে তার ক্রুর হাসি। জ-ভমিরার আকর্ষণের কি মদিরা, আমায় যেন তেওয়ারি কাছ থেকে সরলে—ছিনিয়ে নিয়ে বললে—আমার সঙ্গে যেতে হবে। সে শক্তিকে এড়াতে পারলুম না—এমন জাগরায় গিয়ে পৌঁচালুম—কেবল স্তব্রার চোটে চলেছি। নয়নারী উপায়ে মত্ত হ'য়ে নিজেদের জলাঞ্জলি দিয়ে বীভৎশ দৃশ্য গড়ে তুলেছে। আমায় দেখে বললে—‘এইত কৌন, এইত আনন্দ’ বলে জোর করে আমায় এক গেলশদর খাইয়ে দিলে। তারপর—তারপর আমিও তাদের মত ভেসে চলেম। মহাশয়ের আর বাকী কিছুই রইলনা।—

...যখন এমনি করে আকণ্ঠ পান করেছি, তখন তাদেরই একজন বললে—আমাত্ত্বিকির প্রচেষ্টাইত আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায়।...তখন আমার মনে পড়ল সেই যে শিবপুরের বাগানে ছুটি কালো হরিণ চোখ দেখেছিলুম সে যেন আমার পিছনে সমান চেয়ে আকর্ষণ করছে। ঠিক এমনি সময় আমার চমক থেকে গেল, চেয়ে দেখি তুমি।

বড় পরিষ্কার হয়ে পড়েছে বলে এই সব মনে হচ্ছে। এখন তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও দিকি—বসিয়া সাবিত্রী কাতার উদ্দেশ্যে একটা প্রথান বানাইল।

(৮)

সত্যবান হুহু হইয়া প্রথম প্রথম সাবিত্রীর সহিত দেখা করিতে লজ্জা করিত। কিছু বলিতে ভয়সা করিত না। নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া কত কথাই না ভাবিত। সাবিত্রী তাহার পড়িবার ঘরটিকে কেমন সামান্যই রাখিয়াছিল। এই বইগুলি ছাত্রজীবনে কত প্রিয়শী ছিল। ঐ যে আলমারি ভর্তি প্রাইজের বই, এরা কি তার মিথ্যা পরিচয় দেয় না? কত ছোট বড় খেয়ালেই না কৌন কাটিয়াছিল। ব্যায়াম, সঙ্গীত কিছুই বাদ ছিল না। ইহার

তাহার কাল হইল। অধ্যাপকের প্রথম সোপানে যখন পা বিখ্যে সেই সময়েই সাবিত্রীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু নেপার গ্রন্থের চোটে সাবিত্রীকে সে অধঃপা করিয়াছে, অথচ সাবিত্রী তাহার ছবিতে নিজা স্মরণে মালা পরাইয়া আসিয়াছে। মন বিচারে ভরিয়া গেল। এমন সময় সাবিত্রী আসিয়া পড়িল, বলিল—কি সব ভাবছ, ভেবে ভেবে মনকে কাহিল করছ?

সত্যবান হাসিয়া বলিল—ভাবনাতেই সমস্ত অস্তর্য্যটাকে মুগ্ধের দ্বিগে একটা সম্পূর্ণ নৃতনের সন্ধান বলে দেখ। এই তাগের অত্যাশ্রয়িত ত মাগুয়ের সব।

সাবিত্রী বলিল—ভগবান যখন ঈচ্ছিতেছেন তখন তাকে ঈচ্ছিতে হইবে। সে অত্যাশ্রয় করেই হোক আর যে করেই হোক। অথচ এই ঈচ্ছার আকাঙ্ক্ষাটাই মাগুয়ের সব চেয়ে বড়।

সত্যবান তেমনি হাসিয়া বলিল—ঈচ্ছার আবার শক্তি থাকা চাই, তা না হ'লে ঈচ্ছান যায় না।

সাবিত্রী যাইবার সময় মুহূ হাসিয়া বলিল তা বৃষ্টি জানতে না?

(৯)

দুই বছর কাটিয়া গিয়াছে। সাবিত্রীর একটা পুত্র সন্তান হইয়াছে। টেপী সেই কৃষ্ণাঙ্গনেই রহিয়াছে। শিবনাথনারায়ণের আজ আর আনন্দ ঘরে না। অঙ্গ পিতা সন্তানের কাছে ফিরায়া পাইয়া মনে দিয়া দৃষ্টান্ত করিলেন।

সেদিন খোকার মরণপ্রাপনের জ্ঞাত বৃহৎ আয়োজন হইয়াছে। বহু আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীর নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পরিতোষ্টান ভরিয়া গিয়াছে। সত্যবান সকলকার সঙ্গে আপ্যায়ন করিতে বাস্তু। সাবিত্রী উল্লসেব আয়োজনে রহিয়াছে। নৃত্য সঙ্গীত সভা যুগ্মক। টেপী আসিয়াছে। একপাশে নীরবে পাড়াইয়া আছে ললিতা তাহার পুর কতাবের লইয়া আসিয়াছে। সাবিত্রী সকলকে রূপার থালা খোলাস দিল। ললিতা আসন করিয়া বসিল। সকলেই বসিল।—

একবার টেপীর দিকে চাহিয়া সাবিত্রীর মনে হইল—এত করিয়াও তার মনে কিসের অভাব। শান্তিতে থাকিলেও তাহার মুখে করুণ বিধাদের ছায়া। ইহা কিসের। মনে হইল সবই মিথ্যা—স্বামী বাতীত নারীর আর ভূষণ নাই। এক বামীর সৌরবে বৃষ্টি নারীর সমস্ত জীবনটাই পূর্ণ্যায় ভরিয়া যাইতে পারে। নারীর শত কীর্তি খমী বিহনে নিভাত্ত স্থলাবীন।

ললিতা বলিল—কি, অমন রূপ করে পায়ে গেলে যে। একটু লক্ষ্যতা হইয়া সাবিত্রী বলিল—একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি, শাটিনী কিছু বেশী হয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে যোগিনীর বেশে এক অপূর্ণ হৃদয়ী তাকাইয়া উঠিল। সত্যবান চিনিল, মলিনা। এই পরিধান দেখিয়া সত্যই হাত দুটা তাহার সম্মুখে আশ্রয় হইতেই কপালে ঠেকিতে চাহিল। কিন্তু এত লোকের সামনে তাহা আর হইয়া উঠিল না।

সাবিত্রী বলিল—এই যে মিসি এসেছে, পায়ের ধূলা দাও।

এতদিনে আমি নিশ্চিন্তি হলাম—তুমি ছেলেগুলোর তার নেবে।

মলিনা মুহূ হাসিয়া বলিল তার নেব বলেই ত এসছি, কিন্তু তারের ভার কি আমার দিতে পারবে? সাবিত্রী বলিল সে কথা পরে হবে, এখন বড় পরিষ্কার, এত বড় কাঙ্ক্ষা তার আর একলা পারি। এস অতিথিদের ভোজন পরীক্ষা পরিবেশন করে শেষ করি।

এতক্ষণে সকলেই মলিনাকে চিনিতে পারিল। কি সব কাণ্ডাঘা হইল। পরিবেশন হইয়া গেল। কাহারও মুখে গ্রাস উঠিল না। এতজন একেবারেই কিছু শূন্য করিবে না, আর একল রূপার খালে বাইবার লোভ সাম-লাইতে পারিতেছিল না। দলে পড়িয়া এ ব্যাধি লোভ পরিচায়ক করিতে হইল।

শেষোক্ত দলের একটা বাগাল ছোকার বলিয়া উঠিল—জাতও গেল পেটও ভরল না।

আর একজন বলিল—গরুরামা চাপা দাও। এখানে সকলেই ত এক একজন ক্রিয়াময় পুরুষ। খুঁটে পেড়ে গোবর হাসে। ভেবে আর কি হবে। এমন রূপার খালি, এমন সব ভাবে ভাবে খাবার, অনেক ভাগির ফলে কোটে। হেতুগা যারা তারা ই এর কথর বৃদ্ধে চায় না। নিন মশায় আরও করুন। ভীরুকী যার জন্মে সে ত বিদায় হচ্ছে।—

সত্যবান নিষ্কাক হইয়া গেণ। মনে হইল সমসার প্রকৃত সত্য বলিয়া কিছু নেই। অত্যাশ্রয়িত পাপ।

সাবিত্রীর চক্ষু বিক্ষারিত হইয়া উঠিল, মলিনাকে কোণাও বুঝিয়া পাইল না। বুঝ আকাশের পানে চাহিয়া চক্ষু তাহার সঙ্গল হইয়া উঠিল। শোকা কানিয়া উঠিল, ভুলাই-বার চেষ্টাও করিল না।

স্বপ্নের নিকট তাহার নিজ শরীরের জ্ঞান যেত। ইহাতেও যদি কেহ আপত্তি করেন যে—তাহা হইলে মৃত এবং স্বপ্ন ব্যক্তির মধ্যে কি তফাৎ? ইহার উত্তর এই যে, স্বপ্ন ব্যক্তির লিঙ্গশরীর (অর্থাৎ স্বক্ষশরীর—বাহ্য মস্তুর পর পরমাণুকে মায়) সংস্কাররূপ ইচ্ছাক্রমেই বর্তমান থাকে, কিন্তু মৃতব্যক্তির লিঙ্গশরীর লোকাধারে গমন করে। এখানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে—ভূমি মায়া বলিলে তাহা কতক বুলিলাম বটে—কিন্তু প্রত্যক্ষের অপলাপ করিব কী করিয়া? আমি যে নিজের চক্ষে দেখিতেছি স্বপ্ন ব্যক্তির শাসপ্রাশাসি-ক্রিয়া করিতেছে। ইহার উত্তরে শাস্ত্রাকারগণ বলিয়াছেন যে অস্ত্রাকরণের দুইটি শক্তি আছে। একটি আশাসনশক্তি অপরটি ক্রিয়াশক্তি। বৃষ্টিসময়ে এই আশাসনশক্তি বিশিষ্ট অস্ত্রাকরণেরই বিনাশ হয়। কিন্তু ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অস্ত্রাকরণ জাগিয়া থাকে; সেইজন্য শাসপ্রাশাসি ক্রিয়া চলিতে থাকে। শাস্ত্রাকারগণ আরও বলিয়াছেন যে বৃষ্টি-রূপ নিত্যপ্রলয়কালে আমাদের ধর্ম অর্ধ এবং পূর্বসংস্কারগুলি অবিকাররূপে বর্তমান থাকে। স্বপ্নোপস্থিত হইলে পুনরায় তাহার অধিকৃত হয়। ইহাই হইল বৃষ্টি অথবা নিত্যপ্রলয়। বৃষ্টিশক্তির নিবন্ধন করিতে গিয়া মাথুকো-পনিবন্ধ বলিয়াছেন—“যে অবস্থায় স্বপ্ন হইয়া মানব কোন কাম্যবস্তুরকে কামনা করে না, কোন স্বপ্নই দেখে না তাহাই বৃষ্টি” —জামোয়াও বলিয়াছেন “যে সৌম্য সেই সময় (অর্থাৎ বৃষ্টিকালে) মানব শত্রু প্রকৃতির সহিত একীভূত হইয়া তাহাতে লীন হইয়া যায়।” এই নিত্যপ্রলয় আমাদের প্রতিদিনই ঘটিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডাংকার জন্মিত যে মোক্ষ অর্থাৎ সর্বমোক্ষ তাহাই আভাস্তিক প্রলয়। আশ-জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মাণ্ডাংকার হয়। হুত্তরাং এই আভাস্তিক প্রলয় জ্ঞানোদয়নিমিত্তক। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে জীব ত নানা, হুত্তরাং একজনের মোক্ষ হইলে সকলের মোক্ষ কী করিয়া হইবে? ইহার উত্তর এই যে একজীববাদের (অর্থাৎ ঘ’হাবের মতে জীব একটি) যুগপৎই সকলের মোক্ষ

হয় এবং অনেকজীববাদে ক্রমে সকলে মুক্ত হয়। এই আভাস্তিক প্রলয়, একজীব বাদ প্রভৃতি লইয়া বর্শনমায়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। বাহ্যলভয়ে তাহা এখানে বলা হইল না।

পূরণে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মার পরমাণু শেষ হইলে প্রাকৃত প্রলয় হয়। পূরণে যাহাকে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে বোঝাতে তিনিই কার্ণাভ্রম হিরণ্যগর্ভ; প্রথম জীব। অন্তরে ইহা স্বীকার করেন না। হিরণ্যগর্ভই সাংখ্যদর্শনের মহত্তর (কিন্তু সচেতন),—The Cosmic mind—The great Principle. ব্রহ্মার পরমাণু বিপর্যয়কাল।

৩২২..... মাহুৎ-বৎসরে এক কল্প হয়। একটি ব্রহ্মার সময় একটি দিন। হুত্তরাং দুই করে ব্রহ্মার একটি দিন এবং একটি রাত্রি হয়। কোটি-কোটি-সংস্রব কল্প হইলে এক পরাধিকাল হয়। এইরূপে দুই পরাধিকাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার পরমাণু শেষ হয়। তখন ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মলোক-নিবাসী জীবমুক্তবর্গ পরমব্রহ্মে লীন হইয়া বিদেহবৈকল্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহার আর কিরিয়া আসে না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সকল লোক (অর্থাৎ ভূতন) যে স্থাবরাদি ভূতভৌতিক বাহ্য। কিছু সবই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াতে লীন হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মে লীন হয় না। তাই ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। কিন্তু একটি দিনের শেষে যে প্রলয় হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ে কেবল ব্রহ্মলোকেই নাশ হয়। তখন বিবশ্রুতা (বিষ্ণু) সমগ্র রাহিকাল ব্যাপিয়া বৈশ্বলোককে আত্মসংক্রিয়া অনন্ত শায়ায় শয়ন করিয়া থাকেন। এবং রাহির অবসান হইলে পুনরায় স্রষ্টি করিয়া থাকেন।* হুত্তরাং কল্পারে যে প্রলয় তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। পূরণগুলিকে প্রাকৃত এবং নৈমিত্তিক প্রলয়ের সবিস্তর বর্ণনা দেখিবে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার প্রলয়ের মধ্যে নিত্য প্রাকৃত এবং নৈমিত্তিক কখননাশে হইয়া থাকে। আভাস্তিক প্রলয় কেবল জ্ঞানোদয়নিমিত্তক। ইহা পূর্ণ

বলা হইয়াছে। ভূতভৌতিক পরার্থের এই লয় স্রষ্টির বিশ্রীতক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ক্রমে (order) স্রষ্টি হইয়া থাকে তাহার উল্টা ক্রমে লয় হইয়া থাকে। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে “সেই পরমাণু হইতে প্রথমে আকাশ স্রূত হইল; আকাশ হইতে বায়ু; বায়ু হইতে অগ্নি; অগ্নি হইতে জল; জল হইতে পৃথিবী; পৃথিবী হইতে ওষধি; ওষধি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুষ্ক। প্রলয়ের সময় সর্বপ্রথম আকাশ বিনষ্ট হইলে চলিবে না। তাহা হইলে আকাশের কাণ্ড বায়ু নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। কাণ্ড (effect) কখনও নিরাশ্রয় হইয়া থাকে না। অর্থাৎ আগে মুক্তিকা নষ্ট হইবে তাহারপর খট বিনষ্ট হইবে এইরূপ হইতে পারে না। হুত্তরাং প্রলয়ের সময়

“দি টি সপ”

[পাটওয়ার একটি কবিতার তর্জমা]

কামাক্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চায়ের দোকানের মেয়েটি

আগে যে সুন্দর ছিলো এখন আর তত নয়।

অগুণ্ট তাকে জীবঁ করেছে,

আগেকার মতো চটপটে সে আর সিঁড়ী ওঠে না ;

হ্যাঁ, সে-ও প্রৌঢ়া হয়ে যাবে ;

আর মাফিন’ এনে দেবার সময়

মৌবনের যে-দীপ্তি আমাদের চারদিকে ছড়ায়

আর কখনো সে দীপ্তি ছড়াবে না।

সে-ও প্রৌঢ়া হয়ে যাবে।

[‘মাফিন—এক রকম কেক’]

পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ জীবহস্তারে, জীবহস্তার হিরণ্যগর্ভহস্তারে এবং হিরণ্যগর্ভহস্তার অবিভ্যায় লীন হইয়া যায়।* এই চতুর্বিধ প্রলয় পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সেই অব্যক্ত পরমাণুই এই জগৎকে নিজের মধ্যে প্রতি-সংক্রিয়া করিয়া লন। সেই আত্মা যাহাকে রূপ করেন তাহারই তৎ-রূপাবশতঃ আভাস্তিক প্রলয় হইয়া থাকে। তাই পরমজ্ঞানী ভীষ্ম বলিয়াছেন—

“তদবাক্তং পরং ব্রহ্ম তস্মাৎসাব্যবহৃতমহুতম্।

এবং সর্বাণি ভূতানি ব্রহ্মৈব প্রতিসংহরন্তঃ।”

ইতি শম্।

১। মাহুৎকালনিবন্ধ—১৭৮

২। জামোয়াও-পনিবন্ধ—১০১৩

৩। বিষ্ণুপূরণ—৩৪ অংশ—তৃতীয় অধ্যায়—শ্রীবারী।

৪। অগ্নিপূরণ—৩৩৩ অধ্যায়—১০১ রোকে।

১। ভক্তিরহোপনিষৎ—২১।

২। বেদান্ততীর্থভাষ্য—বিষয় পরিচ্ছেদ—পৃঃ ৩২৩

৩। মহাভারত—শান্তিপর্বে—মোক্ষবর্গপর্ব—অঃ ২৩০-২১ রোকে—
বোধে সংগতঃ।

মোনালিসা-কাঁদো

বীর চট্টোপাধ্যায়

বাঞ্ছিত ধরার ক্রন্দন শোনা যায়
চমকিয়া ওঠে নৈশ বায়ুতুলি
যন্ত্র দানব আকাশে উড়িছে হায়
গ্যাসের ম্খোস দেখ মুখে সবাকার।
মোনালিসা ওগো মোনালিসা
তাদের তরিতে তুমি কাঁদো একবার।
হৃকলা জমিতে রক্ত মাখিছে ধূলি
ট্যাঙ্ক চষে করে উর্বরা মরুভূমি
কাটাতার পিছে মেলিন গানের গুলি।
জাহাজের দিকে টপেঙো ছোট্ট আর
মোনালিসা ওগো মোনালিসা
তাদের তরিতে তুমি কাঁদো একবার।
হেসেছে তো বহুকাল রহস্তের হাসি
দূর চক্রবালে অঙ্গে বহি দূসরিত
রণ-দেবতার মুখে উৎসবের বাঁশী।
ট্রেনের চারিদিকে বাঁধা কাটাতার,
মোনালিসা ওগো মোনালিসা
তাদের তরিতে তুমি কাঁদো একবার।

বেয়নেট বৃকে ধরি দেখিছে স্বপন
বোমার আঘাতে পৃথি কাটিতেছে ঐ
চেয়ে আছে অনিমিত্ত পাণ্ডগণন।
অশ্রুর ধারা বৃষ্টি শুখায়েছে তার
মোনালিসা ওগো মোনালিসা
তাদের তরিতে তুমি কাঁদো একবার।

নৈশ শান্তি ভেদ করে ঐ হাউজারের ধনী
কুমারীর বুক ফেটে হয় চৌচির
অন্ধ আকাশ দূর থেকে শোনে দামামার রিনিখিনি;
সমুদ্রে আজ ঢুলিসারে ঘোরে ধ্বংসী ভেট্টয়ার।
মোনালিসা ওগো মোনালিসা
তাদের তরিতে তুমি কাঁদো একবার।

মনের স্রুখেতে হেসেছে তো এককাল
কাঁদো নয় আজ খানিক উচ্চবরে
সিনেমা গৃহ যে হয়েছে হাসপাতাল
ফুলের ছাত্র বন্দুক নিয়ে ঘোরে।
হত্যার বীজ জাগিয়া উঠেছে খুনে,
রক্ত হয়েছে উদ্ভাদ সবাকার
মোনালিসা ওগো মোনালিসা
তব দেশের তরিতে তুমি কাঁদো একবার।

স্বপন হয়ে আসে নিশীথ রাতে—

বন্দে আলী মিয়া

আমার খুকী পালিয়ে গেছে—পালিয়ে গেছে নীল আকাশে
জোন্স। হয়ে চাঁদের মাঝে লুকিয়ে আছে হয় তো বা সে।
নিশীথ রাতে তারার মালা হয় তো খুকী গলায় পরি;
মেঘে মেঘে নেচে বেড়ায়—ঘুঙুর বাজায় বাতাস-পরি।
হয় তো খুকী আলোর সাথে আসে আমার বাতায়নে,
ফুলের ঠোঁটে দেয় সে চুমু ঘূমের মাঝে দুই নয়নে।
চোখের জলের সাথে যেন বন্ধে আসে বারবার
আমার খুকু পালিয়ে গেছে—তবু দেখা পাই গো তার।
বাতাস হয়ে সকল দেখে বলায় পরশ আচল হাতে
স্বপন হয়ে আমার কাছে আসে খুকী নিশীথ রাতে;
পাকীর মধু কণ্ঠে যেন পুকুর ভাষা শুনতে গো পাই
ভোরের বেলা গান গাহিয়া ঘুম সে আমার ভাঙায় তাই।
খুকু আমার লুকিয়ে আছে হয় তো ফুলকুঁড়ির মাঝে
বায়ুর সাথে খেলে সে আজ ফুলে ফুলে সকল সঁকে।
বৃষ্টি ধারার কলগীতে খুকী আমার নেচে বেড়ায়
রক্তরাভা বসন পরে নভ পটে সঁকের ছায়ায়—
খুকু যে আর রূপ ধরে গো আসবে নাকো আমার পাশে
আঁধার আর কোসনা মিলে খেলছে খেলা ফুল-স্ববাসে।
পালিয়ে গেছে কোন্‌বা দেশে-কোন্‌বা ধীপে—সাগর কোণে
মোদের কথা সেথা কি আর তাহার কভু পড়ছে মনে।

গ্রাম—“জনসম্পদ”

ফোন :—ক্যাল—২৭৬৭

বাঙ্গালীর অর্থে, বাঙ্গালীর সামর্থ্যে ও বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত—

নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্যাক্স অব ক্যালকাটা লিঃ

হেড অফিস :

৩নং ম্যাক্সে মেন, কলিকাতা।

শাখা সমূহ

ডাকা, নারায়ণগঞ্জ, মৌলভানারী, মেদিনীপুর, পুরী,
জামালপুর (মুন্সের) শান্তিপুর, বালেশ্বর,
আনন্দপুর, কুমিল্লাগঞ্জ ও বালিচক।

সকল প্রকার ব্যাক্সিং কার্য্য করা হয়।

ফোন—পি, কে, ১২৭২

Phone—P. K. 1972

শঙ্কর দত্ত এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

(একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও বাসনাদি নির্মাতা)

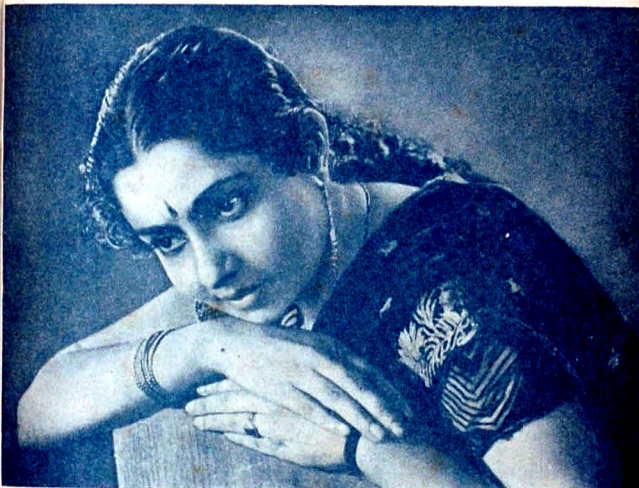
৬, শঙ্কুনাথ পণ্ডিত কীট, ভবানীপুর।

বিহার প্রদেশের
মহামাত্ত গভর্ণর বাহাদুর
শ্রীর টমাস ষ্টুয়ার্ট,
কে.সি.এস.আই; কে.সি.
আই.ই; আই, সি, এস,
কর্তৃক নিযুক্ত।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের বহুবিশ হাল ফাসানের
অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্বদা বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত থাকে এবং অর্ডার দিলে অতি অল্প সময়েও
পছন্দমত অলঙ্কার তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।
আমাদের ‘রিপেয়ারিং’ এরও একটা বিশিষ্টতা
আছে। আমাদের অলঙ্কার সর্বদাই আপনাকে
সন্তুষ্ট করিবে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উচ্চিশ্রী প্রদেশের
মহামাত্ত গভর্ণর বাহাদুর
শ্রীর জন হাবাক,
কে.সি.এস.আই; আই
সি, এস কর্তৃক
নিযুক্ত।

সকল পূজা সংখ্যা ৫০



শ্রীমতী সুনন্দা দেবী

অতীতকালের মধ্যে তারকাগণের
শীর্ষে উঠিয়াছেন



শ্রীমতী মেহেতার

বহুদিন যাবৎ চিত্রায়োদিগণের
আমদের খোঁজক জেগাইতেছেন



শ্রীমতী কৰ্মলা

শাহাবাম পরিচালিত 'শকুন্তলা'
চিত্রায়োদিগণের খোঁজক জেগাইতেছেন

সকল পূজা সংখ্যা ১৫০



শ্রীমতী ভারতী দেবী

ছায়াকাশের নবতম আলোক

সকল পূজা সংখ্যা ১৫০



শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

বাংলা ছায়ালোকের
মনোহারিণী



শ্রীমতী বেণুকা রায়

সর্বশ্রকার চিত্রাভিনয়ে
পারদর্শিনী



০ ০ ০ অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য চিত্রে প্রেমিকার প্রতীক



১৭ শতাব্দীর পশ্চিমী চিত্রে গায়ত্রী

বর্তমান জরুরী পরিস্থিতি ও চিত্রশিল্প

বক্তৃতা চট্টোপাধ্যায়

[সম্পাদক, 'দীপালী']

জরুরী পরিস্থিতির সময় যেমন দাম মিলেও মনোমত ভিন্নিয়ার পাও। যাহা না, তেজাল তাহাতে থাকিবই সেই অবস্থা গাড়াইয়াছে এখন আমাদের চিত্রশিল্পের। এই ১৯৪০ সালে কলিকাতায় এরই মধ্যে যত ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়খানিকে প্রথম শ্রেণীর বলা চলে? হয়ত কয়েকখানির মধ্যে সাধারণকে খুশী করার মত মাল মসলা আছে, কিন্তু সাধারণ দর্শক খুশী হইলেই ছবির ষ্ট্যাণ্ডার্ড উঠু হইবে তাহা বলা যায় না।

আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় তবে এক এক করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছি; কিন্তু আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না যেন। অনেকের মত দেশী ছবির নাম শুনিতেই আমি নাক সিটকাই না। প্রত্যেক খানি দেশী ছবি আমি দেখি, আমি ইহার উন্নতি চাই—সেইজন্য ইহার শোচনীয় অবনতি মনকে কষ্ট দেয় বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে আমাদের বাংলা ছবির কথাই বলা যাক; যোগাযোগ—তিনিটি হাউসে ৪০ সপ্তাহ চলিল, কিন্তু কানন দেবী না থাকিয়া যদি অজ কোন অভিনেত্রী ইহাতে অভিনয় করিত তবে কি "যোগাযোগ" এতদিন চলিত? না যোগে চিত্রনাট্য রচনার ক্ষতিগুলি ক্ষমা করিত? সরস সল্লাপ এবং কানন দেবী "যোগাযোগের" আর্থিক সাফল্যের কাহিনী। "বন্ধ" দেখিতে যাওয়া মানে শুধু অর্থহীন ছাড়া

আর কিছু নয়। "জননী"তে আছে সেই মাঝাতার আমলের কাহিনী এবং অনভিজ্ঞ পরিচালকের অপটুহাতের ছাপ যাহার জন্য "জননী"র আঁখি ছিল মার ভব সপ্তাহ। "অভিসার" হইল ব্যর্থ—যে স্বল্পসার কাহিনীর মধ্য দিয়া লেখক-পরিচালক অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে দর্শকদের অভিল্য পূরণ হয় নাই। কথাই বলে সকলের "নীলা সঙ্ক" হয় না—সেইজন্য "নীলাসুরী" দর্শকদের সঙ্ক হইল না। ছবিখানিতে গুণময়বানু তাহার গুণপনার কোন পরিচয়ই দিতে পারেন নাই। দর্শকদের অন্তরঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু অন্তর পর্দায় তাহার হাত পৌছায় নাই। প্রেমাসুর আত্মী পরিচালিত "দিকশূলে" সব ঘরোয়া ব্যাপার—সেজন্য ঘরমুখের ভালই লাগিয়াছে—তরুণ তরুণীদের নিকট এইরূপ প্রেমহীন কাহিনী কোন আবেদন যোগাইতে পারে নাই। প্রেমের মিত্র পরিচালিত "সমাদান"এ প্রেমটিই প্রাধান্য পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল গল্পটি হারািয়া গিয়াছে। তবে প্রেমের বাবুর প্রথম হাতে খড়ি হিসাবে "সমাদান" দর্শকদের নিরাপত্তা করে নাই।

"কাশীনাথ"এ বঙ্গের এখাবৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তাহার পর "প্রিয়বান্ধবী" ও সহধর্মিণী"র নাম করা যাইতে পারে। নিউ টকীজের "দানী" টেকনিক্যাল দিকে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর, আর তাহা হইবেই বা না কেন?—তিন বঙ্গের খরিবা তিনিটি ঠুড়িতে বিজয়

কামেরামান ও বিকিৎ শব্দদ্বয়কে দিয়া ছবি তুলিলে এইরূপ ফল অনিবার্য। তবে ছবিখানির ভিতর ঘটনা সংস্থাপনের অভিনবত্বে, সংলাপের উৎকর্ষ ও মণিকা পাত্তনীর অনবদ্য অভিনয়ে “দাবী” দর্শক সাধারণের অন্তরস্পর্শ করে। “জন্ম সাধেবের নাতনী” পূর্ব দৈর্ঘ্যে হাজিরসাম্যক ছবি তুলিবার প্রশংসনীয় উত্তম উল্লেখযোগ্য এবং প্রথমাকটি বেশ উপচোগ্য হইলেও কাহিনীর স্বভাব্য এবং দুর্বল চিত্রনাট্য ঘটনায় শেষাংশে হইয়া উঠিয়াছে একেবারে। “খালেদায়ে” হে। পরিচালকমহাশয় পূর্ণিমা পারদ দেখাইয়া কাজ সাধিয়াছেন। ভাগ্যিস, বমলা ছিল তাই লোক পাপলানীওলি সহ্য করিয়াছে।

এ বৎসর এবারও তেজধানি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ছবি হিসাবে “কান্টনাম” “প্রিয়বান্দী” ও “সহপাঠী”রক বাদ দিয়া অস্বাভাবিক যোগ্য ছবি হিসাবে বাহা সাধারণের ভাল লাগিয়াছে— “সম্পাদন”, “যোগাযোগ” এবং “দাবী”। হিন্দী ছবির মধ্যে বড়ো পরিচালিত “সাদী” হে। একবারে অস্বাভাবিক ও চরিত্রহীনদের ‘সত্য-সাক্ষীর’ অধ্যায়টি বেমালুম আত্মসংকর করা হইয়াছে। বড়ো সাধারণের “জায়ে” বাংলার বাহিরের লোকের ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে বাংলাদেশে তাহার নিকিও হই নাই। “মুততা” নামক আরও একখানি স্থানীয় হিন্দী ছবি নিকিতাতায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সম্বন্ধে উৎসাহিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বাংলা দেশে নিকিতা এতগুলি ছবির মধ্যে কয়খানিকে আমরা প্রায় গুলিয়া প্রশংসা করিতে পারি। ছবিগুলির কাহিনীর ভিতরও বিশেষ বৈচিত্র্য নাই—প্রথমতঃ সবগুলিই সামাজিক। দ্বিতীয়তঃ সবগুলিই প্রেম ও বিরহের গতানুগতিকতায়ে ভরপুর। কিন্তু সেক্ষেত্রেই প্রেমিকের প্রশংসনীয় প্রেমোভিনয় আর কত দেখা যায় বস্তু! ঐতিহাসিক, ধর্মমূলক ও জীবনী (biography) অস্বাভাবিক বৎসরে গাওবা দুই একখানা

তুলিতে প্রয়োজকগণ চেষ্টা করেন এ বৎসর তাহা একেবারে বন্ধ। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন যে এই জরুরী পরিস্থিতির দক্ষণ ‘কাঠিউম’ ছবি তুলিতে খরচ কি কম! সেইজন্য তাহার চিত্রজ্ঞানহীন এক পরিচালককে দিয়া কম খরচে (?) সামাজিক ছবি, বলিলেও ভুল হয়, বলা উচিত ‘জরিৎ কম জামা, তুলিতেছেন বৎসরে একখানি এই তাহার কলাফল যে কি ঠাণ্ডাইতেছে তাহা চোখের সামনে দেখিতেছি।

সব ছবিতেই প্রায় একই অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ জহর-ছবিকেবুকা-পুখিম-দোয়াজ—ইহা বাই বাজার গরম রাখিয়াছেন, প্রতিউসারে জিজ্ঞাসা করুন, ইহারা ছাড়া কি আর কেহ নাই? হু! একজন নতুন আটটি আমবাণি কখন না? প্রতিউসার বলিবেন, আর মশাই, এখন বাজারের এই অবস্থা—হে এতখানি ‘বিস্ক’ নেয় এখন?

বুদ্ধিটা একবার দেখিলেন? একজন আটটির বিস্কু তিনি নিতে পারেন না, অথচ এত বড় একটা ছবি ‘বিস্কু’ তিনি অনায়াসে লইতেছেন!

বহু চমকিত্যে এই জরুরী পরিস্থিতির দেখাই দিও ‘মেন তেন প্রাকারো’ একখানি ছবি বাজারে ছাড়িলেন এক বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম ছবিখানিই হয় উৎসাহের পে ছবি। কিন্তু ইংরেজে যে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের আর শ্রদ্ধা হইতেছে তাহা কি একবারও উহারা ভাবি দেখিয়াছেন? বর্তমানে কিয় ও আত্মসংকর বহুখিনি যুদ্ধের জন্ম দুশ্রাণ্য হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুশ্রাণ্য হইয়াছে সত্যিকারের বাবসাংকিসম্পন্ন চিত্র নিন্দাতার। বাহাদের টাকা নাই তাহাদের ফাঁকি লি প্রোডিউসার সাক্ষিবার আকাখা দুশাশয় পরিণত হইতেছে আর বাহাদের টাকা আছে তাহারা নিদারুণ অজ্ঞাতায় পরিণত হিতেছেন। ইহার জন্ম যদি ছবি না চলে এক তাহাতে যদি জরুরী পরিস্থিতিকে দেখা দেওয়া হয় তা হইলে আমরা নাচার।

ছায়াচিত্রে বোম্বাইয়ের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

বিমল দত্ত

ভারতের সকল প্রদেশে অপেক্ষা ছায়াচিত্রে বোম্বাইয়ের অসামান্য উন্নতির কারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইলেও, বোধ করি আরও কিছু বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। সাংবাদিক মগলে প্রাদেশিকতার স্থান না থাকিলেও চিত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির জন্ম আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা বা প্রতियোগিতা বাহাতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়। “আজ বাংলা যাহা ভাবে, কাল সমগ্র ভারতবর্ষ তাহা চিন্তা করিবে”—মহামতি গেংখেলের এই বাণী জাতীয় জীবনের অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যাটিলেও ছায়াচিত্র শিল্পে প্রয়োজ্য নহে। বোম্বাইয়ের একের পর এক জনপ্রিয় ছায়াছবিগুলি হ্রদর বাংলার চিত্রান্দোলনের পর্যায়ক্রম আকর্ষণ করিয়াছে যে বাংলাভাষীরা বাংলা ছবি অপেক্ষা হিন্দী ছবিরই বেশী অহরাসী।

বাংলার ক্ষেত্রেও বোম্বাইয়ের চিত্রশিল্পের প্রসার ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। বাঙ্গালী পরিচালক, শিল্পী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পশ্চিম উপকূলে যে স্থাণ্য পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্টরূপে বোঝা যায়—বায়ুর গতি কোন দিকে। যুদ্ধের যাবতীয় অতর্কিত্য সত্ত্বেও, বোম্বে-টকীজ, শ্রীরাগণ, জ্ঞানপান ইন্ডিগ, মিনার্ভা, লক্ষ্মী প্রোডাকশন্স প্রভৃতি ইন্ডিগগুলি নতুন নতুন চিত্র অবদানে ভারতীয় চিত্র ভাণ্ডারে একবার পরিবেশকের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই পর্য্যয়ে বাংলার স্থান কোথায়?

বোম্বাইয়ের এই অসামান্য উন্নতি মোটেই আকস্মিক নহে বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে বোম্বাই-ই প্রথম ছায়াচিত্রশিল্প প্রবর্তনে তৎপর হয়। কিন্তু এ তৎপরতার ফল শীঘ্রই বাংলাই লাভ করে এবং নির্ভীক ছায়াছবির যুগে বাংলাই প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। সবার ছায়াচিত্রের যুগেও বাংলার গতি অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। চতুর্দশ, পুণাভক্ত ইছদীকা লেডকী, মীরাবাঈ, দেবদাস প্রভৃতি ছায়াছবিগুলি বাংলার সাক্ষরতার মনুনা। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বোম্বে টকীজের অজুত কন্ডা ও প্রভাতের অমর



লীলা চিন্মি

জ্যোতি প্রভৃতি চিত্রের আবির্ভাবে বোম্বাইকে বাংলার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দেখা যায়। ইহার অম্বকালের মধ্যেই সাগর মুভিটোন, ওয়াখিয়া, জ্ঞানপান প্রভৃতি চিত্রশ্রুতি-নাটগুলি ভারতের ছায়াচিত্রের বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলে।

এই নেতৃত্বের মূলের রহস্য ভেদ করিলে আমরা ইহার প্রকৃত-রূপ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে 'ম্রুটই' প্রথম। গল্পের ভাল 'ম্রুট', এবং কৃতী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এবং পরিচালকদের সমন্বয় ছবিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলে। অজুংকভা, অমর জ্যোতি, আশমী, ভাবী, বঙ্কন, কল্পন, শচেশ্বরী, সিকান্দার, পুনমিলন, ময়া-সঙ্গার, পরদেশী, সুলা, আশুনা ঘর, ভরতমিলাপ, কুয়ারা বাপ, প্রভৃতি চিত্রগুলি এইরূপ সাফল্যের নিদর্শন। আলোচ্য ছবিগুলির মধ্যে এক সিকান্দার ও ভরতমিলাপ ছাড়া প্রত্যেকটি ছবিই সামাজিক। গল্প বা অভিনয়ে জটিলতার কোন বাংলাই নাই। সরল গল্পাংশের সঙ্গে রহিয়াছে প্রণয়-ভক্তিত মিলনাত্মক দ্বন্দ্বিকা। ফলে ছবিগুলি জনগণের সম্পূর্ণ মুখা মিটাতে পশ্চিম হইতে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত চলিতে থাকে।

শিক্ষিত ও নিতান্তনূন অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আবির্ভাবের সংখ্যা বোঝাই অনেক উপরে। শিক্ষিতা

পরিবর্তন না হইলেও একটা সঙ্গীতের ও কৃষ্টির ভাব মুগ্ধীয়া উঠিয়াছে। পুনমিলন, পরদেশী, পিয়াস ও খিলঞ্জা ছবিগুলিতে যোগদানপ্রধান, বসন্ত কিসমত চিত্রে মনোহর শান্তি, সিকান্দার, বসন্ত সেনা চিত্রে বনমালা, কুয়ারা বাপ, রাজা চিত্রে প্রতিমা দাসগুপ্তা প্রভৃতি অভিনেত্রীরা যে মার্জিত রুচিসম্পন্ন আবেশ বিকলতা ও শাস্ত্রগীতার অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রকৃষ্টই দৃষ্টগ্রাহী। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অশোককুমারী লীলাচিন্মী বা দেবীকারাণী, মতিলাল খুন্সী, কিশোরশাহ প্রতীমা দাসগুপ্তা—ইহাদের বর্ণনাত্মক অভিনয় বোধাইয়ের চিত্রগুলির সফলতার একটি বিশেষ কারণ। তা ছাড়া এক্ষেপে কয়েকজন অভিনেতা আছেন ইহাদের এক একজন এক এক রসের অবতারণায় সিদ্ধ হস্ত। মার্জিতশক্তি চুক্তিরে কুমিকার না নাওয়াজ ও হরিশ শিবাবাশানি হাফেজকেকারী ভাঙের কুমিকার তি এইচ দেশাই ও চান্নি ও শিচরজের কুমিকার হুসেই ও হশেবর প্রভৃতির স্বাভাবিক অভিনয়ে সকলেই মুগ্ধ।

কিন্তু বাংলার দিকে ফিরিলে হতাশ এবং হুত্থে মন ভরিয়া যায়। কয়েকজন শিশু অভিনেতার অভাব ছাড়া এখানে সকল চরিত্রের উপযোগী অভিনেতা ও অভিনেত্রী বর্তমান। কেবল প্রযোজক ও পরিচালকদিগের দুর্দম্ভুটি ও পরিকল্পনা ও শিল্পী নির্মাচনজ্ঞানের অভাবে বাংলার ছবিগুলি পূর্বের মত সমাদর পাইতেছে না। অবশ্য নিউ থিয়েটার প্রভিষ্টানের পক্ষে একথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

শ্রীমদ্রূপ সঙ্গীতের দ্রষ্টগ্রাহী শক্তি ছবিকে সাফল্য লাভে যথেষ্ট সহায়তা করে। পরদেশী, পূর্ণমিলন, পিয়াস, আশুনা ঘর, বসন্ত প্রভৃতি চিত্রগুলি এই সঙ্গীতের গুণেই শ্রোতার মন জয় করিয়াছে। পলীসঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া, পারসিক গজল, ফুঁরী ও উজ্জেশ্বরীর সঙ্গীতের সহিত আধুনিক সঙ্গীতের সমন্বয়—কেবল বোধে চিত্রগুলিতেই দেখিতে পাই। মনোহরালী-নাহারালী রঙের নৃত্য ও আধুনিক ভাবাবেশে স্বপ্নাত্ত্ব মৃত্যুর পরিকল্পনা কেবল

লোকপ্রিয় করিবার শাফল্য প্রচেষ্টা। যুক্তি বা কল্পিত দিক হইতে দেখিলে হয় ত ইহাদের অনেক কিছুই কলারসিকদের হাফেজের করিবে, কিন্তু বোধে চিত্রপ্রস্তুতকারীরা জানেন যে কয়েকজন সমালোচক বা অভিজ্ঞব্যক্তিই দর্শকবৃন্দের সম্মতি নহেন। সাধারণ লোকে বাহ্যতে আনন্দ পায় তাহা বই অদ্বিত বা যুক্তিহীন হউক না কেন এই শ্রেণীর চিত্রকারীরা তাহার সন্নিবেশ ঘটাইতে পশ্চাদগত হন না।

বাংলার প্রযোজক ও পরিচালকদের জাতিগত ভাব-প্রবণতা ও কাব্যপ্রিয়তা তাহাদের ব্যবসার প্রতিফল হইয়াছে। তাহারা ব্যবসা করিতে গিয়াও কাব্য ও কল্পিত রূপ ফুটাইতে মিথি বোকানের নাম মিথিসুখ—ও জগৎগণ এবং জ্ঞতার বোকানের নাম শীতগণের পদশোভা রাখে। বীরব্রত, বকিম ও শরৎচন্দ্রের দেশে মানবজীবনের স্বাভাবিক দুখ ফুটাইয়া তুলিতে, মঞ্চশিল্পী কাহিনী বোধবোধ, কপাল-কুণ্ডলা, দেবদাস প্রভৃতি ছাড়া ছবিগুলি হয়ত কাব্য ও কল্পিত

দিক দিয়া উজ্জ্বলের কিন্তু এইরূপ বিরোধাত্মক চিত্র দর্শকেরা চায় না। এ ছাড়া বাংলার ভিত্তিস্থিতরা চিত্র প্রস্তুতের সময় হন 'ডিক্টেটর'। আপনাদের খেলাপ খেলাপানা বজায় রাখিয়া এবং বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্বের চরম পন্থায়ে উঠিতে গিয়া জন-মনের কথা মনে থাকে না।

বোধাইয়ের যে কতগুলি ছবিবা আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। হিন্দী ভাষার প্রসার ও প্রতিপত্তি বাংলা দেশ অপেক্ষা সব দেশেই বেশী। অর্ধের দিক দিয়াও বোধাইওয়ালাদের টাকার ভারত বিখ্যাত। কিন্তু যাহারা বোধাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের—পাহাড় ও সমুদ্রের—ছবিবার কথা বলেন তাহাদের এই কথাই ভাবা উচিত যে রেলগাড়ী ও ট্রামের এখনও ভারতবর্ষে বানবাহনাদীর কার্য করে। তা ছাড়া স্বপ্নের আমেরিকার কলম্বিয়া টুপিও বহি 'লট হোয়াইজ' চিত্রে বিশাল হিমালয়ের প্রাকৃতিক ছবি আঁকিতে পারে, তবে বাংলার চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির পর্বত-সমুদ্র দুখ তুলিতে অসুবিধা কোথায়?



সেই প্রভা

অভিনেত্রীদের চিত্রশিল্পে যোগদান করার হাতে ঢালা নাটকীয় কলাবিজ্ঞার এবং যাবতীয় অল্পবয়সী ভাবধারার আয়তন

ফুটিতের অঙ্গদান (সেবা)

তোমরা লইবে বল কেবা

দেশের কল্যান কামনা

দেশের সাহচর্য

এই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

প্রার্থনা করিতেছি আজ

আনন্দময়ীর চরণতলে—

ত্রিপুরের শ্রীশ্রীযুত মহারাজা মণিকা বাহাদুর পুষ্টপাষিত

দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অফ ত্রিপুরা

নির্নিতেড

ম্য: ডিরেক্টর--

মহারাজ কুমার প্রজেক্টকিশোর দেববর্ম

চীফ, আফিস
আগরতলা

হেড আফিস
গঙ্গাসাগর

কলিকাতা আফিস
১১, ক্লাইভ রো

বাংলা ও আসামের বাণিজ্য কেন্দ্রে অপরাপর আফিস সমুহ

ভবিষ্যতের চিত্রাভিনেত্রী

शङ्खलक्षणं त्रयम्

[सम्पादक, "किन्नु-टो'ग'ड']

প্রায় বহুর দশকে আগে শ্রীমতী দেবীকারাণী এক
সংবাদপত্র-প্রতিনিধির কাছে বলেছিলেন যে, ভারতীয়
মহিলাদের চিত্রাভিনয় করা উচিত। আত্ম তাকে অথবা
শ্রীমতী সাধনা বোসকে প্রেরণ করলে তাঁরা নিশ্চয় এই কথাই

যতই মনোহারী হোকনা কেন, বাস্তবক্ষেত্রে সেই গা
রয়েছে তুলজ্যা বাধা।

কিছুদিন পূর্বে স্বপ্রসিদ্ধা চিত্রনটী শ্রীমতী দুর্গাবা
থোটে এক মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্যিক মণ্ডলীর অভিনয়

উত্তরে বলেছিলেন যে নিজে
দিক থেকে বিচার করে তিনি
কুলললনাদের চিত্রাবতরণ কব
বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দেখা
পান না।

শ্রীমতী দেবিকাবারী
শ্রীমতী দুর্গাবাঈর এই অভি
মত তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞত
ফল—একথা স্বাভাবিক অনায়াসে
ধরে নিতে পারি। কিন্তু য
ষ্ট্রুড়ির আবহাওয়ার মত
অনাচারের কোন ছোঁচাচ
থাকে, তবে বাস্তবী তা
“ভীতি” কথাটা নাই বার
করলাম—কারণ ভক্তজ্ঞান
মানচিত্র-কি ?

सकयुन

আমার মনে হয় হেঁকারাণী, বা দুর্গাবাই বা প্রতিমা দ্বারাও আশ্রয় পাওয়াই যোগ্য একজন। আজ্ঞা হয়ে গেছে যে শাখার নবাবগা কাশ্মীরে কোথায় যাবে তা বুঝতে পারেননি। হয়তো শেষ শিবিরে গীরা বসে থাকেনি, তাঁদের প্রকৃৎ একথা বোঝা সম্ভব নয়।

আজ পল্লিই হংরাঙ্গ, ফিরিখী, গিছী, গু'টি ভাব-ভায়ী জিজ্ঞানী, কবিত্বকৃৎ হয়ে জীবিতব্য কভেচেনে বিশ্ব ভাষিসি ভূতরকু জয় এমন অসম্বোধী দু'চার জন ভাষা কেউ শেষ পল্লিটিকে পালতে পারেননি। ভাষের কট রকম অসম্বোধী শব্দকেও কবিতা হয়, এবংর বাইরের লোকের কাছে ততটা প্রকাশ হবার সম্ভাবনা নেই বলেই বোধহয় তাঁরা তা জানেন না।

কিন্তু এই অস্বাধীনতার আনন্দভিরাট যে বস্ফুরিত, এই কথাটা বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমাদের ইতিপূর্বেরই আনন্দভিরাট বা দ্রুতীত (নাই, একথা বলা চলে না। কিন্তু নিম্ন অসম্ভব) হয়ে প্রকৃত শিল্পীর জীবন যাত্রা করতে চান, তাঁর পক্ষে তিনি যৌগিকই যোগ্য বা পুঙ্খই হোন—এই দ্রুতীতির উপশিষ্ট মায়াবদ্ধ নয়। বিদ্য একথা ধরে নেওয়া হয় যে ইতিপূর্বেরই এমনই hot-bed of corruption যে মন্ডিজি নারী মাঠেই তার জ্বালে জ্বলিয়ে পড়ছেন, তবে ভীতিকরনরায়ই পরিচয় দেখো

যে কণ্ঠন ভগ্নমহিলা চিত্রাভিনেত্রীর জীবন
 গ্রন্থে ব্যাখ্যানে বা কবচেনে তাদের মৃগ্যা বেশী
 ন। শেখিকারানী, প্রেমিকা গল্পেখাখাখা
 মিসেস ডিজি, মায়া রায়, অন্যাকী রমা রায়,
 রান্না বহু, হুঁহাংগে খেটে, প্রতিমা দ্বন্দ্বপ্রভা,
 মিল্ল, মায়া, রাখে, নলিনী তরুণ, শেখনা
 বর্ষ, রাখী, নলিনী ভবন, মলিকা গল্পেখাখা, স্বপ্নভা
 মৃগ্যাখাখা, বীণা, বাসন্তী, ইন্দিকা রায়, শীলা ভট্টাচার্য
 প্রভৃতির নাম প্রকৃত উপহাসে হিহাসে করা যেতে পারে।
 ভাষিকাতা মনে ছোট মনে ছোট ভাবতবৎসব মন একট
 ভাষী মনের পক্ষে ভাষাতাই থাকিবেক।

আসল কথা, ভারতীয় stage বা screen এর এমন একটা কুশী tradition গড়ে উঠেছে যাকে মাদুরীময় করে দেখতে গেলেও তা কুশীই থেকে যায়। এই tradition —পতিতা রমণীদের দ্বারা অভিনয় করান। অবশ্য এদিক দিয়ে চিত্রনিষিদ্ধাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ

তাঁরা এদেরই ready made অভিনেত্রী হিসাবে পেয়ে-
ছিলেন—ভদ্রপুঙ্খ কস্থাদের পাননি। ক্রমে এমন একটা
ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়, যার ফলে ‘অভিনেত্রী’ শব্দটা হল
‘পতিতা’ শব্দেরই নামানুসার। ফল হল এই যে ভদ্রমহিলা-
দের চিত্রে যোগ দেওয়ার পথে এক দুস্তর বাধার সৃষ্টি
হল।

কিন্তু ভবিষ্যতের চিত্রাভিনেত্রীকে আসতে হবে শিক্ষা।



কিশোর শাহ ও প্রতিমা দাসগুপ্তা

ও শালীনতার অধঃপূর থেকেই গৃহস্থকল্যাণ মানবজীবনের দৈবিকভাবে সুদৃষ্টিতে তুলেনে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অঙ্কুরিত সমাহায়ে জীবনের সৌন্দর্য্য ও বিকৃতিবৎ রমকে উপলব্ধি করে সমাধায়ে শালীনতা-মনতার দ্বারা তাকে রূপায়িত করবেন, এই চিন্তাই হবে হৃদয় ও আত্মবাক্য। তারা নির্মল জীবনের type, পতিতার স্বচ্ছ অভিজ্ঞতা তাঁদের কঠিকে কলঙ্কিত করে তুলতে পারে। হৃদয় ও কল্যাণ বা বধূ কলনীর চরিত্রকে তারাও মনোজ্ঞ রূপে দর্শকমুখে দেখোঁয়ামান করে ওলবায়। অর্থাৎ অধিকাংশই।

ଦର୍ଶା ଖୋଟେ ଓ ଯତିନାଥ

বলবেন। কিন্তু করলেই প্রশ্নটার চিরকালের মত সমাধান হয় না, কারণ ভক্তকন্যাদের চিত্রাবতরণ আদর্শ হিসাবে

১৯৪৭-৪৮ সালের
অনুপম চিত্র সম্ভার

বাজকমল কল্যাণদ্বির
শব্দভুল
জয়প্রা ৩ চল্লিশোতন

ফিল্মি জালের
চল চলবে
নও জোয়ান
শো-শ্যাক্তি ফার ৩ নামির

মাচার্য আর্টের
মাগে কদম
মতিলাল ৩ জি জি দৌ

নীতাঞ্জলি পিকচারের
স্নাও য়ামে
মমতাজ শান্তি ঐতরাম

হুজি-বের জনস
কাপের চাদ লিঃ
৩২ নং বৈদিক ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সিনেমার সমালোচনা

চল্লিশের

সবের সবারে সিনেমার ভক্ত আজ অগুপ্ত। এমন পরিবার খুব কমই পাওয়া যাবে যাদের ছেলেমেয়েরা কেউ-না কেউ হস্তা শেষে একবার সিনেমা ঘুরে না আসে।

সিনেমার এই জনপ্রিয়তার মূলে নানারকমের কারণ আছে। তবে সে সবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাগুয়ের মনে তার রসভাস জাগাবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আছে বলেই সিনেমার শিল্প আজ সাহিত্য, কাব্য, চিত্র, স্বপ্নাত প্রভৃতি অত্যন্ত ললিতকলার সমন্বয়াক্রমিক হবার দাবী রাখে।

চাপা বইয়ের গল্পে যে ছেলে মন বসাতে পারলে না সেই উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল সেই গল্পেরই ছায়াছবি দেখে। এবং হয় তো ফিরে এসে বইখানা এমন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে ফেললে যা সে আগে কখনও করে নি। এমন ঘটনা আমি বারবার প্রত্যক্ষ করেছি। রসাবেশ না ঘটলে মাগুয়ের মন এমনভাবে সাড়া দিতে পারে না। একদিক দিয়ে জনসাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা সিনেমার সত্যিই অসম্ভাব্য।

সিনেমার ছবির মাধ্যমে তাই যেমন শিল্পশক্তি করা চলে, তেমনই লোকশিক্ষার বাহন হিসাবেও একে কাজ লাগান যায়। আমাদের দেশে গীরা সিনেমার জগে ছবি তৈরি করেন তাঁদের দাবিই সেই কারণে কেবলমাত্র জনসাধারণের মনোরঞ্জন করার মতোই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। যে তাঁর অঙ্গ তাঁদের হাতে রেখে তার তীক্ষ্ণত বাবদন্ত হোক

উপযুক্ত ক্ষেত্রে,—নয় তো কেবলমাত্র মশকতুল ধ্বংস করতাই যদি কামানের ব্যবহার শেষ হয় তাহলে তার চেয়ে পরি-তাপের বিষয় আর কি হতে পারে?

জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করার উদ্দেশ্যেও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু গুরুত্ব সহ যখন দেখি সেই উদ্দেশ্য সিনেমার আর লবল সম্ভাবনাকে আমলই দিচ্ছে না। নব নব সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে চাকশির হিসাবে সিনেমা যদি লোকের মনে শিকড় গাঢ়তে না পারে, তাহলে বেশী লোকের মনোরঞ্জনও আর সে বেশীদিন দূরে করতে পারবে না। আজ আমাদের দেশে ছায়াছবির এই ব্যাপক লোকপ্রিয়তার দিনে এই শরম সত্যটি মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে।

এর মূলে একটি নিগূঢ় কারণ রয়েছে। সাধারণ আদ্যো-প্রত্যাদের ক্ষেত্রে বার বার দেখা গেছে গাভরাপত্যিকের স্থান দেখানে নেই। মাগুয়ের মন অসম্ভাব্যভাবে একই রকমের পতিবেশনায় রাস্ত হয়ে পড়ে। সে চায় নব নব সৃষ্টির বৈচিত্র্য, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর দিয়ে পুরাতন রসকেও তাই সে নতুনভাবে উপভোগ করতে চায়। সেকালের খাজার আসর থেকে একালের থিয়েটার-সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে পর্যন্ত এ সত্যের বার বার ঘাচাই হচ্ছে গেছে।

তাই আশঙ্কা হয় যখন দেখি মজ্ঞ-বাগদা নদীর মত সিনেমার গতি একই পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই একটি মেথেকে একটি ছেলে ভালবাসল,

তারপর এল বাধা তাদের মিলনে— সামাজিক বাধা, পারি-
বারিক বাধা, ভুল-বোঝার বাধা। শেষকালে সব বাধা
যুগে গিয়ে তাদের মিলন হ'ল। গল্পের মটেশাকটিও সেই-
খানে মুড়োল। স্বাক্ষরকার অধিকাংশ সিনেমার ছবি
বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি এই একটি কাঠামোই পাওয়া
যাবে।

আপাত-সাক্ষরতার মোহে ছবির নিখাতা ভাবছেন—
কৈ, সিনেমায় দর্শকের ভিত্তি ভেঙে যেতে না। পরিচালক
ভাবছেন—অমুক ছবিতে এই প্যাচ প্রশংসা পেয়েছে,
অতএব এখনও তা' কেন চলবে না। ছবির গল্প যিনি
লেখেন নাকের ডগার বাইরে চেয়ে দেখবার মত তাঁর দৃষ্টিও
নেই আগ্রহও নেই।

এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে সিনেমা শিল্পকে
গাচবার আন্দোলন তাই আজ রসাত্যাগী সমালোচককেই
করতে হবে। তবেই কাগজে কাগজে সিনেমার আসর
খোলা সফল হবে—কতকগুলি অস্থায়ী নরনারীর
নামের ও খেয়ালের ফর্দেই তা' কেবলমাত্র ভারাক্রান্ত হয়ে
উঠবে না।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্য

আপনার ব্যবসা-বাণিজ্যকে সুপ্রগতিষ্ঠিত করতে
হ'লে চাই আপনার বিজ্ঞাপন

..

এ বিষয়ে আপনাকে সর্বদা সাহায্য করতে
পারে

প্রেসিডেন্সি পাবলিসিটি

করম্বর ৩৪এ

৮৪, ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতা।

১৯৪৩-৪৪ সালের

শ্রেষ্ঠ চিত্রপটকার

সায়গল ও নুরশীদ

তারকাচিত

রঞ্জিত মুভিটোনের

তানসেন

পরিচালক

জয়ন্ত দেশাই

দেবীকারাণী ও জয়রাজ

অভিনীত

বধে টকিজের

হামারী বাত

পরিচালক : ধরমণী

স্নেহপ্রভা ও সাহু মোদক

অভিনীত

নবযুগ চিত্রপটের

লড়াই-

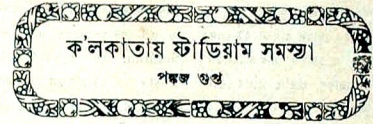
কে-বাদ

বর্তমানে কলিকাতায়
প্রদর্শিত হইতেছে

“জঙ্গলসাহেবের নাতনী
—উত্তরায়—

গৌরী—জ্যোতি সিনেমায়

জননী—বিজলী সিনেমায়



কলিকাতায় ফ্যাডিয়াম সমস্ত

পঞ্চ গুণ

প্রত্যেক পরিব্রজন্যর মূল্যেই একটা আদর্শের স্থান
রাখতে হয়। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বাস্তব
কল্পনারও সম্মিশ্রণ থাকা প্রয়োজন। কেবল অলৌকিক,
অসম্ভব একটা কিছু ভাবলেই তাকে আদর্শ বলতে পারি না।
তবে আদর্শ সব সময়ে উচ্চ হওয়াই শ্রেয়। আমার মনে
হয় বার্লিন যা ওয়েস্টারলির মত ষ্টাডিয়াম আমাদের দেশে
অসম্ভব না হলেও, সম্ভাবনার আশা বর্তমানে খুব কম।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কলিকাতায় কোন
বিশেষ রকমের ষ্টাডিয়াম হওয়া উচিত। ঠিক কি ধরনের
ষ্টাডিয়াম হ'লে ক্রীড়ামোদীদের ও খেলোয়াড়দের উভয়ের
পক্ষেই উপযুক্ত হবে। কলিকাতার মত সহরে বাদিনের
মত একটি অতিবৃহৎ খেলার মাঠের মধ্যে সমস্ত খেলার
ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। তার কারণ ঠিক সহরের নিকর
উপর এতাবড় একটা জায়গা পাওয়া দুস্কর। একটি
আবেষ্টনীর মধ্যেই ক্রিকেট ও এ্যাথলেটিক ক্রীড়ার জন্য
ওলা আকারের একটি মাঠ, এবং ফুটবল হকি প্রভৃতির জন্য
চতুষ্কোণ একটি মাঠের আয়োজন করা স্থান মাপে। সেজন্য
চুইটি মাঠের জন্য দুইটি পৃথক ষ্টাডিয়াম হওয়াই বঞ্জনীয়।

কথা উঠতে পারে ষ্টাডিয়াম কোথায় হওয়া উচিত—
সহরে না সহরতলিতে। আবার যেতে সহরে। কলিকাতায়
অসম্ভব দুইবল ও হকি সম্ভাব্যবাপী চলে। সেজন্য সহরের
প্রত্যেক পরিব্রজন্যর মূল্যেই একটা আদর্শের স্থান
রাখতে হয়। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বাস্তব
কল্পনারও সম্মিশ্রণ থাকা প্রয়োজন। কেবল অলৌকিক,
অসম্ভব একটা কিছু ভাবলেই তাকে আদর্শ বলতে পারি না।
তবে আদর্শ সব সময়ে উচ্চ হওয়াই শ্রেয়। আমার মনে
হয় বার্লিন যা ওয়েস্টারলির মত ষ্টাডিয়াম আমাদের দেশে
অসম্ভব না হলেও, সম্ভাবনার আশা বর্তমানে খুব কম।
এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কলিকাতায় কোন
বিশেষ রকমের ষ্টাডিয়াম হওয়া উচিত। ঠিক কি ধরনের
ষ্টাডিয়াম হ'লে ক্রীড়ামোদীদের ও খেলোয়াড়দের উভয়ের
পক্ষেই উপযুক্ত হবে। কলিকাতার মত সহরে বাদিনের
মত একটি অতিবৃহৎ খেলার মাঠের মধ্যে সমস্ত খেলার
ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। তার কারণ ঠিক সহরের নিকর
উপর এতাবড় একটা জায়গা পাওয়া দুস্কর। একটি
আবেষ্টনীর মধ্যেই ক্রিকেট ও এ্যাথলেটিক ক্রীড়ার জন্য
ওলা আকারের একটি মাঠ, এবং ফুটবল হকি প্রভৃতির জন্য
চতুষ্কোণ একটি মাঠের আয়োজন করা স্থান মাপে। সেজন্য
চুইটি মাঠের জন্য দুইটি পৃথক ষ্টাডিয়াম হওয়াই বঞ্জনীয়।
কথা উঠতে পারে ষ্টাডিয়াম কোথায় হওয়া উচিত—
সহরে না সহরতলিতে। আবার যেতে সহরে। কলিকাতায়
অসম্ভব দুইবল ও হকি সম্ভাব্যবাপী চলে। সেজন্য সহরের

স্বাভাবিক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর

ক'লকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে এ যুক্তি অচল। অতএব কর্পোরেশনের দায়িত্বই যে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী তা বলা বাহুল্য।

এ ছাড়া দেশের স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনরা (আই, এফ, এ., বি, এইচ, এ.; বেঙ্গল ক্রিকেট, এ্যাসোসিয়েশন) তাদের নিজস্বের প্রয়োজনমত ঠাণ্ডিমণ্ড করতে পারে।

আবার কোন একটি ক্লাবের (মোহন বাগান, ইষ্ট বেঙ্গল কালকাটা, রেজারস) একক প্রচেষ্টায়ও এ হওয়া সম্ভব। ইংলেণ্ডে আরসেনাল, ম্যানচেস্টারের প্রভৃতি দলের নিকট দেবই ঠাণ্ডিয়াম রয়েছে। আমাদের দেশে নাম করা দলগুলো তাদের মার্কেটিক রাখার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন তা যদি তারা একবারে খুব চেষ্টা করে ঠাণ্ডিয়াম তৈরীর কাজে লাগান, তবে হয়তো এটা ফলপ্রসূ হতে পারে। এতে তাদের সভাপদেরও একটা চিরস্থায়ী আয়াম ও ইবিদার ব্যবস্থা হবে এবং ক্লাবের পক্ষেও বেশ কিছু আয়ের উশায় হতে পারে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য যে আমাদের দেশে ফুটবল খেলাটাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ফলে লোকসমাগম বৈ হওয়ায় ফুটবল ঠাণ্ডিয়ামের বিশেষ অভাব বোধ করি ফুটবল দলগুলি যদি একত্র বা একক চেষ্টায় এই পরিকল্পনা সরাসরিভাবে হাত দেন, তা হলে আমার মনে হয় ফুটবল দর্শকদের অশেষ ধন্যবাদ তারা অর্জন করবেন।

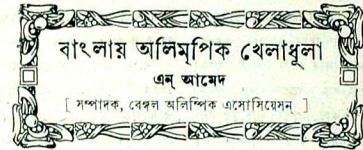
এর প্রমাণ দেখতে পাই বোম্বাইতে Brabourne Stadium এর প্রতিষ্ঠায় Cricket উৎসাহীদের ইচ্ছামাত্র প্রচেষ্টার ফল। আমরা দিল্লীর আরউই ঠাণ্ডিয়ামের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। এ ছাড়া কোন জাতীয় রাজ্যের রাজ্যের অথবা বিরলা রাষ্ট্র ইম্পাহানি প্রমুখ ধনী বাবসাহী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বাতীত এ কার্য বেশরকারীভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। পাতিয়ালার মহারাজের নাম এ বিষয়ে স্মরণ রাখা উচিত।

[১২- পৃষ্ঠার পর]

অস্বীকার করছি না। তবে কোন খেলোয়াড়ের মারাত্মক জুল যদি সধ করা চলে তাহলে রেফারীর কোন অনিচ্ছাকৃত মারাত্মক জুল উপেক্ষা করা চলবে না কেন? তবে আমার মনে হয় কোন পরিচালকের যদি দৈহিক যোগ্যতা এবং মানসিক দৃঢ়তা যথোপযুক্ত থাকে এবং দুইজন সহযোগী তাহাকে লাইনম্যান হিসাবে সাহায্য করে তাহলে তাহার পরিচালনায় ক্রীড়া খুব কমই দেখা যাবে।

হকি খেলায় আম্পায়ারদের দায়িত্ব অল্পতর দায়িত্বপূর্ণ

হলেও একজন আম্পায়ারকে অর্ধেক মাঠের খেলা পরিচালনার ভার নিতে হয় বলে ইহা রেফারীর অপেক্ষ কতকাংশ সহজ। এই খেলাটিতে এইরূপভাবে আম্পায়ার করার ব্যবস্থার কারণ এই খেলাটি ফুটবল অপেক্ষা অনেক জটিলতায় খেলা হয় এবং ইহার জন্য হকি বলের জটিল গতিই বিশেষভাবে দায়ী। তাতে হকি আম্পায়ারগণ দৃষ্টিশক্তি এবং অধিকতর দ্রুত খেলার নিয়মগুলি প্রয়োগে শক্তির প্রযুক্তি থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।



অলিম্পিক খেলাধুলা ও স্পোর্টসের কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে প্রবুদ অলিম্পিয়াডের কথা। প্রায় দুই পূর্ব ১৭৬ অব্দে এলিসের অন্তর্গত অলিম্পিয়াতে এই

এইরূপ খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হ'ত কিনা বলা যায় না তবে রাজা অশোকের সময় (পূর্বপূর্ব প্রায় ২৫৮ অব্দে) প্রস্তর লিপিতে 'সমাজ' কথার অর্থ যে সকল আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলার আয়োজন হ'ত, তাতে হয়ত কিছু পরিমাণে এই দৌড় খাঁপের বন্দোবস্ত ছিল।

বর্তমানের অলিম্পিক গেমস ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে প্রতি চার বৎসর অন্তর পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। 'বেঙ্গল অলিম্পিক' হ'য়েছে ১৯৪০ সালে বালিনি। এই সব অলিম্পিক খেলাধুলার বহু দেশের খেলোয়াড়গণ যোগদান করে আসছে। ভারতবর্ষে যোগদান ক'রেছে, কিন্তু হকি খেলা ছাড়া আর কোন কিছুতেই সাফলা লাভ করতে পারিনি।

কেন পারিনি, তার কারণ কি? তার উত্তর বলতে হ'লে ভারতবর্ষের অলিম্পিক খেলাধুলার ইতিহাস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে হয়। প্রকৃত কথা বলতে গেলে এক্ষেত্রে অলিম্পিক খেলাধুলার বচনা হয় মাত্র উনিশ বৎসর পূর্বে—১৯২৪ সালে তার পূর্বে আমাদের দেশের খেলোয়াড়গণ যে অপ্রাকৃত আনন্দাত্মিক খেলাধুলায় ভারতবর্ষ বাহিরে যোগদান করেননি তা নয়, তবে বলবৎ হ'য়ে কিম্বা সাধারণ



লেখক

খেলাধুলার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং প্রতি চার বৎসর অন্তর ইহা অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। ঠিক সেই সময়ে

প্রতিযোগিতায় নিৰ্দ্ধাৰিত হ'য়ে ভারতের প্রতিিনিধি দল হিসাবে যাননি।

এ বিষয়ে ভারতের অস্ত্রাজ প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা দেশই প্রথমে সচেতন হয়। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই বাংলার অনিশ্পিক এসোসিয়েসনের ইতিহাসে। বিগত ১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে গভরমেন্ট হাউসে এই সমিতি জন্ম লাভ করে। তখনকার বাংলার গভরবর বাহাদুর লর্ড স্টিটন এই খেলাধুলার একটি সমিতি পত্তনের জন্ম নিজেই খেলাধুলার বড় পুণ্ড্রপোষকদের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে গভরবর বাহাদুর অতঃপৰিত থাকার স্বপ্নীয় মাননীয় স্ত্রাব প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই বৈঠক বসে। বৈঠকে সভাপতি মহাশয় জানান যে ভারতবর্ষে প্যারিসে অষ্টম অনিশ্পিক গেমস এ আমন্ত্রিত হ'য়েছে এবং গ্রহণও করেছে। শীঘ্র সারা ভারত হ'তে বাছাই করা একটি দল গঠন করার জন্ম একটি কমিটি তৈরী করা হবে। অতএব বাংলা থেকে বাছাই করা একদল খেলোয়াড় দিল্লীর সাধারণ প্রতিযোগিতায় পাঠান হউক এবং এই কাৰ্য্য করার জন্ম একটি কমিটিও গঠন করা হউক।

এইভাবে গড়ে উঠল বাংলার ও ভারতবর্ষের অনিশ্পিক সমিতিবর্ষ। যদিও ভারতে ১৯২০ সাল হতে অনিশ্পিক এসোসিয়েসনের মত আর এগুটি সমিতি ছিল কিন্তু তাতে

সব প্রদেশ অংশ গ্রহণ করেনি। সেই ১৯২০ সাল হতে আঙ্গ পর্যন্ত বাংলায় ও পরে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অনিশ্পিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অল্পপ্রতি হ'য়ে আসুছে। অতি পুরান আদর্শের উপরই ভিত্তি করে বৎসরের পর বৎসর কোন ব্রবা'সামগ্রী পুরস্কার না দিয়ে কেবলমাত্র একটি করে সম্মান পত্র বিতরণে নিছক খেলাধুলার প্রীতি ও প্রতিযোগিতার উত্তম জাগিয়ে রাখা হ'য়েছে।

বাংলা দেশ থেকে যে সব খেলোয়াড় ও সাঁতার ১৯২৪ সাল হ'তে আঙ্গ পর্যন্ত পৃথিবীর অষ্টজাগি অনিশ্পিক খেলাধুলার যোগদান ক'রেছেন তাঁদের নামের সংখ্যা বুঝই অল্প। তাঁদের মধ্যে খেলা ও দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন—পি, সি, ব্যানার্জি—৪০০ গজ দৌড় ডবলিউ, আর, হিলডে—২০০ গজ ও ২০০ গজ দৌড়। জে, এন্স, হল—১০০, ২০০, ৪০০ গজ দৌড় এন্স, সার্টন ১০০, ২০০ গজ দৌড় এবং ১১০ গজ হার্টল ইনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম হার্ডলারূপে পরিগণিত হন। টি, কে, পিল; আর বারগ; আর ভারনিউজ এরাও ২০০ ও ৪০০ গজ দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। সম্ভবপ প্রতিযোগিতায় কেবল ডি, ডি, মুলজি ও এন, সি, মল্লিক যোগদান করেছিলেন। কিন্তু কেউই কোন স্থান অধিকার করতে পারেননি।



কলিকাতার মাঠে—

খেলা পরিচালনা সমস্তা

“সিবি”



এই নূতন মাসিক পত্রিকাপানিতে একটি প্রবন্ধ লেখার ক্ষমতা আমার কাছে অপরোপ এসেছে। আমাদের মত জন কয়েক ‘অখ্যাত লোকের’ সামান্য প্রচেষ্টায় যদি এই পত্রিকা-বানির বিশেষ স্থাখ্যাটির স্রীষ্টি হয় তাহলে অস্বস্তা আমরা মানদ অহুভব করব। ‘রেকর্ডার’ বা ‘স্প্যানায়ার’ অর্থাৎ খেলা পরিচালনা-সংক্ষেপে কিছু লিখব বলে ঠিক করেছি। কারণ ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি এই তিনটি জনপ্রিয় এবং প্রধান খেলার পরিচালনা করার অধিকার আমার আছে তবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে কি জানি না।

প্রথমে আমি ফুটবল খেলা পরিচালনা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই খেলাটি পরিচালনা করা সবচেয়ে দুষ্টবর্ষ যেন আমি মনে করি। অবশ্য আমার এইরূপ ধারণার কারণ এই নয় যে অজ্ঞাত খেলাগুলি অপেক্ষা ফুটবল খেলার নিয়ম কাছন্ন কিংবা ফুটবল খেলার প্রণালী এবং কৌশল অজ্ঞাত সকল খেলাগুলি অপেক্ষা অধিকতর জটিল। ইহার কারণ এই খেলাটি বিশেষ করে বাংলা দেশে আশাতীত জনপ্রিয়তালভ করেছে। তাছাড়া একটি সাধারণ খেলাতেও কখনোজন্মের বিখ্যাত দর্শকদের মনে সর্বাপেক্ষা প্রাধিক্য লাভ করে এবং তাদের এই মানসিক বৃত্তির জন্ম খেলার কৌশল এবং নৈপুণ্য মনোযোগ দিয়ে দেখবার তাদের ঐচ্ছ্য থাকে না। বিপক্ষ দলের খেলার বৈশিষ্ট্যের কথা ছেড়ে দিলেও দর্শকেরা এমন কি নিজেদের প্রিয় দলটির খেলোয়াড়দেরও

মনোও যদি নৈপুণ্যের প্রকাশ দেখেন তাহলেও তাঁরা ফলাফলের দৃষ্টিভঙ্গ্য এতই ব্যাপ্ত থাকেন যে প্রিয় খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য উপভোগ করতও ঐচ্ছ্যের পরিচয় দিতে পারেন না। তার উপর প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটির মধ্যে একটির বহি অধিক জনপ্রিয়তা থাকে কিংবা দুইটি দলেরই যদি সমভাবে জনপ্রিয়তা থাকে তাহলে খেলাটির গুরুত্ব অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনারও বৃদ্ধয়সারে বৃদ্ধি লাভ করেন।

উত্তেজনার যে একটি শ্রেণীবিভাগ আছে সেটা হয়ত অনেক বীকার করবেন না। কিন্তু আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল মাঠে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তেজনা দেখা যায়। দর্শকদের মধ্যে যে উত্তেজনা দৃষ্ট হয় এবং যা আমি উল্লেখ করেছি তাকে আমি বলি অল্প উত্তেজনা কারণ তারা চান যে তাঁদের প্রিয় দলটি যে করেই হক জয়লাভ করুক। দ্বিতীয় প্রকারের উত্তেজনা দৃষ্ট হয় প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটির খেলোয়াড়দের মধ্যে। অবশ্য এই উত্তেজনা খুব অল্পই তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় কারণ তারা নিজেদের খেলা নিয়েই অধিকতর ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়। তবে তাদের মধ্যে উত্তেজনা যে একেবারে প্রকাশ পায় না একথা বলা চলে না। খেলোয়াড়দের এই উত্তেজনা প্রকাশ পায় সাধারণতঃ যে দল অপেক্ষাকৃত নিরুত্তেজ খেলার পরিচয় দেয়। খেলার মধ্যে যদি তারা কোন কারণে এই উত্তেজনা প্রকাশের সুযোগ পায় তাহলে

তারা এই ক্রোধে সম্বাবহাংসের চেষ্টা করে। কিংবা পরাজিত দলের খেলোয়াড়েরা অনেক সময় খেলার পর তাদের উত্তেজনার আতিশয্যের পরিসর দেখা। তৃতীয় প্রকারের উত্তেজনা দুই হয় প্রতিদ্বন্দী দল দুটির কঠোর পক্ষের মধ্যে। এরূপ উত্তেজনা সম্পূর্ণ নীতি সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধবিধা। তাঁদের মধ্যে জ্ঞানবানদের উত্তেজনা থাকলেও তার মধ্যে ভাল এবং মন্দ বিচারের বৃত্তি থাকে।

গুরুতর এরূপ অনতিশ্রুত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এবং সময়ে প্রায় দশ হাজার দর্শকের সমালোচনার বস্ত্র হয়ে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তারপর খেলাটির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উত্তেজনা চড়তে থাকে। এই কারণে কোন খেলার নিয়ন্ত্রকেরা কী যে ক্রিয়াকর্ম মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হয় তা সহজেই অনুমান করা চলে। তার উপর পরিচালকের যদি কোন ক্রটি বিচ্যুতি প্রকাশ পায় তাহলে দর্শকের কাছ থেকে তিনি যে ক্রিয়াকর্ম অভিনন্দন পান তা কীভাবেই মনেই জানেন। বাইশজন খেলোয়াড় এবং এমন কি কোন দলের নির্বাচক কমিটিও যদি খেলোয়াড় নির্বাচনের কোন ক্রটির পরিচয় দেন তাহলে সে সব ক্রটি মার্জিত করা চলে। কিন্তু রেফারীর যদি সামান্য কোন ক্রটি হয় তাহলে দর্শকের মনে এই ক্রটির জন্য প্রতিবার জানাবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সজাগ হয়ে উঠে। উপরন্তু যদি কোন ভ্রমপ্রিয় দল পরাজিত থাকে এবং সেই সময়ে যদি পরিচালকের কোন ক্রটি হয় তাহলে উক্ত দলের কর্মস্বার্থকে বেধে হয় পরিচালকের ভিন্নমুণ্ড পেলে নিজ দলের জন্য অপেক্ষা অধিক সম্ভব হয়। দর্শকের মনে বসন বৃদ্ধিত্বের কোন স্থান থাকে না বলেই উক্ত উত্তেজনা-মূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা জানি। কিন্তু রেফারীর কোন ক্রটি হলে বা কিংবা হওয়া উচিত নয় এই দাবার দর্শকেরা যে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কেন করেন তার কারণ বোধ হয় তারা নিজেদেরই জানেন না। কুল মাছমেই করে এবং রেফারীরা যে মাছই এই সহজ এবং সাধারণ বুদ্ধিত্বকে দর্শকগণ কেন সাময়িকভাবে ভুলে যান তার

কারণ নির্ধারণ করা একটা সমস্যা। দর্শকবিশেষের মনে ভাবের আরও একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তারা রেফারী ক্রটির প্রতি স্রেষ্ঠ সম্মান তার ক্রটিবিশেষের প্রতি কিংবা তার পারদর্শিতার প্রতি স্রেষ্ঠ উপাসনা। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আকর্ষণীয় ফুটবল মাঠ ভালভাবে পরিচালিত হলেও যদি নগণ্য সংখ্যক দর্শক খেলাটির পরিচালককে প্রশংসায় ভরষা প্রকাশ করেন। ফুটবল খেলার সাধারণ দর্শকের মধ্যে কঠিন ভাবের মত বাস্তব প্রকাশ পায় সেই তুলনা তাঁদের কোমল ভাবের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। দর্শকদের সমালোচনার কোন দাম নেই কিংবা ভিত্তি নেই এ মত আমি অস্বীকার করি। তবে সাধারণতঃ তাঁরা খেলা পরিচালনা সম্বন্ধে মতামত দেন ফুটবল খেলার নিয়ম বলা সম্বন্ধে অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। কোন বিষয় নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে হলে যে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকে দর্শকের এই সহজ সত্য কথাটা সাধারণতঃ কীভাবেই নিঃস্বেরে অজ্ঞাতই জানেন না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য বিষয় এই যে তাদের মধ্যে অনেকেরই দাবীরা তারা কেবল নিয়মাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং তাঁরা বা বোকে সেইটাই চরম। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান খেলা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে অজ্ঞিত।

অনেক দর্শকদের বলতে শোনা যায় যে রেফারীর সি জানে না এবং খেলা পরিচালনা বিষয়ে তাহার অক্ষম আবার অনেক রেফারী সম্বন্ধে দর্শকদের মত তারা পক্ষপাত দোষদুষ্ট। মোটামুটি ব্যাপারটা এই যে ভারতীয় রেফারী গণ সাধারণতঃ কোন না কোন কারণে খেলা পরিচালনা পক্ষে অযোগ্য। কিন্তু দর্শকদের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায়, ইউরোপীয় কিংবা এংলো ইন্ডিয়ান রেফারীর বিষয়ে। এই দুই জাতীয় রেফারীর যদি কোন সাধারণ ভারতীয় রেফারী অপেক্ষা নিরপেক্ষ হয় তাহলেও তাহার স্থান অনেক উচ্চে বলিয়া আমাদের দেশের কীভাবেই বিবেচনা করেন।

খেলা পরিচালনায় যে কোন ক্রটি হয় না এ কথা আমি (অবশিষ্টাংশ ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ)

কখন ফুটবল খেলায় গুলি মেরে মেরে শেষরাতির দিকে এসে পৌছোতে, প্রিয়কুমারের কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। ক্রমশঃ দর্শকের অক্ষমতার পরিচয় জোখা দেখা দিয়েছে, রাতজাগা গাখী কোলাহল হারাগার হয়ে শুভ হয়ে গেছে, কখন নিঃশাঙ্ক বহুকার জগৎ তার চরুপথের প্রান্তে এসে পড়িয়ে প্রভাতের নভ্যনীর জানাচ্ছিল, তাও এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অজ্ঞাত ছিল।

সন্ধ্যা আচমকা এক সময়ে প্রিয়কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন সে ঘুমিয়েছিল, কেন তা'র ঘুম ভাঙলো, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু উৎকর্ষ অধ্যাপকের বিশেষণী বুদ্ধি একথা অনুভব করলো, তার আচমকা ঘুমভাঙার একটা সম্ভব কারণ আছে বৈ কি। ঘরের খোলা দরজা, উজ্জল আলো, ব্র্যাকেটের গুপের টিকটিকে ঘড়ি, দেয়ালের ছবি, বাগানের আনন্দ—সবগুলো যেন চক্ষুর করে মুখ বুজে গোপন কথাটা চেষ্টা রয়েছে। মনে হচ্ছে একটা অশ্লীল সম্ভাবনার আচেনন ঘুমের মধ্যে নিশ্চলস্বার্থে এসে পড়িয়েছিল, সেটার অশরীরী আশ্বাসটা এখনো তা'র ঘড়িতে পড়ায় ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক, ঘড়িতে রাড সাড়ে চারটা বাজে। অবশ্যই ঘরে সে ঘুমিয়েছে? এত তা'র ঘুম?

সন্ধ্যা বাইরে খড়িমার গলার আগুয় পাওয়া গেল—

এখানে কে গা পড়িয়ে? বোমা নাকি?

পলকের জল মুক্তার মতো একটা ভূহীন শব্দটা। তারপর শোনা হল, না খড়িমা, আমি।

কে, রাহু?

জাঙ্ক হ্যা—

খড়িমা বললেন, এত রাত থাকতে উঠেছেন, রাহু?

তার কণ্ঠে কেমন একটা সশব্দের আভাস পেয়ে দেবীরাণী একটু ভতিয়ে জবাব দিল, ঘুমটা ভেঙে গেল তার থাকতে। আজ ভোরের গাড়ীতে মারার তাসা আছে কিনা—

এটা একটা আকস্মিক কৈফিয়ত, প্রিয়কুমারের কানে বাজতে লাগলো। দেবীরাণী চলে যাওয়া স্থির করে

ফেলো একটা নিমেষের মধ্যেই। সে এত অবির, এতই অন্তর!

খড়িমা বললেন, ওমা, প্রিয়কুমারের ঘরে আলো জ্বলছে কেন? ও কি এখানে ঘুমোয়নি? - বোমা, ভুলই ও বোমা—?

প্রতিমা দ্রুতমত করে জেগে উঠলো। উঠে সাড়া দিল, কেন খড়িমা?

বোমার এত ঘুম কেন, বোমা? সমস্ত রাত ঘরে প্রিয়'র ঘরে আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা—তুমি একটাবার খবর নিতে পারোনি কেন? এত রাতে রাহু চুপ করে পড়িয়ে রয়েছে বোমার ঘর! তা'রও একটা বোমার খবর রাখা তোমার উচিত ছিল, বোমা?—খড়িমা বিরক্ত, উত্তর ও সশব্দাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিমা বাইরে এসে বলল, দেবীমিদি, এখানে পড়িয়ে যে?

দেবীরাণী অসাড় ও চেতনাহীন হয়ে জোখাগুলোকে ঘিরে নিমেষ নিহত চক্ষে পড়িয়েছিল। প্রতিমার প্রশ্নে সে সশব্দতঃ গাখী কিয়দে মুহুর্তে বলল, জোয়ার বড়ীতে এক জায়গায় চুপ করে পড়িয়ে থাকো, কিংবা রাতজাগার স্বাধীনতা নেই—একথা জানতুম না, প্রতিমা।

তা'র গলার আগুয়—প্রতিমা একটু লজ্জিত হয়ে সরে পাড়ালো। বলল, না দিদি, তুমি ঘুমোওনি কিনা তাই বলছি—আসছি ভাই ওপর থেকে।

প্রতিমা এলা স্বাধীন ঘর। বিছানার কাছে এসে সে প্রিয়কুমারের পা তেলে ডাকলো, কিন্তু একবার ঘুমোলে প্রিয়কুমারের আর কাণজান থাকে না। সে একেবারে বোম, তা'র নাক ডাকছে। পাছে শেষরাতে আগুয় প্রিয়কুমার বিরক্ত হয়, সেজন্ত প্রতিমা আর তাকে ডাকলো না। কিন্তু হাতখানা সঠিকের নিম্নে প্রতিমা দেখলো, তার হাতে জলের দাগ। নদীয়ার কোন্ এক গুণ্ডামের দাগ মেরে সে, সে নির্দোষ—জলের দাগের কারণটাকে সে ভুলিয়ে বুঝলো না। আরোটা নিম্নে দরজাটা ভেঙিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তা'র মনে কোনো সন্দেহের ছোঁয়া লাগেনি।

খুঁড়িয়া বললেন, তুমি আর সুমিয়ানা, বৌমা। রাগ যাবে ভোয়ের গাড়ীতে—তা'র জিনিসপাছ গোছাগছ করে দাও। বনমালীকে ভেঁকে উঠলে আঙন বিতে বলে।

শব্দকালের রাগি প্রভাত হয়ে এলো। প্রিয়কুমার ঘুম থেকে উঠলো। শুনলো, দেবীরাণী এখনই চলে যাবে। সে দৃঢ় হাত দিয়ে প্রস্তুত হোলো। বনমালী গাড়ী ভেঁকে আনলে।

দেবীরাণী গাড়ীতে ওঠবার আগে প্রতিমাকে আদর করলো, তারপর প্রিয়কুমারের দিকে ফিরে বললে, শুনেছি মরবার পরে মাঘষ কোথায় গিয়ে যেন নিজের একটা কৈকিষৎ দেয়। আমিও কৈকিষৎ দিয়ে বলতে পারবো, সমস্ত জীবন খরে জলে পুড়ে থাকে হয়েছি বটে, কিন্তু নির-পরাককে কখনো প্রভাৱশা করিনি!

প্রিয়কুমার হাসিমুখে বললে, কিন্তু নিরপরাদকে অনিচ্ছা যারা চিরদিন খরে ঠকাবে, তাদের কি উদ্ধার নেই?

প্রভাতের আলোর মত দেবীরাণী হেসে উঠলো। বললে, বেশ ত, অশনি আমি একসঙ্গে গিয়ে ঘি মধাকালের বিচার সভায় দাঁড়াতে পারি, তখন এর মীমাংসা হবে।

অদূরে দাঁড়িয়ে খুঁড়িয়া বললেন, তোমার গাড়ীর সমা হোলো, রাগ। এসো, মা এশো—সম্মতি হোক—দুর্গা—দুর্গা—

দেবীরাণী গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী ছেড়ে দি-সেইদিকে একাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়কুমার মনে মনে বললে, সেখানেও এর মীমাংসা হবেনা, রাগ।

[২৩শ পৃষ্ঠার পর]

কবে' Beethoven তার চরম স্বর-সৌধ রচনা করেন, প্রায় ১০ বছর ধরে (১৮১১—১৮২৪)। সে রচনা তার Ninth Symphony এটি তাঁকে অমর করেছে। ১৮১২ সালে Vienna municipalityকে উপলক্ষ করে; তিনি বলেন—যে কেউ সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করে যে সব দুঃস্থের সব দুঃখ ভর্য করতে পারে—এইটুকু আমি প্রাণণ করে যেতে চাই—মাঘষ সত্যি বড় কিসে? ভাল বাসায়। প্রেম ছাড়া অন্য কোন মহত্বের দাবী আমি স্বীকার করি না। রক্ত মাংসের সব দুর্কলতা উপেক্ষা করে মাঘষ জ্বী হত! নিজেস্ব, নিজে মাঘাঘা ভরতে হবে—ভরাঘ হারিও না। এসব কথা যেন আঙনের মত আঙ্গু নরনারীর প্রাণে নৃতন সাহস ও প্রেরণা জাগায় প্রকৃষ্টি ও ঐশ্বের অনেক নিষ্ঠুর প্রশংসা উপেক্ষা করে বেটোমক্স প্রাণণ করে গেছেন যে দুঃখ বেনদার সাগর পার হয়ে আনন্দ লোকে স্বাস্থী প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। তাই Ninth Symphony'র চরম বিকাশ দেখি “Hymn to Joy”—Schiller-এর কবিতার সঙ্গীতে অমর অধ্বাবার। যুর সঙ্গীতের মধ্যে যখন নরনারীর বিজয় মধুর কণ্ঠ সঙ্গীত সঞ্চার হয়ে ওঠে—ইউরোপের সঙ্গীত শালায় চোখ বুজে অধব করবেছি যেন সেই উপনিষদের যুগে গিয়ে গেছি যখন এই ভারতের অমি উদ্বাস্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন:—

“আনন্দাঙ্কের পথিধানি কৃত্যতি জায়ন্তে

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি

আনন্দম প্রাণাভিঃশিশতি।

এই সত্য বর্ণনায় ও তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে প্রকাশ করে গেছেন:—

“আনন্দ গান উঠুক তবে বাজি

আজি আমার বাথার বীণীতে।

অশঙ্কলের ডেউএর পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।”

২৩শে মার্চ ১৮২৭ সালে জীবনব্যাপী সাহনের চর নির্বাণ হয়। তার কিছুদিন পূর্বে তাঁর শেষ চিঠির মধ্যে দেখি কী নিমগ্ন একাকী তিনি—কী অর্থ কষ্ট তখনও এই কি আনন্দ উপাসকের শেষ পরিণতি? তিনি লেখেন:—“জীবনে মৃত্যু বহন করে এসেছি বহনিন। আমার পূর্বে শুধু এই প্রার্থনা, ভগবান যেন অর্থাভাবে দৃষ্টিভ্রান্ত থেকে আমার রেহাই দেন।” অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্বে, Beethoven একজন পাউণ্ড ও উপহার পান, তাঁর হংলণ্ডের বন্ধুদের কাছ থেকে—Philharmonic Society of London এই টায় পাঠিয়ে সে অমর শিল্পীর দৃষ্টিভ্রান্ত একটু দূর করেছিলো সেজন্য জগতের স্বর-সিকরণ সর্বত্র স্তব্ধ থাকবে।

দুঃখ-বাহন-দীপ Beethoven এর জীবনী মানবে চির সমাপ্ত হয়ে চিরকাল নির্ভর দেবে।

প্রেমশক্তির বিকাশ

(যৌন বিজ্ঞান)

ইউরফ

আর ম্যাকান্ড্র, বীর্ঘাশক্তি লাভ সঞ্চয় পুণ্ডকে নিখিয়াছেন—“মানসজ্ঞাত ইন্দিয়মান সভ্যতারই একটি পরিণাম।” পুরাতন সাহিত্য বা প্রাচীন অসম্পূর্ণ সজ্জাব্যয়ের ইন্দিয় সভ্যতার দিকটি পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাই কোথাও স্ত্রীভবের উল্লেখ নাই এবং বৈদিক ইন্দিয় কষ্ট প্রায় একেবারে শূন্য। কিন্তু সভ্যতার আলোক-প্রাণ জাতিগুলির মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্রই ভিন্ন অবস্থা! একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ অহুসার স্বভাবের মধ্যে শত-করা ৭৫ জনের উপর ব্যক্তি কোন না কোন ইন্দিয়কণ্টে সীড়িত হইতেছেন বা হইয়াছেন। আমার মতও অনেকটাই এইরূপ। অনেকেরই হয়তো ব্যাধি জড়ত বীর্ঘাশ্বলনমাত্র, কিন্তু অধিকাংশই মানসিক স্ত্রীভব।

হাঁহারা মনে করেন যে ইন্দিয়শক্তি সখ্যে তাঁহারা স্মৃতিয্য তাঁহারা ইন্দিয় রোগের এই উচ্চ হাব দেখিয়া যে পুণিক্ত হইবেন তাহা নহে। বহনিন হইতেই প্রতি-বিধানের চিন্তা করা হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা বেশীর ভাগই বিফল হইয়াছে। রোগ প্রতিকার সহজ নহে সেজন্য রোগীর দুলভ্য দুর্কলতা সহ্যভুক্তির বস।

কানিক্স দাউদোর্সেল্যের চিকিৎসা

কিন্তু সহ্যভুক্তিই সব নহে। রোগ নিরন্তর জগ্ন বোনও অমোঘ পহারও প্রয়োজন। প্রাণ উঠিতে পারে যে

ইহার কারণ, আরোগ্য বিখাসের উপর নির্ভর করে এবং যে ব্যক্তি শুভম্বে অস্বাভাব্য তাহার মনে বিবাসের উদয় স্বভাবতই সহজ হয় না। তাহার চরিত্রবল বা মানসিক শক্তি যতই থাকুক না কেন নিজেস্ব পৌরুষে মনে করি-বার কোন নিশ্চিষ্ট পথ্য যে নাই। অনেকেরই মনে করেন যে ব্যক্তি কানিক্সভাবে নিবীঘ্য সে বৃষ্টি শারীরিকভাবে অশক্ত ও অপদার্য। ইহা সত্য নয় বরং সত্য ইহার বিপরীত। সাধারণতঃ হাঁহারা প্রকৃষ্টি, হাঁহারা চিন্তা ও অহুত্ব করেন তাঁহারা এই দৈবজ্ঞের বশীভূত। অহিস্যক্স নিউটন, রাবিন, এবং কারলাইল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের অনেকেরই স্ত্রী ছিলেন।

ক্ষয়িকের বলক্ষয়ে অনেকের মনে অনেকভাবে প্রকৃষ্টি হয়। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইহাও প্রায় উপেক্ষা করেন কিন্তু অধিকাংশই ইহা হারা অত্যন্ত বিরত হন। তাঁহাদের অনেকেরই দৃঢ়ত্যাগবশতঃ পুরুষস্বহীনতা হারা নিজেকে বিভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন এবং এমন কি অনেক কক্ষ-শক্তিও হারা ইহা ফেলেন। কেবলমাত্র নিজের রোগ ছাড়া আর সকল বিষয়ে মনযোগ প্রয়োগ করিবার শক্তি অশ্বহিত হয় এবং ফলে সাধারণ স্বাস্থ্য সাময়িকভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। রোগী কখনও কখনও রাগির পর রাগি অনিচ্ছা বাপন বোনও অমোঘ পহারও প্রয়োজন। প্রাণ উঠিতে পারে যে

ম্যাও সংযোজনকার উপকারিতা—

সহজাত বুদ্ধির বশে নিম্ন ব্যক্তির মত নির্বোধ রোগী হাত বাড়ায়। যাহা সামনে পান তাহাই ধরিয়া ফেলেন। প্রতিকার করলে যে কোন টনিক বা বড়ি তাঁহারা গলাগ-করণ করেন কেহ কেহ বিশ্বাসনা আশ্রয়তা বা ঐরূপ কোন কিছুৎ সমাধানের আশ্রয় লন। পূর্বযৌবন লাভের বুঝা চেষ্টাও করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ম্যাও সংযোজনকার উপকারীতার বিষয় অনেক শোনা গিয়াছিল। ডাঃ ভেরানক্ পুঙ্খবর্ণনের উপর বিশ্বাসপাচার করিয়া বানদের ম্যাও সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের পুনরুজ্জীবিত ইন্দ্রিয়শক্তির আশায়। শুনিয়াছি তিনি নিম্নের উপর পরীক্ষা করেন নাই। সেই সময়ে ডাঃ লিওটনও অনেকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া দৈবত্ববি-পাকে সমুদয় স্রীপুঙ্খের ম্যাও সংগ্রহ করিয়া অণুকায়ে অথবা ভিক্ষাক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সাহস এবং নিশ্চিন্তাবশতঃ তিনি নিজের উপরও এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সবগুলি ক্ষেত্রেই অল্পমাত্রায় মধ্যেই ম্যাওগুলি পুষ্টি না পাইয়া শুকনাই গেল। কোন কোন রোগী উপকার পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় খানিকটা “অটো সাজেকশনের” জন্য। যে ব্যক্তি খাণ্ডুলোপের কাতর সে যে ঐরূপ অস্ত্রোপচারের উপর অত্যন্ত আস্থা-বান তাহা অতি স্পষ্ট। আজকাল যে আমরা এই ম্যাও সন্নিবেশের নিমিত্ত অস্ত্রোপচারের কথা একটুইও শুনি না, ইহাই এক খালী উপকারীতা হুতি করে।

অন্য অনেকপ্রকার প্রতিক্রিয়া এক্ষণে চেষ্টা করা হইতেছে। অনেক চিকিৎসকপ্রবর ম্যাও নিম্নতর রস, ভিটামিনের বড়ি প্রভৃতি দ্রব্যের বিধান দিতেছেন। যেখানে প্রকৃত বিকলতা বর্তমান সেখানে কোন কোনটা যে কার্যকরী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মাছের সাধারণতঃ যে প্রচুর খাদ্যগ্রহণ করে তাহা হইতেই দেহ তাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আকর্ষণ করিয়া লয় এবং প্রকৃতি যেখানে অক্ষম ঐবধ যে সেখানে সক্ষম হইবে ইহা অসম্ভব।

প্রতিকার—

আমার পাঠকেরা আমাকে অনেকবার পুঙ্খবর্ণন দৈন্যে কোন প্রতিকার উল্লেখ করিতে অস্বরোধ করিয়াছেন। যদি কণিক ইন্ড্রিয়দোষের কোন সহজ উপচার থাকিত তাহা হইলে তাহার নির্দেশ দিতে আমিই সর্লোপেচ উল্লিখিত হইতাম। তুর্ভাগ্যবশতঃ সেখান কিছু আমার জানা নাই। আমার মতে বোগোপশমের মাত্র একটা উপায় আছে। তাহা স্বাভাবিক উপায় এবং তাহা সময় সাপেক্ষ।

অবিবাহিত ব্যক্তি—

মানসিক খাণ্ডুলোপের বশীভূত অবিবাহিত ব্যক্তি সমুদয় আমি প্রথমে আলোচনা করিব, কারণ নাম হইতেই প্রতীয়মান যে তাহার বোগ মনের মধ্যে নিবদ্ধ। “বোগীকে ভয় দূর কর এবং তোমার বোগ উপশম হইবে” এইমাত্র বলা যথেষ্ট নহে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে ভীতির সহিত যুদ্ধে তাহাকে তাহার সমস্ত মানসিক বলকে একত্রিত করিতে হইবে। সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিজ আয়ত্রে আনিবে, এবং যে সকল অনিষ্টকর চিন্তা তাহাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মিয়মান করিবে তাহাকে সন্তোষে উৎপাদিত করিতে হইবে। এই অক্ষমতা চিন্তাই তাহার শক্তি বিপর্যয়ের কারণ।

কাল্মসিক স্রীষ—

দেখা যাক, কাল্মসিক স্রীষের মুহমান ব্যক্তির মানসিকতা, বস্তুগণ সে পীড়িত ছিল—তাহার বিবাহ স্থির তাহার পক্ষে বিবাহ বাক্য ও ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা কলমে সম্ভব হইবে না। তাহার স্থির বিবাহ ছিল যে কিছুই তাহাকে নিরাময় করিতে পারিবে না। সে ভাঙ্কার দেখাইয়াছে, টনিক পাইয়াছে, বিশ্রাম লইয়াছে, বিশ্বাসও মানসিক বল সঞ্চয় করিয়াছে, নিজস্ব করিতে প্রয়াসী হইয়াছে কিন্তু বিবাহের সে যে আরোগ্যের বাহিরে একথাটা সে ভুলিতে পারে—নাই। কোনদিন সে জাগ্রত বোধ করে এবং কোন প্রভাতে হয়তো তাহার শুন্তন হয় তাহার পর আবার সেই পুরাতন ঔদাসিন্য ও স্রীষের প্রাডকালীন শুন্তনকে উদ্বিগ্ন লক্ষণ মনে না করিয়া

মনে করে ইহা বৃষ্টি মৃত্যুর শেষ নিবাস। সে বর্তমান ও মৃত্যুরে চুই অভ্যাস বা আপন অধ্যাত্মকে দোষী করে। মায়াযোরা, পৃষ্টবন্দনা প্রভৃতি নানা লক্ষণ তাহার অনতি-বৃহস্মাশ্রি হুতি করে। সে অহুভব করে সে ক্রমেই ভাঙ্কিয়া পড়িতেছে। তাহার স্রীষ তাহার সমস্ত চিন্তাকে বৃষ্টি করে এবং তাহার অশ্রুনিহিত শক্তিকে বর্ধক করে। বস্তুতঃ স্রীষের প্রতি সে আর তেমন উৎসাহী নহে। কাম ভাব খাপিলেও তাহার ইন্দ্রিয় কোন সান্ত্বনা দেয় না। কিন্তু কাল্মসিক স্রীষের বশীভূত সকল ব্যক্তিরই নিরাময় হওয়া সম্ভব। যদি কোন পাঠকের অবস্থা উল্লিখিতরূপ হয় তিনিও আরোগ্য পাইতে পারেন। রোগীই নিজেকে আরোগ্য করেন, কেহ মনবলে তাহা করিতে পারে না।

সময় সাপেক্ষ—

প্রথমে স্রীষী যে বহুকালের ব্যাধি শীঘ্র নিরাময় হয় না। ইহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে সপ্তাহ বা মাসাধিক বাল ব্যক্তিও পাইতে পারে। বর্নিত হুচিন্তা যদি সর্লোপেচা স্রীষের পক্ষেও মনে স্থান নেন তাহাযোগে যে পৌকমেয় ইহার কোন সম্ভাবনা নাই—এই তাৎপর্য। জগদ্বন্দ্ব হইলে একটা বিরাট বাধা অভিক্রান্ত হইবে। রোগীর বৃষ্টিতে গরা চাই যে তাহার ব্যাধি অঙ্কিত, সহজাত নহে এবং অসভ্যভাবের মধ্যে সে ব্যাধির চিহ্নমাত্রও নাই। অন্য কথা কাল্মসিক স্রীষ (এবং অধিকাংশ বিকলতাই ঐ নামেই) কোন ব্যাধি নহে, পরন্তু দেহের একটু স্থল অঙ্গ বিস্তার বা দ্বন্দ্বত করার লক্ষ্য। মাংসপেশী বা স্নায়ু বৃত্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত নহে পরন্তু তাহারো দুশ্চিন্তায় নিজেই ইহা সময়ে সান্ত্বনা দেয় না। হাঙ্কর গল্পে বিশ্বাস করা উচিত নহে, যে হুত্রেমুখন বা অতিরিক্ত সপ্নমের ফলে সে এই দৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী তাহার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। কোন চিন্তা মনে উদয় হওযাকে আবার নিবৃত্ত করিতে পারি না, কিন্তু তাহার দোষগুণ নির্ণয় করিতে পারি। চিত্তবিকলকারী সকল চিন্তাকে সবলে দূর করিতে হইবে। শুধু এই উপদেশে অবশ্য কাব্যকরী হইবে না। মনকে সর্লোপ কোন কথো নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

যখন অনিষ্টকর চিন্তা দূর হইবে তখন ইষ্টকর চিন্তার দ্বারা মনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। এ অবস্থায় মাছের সর্লোপেচ চিন্তা তাহার প্রাত্যহিক জীবনের ব্যাপার নহা, তাহার কর্মশক্তি, ব্যবসা, ও সাধারণ জীবন ইত্যাদি। কোন জিনিষ খতাইয়া দেখিবার চেষ্টা বা বোগ সমুদয় চিন্তায় ভাঙ্কাক্রান্ত হওয়া যে কোন রকমে বিলম্বিত হইবে।

তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি হ্রাসের সময়ে রোগী অবশ্য বোগের পরিমাণ বা গভীরতা নির্ণয় করিতে যত্নবান হয় এবং যত্নবতই সে আবিষ্কার করে ক্রমশঃ অবগতন। সে জানে না যে শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাপারে যত অধিক নির্ভরনা বা গবেষণাহীন হওয়া যায় ততই তাহা হুচাক্রান্তে সংঘটিত হয়। আরোগ্যের সময়ে এই সকল গবেষণা হইতে বিরত হওয়া উচিত। তাহার কার্যের ভার হইতেছে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, এবং যদি সে পূর্লোপেচা উত্তমশীল না অহুভব করে তাহা হইলেও সে যেন বিচলিত না হয়।

তাহার ইন্দ্রিয়ের পেশী ও দৃঢ়তা, স্নাত্তের-ক্রিয়ায় অত্যধিক দুশ্চিন্তাধারা সাময়িকভাবে ব্যাহত হইয়াছে। যাহারা সর্লোপ ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদয় অহুভার করিয়াছেন তাহাদেরও অনেক বিবাহের কালে এই কথো পতিত হইয়াছেন ও তাহাদের বিধানও এইরূপ।

একটা উপায় দেওয়া যাক। যদি অন্যভাও কেহ এক মাইল দৌড়িতে চায় সে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই বেগ কমাইতে বাধা হইবে বা একেবারে থামিয়া যাইবে। যদি অন্যভাও হয় ত এক মাইলের পর আরও এক মাইল দৌড়িবার জন্য প্রস্তুত হইবে। তেমনিই অনেকদিন যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেন নাই তিনি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারেন না। দেহকে মাসীক প্রভাতিত দেহের উপর পড়ে এবং তাহা মনে করিয়া গুপিত হওয়া উচিত নহে। কোন সময়েই রোগী হতাশ হইবে না। ইন্দ্রিয় ভোগের সামগ্রী, যথেষ্ট বা দুশ্চিন্তার নহে। সেসকল চিকিৎসাকালে কোনরূপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে,

কারণ ঐসময়ে ইন্দ্রিয়শক্তি অনেক সময় হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং তাহা মনের উপর হতাশা ও উৎকণ্ঠা আনে। কেহই এমন কি মহাবীরাশালীও কামতাবের সহায়তা ছিন্ন ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতে সক্ষম হন না। অল্প কথায় স্বাভাবিক ভোগের আনন্দ লাভেচ্ছা ব্যক্তিকে কেবলমাত্র পরীকার ইচ্ছাবশত কোন কার্যে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নহে।

আর একটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা উচিত। প্রত্যহ প্রভাতে মুক্ত ও পবিত্র বাতাসে কিছুক্ষণ গভীরভাবে নিশ্বাস গ্রহণ লইলে শ্বাস্ব এবং অঙ্গমাশ্রিত পেশী স্বস্থ ও সশল হয়। ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

বিবাহিত রোগী—

বিবাহিত রোগীকে আমার উপদেশ—যতদিন না স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন, ঐশ্বরিক শক্তি সঞ্চয়ন করিতে থাকুন। বাইবেলে ইহা স্বন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে “বাহার আছে—সেই পাইবে, তাহারই হইবে প্রার্থনা” একদিক দিয়া সম্ভোগময় জীবন দীর্ঘায়ু সহিত ভুলনা। ্যে ব্যক্তি পক্ষ বৃদ্ধ হন, মনে করা হয় তিনি খুব সফল করিয়া রাখিয়াছেন এবং খুব নিলিপ্ত জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহা নহে বরং তিনিই ছিলেন সৰ্ব্বশক্তি। নিরন্ত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি বন্ধ করা যায় না তাহাতে শক্তি হ্রাস হইবারই সম্ভাবনা। ইন্দ্রিয়শক্তি গঠনে ও ধারণে তাহার স্তায়সত্ত্ব ব্যবহার প্রয়োজন।

অবিবাহিত মানসিক রীতিবোধ ব্যক্তির প্রতি আমার উপদেশ সরল ও স্পষ্ট। তিনি অবশ্যই নৈরাশ্রজনক চিন্তা পরিহার করিয়া স্বচিন্তায় কাণ্ডহরণ করিবেন। অসামান্য চিন্তা করিয়া জঘনিত হইবেন না। কামতাবের উদ্ভব হইলে তাহাকে বাদ্য দিবেন না বরং তাহার স্বাভাবিক পরিণতির সাহায্য করিবেন এবং যখন আত্মরোগ্য তিরতবে প্রস্তুতিগত হইবে তখন সে সৎকাজ অঙ্গ যত্নবান

ব্যক্তি যাহা চিন্তা করেন তাহার অধিক চিন্তা করিবেন না।

বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অধিকতর সহজ ও তাহার স্ত্রী তাহাকে ভালবাসেন ও তাহার প্রিয়তমে আত্মস্বাচ্ছন্দ্য ক্রমশঃ করিবার জন্য তাহার সহিত সহযোগিতা করেন। স্ত্রীর কর্তব্য বিবাহকালে আলোচনা করিবার ক্ষমতা আমার হইবে না, কিন্তু তাহার প্রধান কর্তব্য হইবে যদি উপর সর্বদা পক্ষণের পুণ্যধর্ম উদ্ভব করিয়া রাখা। যদি স্ত্রী উভয়ে—প্রেমবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হইলে ও তাহা আত্মিক করিতে সক্ষম হইলে কার্য সুসাধ্য হয়। বিবাহিত জীত আরোগ্য সহজ হয় কারণ স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছায় প্রস্তুতি উদ্ভব করিয়া তাহাকে সাহায্য করেন। তাহার কাহারই অধিক তর গুরুত্বপূর্ণ। ভাঃ ই, ভ্রু, হিত” তাহার “পান্ডুরা লাভ” পুত্রকে বলেন—“স্বাস্থ্যমানে ও সময়ে রমণীর—মহা হস্তস্পর্শ যত কামুকতা আছে সর্বাঙ্গপেক্ষা শক্তিশালী সাধনা ম্যাগনিফিসেন্ট বসেও তাহা নাই।”

প্রেমোভিজ্ঞ বিবাহিত ব্যক্তি কালক্রমে স্ত্রীবৎ পীড়িত একপ ক্রান্তি দেখা যায়—যদি না সে বিবাহের প্রায় নিজেই শক্তি সঞ্চে সন্নিহান হয়। সময়ে সময়ে সে হাত প্রেমের আঁট আঁস্ত করিতে পারে না ও পরিত্যাগ করিয়া যায়।

বাধ্যতাবের মধ্যে ছন্দ, মল, ডিম, এবং সর্বপ্রকার পুষ্কর পাণ্ড গ্রহণ করা কর্তব্য কিন্তু এ বিষয়ে অধিক চিন্তা করা নাই। উত্তমরূপ ব্যায়াম ও মুক্তবাস তাই অপেক্ষাও অধিক আবশ্যকীয়।

নিরাশ্রয়ের পর একরা বীরাহীন ব্যক্তি বিবাহিত হইলে রোগের কারণ চিন্তা করিয়া। আরোগ্য কত সহজ কিন্তু ইহা কত তুল্য! তেজস্বী ব্যক্তি তিনিই নিঃস্বাভাবিক, যিনি ভয় ও সন্দেহ হইতে মনকে মুক্ত রাখে সকল মাহুয়েই এইরূপ হওয়া উচিত। ইহাই আপনাকে অন্তিমতঃ শক্তি—প্রেম করিবার শক্তি।

বরলিপ্ত শেখ হওয়া পূর্ণ্য অপেক্ষা করবে। আজ্ঞা আশ্রয়, দেশে দেশে যাওয়া গাড়ীর পর সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত চালা-গাড়িতে সে আশ্রয় ঘরিয়ে দেবার জঙ্ক দিল।

এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডে মাছুষ মরল মোটে একজন। দুর্ভাগ্য সামনের গর গাড়ীতে ছিল। গাড়োয়ানেরা পালানোর অবসর পেল কিন্তু দুর্ভাগ্যটিকে বেঁধে রাখায় গাড়ীর সঙ্গে সেও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই গাড়ীটাকে পাঁচ ছ' গ্যালন পেট্রল ঢালা হয়েছিল। গাড়োয়ান ও দর্শকদের রানো করো শরীরে একটু ছাঁকা লাগল এবং গাড়োয়ানের বয়েকজনের রাধা একটু ক্ষেতে গেল। আর কিছুই হল না।

অপরকে নগরগাড়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ডক্টরকে মহীধরের কাছে দরবার করতে গেলেন। বললেন, “এবার আমি বিলামসনকে বিদায় দিন।”

মহীধর বিজ্ঞত হয়ে বলল, “কি করে বিদায় দেব?”

“চলে যেতে বলুন।”

“তেতে বলল কি যাবে!”

কথাটা তার নিজের কাণেই একটু অদ্ভুত শোনাল মনে। তার জমিদারী, তার বাড়ী, তার লাক্ষ্মন, তার পদ্মা—সে যেতে বলল বিলামসন যাবে না একবার যেন সত্যসত্যই কোন মানে হয় না।

ভালোকেরা বললেন, “ওকে যেতে বলুন, আজকেই যেতে বলুন। ওর সঙ্গে আপনিও কোন মারা পড়বেন?”

মহীধর সন্তুষ্ট হয়ে বলল, “আজ্ঞা, দেখি বলে কি হয়। আশনার অন্ত ব্যত্ হবেন না, একটু সময় দিন আমাকে।” বিলামসনেরা বৈকালিক চা পান করছিল, মহীধর সেখানে গিয়ে চা খেতে অস্বীকার করে গভীর চিন্তিত মুখে বলল, “এবার সত্যি সত্যি তোমার মাস ছয়কের বিশ্রাম নেওয়া দরকার বিলামসন। তুমি কালকেই যাও। আমি

এখন ট্যাঙ্কার দিয়ে দিচ্ছি যে তুমি কাল থেকে ছ’মাসের ছুটিতে বেড়াতে যাবে।”

বিলামসন শুধু বলল, “কেন্দ্রে? এ অবস্থায় তোমাকে ফেলি কি আমি যেতে পারি! আমি গেলে কি অবস্থা পাড়াবে ভেবে দেখেছ? সবাই মারা পড়বে।”

মহীধর ভীত নয় কেবল মনের গড়নটা তার খাপছাড়া। জীবনে কোনদিন যে কথা উচ্চারণ করতে পারবে ভাবে নি আজ্ঞা অন্যায়কে বিনা বিধায় সেই কথাগুলি বলে, বলল, “তা হোক, তোমায় আমি আর থাকতে দিতে পারি না বিলামসন। তোমার আমার ছ’মাসের ভালর জঙ্কই তোমাকে আমার যেতে বলতে হচ্ছে। তুমি কাল সকালে রওনা হবে। আমি এখনি খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, শুনেলে সকলে শান্ত হবে।”

বিলামসন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, “তোমার কান্ডজান লোপ পেয়েছে রায়। আমি চলে যাব শোণা মাত্র ওদের সাহস বেড়ে যাবে, উত্তেজিত হয়ে তোমার খবরবাটা কান্ডারি আক্রমণ করবে, লুটপাট দাখালাহা। স্বক হয়ে যাবে। আমি আছি বলেই ওরা কিছু করতে পারছে না, তা জানো?”

মহীধর আমতা আমতা করে বলল, “তা হোক। এ অবস্থায় ওপর ভর্য করলে চলে না।”

অরেলো জমাগত ইসারা করছিল, মহীধর জোর করে কার্পেটের দিকে চেয়ে রইল।

বিলামসন নিজে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বোতল নিয়ে এল, মাশে ঢেলে মহীধরের সামনে ধরে দিয়ে বলল, “খেয়ে নাও, খাসা জিনিষ। তারপর এসে আমার মাথা ঠাণ্ডা করে পরামর্শ করি। কর্তব্যের চেয়ে বড় কিছু নেই রায়। আশ্রয়ের জঙ্ক দরকার হলে প্রাণও দিতে হয়। ঈশ্বর যে নিদেপ আমার দিয়েছেন আমাকে তা মানতেই হবে।”

ডাক্তার ইন্দু মাধব মল্লিকের

বৈজ্ঞানিক পাকষল

ইক্-মিক্-কুকার

ইহাতে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস, ভাজাভূজি, রুটি, পরটা ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ মাত্র
এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না হয়।

১০ বৎসরের ছেলে মেয়েরাও রান্না দিতে পারে।

কমলা, কাঠকমলা, গুল বা কেরোসিন খরচ দুই পয়সা হইতে চারি পয়সা মাত্র।

স্টিটামিন ও খাতের সারাংশ একেবারেই নষ্ট হয় না। খাত সুখাত পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয়।

পাকের দরকার নাই, গৃহস্থীও খাটনি কম, কারণ ইহাতে আপনা হইতেই রান্না হয়। খা
শরিয়্য পুষ্টিয়া যাইবার ভয় নাই।

খাতের বাহিরের ধূলা, বাসি, ময়লা বা রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে না।

ঘরে ঘোয়া গ্যাস বা ঝুল হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—২১১১এ, বোম্বেজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত স্টেট কোম্পানীর

‘স্টেট’ ব্যবহার করে বান্ধলার কুটার শিল্পকে সাহায্য করুন

কাগজ অপব্যয় না করে যুদ্ধকে সাহায্য করুন

সোল—ডিপ্লিকিউটাস

কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট—

জেনারেল অর্ডার সামান্যাস

১১২৯, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা।

সকল

দেওয়ানী সংখ্যা ১৩৫০



দিনের শেষে

এক কোটি কণা অনাগারে ও রাগে মায়া গিয়েছিল এক চোখের জমির ভিতর ভাষার এক ভাগ অনাগারী পুরুষিণী। কোপানীরা এক জন কণ্ডারী ১৭৭৭ সালে লিখেছিলেন—“হৃৎপতি যে দৃষ্ট মাহু গিয়েছিল এক খন্দো খো যাচ্ছে তা এতই বীভৎস যে মাহুদের পক্ষে তার বর্ণনা শোনা অসম্ভব।” এতদূর কথা যে, কোনো কোনো অঞ্চলে জীবিতের মৃতের মাস বেয়ে পৌঁছে গিয়েছে।” কোপানীর অনেক কণ্ডারীর বিকৃত চাল বিশেষ অস্বাভাবিক দামে বিক্রি করে মোটা লাভ করার অভিযোগ করা হয়েছে। সৌন্দর্য অকিঞ্চিৎকর করার প্রচুর ও সমস্ত কারণ আছে। ওভারগেট্টেল পীকার করেছিলেন যে, নিম্নম কণ্ডারীরা অল্পমদন করে রাজস্ব আদায় করা হয়েছিল। চরম-দুঃখিত্রি, সমগ্র শতকরা ৬০ টাকারও কম ডুমির মকুব করা হয়েছিল। এবং পূর্বের বছরে সাত্য সাত্যই শতকরা ৭০ টাকা বেশী আদায় করা হয়েছিল। এই জীবন নিম্নপাটতে বা উসোপিত হয়েছিল, তা’ পূর্ব পূর্বের তর পরিপূর্ণতা হয়নি। আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও এর প্রবর্তনকারী হয়েছিল।

আঁদাম শীত-সমগ্র

তাই আজ মাঝরা চারি দিক থেকে অনাগারের ব্যাবিহিত মৃত্যুর সংবাদ আমাদের হাজারিক বলেই মনে হচ্ছে। স্থানে স্থানে লুপ্তধান, সাহায্য ভোগার, পোশাক সহজ ও বেশবাগী মৃত্যুসংঘর্ষে বেড়েই চলেছে। প্রত্যেক মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও হতজাগা নবাবী শিক্ত দল যদিও বা কোনো ক্রমে প্রাণধারণের তীর অগ্না স্রব করে এখনো বাঁচবার চেষ্টা করছে, তার প্রশংসা শ্রুতের অত্যাচার স্বর হলে মৃত্যুসংঘর্ষ অথবা ভুক্তগতিতে বেড়ে যাবে। সরকার ও অনাগারপন দেশোদার এখন থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। এই উচ্চতা সূচের বাজারে সাধারণ মণাবিত ফদের লোকেরাই গরম শিত্তর কিনতে পারবে না। বা’ বা’ হেঁচো পুরণো শিত্তর আছে তাতেই কোনো ক্রমে এগিয়ে শিত্তর চাটতে হবে। আর নিম্নাশিত্তর কোনো মৃত্যুসংঘর্ষ অনাগারপন সাধারণ শ্রুতির কাগজের অভাবে টাইফয়েড নিউমোনিয়া প্রকৃতি অনিবার্য ব্যাবিহিত ভূমি দলে দলে অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হবে।

নূতন বড়লাটের কণ্ডাত্তপত্র

জাতির এই চরম সঙ্কটজনক মুহুর্তে সমগ্রিত আশার আলো দেখা গিয়েছে। ভারতের বারনিমুক্ত বড়লাট শ্রী অচিরন্ত ওয়েলেং বালোর হৃদয়বিশিষ্ট কয়েকটি অকাল সমগ্রিত বহু পরিপূর্ণন করে বিদ্যী করে গেছেন। বাঁচে বালোর দ্রুত বাজ-সঙ্কট সমাধানের ব্যাঘ্র অপরূপিত হয় তার জ্ঞান সহজ ও হয়েছেন। বাজশব্দ চাটাল নিম্নপ্রবণ তার সদর বিজ্ঞান প্রকাশিত অশ্রুত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রভাঙ্গর মেজর কেমোরেল এ, ডি, টি ওয়েকলী গত ৩০শে অক্টোবর পাঠানো থেকে বিমানযোগে কলকাতায় এসেছেন। ডেপুটি ট্যাক অর্ড মেজর কেমোরেল আর টারিটরিয় ও কলকাতায় এসেছেন। অর্ড ওয়াডেলের সদর শেষ হবার পর সেনা বিভাগ থেকে আর যে সব

সাহায্য করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল মেজর কেমোরেল আ টারিটরিয় এ অকালের সাহায্য অনিবার্যকর পক্ষে যে সেনা আকোচনা করবেন। এ বকম আশা করা যাচ্ছে যে সেনা-বিজ্ঞ থেকে চিকিৎসার ব্যাপারে বেশ ভাল বকম সাহায্য পাওয়া যাবে।

সাহিত্য-মহলে

প্রতিবাদ

আধুনিক সাহিত্য অর্থাৎ গত মহাযুগান্তর সময় থেকে বর্তমানে মৃত্যুসংঘর্ষ সময় পর্যন্ত বালোর সাহিত্যক্ষেত্রে যে সব প্রতিবাদ সাহিত্যিকেরা আবিষ্কৃত হয়েছেন তাদের বিভিন্ন বিভাগীয় সাহিত্য সৃষ্টি সঙ্গে সম্যক পরিচিত থাকার সহজ ও বীর অপরিচয়ের উৎ বকম অর্থাৎ জেনে থেকেও বীর আত্মা সৃষ্টিয়ে আহ্নেয় বীর পুরস্কারের মনোগতির তত্ত্ব বাস্তবিকই প্রত্যেক আধুনিক সাহিত্যিকের করণ্য জাগ্রা উচিত। আধুনিক সাহিত্যিকদের বীর বাস্তব পারিচয়িত্ব চিরকাল থাকবে। সমগ্রিত জনৈক বিদ্যা অস্বাভাব্যের অস্বাভাব্য মাহাশয় আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে তত্ত্ব ঘোষণা করে অনবদিকের চর্চা ও প্রচেষ্টা বকম ভিন্নবর্তিত পতি সিদ্ধেয় বকম এই কণ্ডাজানবর্তিত উদার অধ্যাপককে সমর্থন করে এমন প্রাচীনপন্থী “গেল” “গেল” বাকী সাহিত্যিক তাদের নববর্তন প্রাচীনপ্রাচীন বাকীজাননিত মহিষবর্তিত পরিচয় বিজ্ঞেয় জেবেচিযু এই অর্কাটান অধ্যাপককে—বিকৃত মস্তিষ্কের তত্ত্ব মনে করে উপেক্ষা করবে, কিন্তু আর চূর্ণ করে থাকার সন্তব্যই না। কারণ যখন যেকোনো এই অর্কাটানে আত্মপ্রকাশ করে পত্রিকা-সম্পাদকের বিচারকৃষ্ণিনতার দৃষ্ণ মাঝে মাঝে অর্কাটান আত্মপ্রকাশ করছে তখন চূর্ণ করে থাকার কাগজকর্তা ন্যায়বর্তন করে অধ্যাপন বোধ করেছি তাই প্রতিবাদ করতে বাধ্য হই।

বিলম্বণ

বীভৎসারের সর্বপ্রত্যয়ী প্রতিবাদ পর যখন কবি বারোবান্টিসিমেয়র আত্ম-স্মরণ হয়ে এল তখন আধুনিক কবি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে নূতনতর কাব্যকলার মনোযোগী হয়ে এক বিশ্ববাগী বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানিত সমগ্র তত্ত্ববর্তের অবশ্যস্তারী প্রভাব আমাদের নবীন চিন্তাধারাকে উৎ করে তুলেছে। বিনিক-মজার অতিপ্রাণ-বকম ব্রজেশ্বর-সুখী নাগপাশ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নবজাগৃত বাস্তব কবিমহারা বরমানা আজিগের পরীক্ষার বাসনা বকম ব্রজেশ্বর তত্ত্ববর্তে সেই অনিবার্য সৃষ্টি-পরিবর্তনের মুখে বরকে জন সান্ধিধমনা, অর্থাৎ ও পাতিভ্যাতিমানী লেখক “কোলা” “কালিসময়” পরী “পরিচয়” যুগে নিম্নপ্রবণ হুঁসীরা জাতির পক্ষে পাতিভ্যাতি করে সময় আধুনিক কবি-সমাজের তর্কম সৃষ্টি করেছিল সৌভাগ্যের কারণ, সেই সূর্যময় কবিগোষ্ঠী সম্যক বিবেকের জাগরণ নিম্নপ্রবণ মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। অর্ড কণ্ডাত্তপত্র, এই অধ্যাপকিত পাতিভ্যাতিমানীর দল কোনো

বর অর্কাটান প্রাণের বিয়ে সাহিত্যকে কলকৃতি করেন। বর্তমানে প্রত্যেক আধুনিক কবিই কোলোর (বীভৎসার ছাড়া) বেকোনো শ্রুতি কবির চেয়েও বহু গুণে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন—একথা প্রাচীনদের মতোও বহু সমালোচক যুক্তকর্তে মনে নিয়েছেন। সর্বপ্রাণে সর্বপ্রাণেই কবি-সমাজের মধ্যে হুঁ-এক জন নিম্নে মনোগতির পতিভ্যাতি কলকৃতি লিখে গেছেন, তার স্রব মত কবি-সমাজকে কোনো ভ্রমকটিমপার সমালোচক দ্বারা উচিত, তাদের মিন ঘনিষে এসেছে—নূতন নূতনপন্থা—নবনবপ্রবণ—শাস্ত্রী পৃথিবী চিহ্নিতই নবীন-জোগা।

অপরূপে অপরূপী হুঁ-এক জন কবি উদ্বোধনীয় ও প্রতিজ্ঞাবিশ কবিতা লিখেছেন। তার তত্ত্ব যে হতজাগা অর্কাটান সমালোচক-বর্গ সময় আধুনিক কবি-সমাজকে দ্বারা করে তাদের বিরুদ্ধে মাসের পর মাস অধ্যা তৃপ্তি জাগ্রা অকালম চাটাল ও অধ্যা পাতিভ্যাতির কাছে হয়ে প্রতিপ্রাণ কবির চেষ্টা করে, তাদের কোন মতেই ক্ষমা করা যায় না। এই সব অজান-ব্রজেশ্বর মনে রাখা উচিত, তাদের মিন ঘনিষে এসেছে—নূতন নূতনপন্থা—নবনবপ্রবণ—শাস্ত্রী পৃথিবী চিহ্নিতই নবীন-জোগা।

শ্রুপ-চ্যাবী

[বেলা ঘোষ বি-এ]

Coloridge এর If I had but two little wings এর অর্থ।

পায়ের দল উড়ে যেতে চাই দেখা আছে দুটি, কে প্রিয় মোর।
কিন্তু বুঝা এ অধ্যা ভাবনা বুঝাই যে করে নবন-লোভ।
যখন আমার নিমিত্ত হয়ে যোগাই এই শরতে আমার শ্বন;
কলই আমার, আমি দেখা রাগী।
আগরণ, হায়। কাঁধে যে প্রাণ।

জাগে যে স্বপন, থাকে না তখন, বহু আবেশন নিমেষ তব;
চলে যায়, খেলে একলা আমারে, নবন আমার যদিও করে।
তবু জাগবামি, আগিতে থাকিবে; স্বপনের স্বপন জাগিলে পর
নয়ন মুদ্রি। নীচ শরমে আগরণে হই স্বপন-চর।

৫৫৮, বি.ই. ১৭৬৬

মাস - ব্রিটিশের মাস

এম. বি. সরকার

সন ১ ও প্রাণ্ড সন অর্ডে বি, সরকার

ম্যানুফ্যাকচারার: মুম্বাই

একমাত্র গিনি সর্গের অলঙ্কার এবং ক্রোপের বাসনাদি নিম্নাতি

MASS

একটি নিম্নপ্রবণ কবি-সমাজের অর্কাটান প্রাণের বিয়ে সাহিত্যকে কলকৃতি করেন। বর্তমানে প্রত্যেক আধুনিক কবিই কোলোর (বীভৎসার ছাড়া) বেকোনো শ্রুতি কবির চেয়েও বহু গুণে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন—একথা প্রাচীনদের মতোও বহু সমালোচক যুক্তকর্তে মনে নিয়েছেন। সর্বপ্রাণে সর্বপ্রাণেই কবি-সমাজের মধ্যে হুঁ-এক জন নিম্নে মনোগতির পতিভ্যাতি কলকৃতি লিখে গেছেন, তার স্রব মত কবি-সমাজকে কোনো ভ্রমকটিমপার সমালোচক দ্বারা উচিত, তাদের মিন ঘনিষে এসেছে—নূতন নূতনপন্থা—নবনবপ্রবণ—শাস্ত্রী পৃথিবী চিহ্নিতই নবীন-জোগা।

১৪৮, ১৪৮-১ বহুবাজার ট্রাট - কলিকাতা
(বহুবাজার ও আমহারি ট্রাটের মাঝে)

জাহ্নবী জানিত না ও-ও সিনেমায় গিয়াছে। হঠাৎ দেখা। বলিল, নাম নিরঞ্জন...সামনের মেশে থাকে...বীণী বাজায়। তখন মনে পড়িল, তাই বটে! তার পর চিঠি লিখিয়াছে...

মা বলিলেন—এই চিঠি?

মা সাবধান করিয়া বলিলেন,—বন্দার জাহ্নবী, এর জবাব দেবে না। কোন বংশের মেয়ে তুমি, তা ভুলে যেনো না। নাটকে ও-সব বা গড়ে, সত্যি-সত্যি তা কেউ করে না। করা চলে না! অনেক অস্থিবিদ্য...অনেক গোমালনা...সত্যিকারের জগতে আত্মীয়-বন্ধ আছে, সংসার আছে...নাটক-নভেলে ও-সব বলাই নেই! যা বৃশী লিখে গেলেই হলো।

এমনি পাঁচ-কথা আলোচনার পর জাহ্নবীর কি মনে হইল...অসমাপ্ত চিঠিখানা আনিয়া মায়ের সামনে কুচি কুচি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল।

মা আশ্চর্য্য হইলেন...বৃশী হইলেন। বলিলেন,—আমার গা ছুঁয়ে বন্ জাহ্নবী, কখনো আর ওক চিঠি লিখিবা না?

নিপুণ ভঙ্গীতে অবচল কহে জাহ্নবী বলিল,—না।

ও বীণী বাজাও-ও-থের গড়খড়ির ধারে কখনো গিয়ে বসিবা না?

জাহ্নবী বলিল—বসবো না।

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—হ্যাঁ, একথা মনে রেখো।...তোমার বিয়ের জজ আবার ভাবনা? বেশ বাপু, কোটীদুই অত কড়াকড়ি আর করবো না—তুমি মোটীদুই একটু দেখে নেও...নেছাড়া রাশির জোরে আমার মেয়েকে না খেয়ে ফেলে। তোমার মঙ্গলের জজ, মা!

এ-ঘটনার পর মেশের নিরঞ্জন দিক হইতে চিঠিপত্র আর আসে নাই। বাহিরে কোথায় চাকরি পাইয়া নিরঞ্জন মেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। জাহ্নবীও নাটক-উপকাসের মায়ায় মনে বিহীন জাগিয়া নাই। কিন্তু এক বছর পরে হারে আসিয়া পাঁড়াইল এক আই-সি-এস পাত্র। ছ'বছর পূর্বে সার্গর-পার হইতে চাকরির তক্কা

জাটিয়া আই-সি-এসটি বহু কল্প ও কল্পার অভিভাবক চূষক-প্রস্তরের মতো আকর্ষণ করিতেছে—কিন্তু আই-সি-এসের বুদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রথর—দেশের বাহ্য সমস্ত অভিজ্ঞতাও প্রচুর। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সে দর জানাইয়া দিল পঞ্চ হাজার টাকা। এ দর লইয়া ছ'চারটি ফ্যানিলির মত দারুণ প্রতিবন্ধিতা চমিয়াছিল...প্রতিবন্ধিতার মত মরন্তুয়ে গিরিবালার প্রয়োচনায় চিন্তাহরণ রায়ও চেষ্টা শাশ্বিত গল্প লইয়া গিয়া পাঁড়াইয়াছিলেন...চায়ে নিমজ্জনে আসিয়া আই-সি-এসটি দর দিবার আশ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু জাহ্নবী তুলিল প্রতিবাদ জাহ্নবী বলিল—কি মোটা আর কি কালা রং বাগ-রে...হোক আই-সি-এস! ...মায়ায় নয় মা, যে মহিষাছুর!

এ প্রস্তাবখানের পর মা-বাগ চুল করিয়া গেলেন বাগ বলিলেন—কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা কবো সেবে তোমার মেয়ে বল বসবে, নেই! আমার মত তখন থাকবে কোথায়?

গিরিবালার দেবী কল্পার তুলিলেন,—বোঝো...সে থাকতে যেমন থাকিবে হ'শ করোনি! সেবে এখন বস হয়েছ—ওর মন বল! একটা পদার্থ হয়েছ...নিশ্চয় পছন্দ-অপছন্দ আছে তো!

বাপ বলিলেন—সুখ পরোয়া নেই। সব মেয়েই বিয়ে করছে...ও না হয় বিয়ে করবে না!

এ কথায় গিরিবালার শুধু দু'চোখে আগুন ভরিয়া চিন্তাহরণের পানে চাহিলেন...মুখে কোনো কথা বলিলেন না। সে আগুন চিন্তাহরণ ওপাশের দৃষ্টিতে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কারবারে মনোনিবেশ করিলেন।

তার পর ক' বৎসর পাত্র লইয়া গবেষণা বা মনোবিশেষী পড়িয়াছে। ছ'-একটা সখ্য আসে...ভরসা করিয়া মা বা বাবা উৎসাহ বা উদ্দীপনা পান না!

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। সহসা তেইখ বয়সে জাহ্নবীর জীবন-পথে আসিয়া উদয় হইল জাহ্নবী আদিত্য...সম্পূর্ণ অভাববিরহ রকমে!

২

আদিত্য উপকাস লেখে, গল্প লেখে। পাঠক-সমাজে তার লেখা গল্প-উপকাসের আদর জমিয়াছে। আদিত্যের দিন চলে এই গল্প-উপকাসের কল্যাণে। সে থাকে গল্পভাষার মেশে। রূপ নয়। পয়সা মাঠে মাঠে হাতে আসিয়া ওঠে...কিন্তু জমিতে পায় না। আসিরা-বাস পাখার মতো পাখা মেখিয়া পয়সা উড়িয়া যায়। তার কারণ উত্তন-চণ্ডী বলিয়া আদিত্যের খ্যাতি রটিয়া গিয়াছে।

পূজার ক'দিন আগে পাঁচ-সাতখানা মাসিকপত্রের খসি হইতে তাগিদ আসিয়াছে, গল্প চাই...পূজার বাজারে বেশ লাগেই গল্প! ঘরে বলিয়া ক'দিন সে অস্বস্ত প্রস্রবে সাতটা গল্প লিখিয়া ফেলিয়াছে...এবং যে-কাগজ কেবলম দক্ষিণা দেয়, তার পরিমাণ বিচার করিয়া অল্পপ গল্প দিয়া টাকা আনিবে বলিয়া আদিত্য পথে বাহির হইয়াছিল।

সন্ধ্যা তখন হয়-হয়—কলক জটীরে মোড় পার হইবে, এমন সময় পথের কাদ্যর চাকা মিল করিয়া একখানা ঘোড়া আসিয়া থাকা দিয়া তাকে পথশায়ী করিল।

চোট-জম্ব খাইয়া কাপা মাখিয়া আদিত্য উঠিয়া গাঁড়াইল। মনের মধ্যে আগুনের চাকা ঘুরিতেছে...সকল লোকের বোয়াদবিত্তে গরীব-দুখী মায়ায় নিরাপদে পথে চলিবে না, একি বর্ষর জুজুম...এমনি ভাবের ক'টা কথা আরোহীকে শুনাইয়া দিবে বলিয়া উজ্জত হইয়া মোটরের আরোহীর পানে সে চাহিল।

চাহিবারাজ মনের মধ্যকার অমন প্রবল আগুনের উপর বেন বেগুনা হইতে শ্রাবণের দারা ফলিল...মোটরে যাই ছিল জাহ্নবী...এক। মোটরে চড়িয়া সে চলিয়া-ছিল চিতায়...বাঙলা ছবি দেখিতে। মোটরের ধাক্কা পেরে পৃথিবীকে ভূপতিত আত দেবিবামাজ ভূইভারকে মনক দিয়া গাড়ী থামাইয়া জাহ্নবী গাড়ী হইতে নামিয়া তার সামনে আসিয়া পাঁড়াইল...ছ'চোখে আতঙ্ক-ভরা মগ্ন দৃষ্টি।

এ দৃষ্টি আদিত্যকে এতখানি বিচলিত করিল যে, বেলুনাসিয়া সে সরিয়া যাইতে উজত হইল।

জাহ্নবী বাহা দিল, সামনে আসিয়া বলিল—দুব লেগেছে আপনার?

ভিড় জমিয়াছিল। ভিড়ের মধ্য হইতে হাজার টিককারী-বিজপ! যেন একরাশ এয়ার-ক্রাফট কামান দাগিয়াছে। সে সব বিজপ পায়ো মাড়াইয়া চাপিয়া গিয়া আদিত্য বলিল,—আজ্ঞে না, বিশেষ তেমন নয়...

ধরে যেন ক্রান্তান্তার আসা। অর্থাৎ গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া সে যেন বর্তাইয়া গিয়াছে—এমনি ভাব।

জাহ্নবী বলিল—আমার গাড়ীতে আহুন। হাসপাতালে নিয়ে যাবো।

আদিত্য বলিল—না, না...কোনো দরকার হবে না তার।

জাহ্নবী বলিল—তা হয় না। দর্য করে হাসপাতালে চলুন। চোট লেগেছে দেখছি...চিকিৎসা দরকার।

আদিত্য তবু বলিল—আজ্ঞে না, আমার এখন হাসপাতালে গেলে চলবে না...অনেক কাজ আছে...জরুরি কাজ...কর-বাঁচান...ভরিয়া...নির্ভর করছে সে কাজের উপর।

জাহ্নবী বলিল,—কি কাজ...কোথায় কাজ, বলুন...গাড়ীতে কবে? আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো!

ভিড়ে হুহু শিকিত মাথায়ের মনও আদিত্য বর্ষরতায় ভরিয়া ওঠে। এখানকার এ ভিড়েও সে বিধির ব্যতিক্রম হইল না। তরুণী মোটর-বিধিরি...তার এমন সপ্রতিভ ভঙ্গী! ছ-চার জন তরুণ লোভ সঘর করিতে পারিল না...মাখিয়া উঠিল—

ঐ ঐখির

ফিরে ফিরে যেনো জোনা, ফিরে যাও, কি আর বেখেছো ব্যকির!

সে-সব বর্ষরতায় জকেপনামে না করিয়া জাহ্নবী ভিড় ঠেলায় গিয়া আদিত্যের হাত ধরিল, ধরিয়া বলিল—আপনাকে এক-বর্ষর রেখে আমার মায়া হতে পারে না...এতখানি অমায়ুষ আমি নই! আহুন আপনি—আমি কোনো কথা শুনাবো না।

এক একথা বলিয়া রাজেশ্বরীর ভঙ্গীতে জনতার হৈতর উল্লিঙলাকে ছুঁপায়ো মাড়াইয়া সে আদিত্যকে

গাড়ীতে চুলিয়া নিজে গাড়ীতে উঠিয়া তার পাশে বসিল। ড্রাইভারকে বলিল—যর চলো...

পথের পুলিশ আসিয়া ড্রাইভারকে কহিল,—ঠাহরো... পুলিশকে ড্রাইভারের নাম আর লাইসেন্স-নম্বর দিয়া জাহ্নবী আবার বলিল ড্রাইভারকে—চালাও...

ইতর জনতার মধ্য হইতে একটা মিশ্র উচ্চ কলরব জাগিল। সে-কলরবে জাহ্নবী বৃকপাত নাক করিল না!

গাড়ী থামিয়া থাওয়াইল একেবারে ভাবানীপুরে চিত্তাহরণ রায়ের বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায়।

এমনি করিয়া পরিচয়ের হুজপাত।

তার পর সাহিত্য্যালোচনা এবং এ বাড়ীতে যাতায়াত করিতে হইলে জানা-কাপড়ে যে সৌখিন পারিপাট্যের প্রয়োজন, সেদিকে আদিভার আলগ্ন রহিল না। গরম-উপভাসা লিখিতে লাগিল সবগে—সে-সবের সারফৎ যে টাকা-পয়সা পায়, সে টাকা-পয়সার বিনিময়ে ধোপদোস্ত খুঁত, সিঁকের পান্নাবি প্রকৃতি সংগ্রহে ঈদাঙ্গ রহিল না। কিন্তু...

এদিক্কার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া আর পাঁচ দিকে টান পড়িল। দেশের ঘরের চাঞ্চ বাকী, কিস্তিবন্দী রীতিতে দামী যে সব বই ক্রিনিত, সে-সবের কিস্তি-খোপা...এমনি উপসর্গ উৎপাতের জালায় মনের আরাম কোনো দিন বোলকলায় পূর্ণ হইতে পারে না!

জাহ্নবী ঘরে বসিয়া একতলা গরম-উপভাসা পড়িত। সে সব গরম-উপভাসা ব্যাধি লেখে, স্থল শরীরে তেমন লেখককে কখনো দেবে নাই! কাজেই মোটরের ধাক্কা আদিভার উপর তার প্রথম বিদ্যের জাগা সেই মনো-অচরুপ্পা আজ গরম-উপভাসার পল্লবিত কর্তব্য-মার্গে ভর করিয়া অসহ্যগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যা গিরিবালা দেখিলেন; এবং দেশের বায়ার সেই নিরলসকে অশ্রণ করিয়া তিনি আবার উজ্জগী হইলেন বড় ঘরের এক পাজ ধরিয়া তার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহ দিতে।

তুমিরা মেয়ে বসিয়া উঠিল,—না!

মা বলিলেন,—অনাশ্চিৎ কথা! বিয়ে করবি না এ

আবার নাকি একটা কথা! মেয়ে হলে জমিহাসি...আবার বাঙালীর ঘরে!

উদাস মেয়ে আকাশের দিকে চাহিয়া জাহ্নবী বলি—বিয়ে করবো না কখনো, এমন কথা আমি বলিনি—বিষয়ে মায়ের ছুঁচোপ বিদ্রোহিত হইল। অথচ আশঙ্কায় বৃকপাত একবার উৎ করিয়া উঠিল। র নিখাসে মা বলিলেন—তবে?

জাহ্নবী বলিল—বিয়ে যদি করি তো ঐ আদির বাগ্গে করবো। আর কাকেও না।

মা নির্দ্বন্দ্ব ভক্তিত! জাহ্নবী এ কথার পর সেখান আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না। বয়স আরো বাড়িয়াছে—মন বৃদ্ধি অনেক-বেশী বিকশিত। কাজেই এ কথা লগ্না বাদ্যহস্তে তার রুচি নাই।

গিরিবালা গিয়া চিত্তাহরণের কাছে কথাটা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। চিত্তাহরণ প্রমাণ চিন্তিত হইলেন, তার পর পুরুষোচিত আকোশ-ক বলিলেন,—পাগল! কাজকর্ম করে না—মেয়ে পায় বাঙলা বই লেখে! যাকে বলে, ভাষাবাদ! তার মা আমি দেবো আমার মেয়ের বিয়ে? পাগল হই আমি!

গিরিবালা বলিলেন—বই লিখে ছেলের মন হয়েছে, তুমি।

চিত্তাহরণ বলিলেন—ছাই! ও নামের তো জা দাম! ভিক্ষাবৃত্তি! লোকের যদি খোয়াল হলো, হুটী দিয়ে বই কিনলো...না হলে? হু...নাটক-মতল জীয়ে নেসেসিটি নয়! ওর কোনো মাস্কেট-ভালু নেই!

মেয়ের মনের পরিচয় মা জানেন, তাই মা বলিল—টাকার কথা বলছো তো? তা তোমার টার রয়েছে—এক মেয়ে...

চিত্তাহরণ বলিলেন—থাকা টাকা পাখা মেলে উচ্চ কতকণ? তা নয়! অনেক ভেবে দেবেছি। আমিরা পাজের বাপের টাকা মা থাকুক বিষয়-বুদ্ধি থাক পাজের—মানে, কাজের দাম বুঝবে, টাকার দাম বুঝা আমার পরে আমার এ কারবার বুঝে সে চালা পাবে!...

গিরিবালা গিয়া মেহ-ভরে মেয়ের সঙ্গে অনেক আলপ চুরিলেন।

মেয়ে বলিল,—আবার এক কথা...এ কথা না শোনো, বিয়ে দিগো না। কোনো রূপ হবে না আমার তার মজ।

যে-কাল দেখে দেখা মিছেছে, তার প্রত্যক পরিচয় না জানিলেও পাঁচ জনের মূখের কণায় গিরিবালা তাহা শুনিয়াছেন! নিখাস দেখিয়া তিনি গিয়া আবার চিত্তাহরণকে ধরিলেন।

চিত্তাহরণ কি বুঝিলেন, মেয়েকে ডাকিয়া স্থলপ্ত প্রমোত্তবে সকল সমস্তার যীমানসা করিতে চাহিলেন। প্রমোত্তবে বোপেস্ত বর্ষে...শাস্ত্রের কথা! পুজো আর কল্যায় এ যুগে প্রস্তেদ নাই। তার উপর কল্যা জাহ্নবীর যোড়শ-বর্ষ বক্তব্য হইয়াছে সাত বসন্ত পূর্ণে! অতএব...

মেয়েকে তিনি কহিলেন—ছেলের পুরো নাম?

মেয়ে বলিল—আদিত্য চাট্টোয়।

চিত্তাহরণ বলিলেন—বই লেখে?

—হ্যাঁ।

—গরম-উপভাসা?

—হ্যাঁ।

—সে সব গরম-উপভাসা ছাপা হয়েছে?

জাহ্নবী বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এগুলো ছাপা হচ্ছে।

চিত্তাহরণ চিন্তাশ্রম হইলেন। মনে পড়িল ছেলে-বেলাকার কথা...তখন বাঙলা সাহিত্যের একটু-আদুট রপ্ত রাখিতেন। তাই বন্ধিত চাট্টোয় নামটা মনে ভাসিয়া উঠিল। বলিলেন—তোমাদের বন্ধিত চাট্টোয়ও একজন মন্ত লেখক ছিলেন না?

জাহ্নবী বলিল—ছিলেন। সবাই বলে, তিনি ছিলেন গহিত-সন্নাত।

চিত্তাহরণ বলিলেন—এ ছেলেটিও চাট্টোয়...বললে না?

—হ্যাঁ।

—এও চাট্টোয়...সেই বন্ধিত চাট্টোয়ের কেউ হয় না

কি? নাকি-টাতি? কিছা জ্ঞাতি?

জাহ্নবী বলিল—না। বন্ধিত বাবুর কেউ হন না।

চিত্তাহরণের ক্রুদ্ধিত হইল। তিনি বলিলেন,—তবে? ছোট প্রশ্ন! প্রশ্নটা নিক্ষেপ করিয়াই তিনি চাহিলেন মেয়ের পানে। মেয়ে প্রশ্ন বুঝিল না...কাজেই উত্তর না দিয়া নির্দ্বন্দ্ব দাঁড়াইয়া রহিল।

চিত্তাহরণ বলিলেন—আমি ভেবেছিলাম চাট্টোয় যখন, তখন বন্ধিত চাট্টোয়ের নাকি-টাতি হবে হয়তো। তা যদি হয়, তাহলে এ-ও সমাট না হোক, সাহিত্যের সদাগর কোটাল-চোটাল হতে পারবে হয়তো একদিন!

চিত্তাহরণের প্রতিবাদ-আপত্তি টিকিল না। গিরিবালা লোকের তাগিদ দিতে লাগিলেন। কখনো অসিতপ্ত বচনে সে তাগিদ বুলেটের মতো দেহে-মনে আসিয়া লাগে। কখনো বা তাগিদ অশ্রু বন্যায় বহিয়া চিত্তাহরণের ঐরানত-কুল্য সন্মুখে ভাসিয়া বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। গিরিবালা বলিলেন—আর কত বয়স পর্যন্ত মেয়েকে এমনি রাখবে? মেয়ে খুব ভালো, তাই...নাহলে যদি বাড়ী থেকে চলে গিয়ে পথে যাকে-তাকে বিয়ে করে বসে?

এত রকমের পোলযোগে চিত্তাহরণের কারবারী-মন দিশাহারা হইয়া ওঠে। লোহার বাজারে মাথা একেবারে লোহার মতো ভারী হইয়া থাকে,—মাথা অবলীলায় লজ্জা-সান্দার নব নব ময় রচিত পোরে না। তখন বিলেন তিনি মন্ত,—বেশ, ঐ ছেলের লক্ষেই দাও তবে বিয়ে। পুরুষ ভেঁকে দিন ঠিক করাত...আমিও মহাদার থেকে মুক্তি পাই।

এ কথা শুনিয়া জাহ্নবী আসিয়া গিরিবালাকে বলিল—তোমাদের তো আমার কোণী মেলালো চাই!

গিরিবালা উচ্চক হইয়া গিয়াছিল। জ্যোতিষের উপরে বিশ্বাস আর বিতাইতে পারে নাই—জ্যোতিষীরা কতবার বলিয়াছে,—আর চিত্তা নেই মা...এ বছরের মধ্যে তোমার বিয়ের বিবাহ হবেই। বিবাহের যোগ একেবারে স্পষ্টাকরে লেখা দেবছি...এই যে!

এমন আশা আজ সাত বসন্ত ধরিয়া তিনি অনেক শুনিয়াছেন! আর নয়।

তিনি বলিলেন,—না বাপু, আর কোণীতে কাজ নেই...যা করে ভাগ্য!...এই তো এত লোক কোণী মিলিয়ে

ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছে—ঐ বরদা বাবু দিলেন মেয়ের বিয়ে। কামীর পণ্ডিতরা গুণে বললে, রাজঘোষটক...বিয়ে হলো...বছর-ও পঞ্চদশো না...চাঁপার কলির মতো মেয়ে হাতের নোয়া সীংখের সিঁদুর খুঁইয়ে বাগের কাছে ফিরে এলো। সেই-ইন্তক কোজীর উপর আমার ঘোড়া ধরে গেছে।...

তবু বাঙালী ঘরের বিবাহ। পুরোহিত ডাকাইয়া দিন দেখানো হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখ।

ফাক্তন মাসের শেখাশেমি চিত্তাহরণের কাজ পড়িল দাখিলিঙে। কাজের সঙ্গে দাখিলিঙে হাওরা বন্দানো...গিরিবাদা বলিলেন—আমরাও যাবো তোমার সঙ্গে। চিত্তাহরণ বলিলেন,—বেশ। গিরিবাদা ও জাহ্নবীকে লইয়া চিত্তাহরণ দাখিলিঙে গেলেন।

চৈত্র মাস। সামনে নব বর্ষের আয়োজন লইয়া মাসিকপত্রের বাজারে নানা রকমের অভিসন্ধি চলিয়াছে...আদিভক্তের অবসর নাই। ছ'খানা মাসিকপত্র চাহিয়াছে তার লেখা উপজ্ঞাস। বৈশাখ হইতে তারা উপজ্ঞাস ছাপিতে শুরু করিবে। তার উপর আরো তিনখানা মাসিক বলিয়াছে, গল্প চাই... আদিভক্তের সেইকুণ্ডে!

উপজ্ঞাস ছ'খানা শেষে করিয়াছে—ছ'টো গল্পও শেষ...পত্রিকাগুলার অফিস গিয়া লেখা দিয়া চেক লইয়া আসিয়াছে...উপজ্ঞাস ছ'খানার জন্ত ছ'শো টাকা করিয়া চারশো টাকার চেক—গল্প ছ'টার জন্ত নগদ চল্লিশ টাকা।



বাসায় আসিয়া দেখে, চিঠি আসিয়াছে। ডাকে-আ চিঠি।

খামের উপর লেখা নাম-টিকানা...মন মাতিয়া উঠিল জাহ্নবীর লেখা!

খাম ছিড়িয়া চিঠি পড়িল।

জাহ্নবী লিখিয়াছে

আমিরা বাজ এখানে একবার চুকিল না? একবার যদি এখানে আসিতো পারিতেন। এখানে কি আনন্দে আছি, আপনার মতো লেখার শক্তি থাকিলে লিখিয়া জানাইতাম।

দিন বেশ কাটিতেছিল। একজনের সঙ্গে আলোচনাইয়াছে। তাঁর নাম মুরুল বাবু। ভরলোক ব্যাখ্যারী করেন। তিনি প্রায় আসছেন। তাঁর দুই বোন আসতো সঙ্গে। খেলা হতো, বেড়াতে যেতুম—ভরী খামেঘর দিন কাটিছিল। তাঁরা কালিম্পঙ গেছেন। একথা দিন আর কাটিতে চায় না! এ সময় যদি আসতে পারতেন, চমককার হতো!

আরও না একবার। এখানে লেখবার জন্ত অনেক সৌকর্য্যে পাবেন।

আসবেন—আসবেন—আসবেন।

জাহ্নবী চিঠি পড়িয়া আদিভক্তের চোখের সামনে আলো যে নিখিয়া গেল! চেক পাইয়া অত যে আনন্দ...ভাবি রাখিয়াছে, চেক ভাঙাইয়া সে-টাকায় জাহ্নবীর জন্ত তার পঞ্চমসই উপহার কিনিবে। দুকিতার পাথবে সে-আনন্দ যেন চাপা পড়িল।

মুরুল। ব্যারিয়ার! চমককার লোক। তার সঙ্গে যে আনন্দে দিন কাটিতেছিল...

মাথা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। আশিতা বিছানা বসিয়া পড়িল...অবসর মুক্তিভের মতো!

[ক্রমশ:

স্মৃতি-তর্পণ

[শ্রীশান্ত দেবী]

স্বর্গীয় শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তৎপত্নী স্বর্গীয়া হর-মুকরী দেবীর জিন কল্যাণ ও দুই পুত্রের জন্মের পর ষষ্ঠ স্বামী শ্রীকৃষ্ণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাবুদে পাঠকপাঠ্য ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। রামানন্দের বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহার স্নেহ জ্যোতি মহাশয়ের টোলে ৫/৬ বৎসর বয়সে। তার পর তিনি বাবুদার বাংলা স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে হইতে ১০ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪, ৮ টাকা বৃত্তি ও জেলা স্কুলে বিনা বেতনে পড়িবার অধিকার পাইয়া তিনি জেলার উচ্চ ইংরাজী বিভাগে ভর্তি হন। ১৬/১৭ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রামানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন এবং ২০ টাকা বৃত্তি পান।

শৈশবে রামানন্দ অন্ত্যন্ত দীর্ঘপ্রজ্জ্বল ছিলেন। জিলা স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই রামানন্দ প্রায় স্বাবলম্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র-বৃত্তির জলপানি ছাড়া পড়ার জন্য তিনি কোঠা ভাড়া রাখাধর চট্টোপাধ্যায়ের ঘর সাহায্য মাঝে মাঝে পাইতেন।

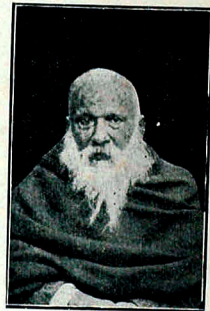
জিলা স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় বেদার-নাথ বুলভি। বুলভি মহাশয় তাঁহার এই ছাত্রটিকে খুব ভাল বাসিতেন। তিনি লেকচারের ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন। গুরু সাহায্যে শিষ্যের মনের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব পড়ে।

কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিবার সময় বৃত্তির ২০ টাকা তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। ইহার সাহায্যেই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের খরচ চালাইতে হইত। Tropical School of Medicine-এর কাছে শোভারাম বসাকের লেনে একটি মেসে তিনি বাবুদার কয়েকটি বেদের সঙ্গে বাসা করেন।

আর্থিক কারণে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়িয়া তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। সেখানে বাকি

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ল্যাটিন শিখিয়া পরীক্ষা দিতে হইল।

এখানে হইতে এফ-এ পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার চতুর্থ হইয়া তিনি ২৫ টাকা বৃত্তি পাইলেন। বি-এ, পড়িবার জন্ত আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। বি-এ পরীক্ষার সময় একদিন কি কারণে মনে হইল ভাল শিখিতে পারেন নাই, তাই বিজ্ঞানের একটা



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষা না দিয়াই পরীক্ষা শেষ করিলেন। কাজেই সে বছর গেজেটে তাঁহার নাম উঠিল না। কিন্তু তিনি সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে প্রথম হইয়াছিলেন।

পরের বার সিটি কলেজে হইতে বি-এ পাশ করিয়া ইংরাজী অনার্সে রামানন্দ প্রথম হন। সোটার উপরও প্রথম হইয়াছিলেন। সিটি কলেজে তখনও হেরথলে মৈত্রেয় মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। ইনি তাঁহার একজন গুরু। ইঁহার প্রতি তাঁহার গুরুভক্তি চিরদিন ছিল।

এই বৎসর বি-এ পরীক্ষাতে প্রথম হওয়াতে States

scholarship পাইয়া রামানন্দের বিলাত বাইবার কথা হয়। কিন্তু তিনি গবর্ণমেন্টের বৃত্তি প্রত্যাহাণ করেন।

২১ বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ মাসে বাকুলা জেলার ওদা গ্রামের বর্গায় হারাদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সহিত প্রাচীন হিন্দুতে তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৮৯ হইতে ১৮৯০ পর্যন্ত তিনি হের্ষটজ মৈত্রয়ের সহকারীরূপে সম্ভবত বিনা বেতনে ইংরাজীর অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাস হইতে তাঁহার ১০০ টাকা বেতন হয়।

সিটি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিবার পরেই কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সেই কলেজে অধ্যাপনা করিতে বিলেদন। এই সময়েই এম-এ পরীক্ষা দিয়া তিনি সিটি কলেজের এম-এ হয়। ছাত্রাবস্থা হইতেই সাময়িক পত্র চালানায় রামানন্দের উৎসাহ ছিল। বহুকাল আগে অধরঞ্জন বহু নামক এক ব্রাহ্ম ভ্রমলোক ‘ধর্মবন্ধ’ পত্র প্রকাশ করেন। ইহার নিজেরই মুদ্রায় ছিল মণিকা প্রেস। রামানন্দ যখন বি-এ পাশ করেন নাই, তখনই এই কাগজের কাজ করিতেন। পরে তিনিই ইহার সম্পাদক হন।

এখন কলিকাতায় যে আত্মরক্ষা আছে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল প্রায় ৫৫ বৎসর আগে। কলকটী ব্রাহ্ম ভ্রমলোক ও তাঁহাদের পরীয়া নিজেরা পথের ধার হইতে কয় মরণপণ লোকদের কুড়াইয়া আনিয়া একটি গৃহে আশ্রয় দিতেন এবং নিজেরাই তাহাদের সেবা করিতেন। প্রথম কার্য আরম্ভ করেন মুখার্জির দায়, তাঁহার পত্নী কমল দেবী, কীরোরচন্দ্র দাস, তাঁহার পত্নী প্রভাবতী দেবী ও শরৎচন্দ্র রায়। এই আশ্রমটির নাম ছিল দাসপ্রাসাদ। পরে ইহাতে সঙ্গীক ইন্দুত্বয় প্রায় প্রভুতি যোগ দেন। এই দাসপ্রাসাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পিতৃদেব রামানন্দ। প্রথম প্রথম ভিকলাক অর্থেই ইহার ব্যয় চলিত। ক্রমে একটি চিকিৎসায় হইল, তাহার আয় ইহারই কাজে লাগিত। তাহার পর হইল ‘দাসী’ মাসিক পত্রিকা। পিতৃদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে এই কাগজটি বাহির করেন। ইহার সমস্ত আয় সম্পাদক দাসপ্রাসাদে দিতেন। ‘দাসী’তে অনেক সময় গল্প কবিতা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদককে

একহাতে লিখিতে হইত। এই সময় তিনিই প্রথম বাঙলাদেশে অন্ধদের জন্য বাঙলা ব্রেল অক্ষর উদ্ভাবন করেন।

এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ‘India Messenger’ পত্রের তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া যান। ১৯১১ বৎসর এলাহাবাদ কলেজের পূর্ব কর্তৃপক্ষের সহিত অবসিনিদা হওয়ার তিনি চাকরী ছাড়িয়া দেন। ইহার পর তিনি আর কেহ চাকরী গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৬ সালে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ‘প্রদীপ’ পত্র প্রকাশ করেন। তিনিই ইহার বহুমুখিকারী ও সম্পাদক ছিলেন।

বাঙলা ১৮৫৮ সালে কতকটা ‘প্রদীপের’ আদ্য ‘প্রবাসী’ প্রকাশিত হয়। ইহা এলাহাবাদ সাউথ রোড হইতে প্রকাশিত ও ইন্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হইয়া এলাহাবাদে বাসকালে শিক্ষা-বিস্তার, মাদরাসা-নির্বাহ, অনাধ্যাপন-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। এলাহাবাদের বাঙালী সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বাঙালীদের পরস্পরের সহি যোগদক্ষ ও বাঙালীর বন্ধার রাখার জন্য এবং তাহাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হয়। বঙ্গ-একবার ময়ামারোহে ইহাদের উৎসব হইত।

এলাহাবাদে ইনি আতিথ্যবর্ধনের জন্য স্থবিধা ছিলেন। জাতিধর্মনির্কিশেলে বহু লোক তাঁহার গৃহে অতিথি হইতেন।

‘প্রবাসী’-সম্পাদক ভারতীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভারতে সর্বাঙ্গোপায়া হইলেন। শিল্পাচার্য্য বনরোজ চিত্র তিনিই দেশীয় পক্ষে প্রথম প্রকাশ করেন। ভারত বর্গের ও বাঙালার সর্বাঙ্গীন উন্নতি চেষ্টা ছিল ‘প্রবাসী’ সম্পাদকের জীবন-ত্রাণ। বাহুরের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হেঁচি তিনি বিলাস করিতেন। আজীবন এই বিলাস রাজকীয় রামমোহন তাঁহার আদর্শ ছিলেন। ‘প্রবাসী’র প্রথম হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অধরঞ্জন দিবে তাহা আদ্য ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এলাহাবাদে

‘প্রবাসী’-সম্পাদকের সর্বাঙ্গোপায়া প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধ ছিলেন মজের শ্রীবামনদাস বসু। ইহার সহিত পরিচয় হইবার পর ইনি ‘প্রবাসী’তে বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেন। এই সকল প্রবন্ধ নানা ভাবে ও নানা দিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব প্রদর্শিত হয়। বামনদাস বাবুর ঐতিহাসিক প্রায় সমস্ত পুস্তক ‘প্রবাসী’-সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকগুলির সাহায্যে ভারতের ইতিহাস-তাহার গৌরব, তাহার অধঃপতন, তাহার শত্রু মিত্র মন দিক বাট ও নৃতন দৃষ্টিতে দেখিবার সাহায্য হয়। ‘প্রবাসী’র পুস্তক প্রকাশ বিভাগ বলিয়া বিশেষ কিছু পূর্বে ছিল না। কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যই এই জাতীয় পুস্তকগুলি প্রকাশে পিতৃদেবের আগ্রহ হয়। দাদা লক্ষণরায়ের ইংরাজী পুস্তক ও গুরুদেবদেব সাহেবের India in Bondage প্রভৃতি ‘প্রবাসী’-সম্পাদক মহাশয় এই সব ব্যবসাই প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁহাকে রাজস্ব পাইতে হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বঙ্গেরী ব্রতধারী ছিলেন। বহু বৎসর তিনি সর্বাঙ্গা বন্দর পরিধান করিতেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ‘Modern Review’ প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহার ইতিহাস রচিলা থাকিবে। ইহারই notes পরে Towards Home Rule নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

কাগজ নিকিষ্ট দিনে বাহির হইবেই হইবে, এই প্রথা ‘প্রবাসী’-সম্পাদকের সৃষ্টি। ‘প্রবাসী’-সম্পাদক নির্ভীক ময়াদোচক ও উচিত বক্তা স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি এই কার্যে বদ্ধ ও শরত্রে ভেদ করিতেন না।

তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও সভাপতি হন এবং বহুবার আচার্য্যের কার্য করেন। সাহেবের নিম্নলিখিত ভারতীয় একেবরবাদ শিল্পীদের সভাপতি ও বাঙাল-পাট বোড়ক মণ্ডলারও সভাপতি হন।

রাজকীয়দের অভাব অভিযোগ ও দাবী বিষয়ে তিনি ইহার হুৎপাণ্য পেশনী সর্বাঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন।

উপর উপর ছুই বৎসর তাঁহাকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। হিন্দু মহাসভার বিভিন্ন প্রদেশের ভোটে এই অস্পষ্টতলিক এবং জাত-পাত ভোড়ক হিন্দুই প্রায় সব প্রদেশের ভোটে পান। হিন্দু মহাসভার যে areed এই সময় ছিল তাহাতে অবশ্য ইহার সভাপতি হওয়ার কোনো বাধা নাই।

League of Nations এর কার্যকলাপ দেখিবার জন্য বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি League কর্তৃক জেনিভায় নিমন্ত্রিত হন। League তাঁহার ব্যয় ৬০০০ দিতে চাহিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার স্পষ্ট ময়াদোচনার পথ আরও পরিষ্কার থাকিল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করিয়া জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, সুইজারল্যান্ড, চেকো-স্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইটালী ঘুরিয়া ৪৫ মাস পরে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া রত্না দিবিয়াছিলেন—‘ইহাকে দেখিলে টলষ্টয়ের কথা মনে হয়।’

কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি বোম্বাই States people Conferenceএর সভাপতি হন।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দী ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা করিতে চান। এই লঙ্ঘ্য বহুবার কংগ্রেস-মণ্ডপে বহু বিবাদ হইয়া গিয়াছে। রামানন্দ ইহার সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু তিনি ‘বিশাল ভারত’ নামক হিন্দী পত্রিকা বহু বৎসর পরিচালন করেন। ইহা বঙ্গদেশে ও বহির্ভারতের হিন্দীভাষীদের বিষয় চিন্তা করিয়াই তিনি করিয়াছিলেন।

সর্বপ্রকার নারী-কল্যাণ চেষ্টায় তিনি উৎসাহী ও অগ্রণী ছিলেন।

তিনি কেবলমাত্র সাংবাদিক ছিলেন না, সকল প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণই তাঁহাতে ছিল। জ্ঞান, চরিত্রে, সভ্য-মিটার, মানব-প্রেমে, দেশ-ভক্তিতে তিনি বাহুরের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি জাগাইয়াছিলেন।

তোমাকে দেখিয়ে ধনি পাগল হয়েছি।
মন-প্রাণ-দেহ সব তোমাকে সঁপেছি।
চাই না স্বর্গের স্থান নন্দন-কানন।
দরশন পাই যদি ও বিধুবদন।
তোমার চাহনি প্রাণে শেল সম বাজে।
বিকল অশ্রু অঙ্গ নাহি সরে কাজে।
বিদ্রাঘ-কটাক্ষ আর মমুখাধার।
করেছে গো জর জর এ' তহু অজ্ঞ।
শব্দে বর্ণনে আর নিভা জাগরণে।
তব ছায়া রোদনে ধানে আর মনে।
পুরাবে কি তাপিতের অবসার বাসনা।
দেখা দিয়ে পুনঃ যোরে কুরঙ্গ-ময়না। (১)
ভূমিত পখিক যথা আনন্দিত হয়।
পাইলে সমুখে দেখা পূর্ণ জলাশয়।
তা' হ'তে অধিক রমা তুমি মোর কাজে।
তোমা ভিন্ন মাঞ্চনীয় অঙ্গ কিবা আছে।
‘তিলমূল-জিনি নাশা’ সন্মুচিত কেশ।
করত স্তম্ভ উরু উজ্জ গ্রীবাশেষ।
চাপ সন ক্রুর যুগ পক্ষ বিধার।
স্বর্ণলিপিত বর্ণ গীনি পরোদর।
মূল নিভয় আর কীণ কটিলেশ।
আধাধারে সরিবদ্ধ সৌন্দর্য অশেষ।
মেঘান্ত বেষ্মি শোভা বলা নাহি যায়।
লাজ পেয়ে ফণী যেন বিবরে লুকায়।
দশন-পঙ্ক্তির ছটা বর্ণি কি আর।
একহরে গাথা যেন মুকুতার হার।
চিকুর কুশলরাশি অতি মনোদোহা।
ইন্দ্রি়ত বননের বাড়িয়েছে শোভা।
কপোলের শোভা কিবা আধা মরি মরি।
গোলাপ হ'রেছে রক্ত চন্দক উপরি।

সখা-সুখে বড় যত চরণ-অমুখি।
সামিলিত হ'য়ে আছে বৈরীভাব ভুলি।
আকুলিত করি' দ্বাদি শ্রমধুর বনে।
অখন-গৌরবে চল গজেন্দ্র ধমনে।
যে নানা এ কণ্ঠস্বর ক'রেছে শ্রবণ।
না চাহিলে বিনাবারে কোকিল-কুজন।
কুমুদাবল তব রূপের প্রভায়।
সংহত করিয়া রশ্মি মেঘেতে লুকায়।
অগতে না পাই তব রূপের তুলনা।
যেন তুমি চিত্ররের মানস রচনা।
তিল তিল রূপ ধাতা করিয়া গ্রহণ।
তিলোত্তমা সমা তোমা করেছ সন্ধান।
এ রূপ-মাধুরী যেবা করেছে দর্শন।
সাধ্য নাই অজ দিকে ফিরতে নরন।
মহাভূত হয় লোক তোমার রূপেতে।
তোমা ভিন্ন অজ নারী নাহি লয় চিত্তে।
হ'য়েছি তোমার রূপ-দর্শন-ভিহারী।
পূর্যাব মনের সাধ বারেক নেহারি।
ধরা মাঝে ধখ কেবা পুষ্প-প্রবর।
যে জনা লভিলে তোমা, রমণী হুন্দর।
রাগীর প্রলাপ সম রুচি-বিগহিত।
বলেছি অনেক কথা অতীতচরিত
কল্পনিত চিত্ত মম হে যুগশ্রেণিনি।
ক্যা কর মোরে দেবি অজ্ঞ প্রদানি।
চাতক মেঘিত থাকে বারিবিদ্যু আশে।
এ চিত্ত-চকোর মম (ভেমতি) তব প্রেম পাশে।
তোমার সর্গীণ মম এই আকিঞ্চন।
যুগে যুগে প্রেম-বারি কর' সিঞ্চন।
দূর কর বিরহীর বিরহের আলা।
(নিত্য) নব নব রূপে পৃথী প্রেমে হোক আলা।

ইন্দিও

(সমস্যা-ধূলাক উপন্যাস)


শ্রী অমল ঘোষ

দেখুন ছিল না মোটেই, তবে কুসংস্কৃত না হলেও অতি-
রক্তার একটা স্পষ্ট ছাপ তার সারা মুখেতে ফুটে
উঠেছিল। সে বিখ্যাত কৈরত প্রেমে পড়ার ব্যাপারে
যে কোনো সন্দেহী মেয়ে একদিন তাকে ভালবাসতে
পারে। কারণ, ওর ধারণা ভালবাসার সৃষ্টি দৈহিক
প্রয়োজন থেকে, অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি থেকে নয়।
এলিস থেকে পশ্চিমে লেখাপড়া জানা লোকদের
বহা ছিল ওর জিজ্ঞাসা, নারী-পুরুষ বিষয়ের তর্কের গন্ধ
ওকে সবচেয়ে বেশী তাকিক করে তুলত। যুগের
ব্যাপারে ওর ছিল একটা আশ্চর্য রকমের ক্ষমতা, নীরস
প্রবন্ধ-জর্জরিত বস্তুর পাহাড়ী পথের মত দীর্ঘপদবিশিষ্ট
ইয়োরেণীয় তাত্ত্বিকদের উৎকট গণ্ডগোলগুলোর
মুণকগুলিই প্রায় সে একসঙ্গে অনর্গল বলে যেতে
পারত, শুধু এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে অবাক হ'ত, বোলত—
Parrot.

সৈনিকও মেয়ে-পুরুষ নিয়ে ওর বক্তৃতা-মহলে একটা
তরু চলেছে এমন সময় হঠাৎ ও বলে বলল : “The
sexes are not greatly attracted by any purely
aesthetic qualities, it is the womanly
qualities of the woman which are attractive
to the man, the manly qualities of the man
which are attractive to the woman.” বন্ধুরা
প্রেমের ব্যাপারে ওর বৈজ্ঞানিক বৃত্তি নিশ্চয় করণ
পেরলেও বলেছিল, স্বপ্নকে ওকালতীর জন্মে ও শুধু
একপাশী হলে পড়ছে, কোনো সন্দেহী মেয়ের মন
আমরা যেটার কোনো দিনই তাকিয়ে দেখবার সুযোগ
পাননি জীবনের কত বড় একটা failure সে। বন্ধুদের
মধ্যে কে একজন ঠাট্টা করে বলেছিল Havelock Ellis

বোধ হয় খুব হুস্রী পুরুষ ছিলেন, না হে ? রাগ না করে
ও জবাব দিয়েছিল, জগতের নাম করা মনস্তাত্ত্বিকদের
কেউই বোধ হয় তত সন্দেহ করেন নি, কিন্তু এ পর্যন্ত
নারীর মন আকর্ষণের ব্যাপারে বোধ হয় তারাই
তোমাদের তথাকথিত অনেক সন্দেহ পুরুষের চেয়ে ঢের
বেশী ভাগ্যবান ছিলেন। একজন উত্তর দিয়েছিল, সে
সব মেয়ে ত দাগী, রক্তী! কোনো বেরাগী মেয়েই বোধ
হয় এ পর্যন্ত তোমার দেখে এলিস বা স্বয়ংভের প্রশংসা-
কাথিনী হবার সৌভাগ্য লাভ করেনি। ও জিজ্ঞাসা
করেছে, বোধ হয় তোমরা বোলতে চাইছ তারা নিজেরা
সন্দেহী ছিলেন না বলেই ওপরের ঐ মন্তব্যকে নিজেদের
আত্মকৃত্তির জন্মেই শুধু সৃষ্টি করে প্যাছন, ‘এইত ? কিন্তু
সংসারের কোথাও একটা বেরাগী মেয়ে-পুরুষের সন্ধান
আমরা বলে দিতে পারি। চোখ যদি থাকে, তাহলে
দেখতে পাবে সমস্ত সমাজ বাহ্যানে Insane, Corrup-
tible, disintegrated সেখানে যে কোনো একটা
সুস্থের সন্ধান করা বাতুলতা। কারণ জীবনটা কাব্য নয়
বাস্তব, দেহমনের স্বাভাবিক প্রয়োজন মোটামুটি এর ধর্ম;
তাই ক্রটি-কিছুটি এর পায়ে শইবে না, গা পরম হবেই।
এক বিকার অসুস্থতা বা হুস্রী বোলতে পার। কারণ
দেহের স্বাভাবিক অভাবের সৃষ্টি হলেই যে কোনো একটা
Substitute এর চাইই, তা সে যে কোনো, অন্তি-জনক
ব্যাপি হোক না কেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের পাতায়
চোখ বুজিয়ে যাদের বল তোমরা Frigidity, Dis-
pareunia, Maltrusion, Masturbation, Homo-
sexual lit, Insanity, obsessional-neurosis। কিন্তু
যে পাতায় সৃষ্টি ওরা ? ওগুলো কি সর্বত্র জীবনযাত্রার
যে স্বাভাবিক কতবে বোলব পাগলের মতোই স্বাভাবিক

নাতনটা জুয়েলারী
স্মারকচক্রিঃ জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্কেটস



১৬০-১, বহুবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা

নূতন ডিজাইন * নূতন প্যাটার্ন
 হীরা] অবসর [মুক্ত
 মত আমাদের
 প্রদর্শনী-গৃহে শুভ
 পদার্পণ করিয়া আমাদের
 এই নব অভিজান তথা শিল্পাধনা
 সার্বিক হইয়াছে কি না দেখিতে
 অরুরোধ
 মণি] করি। [জডোয়
 আধুনিক সৌধীন সমাজ
 মুগ্ধ হইবেন।

ফোন
 বি.বি. ১২৫৩

‘আর্ট ফিল্মিস্’ এর
 পরবর্তী আকর্ষণ
 ?

শীঘ্রই আপনাদের নিকট
 আত্মপরিচয় দিবে।

৮৮ নং চৌহদ্দী রোড

সারকুলার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের জংসন

ফোন : পার্ক ৯২২

পুণ্য-ফল

“হ্যাঁবে, সাড়ে ন’টা। বাজতে চলল বাবি। কখন ?
 এগনি তোর রথ এসে দাঁড়াবে।” না রান্নাঘর হইতে
 ডাক দিলেন।

দোতলার শুইবার ঘরে মেয়ে উষা ভাড়াভাতি করিয়া
 কল্লের জল পেলত হইতেছিল। আজ ঝান করিতে
 গিয়া দেবি হইয়া গিয়াছে। চুলে যা আঁঠা হইয়াছিল,
 মাথাটা নিতান্তই ঘমিতে হইল। যা এক কাঁড়ি চুল,
 ইহার ব্যবস্থা করিতেই যে কত সময় যায় তাহার ঠিক
 নাই। অথচ ইহার উপর মমতাও উয়ার এত বেশী
 যে, যা তা করিয়া ফেলিয়া রাখিতেও পারে না।

মায়ের ডাকে দরজার বাহিরে গলা বাড়াইয়া উষা
 বলিল, “এই যাচ্ছি, চান করতে গিয়ে দেবি হয়ে
 গেল মে।”

পানের ঘর হইতে উয়ার দাদা সুপ্রিয় বলিল,
 “বাগবিক, মেয়েদের বড় দুঃখের জীবন, এই চুল-বাঁধা,
 লাজ করা, পাউন্ডার, সেট, মাথা, পরচ্চা করা, এসবের
 ঠেকে আবার পুল-কলেজ যাওয়া! ভগবানের উচিত
 ছিল, মেয়েদের জন্ম দিনটা অন্ততঃ ছত্রিশ খটার করা।”

উষা বই-খাতা শুছাইয়া হুন্ হুন্ করিয়া নামিয়া
 গেল। সিঁড়ি হইতেই উঁচু গলায় বলিল, “নিজের
 চরকায়ে তেল দাও না বাপু। মেয়েদের ভাবনা অত কে
 তোমাকে ভাবতে বলছে। নিজেরা ত খাচ্ছেনও না,
 পরচ্চাও করেন না। আর দাড়ি কামাতে গিয়ে ঠাদের
 কোনো দিন দেয়িও হয় না। তবু যদি না আর্কেকের
 বেশী লেকচারে “প্রকৃষ্টি” চলত।”

মা বলিলেন, “নে বাপু পেয়ে নে আগে, ঝগড়া করিস
 পরে। এই গাড়ী এল বলে।”

উষা বলিল, “বাপের কত ভাত দিচ্ছ ? অত
 গিলতে পারব না আমি, শুধু শুধু নষ্ট হবে।”

উষার ছোট বোন হাসি সেইখানে বসিয়া শেলাই
 করিতেছিল। বসন্তের সোড়ায় একপালা টাইফয়েডে
 দুইয়া উঠিয়াছে, কাছেই পড়াচনার হাঙ্গামা এখন নাই,

বাড়ী বসিয়া আছে। মাকে একটু আধটু সাহায্য করে,
 দিদির কাছে ইংরাজী এবং দাদার কাছে অল্প কবিতার
 ভাগ করে, তবে কার্যতঃ বিবেশ কিছু হয় না। উয়ার
 কথা শুনিয়া সে বলিল, “বাবা; দিদি সুন্দরী হয়ে যা বিপদ
 হয়েছে, ‘কিগার’ রাখবার চেষ্টায় তার আহার-নিদ্রা
 গুচে গেল। বেশ আছি বাবা আমি, খালি ক্লান্তি,
 টাইফয়েডে হয়ে কোথায় একটু স্তব্ধতা, না আরো
 ঘুসো মুক্তি বাগিয়ে বসলাম।”

উষা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল, “ছোট বড় সবাই
 মিলে আমার পিছনে লাগলে ভাল হবে না বলছি।”

মা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “এই
 নাও, একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। তোমাদের কি
 আর বেয়ে বসে কাজ নেই, তাই সবাই মিলে ওর পিছনে
 লেগেছ ? পোড়া গাড়ীও এসে গেল দেখছি। কতগুলো
 ভাত ফেলে দিল দেবলি ? আর এই দারুণ মাগিয়া-গণ্ডার
 দিন।”

হাসি বলিল, “কারো বা সর্গনাশ, কারো বা পোয়
 মাস। দিদির মত মেয়ে ঘরে ঘরে থাকলে, কলকাতার
 ভিক্টরী ষ্টোডাগুলো বেয়ে বাচে।”

“এমনি করলে এর পর নিজেদেরই ভিকে করতে
 বেরতে হবে। অ মতির মা, ভাত কটা হুড়িয়ে ঐ কটি
 ছেলেটাকে দিয়ে দাও বাছা, দোরের ভিতরে ডেকে এনে
 দিও, না হলে ঐ শুননি মাগীরা কেড়ে খাবে ওর হাত
 থেকে।” বলিয়া হাসির মা আবার রান্নাঘরে চলিলেন।
 আগে একটা ঠিকা রাধুনীও ছিল, কিন্তু এখন আর ছুটী;
 লোক রাবিবার মত অবস্থা নাই, তাই রাধুনীকে বিদায়
 দিয়া নিজেই ছুঁবেলা হাঁড়ি ঠেকিতেছেন। ছুই মেয়ে
 অথবা কিছু কিছু সাহায্য করে, তবে বেশীর ভাগ চাপ
 তাহারই খাড়ে পড়িয়াছে।

উষা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল—ভিখারী ভীড়ের ভিতর
 দিয়া। একটা বাটিতে করিয়া ভালমাথা কয়েকটা ভাত
 লইয়া মতির মা দরজার কাছে আদিবাসক সমুদ্র-তরঙ্গের

মত' অনশনরীষ্ট জীলোকা ও বঙ্গালসার শিশুর দল তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। খাজস্রবোর এক কণাও কাহারও ভাগ্যে ছুটিল কি সবটাই পথের ধূল্যয় দলিত হইয়া গেল, তাহা দেখিতে পাইবার আগেই কলকাতার "বঙ্গ" তীক্ষ্ণ হুরে বাঁশী বাজাইয়া অনেকখানি অগ্নসর হইয়া গেল।

উষা সূর্য্যপাতিনী ললিতাকে বলিল, "সন্ধ্যের অতীত হয়ে উঠেছে ভাই, ইচ্ছে করে বাড়ী ঘর ছেড়ে এমন কোথাও পালিয়ে যাই, যেখানে এ দৃষ্ট অন্ততঃ আর দেখতে হবে না।"

ললিতা বলিল, "কোথায় বা যাবি? সব জায়গায়ই ত এই—আমাকে আশ্রয় প্রায় মড়া ডিঙ্গিয়ে আসতে হল।"

উষা বলিল, "কলকাতার ফণ্ডে তুমি কত দিয়েছিস তাই?"

ললিতা বলিল, "এক টাকা। আর তুমি?"

উষা বলিল, "কিছুই দিতে পারিনি। মায়ের কাছে চাইব কোন লজ্জায়? দেখছি ত সংসার চালাতে কি রকম মুখে রক্ত উঠিয়ে খাটছেন। নিজের যদি বাবা-বাড়ি থাকত ত দিয়ে দিতাম। যতই আমরা ছেলেরদের সঙ্গে সমতার দাবি করি না, আমরা সত্যিই তাদের চেয়ে নিষ্কল। এই ত বাবা সেদিন একটা মোটার ড্রাইভারের বলি "পার্সিটাইম" কাজ করে ক'টা টাকা চাড়া দিল, আমার মুরোদে ত কিছুই ফুলোল না।"

ললিতা বলিল, "তুমিও ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারিস, তবে ইচ্ছেটা যথেষ্ট প্রবল হওয়া দরকার।"

উষা বলিল, "ইচ্ছের অভাব কিছু নেই ভাই, সাধেরই অভাব। তাড়াহুড়া আমি বাধীনও নই। বাপ-মায়ের খাড়ে আছি, তাঁদের পয়সায় খাচ্ছি পরছি, ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের অস্বস্তি আমি কি-ই বা করতে পারি? আর তাঁরা বেশ কিছু "ওল্ড ফ্যাশানড" ভা ত জানিস্‌ই ভাই।"

স্মৃতিতে স্মৃতিতে গাড়ী কলকাতার দিকে চলিল। সন্ধ্যা একই দৃষ্ট, ভীড় করিয়া অন্ধি-চর্ম্মার নারী ও শিশুর দল যেন যমের সিংহাসনের দিকে যাত্রা করিয়াছে।

"মাগো ছুটো ভাত দাও" ইহা ভিন্ন কাহারও মুখে কোন কথা নাই। যথের ভাব অভিক্রান্ত, তন্ত্রাজ্ঞারের মন্ত,—ঐশ, বিরক্তি কিছুইই ছিল সেখানে নাই। কালি হায়েব বা চুরি করিয়া বাইবে, সেটুকু ক্ষমতা লইয়া ইহার জমগ্রহণ করে নাই। ভিক্ষা চাহিতে কেউ উৎসাহ দরকার সেইটুকু মাত্র দিয়া যেন বিদ্যাত। ইহার সঙ্গ করিয়াছেন।

কলকাতার দরজারও সমান ভীড়। জীলোকার মধ্যে কেহ কেহ বঙ্গালসার শিশু কোলে করিয়া দাঁড়ি আছেন। শিশুগুলি না বাইয়া শুকাইয়া এমন মৃত্যুর কবিরাজকে, যে বাহুদের সন্তান বলিয়া বুঝিবার আর উপায় নাই।

উষা বলিল, "এদের দেখলে নিজেরদের উপর যোগা যায় ভাই। আমরা ছুঁবেলা খাচ্ছি কি করে?"

ললিতা বলিল, "তুমি যে ক'টা ভাত খাস, তাতে যেকোনো মানুষের আশ্রয়পেটাও হবে না। বাঙালীরা ছেড়ে বরং বাড়িয়ে দে, গায়ে জোর হলে খেতে বোঝা করে বরং অনেকের উপকার করতে পারবি।"

উষা বলিল, "গায়ের জোর লাগবে এমন বোঝাপাড়ের পথা মেয়েদের আছে বাপু? আমি কাঁকাগুটে বা মিল্লী হতে পারব না।"

যতটা পড়িয়া গেল। মেয়েরা সকলে রাশের দি চলিল। উষার মনটা বড় মার, দুর্ভিক্ষের দৃষ্ট তা হৃদয়ে কেমন একটা বিভীষিকার ছায়াপাত করিয়া কিছুতেই মন হইতে সোঁতকে সে বাড়িয়া ফেলি, পারেন না। লেখক আর সত্যিকার জ্বলন্ত হঠাৎ সঙ্গে হইয়া দেবে, তাহার চিন্তার ধারা পাঠাপুস্তকের বা ছাড়িয়া অল্প কোথায় উঠাও হইয়া গিয়াছে। ইহাও অল্প কিছুই করিতে পারিতেছে না বলিয়া নিজের উদ্ভাবনা আসে। কিন্তু কি-ই বা সে করিতে পারে নিজের বলিতে তাহার এমন কিছুই নাই যাহা, কবিরাজ কাহারও কোনো উপকার হয়। গহনার অতি সামান্য যাহা আছে তাহাও ত পিতামাতার স্মৃতি তাহার নিজের নয়। এক উপায় কিছু উপার্জন করি দান করা, যেমন তাহার দাদা করিয়াছেন।

হেলেনের সামনে অসংখ্য পথ খোলা, এমন কি, মুটেগিরি করিলেও যথ বই অপযশ নাই। কিন্তু উন্মত্ত ও সত্যই কি বা রাঁধুনীর কাজ লইতে পারে না? শিক্ষিতা মেয়েদের একমাত্র বোঝাপাড়ের পথ মেয়ে-স্কুলে টাচারের কাজ করা, কিন্তু কত গড়া বি-এ, এম-এ, পাশ মেয়ে বেকার বসিয়া আছে, সেখানে তাহার মত খাড়া ইয়ারের ছাত্রীকে কে কাজ দিবে?

তাহার গভীর মুখ দেখিয়া তাহার আর এক বন্ধু নিরুপমা ভাহাকে চিঠিটি কাটিয়া বলিল, "এত ভাবনার গাধরে তলিয়ে গিয়েছিস কেন? বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে না কি?"

উষা বলিল, "আহা, বিয়ে করবারই উপযুক্ত সময় বটে, বেশভূজ যমের বাড়ী যেতে বসেছে, এই ত শুভ কার্যের ঠিক দিন।"

মিক্স বলিল, "আহা মরে যাই, দেশের লোকে খেতে পাচ্ছে না বলে কি আর বুদ্ধ প্রজাপতি বা তরুণ পক্ষসর "সিটায়ার" করেছেন মনে করছ? জ্বলন্ত তা মনে কোনো না। এই ত সেমিন আমাদের পাড়ায় উপরি উপরি তিন চারটে বিয়ে হয়ে গেল। বেশ পাঁচ ছ'শ মোটা মোটা লোক বেয়ে, ফেলে ছড়িয়ে আনন্দ করে গেল। জম্মাধর্মের রথ যখন না ঘুরলি, চাকার ভলয় যতই না মাছ খুঁড়িয়ে যাক।"

উষা বলিল, "তাই ত দেখছি। কেন যে এমন হয়, সেটা এক জগৎব্যবহী জ্ঞানে বোঝ হয়।"

বিকালে বাড়ী আসিতেই হাসি লক্ষাইতে লক্ষাইতে আসিয়া হাঙ্কির, বলিল, "জান বিদি, রাতে একটা মেমস্ট্রল গুটে গেছে। বাজ ত? আমি কাপড় চোপড় সব বার করে রেখেছি।"

উষা বলিল, "কোথায়? কাদের বাড়ী, কিসের মেমস্ট্রল?"

"যারে ধারা মাদীনের বাড়ী, কিসের তা কে জানে? কানো জম্মি-টিন হবেন, সেবেনি ত কিছু। বাড়ীভক্ত রবাইকে বলেছে, তা না যেতে চাইলে না, আর দাদাটা ত এখন অবধি বাড়ীই আসিনি।"

উষা মরে চুকিয়া বই বাত টেবিলে রাখিয়া লগা

হইয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। বলিল, "আমায় চা-টা একটু এনে দে না ভাই, তার পর ভাবা যাবে, যাব কি না, আর গেলে কি পরব।"

হাসি চা ও জলপানার লইয়া আসিল, তক্তপোষের পাশে টুলের উপর রাখিয়া বলিল, "দিদি বেশ চা-তে প্রোমোশান্ পেয়ে গেলে, আমিই চোবের দায়ে ধরা পড়েছি, বুড়ো বয়স অবধি কালি বাট দিচ্ছ গেলোবোনা না।"

উষা উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সত্যি অসহ্য অত্যাচার। আজকালকার দিনে হু' তিন বার দুখ বাইয়ে দেওয়া যে কতবড় শাস্তি, তা এক ছুঁমই বুঝবে।"

হাসি বলিল, "হাঁ বাবা যেতে হত নিজেকে ত বুঝতে। বা বোটকা গন্ধওয়ালা দুখ। না গোয়াল-টাকে কিছু বলবেনও না আর সেটা প্রাপণগণে পেছোনি করবে। আচ্ছা, বাজ ত? কি পরবে বল, বাস থেকে বার করে দি।"

উষা বলিল, "ধাম বাপু, যান ত রাতে, এত তাড়া কিসের? কলকাতার গাড়ীর কল্যাণে প্রত্যেকটা "জয়েন্ট" ব্যথা হয়ে গেছে, আগে একটু গড়িয়ে নিই।"

উৎসাহেরে প্রোত বাধা পাইয়া হাসি অল্প বরে চলিয়া গেল। কোন্‌ জামার সঙ্গে কি রঙের রিবুন মানাইবে তাহা লইয়া গবেষণা করা ভগ্ননও তাহার বাকি ছিল।

শেষ পর্যন্ত হাসির বা বাবা কেহই গেলেন না। না বলিলেন, "নেমস্ট্রল খাওয়ার চেয়ে একটু হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে আমার কাঁধ দেববে বাপু। ধীরাক বলিস্‌ আমার শরীরটা বড় খারাপ, তাই যেতে পারলাম না।"

হাসির বাবা বলিলেন, "অমন আধ ঘণ্টা আগে নেমস্ট্রল করলে ছেলো-ব্রাতে যেতে পারে, আমাদের মত বুড়ো হাড়ভার কর্তব্য নয়। চার দিন আগে থেকে "অ্যাপপেন্টমেন্ট" করা রয়েছে, নেমস্ট্রল খাবার জন্তে সেটা কসকে যেতে দিতে পারি না।"

হাসির মহা উৎসাহ সফলকর লইয়া যাইবার জন্ত। সে বলিল, "আহা, সেটা সেয়ে বুঝি যাওয়া যায় না। ওঁরা অনেক লোক বলেছেন নিশ্চয়, বাওয়া দাওয়া

শেষ হতে ঢের রাত হবে, অনেকেই হয়ত দেরি করে যাবে।"

হাসির মা বলিলেন, "ভাই যেয়ো গো, আমরা ছুটকের একজনও না গেলে কিছু আবার মনে করবে।"

কর্তা অবশু পাকা কথা কিছু দিলেন না, যাইতেও হয়ত পারেন, বলিয়া বৈকালিক জলযোগ গারিয়া বাহির হইয়া গেলেন। হুশ্রিয় রিক সময়ে আসিয়া জুটিল, বোনদের পিছনে খানিকক্ষণ খুন্সটি করিয়া, তাহার পর নিজের সাক্ষাৎকার মন দিল। হাসির ভাড়া চোটে উন্মাদকেও খাবার খতাবাদেনক আগে উঠিয়া বেশভূষার আয়োজনে লাগিতে হইল। কি রং-এর কতখানি মূল্যের শাড়ী পরা উচিত তাহাই লইয়া ছুই বোনে খানিক তর্কাতর্কিও হইয়া গেল।

হুশ্রিয় পাশের ঘর হইতে চোঁচাইয়া বলিল, "ট্রানে যাবেন যদি বাপু ত একটু ভঙ্গলোক সেজে যেও, গাড়ী শুদ্ধ লোক মেন হাঁ করে তাকিয়ে না থাকে।"

উষা বলিল, "কবে, কোথাও আমরা ছোটলোক সেজে গিয়েছি না কি?"

হাসি বলিল, "দাদাটার জালায় অধির। এর জন্মে আমাদের কোথাও গিয়ে একটু আনন্দ হয় না। বললাম মাকে যেতে, তা যদি কিছুভেই গেলেন।"

বাহা হউক, অপরশেষ সকলের প্রসাধন সম্পন্ন হইল, তিন ভাই-বোনে ট্রাম ধরিতে চলিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া হুশ্রিয় বলিল, "এখন বুটী না এলেই বাটী।"

বুটী আসিল না। তাহাদের পশ্চাৎবলটিও খুব দূরে নয়, নিরুপদেব তাহার গিয়া পৌছিল। ছাত্তের উপর মেয়ের দল রতীন প্রজাপতির কাঁচের মত ঘুরিতেছে। নীচের ভূমিরূপে ছেলেরের ভীড়, হুশ্রিয় সেইখানে চুকিয়া পড়িল। উন্মাদা ছুই বোনে দোতলায় উঠিয়াবাত্ত বাহীর একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিল। সে হাসিরই বয়সী হইবে, তবে লম্বা চওড়া অনেক বড়। আসিয়াই হাসিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "খান্ এক্সেসিভ, বালাস বাবা। যা দেরি করে বলা হল, আমরা ভাবলাম অর্ধেক সোকে আসলেই না বুঝি।"

হাসি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি ভাই? যে জম্মদিন?"

মেয়েটির নাম বিমলা, সে বলিল, "দূর, আমার ভাত্ত নামে জম্মদিন? তোরা যা চমৎকার 'সেমন'-টাইফয়েড হয়ে আরও কবে গেছে, দাদা এবারও ভাল করে পাশ হয়েছে কি না, ফাউন্ডার্স অনার্স' পেয়ে ভাই খাওয়ান হচ্ছে। খাওয়ান হবে অনেক দিনের ঠিক ছিল, এমন সময় বড় পিসীমা হঠাৎ দেশ থেকে এে হাবিল, এসেই এমন অশ্রুবে পড়লেন যে আমাদের গিয়ে গেল চমকে। পরন্তু থেকে ভক্তারা বলছেন যে রিক কিছু নেই, ভাই খাওয়ানটা হচ্ছে।"

উষা ভক্ততার খাতিরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি অম্বর? বিমলা বলিল, "কে জানেন ভাই, খুব জর ছিল, জী কানেশন আর বমি করেন। এ ক'দিন তাঁকে নিজে ছোঁয়া ভুগতে হচ্ছে। নাস' এত বোঁজা হচ্ছে, কিছুতেই পাগ্গ যায় না, মায়েরও প্রাণ বেরবার জোপাড়। তার উপ আসিয়া যদি বা তাঁর কাজ খানিক খানিক করছিল, তা আজ দুপুরে সেটাও পালিয়েছে, তার জেলেরা পটা তুলছে না কি একটা ছুতো করে। আজ রাতে কি হবে জানি না।"

হাসি বলিল, "বাবা কলকাতায় আবার নাস' পাগ্গ যায় না? অলিতে গলিতে ত সব বাহার দিয়ে ঘুঁঝেছে।"

বিমলা বলিল, "আরে তারা ত A. R. P. এর নাস'-তারা আসতেই চায় না।" কথা বলিতে বলিতে তাহার ছাতে গিয়া উঠিল।

ললিতাও আসিয়াছিল, সে ইহাদের দূর সম্পর্কে আত্মীয়। উমাকে এক কোণে টানিয়া লইয়া বলিল "দেখ ভাই, সত্যি যদি কাজ করে কিছু উপার্জন করে চাস ত এই একটা স্থবিরে রয়েছ। তোরা বাব-মাও আপত্তি করেন বলে নমোন নয়, আজমকালে চেনা বন্ধুর বাড়ী। এঁরাও ভয়ানক বিপদে পড়েছেন।"

উষা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি কাজ ভাই, নাসের কাজ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ছোঁয়াতে অশ্রু কিছু নয়, তাহলে কি আ

তাকে করতে বলতাম। একেবারে শয্যাশাঠীও নয়, ট্রেন্চ-নাসের কিছু দরকার নেই।" কাছে থাকা, আর ট্রায় উপরি দেখাশোনা করা। দু' তিন দিন পরে শ্রম থেকে ওঠ বড় মেয়ে এসে পড়বেন, তখন আর দরকার হবে না।"

উষা বলিল, "আমি করতে পারি ভাই, রঞ্জীর সেবা করতে আমার কিছু যোরা করে না। যা বাবা মত দিলে আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু আমি ত আর সত্যি নাস' নাম, আমি টাকা চাইব কি বলে?"

ললিতা বলিল, "ও ক্যালা ভাত বাবি, না হাত ঘাব কোথায়? ওরা যে কোমোরকম attendant পলেই এখন বর্ডে যায়, তা নাস' হোক বা নাই হোক। তুই রাজী হলে এখন হাতে গবাই বর্ণ গায়। তুই রাজী থাকিস ত বল, ওদের সব কথা বলবার, আর তোর বাবা মাকে রাজী করাবার ভার আমি নিচ্ছি। কিন্তু বই তাঁরা ত আসেননি?"

উষা বলিল, "বাবা হয়ত খানিক পরে আসবেন, যা খায়েতে পারেননি। দাদা এসেছে।"

ললিতা বলিল, "আচ্ছা, আগে এঁদের বলি, তার পর যের বাবা বাব মত করান।" সে নামিয়া চলিয়া গেল।

যে চৈত্রে গল্পগাড়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল, তাহার পর খাওয়া খাওয়া আরম্ভ হইল। শেখাশেখি হাসিকে কুন্ততগাপগরে নিমজ্জিত করিয়া তাহার বাবাও হাসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিমজ্জিতের দল যখন এক একে বিদায় লইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ললিতা আবার আসিয়া উষার কাছে উপস্থিত হইল। বলিল, "ওরা ত অত্যন্ত আনন্দে সঙ্গে রাজী। ছোট কাকীমা বলছেন তোর মত মেয়েকে daily দশ বারো টাকা দিতেও আপত্তি নেই ওঁদের, কারণ রোগিণীটি একটু গোড়া গোছে, নাসের হাতে বাওয়া দাওয়া করতে একান্তই নারাজ। তা দেখ' থাকবি আজ রাত থেকে। পরন্তু ত রবিবার, আর কাল মাত্র তোর এক 'শিরিয়' রাশ না হয় ঠাকিই দিলি? বিমলার কাপড় পরিস আজ রাতে, পরালে নিম্বের কাপড়চোপড় আনিবে নিশু।"

উষা বলিল, "গবাই ত ঠিক করে দিলে, কেবল বাবাব মডটাই নেওয়া হল না।"

এমন সময় অতি উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিতে করিতে হাসি আসিয়া উপস্থিত। বলিল, "ওমা দিদি, তুমি না কি রাতে বাড়ী যাবে না, এখানে থেকে নাসের কাজ করবে?"

উষা হাসিয়া বলিল, "তোকে কে বললে রে?" হাসি বলিল, "বাবা রে আমার বুঝি কাণ নেই? বীরা মাসী থাকবে বসুন্ধে আমার ইচ্ছা শুনেতে পাইনি? কিন্তু কেন ভাই? তুমি ত আর সত্যি নাস' নয়, নাসের কাজ করবে কেন?" উষা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "বাবা কি বললেন রে?"

"হাসি বলিল, 'বাবা ত বলছেন ইয়া তুমি থাকবে। এসব না কি মেয়েদেরই কাজ, আগেরকার কালে নাস' ছিল না, প্রতিবেশীরা পরস্পরের সেবাভ্রম্বা করত, এই সব। বেশ মজা বাবা। আমাকে কেউ কাজ দেয় ত আমিও থেকে যাই, আমার একলা একলা বাড়ী যেতে ভাল লাগছে না।"

উষা বলিল, "তুমি যা কাজের মেয়ে, তার উপর সস্তা রোগ ভুগে উঠেছ, তোমাকে আবার কে রোগীর সেবা করতে ডাকবে?"

শেষ পর্যন্ত উষা থাকিয়াই গেল। হাসি অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে একলাই ফিরিয়া চলিল। হুশ্রিয় জামনে এই প্রথম বোনের কোনো কাজের প্রশংসা করিয়া বলিল, "ভালই করেছে, বাপের টাকার শ্রদ্ধা করার চেয়ে এ ঢের ভাল। সকালে তোর জিনিষপত্র আমি নিয়ে যাব।"

রোগিণীর কাজ খুব বেশী নয়, উষার সাধের অতীত হইল না। বিমলার মা, বিমলার বাবা ও উষা, তিন জনে পালা করিয়া রাত জাগিল। বিমলার দাওয়া ছুঁটারবার ঘরের দরজা অবধি আসিয়া ঘুরিয়া গেল, তবে উষা ভিতরে আছে বলিয়াই 'বোধ হয় ঘরে চুকিল না। সকালে উষা কাপড়চোপড় আসিল, তাহার মা ও হাসি আসিয়া আর খতীর মত থাকিয়া গেলেন। দিনের বেলায় কাজ নেই, তবে সাহায্যকারীও অনেকগুলি জুটিয়া

গেল। বিমলার শিশি উবার উপর মহা খুসি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “ওমা, এ ত রিক আমাদের গেরস্ত খরের বৌঝির মত। তবে যে বলে কলেজে পড়লে সব বিবি হয়ে যায়, কোনো কাজ পারে না? যেমন লজীর মত দেখতে, তেমনি স্বভাব।”

ছুইটা দিন দেখিতে দেখিতে কাটয়া গেল। সোমবার সকালে রোগিণীর কন্ডা আসিয়া পৌছিলেন, উষাও বাড়ী ফিরিয়া গেল। কলেজের ছুটিক ফুটে একেবারে ছুটি টাকা চাঁদা দিয়া সহপাঠিনীদের অবিকালকেই সে অত্যন্ত নিশ্চিত ও চমৎকৃত করিয়া দিল। যে ছুটার জন দলিতার কাছে ভিতরের ববর জানিয়াছিল, তাহারা শুধু হাসিল। হাসি দিমির কার্যে পূরাপুরি খুসি হইতে পারিল না। নাক সিটকাইয়া বলিল, “আমি হলে বাগু অর্ধেকটা নিজের অঙ্কে রাখতাম আর অর্ধেকটা চাঁদা দিতাম। দিমির সব ভাতেই বাড়াবাড়ি।”

দিন দশ বারো পরে হাসির বাবা সন্ধ্যার সময় বাড়ী

ফিরিয়া যেয়েকে বলিলেন, “তোমার মাকে একটু জেবে দেখি।”

পত্নী আসিতেই বলিলেন, “মেয়ে নারিং করে টাকাই রোজগার করেনি, অজ্ঞ জিনিষেরও ব্যবহারেছে।”

হাসির মা উদ্গ্রীব হইয়া বলিলেন, “আবার কি ব্যবস্থা গা?”

“আমার নামে আজ বন্ধার কাছ থেকে সরাসরি চিঠি এসে হাজির। তিনি উমাকে চান চান ছোট ছোট জেবে। ছেলে ডবল এন-এ, পাশ, কলেজের প্রবেশ হয়েচে, তবে সেটা নিতান্তই সময় কাটানোর জেবেলার মা সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন। ও ওজীর কাউকে নাকি চাকরি করে কোনো দিন যে হয়নি।”

কোথা হইতে একটা শাঁখ জোগাড় করিয়া আনি হাসি প্রাণপণে বাজাইতে আরম্ভ করিল।

“খুব যে”

(গল্প)

সে দিন বেলা ঊটার সময় উপরের ঘরে কি একটা কাজে আসিয়া রসময় ছটাত থমকিয়া দাঁড়াইল। কতক্ষণ সে সেরূপ ভাবে ছিল তাহা খোলা হয় নাই। সামনের বাড়ীর আয়নায়া একটি ছায়া দেখিয়াই এইরূপ খটয়াছিল।

শতীন আসিয়া Mohun-Bagan vs East Bengal ক্লাব খেলা দেখিতে যাইবার জন্ত ডাকিল। তখন মনে পড়িল water proof লইতে আসিয়া সে ছায়া proof এ হাফুসু বাইতেছে।

বাহির হইয়া শতীনকে বলিল—আজ খেলা দেখতে না গেলেই ছিল ভাল।

শতীন বলিল—খুব যে, যারা সকাল আয়াম খেলা দেখতে যাবার জন্ত কত পীড়াপীড়ি—আমি আমার কাজের ক্ষতি করে চলে এলাম—আর এখন বলা হচ্ছে, না গেলেই ছিল ভাল। রসময় বলিল—ছটাত একটু কাজ প’ড়ে গেল, তা সে এমন কিছু নয়, চল।

জামাজুতা বাঁচাইয়া, টেলাটেসি করিয়া কোনও রকমে গালাগীতে থিয়া দাঁড়াইল, পিছন হইতে নীরেন টেচাইয়া উঠিল—এই যে রসময়, কি রকম B. A.-এর paper হল। রসময় হাসিয়া বলিল—ভাই, খেলার মাঠে এসে পরীক্ষার কথা কি হবে? মোটের উপর মন্ব হয়নি।

বহুক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিবার পর খেলা দ্রাব্য। শেষ হইল, মোহনবাগান ২-০ জয়লাভ করিল। বর্ণবর্ণের বিপুল চীৎকারে ও হর্ষধ্বনিতে সকলেই বসিতে পারিল, মোহনবাগানের নিশ্চিত জয়।

নীরেন বলিল—চল একটু Outram ghat এ।

কথায় কথায় শতীন বলিল—মাহুষের সবচেয়ে বড় গোস্ব কি?

রসময় অতঃমন্দ্র ভাবে বলিল—মাহুষ ভালবাসা খিলাস করে না।

নীরেন চুচুকি হাসিয়া বলিল—সেটা আবার কোন theory, এরকম বাঁকা কথা বলতে শিখল কবে থেকে রসময়!

রসময়—বিবাসের কথা বলতে গেলেই বাঁকা হয়ে যায়, শরল যে তাকে ত বিবাসের মুক্তি দিয়ে ঠেকান যায় না—স্বভাবতঃ যা স্পষ্ট তাকে অস্পষ্ট করতে গেলেই অস্বাভাবিকতাটা নজরে পড়ে প্রথম।

শতীন—খুব যে দার্শনিকের মত কথা বলছ, অর্থশ্রমের বিরহেই পোকের দার্শনিক ভাবটা বেশী ফুটে ওঠে।

নীরেন—এইটাই যে মাহুষের সবচেয়ে বড় দোষ তার প্রমাণ কি?

রসময়—circumstantial evidence গেলেই তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে, এমনত কোনও কথা নেই। অনেক সময় benefit of doubtও সে সব জায়গায় হয়ে থাকে। তা হ’লেই বুঝতে পারছ প্রমাণ-সাপেক্ষ বিবাসের মূল্য কি?

শতীন বলিল—তোমাদের মাজাজ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যাই। এমন হৃদয় গরুর দৃষ্টি দেখে তোমাদের তত্ত্বজ্ঞান যে কোথা থেকে আসে বুঝতে পারছুম না।

রসময়—কথাটা যখন উঠেছে তখন শেষ ক’রে নেওয়াই হুবিধে। ধরনা, স্মরণও গোবিন্দলালের ভাল-বাসার কথা। স্বামীর বিবাসেই তার বিবাস। এক গভীর ভালবাসা তাতেও অবিবাস হ’ল। রেহিষ্টি গির্ভী করা গহনা দেখিয়ে যে circumstantial evidence বাড়ী করলে তাইভেই তোমরা গোবিন্দলালের ভালবাসার সন্দিহান হ’ল। অথচ সত্যিই তখন সে কোনও অবিবাসের কাজ করেনি। তাই মনে হয়, মাহুষের ভালবাসা হওয়াটাই সবচেয়ে দোষের।

নীরেন হাসিয়া বলিল—এই ধারণাই যদি বহুমূল হয়, তা হ’লে তোমার মতে কউকে ভাল না বাসাই রিক।

রসময় এ কথাটা সহসা উত্তর করিতে পারিল না। পরে বলিল—এমন কথা ত আমি কোথাও বলিনি যে, কাউকে ভালবাসবে না। এই কথাটাই বঝতে চাই—এ পথে কত সামান্য কারণে বিপর আসতে পারে এবং তার পরিণাম

তিনটি মুহূর্ত—

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম মুহূর্ত : ছায়া

কামারাজা রঙ রেশমি শাড়িটি সন্ধ্যা-রঙীন বাতাসে, স্থতির পাঁজরে জোনাকির মতো স্পন্দিত তারা আকাশে।

দ্বিতীয় মুহূর্ত : ডেউ

আমের মুকুলে ফাঙনের আলো তুলেছে ডেউ আমাদের কথা জানে না কেউ। রজনীগন্ধা জড় হাসির সাদা হাসি স্তবির গুপ্তকে আলগোছে ছোঁয় ভীকৃ তার হাত দিয়ে।

অনেক পাখীর কাংকিতে ভরা সন্ধ্যা

রাত আসে দেখি মুকুর মতো বন্ধা।

মনের আকাশ শুদ্ধ বিশাল : ছিলো কি কেউ?

আমের মুকুলে ফাঙনের আলো তুলেছে ডেউ।

তৃতীয় মুহূর্ত : প্রার্থনা

এসো নীল নিছন শান্ত আকাশ

আমাদের অথচেন্দ্রনায়,

এসো নিশাপল দিন, চৈত্র রঙীন

গোপলির রাতা, বদনায়।

যেঁ কি বিজীবিকাময়, তা মনে হ'লে বলতে হয়, 'ছেড়ে দে মা কৈদে বাঁচি' কিন্তু 'কমলি ত নেহি ছোড়তা'।

শচীন বলিল—এ সব আমার ভাল লাগে না, যাওনা বাড়ী গিয়ে পাণ্ডর্য্য দাওর্য্য ক'রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সব 'অন্তবিহীন'ের কল্পনা করনা—কেউ তাতে অস্থখী হবে না। মনেরও প্রসারতা বাড়বে। কিন্তু পথে-ঘাটে যদি এই নিয়ে আলোচনা লাগিয়ে দাও, তা হলে তোমাদের দল থেকে ভবিষ্যতে আমার নামটা কাটাতে হবে।

শরীরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—এই যে রসময়, তোমার কথায় একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রসময়ের কোনও উত্তরের পূর্বেই শচীন উঠিয়া বলিল, খুব যে, আমার নিয়েও শেষ পর্য্যন্ত টানাটানি।

(২)

আজ কাল বৈকালের দিকে রসময়ের প্রায়ই উপরের ঘরে কাটিয়া যাইত। পরীক্ষার ফল বাহির হইতে এখনও দেরী আছে। দিনের হিসাব নিকাশ করিবার মত সময় তাহার ছিল না। দিন এমনই কাটিয়া যাইতে লাগিল। শুধু একটি ছাত্রকে কল্পনা করিয়া তাহার প্রাণে যে ভাব-ধারার বজ্রা বহিয়াছিল তাহা ভাবিলে, এই কথাটাই মনে হয় যে বয়সের স্বপনে সে ছাত্রা দেখিয়াই বিভোঁর।

সে দিন রসময় দেখিয়াছিল আয়নায় প্রতিফলিত একটি মেয়ের স্বন্দর মুখ। মুখে তার মুছ হাসি, চপল চোখ দুটি যেন তাহারই পানে নিবদ্ধ।

স্বন্দর মুখের চপল মুছ হাসির রহস্ত যুবকসম্প্রদায়ের যগজ্জকে কিরণ রসায়িত করে সে কথা তুলিয়া রসময়কে লজ্জা দিবার কোনও কারণ দেখি না। বেকারীর প্রিয় ফুটবল বেলা দেবা বন্ধ হইয়াছে, এতদিন বাহা তাহার কাছে জীবনের পরিচয় বলিয়া মনে হইত, আজ তাহা আমার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে একটুও বিধা বোধ করিল না। কথার খেলাপ হওয়া তাহার কাছে অজ্ঞায় বলিয়াই গণ্য হইত, আজ প্রতিপদেই তাহা খতিয়েছে। বাড়ীর সকলে মনে করিল, পরীক্ষা দিয়া বিশেষ পরিশ্রান্ত

হইয়া পড়িয়াছে; বজ্রা ভাবিল, কিছু একটা পোলসে বাহিয়াছে।

একদিন শচীন আসিয়া বলিল,—কি হে, আর আমার বেতাদ্ধে না, কি হয়েছে বলতে পার।

রসময় বলিল—কিছু হইনি, তবে এখন আমার লক্ষ্য করতে ভাল লাগে না। মনে করছি, বি, এ পাস করে কি ক'রব?

শচীন হাসিয়া বলিল, এর জন্ত এত ভাবনা, না কিছু ভাবছ। আমি কিন্তু সব জানি আমার ক'র জুকোসে চলবে না।

রসময় একটু চমকিয়া উঠিল, বলিল—বাছো পাণ্ড কাচ, নেশা চেশা করেছ নাকি?

শচীন তেমনিই হাসিয়া বলিল—তোমার মত কে মশগুল হতে পারলে আচ্ছ কি আর আমার বেতাদ্ধে পোতে। এতকণ ময়রের পিঠে চড়ে নন্দনকাননের উল্লসে চলে যেতাম, সমস্ত পারিষদ্যত আহরণ ক'রে বর দেবার করে নিবেদন ক'রে বলতুম, শচীকান্ত আমার মেনেছে, শচীর রূপ আজ তোমার কাছে মান হইবে।

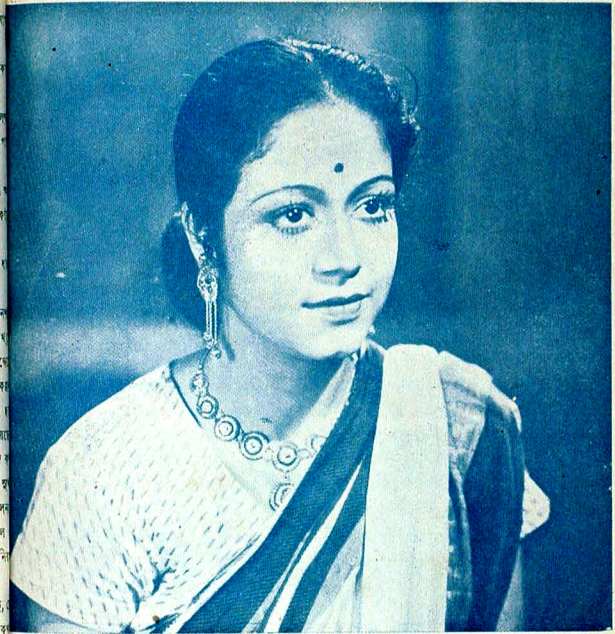
রসময় একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—ও সব বাছো পান্থনা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কল্পনাই শু কল্পনার গতাক্ত উপলব্ধি করতে গেলেই দেখি সব বন্ধ।

শচীন হাসিয়া বলিল—এতদিনে তুমি জানলে "ললনার কল্পনা মাজেই হলনা"—বুঝি কেউ নি করেছেন?

রসময় দেখিল, এমনি ভাবে কথাবার্তা হইতেছে, শচীন সমস্তই জানে অথচ কিছু বলিতে চায় না, সব কথা যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হইতেছে, বলিল—সত্যি বলতে কি একটু পাহাড় পর্বত দেখবার সখ হয়েছে একঘেঁয়ে জীবন আর ভাল লাগে না।

শচীন মুছ হাসিয়া বলিল—তোমার বয়সে কতটা সাগর পাড়ি দিয়ে এল, তোমার ভ' অভাব কিছু একবার সাগরপারের মজাটা উপভোগ ক'রে এসে আমার পত্র পেলেই স্ত্রী হব।

রসময় প্রজ্ঞয় ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া কমি তোমাদের ঐ এক কথা—



ইন্দ্র মুন্ডিটোনের "কলকিনী" চিত্রে
প্রমিতী পূর্ণিমা



ভয়াবহ চিত্রে রূপ দিতে ইনি অস্বীকার
এঁকে চেনেন নিশ্চয়ই—ইনিই হচ্ছেন
বরিশ কালফ



আধুনিক সভ্যতার হাতকর দাঁড়ি
ছবিতে ফুটেই তুলতে
চালি চ্যাপলিনের জুড়ি মেলা ভার



বিলাসী চিত্রে অগভীর ছুটি "গোপাল ভাড়া"
লরেল ও হার্ডি

শটান বলিল—তোমার মা সেদিন বলছিলেন—
তোমার শরীরটা বড় খারাপ, দিন কতকের জন্ম দার্কিনিং
কি শিলং বেড়িয়ে আসতে।

রসময় হাত করিয়া বলিল—নিঃসঙ্গ ভাবে দুর্জয় লিঙ্গ
উপভোগ চলে না—আর "She long" একেবারেই পছন্দ
হয় না।

শটান হাসিল, বলিল—তোমার দেখছি একেবারে
মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, এই বললে পাছাড় পর্কত
বেগতে হচ্ছে করে, আর এখন বলছ ও সব ভাল
লাগে না। তোমার একান্ত বিয়ের দরকার দেখছি।

রসময় গভীর হইয়া বলিল—এতে বিয়ের কথা এল
কোথা থেকে? আমি বিয়ে ক'রব না মনে ক'রেছি।

শটান হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—খুব যে, এদিকে
পাছাড় বেশ নিঃসঙ্গ ভাবে বেড়াতে ভাল লাগে না।
কিছরের লগও যোল আনা আছে। মনে করছ—বনানী-
বেষ্টিত পাছাড়ের বৃকচেরা বরখার জল খেখানে অস্বাভাবিক
পারে করছে, বিহঙ্গের বলকুলে যার অন্তস্তল কপিষ্ট,
মুগ্ধিত, ভোরের আলোয় যেখানে জ্বাল অঙ্গন
বাদ্যকিত হ'য়ে উঠেছে, ঠিক সেইখানে, সেই নিরাশা
পাতার-ঘেরা কবিনিকুঞ্জে কল্পিত গেমসীর সঙ্গে থেকে
থেকে জ্বরমাঝে পলকের সঞ্চার করছে—মনে করছ
এই ত জীবন, এই ত আনন্দ, আর বাইরে বলছ ও সব
কিছু না।

রসময় কিছু বলিলে না মনে করিয়াছিল। কিছু
থাকিতে পারিল না, বলিল—সত্যিই কি যৌবন-স্বপ্ন
একেই বলে। কল্পনা করবার আমার শক্তি নেই, কিন্তু
যা শুনেছি, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় যেন
মনের মাঝে থেকে থেকে সকল যুরকেরই ঠিক এই রকম
হয়।

শটান বলিল—শুধু এই নয়, অবস্থা এমন যে একদিন
'পরের কাঁটা বন্ধ হ'য়ে ফুটেবে গো ফুল ফুটেবে।' ভাবন
মনে হবে এই ত জগতের সকল সৌভাগ্যের আধার, এই
বড়েই ত জীবন রচনা হ'য়ে উঠেছে—কাল রেখা সব
অশ্লীল হ'য়ে যাবে, দুঃখ স্রবের সাধী হ'য়ে বন্ধবে—
মিলনটা বুড়ে, মুখে গেছে, সবার রয়েছে রং বেশাতে হবে—

সেই ত জীবনে পূর্ণ আনন্দ বিকাশের আন্তরিক অবসর।...
বুকেছ রসময়, আর লুকেচুর্চী ক'রে আনন্দ উপভোগ
করবার কোনও প্রয়োজন নেই। কথাটা পরিষ্কার
ক'রেই বল না—আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।

রসময়ের মন কিসের তালে যে নাচিরা উঠিল, জ্বর-
তত্ত্বাভি আজ স্বাক্ষর দিয়া উঠিল, ঠিক এই হুরেই কি
এ ক'দিন তাহার মন ভরপুর ছিল, হ্যাঁ কি এতই অবাক!
কোন অজমক মুহুর্তে রসময় আবেগে বলিয়া ফেলিল—
সত্যিই সে ছায়ায় ভাসতে পারে।

শটান বলিল—সেটা কি রকম কথা হ'ল বুঝতে পারি
না। ছায়া ত হিন্দুতে ভূত, তাকে আবার ভালবাসা
যার না কি?

রসময় বলিল—ওই যে ওদের বাড়ী আয়নাতে মুখ
দেখছ, ওকেই আমি—বলিতে পারিল না, কথা যেন
জড়িয়া আসিল।

শটান বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া বলিল—
"খুব যে।"

কথাটা রসময়ের কেমন ধারা লাগিল, কোনও কিছু
বলিবার আগেই শটান চলিয়া গেল।

(৩)

জীবনে মাহুঘের এমনই এক একটা মুহুর্ত আসে,
যখন সে মনে করে 'আমার সকলই দিব বিলাইয়া
তোমারই তরে' এই ত অস্বাভাবিক—জানি না ঠিক এমন
অবস্থা রসময়ের হইয়াছিল কি না—কারণ, কোনও দিন
কেহ তাহাকে বলিতে শুনেন নাই—'তোমা লাগি দিতে
পারি সব বিসর্জন, তুচ্ছ সে লাভ ভয় যুগা, তুমি
আদেশিলে দিতে পারি সাগরী ধরণী।' স্তব্ধতা সে
কথা নেহাতই অবাস্তব হইয়া পড়ে।

সে দিন সামনের বাড়িতে খুব ধুমধাম—শঙ্খশনির
আর বিরাহ নেই। রসময় খবর লইয়া জানিল—ছায়া
আজ আশীর্বাদ।

মনটা কেমন যেন হইয়া গেল। সুখের ভাবটা
আখ্যাতের বেগের মত কি গরমের দিনে বরফ-ঢাকা

চালানি ঠাণ্ডা যাচ্ছে মত তাহা হলপ্ করিয়া না বলাই ভাল। মনস্তত্ত্ববিদেরা একরূপ সময় একদা পাকাটা একবারই পছন্দ করেন না, কারণ, ঐদিকে ভয়, কি জানি শেষে হাতে হাতকড়ি পড়বে না তা।

নীরেন আসিয়া বহু ডাকাডাকির পর সাড়া পাইল। রসময়কে দেখিয়া বলিল—তোমার কি অসুখ বিস্ময় করেছে, মুখ যে একেবারে ফ্যাকাশে মনের গেছে?

রসময় সহসা কিছু বলিতে পারিল না, কথাটা বুঝাইয়া লইয়া বলিল—তার পর কি খবর, অনেক দিন পরে যে এসিকে?

নীরেন বিশেষ ভণিতা না করিয়াই বলিল—তোমার না তোমার বিয়ে দেবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। রসময় একরূপ নীরল হাসিয়া বলিল—মা'র যেমন আর ঘুম নেই। তোমার তা সকলেই জান আমি তোমাদের মাঝগণত বিয়ে কোনও দারই দারি না।

নীরেন উত্তরে বলিল—আরে সে দার তা এখনও আমাদের আছে, তবে কি জান, মা'র বিশ্বাস, ভোমাকে রাণী করতে এক আমি পারি।

রসময় হাসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না, বলিল—বিয়ে করবার মত মেজাজ আমার এখন নেই, বা বামেলা বাবুদারও কোনও প্রয়োজন নেই।

নীরেন গম্ভীর হইয়া বলিল—তা থাকবে কেন? কোথায় নীল শাড়ীর আঁচল, রেশমী চুলের বাহার—এ সব উপভোগ করবার সময়, ভায় অজায়ের কথা ছেড়ে ধাও, মনে হয় না ত এমন নীরব আনন্দে মশগুল হওয়াটা জীবনের পুঙ্খন গতির একটা অস্বাভাবিকতার মধ্যে মশগুল হওয়াটাই জীবনের একটা অস্বাভাবিক, কি বল?

রসময় একটু রাগিয়া বলিল—এসব ভণিতা করে আমার কি বোঝাতে চাও।

নীরেন—ভণিতা করবার কিছু নেই, শতীন যা বলে তা দেখছি বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শতীন তাহার নামে যে কত কি লাগাইয়াছে, তাহা কল্পনা করিয়া সমস্ত শরীর কিব্ কিব্ করিয়া উঠিল। অসুখ মনে হইল। রসময় বলিল—শতীনকে তার নিজের

চরকাম তেল দিতে বল। আমার কাছে ওসব ধারণাটা চলবে না। আজ আমার একটু দরকার আছে, নইবা এখনই একবার শরের দৌড়টা দেখে শিঁতুম।

নীরেন বলিল—অত দৌড়-ঝাঁপের দরকার নে আমার কথাটা কি ভুলে গেলে?

রসময় বলিল—এটা বড় বেখোশা হ'ল, সবই যদি রক্ত থাক ত আমার কাছে এর কোনও মূল্যই নেই—জন্মত মন যায় না।

নীরেন বলিল—আজ মন না যেতে পারে কিন্তু এক একদিন আসবে যা উর্দাসীন, যা প্রাণধীন, যা আনন্দদায়ক তা চরম রাতের অশ্রুধারায় সারা হবেই হবে। সে নি আমার এসে নুতন ক'রে শে কথা বলতে হবে—তবে তোমার সারাজীবনই ভরপুর হ'য়ে উঠবে সুখের তরঙ্গ কল্পনায়, নবীন হ'য়ে উঠবে তোমার সাধনায়—মুঠ হ'ল উঠবে তোমার প্রেরণায়—সেই ত সম্পদে মন লক্ষ্য। এ বেশী আর কিছু বলতে চাই না—এখন চলি।

(৪)

আজ কয়দিন সামনের বাড়ীর জানালা বন্ধ থাকে ছায়ার বিয়ের আর ৭ দিন মাত্র বাকি। রসময় আ বসিয়া কত উপভোগ্য উটাইল, কাপা পড়িল, সন্ধ্যা গেলে এক্ষেত্রে দুস্তর বড় অভাব। দেবদূত, মেঘদূত, ভগ্ন কবীও দুইই তাহার হাজির হইল না। 'দূর ছাই' বলি বইগুলি টানিয়া ফেলিয়া দিল। মনে হইল, ভালবাসা তাহার অজ্ঞান হইয়াছে। প্রতিদান নাই, আছে কেবল ক্ষমা বোকা হা হতাশের ছটা, হইহই বুকি প্রেমের ঘটা, নই বুকি যায় না পটা। হঠাৎ নিজের মধ্যে বলিয়া উঠি সব মিথ্যা, মিথ্যা। আমার বরাত এমনই যে নিম্নেবৎ অবসরটা পর্যন্ত একদিন হ'ল না। না, এখানে থা একগুণ থাকা চলবে না, যেখানে চু-চুৎ যাব বাহিরে পড়ি।

মানসপটে বিচিত্র রংয়ের ভুলি বুলাইয়া যে যি চিত্র রচিয়াছিল, তাহা আজ মনের মধ্যে একটা বি রঙের সমষ্টিভা, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য বলিয়া কিছু নী যাহা আছে তাহা paint shopএর নমন্যাপ্রকৃতি দে

দেতে পারে, নুতন ক'রে ফুটিয়ে তোলাবার ঐখ্য হইত কোনও artistএরই আসে না।

সন্ধ্যা ধনাইয়া 'আসিল', ছবি আরও বাপসা হইয়া উঠে—দাবীর কলরব বামিয়া আসিল। ছেলের দল সব বাড়ী ফিরিল। সামনের বাড়ীর জানালা হঠাৎ বুলিয়া গেল—আরানায় ছায়ার মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহার সে হাসি নাই, বিষম, ভাবী। ঘরে light ব্লিভেছে, টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে—একটা বহু ছয়কের মধ্যে আসিয়া কণাৎ করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

শপাৎ করিয়া কে যেন তাহার পিঠে চাবুকা মারিল—বুলিয়া গিয়া নেহাৎ নিকুপায়ের মত রসময় বিছানায় উঠিয়া পড়িল।

অন্ধকার পরেই একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল—কালাপাটির বেল উল্লি, ছায়ারের বাড়ী হইতে আঙনের হ্যা উঠিতেছে, ছোট মেয়েটার উচ্চ কান্না হইতে যতটুকু রাগা করা যায় তাহা হইল এই যে ছায়া আঙনে পড়িয়াছে।

রসময়ের সমস্ত ভুল হইয়া গেল—নিমেষের মধ্যে শয্যা ত্যাগ করিয়া, ট্যান্সি চড়িয়া ভক্তিতে চলিয়া গেল। ছায়ারের বাড়ীতে পুরুষ মাহুয তখন কেহ ছিল না। Fire Brigadeএ phone করিয়া হস্তস্ত হইয়া একজন মড় ভক্তারকে ট্যান্সিতে তুলিয়া লইল। মোটর হু হু করিয়া চুটিল, মনে হইল এই ত ভালবাসার প্রতিদান। কে বলে প্রকৃত ভালবাসা মিথ্যা; উপভোগ্য ভাল তাহার বাস্তব জীবনকে হু করিয়াছে। ছায়ার জীবনকারী ব্রজ ভক্তারকে যত কিছু লাগে, তাহা দিতে সে প্রস্তুত। ভুত সে একদিনের তরেও ছায়ার জন্ত কিছু করিতে পারিয়াছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তার ভবিষ্যতের নিকটবেগের জীবন একরকম করিয়া গিয়া যাবে। এত দুঃখের মধ্যে সে সজীব হইয়া উঠিল। ঠাঙ্গি হু হু করিয়া চলিতে লাগিল।

(৫)

রসময় যখন এমনি ভাবে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, শতীন ও নীরেন তাহার সন্ধানে আসিয়া এই সোরগোলে

বেশ একটু ভাবা চ্যাকা খাইয়া গেল। লোকপরিপূর্য ভণিল—ছায়া আঙনে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

শতীন এক পাশে নীরেনকে লইয়া গিয়া বলিল—হয়েছে হে, ব্যাপার অনেক দূর, এমন এর evidence বড় যে সে নয়। রসময় যে এর মূল, সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নেই, অথচ ভক্তদাকের বাড়ী এতবড় কল্যাণীরাটা কি রকম বল ত? রাফেল রসময় করেছে কি? ব্যাপার বড় স্বপ্নদেহ নয়—

নীরেন বলিল—তবে ভূমি যে সে দিন সব কি বলছিলে, সে কি সত্য নয়?

শতীন—সত্যি মিথ্যার কথা পরে হবে, রসময় যখন ভক্তার ডেকে আনবে, তার এই অবাচিত সাহায্যের জন্ত সকলেই ধম ধম করবে—কিন্তু যার জন্ত করা সেই হে ত আগেই চল যাবে—রসময় কেমন ক'রে সেই কষ্ট সহ্য করে, সেইটাই আমাদের দেখা দরকার।

নীরেন—বলিছা যাই তাই তোমার উপলব্ধির মধ্যেগকে।

শতীন—তোমার বোধ হয় মনে নেই circumstantial evidence নিয়ে রসময় কত তর্ক করেছিল, কিন্তু আজ যে রকম evidence পাওয়া যাচ্ছে এতে বাবাটির হ'য়ে লড়ে কে? এইটাই ত ঠাঠর করতে পারছি না।

নীরেন বলিল—ভূমি লড়বে, আমার এ পণ্ডগালের মধ্যে থাকতে আশেই ইচ্ছা নেই।

ভক্তার লইয়া রসময় হাজির হইল। ইতিমধ্যে Fire Brigade আসিয়া, তাহাদের করিবার কিছু নাই দেখিয়া মনের আগিয়াছিল, তেমনই কিরিয়া গিয়াছে। ভক্তারকে ছদ্মরূপে অবধি আগাইয়া দিয়া রসময় একবার শটনের প্রতি দৃষ্টান্তে চাহিল।

শতীন সে সব লক্ষ্য না করিয়া বলিল—তাই ত রসময়, ব্যাপার যে বড় গুরুতর, কি হ'য়েছে বলতে পার।

রসময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—কি আর বলব, সবই বোধ হয় জ্ঞেছ। সন্ধ্যাবেলা ছায়া আরনার সামনে আলো নিয়ে কি যেন লিখতে বলল মনে হ'ল, তার পর ওদের বাড়ীর দূর এসে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

তার পর এই ব্যাপার।

শতীন বলিল—যাক একটা dying declaration

যেথেকে গেছে তাই রসকে, circumstantial evidence হিসাবে তোমাকে নিয়ে টানটানি হ'তে পারত ---

নীরেন কথার মধ্যে বাধা দিয়া বলিল—তুমি যে সে দিন বললে—ওদের প্রকৃত... কথা শেষ হইল না, ডাক্তার সাহেব বেশ একটু প্রবুদ্ধ অথচ গরম হইয়া আসিয়া রসময়ের নিকট ৩২ টাকা fee লইল।

শচীন কিন্তু এবার একটু যত্ন হাসিয়া বলিল—ডাক্তার বাবু, ছায়া বাচবে ত? ডাক্তার উচ্চভাবে বলিলেন—বড় লোকদের কাওই এক! কোথায় ওর গুহু বাতি ছেলে,

আমনার সামনে, কতকগুলো বাঙালি কাগজের খুঁচু খুঁচু নীচু করিয়ে, স্বন্দর ভাগের ডলিপ্রতুলকে যে ঘর বন্ধ করে চলে গেছেলো; বাতিটা উঠে গিয়া কাগজগুলোয় আঙুন লাগে, তাতে celluloid পুতুলটাও গুড়ে ছাই হয়ে যায়, তাইতেই এই ব্যাপার many thanks রসময় বাবু।

শচীন রসময়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—“যুব যো।” রসময় সেইখানে ডলি পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অমৃতের সাক্ষাৎ সত্যন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ভাষার গড়ন চাই চিন্তার জোন্ম
আমাদের ভীষণ মেধা আরো তীক্ষ্ণ হ'বে
প্রজ্ঞার পাথরে শাণ দেওয়া
বাঙলের শানিত অক্ষরে
কুলাশ বিদীর্ণ করা সেবা বেবে নতুন করনা
কায়াম্ব শতাব্দীর নতুন চেহারা।
অকলঙ্ক দৃষ্টিময় জীবনের গান
তানাম্ব হুনিয়া জুড়ে দীপ্ত অভিমান
আমাদের স্বরূপ হ'বে
কাদ্যের বৈভব জীবন্যম!

ঈশ্বরের পুত্রদের পুরোণা পৃথিবী
আমাদের বাসযোগ্য নয়,
নরকে বাক বিধাঙ্গম আদিনি সংসার
মানস মেঘের ইক্সকাল।

বর্তমান সমাজতন্ত্র বকী শরীরে
প্রাগৈতিহাসিক মন

বিজ্ঞার আড়ালে বিজ্ঞান;
আমরা কি অমৃতের সাক্ষাৎ সত্যন?
স্রাবিত মোক্ষল আর্গো শোণিতদ্বারায়
আমাদের অন্ধভেদনায়:—
জন্মেছে শেতলা-বল্লী-স্বচন্দ্রী-মন্সা-ওলাবি
তুচ্ছতাক কাড় হুঁক জুতে পাওয়া মস্তুর তত্ত্বের
মাগিক পীরের সিল্পি সত্যনারায়ণের
বৌদ্ধমুগ প্রেতাঙ্গার বীভৎস সাধনা
আমাদের কাঠামো অজুত!
কলুষময়ী কামাক্ষীর রক্তচিহ্ন আঁকা
মনস্কাম পূরণের পথিক্স মাদুলী
অধ্যাপক জঞ্জেরাও মানে!
পাণিপড়া বিজে যত জন্মাক্কের দল
ত্রাহস্পণ্ডে পাণগ্রহে দ্বিত চিত্ত-বল।
অথচ সবাই বাবুবারী—
অর্ধজীব মাংসপিণ্ডে বিংশ শতাব্দীর

কাদ্যের ঘোষণা চাই; মৃত্তকত্ব মাহুষ দুর্জয়,
প্রচলিত এ সমাজ মাহুষের বাসযোগ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের জাতিপ্রেম ও দেশানুরাগ

(শেখাংশ)

কবিশেখর কালিদাস রায়

ঐশীলিকা, শিক্ষার আদর্শ, একাল সেকালের স্বপ্ন, বৈদ্যিক সমাজ, হিন্দুস্বাক্ষ-সমাজ, বাঙ্গালিবাংলা, জাতিভেদ, মুসলমানসমাজ, আচারের ও বিচারের স্বপ্ন ইত্যাদি সমস্ত কবির প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, এদেশের সর্বশীর্ণ উপাতি ও জাতীয় জীবনের সর্বশীর্ণ সংস্কারের কবি কত গভীরভাবেই না চিন্তা করিয়াছেন। এ সকল প্রবন্ধে সাহিত্যিক রসাবেগ অপেক্ষা দেশের জন্ত উৎসাহই প্রাধান্য। সেজন্য চাতুর্য্য অপেক্ষা যুক্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গভীর সত্যনিষ্ঠা তাঁহার কবিশ্রমকে বেন কুলাইয়া দিয়াছে। সাহিত্য অপেক্ষা দেশের জন্ত দায়িত্বই তাঁহার কবির অধিকতর উৎকর্ষিত করিয়াছে। তিনি এই সকল প্রবন্ধে যে ভবিষ্যৎ কবিয়াছিলেন, তাহা এখন সবই ফলিতেছে। হৃদয়ের বিষয়, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে এ সকল প্রবন্ধের বিষয়ে পরিচয় নাই। এই সকল প্রবন্ধ যদি এই শতাব্দীর প্রান্তে হইতে বিশ্ববিজ্ঞানের অবশ্যগত হইত তাহা হইলে দেশের কি বল্প হইতে পারিত তাহা দিয়া শেষ করা যায় না। স্বয়ং সকল জাতীয় চরিত্র গঠনে ইহা অপেক্ষা বড় সহায়ক এদেশের ভাঙারে ছিল না। এ যুগের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষা লাভ করিয়াছে বিদেশী গুরু কারে। বিশেষ ভাবে স্বদেশ-স্বদেশে স্বাধীন চিন্তার দীক্ষা তাহারা কবিগুরু কারে হইতেই পাইতে পারিত। স্বদেশ স্বদেশে চিন্তা করিতে যাহারা শিখিয়াছে—তাহাদেরও চিন্তায় খুশলা নাই। এই ধোঁষ গোড়া হইতেই দূর হইতে পারিত। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষদের এই উদাসীন দেশের পক্ষে হুমিয়ারিত স্বসংযত ও অস্বস্তিক আদর্শের শিক্ষার বিকোবী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধাবলীতে দেশের বিবিধ সমস্যার সমাধান যে ভাবে দেখাইয়াছিলেন, তাহা কার্যে পরিণত করা কত শক্ত, একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চারিদিক হইতেই প্রতিবাদ ও বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। দেশের স্বপ্ন,

শিক্ষা, নীতি ও আর্থিক অবস্থার দিক হইতে দুর্গতি দেখত। গভীর তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার cynic বা নৈরাশ্রবাদী হইয়া পড়িবার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি একদিনের জন্তও আশা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দেশের লোক একদিন তাহাদের জাতীয় মুক্তি, স্বাধীন, আদর্শ শিক্ষা কাহারো বলে বুঝিবে, মাতৃভাষার ব্যাঘোষ্য আদর বুঝিবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ ধর্মের যে অমৃতবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজ সহস্র লোকচারণ, কুলাচার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইলেও তাহা মেঘমুক্ত স্বর্গের বত আবার দীপ্যমান হইবে,—এ আশা তাঁহার ছিল। তাঁহার নিজের রচনা এক সময়ে দেশের মধ্যে ব্যাপ-গুরু আদর পায় নাই—তাহাতেও তিনি হতাশ হন নাই। তিনি জানিতেন, দেশ তাঁহার বাণী ও সাধনার মধ্যদা একদিন বুঝিবে। বহু বর্ষের লোকে বহু বার তাঁহার গায়ে ধুলি নিক্ষেপ করিয়াছে, তিনি রাজহংসের জায় সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে বেতের কীটায় আপনার আভিজাত্য-স্বলত নিরুদ্বলতায় দীপ্তিলাভ করিয়াছেন।

কবি নিজের সঙ্গে রাজহংসেরই উপমা দিয়াছেন—
“সংসারের চেউখেলা সহজে করি অবলো।
রাজহংস চলেছে বেন ভেগে।

সিদ্ধ নাহি করে তারে মুক্ত রাখে পাখাটাকে
উর্দ্ধ শিরে পড়িছে আলো এসে।
সরকারী বিধি বিধানে তাঁহার কোন্ডের অস্ত ছিল
না, কিন্তু তবু স্বস্বাত ইংরাজজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিচারবুদ্ধির
প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নাই।

ভারত-ভাগ্যবিধাতার চরম বিধানে তাঁহার গভীর
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, জগতের
সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত এত বড় জাতির
অদৃষ্ট চিরদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, সভ্যজ্ঞা
ঋষিদের বহু শত বৎসরের তপস্বী, ত্যাগ, তিতিকার,
সংযম ও অধ্যাত্ম সাধনার ফল একবারে নিশেপে বিলুপ্ত

হয় নাই। তাহাই এ জাতিকে সর্বসম্মত, সর্বপরিপাক, সর্বপরিপাক হইতে রক্ষা করিবে। সমগ্র জগতের পানে চাহিয়া যখনই তিনি নিজের দেশের পানে চোখ ফিরাইয়া-ছেন, তখনই তিনি অশান্তিতে অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু তখনই আবার ভারত-ভাগ্যবিধাতার মঙ্গলবিধানের কথা অশ্রু করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভারতের অশ্রুনিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্ত বৈশ্বা, বিবোধ, ধর্ম ও সংস্কারের মধ্যে একটি মঙ্গলময় একাধি বিধান করিবে।

রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে এইরূপ আশার বাণী স্পষ্ট হইয়াছে। "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়" তিনি বলিয়াছেন—“বহু মধ্যে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে। এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহ্যলব্ধ একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধারণে বাধা সঙ্কুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পরিত্রাণময় বিন-মুহু ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড় সমস্তা তত বড় তাহার তপস্তা হইবে। যাহা কালে কালে ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে স্থান হাড়িয়া তুলিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার যানিবে না।”

কবিতার মধ্য বিয়াও তিনি এই আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন—

রাহি প্রভাতিক উদিল রবিজ্বল পূর্ব-উদয়-পিরিডালে।
গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সখীর নব জীবন রস ঢালে।

তব অঙ্গশারঙ্গ রাগে নিমিত্ত ভারত জাগে

তব চরণে নত মাথা।

পূর্ব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে

প্রেমধারা হয় গাথা।

জনগণ-একবিধারক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।

কবির বিশ্বাস, এই ভারতই মহামানবের মিলনভূমি।

যুগে যুগে বহু মাহাত্ম্যের ধারা এখানে আগিয়াছে—এই ভারত সকল জাতিকে এক মহাজাতিকে পরিণত করিয়াছে। এইখানেই এ যুগের সর্বজাতিক ও মিলন ঘটবে এবং জগতের একটি সর্বচেয়ে বড় সমস্তার সমাধান

এইখানেই হইবে। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা জগতের সকল সাংস্কৃতিক আশ্রয় করিয়া নৃতন মানব দান করিবে।

হেথায় আধ্যাত্মিক হেথায় আধ্যাত্মিক দান শব্দদ্বন্দ্বল পাঠান যোগল একদেহে হলো লীম।

পশ্চিমে আছি গুলিয়াছে হার
সেবা হতে সেবা আনে উপহার

দিবে আর নিবে মিশাবে মিলিবে যানে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

কবি এক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন—

“ভারতবর্ষে যেরূপে আছে যে কেহ আশ্রয়
সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব। ভারতবর্ষের

মানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্তার নীমাণ্ডা হইবে।
সমস্তা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্গে ভাষার বহু

আচরণে একই বস্তু বিচ্ছিন্ন। নরদেহত এই বিচ্ছিন্নকে
বিদ্যাট। সেই বিচ্ছিন্নকে আমরা ভারতবর্ষের মদি

একত্র করিয়া দেখিবা।”

আর একটি প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

“আমি বিশ্বাস করেছি মাহাত্ম্যের সত্য মহামানব
মধ্যে, যিনি সদা জ্ঞানানন্ডে ধরয়ে সম্মিলিত। আমি এ

এই ধরণি মহাতীর্থে। এখানে সর্বদেহ সর্বজাতিক
ইতিহাসের মহাক্ষেত্রে আছে নরদেহত। তাঁর কৌশল

নিহতে সেসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি
করবার হুঁসাম্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।”

কেবল ভারতের কথা নয় সমগ্র জগতে যে হানাদ
গুনামিচি চলিতেছে তাহাও একই পাপের প্রায়শ্চিত্ত

পশ্চিমের জড়বাদী যাত্রিক সভ্যতার অনিবার্য পরি
হাই। কবির বীরদ্বন্দ্ব মহাকালের সিংহাসনে সদা

বিচারকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

“শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে।

বলে মোর আনো বজ্রবাণী।

শিশুখাতী নারীখাতী কুৎসিত বীভৎসা পরে

দিক্কার হানিতে পারি যেন।”

একদিন “কল্কট ভাঙ্গা ও শূন্যস্থিত যুগ আগান

দ্বন্দ্বল নিঃশেষে প্রচ্ছন্ন হইবেই, তখনও যেন ঐ দিক্কার
শঙ্কাজুর, প্রীতিহের ধ্বংসলেন্দু স্পষ্টিত হয়।

কবি এত বড় মহাপ্রলয়ের মধ্যেও মানবজাতির সর্বদেহ
দাশ ত্যাগ করেন নাই।

বিষম ক্ষুণ্ণে প্রাণের পিতৃ বীর্য হইবে তার

কলুষপুঞ্জ করে দিল উদ্গার।

ধরা বন্ধ চিরিয়া চক্ষু বিজ্ঞানী হাড়গিলা

হৃদয়িক লুপ্ত নবর একদা হইবে চিলা।

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবলে

একদিন শেষে বিপুল দীর্ঘ শান্তি উঠিবে ক্ষেপে।

ভীষণযন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করিয়া শেষে
নৃতন জীবন নৃতন আলোকে জাগিবে নৃতন দেশে।

এ নৃতন দেশ তাঁহারই ভারতবর্ষ, যিনি যুদ্ধের মত শান্তির
বাণী শুনাইবেন কবি সেই অনাগত ভাগ্যগতকে আহ্বান

করিয়া বলিয়াছেন।—

“নবীন আগমুক।

নবযুগ তব যাত্রার পথে চেয়ে আছে উৎসুক।

আজিকে তোমার অসিখিত নাম আমার মেডাই খুঁজি।

আগামী প্রান্তের শুকতারাম নৈপথ্যে আছ বুকি।”

গান

কথা—শ্রীমদ্রোহেন্দ্রনাথ সিংহ।]

[সুর ও স্বরগিণি—শ্রীকালিদাস নাগ।]

তু কি গান পাওয়া।

তু পূর্ণ মূল্যে মূল্যে

মনের অঙ্গন ছাওয়া।

কত যে কাজ হইল বাকি

শাখিতে তা হেব নাশি;

স্বপ্ন আশে বসে মিছে

আপন পানে চাওয়া।

বাঁশী ডাকে কাতর হৃদয়ে,

আয়ের বারা যাবি দূরে;

পুলে দে তোর তরী পালে

কাদছে ব্যাকুল হাওয়া।

সুর—শিবরঞ্জনী মিশ্র; তাল—কাহারবা

রা জা সা ১	রা ১ জা ১	পা ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	ধা সা ধা পধপা	১ ১ ১ ১
জ ধু - কি	গান গা ও	য়া - - -	- - - -	জ ধু স্ব প	ন - - - -
ধা পা ১ জা	রা ১ ১ ১	জা ধা পা জা	রা সা ধা রা	সা ১ ১ ১	১ ১ ১ ১
হলে - হু	লে - - -	যনে র অ	ড ন ছা ও	য়া - - -	- - - -
ধা ধা সা ধা	সা ১ ১ ১	ধা সা রা ধা	সা ১ ১ ১	পা ধা সা রা	জা ১ ১ ১
ক ত যে -	কা - জ	র ই ল বা	কি - - -	সা যি - তে	তা - - - -
হ - বে না					
সা ১ ১ ১	জা রা সা রা	পা ১ ১ ১	ধা পা ১ জা	পা ১ ১ ১	জা ধা পা জা
কি - - -	হু - গ আ	শে - - -	ব - সে মি	ছে - - -	আ প ন পা
রা জা জা					নে - চা ও
সা ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	সা ১ ১ ১	পা ১ ১ ১	পা ধা সা ধা	সা ১ ১ ১
রা - - -	- - - -	বা - জী ডা	কে - - -	কা ত র হু	রে - - - -
					আ য়ে রে যা
রা ১ ১ ১	জা সা রা	সা ১ ১ ১	রা সা ধা পা	সা ১ ১ ১	সা ধা পা জা
রা - - -	যা - বি হু	রে - - -	থু লে - দে	তোয় - -	ত - রা পা
					লে - - - -
জা ধা পা জা	রা সা ধা রা	সা ১ ১ ১	১ ১ ১ ১		
কি - - -	হু ল হা ও	রা - - -	- - - -		

LEADING SPRING MANUFACTURERS OF INDIA

THE CALCUTTA SPRING MFG. CO.



84-A, CLIVE STREET,
CALCUTTA.

Phone No, Cal. 5175.

পোষাক—পরিচ্ছদ

তৈয়ারীর

সমস্যার সমাধানে—

বোস ব্রাদার্স

নব যুগের স্বস্ত্রী, টেকসই পোষাক
অল্প মজুরীতে ও সময়ে অর্ডার মত
প্রস্তুত করা ই আমাদের আদর্শ

৭২, রঙ্গা রোড
(ভবানীপুর থানার দক্ষিণে)

বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতার বইঃ—

দক্ষিণোত্তর—কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ
মূল্য—দেড় টাকা।

উল্লুখাড়—(এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা) চার আনা।

প্রিপ্রহর—(যন্ত্রস্থ) সমবায় পাবলিশার্স ৩৩২, শশিভূষণ দে স্ট্রীট

অমল ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—

কালো-হরফ—কবিতা-ভবন, ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ
মূল্য—চার আনা।

কানাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যগ্রন্থঃ

স্নানক—এক টাকা

শিবির—দেড় টাকা

সোনার কপাট—চার আনা
(২য় সংস্করণ)

সাহিত্য-জগতে উচ্চ প্রশংসিত

যে কোন বিখ্যাত বইএর দোকানে পাওয়া যায়।

সংকেত—

অভিনব ত্রৈমাসিক

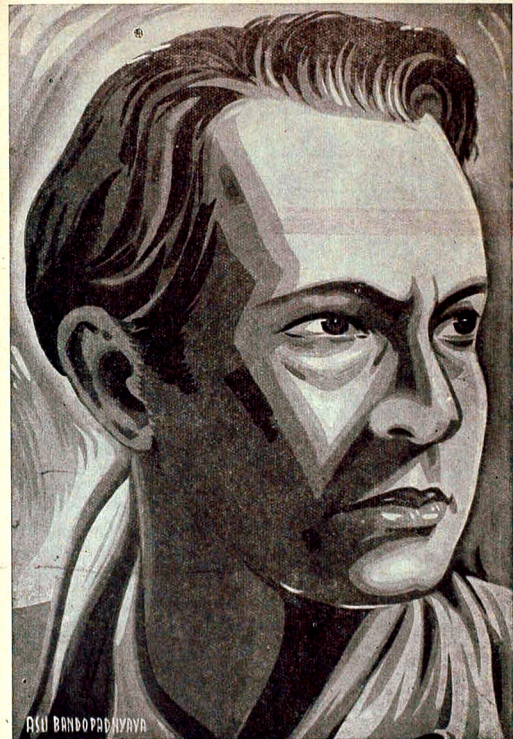
সম্পাদকঃ কানাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রতি সংখ্যা—বারো আনা

এনং শঙ্কুনাথ পণ্ডিত প্রীট

পোঃ আঃ এদগিন রোড, কলিকাতা।



প্রমথেশ বড়ুয়া—একাধারে ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক

("মুত্তিওয়ালার" সৌমভে)





ইন্দ্র মুখীচৌধুরীর “দেবর” চিত্রে
ছবি বিশ্বাস ও তুলসী চক্রবর্তী



বাঁটা গোড়াবাসনের “পানী” চিত্রে
শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী আপনাদের অভিবাদন জানাচ্ছে



দোকানদারী

হরীহরেন্দ্র সাত্তাল

আমরা দোকানদারী।

কথাটি সাত্তাভাষায় ব্যবহৃত হ'লে স্তন্যে খারাপ লাগে। কিন্তু Salesman বললে মনে হয়, না জানি কী গালভরা নাম! ইংরেজদের যিনি 'A nation of Shop Keepers' বলে বিক্রপ করেছিলেন, তিনি অবজ্ঞা গালাগালিই দিয়েছিলেন। কিন্তু 'Salesman' বললে সব দোষ থুওন হোত।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছিলেন :

‘আমায় দাও মা ভবিষ্যদারী, আমি নেমকহারাম নই শংকরী’!

এই ‘ভবিষ্যদারী’-র মত ‘দোকানদারী’ কথাটিও আমার কানে মিটি লাগে। এই দোকানদারী কাজেও যথেষ্ট education ও culture-এর প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক, একজন খদ্দের এলে আমাদের cultured salesman-এর কর্তব্য কী।

আমুসিক দোকানদারীর মূল কথা হতে এই, কোন খদ্দেরকে স্নেহ করে আমরা কোন জিনিষ গছাব না।

Yes madam or yes gentleman, what would you like me to show—এই ধরণের প্রশ্ন এমনি যোলায়েম ভাষায় হওয়া উচিত।

অনেকে হয়ত ‘অর্ডার বইতে গ্রাহকেরের নাম লেখবার প্রয়োজন হলে তাঁর বিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—what's your name? কথাটি ভয়ানক অশিষ্ট। তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো—By what name would you like me to book the order please.

Sir কথাটি ইংরাজী ভাষায় এমন বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে আমরা বাঙালী অনেক সময় ভুল বুঝি—

হয়ত ‘আবি কোন খদ্দেরকে Sir বললে নিজেদের মানহানি হয় বা অতি বিমর দেখানো হয়। এটা আদতে আমাদের বহুদিন-অজ্ঞিত দাস-মনোবৃত্তির পরিচায়ক। বাংলায় যদি কোন লোককে শশাই বলতে না পারে, তবে Sir বলতে বাধে কেন?

একজন cultured Salesman বা Memo writer যখন কোন খদ্দেরের কাছে দাম চাইবেন—তিনি বলবেন—“Six rupees four annas, if you please,” এই if you please কথাটি তার culture-এর সূচীচোপ। কোন খদ্দের যদি এসে বলেন :

“Where can I find the towels?”

আমরা সাধারণতঃ সেই department-এর বিকে আহ্বান দিয়ে দেখিয়ে দিই। এটা শিষ্টাচারের দিক থেকে ভয়ানক মারাত্মক রকমের অপরাধ।

এই প্রশ্নের জবাবে বলা উচিত—

“Left wing on the Second Hall please or last block on the right অথবা তাঁকে বলা উচিত—

“I would lead you to the department, if you please, madam or Sir, এখন কতরকম রকমারী খদ্দের যে এখানে আসে, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারই খানিকটা পরিচয় আমি আপনাদের দেবার চেষ্টা করছি।

এক class-এর খদ্দের আসেন, তাঁরা বিশেষ নামকরা কতকগুলো জিনিষ telegraphic code-এ চান। যেমন যখন—

1 Bar 501

1 Cobra Number one

1 Small Swan

1 Byke medium, 1 Box Cotex

2 Reels NMT 60, 2 Cakes Renu.

1 Tin: 555

অনেক আবার কথা উঠে বলেন। যেমন একজন লোককে আমি জনৈকি তিনি কখনও বোশেখ-জট মাংসে ডাব নারকেল বলেন না। তিনি বলেন কোসেক-বট্টমাংসে না। ডাব নারকেল। এই জাতীয় খবর Castopheneকে বলেন Phanto-Kine; Huntly Palmersকে বলেন Planty Hamars; Kolynosকে বলেন Nolykos—Salesmanদের পক্ষে এরাই মারাত্মক।

A pair of Scissors বা A pair of trousers বললে আপনারা নিশ্চয়ই ছুনা কাচি বা ছুটো পাটখুন দেবেন না।

ছুরি, কাচি, আপনি জাতীয় ধারালো। জিনিষ কোন পক্ষেদের দিকে এগিয়ে ধরতে হ'লে, প্রত্যেক শিক্তি Salesman-এর কর্তব্য ধারালো দিকটা সাবধানে নিজ হাতে ধরে হাতল বা নিরাপদ অংশটুকু সাহসের দিকে এগিয়ে ধরা। আমরা অনেক সময় এই ভুলটা করি কিন্তু আমাদের প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনেও এটা করা উচিত নয়।

দোকানদারীতে কতকগুলো কথা খুব abbreviated form-এ ব্যবহার হয়। যেমন Hankey, Nighties nndies,

বানান এবং উচ্চারণ-সমতাও আমাদের অনেক সময় ভাবিয়ে তোলে।

মল্লবারকে আমরা বলি টুইল ডে।

হবে টিউল ডে।

ক্ষে কটনকে আমরা প্রাই বলি কুচোট কটন—মারাত্মক ভুল। যেমন Pliersকে বলি Plus, আবার সেমিক বানান হচ্ছে Chemese কিন্তু আমরা লেদার তার বানান হচ্ছে Chamois যদিও উচ্চারণ তার চ্যামইল নয়।

আমাদের দেশী খদ্দেরদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গের খদ্দেরদের নিয়ে খাস কলকাতাবাসী Salesmanদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়।

যেমন ধকন একজন-এসে চাইলেন

“মুশাই, ছুই জুবা মার্গো, হাঁপান চাই।”

এখন ঠিক মত মার্গো: সোপ দিতে না পারলে

বুঝতেই পাচ্ছেন না!

আবার জনতে হয়,

“কুস্তার লাইগায়া ৩৬ ইঞ্চি হাতির পিরাখ চাই”

আপনি হয় ত’ ততকথ্যে ধামছেন কুস্তা মানে

কুস্তার তার জন্তে আবার ৩৬ ইঞ্চি কেন?

কিন্তু আদতে কুস্তা হচ্ছে কর্তা (ময়মনসিংহে প্রচলিত)

যেমন মেঝো কর্তা ‘হাইক্যা কুস্তা!’ আপনার

আপরাধ নবেন না। আমিও যেরতর বাস্তব এ

‘লগা পাইয়া মনিয়া।’

এদের কুলনার Madraseo খদ্দের অনেক বেশী

শীল। বহুই বছর আগে একটি Madraseo ভদ্রলোক এ

Thermoflask কিনেছিলেন। Flaskটির temper

একটু বেয়াড়া। অর্থাৎ চা রাখলে Ice cream

মেতে, আর cream রাখলে অনেকক্ষণ পানাব

লাগিয়ে ঠাণ্ডা কোরে যেতে হোত। ভদ্রলোক এ

বলেন—“This flaska is not hota or colda-

I want refunda or a good flaska in

exchanga.” আমরা তাঁকে পুরো টাকাই refund

দিয়ে আমাদের ইচ্ছতে বাচাই।

এই ধরণের খদ্দেরদের নাম যদি কখনও order

লিখে নিতে হয় তা হ'লে পুরো একটা pencilই

রাখবেন—

“Sree Ramchandra Chelu Sekhara

Chithghanananda Sanmukham sat Linga

(চিকানা) Munium chetty Kodam vappa

puram St

Musalipattam (M. S. N. R)

আমি বিজ্ঞাপন লিখি। ফিরি করে কাগজওয়ালার

কপি লিখে সবাব মন পাইনে। ১৪ হাজার Squa

feetএ বা কিছু পূণ্য সামগ্রী রাখা আছে ২ ইঞ্চি ও ক

তা আছে পায় ত’ বেড়ে পায় না। যাই হোক—এ

থেকে ঠিক করেচি, কার মনেই আর আশাত

ও গাভু বদনার লড়াই আমাদের এ পোড়া দেশে কখনও
মেটার নয়। তাই একটা copyর ছক আমি করে
রেখেছি, যাকে বলে একেবারে চরম ডিমোক্রাসীর
রোগ্যারী। এখন দেখুন, বর্তমান বিজ্ঞাপনের মুণ্ডে
এই ধরণের কপির দ্বারা বিজ্ঞাপনদাতার পিপাসা মেটে
কী না!

সার্ট-সট-বেশিয়ান

জুতো-মোজা টাই

পাংখুন চাপকান

পাবেন সবাই!

তাতে ও মিলে, যা কিছু চান

ধুতি ও শাড়ী বাচবে যান

Crope, Georgette বেশী নয় rate

তারও উপরে tissues ও Brocade!

সব Ready-made!

রোগা চাশা লিঙ্গলি

সাদা কাপো কিছা ফিক

সব কলেরবর accurate fit

Demand করিব meet!

Hockey, Tennis, Badminton

Carrom, Ping-Pong—যা কিছু ক

Toll-এ ও Doll-এ

কেবা না ভোলে!

বোতলে বোতলে dense

রকমারী মিষ্টি Loggans!

Biscuit নহে few

Home made Snow view!

Cutlary, মনিহারী

Crockery, Stationery

Presentation Set

উৎসবের ভেট

গুণ্ড Patent

Provision হয়নি Rationed!

তোষকে বালিশে মশারি ও লেপে

বানাই Bedding প্রতি গজ মেপে

Trunk Suit-case

Holds alle fit

Complete Travelling Kit!

আছে কাপা ও পিতল বিবাহের দান

দশকর্মে যা কিছু চান!

দিতে পারি ঢেলি ও টোপর

গুণ্ড পারি না জোগাতে কেন-বর!

এই দুর্দিনের পোষাক পরিচ্ছদ সমাধানে—

পাল ব্রাদার্স

৫৮ টাঁদনী চক্ (৪র্থ গেটের ভিতর) কলিকাতা

ভাল পোষাক ভবিষ্যতের খরচ বাঁচায়

জনরক্ষা সমিতির আবেদন

— ০ —

চরম বিপদের অমৃত্তে আজ আমাদের প্রিয় বাংলা।
এক দিকে নিরস্ত্র অসহায় মানুষ জাপানী আক্রমণের
বীভৎসতায় ভীত-ক্রান্ত হয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত প্রত্যাশায়
রহেছে এবং জাপানী বোমার স্পর্শ পেয়ে আমাদেরই বহু
ভাই বোন এ দেশের মাটিতে চিরদিনের জঙ্গ চোখ
বুজেছে ও তাদের রক্ত মোকণে ভাসমান বাংলা লাল
হয়েছে। আর এক দিকে বিকট ছড়িকের কালো
ছায়ার বাংলা আজ অন্ধকার—দিকে দিকে কুখার তাদনার
মুখশশী শ্মশনের উজ্জ্বল। শতজালায় এক মুঠের চাটী
মজুর আজ আশ্রয়হীন, গৃহহীন হয়ে এক দূরতর
সুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করে, গৃহ-বন্ধনের সমস্ত এখি
শিখিল বদে দিয়ে নারী আজ পথে বেরিয়ে অসংখ্য
হাটাকার করে, এবং মাতৃহের কোমলতা ভুলে নিজ
শিশুকে পথের মত বিক্রয় করে।

দেশের এই দুর্দিনে সম্বন্ধ হয়ে বিচার ও অসহায়
জনসাধারণকে বিচার্যার পূর্ণ ও প্রেরণা নিয়ে প্রতি
মহায়া পড়ে উঠেছে জনরক্ষা সমিতি। এই সমিতিই
জনগণের শক্তির কেন্দ্র—আত্মশক্তির প্রতীক। নিরস্ত্র
দেশবাসীর মুখে অন্ন দেওয়া, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর—
শিশুদের প্রশ্নরক্ষা করা, ঔষধপত্র দিয়ে ও প্রাথমিক
চিকিৎসার কেন্দ্র গুলে জনসাধারণকে সাহায্য করা, অসহ-
ায়দের ব্যবস্থা করা, বাস্তব-মততা সমাজানের জঙ্গ সুরক্ষার
কাছে সমিতির দাবী তোলা ও জনসাধারণের সর্বগ্রন্থকার
বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করার ভিত্তিতে প্রত্যেক জনরক্ষা
সমিতি অগ্রসর হয়েছে ও হচ্ছে। আমাদের বাল্লভগান
জনরক্ষা সমিতি ও মহালার গরীব ছেলেরদের অন্ন দেওয়া
ও গরীবদের বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার কাজ অনেক দিন
থেকে শুরু করেছে। এই সমিতির বর্তমান প্রচেষ্টা হচ্ছে
মধ্যবিত্তদের সাহায্য দেওয়া ও বিমান আক্রমণ থেকে
স্থানীয় লোকদের বিচার্যার জঙ্গ যতদূর সম্ভব আয়ের
ব্যবস্থা করা।

দেশহিত-রত্নের যে মহৎ প্রচেষ্টা নিয়ে জনরক্ষা সমিতি
জাঙ্গ অগ্রসর হয়েছে, তার সাফল্য নির্ভর করে সর্বপ্রকার,
সর্ব সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতার উপর ও সকলের
সংযুক্ত চেষ্টার উপর, পার্শ্ববর্ত্তের কাছে, ভাই আমাদের
সমিতি আন্তরিক সহযোগিতা ও সহায় সাহায্যের
আবেদন জানাচ্ছে।

জনরক্ষা সমিতি, বাল্লভগান

১১ নং পঞ্চানন খোশ কলি, কলিকাতা।

জয়িলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কাবে

????

কিন্তু তার স্মৃতিকে
বাঁচিয়ে রাখা যায়
ছবির ভিতর দিয়ে।

সুন্দর ষ্টুডিও

আর্টিষ্ট : কে. সি. খান্না

১৩৯২ রসা রোড, ভবানীপুর।

(হাটজা রোডের পাশে)

ফোন : সাউথ ৪৪৫

ঘরের সৌন্দর্য্য আসবাব পত্রে।

বেঙ্গল ফার্ণিচার

≡ সিগ্ণেট ≡

মিলিটারী ও গভর্ণরমেন্ট সাপ্রায়ার

৮-১৯, রসা রোড, ভবানীপুর

(চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সম্মুখে)

ফোন : সাউথ ৭২৭

দর সাঁজাবার জঙ্গ ফুটিসম্মত ফার্ণিচার
আমাদের নিকট সব সময়েই প্রস্তুত
থাকে। অর্ডার মত তৈয়ারী করা
আমাদের বিশেষত্ব।



চলতি ছবির সমালোচনা

দম্পতি — এন্টোনিয়োট্ট, ডিট্রিউটাস' লিএর
পরিবেশনায় রূপঞ্জীর দ্বিতীয় ছবি "দম্পতি" গত ১৯
নভেম্বর থেকে শ্রী, পূর্ববী, রূপালী ও আলোয়া এই
চারটি চিত্রগৃহে একই সঙ্গে দেখান হচ্ছে—বলিকাভায়
এর পূর্বে কোন ছবিই একসঙ্গে চারটি চিত্রগৃহে মুক্তি-
লাভ করেনি। ছবির কাহিনী ও সংলাপ-রচয়িতা হচ্ছেন
প্রবোধ সাহাওয়া ও পরিচালক হচ্ছেন নীরেন লাহিড়ী।
গানের ঘর দিয়েছেন কমল দাসগুপ্ত আর আলোকচিত্র
এবং শব্দনিয়ন্ত্রণের ভার ছিল যথাক্রমে অজয় কর ও
গৌরবাস্তবের উপর।

শব্দ আর গৌরী—এদের দু'জনকে কেন্দ্র করেই
'দম্পতি'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। শব্দ আর গৌরী ছিল
ছোটবেলার সখী। ছোটবেলার জীতি যৌবনে প্রেমের
পরিণত হয়। আর এই প্রেমের পরিণতি হয় তাদের
বিচ্ছেদ। বিয়ের আগে দু'জনের মধ্যে যে মিল ছিল বিয়ের
পর সেখা গেল তাত্তে ভাঙ্গন ধরেছে। ভাঙ্গনের কারণ—
বিয়ের আগের মত শব্দর তার গান আর কাব্য নিয়ে
শাননের ষ্টপ দেখতে চায় কিন্তু গৌরী এখন আগেকার
বাগা আর গান ছেড়ে ঘরকন্নার কাজের মধ্যে দিয়েই
শাননের স্বপ্ন-গুণতে চায়। এই থেকে তাদের স্ক্রল হল
কুল বোঝাবুঝির পালা। শব্দর ঘর ছেড়ে যাত্রা করে বন্ধ-
বান্ধব নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে। লজ্ঞোর এক ছোট্টেলে
শব্দরের জীবনে হঠাৎ আবির্ভাব হ'ল এক অতি আধুনিক।
মহী—রমলা। এতদিন যেম একেই শব্দর 'মুজিলি।

গীতার পঙ্ক-করা এক খন্দরদারী আদর্শবাহী নেতাকে
দিয়ে না করার ইচ্ছার রমলা আজ ঘর ছেড়েছে। এই
দুই ঘর ছাড়ার মধ্যে পড়ে ওঠে প্রেম ও জীতি এবং
শব্দরের স্বপ্ন থেকে গৌরীকে ধীরে ধীরে সজিয়ে তার

স্বান জুড়ে বসে রমলা। কয়েকদিন পরের কথা অল্প
রমলাকে দিনকয়েক সেবা করে বাড়ী আসার দিন গৌরীকে
শুধী করবার জঙ্গে রমলার কথামত শব্দর একখানা শাড়ী
এনে গৌরীকে উপহার দেয়, শাড়ী পেয়ে খুশী হওয়া
থাক গৌরীর অন্তরের এতদিনের চাপা আত্মন ছড়িয়ে পড়ে
আর শব্দর এই তাকে প্রথম চেনবার সুযোগ পায়—আজ
সে যেম গৌরীকে নতুন রূপে দেখল। সে রাস্তা শব্দর
উদ্বেগের মত পথে কাটাল কিন্তু পরদিন সে যখন এক
পরিচিত লোকের সাহায্যে বাড়ী ফেরে তখন তার প্রশ্ন
আর। শব্দরের যখন তার তখন শব্দরের—রমলার মিলন হয়
প্রথম সাক্ষাৎ। রমলা চায় বন্ধুত্বের রাস্তার শব্দরের
রোগশয্যার পাশে যেতে কিন্তু তাকে বাধা দেয় গৌরী—
তার জীবন অধিকার নিয়ে—শেষকালে জীবন অধিকারই
জয়ী হ'ল। রমলা তার ভুল ঝুঞ্জে শেরে ফিরে যায়।
আবার মিলন হয় গৌরী আর শব্দরের—রমলার মিলন হয়
আদর্শবাহী নেতার সখী। শেষকালে দেখা গেল গৌরীর
আর শব্দরের ছেলের সঙ্গে রমলার মেয়ের বিবাহ।

গল্পের মধ্যে মনুজের কোন আভাষ পাওয়া গেল না—
প্রবোধ সাহাওয়া'র কাছে আমরা কিছু নতুনত্ব আশা
করেছিলাম—তবুও তার নৈপুণ্য প্রকাশ করেছে সে সালাপ
রচনায়। নীরেন বাহু তার পূর্বের প্রদ্যম তখনই রাখতে
সক্ষম হয়েছেন, তাঁর চিত্র-নাট্য রচনার ক্ষেত্রে ছবির গতি
কোথাও বাধা পায়নি। ছবির Photography এবং
শব্দনিয়ন্ত্রণ প্রশংসনীয়। কমল দাসগুপ্তের সুর-সংযোজন।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমই
ছবি বিশ্বাসের কথা বলতে হয়। কারণ, আদর্শবাহী নেতার
ছোট জুঁকিয়ায় তিনি যে-রকম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা'
বোধ হয় অল্প কোন অভিনয়তারা ধারা সম্ভব হ'ত না। ছবি

বিবাহের পর অহর গাঙ্গুলীর নাম করা যেতে পারে—
তার সাবলীল অভিনয় সত্যই প্রশংসনীয়। হুনদার
মাক্ষিত অভিনয় “কালীশাখের” চেয়েও আমাদের অধিক
ভাল লেগেছে। শঙ্করের ভূমিকায় রবীন্দ্র ও রমণীর
ভূমিকায় সাবিত্রী মন্ড অভিনয় করেননি। সাবিত্রীর
অভিনয় পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করেছে।
রবীন্দ্রের গানগুলি ভালই। অপরাপর ভূমিকায় শ্রীম
লাহা, কাহ বন্দ্যো, রমা ব্যানার্জি অপ্রতি চলনগই।
গানগুলি ছবিটির একটা বিশেষ আকর্ষণ।

নিচারা :—শ্রীক্ষিত্রাসের প্রথম বাঙালি ছবি “বিচার” গত
৬ই অক্টোবর থেকে মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে একই
সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন নীতিন
বসু ও শৈলেন বসু এবং তার সংলাপ রচনা করেছেন
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ছবি পরিচালনা ও চিত্র গ্রহণ

করেছেন নীতিন বসু। গানের সুর দিয়েছেন জ্ঞানচন্দ্র মিত্র—রবিনের দাদা, পিতৃ-ইচ্ছা। পালনের জ্ঞ
সেবা। শব্দগ্রহণের ভার ছিল মুকুল বসুর ওপর।
একটি হারাণ বাসিকাকে কেন্দ্র করেই ছবির কাহিনী
রচনা করা হয়েছে। বাসিকার হারিয়ে যায় প্রাপ্তবয়স্ক এবং গবিনও শিল্পিয়ানকে ভালবাসে। রবিন
বেলায় আর সে এসে আশ্রয় নেয় সমাজের চোখে পড়িলেও এ প্রস্তাবে রাজী হয় না কিন্তু প্রতিবার সত্য
শাস্তা দেবীর ঘরে। শাস্তা দেবী তার জীবনের পোড়ার জানাবার পর দে দাদার কথায় রাজী হয়—তবুও
দিন কটা ঠাকুরের সেবায় কাটিয়ে বেবে বলে প্রতিশ্রুতি করে সে মন থেকে মুছে দিতে পারল না। এর পর
করেছিল—কিন্তু তাকে ব্রহ্ম করতে হল নতুন জীবনকে একদিন রবিন আর প্রতিমার সাক্ষাৎ হয় এক
মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরের স্বপ্নাদেশ মত এই প্রকাবে—রবিন প্রতিমাকে পরিচয় দেয় আঙি।
আগির অভিভাবক হয়—এই তিনটি আগির দিন থেকেই রবিনের শিল্পিয়ানকে বাস্তবানের দিন প্রতিমা
আনন্দেই কাটিতে থাকে। প্রতিমা শাস্তা দেবীকেই জ্ঞানে আঙি সিরিয়ে দেবার জ্ঞে। প্রতিমার হৃৎ
না বলে জানত—বড় হয়ে তার আলাপ হয় ধনী মেয়েদের শিল্পিয়ান রবিনের সঙ্গে প্রতিমার মিলন ঘটায়
রবিনের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে যোগেই রবিনের সঙ্গে মিলিত হয়। এ মিলনেও প্রতিমা
ওঠে এবং পরস্পরে পরস্পরকে বিবাহ করতে চায়।

বিচার সে ছুটে যায় আশ্রয়স্থলে করতে কিন্তু তাকে
ব্যাগ দেয় রবিন। শাস্তা দেবী রেডিওতে গান করতে
এসে গানের পর অকাশ করে দেয় পনের বছর আগেকার
সমস্ত ঘটনা। শাস্তা দেবী হয় গুলিশের ছোটে বন্ধী—
যা ছিরে পায় পনের বছর আগের হারাণ বেয়ে।
রবিনের বিবাহ হয় প্রতিমার সঙ্গে—বিবাহের দিন মুক্তি
পায় শাস্তা দেবী—তার বিচার হয়, বিচারালয়ে নয়—
বিবাহ-আগের সমাজের চক্ষে। যে ক’টি সংসার ভাঙতে
চলেছিল শেষকালে আবার তাদের মিলন হ’ল।
ছবির গল্প অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর। পরিচালনার
দিক থেকে নীতিন বসু তার প্রশংসা বজায় রেখেছেন—তবে
তার নায়ক নির্বাচন ও গল্প নির্বাচন আমাদের স্বর্গ
বসতে পারি। না। ছবির চিত্রগ্রহণ ভালই, সুর-
সংলাপও মন্দ নয়। শব্দগ্রহণ নিখুঁত হয়নি—অনেক
বাসে শব্দগ্রহণের দোষ থেকে গেছে।

সর্বাঙ্গিক। অধিক কৃত্রিম দাবী করতে পারেন রাধারাজী—
শাস্তা দেবীর ভূমিকায় তার অভিনয় ও গান আমাদের
একই মনে হয় সফল দর্শককেই মুগ্ধ করেছে। অপরাপর
ভূমিকায় লীলা দেশাই, মায়্যা ব্যানার্জি, হুনদারী দেবী ও
বেবী মাসুরীর অভিনয় ভালই। রবিনের ভূমিকায় রবীন্দ্র
ঠাকুর তার মাক্ষিত অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের প্রচুর
হাসির খোরাক জুগিয়েছেন।

ছবিখানি মোটামুটি চলনগই। তবে নীতিন বসুর মত
পরিচালকের কাছ থেকে আমরা আরও ভাল এবং উচ্চ-
স্তরের ছবি আশা করেছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের
নিরাশ করেছেন।

ফুডিয়োর কথা

শহর থেকে দূরে :—অনেকদিন বন্ধের পর ইষ্টার্ন
টকিয়ার “শহর থেকে দূরে” স্টাট গভ ১৮ই অক্টোবর
থেকে ইক্ষপুত্রী ষ্টুডিওতে আবার আরম্ভ হয়েছে।
রূপালী পূর্ণায় গ্রাম্য জীবনের প্রকৃত রূপ ছুটিয়ে তোলার
জ্ঞ পরিচালক শৈলজ্ঞান মুখোপাধ্যায় “কোনরকম
চেষ্টারই কলি করছেন না; বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন
জহর, বেথুকা, ধীরাঙ্গ, নরেন মিত্র, মলিনা, প্রভা, কাহ
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে। গীতিকার শৈলেন
রায়ের রচিত গানে সুর সংযোজনা করেছেন তরুণ সঙ্গীত
পরিচালক অরুণ দাস-গুপ্ত।

এম, পি, প্রোডাকসন :—পরিচালক হুম্মীল মুন্সাদার
এম, পি, প্রোডাকসন ত্যাগ করায় প্রেমেন মিত্র শীঘ্রই
ইহাদের হয়ে সুরচিত কাহিনী অল্পকালে একখানি ছবি
পরিচালনা করবেন এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়
করবেন শ্রীমতী কানন দেবী।

পরিচালক হুম্মার দাগমুগ ইহাদের হয়ে একখানি
ছবি পরিচালনা করবার জ্ঞ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

ইক্ষপুত্রী ষ্টুডিও :—ইহাদের বাংলা ছবি “দেবর”
চিত্রায় আগামী ৬ই নবেম্বর মুক্তি পাবে। ছবিখানি
পরিচালনা করেছেন জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন
ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন অশীষ, ছবি বিখাস, জহর বাঙ্গুলী,
যমুনা, ক্রম লাহা প্রভৃতি।



পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জী
স্বরশিল্পী - মুন্সুর দাস গুপ্ত

তুর্কিবেশ ইক্ষপুত্রী ষ্টুডিওর নতুন ছবি
যমুনা, ছবি, অরিশ
জহর, ইন্দ্রিয়া রায়, ইন্দ্র
তুলশী চন্দ্রবর্তী, তুয়া

“দেবর”

শনিবার ৬ই নবেম্বর

চিত্রায়

শুভারম্ভ

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইহাদের পর-বর্তী ছবি “কনকিনীরা” কাজ বীর গতিতে এগিয়ে চলেছে, বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুণ, জহর, বেথুকা, সাকিনী, নীরাঙ্গ, পূর্ণিমা, আন্ত বহু, শ্রাম লাভা প্রভৃতি।

নিউথিয়েটাস :—নিউথিয়েটাসের হিন্দী ছবি “ওয়াপস” হেমচন্দ্রের পরিচালনায়—ঋতু সমাপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে—শাশা করা যায়, আগামী বড়দিনে ছবি-বানি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তি পাবে। ভারতী দেবী একটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন এবং তার বৃত্তা ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। অজ্ঞাত ভূমিকায় অসিতবরন, নীরাঙ্গ, নবাব প্রভৃতি অভিনয় করছেন। লতিকা ব্যানার্জি নামে একটি স্ত্রীনাং নবাগতা তরুণী অভিনেত্রীর সন্ধান এই ছবিতে পাওয়া যাবে।

পরিচালক সুবোধ মিত্র এর মতোই নিউথিয়েটাসের বাংলা ছবি “দুই পুরুষ” এর অনেকখানি কাজ শেষ করে-ছেন, ছবি বিশ্বাগ এবং নরেশ মিত্র তাঁদের মঞ্চের মূল ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

জমিদারের ভূমিকাকে স্বন্দর করে আঁকার ভার পড়েছে অরুণ চৌধুরীর উপর এবং ছুটি বিশিষ্ট স্ত্রী ভূমিকা রূপ দেওয়ার জন্য চন্দ্রাবতী এবং লতিকা ব্যানার্জিকে নির্বাচন করা হয়েছে।—সঙ্গীত রচনা করেছেন শৈলেন রায় এবং অরুণ সংযোজন করছেন পঙ্কজ মল্লিক।

সুশীল মজুমদার :—গত কয়েক বছর ধরে পরিচালক অভিনেতা আর অভিনেত্রীর যোগে বইছে বোম্বাইয়ের দিকে, ইতিপূর্বে এই যোতে পরিচালকদের মধ্যে ফরি মজুমদার, প্রব্রাজ রায়, নীতিন বহু প্রভৃতি ভেঙ্গে গেছেন, এবার এই যোতে ভাসার পালা এসেছে সুশীল মজুমদারের। এম, পির সহিত সম্পর্ক শেখ করে তিনি যথেষ্টকালের সহিত নতুন চুক্তি করেছেন এবং শীঘ্রই তিনি এদের মধ্যে একখানি ছবি পরিচালনা করবেন।

ভ্যারাইট পিকচার্স :—সঙ্গীত দাশগুপ্তের পরিচালনায় এদের সামাজিক ছবি “পোষ্যপুত্র”এর কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। নাট্যাচার্য শিশিরসুন্দারকে

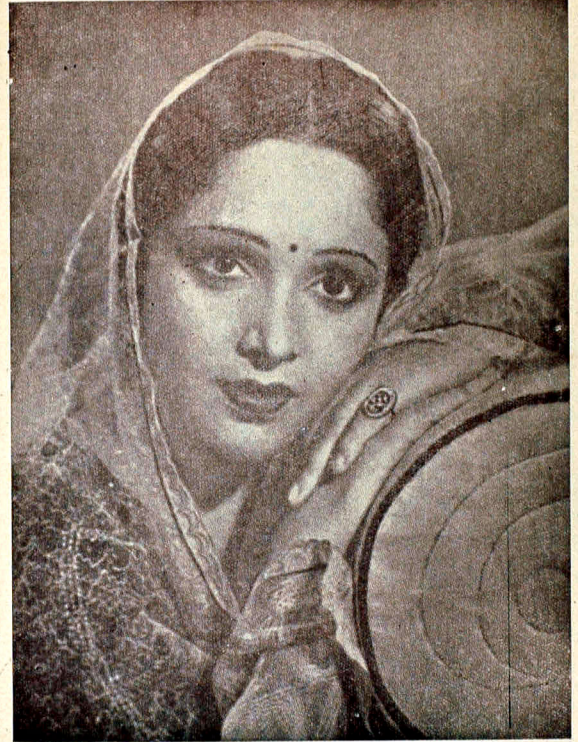
বহুদিন পরে আবার ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবি তিনি শ্রামিকালের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অপর চরিত্রকে রূপায়িত করছেন শৈলেন চৌধুরী, বেথুকা সংস্কার সিং, প্রমোদ পাণ্ডুলী, সাকিনী, পতা প্রভৃতি।

চিত্র ভারতী :—পত্নীপতি চট্টোপাধ্যায় এদের তথেকে রবীন্দ্রনাথের “শেষরক্ষা”কে চিত্ররূপ দিচ্ছে এই ছবিতেও আমরা শ্রীমতী বিজয়া দাস নামে এক নতুন অভিনেত্রীর সন্ধান পাব। ইনি বিখ্যাত গায়ক কনক দাসের আত্মীয়। ইন্দুভীর চরিত্র অঙ্কনের পক্ষে এই নবাগতা অভিনেত্রীর উপর। অপর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অমর মল্লিক, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মলিনা এবং রেবা মনোনীত হয়েছেন।

প্রকাশ পিকচার্স :—পরিচালক বিজয় আমাদের জানিয়েছেন যে “বুদ্ধের জীবনী”ই হবে তাঁর পরবর্তী চিত্র। সমস্ত বিশ্বসংসার যখন ক্রমাগতরূপে পাণ্ডরায় শাস্তির জন্য উদ্ভূত সে সময় শাস্তির প্রচারক যুগ জীবনী যে কাশোপযোগী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরিচালক ভট্টের এই সংগ্রহে যাতে জ্ঞান হয়, সেই জন্য ভাঃ শ্রামপ্রদা যুগার্জি, ভাঃ সুনী চট্টোপাধ্যায়, ভাঃ পাণ্ড, বিচারপতি চারুচন্দ্র গি প্রভৃতি তাঁকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন।

নিউ সেফুরী প্রোডাকসন :—জনপ্রিয় চিত্র ছবি বিশ্বাগ এইবার পরিচালকরূপে দেখা দেবেন। প্রাতিষ্ঠানের হয়ে তিনি প্রেমেই মিলের কাহিনী অবলম্বন একখানি ছবি তুলবেন। ছবিখানির আপাততঃ না কখন হয়েছে “ভেদাভেদ”। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুমার শতী দেববর্ধন।

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী :—জহর গোস্বামি ছিল যে বেথুবা এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর পরিচাল্য করে এম, পি, প্রোডাকসনে যোগ্য করবেন, কিন্তু যখন পাণ্ডা পেছে যে তিনি এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর পরিচাল্য করবেন না বলে সঙ্কল্প করে



শ্রীমতী দেবীকারাণী

বহু চক্রের “হামারি বাত” চিত্রে ইহাকে দেখা যাবে

(“ফিল্ম-স্ট্যাণ্ডার্ডের” সৌজন্যে)





নিউ থিয়েটারসের
“ওয়ারপস” চিত্রে
দীরাঞ্জ ও লতিকা ব্যানার্জি
পরিচালক—হেমচন্দ্র



রূপশ্রীর “দম্পতি” চিত্রে
সাবিত্রী ও রবীন্দ্র মজুমদার



“রাজকুমারী ললি”

[ত্রীকৃষ্ণ মিত্র]

একদিন বিবানিয়া হতে উঠে তো হুয়েন দেখে সার্জের
গোপাল পরা এক জন তাকে কি খবর দেবার জন্তে পাশে
থাকিয়ে—তো তাকে কি দরকার জিজ্ঞাস্য করিতে জানাশেন
সে তার প্রকৃত নিমন্ত্রণ বয়ে এনেছে।

তো প্রশ্ন করলেন—কে তার প্রভু?

উত্তরে স্পষ্ট কোন জবাব না দিয়ে সে তাকে তার
গৃহে বাবার জন্ত অহনয় করে বলল—তিনি খুব নিকটেই
থাকেন। তারা দুজনে চলতে আরম্ভ করল। একটু
পরে তো দেখল অসংখ্য উচু নীচু সাধা রংয়ের বাড়ী—
দেয় বাড়ীতে ঘেরা। পথ-প্রদর্শক তাকে নিয়ে চলল
সহুত আকারের অসংখ্য ঘর-দরজার সামনে দিয়ে, আর
অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি পথ-প্রদর্শককে জিজ্ঞাস্য করিতে
লাগল—তো হুয়েন এল? উত্তরে সে শুধু তৌয়ের দিকে
চেরে একটু ঘাড় নাড়ল।

শেষটায় তো দেখল তাকে একজন চৈনিক উচ্চপদস্থ
কর্মচারীর সামনে এনে হাজির করা হল। তাকে বেশ
আকর্ষণের সাথে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হল একটি
বিষয়কর প্রাসাদে—তো কিন্তু এবার ইতস্ততঃ করিতে
লাগল, বলল—আমি আপনার শৌজন্তে মুক্ত, কিন্তু আপ-
নাকে জানতে পারলাম না এবং আমার অকস্মাৎ
উপস্থিতির জন্তে লজ্জিত বোধ করছি।

উত্তর এল—আপনাকে মহৎ এবং উচ্চবংশসম্পন্ন বলে
আমাদের সুব্রাহ্মণ্য অনেক দিন শুনে আসছেন—এবং
তিনি আপনার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হতে
চান।

কিন্তু কে আপনার সুব্রাহ্মণ্য?

কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি নিজেই তাকে দেখতে
পাবেন—এই কথা বলবার সময় ছাঁচন হৃদয়ী উৎসবের

পড়া। হস্তে এসে উপস্থিত হ’ল এবং ঘর-দরজা পেরিয়ে
শেষে তারা তাকে নিয়ে হাজির হ’ল সেই সিংহাসনের
সামনে, যার উপর বসেছিলেন স্বয়ং সুব্রাহ্মণ্য।

তাকে দেখে সুব্রাহ্মণ্য সিংহাসন থেকে নেমে এলেন
এবং নিজেই অধিকৃত বসিয়ে দিলেন সেই উচ্চাসনে।

আনন্দ ভোজ্য স্বয়ং করার আজ্ঞা দিতেই সুব্রাহ্মণ্য
এবং মদ সকলের সামনে পরিবেশন করা হ’ল।

তো তখন বিশ্বস্তরা দৃষ্টি নিয়ে চারি দিকে চাইতে
লাগল এবং দেখল এক ফালি কাগজে এই কটি
কথা লেখা—“দি কাগিয়া কোর্ট।” কিন্তু মাত্র
এইটুকুতে তো ভালো করে বুঝে উঠতে পারল না—কে
এই ভদ্র গৃহবাসী। তাঁর এই হতভম্ব ভাব লক্ষ্য করে সুব্রাহ্মণ্য
বললেন—তোমাকে প্রতিবেশী হিসেবে পাণ্ডয়ার সৌভাগ্য
য়েন আমাদের ভিতর একটা আত্মীয়তার স্বরূপ বলেই মনে
হয়—আজ ভয় বা সন্দেহ দূর করে এস আমরা উৎসবে
যোগদান করি।

এর পর তো আর এই নূতন পরিস্থিতি স্বত্বকে
চিন্তা করবে না সংকল্প করে আমোদ প্রমোদের স্রোতে
নিজেই ডুবিতে লাগল। কয়েক বার মদ পান করবার পর
শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসছে বাঁশী আর গানের
মুর্ছনা, কিন্তু প্রথমত চাকের কোন আওয়াজ শোনা গেল
না।

সুব্রাহ্মণ্য বললেন—এই সঙ্গীত দিয়েই আমরা তোমার
সম্বন্ধনার ব্যবস্থা করেছি—“কাগিয়া রাজশতা গুণীর
সমাদর করে।” যখন সমবেত ভক্তমণ্ডলী এক প্রকার শব্দ-
ক্রীড়া স্বত্বকে চিন্তাময় তখন তো সবাই আগে বলল—
মাজ্জিত কৃতি পদ্মকুল (লিপি) ভালবাসে।

প্রশংসার অক্ষুণ্ণ ভক্তদের মাঝে সুব্রাহ্মণ্য আনন্দোচ্ছাসে

বলে উঠলেন—সত্যিই এ বিশ্বাসের—তোমার মুখ দিয়ে ঠিক এই কথাই বেরল—আমারই মেয়ের নাম দিলি—একুনি স্বচক্ষে তুমি তাকে দেখতে পাবে। যুবরাজ আদেশ দিলেন—ক্ষণপরে তেলে এল অলঙ্কারের রিমিকিনি আর মুহুম্বান সুরভি—রাজকন্ডার আগমন জানিয়ে দিতে।

স্বীদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল রাজকন্ডা—বয়স তার বোল কি সত্তর। তার অনিন্দ্যময় রূপের সামনে নির্বাক ভেঁ বিশ্বয়ে চেয়ে রইল—পিতার আদেশে তৌকে শ্রদ্ধা ও সন্মান জানিয়ে রাজকন্ডা ভিতরে চলে গেল।

তৌকে রাজকন্ডার রূপে মুগ্ধ দেখে যুবরাজ তাঁর কন্ডার একটী উপযুক্ত পাঠের সন্ধানের কথা ভুললেন, কিন্তু তৌ তখন এমন বিবল দেখে যুবরাজ কি বলছেন তা ভুলতেই পেলেন না—এবং তার চারি দিকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে রইল—শেষ পর্যন্ত একজন পারিষদ তাকে হাত ধরে জানিয়ে দিল যে যুবরাজ তাকে কিছু বলছেন। চমকে উঠে, একটু আশ্বাসবরণ করে নিয়ে তৌ আশুতা আশুতা করে কমা চাইল এবং ফিরে যাবার অসম্মতি প্রার্থনা করল।

—যবরাজে তোমার ভগ্নগমনে আমি অত্যন্ত ক্লীত হয়েছি, কিন্তু তোমার এই ক্ষণ-অবস্থান সত্যিই দুঃখের, আমি তোমাকে আমাদের মধ্যে আবার আনা করি।

তখন যুবরাজ তৌকে তাঁর গুপ্ত পৌঁছে দিয়ে আসবার আদেশ দিলেন। তার সঙ্গে পারিষদটি বলল, যখন রাজা অন্ত করে তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা বললেন তখন তৌ কেন রাজকন্ডা দিলিকে নিয়ে করবার প্রস্তাব জানাল না? অভিভূত যুবক যখন বুঝতে পারল যে একটা মন্ত শ্রমগোপন সে হারিয়েছে, তখন সে তার বাজীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—হৃদয় অন্ত পেছে—বিষয় তৌ বসে বসে স্বপ্ন দেখছে রাজকন্ডাকে—আর দুঃখ করছে দুর্ভাগ্যের কথা জেনে—সন্ধ্যার পর ভুতে গিয়ে আদো নিবিয়ে ভাঙতে লাগল স্বপ্নে হরত আবার সে হারান স্বপ্নে গুঁজে পাবে।

কয়েক রাতি পরে একদিন তৌ যখন তার এক বন্ধুর বাড়ীতে যুগ্মদিল তখন একজন রাজকন্ডাচারী এসে তাকে ফুলে যুবরাজের সামনে নিয়ে চলল। তৌ দেখতে গেল

আবার সে সেই অস্বস্ত রকমের অসংখ্য ঘরদোহা সামনে দিলে চললো। শেষ পর্যন্ত সে যুবরাজের সন্ধান পিয়ে নতজাহ হতে, যুবরাজ তাকে সন্ধানমতার সন্ধান করলেন। উৎফুল্ল তৌ যে রাজকুমারীর প্রবেশ আনন্দিত হয়েছিল, এ কথা তিনি জানেন এবং রাজী থাকলে তৌকেই যে এখনি সম্পন্ন হতে পারে—এ প্রস্তাবও তিনি কখনো

সংবাদ এল—রাজকুমারীর প্রস্থান শেষ এবং দাল চৌকীতে মন্তক আবৃত করে তার তাঁর সাথে আসছেন। যখন স্বর্গীরা তাকে তাঁর দিকে নিয়ে আসছিল, তখন তার লগ্ন পক্ষের দিকে ছোট ছোট ডেউয়ের ছলছলানি শোনা যাক্ষিল। রাজকুমারীর সামনে সন্ধ্যমে মাথা নীচ করে তৌ তোমার উপস্থিতি অতি সম্বন্ধে মন্তকে ভুলিয়ে কিন্তু সত্যি করে বলো, এ সব কি স্বপ্ন নয়?

মুগ্ধ কহে রাজকুমারী বলল—কুমি আমি যখন এখানে, তখন আমার স্বপ্ন কি করে হবে প্রিয়তম? পরদিন সকালে আনন-প্রসাদনে তৌ রাজকুমারী সাহায্য করল; তার পর একটি মালা ধরে রাজকুমারী কটিদেশের, আশুতুলার এবং পাঠের মৈত্রীর মালা বন্ধ করল। সন্ধ্যার হেসে উঠে রাজকুমারী কুমি কি পাগল হলো?

উত্তরে তৌ বলল—আমি বহু বার প্রস্তাবিত হই এবার আমি সাবধান একটা পাকাপাকি কার্য চাই। যদি এবার সব কিছু স্বপ্নও হয়, তবুও স্বপ্নবিরূপ একটা কিছু রয়ে যাবে।

তাদের কথার মাঝখানে সহসা একজন অস্বস্ত এসে বলল—সর্গনাশ, একটা দৈত্য প্রাণীদের টুকে পড়েছে। যুবরাজ পাশের একটা ছোট্ট কানি পালিয়েছেন; আমাদের মুক্তা অনিবার্য।

তৌ তৎক্ষণাৎ যুবরাজকে গুঁজে বসে করল, চোখে রাজা তৌকে তাদের ছেড়ে না অহরোধে জ্ঞানালেন। চীৎকার করে রাজা যুবরাজের সন্ধান একটা পাকাপাকি আশা উপস্থিত তখন উপর থেকে এল এই অভিযান, আমি রাজাহারা হয়ে কি করব?

সমস্ত ব্যাপারটা জানবার জন্যে অহরোধে জানাতে রাজকুমারী চিঠি টেবিলের উপর রেখে তৌকে চিঠি বিধি পক্ষে নিতে বললেন। চিঠিতে লেখা ছিল—
“সীতাক্ষের প্রধান কন্ডা গর্ভিণী, রাকটউৎসে একটি কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সমস্ত রাজদরবার শব্দিত হয়ে উঠল। তৌ চারি দিকে দৃষ্টিবিস্তার করলেন। চীৎকার করে রাজা যুবরাজের সন্ধান একটা পাকাপাকি আশা উপস্থিত তখন উপর থেকে এল এই অভিযান, আমি রাজাহারা হয়ে কি করব?

উপর পড়ে তাকে ছেড়ে না যাবার জন্যে মিনতি জানালেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

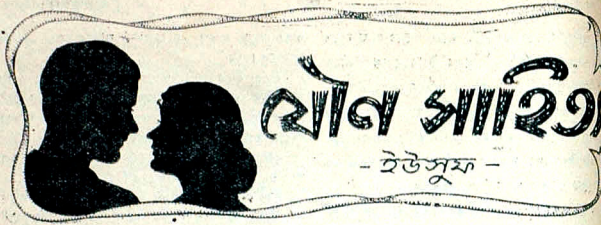
সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।

সীত সিংহধারের ভারপ্রাপ্ত কন্ডাচারী কাছ থেকে এই সন্ধান সংবাদ পাওয়া গেছে যে, দ্য হাজার ফুট লম্বা একটি মস্ত কন্যাশিশু রক্ষা করবার জন্যে সমস্ত রাজ-দরবারকে উপস্থাপিত করবার পরামর্শ দিয়েছেন।



নারীর মর্যাদা

আধুনিক ও প্রাচীন সকল ধর্ম ও জাতিই নারীকে পুরুষের চেয়ে হেঁচট করে দেখেছে। জী-পুরুষের সময় চেয়েচেনে মাত্র এক মুহূর্তের দল, জীজাতির শ্রেষ্ঠ চেয়েচেন আরও বর লোকে। আধুনিক জীবন-বিজ্ঞান-বিদেবাই মাত্র এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেচেন এত দিন। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বপক্ষে মতের আধিক্য সব সময়েই এবং মুসলমানদের কোন কোন সম্প্রদায়ের বত কোন কোন ধর্মও মনে করে নারীর কোন আত্মাই নেই। বিশেষ করে কোন কোন মুসলমানেরা এমনও বলে যে, নারীরা "দীর্ঘকেশী কিন্তু ক্ষুদ্র মস্তিষ্কবিশিষ্ট।"

দার্শনিকেরা বলেচেন, নারী একজন অপরিণত পুরুষ মাত্র; সেজন্য স্বভাবতই সে অধীনত্বের, দাসত্বের ধাপে নেমে গেছে। সেটাই মনে করতেন, নারী নবের সম্পত্তির একটা অঙ্গ মাত্র, তার খোঁড়া, কুকুর, দাসদাসী ও আসবাব-পত্রের সান্নিধ্য।

সেক্সপীরের তাঁর Taming of the Shrewতে বলেচেন :

I will be master of what is mine own ;
She is my goods, my chattels ; She is
my house,
My household stuff, my field, my house,
My horse, my ox, my ass, my anything ;—
And here she stands—touch the whatever
dare.

মৌনিসাঁচনের দ্বারা ডারউইনের জন্মবিস্তার

করনাও পুংলিঙ্গের সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। স্পেন্সার মনে করতেন যে, জীজাতির সম্যক পরিণতি বাগ্য-তার প্রাথমিক ক্রিয়ায়, কৃত্রিমী হওয়ার জন্ত এবং গর্ভসঞ্চারের জন্ত। ডারউইনের কল্পিত পুরুষ বিকৃতি অথবা পূর্ণবিকৃতি নারীই। অপর পক্ষে স্পেন্সারেরও হাঙ্গল অবস্থিত পুরুষ যে পূর্ণ বিকাশের পূর্ববর্তী বাগ্য হয়েচে।

টাইন্ডম্যান সব জ্ঞপকেই পুং বলে মনে করে কিন্তু প্রায়ই তাদের মধ্যে কোনটি কোনটি পূর্ণ বিকৃতি অক্ষম হয়ে জীতে পরিণত হোত—“degenerating the female state”।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে মহিলারা প্রকৃত পক্ষে পুরুষের দাসত্ব বা এক প্রকার অধীনতায় বদ্ধ ছিলেন। পুরুষদের সাধারণ দৈনিক ব্যবসায় বা বেতনওয়ারী চাকরীতে যোগ দেবার অধী ছিল না তাঁদের। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে মার্জিত শ্রমিক নারীরা শিক্ষকতা এবং অশিক্ষিতেরা চাকরী কাজ করলেও ইংল্যান্ডে যাকে এখনও slavery-র অতি অসংখ্যক নারীই এই ব্যবধান ভেঙ্গে এনেছেন এবং করচিৎ দৃষ্টান্ত ছাড়া নারীরা পুরুষের সমবেতন পতেন না—সমান কাজ করলেও না।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত মুক্তিকা-শাসনেও তাঁর লিখনে যা য়ে, পুরাকালের খ্যাতিলেন নারীর স্থান পূর্ণ দেশের সমাজের চেয়েও উচ্চ ছিল। তারা পূর্ণ বুদ্ধাবিস্তৃত হোলে এবং পুরুষের কাজ করলে পুরুষ

[১০৫]

মতই পরগা পেত। ইউরোপের দেশে দেশে স্বাধীর মারফৎ ছাড়া জীর কোন পৌর অধিকার ছিল না। তারা নিজেদের নামে কোন সম্পত্তি রাখতে পারত না, আর তাহা নিজে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি স্বাধীর অধিকারভুক্ত ছিল। অভিযানেও নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা আরোপ করা হয়েছিল। অপৌরুষেয় (unmanly) মানে দৈহিকতা বা নির্বুদ্ধিতা, এই কথাই বলে।

এর চেয়ে অহুদত সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর আরো নিষ্ঠুর অবস্থা অসংশয়ই আমাদের বিস্মিত করবে না। উদাহরণ স্বরূপ ভাষ্যমীতে, নারীদের এক-চতুর্থাংশ ভৌতিক ও ভগ্নসম্পন্ন প্রাথমিক দেহভার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ; অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তারা রাষ্ট্রের দাবী এবং তার সৈন্যদের দলভুক্ত। যদিও সৈন্যদের মধ্যে কিছু স্বাধীনও থাকে। অবশিষ্ট নারীরা নৃপতির সম্পত্তি এবং তিনি যেমন ইচ্ছা তাদের ব্যবহার করতে পারেন। তিনি নিজেদের জন্ত যে কোন নারীকে রাখতে পারেন। যে কোন নারীকে সৈন্যদের কাজে লাগাতে পারেন। তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তীদের যুদ্ধে হস্তে জী ব্যবহার করেন। যুদ্ধে বন্দী নারীদের মধ্যে যাদের শরীর খুব ভাল তাদের সৈন্যদলে পাঠান হয়, বাকী নারীরা যোদ্ধাদের সন্তোষের জন্ত শিবিরের অগ্রদূতী হয় অথবা দাসীরা বরণ করে।

অশান্তি দেশে রাজার ৩৩৩ জন জী আছে বলে জানা যায়। এর মানে রাজার ভোগলিপ্সা মেটাবার জন্ত এক অসংখ্য ব্যবস্থা।

নারীর মর্যাদার এই রকম পার্থক্য করনা তথ্য-কথিত ভ্রূতভাষ্য দেশেও চলে এসেছে। যেমন ফ্রান্সে ১০০ বৎসর আগেও আইনতঃ প্রত্যেক নারীই ছিলেন রাজার সম্পত্তিভুক্ত এবং দুর্ভাগ্যবশত রাজা পঞ্চদশ বৃহৎ তাঁর রাজসভার যে কোন নারীর প্রতি আসক্ত হয়েচেন। একটা গল্প আছে যে একবার তিনি রাজসভার কোন একটি সন্ধ্যায় মহিলাকে ভোগ করার জন্ত তাঁকে আটক করেন। মহিলাটি তাঁর স্বামীকে সব জানান, কিন্তু রাজাদেশ লঙ্ঘন করা বা উৎপেক্ষা করলে তাঁরা সাহস করলেন না। সে জন্ত তাঁর স্বামী বেছায় শিকশিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরীতে

তা সংক্রামিত করেন। পত্নীর কাছ থেকে আবার রাজার দেখে এই রোগ সংক্রামিত হয় এবং তাতেই রাজার শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে পর্যন্ত আইনামুসারে ফ্রান্সের রাজা যে কোন ভর্তুকীর বিবাহের পর প্রথম রাতে তার সঙ্গে শয়ন করতে পারতেন। এইটাই নাকি ফরাসী বিপ্লবেই বিশেষ কারণ। অবশ্য রাজা নিজে সব ভর্তুকীর প্রতি এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না, সে জন্য তিনি তাঁর অধিকার আর একজনকে দান করতে পারতেন এবং এই ভাবে কাজ চলতো যতক্ষণ না শেখ জেতা তার জেলার সব ঘরের উপর এই অধিকার লাভ করতো। যখন কেউ বিবাহ করতে যেত, তখন সে যে ঘরেই বিবাহ করবে, টাকার দ্বারা তার ওপর তাকে অধিকার লাভ করতে হোত।

সমস্তই রাজার, এই মতবাদ ফিড্ড্যাল (জার্মানীর দার) যুগেও বহুপ্রচলিত ছিল। “King’s army,” “King’s navy,” “King’s Government” প্রভৃতি ইংরাজী শব্দগুলি সেই যুগেরই পরিচিষ্ট।

জন্ম:

কেবল উৎসবের দিনেই নয়,
প্রাত্যহিক ভোজের সহিত

এস, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স এর

জায়, জেলী ও চাটুনী

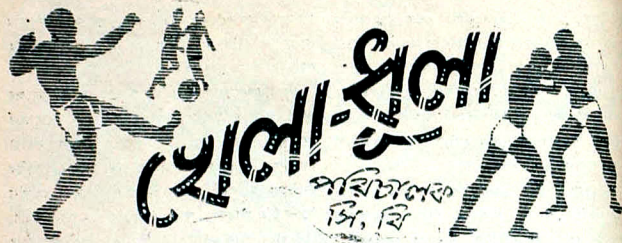
খাওয়ার আদে ও রুচিতে বিশিষ্টতা দান করে

আমাদের বিশেষত্ব
পোয়ারার জায় ও জেলী, আমের
চাটুনী, ভিনিয়ার, সস এবং
ফলের সিরাপ

১০/১, চক্রবেড়িয়া রোড, (সাউথ)

স্বাধীনপুর

মফঃস্বলের অর্ডার বিশেষ যত্নের সহিত
সব্বর পাঠান হয়।



কলকাতার ফুটবল খেলার মরওম প্রায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ করে লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব এবং আই এফ এ শীভ-বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব কলকাতার বাইরে চ্যারিটি ম্যাচ খেলবার জন্ত কয়েকটি সন্ধ্যায় পেরেছিল। ঢাকার হুঃহুদের সাহায্যের জন্ত দুটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয় সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। এই খেলা দুটিতে যোগদান করার জন্ত ঢাকার সেসন জন্ মিঃ জে. দে. আই. সি. এই মোহনবাগান এবং ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব দুটিকে আমন্ত্রণ পাঠান। ইষ্ট বেঙ্গল দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই গিয়েছিল। তবে মোহনবাগান দলে মাত্র কয়েক জন নিয়মিত খেলোয়াড় গিয়েছিল। প্রথম দিনে মোহনবাগান এবং ইষ্ট বেঙ্গল সম্মিলিত দলের সঙ্গে ঢাকা একাদশের খেলা হয় এবং সম্মিলিত দল একটি পেনাল্টি গোলে জয়ী হয়। দ্বিতীয় দিনে মোহনবাগান এবং ইষ্ট বেঙ্গল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং কোন গোল না হওয়ায় খেলাটি অসমাপ্তিভাবে শেষ হয়।

সৈনিক কর্তৃপক্ষ বর্তমানে বাঙ্গালা এবং তার নিকটবর্তী প্রদেশগুলির সৈনিক ফুটবল খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার জন্ত এলায়েড সার্ভিস ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলি কলকাতা এবং তার আশে-পাশে অল্পদূরত্ব হলেও হচ্ছে। সেমিফাইনাল দুটি এবং ফাইনাল এখনও বাকী আছে। সেমিফাইনাল খেলা দুটি, ফাইনাল খেলাটি এবং এরপর ব্যবস্থাকৃত তিনটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলা 'বাঙ্গালার

হুঃহু সাহায্য ভাণ্ডার', 'রেডক্রস ভাণ্ডার' এবং 'হসপিটাল নাসেস ইমিউটিউনসের' সাহায্যে অল্পদূরত্ব হবে। ফাইনাল খেলাটি ১১ই নভেম্বর অল্পদূরত্ব হবে বলে ঠিক হয়েছে এবং প্রদর্শনী খেলাগুলি এর আগেরই হবার ব্যবস্থা হয়েছে। উক্ত সব খেলাগুলিই ক্যালকাতা মার্চে অল্পদূরত্ব হবে। এই প্রদর্শনী খেলাগুলির মধ্যে ১১ই নভেম্বর মোহনবাগান এবং ইষ্ট বেঙ্গল সম্মিলিত দলে সঙ্গে এলায়েড সার্ভিস বাছাই করা দলের খেলাটি আমাদেরও বেশ আকর্ষণ সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

বর্ধমানের বজা-প্রসিদ্ধিত লোকদের সাহায্যের জন্ত মোহনবাগান এবং পুলিশ দলের আই এফ এ শীভ প্রতিযোগিতার শেষ দিনের সেমিফাইনাল খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলা হয়েছিল। এই খেলাটির সংগৃহীত অর্থ আইএফএ এবং জে জে হেডওয়ার্থ কোং যথাক্রমে ১০০১ টাকা এবং ২৪০০ টাকা সেন্ট্রাল স্টাড রিসিকমিটির সভাপতি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের কাছে পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া আই এফ এ হুঃহুদের সেবার জন্ত কলকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ৯৬৬ টাকা দান করেছেন।

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভা ২৬শে অক্টোবর হয়ে গেছে। তার বারেন মুখার্জি

মি. বি. এইচ. পিক এবং মিঃ পি. গুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক পুনঃ নির্বাচিত হয়েছেন। এই সভায় অজান্তে নিয়মিত সাব কমিটিগুলি ছাড়া হুঃহুদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি রিসিক সাব কমিটি নব গঠিত হয়েছে। বি. এইচ. এর সাধারণ ফণ্ড থেকে ৪০০ টাকা নিয়ে এই সাব কমিটির কাজ আরম্ভ হলেও তারা সন্তোষজনকভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছে। কোন প্রদর্শনী হকি খেলার ব্যবস্থা করে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বি. এইচ. এর

কলকাতার ফুটবল খেলার মরওম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ালকাটা রাগবী কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছিল। কয়েকটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলার পর ফাইনাল খেলার 'ইউনিফর্ম' দল তাদের বিপক্ষ 'টোয়েন্টিএইট' দলকে ৪-০ পর্যায়ে পরাজিত করে। ক্যালকাতা মার্চে ফাইনাল খেলাটি হবার পর কলকাতার পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতা ময়দান যথারীতি পুনরোক্ত দিনের জন্ত জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।

বোম্বাই রোভার্স' কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ৪৭ বছর পূর্ণ হয়েছে এই বছরের ফাইনাল খেলা হয়ে যাবার পর। এই বছরের প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব হচ্ছে যে, বোম্বাইয়ের বাইরের কোন দলকে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। সেই কারণে গত কয়েক বছরের মত, এবারে কলকাতার কোন দল যোগদানের সুযোগ পায়নি। সম্ভবতঃ দেশের বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্ত রোভার্স' কাপ প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে এই বাধা নিষেধের প্রয়োগ করেছেন।

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় বাছাই করা ভারতীয় দল এবং শ্রী, এ, এফ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। আর, এ, এফ

দলটি বিলাতের পেশাদার খেলোয়াড়দের দ্বারা গঠিত হলেও ভারতীয় দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে। তীম রাত এই গোলাট করেন।

বোম্বাই ক্রীড়ামণ্ডল ভারতের একটি নাম, করা হকি দল। এ দলটি এ বছরে বোম্বাই হকি লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না বলে স্থির করেছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত সাময়িক হলেই মঙ্গল—তা না হলে হকি খেলার অঙ্গুরাগীরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হবে।

নিখিল ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা গত বছরে বোম্বাইয়ে অল্পদূরত্ব হয়েছিল। এ বছরেরও এই প্রতিযোগিতা বোম্বাইয়ে অল্পদূরত্ব হবে। আগামী ১১ই ডিসেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই সিমথানায় এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলি হবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙ্গালা, পাঞ্জাব, মুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ব্রিটিশ প্রভৃতি সকল প্রদেশগুলিই যোগদান করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

গত বছরে স্থগিত থাকার পর এই বছরে বোম্বাই পেটাবলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলাগুলি পুনরায় যথারীতি অল্পদূরত্ব হবে বলে স্থির হয়েছে। ২৩শে নভেম্বর এই প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে এবং আগামী ৬ই ডিসেম্বর শেষ হবে।

করাচী সিদ্ধ পেটাবলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি গত সপ্তাহে শেষ হয়েছে। হিন্দু দল এবং মুসলিম দল দুইটি ফাইনাল খেলায় প্রতিযোগিতা করেছিল। আড়াই দিন খেলা চলার পর হিন্দু দল এক ইনিংস এবং ৩৩০ রানে জয়ী হয়েছে। হিন্দু দল প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায় এবং ৪০৯ রান করার পর প্রথম ইনিংসে খেলা শেষ করে। এই রান-সংখ্যার মধ্যে

কিয়েন চার নিজস্ব ১৮১ রাণ করেন। সুসীম দল প্রথম ইনিংশে মাত্র ৮৪ রাণ করায় 'ফলো অন' করতে বাধ্য হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংশে ২২২ রাণ করতে সক্ষম হয়। ফাইনাল খেলাটির প্রথম ইনিংশে উক্ত রাণসংখ্যা করে হিন্দু দল তাদের আগের খেলাটিতে ৪৩০ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করে। 'সিদ্ধু' পেটাসিয়ার প্রতিযোগিতার 'স্বর্ণ পদক' উৎসর্গ উপলক্ষে আগামী ৬ই এবং ৭ই নভেম্বর করাচীতে 'চ্যাম্পিয়ানশ্ব' বনাম 'রেট দলের' একটি দুই-দিনী প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হবে।

মাস্টার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের স্থির করেছেন যে, এ বছর স্থানীয় ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা খেলা হবেন না।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাকালের খেলায় বাঙ্গালা এবং বিহার প্রাদেশিক ক্রিকেট দল দুইটি সম্ভবত: আগামী ১০ই, ১১ই এবং ১২ই ডিসেম্বর ইডেন উড্ডানে প্রতিযোগিতা করবে।

বোম্বাই এবং বরোদা দলের রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাকালের খেলাটি বোম্বাইয়ে অগ্রহস্তি হবে বলে স্থির হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশ গত বছর রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার যোগদান করেনি। এই বছরে বোম্বাই প্রাদেশিক দলটি অবিকৃত শক্তিশালী হবে বলে মনে হয়।

আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় রেড ক্রস সপ্তাহ পালিত হবে। এই উপলক্ষে আই, এফ, এ ডিনটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া একটি প্রদর্শনী হকি এবং ক্রিকেট খেলার

ব্যবস্থা হবে। বোম্বাই, বেঙ্গল, হুইনিং, টেনিস, রাগবি প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থাও এই উপলক্ষে হতে পারে।

গত বছর স্থগিত থাকবার পর এই বছরে পুনরায় বেস্টল জিমখানা ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অগ্রহস্তি হবে বলে স্থির হয়েছে। এক প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলগুলিকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে আগামী ৭ই নভেম্বর থেকে উভয় বিভাগেরই খেলা আরম্ভ হবে।

বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ তাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়দের খেলার স্থগিত করা এবং বেস্টল চ্যাম্পিয়ানশিপ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার অগ্রহস্তি করে সাময়িক ভাবে ১০ম রাত্বে নববিক্রীষ্ট বাড়ীর প্রান্তরে একটি আচ্ছাদিত কোর্টের ব্যবস্থা করেছেন। ১লা নভেম্বর থেকে নিয়মিত ভাবে খেলা শুরু হয়েছে।

আগামী ১৯৪৪ সালের ২০শে জানুয়ারী থেকে কলকাতার পর্যন্ত এলাহাবাদে নিমিত্ত ভারত লন টেনিস প্রতিযোগিতার খেলাগুলি অগ্রহস্তি হবে।

আগামী ডিসেম্বর দুইটিতে উত্তরাংশ পার্কে ক্যান্টন মাউন্ট রোড পরিচালিত পূর্ব-ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা অগ্রহস্তি হবে। খেলাগুলি নিয়মিত ভাবে কীডামারদীদের আনন্দ সঞ্চার করে।

ভারতের টেনিস খেলোয়াড়দের জন্মপরিবারে স্থান অবিকারী ইকিতিকার আয়েদ করাচীতে চীন সার ভাওয়ারে সাহায্যার্থে একটি প্রদর্শনী টেনিস খেলা চীন জেডিস কাপ খেলোয়াড় ভবনটি সি চয়েক পরিচালনা করেছেন।

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা

আমেরিকা যুক্ত-প্রদেশ পরাধীনতার সৌখ্যমূল থেকে মুক্তি দিতে বৃত্তান্ত হয়েছেন ফিলিপিনা আভিক: এ প্রসারের সমস্কেই গৃহযুদ্ধ। সম্ভ্রতি রাষ্ট্রসেতা কলকাতা যাকে যুদ্ধের এই অগ্রদূত করায় মধ্যেই অবিশেষ তত্ত্বার্থ্য সম্পন্ন হতে পারে, সে সম্ভ্রত প্রদেশের রাষ্ট্র কখন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্তিহীন হইবে ফিলিপাইন কনগ্রেসের প্রেরিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে তত্ত্ববিশেষ প্রস্তুতকারের প্রস্তুতাবলি সহায়ত্ব চিরমক্ষয় থাকবে।

ভারত লর্ড মাউন্টব্যাটেন

গুরুপূর্ণ এশিয়া বঙ্গদেশের সর্বোচ্চ অবিসার লর্ড মাউন্টব্যাটেন নবাবীরা পৌঁছেন। দক্ষিণপূর্ণ এশিয়ার তীর্থস্বয়ং, স্বাধীনতা, ও পূর্ণভারতীয় কলকাতা প্রদেশের রাষ্ট্র প্রেরণের ব্যক্তি আর নেই। প্রথম প্রতিবোধের সামনেও land হস্তে এর দক্ষতা অসাধারণ। তিনি প্রথমে মজলিট জেলায় অবিসারকে ও তার পর নূতন মাসিয়ারে জেলায় ওয়াহেলের সঙ্গে আসাদনা করেন। সম্ভ্রতি তিনি চুক্তির মার্শাল চিহ্ন প্রেরিতদের সঙ্গে একত্র আক্রমণের প্রস্তুতি করে দিলে যুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যেই স্থানীয় আক্রমণের পূর্বসংবাদ আনয় প্রেরিত টাট্রায়ে ও মার্সালে; লর্ড মাউন্টব্যাটেন আমাদের সর্বোচ্চ পরিচালনা করতে সক্ষম হোন এই কামনা করি।

ভারতবর্ষে অধিক শত্বেপাদনের উপায়

ভারত বঙ্গদেশের সর্বস্বত্র সত্রার রাশবানী মুসলিমদের জাতিগত, সামান্য শির, সর্বস্বত্র, বাত, বারিগত, নিকা, স্বাধীনতা ও মুক্তি বিচারের প্রতিনিয়মের ঐক্যে 'আয়োনিয়াম সারস্কেই' কবি উত্তরা বুদ্ধি করায় পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ও ফলস্বরূপ গায় জাতিগত বুদ্ধি। ভারতবর্ষেই যাকে এই বাক্তি উৎসর্গ হতে পারে শিশুভাবের সঙ্গে গুরুভবিত যে বিষয়ে সর্বস্বত্র করণে একটি প্রয়োজন কবিগত সাহায্যে। ভারতের প্রয়োজন যেটাকে মাগবে লর্ড ০ ০ হাজার টন আয়োনিয়াম সারস্কেই। বিশেষ থেকে পাণ্ডি এনে এই পরিমাণে সারস্কেই উপাদান করতে হ'বে প্রয়োজন। বর্তমানে প্রথমে মাত্র বাৎসরিক ৩ ০ হাজার টন প্রস্তুত হতে পারে। গুরুভবিত এ বিষয়ে আরও ক্রয় ক্রয় করণ, বিশেষ লোক এইটুকু আনা হবে।

পূর্ণ রাগনের ইতিহাসের বৃহত্তম অভিনয়

বিষয়্যার গুলিনে কলিয়ার হৃদে প্রথমে ব্যাপক অভিনয় প্রস্তুত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণের কাছে এর পরিমাণ বড়ই কল্যাণকর হবে বলে আশা করা যায়। জাতিগত ঐক্যবিশেষ বিপর্যয়ের পর

ক্রমাগত পিছিয়ে চলছে। যে ইউকেনকে তারা ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাও অর্ধেকের কাছাকাছি তারা হারিয়েছে। নীপার নদীতীরে জাতিগত-বৃত্ত চূর্ণ-চূর্ণ করে গোত্রকেই সৈন্য শত্রুকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা যে অসম সাহসে এশিয়ে চলছে তা সামরিক ইতিহাসে অদ্বন্দ্বনীয়। কলিয়ার, কিয়েত, গোমেল লালকৌল জাতিগতদের সঙ্গে আশাও হয়েছে। কলিয়ার কোর্টি ইতিহাসে চিত্রিত হতে পারে।

মিস পাল'বাকের ভারত-রুশ-চীন জিত্ত্ব

"প্রাচ্য ও পশ্চাত্য সঙ্গের" আশ্রমে নিউইয়র্কে ব্যক্তনামা লেখিকা মিস বাক যে বক্তৃতা বিবাহের তাহা প্রবাহনযোগ্য। "যে মার্কিন সৈন্যগণ আজ সমস্ত রাগনেরই বৃত্ত করিতেছে যুদ্ধাঙ্গের সৌকর্যের সম্পর্কে সেই সৈন্যগণ বঙ্গদেশে যিহিয়া কি মনোভাব অবলম্বন করিতে তাহার উপরই স্বাধীনতা দ্বিতীয় নির্ভর করিতেছে। ভারত, চীন এবং রাশিয়ার জনগণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক শক্তিশালী জিত্ত্ব রচনা করিয়াছে, এবং ইউরোপীয়দের অপেক্ষা আমাদের নিকটই ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে।"

অঙ্গ-বঙ্গ সমস্তার শীমাসংসার মহাশয় গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

গত বঙ্গের "অন্তর্য যুদ্ধ-প্রবর্তী" স্বর্ধক যে প্রবন্ধ মহাশয় গান্ধী লিখিয়াছিলেন তা সম্ভ্রতি সাধারণ প্রকাশ পেতে। 'তার নিয়মিত সাধারণ সলককে একটি কর্তব্যের ইঙ্গিত দেবে। যুদ্ধ বহই চলবে, ততই অগ্রবর্তের অভাব বেড়ে চলবে। ধনী ব্যক্তিরা ধন খাত অপব্যব করেন এবং অধ্যাক্ষিক খাত গ্রহণ করেন। তাদের সমস্ত হোতে হবে। 'আহা'র সমস্ত চ্যাপটি, ভাল, বি, হুপ, শাকশক্তি ও কলম প্রভৃতি প্রস্তুতি খাত একসাথে গ্রহণ করা আশায্য। ধার্য প্রকৃতি প্রোতিন গ্রহণ করেন উভয় ভাল খাবার দরকার নেই। মনোরা বহি ভাল ও জেল ব্যবহার বন্ধ করতে পারেন, জব্বা যারা প্রাণীক প্রোতিন পান না এমন গরিবরা কিছু প্রোতিন প্রোতিন পান। আর বঙ্গদেশ না হলে বৈধি থেকে খেলার আশ্রয়। বঙ্গা শাক্তীর সালগেরে ও ইউজি ৮ আউল শাকশক্তি কাহ করা। এক বঙ্গা ধার্য শাকশক্তি ও চ্যাপটি, আর এক বঙ্গা যারা শাকশক্তি ও হুপশক্তি লিনিয় ব্যবহার করা যেতে পারে। মিত্র সম্পূর্ণ বর্ধন করে ব্যবহার করতে হবে গুড ও চিনি। টাইট কাফস মনো প্রচার পরিমাণে ব্যবহার করে পরিষের কাছে তা দুখাপ্য করে তোলে—অন্তর্য তাদেরই বৈধি দরকার। এ প্রচার পরিষের উচিত বিধি এ হাজার চাই খাত-স্বয়ং বিকৃতার অত্যধিক লাভের লোভ পরিত্যাগ করা। 'তার গণীকদের খাতের বন্ধক এ ধার্য না লক্ষ্যে লোকান গুণ হবে। কলীয়া প্রাণাণীকদের খাত সঙ্কট করবার এবং

হিন্দুস্থান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

— লিমিটেড —

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস :

৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

— শাখা সমূহ —

বদরগঞ্জ, কাটোয়া, ভবানীপুর,
বরগড়া (উজ্জিনা), চক্রবর্তীপুর,
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এস, এন, রায়চৌধুরী

জানেন কি ?

বুখা কাগজ মষ্ট না করে “শ্লেট”
ব্যবহার করলে যুদ্ধ ও বাঙ্গলার
কুটীর-শিল্পকে সাহায্য করা হয়।

ভারত শ্লেট কোং

সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স :

কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট

জেনারেল অর্ডার মাধ্যম

১৯৯, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা

— জাতীয় কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত —

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :

৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রিট,
কলিকাতা

— শাখা সমূহ —

ঢাকা, কাপিল্পড়া,
শিলিগুড়ি, শান্তিপুর, বাঙ্গী, রাঙ্গাবাহী,
বগুড়া, কুমিল্লাপুর, তারকেশ্বর,
রাণাঘাট ও
বড়বাঙ্গার

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী

ফোন :

ক্যালক্যাটা—৬১১



মহাত্মা গান্ধী



জওহরলাল

যাত শব্দের চাষে উৎসাহ দেবে ; কলা আলু প্রভৃতি সহযোগে পূর্ণ
জিনে বরকারের সময় প্রধান খাজ হতে পারে।

অর্থের অভাব খুব বেশী। কাজের অভাব হলেই টাকার অভাব।
বহাতিয়ার কাজ সব চেয়ে সহজসাধ্য এবং সহজসাধ্য। যে কোন
বাইট পাওয়া থাক না কেন তা করতে হবে।

ব্রহ্মসভার জন্ম মিলগুলির উপর নির্ভর করলে চলবে না।
প্রত্যেক স্থানীয় অভাব নেই, মিলগুলিতে সমস্ত ব্যবসায় হতে পারে
না। স্বাধীনকে বর করার উদ্দেশ্যে জাতির স্তূত কাটার প্রত নিতে
হবে ও লাভের সোভ ত্যাগ করতে হবে বেছাংসোভিতভাবে। এখন
চলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। তবুই চেষ্টা করা খুব
সহজ।

সবচেয়ে যদি এক খুটা স্তূত কাটেন তা হলে নিশ্চল
গাঁওগুলি আবার সঙ্গ হয়ে উঠবে। পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদের
মধ্যে কাজ আরম্ভ করুন। এই হোজো শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক
কাজ।

কাজে আত্ম বিশ্বাস ও রাজস্বর্ণা কি কার্যে সহযোগিতা
করেন ?

স্বাভাৱ্য দ্বিতীয় নগরীতে চার গুণ মুক্ত্যুৎসাহ

বৃদ্ধি

। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার গড়ে ৪৭০ জনের বেশী
লোক মরেনি কখনও। তার আগাম্যাব এবার মরতে ১১৬৭ জন।
এটা আগের থেকে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত ৪,৩৭৭টি মৃতের সংস্কার
করা হয়েছে। ১৬ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে তারও
হয়সংখ্যা ১১৩৮। গত ছই মাসে হাসপাতালগুলিতে মোট
১,০০০ অনশন-দীর্ঘতের মৃত্যু হয়েছে ; পুষ্টির অভাবজনিত

ব্যতিক্রম এই মৃত্যু। ১৬ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে সে
সপ্তাহে কলকাতার হাসপাতালে ১১৯ জনের অনশনে প্রাণ
গেছে। এরা এর সঙ্গে কর্ণারেশনের সাগুহীত রাজপথে পড়ে
থাকা ৪২৭টি শব যোগ করলে গড়ায় ১১৩৮। ৩০ লক্ষ লোকের
মধ্যে কলকাতায় যদি সপ্তাহে ১১৩৮ জন মরে তবে সমগ্র বাংলার
কি অবস্থা তা অল্পমের। সমগ্র বাংলার অশ্রুপূর্ণ কমপক্ষে প্রতি
সপ্তাহে ১১০০০ লোক মরণপথে বারী। সোনার বাংলার
এর চেয়ে ভয়াবহ চিত্র আর কি হতে পারে। অশ্রুত আমেরী
সাথেই পার্লামেন্টে বসেছেন বাংলা দেশের সাংসাদিক মৃত্যুসংখ্যা
১০০০ কি তার কিছু বেশী।

সব চেয়ে বেশী মাহিনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশী বেতনভুক্ত লোকদের যে
তালিকা বানান হয়েছে তাতে দেখা যায়, কিন্ডারকারাই এ
বিষয়ে অগ্রবর্তী। ৮৫ হাজার ডলারের বেশী বেতন সেখানে
অনেক তারকাই পেয়ে থাকেন। জিনেট ম্যাকডোনাল্ড, বাৎসরিক
৩ লক্ষ ডলার বেতন পেরিয়েছেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির মত
এত অল্পবর্তী বেতন আর কোন দেশেই নাই।

মস্কোতে ত্রিশকোটি সন্মেলন

সম্মিলিত ভাবে সঙ্গ্রাম চালানোর জন্ত পর্বশব্দের মধ্যে বেশ-
বন্ধ ও তদুপায়ী কার্য পরিচালনা করার প্রয়োজনে ব্রুটিন
আমেরিকা ও কিশোর যৈরী আন্তর্বিদ্বিৎ কংগ্রেস জন্ত, অংশক
যদি কিছু থাকে তা দূর করার জন্ত এই অদ্ভুতপূর্ণ সন্মেলনকে
মিরগঙ্গ সাগরে আহ্বান করত। ১১শে অক্টোবর এই সন্মেলন
সকল হয়েছে। মিঃ এটলি ইডেন ও কর্টেল হাল রাইন-বোর্টস-

১৯৬০]

যোগে মহাশেষে অবতরণের দু'ঘণ্টার মধ্যেই কলি অবস্ট হইল। রাষ্ট্রবিভাগের ও পররাষ্ট্রবিভাগের বহু কর্মচারী সম্মেলনে সাধারণ করতেন। মসিবে সন্ধ্যাত্ত নভাশ্রম আসান অমলত করতেন। আমোচ্যাব প্রদান বিষয় সামগ্রিক অর্থাৎ second front এর প্রসার। যুক্তোত্তরকালীন সম্মেলন বর্তমান যোগ। শতক্রে পরাশ্রম করবার ভিত্তি বিন্যস্তিত বর্তমান বর্তমান বিন্যস্তিত পদ্ধতি আশ্রিত হইবে বলে সকলে আশা করেন। পরশ্রমের সহযোগিতাই এখন পদ্ধতি-নিপাতের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এই তাঁরই লক্ষ্য: রাজনৈতিক—সামাজিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেমন বড়ো হয়ে উঠবে, সামগ্রিক প্রয়োজনে তা আবার ছোট হইবে, কারণ সামগ্রিক উদ্দেশ্য নকশাই এক। এই সামগ্রিক উদ্দেশ্যেই প্রধান কাজ। বলা বাহুল্য, সম্মেলনের সামগ্রিক তথ্যগুলি অপ্রকাশিত রাখা হবে।

ভারতের নৃতন বড়লোক

লর্ড ওরালেস ১৫ই অক্টোবর কলকাতা পৌঁছান। ভাইকটিউ ওরালেসের বড়লোকত্ব শব্দ প্রথমে আমবাং কানে সন্ধান সন্ধান জানাই। তিনি ভারতের লর্ড কি প্রকৃতি করেন তা কিছু বলবেন না, কিন্তু তাঁর hand bag এ তিনি অনেক কিছু এনেছেন এবং ভারতের প্রতি প্রীতি হচ্ছে তাঁর প্রথম কথা। সম্রাট তিনি কলকাতার সাধারণভাবে হারক গবিনের মত নিকট বাহাদুর রূপ দেখতে এসেছেন। তাঁর এ সম্রাটের সকলই প্রত্যাহাতি করবেন। আশা করি, কলি দৃষ্টে তাঁর দৃষ্টি বিপাকিত হবে এবং অনশন থেকে বাহাদুর তথা ভারতের বিচারাণে তিনি আশ্রিত হবেন।

মসিবে রোম। রোম।

জাখান নিউজ একদমের যোগ্যতা প্রকাশ, প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ও ইংরেজের বিখ্যাত মনোবি রোম। রোমের ১৫ বৎসর বয়সে বংশীশাখার কোনদীপ নিরীক্ষিত হয়েছে। শান্তির অঙ্গ তাঁর অসীম প্রীতি ও ভারতের সঙ্গে তাঁর যে অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তির সাক্ষ্য ছিল তা দেখ করে আবার গভীর শোক প্রকাশ করি ও বর্ণিত আশ্রিত কল্যাণ কামনা করি।

রোম। বিশেষ বিদ্যাক্রমিক ও আধুনিক জগতের অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোবীর প্রিভিয়ার পাণ্ডিত্য দিশা দিশা এ প্রাচ্য চিন্তাবাদীর অঙ্গুর মিশ্রণ ঘটিয়ে। তিনি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদে বিরুদ্ধ ছিলেন। কোনব্যাপী কার্যের মধ্যে তিনি স্যারিগিরিয়ার। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে পণ্ডিত মহাশয়ের অঙ্গ একে পাঁচবার লজ্জা তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, সাননা করতেন। ঔপত্যিক, পার্শ্বিক, ঐতিহাসিক ও সঙ্গীত রোম। রোমের বংশীশিবে মৃত্যু বড়ই পোকাব।

১৩৬৬ সালের ২১শে আগস্টের রাতেই সহরে এই মহা-মানবের অঙ্গ হইল। তিনি লাহোর দিশা পান। ১৩৫৫ সালে জর্জ অক্সিয়ারের উপাধি পেয়ে ৫ বৎসর অধ্যাপনা করেন। পরে ১ বৎসর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। মহানুভব মেজাজের এক আদর্শনিয়োগ করেন

এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ স্থাপনের লক্ষ্য বত্সরাখান ১৩১৩ সাল হতে তিনি ব্রিটান্যল্যাণ্ডে বসবাস করেন।

১৩১৩ সাল সাহিত্যিক জীবনের হৃদয়ান্ত ৫৪ সঙ্গীত সমালোচনার তিনি বিখ্যাত সঙ্গীত-নাট্যকর্মের জীবনী রচনা করতেন। বহু নাটকে তিনি অঙ্গুর স্বজনী প্রতিভার পণ্ডিত দিয়ে



মসিবে রোম। রোম।

তার বিশ্বাস ছিল, মহাশয়ের ঔষে ম্যোনের অঙ্গই শিল্প এবং সাহিত্য এই উচ্চতর তাঁর জীবনের অঙ্গিলিষ্ঠ ছিল।

উপজাতি রুমায় তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। মাল আবার মধ্যযুগের জাতিগত ও জীবন দর্শনে তাঁকে আশ্রয়িত্য ঘটিত এনে দিয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'জন ক্রিস্টোফার' ও জাতির অঙ্গিলিষ্ঠ হয়েছে এবং ১৯১৫ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়ে কিন্তু তাঁর উপজাতি সাধারণ উপজাতি নয়। এক তত্ত্ব যা সঙ্গীতবিদ্যের জীবনের অঙ্গবিশ্ব এবং সমসাময়িক জুয়ার আশ্রয় সঙ্গ তাঁর জীবনাবশেষ সম্বন্ধে তিনি এতে নিমুণভাষ্য একে জিষ্ঠাধর অঙ্গলয়ে তাঁর জীবনের শাখকতা লাভ করেছিল নতুন দুই নিয়ে।

রোম। বরীক্রনাথ ও মহাশ্য গাখীক অস্ত্রত্ব অঙ্গ করতেন তিনি মহাশয়ের একটি জীবনী লিখেছেন; রামকৃত ও বরেন্দ মনোবীর জীবনী তাঁর লেখায় অঙ্গর হয়ে আছে। এই সব রোম। তিনি প্রাচ্য ও প্রাচ্যেভার সহযোগিতার অঙ্গলয়ে মধ্যযুগ করতেন। সম্রাট এমন খবর পাওয়া গেছে যাতে তাঁর স্বা মনোব জুল প্রমাণিত হতেও পারে। মসিবে সে সন্ধাননা সঙ্গ বিশ্বব্যাপ আদর্শনিয়োগ করবে—ভগবানের কাজ কামনা করি, যোগে বৃত্তাস্থাবা যেন গুল বঙ্গই প্রমাণিত হতে পারে।

অর্থাভাব মূল সমস্যা নহে

বাংলার হৃতিকশিল্পীদের অঙ্গ অর্থব্যাহায্য চেয়ে ভারত সচিব লর্ডের লর্ড মেয়ের ও ভারতীয় হাই কমিশনার যে আবেদন করেন তাতে বলা হয়েছে অর্থাভাব মূল সমস্যা নয়। অঙ্গত প্রাচ্য বাংলার অঙ্গ সব বরম সাহায্যই চেয়েছেন, কিন্তু প্রত্যমূল্য যে বরম বৃত্তি পেয়েছে তাতে অঙ্গমসমতা অঙ্গমসমতা কাছে যে অনেকসময় লক্ষ্য এ কথাটা তাঁরা কি করে বললেন ?

এ সঙ্গে আরও হুইন বিশিষ্ট কলেজগমনতার উপদেশ যোগ করলে যোগ্যতা পণ্ডিত আরও সহজবোধ্য হবে। পণ্ডিত অঙ্গহকাল্য বললেন—অঙ্গই পণ্ডিমাণ ব্যাভ্রত্ব মজুর বাধার পর প্রত্যেক প্রাচ্যের অঙ্গিলিষ্ঠ হুইন। ক্রম করবার জিষ্ঠিষ্ণ হই। যুগের বিজিত লজ্জা সেই প্রত্যেক বর বেগে বিস্তে হবে। প্রত্যেক লাহাদুরা লাভবান না হয়, সে লজ্জা প্রাচ্যে অঙ্গিলিষ্ঠ উৎসাহ হয় ও বরতঙ্গীতে যুগের জিষ্ঠিযের মূল্য বেগে দেওয়া বরকার। এই বর বীরা থাকবে হয় মাস বা এক ফল হতে আগামী ফলস প্রায়। ক্রমিক অঙ্গবোধে সঙ্গি হয় গার্লমেন্টের পক্ষে অঙ্গতমিক মালবিলয়, ব্যাপারিদের মাল জমা করায় ও বর চালালে বিল্য়সায়ে।

জাঃ ব্যাভ্রত্বপ্রসাদের প্রস্তাব এইরূপ—(১) যত বেশী সম্ভব পণ্ডিত হুইন (২) জমির উৎপাদন সম্ভা বৃত্তি করার প্রো (৩) গাটে পরিষ্কৃত গান বা অঙ্গ শ্রম বণন (৪) কলেজিগনের অঙ্গব

সহিবা ও জিষ্ঠির হেল ব্যবহার (৫) ব্যাভ্রত্বের অঙ্গর নাকিরা (৬) ক্রমকর উৎস্রুত মাত্র ব্যাভ্রত্ব বিজিত (৭) চুরি ভাঙাতি বঙ্গ করার লজ্জা সেরা বর দর্শন (৮) কাপড়ের লজ্জা চরকার পুতাকারী ও নিম্ন জুটিতে তুল্য জমান (৯) ব্যাপারিগণ যেন অঙ্গিলিষ্ঠ লাভের আশায় বিজিত বঙ্গ না করেন।

কৌশলসাধারণ শীর্ষ মাথা গিলি বেসনকার্ভের ব্যবস্থা হবে কি। মধ্যযুগ ও প্রাচ্যে যাই এই উদ্দেশ্যগুলি যেন চলা যায় তা হলে অঙ্গবোধ নিজেই হবে। যে কপটতা অঙ্গবোধ উদ্ভূত করতে পারি, তাতে আর কোন সম্ভেই নেই।

বেলনার মধ্যে বিজয়া

এবারকার বিজয়া এক অঙ্গত ব্যাধার মধ্যে অঙ্গিলিষ্ঠ হয়েছে। এমন আর দেখা যাইনি আগে। ব্রাক্স আউটের লজ্জা সন্ধান পূর্ণে অঙ্গিকার প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণ হয়, বাত ও আঙ্গিলিষ্ঠের কোন বাহুল্য ছিল না। হৃতিকশিল্পি আবেদনের সত্যতা যেন নিয়ে পূজা-কর্তৃপক্ষ উৎস্রুত অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের সোয়া উৎসর্গ করতেন। জনতার মধ্যে উৎসাহ ছিল না। বেলনা ও বাবার কেরবার লজ্জা হেলমেয়েদের লৌকিক্য করেন। প্রীতি সন্তানদের উজ্জিস্ত আনন্দের দরজা লজ্জা ছিল। আনন্দময়ী এবার হলে অঙ্গবোধে নিরানন্দ জীবন দেখে গেলেন।

জাপি হানার মরমুম

অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের তিনটি স্থানে জাপি বিমান হানা দেয়। কোনটিতেই সামগ্রিক ক্ষতি হয়নি, কিন্তু অঙ্গময়িক লোকজন

নিরাপদে ব্যাঙ্কিং কার্যের জন্ম—

নর্দাণ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[স্থাপিত—১৯২৯]

হেড অফিস—৫ ও ৬ হোয়াস্ট্রিট, কলিকাতা।
ভারতের সকল প্রধান প্রধান কেন্দ্রে শাখা আছে।

জীবন বীমা করুন—

ইণ্ডিয়া এমিকেল

প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ

(স্থাপিত—১৯৩১)

হেড অফিস—৫ ও ৬ হোয়াস্ট্রিট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

মিঃ এ. রায় চৌধুরী।

দি

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অফ ট্রিপুরা

—লিমিটেড—

পূষ্ঠপোষক :

ত্রিপুরেশ্বর ত্রীশ্রীযুত মহারাজা মানিক্য বাহাদুর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মহারাজা কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবশর্মা

চীফ অফিস হেড অফিস কলিকাতা অফিস
আগরতলা গঙ্গাসাগর ১১, ক্রাইড রো,

বাংলা ও আসামের বাণিজ্যকেন্দ্রে অপারার
অফিস লক্ষ্য

ও ঘর-বাড়ী কিছু কিছু হতাত্যত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রাচ্যে মাজুলি ও সিংহলে বোম্বা নিশ্চিহ্ন হয়। তার পর টাইগের বিজ-মত আকাশ-মুখ হয় এবং পালাবার সময় বেগমাবাদ বোম্বা ফেরার ক্ষত অসামরিক লোকজন হতাত্যত হয়। এবারি ক্ষতির মধ্যে বোম্বা পড়ার সব মাহ ভূমিত উৎক্লিষ্ট হয়। দক্ষাতি কল্পবাক্যের বোম্বা পড়িতে। সব ক্ষেত্রেই ক্ষতির পরিমাণ যৎসামান্য, কিন্তু আতঙ্ক দূর করতে হলে জাপানিগের বাংলাবেশের শাশ থেকে হঠাৎ নিতে হবে। জেনারেল তোকোবো বলেন, যুদ্ধ চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হতে চলিতে। আমরা লর্ড মাউন্টবাটেনের সাহায্য কামনা করি তাঁর আগর বহা-অভিযানে।

আমেরিকায় চীনা বহিষ্কার আইন প্রত্যাহার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনাশিল্পকে নাগরিকের অবিকার দেওয়ার ক্ষত আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলেন, এতে আমরা একটা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করতে পারব আর জাপানি-গের বৈষম্যমূলক প্রচারকাণ্ড বন্ধ করতে পারব। চীনের অবিকার লাভে ভাববর্ত্তি আনিশিত হলেই কিন্তু ভারতীয় নাগরিকরা বহিষ্কার

বহিষ্কার থাকবে সেই অবিকার থেকে তারা আমেরিকার অর্থ-সমিদ্ধা পূর্ণভাবে উপশক্তি করতে সক্ষম হবে না।

ভাষ্যগীর বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা

যর্ধন ইতালী জাতির পিঠে গুলু থাকতের মত ছুরি প্র-তখন তার দষ্ট দেখে কেউ রাগনা করতে পারেনি যে, এর মুসোলিনির ইতালী পুনঃ পুনঃ শতাব্ধির পর অবশেষে বালোক-দেখতে মিত্রপক্ষের সহযোগী হাট্ট হিরাবের যুদ্ধ করতে ছিলে বিরুদ্ধে। মুসোলিনি অবশ্য হিটলার প্রভুর দখায় বেড়ে থেকে কিন্তু তাঁর তৈরী ইতালী আজ গুলু ছাই হয়ে গেছে। ইহা জনগণ তাদের দাবী বুঝতে। মিত্রপক্ষের পাশাপাশি বিভিন্ন য-সকল বিশিষ্ট মূলীভূত কারণ নাহী ভাষ্যগীর বিরুদ্ধে গরম যুদ্ধ চালাবে। ইতালীর রাশা বাহা "ইথিওপিয়ায় সার্ট" "আলবেনিয়ায় রাজা" মন। শতাব্দিক সর্বশ্রেণীর ইতালী-জাহাজ (৬টি ব্যালিস্টিক ও ৬টি ক্রুজার সমেত) মিত্রপক্ষের ল-এসে লৌহচে। যুদ্ধ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল।



খোলা-চিঠি (কাব্যগ্রন্থ) সমর সেন

(এক পয়সার একটি গ্রন্থমালা) কবিতা-ভবন, ২২২, বাগবাজার এলিনি। মূল্য ৫০ পয়সা আনা।

আধুনিক কবিসমাজে সমর সেনের বিশিষ্ট স্থান আছে। যার অবনত গজ-চিহ্নাগুলি আধুনিক কবির সম্পন্ন বলসেলে যুদ্ধ চালাবে। সমর বাবুর শ্বহ শৌন্দর্য্য দৃষ্টি, সমত ভাবার ঠাসু সমত ও বিশ্ব-শক্তি নির্ভরতারের মৌলিকতা বহিঃকল্প-বীভূত। সমর বাবুর কবিতা আমার ব্যবহারই ভালো লাগে—গজ-চিহ্নার বিরুদ্ধে বহু সেনের তীর আগুতি পাঠা সবও একমাত্র কল্পকাব্য—বৈষম্য ও অব্যবহার্যের গজ-চিহ্নার পর সমর সেনের তীরক-গজ-বহু উজ্জ্বল গজ-চিহ্নাগুলি দ্বীপে বৈদিত্যে, অসামান্য প্র-তি-জালা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সঙ্গীতের নিম্নে য-বস করে নিচ্ছে। তবে তাঁর নব-সম্প্রদায়িত কাব্যগ্রন্থ "খোলা-চিঠি" শব্দ বিশেষ উৎসাহিত হ'লে পারবুম না—এ কথা বলতে বাধ্য হব, কাব্য সমর বাবুর কাব্যে একটা বিশিষ্ট পরিণতির প্রাণা বেগ-বিস্তারিত থেকে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে মনে হ'ল সমর বাবু হঠাৎ মনে কালোর গতিপথের সামান্যতম থেকে গেলেন। কালোর বার্ষিকিত পটভূমিকায় কবি ক্রমাগত যাবির জীবনের কলসী বাই আত্মার ছবি একে চলছেন, সে ছবিগুলি দেখা, গ ও কলসী সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করছে পরিণতির অংশকা বাণে। শিল্পি বিশ্বাসের ছেঁড়া ছেঁড়া কালি দিয়ে সমর সেনের কাব্যকালো পূর্ণাঙ্গের অনি-স্বাভাব্য—বর্ণনাকালের মেঘ-ভাঙলোর মতই ক-গাছটারে বহন করে মার। শেষ পর্যন্ত বর্ণন-পন্থাই বের যায়।

(৬) সীমাত্তের অরণ্যে স্বাক্ষরের মুখে তুমি রামনার শিখনে তার শ্রদ্ধা কামান। নদীতে দেহেতে বান, পাখিরা গারনা গান, একে একে লুপ্ত দেশ নারকীয় স্বর্গকার, তবুও আলোর চুপকল্পর এদিকে ওদিকে বাড়ে, ফুলে, ফাটতে, উৎকর্ষায় নতুন জীবনের ছাপ আমাবশে চেনার পথে। [আত্মীয় সঙ্কট—(১৬)]

যে বহিঃ-সম্ভারত বীভূতকলে ভারতীয় জীবন নিম্নেপিত হয়ে চলছে তারি স্বাধীন বৈক্যময় প্রতিধ্বনি "খোলা-চিঠি"র হয়ে ছলে ফুটিয়ে তোলা স্বপ্নও—সমর বাবুর স্বকীয় গজাধৃতিক দৃষ্টি-ভাবী ধরণ কবিতাগুলি রসোচী শিল্পার পথদ্বারে উন্মত্ত হ'লে পারেনি। পটভূমিকা, বিষয়বস্ত, আর্থিক প্রত্যক ও রীতি-পদ্ধতির একপায়ে পূর্ণাঙ্গের কবি তাই আলো বিখ্যাত। সমর সেনের কবি-জীবনের বহুপাঠে যে প্রতিক্রিয়াশক্তি আধুনিক কবি স্রষ্টারবে অভিব্যবহারে বস ছুটিয়েছিল, সে শক্তির ক্রমবিকাশ বেন অর্ধ পথেই থেকে গেল।

"খোলা-চিঠিতে" ("নানা কথাতে"-ও) বেটী আমার সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—সেটি সমর সেনের সাম্প্রতিক কল্প-পরিবর্তন। এ বাবু সমর বাবু বাট্ট গদ্য কবিতা লিখতেন কিন্তু বর্ত্তমান "খোলা-চিঠি"র অবিকার কবিতার মধ্যে কবির হাতেরা অন্তর্ক-মানস-সম্ভারত বিতঙ্ক পথদ্বারের পথত মায়ে ডেকে উঠে বিচ্ছে।

লেখক :—(১) (অষ্টাদশশতাব্দীর পুত্রের পায়ের) জানি জানি, আমার রক্তের ছন্দে আলো বাজে জ্ঞানির হমনী, আমাকে ডাকে অদম্যে সহস্রাব্দে গোনে প্রাণ দেবে লাবণে লাবণ—

(২) (সোভাশক্ত্য রক্তি) (সোভাশক্তি) একা গাছে কাল পর্ণা বিচ্ছেদে গাছেরে লালো (ইতিহাস) (৩) (চতুর্দশশতাব্দীর পুত্রের বিচ্ছেদ পায়ের) এই ভাবে লুপ্ত হবে আধুনিক জন

আজ ২২২২ জন। "খোলা-চিঠি"—কবিতারটির আলাপোড়ায় ছন্দে বীণা, মাকে মায়ে পূর্ব সাম্যের গজের পূর্ব পাঠা যায়। সে ক্ষতে মনে হ'লেই সমর বাবুর মনে পূর্ব গীরে গীরে শতর শতরিক্ষেপে ছন্দ-বাক্যের দিকেই মারা পড় সবচেয়ে—এটা আমার মতে বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। ছবি (উপশ্লিষ্ট) "মেঘদূত" পূর্ব-শিল্পিটি ডিগাটমেট, কথা গেস। ১, অধুর্দ মির বোড, কালীঘাট। মূল্য—গাণিতিক।

গ্রায়—
"জনসম্পদ"

ব্যাংক ক্যাঙ্কাটা লিঃ

ফোন :
ক্যালা—২৪৭

—হেড অফিস—

৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখা সমূহ

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নীলফামারী, পুরী, মেদিনীপুর, জামালপুর (মুন্সের), শান্তিপুর, বালেশ্বর, আনন্দপুর, কৃষ্ণনগর, বালীচক ও বোলপুর।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

(১) সাক্ষিত চোখের কোণে কালি অন্বে, মনে গমেটি বেগে যুক্তভূত বাহিরে বিজির সন্ধান—

সত্যার বনিতো তবু আমার ফলেরে মোনা বলো ; [সোভাশক্তি—(১)]

(২) একা গাছে কালপর্ণা বিচ্ছেদে গাছেরে লালো আলোকের মধ্যপথে বলে ভাবি মেঘেরা চল যেন বিরাট বাহুড়—জানামলে ত্বর্নয় যাবার জানি না স্বস্ত্রহীন রক্তে কি করুণাথায়।

দান থেকে কান্তে হাতে কৃদায় হাতুড়ী মালে কামাখ্যালে, সবুজ আঙন বলে অনেক মাঠে। [ইতিহাস—(২)]

‘সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলক ১২২ পৃষ্ঠার আলোচ্য উপভাষাধিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার সন্নিবিষ্ট ও প্রবণাঠ। লেখক নবীন কি প্রবীর জানি না, তবে একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা চলে যে তিনি মাকীর দৃষ্টিভঙ্গী আশিষ সাহায্য নিয়ে আমাদের বর্তমান সামাজিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে প্রথমস্তিক্তে চিন্তা করেছেন এবং সে চিন্তা তাঁর বর্তমান উপভাষার নায়ক নায়িকার মূখ্য বিষয়ে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর সভ্যতার ভীতাকল থেকে মুক্তি পাবার জন্য গঠনাত্মক-চলিতব্যবস্থার পর থেকে। যেনে যেনে যে আন্তর্জাতিক আন্দোলন অনিবার্য বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে, সে আন্দোলনের দুর্বীর ভয়ঙ্করতা ভাবিতব্যের অলোচনাতমের পার্ণাণ-প্রাচীর শতশা বিকীরিত করেছে। বঙ্গদেশীল প্রাচীন-বর্তমানের ‘গেল’ ‘গেল’ চাঁৎকার তাই নিম্নলিখিত অধ্যায়-বোলেই নামাস্তব।

বর্তমানে আধুনিক লেখক সমস্যারের রচনা তাই প্রগতিশীল হতে বাধ্য। প্রতিভার অভাব হয়তো অনেক লেখাই টিবে না, তবু বলবো—যে ভাবেই লিখিত হোক না কেন প্রগতিশীল রচনা মাত্রই আধুনিক সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। আল তাই খ্যাত অধ্যাত যে কোনো নিত্যক প্রগতিশীল লেখককেই স্বাগতম জানাবো, অজ্ঞানত করবো তাঁর মূল্যবান আশির্কাকর। হয়তো লেখক ‘মেম্বুত’কও তাই সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগতম জানাচ্ছি। পরিশেষে মুদ্রণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের সতর্কতা হ’তে অজ্ঞানত জানাচ্ছি। উপভাষাধিনি অধিকাংশ পৃষ্ঠাই মুদ্রণ-প্রমাণে পূর্ণ। একমাত্র মুদ্রণ-প্রমাণ ছাড়া উপভাষাধিনি লেখকের সার্থক রচনা এক পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করবে বলেই মনে করি।

কালো হরক (কোব্যগ্রন্থ)—অমল ঘোষ

কবিতা-ভবন, ২২ ঠান্ডাঘাটী এডেনিউ। মূল্য চার আনা।

(এক পদ্যের একটি প্রথমাল)

আধুনিক কবিসমাজে অমল ঘোষ সম্পূর্ণ নবগণিত বললেও চলে। এই নবীন লেখকের রচনার মঙ্গ কাব্য-রসিকের পঠিত্যে ঘুরে কম, তবু প্রথম কাব্যগ্রন্থেই কবি খ্যাতি অর্জন পূর্ব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটে। ‘কালো হরক’—এক পদ্যের একটি প্রথমালার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। ছোট বোলে পঠ্যার বৈশাখিনিত লেখকের কবিত্বকল্পি রসিক-সমাজে স্বীকৃত হ’বে একথা জোর করে বলতে পারি। বিশ্বকর শব্দ-সমৃদ্ধিতে, প্রণয়নীয় ছন্দোদৈনুগো, বিষয় নির্ধারণের মৌলিকত্বে—‘কালো হরক’ প্রত্যেকটি রচিতা রচয়িতার। সমাজের আশঙ্কা লাগে তথাকথিত উদ্বোধনগামী অতি আধুনিকতার মূগেও এই শুক্ল কবির মাথা ঘরাণ হতনি। ‘কালো হরক’ের কবিতাগুলি ঐতিহ্যবিশ্বাসে উজ্জল। অবত লেখকের মন প্রাণকিপ্তী দার্শনিক চিন্তাধারার বসিত। তাই কন্যে পাই প্রথম কবিতা ‘হোলে’ সাক্ষ্যবৃত্তির ব্যাকুলতা—

এ বাত আশিম ওয়া বাণে
এ বুকে ভয়ের শিখা কাপে
ঢালো প্রাণ উজ্জল তাপে

অলে যাক অতীতের কায়। [চোত্র (১)]

তিনমুখ শিল্পী-আত্মার বোমাটিক আত্ম-ভাষণ ‘চোত্র’, ‘প্রাক-পুরুষ’, ‘আত্মিক’, ‘জৈবপাতা’—এই কবিতা চতুষ্টয়ের মধ্যে

বহুবর্ণ ভাষার বর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে, চিত্রময় প্রবীণ—চিতার অভিজ্ঞতা সার্থক রচনা। চিত্রময়ভাষা কবিতাগুলি এতই সুন্দর যে সেও অস্ত, ছন্দে, গড়ে প্রায় অবিচলিত বর্ণনাই চোত্রের সামনে ভেসে ওঠে তবে একটা বিষয়ে লেখকের দুর্বলতা সম্বন্ধে এখন থেকেই সজ্ঞ হওয়া উচিত—সেই হল: রচনার ঠাসবৃন্দানি। একই মনে একই বসন হয়ে পড়েছে—বর্ণনাগুলি যেন একই জটিলত পুরস্কারের দিকে ‘বুকে’ পড়েছে—অবশ্য এ অভিমোগ ব্যর্থ কবিতার বিশুদ্ধেই ঘাটে—লেখাগুলি আর একটু প্রাঞ্জল হ’লে সর্বাঙ্গসম্পন্ন হ’ত। ‘কালো হরক’ থেকে কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ লোভ সামলাতে পারবো না।

- (১) সে মুহুর্তে মৌরী ছবি, দেবি ছায়া, সে অনন্ত সিঁ দি,
প্রনীল-মুগ্ধ বাণে অর্ধচুপ্ত সে হবল গিবি,
সেই আলো, সেই মন, তুমার-গলিত নিম্ন-কিট,
নিম্নল উপলব্ধেও সঙ্গীতীনা বিষল-হাবি,
প্রান্ত সম্মা খব থব মন্বব বিশুদ্ধ মেষ কোণে...

[প্রাক-পুরুষ (১)]

‘দুসারাবা পদ্যতে রেণে রামহর একে পূর্ণ
পশ্চিম হ’তে আশংকো মূগে অমণ-প্রান্ত ঘূর্ণে
বসনা করেছিল যে সে এই জাতিক উদ্ভাবকে,
তখন বলনি সে আমার কি না,
তবু মুহুর্তে তবুত বীণা
তুলেছিল অর বিরাগ বিধুর বারো সিদ্ধ
অলেছিল তার সিঁ দিতে...’

[জাতিক (১)]

প্রত্যেকটি কবিতা থেকেই কিছু কিছু উদ্ভূতি দিয়ে এই রচনায় লেখকের অনবত মৌলিকবোধের পঠিত্যে বিত্তে পারত্ব মী স্থানভাষে বিশদ আলোচনা সম্ভব হ’ল না। ‘মাকদসা’, ‘বীজ’, ‘নীল পানি’, ‘আশি’, ‘বাতহপূর্ব’—সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টি-কল্পি লেখা অনবত প্রবীণ কবিতা—যা’কে বলে গাট সিটি-সিটি





সর্বোচ্চ মানব সম্পদ

সর্বোচ্চ মানব সম্পদ
সর্বোচ্চ মানব সম্পদ
সর্বোচ্চ মানব সম্পদ

আমন ফসল ও বর্তমান সমস্যা

দেখতে দেখতে বাংলাদেশের পঞ্চমাংশ লোক ধ্বংস হয়ে গেল, কা'র পাগে স্বয়ং বিধাতা পুরুষই জ্বাণেন! যারা এখনো দলে দলে অঝোলা জ্বন্তর মতো মরে যাচ্ছে তাদের বিচারনোর কি ব্যবস্থা সরকার ও দেশের মাতঙ্গদেরা করছেন এখন সেই বিগয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। যে রহস্তজনক ভাবে বাঙালীর প্রাণশক্তি ধন চাল দেশের বুক থেকে গত বৎসর অদৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে রহস্ত উদ্ঘাটন সম্বন্ধে বড় বড় হোমিয়ার গোমরা স্বদেশী বিদেশী নানা মুন্সী নানা কথা বলেছেন—কিছু রহস্ত রহস্তই রয়ে গেছে—আজো সে সম্বন্ধে কোন বাস্তব তদন্ত হয়েছে বলে জানা যায়নি অথচ প্রলয়ঙ্করী বজার মত লোক দলে দলে আজো মৃত্যুবরণ করছে এবং আরো কতকাল করবে জানি না। অতএব “গতস্ত শোচনা নাশ্চি মৃতস্ত মরণং যথা।”

বর্তমানে বাংলায় আমন ফসলের ধান উঠতে আরম্ভ হয়েছে। নতুন চালিও কিছু কিছু বাজারে দেখা দিয়েছে, দামও কমেছে এবং আরো কমবে বলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। এটা শুভলক্ষণ। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এম বলেছেন, এবারে বাংলা দেশে যে আমন

ফসল জন্মেছে তার পরিমাণ এক কোটি টনের কম হবে না। এ ফসল বাজারে এলে বাংলার খাদ্য সমস্যার সমাধান হতে পারে।” মোট কথা অজান্তে বছরের তুলনায় এবার আমন ফসল ভালই হয়েছে—এ খবর লোক মারফৎ নানা জায়গা থেকেই শোনা যাচ্ছে। তাহ'লেও এ ফসল বাজারে এলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'বার সময় এখনো আসেনি। আগলে আমন ফসল থেকে যে ধান ও চাল পাওয়া যাবে, তা যথাযথভাবে কাজে লাগাবার সুব্যবস্থার ওপোরাই সব কিছু নির্ভর করছে। আশার কথা সরকার এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন।

নতুন ফসল সম্বন্ধে বাংলা গবর্নমেন্ট কি নীতি অবলম্বন করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্তে যে নেতৃ সম্মিলন আহ্বান করা হয়েছিল, তাতে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন যে, গবর্নমেন্ট যেন বাজারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্ত কিনতে অগ্রসর না হ'ন। বর্তমানে ধান চালের দাম স্বাভাবিক গতিতে নামছে। ব্যবসার স্বাভাবিক গতি, ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। এ অবস্থায় সরকার পক্ষীয় একেট সরাসরি বাজারে নামলে এ স্বাভাবিক গতি বাধা পাবে। খাদ্যশক্তির অবাধ সরবরাহ সূচিত হ'বে এবং মূল্যও

হুতাং বেড়ে যাবে। সেজন্ত এখন প্রত্যক্ষভাবে বাজারে না মেনে ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ দ্বারা পুনঃ প্রবর্তিত হ'বার সুযোগ দেওয়া উচিত। তারপর লোকের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জগুচিত্ত হ'লে, তখন গরবমেন্ট নিজের দরকার মত খাজ শক্ত অনার্যাসেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। দেশের জনমত ও এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে এবং ব্যাঙ্কর থেকে মারে থাকবার জন্তে গরবমেন্টকে ব্যার ব্যার অসহ্যে করেছে। অতএব বিপুল সরকারী চাকির বাজারে একেবারে পাঠাতে থাকলে বিপুল শ্রী-ফল ফলবে। গরবমেন্টের মূল্য নিক্কির করা রয়েছে, ফোকো বাত অতিরিক্ত মজুর না করে, তাঁর ব্যবসায় রয়েছে, এখন বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুযোগ স্থাপন করে বাটতি অফলে সরকারিহর অস্বাভাবিক করলেই চলতে পারে এবং তাহ'লেই আপাততঃ যথেষ্ট।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—

রুশ রণাঙ্গনেই এখন যুদ্ধ চলছে, তবে আপাততঃ দেখলে মনে হয় যুদ্ধের গতিতে যেন কিছুটা শৈথিল্য এসেছে। সামনে শীত, সেজন্তে ইউরোপের যুদ্ধগতি হ্রাস হওয়া ভাব্যিক। রুশিয়ার কয়েকটি ছোট ছোট জেত জেতে জার্মানি অংশত আশের তৃপ্ত্যায় উঠেই বেড়েছে বলেই বর পাওয়া যাচ্ছে। কিয়েভের চতুর্দিকে মোস্তিয়েট সেনাপতি ভাটুনিদের সৈন্যেরা ক্রতবেগে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে সেখানে একটা ক্ষীতি দেখা দেয়, যা'কে বলে “কিয়েভ বালুজ্”। সেখানে জার্মান সেনাপতি ফন্ ম্যান্টিন প্রতি-আক্রমণ করেন। সে আক্রমণ ব্যরোদিন চলছে। মোট ত্রিশ মাইল জুড়ে এ আক্রমণের ক্ষেত্র, ছয়দিন পরে গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন জিতোমির তাঁর পুনরাধিকৃত হয়। জিতোমির মাত্র ছয়দিন লালফৌজের হাতে ছিল। তারপরেও লাল-ফৌজকে পিছু হটতে হয়েছে। জিতোমিরের উত্তরে দশ মাইল দূরে চেরনিয়াভক অঞ্চলে তারা এখন হটে এসেছে আর পূর্বদিকেও ২৪ মাইল দূরে ক্রসিলভ অঞ্চলে তারা এসে দাঁড়িয়েছে। কিয়েভ থেকে ক্রসিলভ প্রায় ৪০ মাইলের মধ্যে। সেজন্ত “কিয়েভ” সম্পূর্ণরূপে

বিপন্ন হয়েছিল। তবে লালফৌজের কথা এই, দেড়লক সৈন্য, বহু ট্যাঙ্ক, বিমান, ও কামানের ও আক্রমণ তারা এ অঞ্চলে আটকে তাঁরা এক দক্ষিণাঞ্চলে অগ্রসর হচ্ছে। দক্ষিণে চারকান্ধির বাতা নীপার নদী অতিক্রম করেছে এবং আরো নী নিকোপোলের জার্মানি যুদ্ধও তেল করেছে। রুশ রুশ সৈন্য বিপুল শক্তিতে উত্তরে কিয়েভ ও গোয়েম মধ্যে উত্তর নীপার ও প্রিপেট নদীর মাঝখানে বিস্তারিত ভূমিতে অগ্রসর হয়েছে এবং জার্মান সৈন্যদের বিজয় করে গোমেল পরিবেষ্টনীতে পালাবিনের ১৫ মাইল মধ্যে পৌঁছেছে। এই অঞ্চলে ২০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের পরিবেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বার্লিনে আর-এ-এফ বিমান বহরের হানা—

ব্রিটিশ বিমান সচিবের দর থেকে ঘোষণা হয়েছে গত ২৬শে নভেম্বর রাত্রিতে ব্রিটিশ শক্তিশালী বোম্বার্ক বিমান বহর জার্মানিতে হানা দে ও বার্লিন বোম্বার্ক নিকোঁক হয়েছে। নিজপক্ষীয় বোম্বার্ক বিমান বহরের অধিনায়ক এয়ার চীফ মার্শাল জার্মানি হারিস বলেছেন যে গত আটদিনে বার্লিনের ওপর যেটাই ছয় হাজার টেনের বেশী অতি-দৈর্ঘ্যকারক ও প্রজ্জ্বালক বোমা বর্ষিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন—“অল্প ব্যবসৃত কোনো বোম্বার্ক বিমান যুদ্ধ শুরুর করার জন্ত উৎকৃষ্টতার আর কিছু করতে পারে না। সম্ভ্রমে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সে সাফল্য অর্জিত জন্ত ৪ বছরেরও বেশীকাল আমাদের বোম্বার্ক বিমান বহর চেষ্টা করেছিল।” সংবাদে প্রকাশ এই আক্রমণে ফলে বার্লিনের ২৫ থেকে ৩০ ভাগ ধ্বংস হয়েছে।

ইতালীর যুদ্ধ—

ইতালীতে উত্তরণক প্রায় ধমকে আছে—জার্মানি যুদ্ধ এখনো অক্ষত। নিজপক্ষ এওঁর বটে কিংবা সাধনামে। জেনারেল মটোগোমারির বাহিনী এ সাংগ্রেদো নদী পার হ'বার চেষ্টা করবে। তা'দের সাং প্রাকৃতিক বাধা নাকি দুর্বল—পর্তু ও নদী, জার্মানিগণা নাকি সূত্র রক্ষা ব্যবস্থায় সে অঞ্চল

দুর্বল করে তুলেছে। এম আর্থিরও সেই কথা একটু একটু করে অগ্রসর হ'চ্ছে বটে তবে বাধা বড় কঠিন। এদিকে শীত বাধা সবই আবার আছে। তবু তারা অগ্রসর চেষ্টা করেছে।

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধ—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থ নিজপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা নিউ গিনির স্ট্রাটেলবার্গ হস্তগত করেছে। মার্কিন নৌসচিব কর্বেল ফ্রাঙ্ক নগ্ন বর্ণনোক্ত গিলবার্ট দ্বীপবিশ্বের সময় মার্কিন বাহিনীর পরিচালক রিবার জেনারেল নৌযুদ্ধ চলছে। সম্ভ্রতি নিজপক্ষীয় বিমানবহর এই সর্বপ্রথম ফরমোজা দ্বীপে হানা দিয়েছে। ব্রঙ্ক সীমান্তে ছোট বাট সংঘর্ষও হ'চ্ছে।

ফার্সি নেতা স্তার অসোয়াল্ড মোসলির মুক্তি—

ফার্সিষ্টপন্থী নেতা স্তার অসোয়াল্ড মোসলি সম্ভ্রতি ইরানে মুক্তিলাভ করেছেন। স্তার মোসলির মুক্তি সর্বম কর্তে গিয়ে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হার্স্টাট ঘোষণা বলেছেন, “আমাদের ভাষ্যে যে উন্নতির লক্ষ্য দেখা দিয়েছে, তা'তে বৃটিশ ফার্সিষ্ট সমিতির কতিপয় হৃতপূর্ণ সভাকে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় সৃষ্টি না হ'বে ও এই কারণে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হ'য়েছে যে বর্তমান অবস্থায় তাঁদের—আটক রাখার আর কোন

প্রয়োজন নেই।” এরপর ডাঃ পি হুর্বার্ডওন প্রশ্ন করেছেন; স্তার অসোয়াল্ড মোসলির মত ফার্সিষ্টপন্থীর মুক্তি দেওয়া যদি সম্ভব হয় তবে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ যে সকল ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফার্সিষ্ট বিরোধী বলে নিজস্বের ঘোষণা করেছেন এবং আজ ভারতবর্ষের এই চরমতম চরমদিনে তাদের সেবা ও সাহায্য-লাভ এখন দেশবাসীর একান্ত প্রয়োজন। তাঁদের মুক্তিতে কি আপত্তি থাকতে পারে?” এর কোনো সম্ভ্রত মিলবে না একথা ধরে নেওয়া চলে? উপরন্তু পেশোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ, সীমান্তের কয়েকজন কংগ্রেসী এম-এল-এ-কে মুক্তাশ্রমলা পর্যন্ত বন্দী রাখবার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীমত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়, ভারত সচিব মিঃ আমেরী, বড়লাট বাহাদুর ও মহাত্মা গান্ধীর কাছে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার সমাধান করে তিনবানি মুক্তিপূর্ণ চিঠি লিখেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি বলেছেন অহর ভবিষ্যতে আমাদের ভারতীয় সর্বদেশীয় প্রতিনিধিরা যা'তে সমান মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থায় সাম্রাজ্য সম্মেলনে কথা বিশ্বাস্তি সভায় যোগ দিতে পারেন তার জন্ত কেন্দ্রীয় গরবমেন্টকে এক্ষণ কর্তব্য ও মর্যাদা দিতে হ'বে যেন জগতের কাছে ভারত সত্ত্বর গুণিবিশেষ স্বায়ত্ত শাসন লাভ করেন। সেজন্ত গরবমেন্টের উচিত অবিলম্বে আমাদের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করা।

সকল প্রকার সাহিত্যের পাঠকদের

বুক ষ্ট্যাণ্ড

—অভ্যর্থনা করিবেন—

১১১এ, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

পুরানো বটগাছটির বাঁধান চাতালে যে মাছটি দিনরাত বসে থাকে তার নাম কেউ জানেন না। অন্ধকার করা গাছের তলাটি—বৃষ্টির ঝুরি নেমে এসেচে এখান ওখান থেকে। তারি মধ্যে তার সিংহাসন।

হেজ আমি পথ দিয়ে যাই—রোজই তাকে দেখি এক মনে কি ভাবচে। সে পথে কতো পথিক চলে যায়, সে কারো দিকে চায় না, আপন মনে থাকে—কেবল ভাবে। কখন কখনীল আকাশে তার উদাস দৃষ্টি। নীরব ছুপুরে হঠাৎ উড়ে-আসা পাখিয়ার ডাকে তার শ্রবণ স্পন্দ হতে হতে নিশিয়ে যায় দূরে। কখন তার এপাশ ওপাশ থেকে বায়ুভরে শুকন পাতা পাক খেতে থাকে। মধ্যাহ্নে রাত্রি কাব ফেলে ধাঁওয়া বটের ফল। আমার মনে হয় বড়ো কবিরের ভিতর দিয়ে ভেসে চলে যায় তার জীবনতত্ত্ব।

একদিন কাছে যাছি, লালরাস্তার প্রান্তে দেখলুম তাকে, সে চলেচে সেই বটতলায়। জীব পাঠ্যবীরিণী গায়ে বহুদিনের তেলের ছাপ লাগা, ছেঁড়া মুতির ফুটো দিয়ে তার মগন পোয়াছে। ককথায় তাকে শুধলেম—কেণ্ডো কে তুমি? সে আমার দিকে চোক না তুলেই একটু চুপ করে বললে—আমি আকালিক, অকালের লোক। গতমত খেয়ে আমি গরে পড়লুম।

আবার একদিন পথে যেতে যেতে দেখি সে বটতলায় বসে একটা মেলোমাথা কুরুরকে কী ধাওয়াচ্ছে। সারমেয়ের সঙ্গীতের অসীম পরিতৃপ্তি একমনে চেয়ে দেখছিল শুধু সে। তারপর দেখি তার নিঃসঙ্গ প্রান্তরের মধ্যে আর একট প্রাণি ঐ কুরুরটি। সময় পেলেই সে তার কাছে এসে ভিলে মাটিতে মুখ ভুঁজে থিয়ামে। স্তব্ধতা হাওয়া টপটপ ধকধকলের শব্দ দিয়ে যায়, সে ক্রন্দনপূর্ণ করেন। নিরীকার সে ঐ চাতালের মাছটিই নত। ছুঁচনার তারি ভাব।

দিন যায়, কি করে সে খায় কেউ জানে না। পৃথিবী একই রকম, রূপ বদলায়না একটুও। আজও যেমন

অন্ধাণ্ড চকিত করে উঠেচে উষার শিশিরাহার কালও তাই, তার পরেও তাই। সেই রকম একই একথেকে ভাবে গড়িয়ে চলেছিল জীবন। বটগায়ে মাছটি রয়ে গেলা একই রকম, রয়ে গেলা বট প্রাণের সাথীটিও সেইরকম হুলা মাথা। সেই অন্ধা ডালপালায় মধ্যে অসংখ্য পানী ডাকা, জমাগত কাগ উপদ্রব, সেই চৈত্রদিনের হোল্‌ল হাওয়ায় ঘুম অলসে অস্থানী ভাবনা, আর সেই অনন্ত বিস্তৃত আকাশ সীমা।

একদিন ফেরার পথে রাত হয়ে গেলা। অচান আর কুরুরের হাওয়ায় মনটা গুন্‌গুন্‌ করছি চকিতে বটগাছটি দেখেই থেমে গেলুম। বটগায়ে পন্থেই অন্ধকার ভেদ করেচে রূ একটা পল্লব আলোরেখা। চারিদিকের নিঃশব্দতা ভুত পেয়ে একটা একা ঝিঁঝিঁ থেকে থেকে। মনে হয় চার মেন অশুভ শূন্য, মেন লোকটি নেই, মেন কুরুরটি ঠিক চিরচেনার বিচ্ছেদ বদনয়। কষ্ট হোল, কিন্তু মন হোল না কাছে যাই।

তারপর দিনও একটু বিলম্ব হোল। দূর থেকে দেখলুম সেই কুরুরিনা মা বুড়ো বট, তার প্রকাণ্ড কায় ছপায়ে অঁকা স্বর্গাস্তের লাল ছবি। মুক্ত চোখে ঐ রইলুম বিনাস্তের দিকে। গোখুরির রঙীন ছায়া পড়ে আমার অঙ্গে—আনমনে এগিয়ে গেলুম। হঠাৎ মনে গেল বড়ো ধ্বংসের বিদ্যাদকরণ এক ঘর। সেখান আকালিক। একমনে চলচে সে। পিছনে নেই ক্রন্দন, সমুদ্রেতে খোলাটে দৃষ্টি। প্রাণের কলস বীণীর স্বরে ব্যক্ত করে চলেচে সে সাগরসিঁথীর দিয়ে যে দিকে ছুঁই ছুঁই হয়ে গিয়ে পশ্চিমার হারিয়ে ফেলেচে ধরণীকে। যেখানে মূসর রবি মৌহিত সিক্তে ডুব দিলো সেইখানেই জমেচে পানি তালপাছ। নীচে আঁধার ঘনিয়ে এলা—তার বন্যীধরকে আর দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলুম তালপাছের গোড়ায় সে যেন বসল। লাল আঁধার

গায়ে স্পষ্ট দেখলুম তার কাল ছায়া। বোধ হয় সে কোনো একটু বিশ্রাম কোরল, তারপর বীণীতে হুঁ দিতে দিতে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলা কোন নিরুদ্দেশের দেশে জানিনা। নিমেষে আমার প্রাণের তির্য্যটি ঘুরে এলা। মনে হল এরকম ত কোনদিন হয়নি।

তার পর দিন ভোরেই হঠাৎ মনে হোল তাইতো! বেলো না গভীরেই পথব্য পথে নেমে পড়লুম। সেদিন সেই বটগাছ—চুপটি করে নিশ্বাস ফেলচে। এ জানে সব, দেখেও সব, কিন্তু মুখে নেই রা। ও চিরকালই সাম্যাতিক রকমের বোবা। নম্বর করে দেখলুম চাতাল মুখ, সত্যিই শূন্য। এতদিন পরে এই তার প্রশ্ন বিজ্ঞতা। এগুলোম আজকে সাহস করে।

কেউ তো নেই। অথচ মনে হচ্ছে এখানে যেন সারা আছে—যেন ছাট অন্তরঙ্গ প্রাণ ক্রিয়ের বসে আছে এ চারিভিত্ত অনন্তকাল, কত যুগযুগান্ত হতে। এ দেখি হিসের কবর। শিউরে উঠলুম। এ যে মৃত্যুর হিমশীতল নির্ধর। পরম পথের একান্তে এ কী অপূর্ণ নির্দেশ। যদি পেল—বিষাদের হাসি। অকস্মাৎ অনর্গল কায়ারীন

কতকগুলো ভাবনা আমার মানসগগনে দুর্ঘোপের সমারোহ আনলে। ক্রান্তি মণ্ডিকে বসলুম সেই চাতালের শূন্য সিংহাসনে। হস্তবুদ্ধি মনে আবার ক্রফান এলা তৃষ্ণির ভরসে। দম্কা বাতাস ডালপালা চলিয়ে দিয়ে যায় দিল আমার সে সখিত। আজীবনের দৈন্তকে উপেক্ষা করে যে মাহুস অতৃপ্ত ক্রফান ছটকট করে আঘাত খেতে খেতে একদিন থেমে যাবে সেই তো আকালিক! লোকে তাকে না বুঝলেও সে সলককে যে বোকে। তাই চলে যাবার আগে সেই চেনাবটের গায়ে সে রেখে গেচে একটু চিহ্ন :—

রচিয়াছি এ সমাদি সিক্ত কবি' প্রেমরস দিয়া,
হারায়েছি চিরকাল, তাই চির গিয়েছি চিয়া।
জানিনা কোথায় পথ, কে কোথায় টানিছে আমার,
নিখিলের শেষপ্রান্তে যাব চাঁপ' মৃদু মৃদু পায়।
শুধু মনে রবে, তিতি চির অশ্রুধারা ভলে,
রেখে গেছ যাঁহা হাঁপ পঞ্চমীত তলে।
যে অন্যহত একদিন এসেছিল এই গায়েরই কোলে,
সে আজ কারো নিমন্ত্রণ রাখলে না। যেতে যে তাকে
হবেই, অকালের ঝরাফুল সে যে।

আনন্দ

[আরি ভ্রুঞ্জয়ের Bonheur কবিতার অনুবাদ।]

অনুগমিত

একটা মোমাছি আঁটকে গেল তোমার তীতের হস্তায়,
সে হস্তার ফুলে যে মধুর মতো রক্তিম;
সমস্ত আকাশে শুধু একটা বনোহর মেঘ;
নিঠের বৃষ্টি; ভিলে ছায়া। আনন্দিত হও।
পথ পদ্ধ্যাক্ত, চাকার দাগ পড়ীর হয়;
সে সব পথ যেখানে গেল সে পৃথিবীতে কি আসে যায়!
গত কাল নিয়ে আনন্দিত হও আর
আগামী কাল গয়ছে হও নিশ্চিত;
তোমার স্বর্গীয় স্বরভিত শরীরে
প্রিয় হবার অনিবার্য শক্তি কি নেই?



ভবিষ্যৎ

(উপন্যাস)

স্রীসৌন্দর্য মোহন খুখোপাধ্যায়

৩

পানের কোন্ বাড়ীতে রেডিয়ার জাগিল গানের
লহরী...রবীন্দ্রনাথের গান...

আগের ছুটে, চানতে হবে রসি
ঘরের কোণে বইলি কোথায় বসি?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে

ঠাই করে ছুঁ নেমে কোণোমমতে!

গান শুনিয়া আদিত্য উঠিয়া বলিল। মনের মধ্যে
যে-স্বন্দকার জমিয়াছিল, সে-স্বন্দকারে যেন একটু আলোর
রেখা ফুটিল!

গানের কথা যেন তাকে ইঙ্গিত করিয়াই বলিতেছে,
ঘরের কোণে কেন? ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়া পড়িয়া...
মুহুর পাখির সোণানে যদি জাহ্নবীর সামনে ভিড়
জমািয়া তোলে, আদিত্যর উচিত, সে ভিড়ের মধ্যে
গিয়া ঝাঁপিয়া পড়া!...

এ চিন্তার সঙ্গে আরো অনেক চিন্তা বুকের উপরে
মাঠে ফুট করিয়া দিল।...

হঠাৎ চিন্তার স্বরে ছিঁড়িয়া আবার রেডিয়ার
ঐ গান—

রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ?

গাইছে না মন মরণজয়ী গান?

আকাঙ্ক্ষা তোমার বন্ধাবেশের মতো

ছুটেছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?

আদিত্যর মাথার মধ্যে রক্ত নাচিয়া উঠিল। প্রেরণার
কি বাণী ও গানে! 'আকাঙ্ক্ষা তোমার বন্ধাবেশের মতো
ছুটেছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?' নিঃসঙ্গ জীবনের পৃষ্ঠা-
গুলার পানে আদিত্য চাহিয়া দেখিল—যে পৃষ্ঠাগুলো শেষ

হইয়া গিয়াছে। সে ক পৃষ্ঠায় শুধু বিধা ভয় মশরু-
কৈরাস্ত আর বাধা! ভবিষ্যতের পৃষ্ঠাগুলো—আলো
যেন আলো হইয়া আছে। ভাবিল, অতীতের পাত
চাহিয়া থাকে তারা, যাদের দেহে-মনে প্রাণের শব্দ
পানিয়া গিয়াছে...যারা মরিয়াছে। আদিত্য মনে মনে
তার দেহে-মনে প্রাণের বন্ধাবেশ...ভবিষ্যতেই
লক্ষ্য!

নিখাস ফেলিয়া আদিত্য উঠিল।...পানের ঘর।
থাকেন ম্যানেজার উমেশ বাবু...বয়স পঞ্চাশের
কোঠায় উঠিয়াছে। মাফেট অফিসে কাজ করে
সাহিত্যের দ্বার আগে দাঁড়িয়ে ন। কির
শাত-আট বাস হইল দ্বিতীয় পক অবলম্বন করিয়া
কাজেই এত বয়সের দ্বিতীয়-পক মনোর
মনোরঞ্জনর জন্ত বাঙলা সাহিত্যের ব্যবসারীতে
নামিতে হইয়াছে। এও এ কাজে আদিত্য
সহায়। দ্বিতীয়-পক আদিত্যর লেখার ভ্রমারক
করে। বলে, অত বড় লেখকের সঙ্গে থাকো, এ
আধু লেখবার চেষ্টা করো না কেন? বলে, এ
একবার নিমন্ত্রণ করে আনো না আমাদে
পাড়গারী।...

মনোমার গল্প লিখিতেও শুরু করিয়াছে।—
উমেশ বাবুকে আনিয়া আদিত্যকে দেখাইতে
দেখিয়া আদিত্য কাটকট করিয়া দেয়। আদিত্যর
মনোমার ভক্তি-শ্রদ্ধার গীতা নাই! কাজেই আদিত্য
উমেশবাবু বাতির করেন। তবে দেশের বাড়ীতে
করিয়া লইয়া যাইতে য় ন কেনম কৃত্যায় ভরিয়া
মনে হয়, কি জানি...

কিন্তু সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই!

[১০০]

অক্লি হইতে ফিরিয়া উমেশ বাবু বিছানায় শুইয়া
পড়িয়াছেন। পানের জানলা খোলা। বাহিরে আকাশ
বোঁ যাইতেছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় আলো-করা
দ্বার...উমেশ বাবু শুইয়া আকাশের পানে চাহিয়া-
ছিলেন। মনোরমার কথা ভাবিতেছিলেন। কাল
দিবার...অফিসের ছুটি হইলে আর বাসায় ফিরিবেন
না...সোজা যাইবেন টেনে...মনোরমার কতকগুলো
দরমশ আছে...সেই সব জিনিষপত্র কিনিয়া...

হঠাৎ বয়সভঙ্গ! আদিত্য আনিয়া ডাকিল,—উমেশ
বাবু...

উমেশ বাবু একটা নিখাস ফেলিলেন। বলিলেন—
বাতি!

আদিত্য বলিল—হ্যাঁ। আলো জ্বালেন নি যে।

উমেশ বাবু বলিলেন,—শরীরটা কেমন ভালো নেই,
ভাই।

—ও—তা আলো জ্বালো না?

—জ্বালো।

হুট চটিয়া আলো জ্বালিয়া আদিত্য আনিয়া
বলিল উমেশ বাবু তজ্ঞাপ্রাণের প্রান্তে। উমেশ বাবু
হাত-পা ঝটাইয়া লইলেন।

আদিত্য কহিল—আমার একটু ইয়ে হয়েছে। মানে—

উমেশ বাবু বলিলেন—মাথা ধরছে না কি?

—না, মাথা ধরা নয়! মানে, মেমস্তর এসেছে

দার্জিলিং থেকে। জানেন তো, দার্জিলিং...

উমেশ বাবু বিবাহের কথা জানেন। বলিলেন—

হ্যাঁ, তা...

আদিত্য বলিল—টাকা-কড়ি কিছু হাতে এসেছে।

জানেন তো, ও-জিনিষ আমার হাত থেকে কর্পূর মতো
চুপিতে উল যার! তাই ভাবছি, এ টাকা থাকতে-
থাকতে...অর্থাৎ এ নিমন্ত্রণ যদি না রাবি, তাহলে তারী
কমায় পড়তে হবে।

যৌন-কালে উমেশ বাবু এ সব সেটীমেন্টের দ্বার
খানেন নাই। প্রথম যখন বিবাহ হইয়াছিল, বয়স ছিল
তখন। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বন্ধ-চলিত যে সব
ধাধা সেকালের বর্ধমান ছিল, সেই ধারধার বর্শেই যেটুকু

রোমান্সের রেওয়াজ...অর্থাৎ ছবি-ওয়াল চিত্রের কাগজ,
লেজিগ পেরি, জল-ছবি, উল—এই সব কিনিয়া জীকে
দিয়া ভাবিতেন চুড়ান্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। স্ত্রীর যে
স্বতন্ত্র একটা মন আছে এবং সে-মনকে সাধনায় আয়ত্ত
করিতে হইবে...অথবা ঐ জ্যোৎস্না-রাত্রি, মূল, সিনেমা...
এ-সবের কল্পনাও মনে উদয় হয় নাই! এখন
এ-কালের দ্বিতীয়-পককে লইয়া বুঝিয়াছেন, যৌবনটা
কি ব্যর্থতার মধ্যে দিয়াই কাটিয়া গিয়াছে। চাকরি এবং
টাকা-কড়ির দিকেই ছিল বোঁকা। সহজ-লভ্য বলিয়া
জীকে মনের দিক দিয়া কখনো অহুশিলন করেন নাই।
এখন বুঝিয়াছেন, জীজাতির রূপ-লাবণ্যের অন্তরালে যে
মনমানি নিহিত, সে-মনের সঙ্গে পৃথিবীর রাজ্যধর্মের
তুলনা হয় না। তাই নভেলিষ্ট-হিসাবে নয়, আদিত্যর
উপর তাঁর মন্যতা একটু বেশী তার কারণ তিনি ভাবেন,
আদিত্যর কল্যাণেই তিনি এ-বংশে তদবী পত্নীর
চিত্র-রহস্ত সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিবেন! তার
ফলে...

আদিত্যর কথায় তাই তিনি বলিলেন—নিমন্ত্রণ কার
কাজ থেকে? ভারী খবর-শাতকীর? না, হার মাজেই
স্বয়ং নিমন্ত্রণ করেছেন?

আদিত্য বলিল—জাহ্নবী সেরী নিমন্ত্রণ করেছেন।

উমেশ বাবু বলিলেন—তাহলে ইতস্ততঃ করছো
কেন তাই? আজই ছুটি ষ্টট করো—টাকা তো হাতে
মজুত।

ছোট একটা নিখাস ফেলিয়া আদিত্য বলিল,—
তা আছে। কিন্তু এখানেই ইয়ে হয়েছে।

সেখানেই উমেশ বাবু বলিলেন,—আরে, টাকা যখন
হাতে ভায়া, তখন আবার ইয়ে কিসের?

আদিত্য বলিল—মানে, সেখানে একটু ঠাইলে
থাকতে হবে। জুজিলি সানটোরিয়মে আমি থাকবো
না। আমি চাই গিয়ে একটা হোটেল থাকবো। এখন
হোটেলের যে বরজ ওরি মধ্যে একটু শতা হবে, অথচ
আসাবাবপত্রগুলো নেহাৎ বাজে না হয়।

উমেশ বাবু বলিলেন—তা বেশ তো, এর জ্ঞত এত
চিন্তা কিসের?

আদিত্য বলিল,—আছে হুস্তিহা। জানেন তো সব, উমেশদা। আপনার কাছে আমার দুকাছাপা কিছু নেই। কিন্তুবলীতে কতকগুলো বই কিনেছি। এখানে খণ্ড-বাড়ীতে ইচ্ছা রাখতে কাপড়ে-চোপড়ে একটু ব্যয়ও হচ্ছে। তার উপর এটা-সোটা কিনে উপহার দেওয়া... মাঝে মাঝে সিনেমার যাওয়া। বোম্বেন তো উমেশদা, একালে এ-বদ ন হলে মেয়েদের কাছে এমন, বৌদি এখানে নেই, তাই! থাকলে হস্তায় এক দিনও তাঁকে সিনেমায় নিয়ে যেতে হতো!

উমেশ বাবুর মনের মধ্যে আনন্দের তরঙ্গ ছলিয়া উঠিল। মনোরমা তাকে বলিয়াছে, একবার একটা ছুটিতে তাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া সিনেমা থিয়েটার দেখাইবার কথা...

উমেশ বাবু বলিলেন,—নিশ্চয়!...তা...

কথটা শেষ না করিয়া সগর্র দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন আদিত্যকে পানে।

আদিত্য বলিল—তার উপর দাক্ষিণিঙে ওয়া নিশ্চয় একটু ঠাইলে বাস করছেন। চিঠিতে লিখেছেন, সব ব্যারিষ্টার বন্ধরা বাড়ীতে আসা-যাওয়া করছে...তাদের সামনে এমন দরিদ্র লোকের বেশ গিয়ে ঠাড়াতে তারা যদি হাসে, জাহ্নবী দেবী লজ্জা পেতে পারেন।

গম্ভীর কণ্ঠে উমেশ বাবু বলিলেন—জাতে ব্যারিষ্টার! তাদের বেজায় সাহেলী চাল উনতে পাই!

আদিত্য বলিল—তাই এককণ বসে বসে ভাবছিলাম, কি ব্যবস্থা করা যায়। অমৃত: একটা বিসিতি হাট! মানে, ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করার জন্ত রাখা উচিত। তার উপর বরচপজ আছে। তা...মেসের চাক্স আমার প্রায় তিন মাসের বাকী পড়েছে...তার উপর বাক্যের কিছু নেনা...পেরেছি তেজো মেটে চারশো চল্লিশ টাকা। যাবার সময় ট্রেনে না-হয় বুপটি মেরে বার্ড ক্লাশে গেলুম। কিন্তু ফেরবার সময় সকলে যদি ঠেশনে শী-অ করত আসেন? বার্জে বা ইট্টারে চড়া বানো না...সেকও ক্লাশ টিকিট কিনতে হবে! সে খড় সামান্য খরচ হবে না। তার উপর সাত দিনও যদি থাকি, সাত দিনের হোটেল-খরচ...আমোদ-প্রমোদ,—

এ-সবে যার নাম, চারশো চল্লিশ টাকা ফটকড়াই... উভে যাবে উমেশদা!

কথা শেষ করিয়া নিরুপায় অসহায়ের ভাষা আদিত্য চাহিল উমেশ বাবুর পানে।

উমেশ বাবু চিরদিন চাকরিই করিতেছেন। সে আর কসেপেগেণ্ডা ষাটিয়া তাঁর নিন কাটে। লাইফের সঙ্গে প্রত্যন্ত পরিচয় নাই। বাঙালী সময়ে ছু'চারিটা ঠাইলে, মজার মেয়েদের হামি-কথার জী-কটিং-কখনো স্বাপুটা মারিয়া সে উয়া গিয়াছে—স্বাপটায় যেটুকু তাঁর উপলব্ধি, সে উপলব্ধিই নির্ভর করিয়া উমেশ বাবু শুধু বলিলেন,—হ!

তার পর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন...অনেক আদিত্যর প্রশ্ন-ভরা হু চোখের দৃষ্টি উমেশ বাবুর নিম্ন, যেন সমস্তর সাধনান বুঝিয়া আসুক! উ বাবুর গম্ভীর মুখে সমাধানের সন্ধান মিলিল না, এ আদিত্য কথা কহিল। বলিল,—সাপনি যদি এখি করেন...মানে, মেসের টাকার জন্ত তাগিদ না যে অর্থব্য দাক্ষিণিঙে গিয়ে আমি প্রশ্নর-সঙ্গেই থাকাবো না উমেশ দা—ওখানে বসে বড় এক উপভাস্য লিখে ফেলবো...সাতশো আটশো প... উপভাস্য...ওতিন পাটে। দাক্ষিণিঙের মোশাল গিয়ে। ও-জিনিষ আমার কাছে নুন্ন। কিনে সে-উপভাস্যের কপি-রাইট বদি বেচেতে হয়, সে বেচে মেসের বেনা সব স্ক্রায়র করে মেবো। বাকী পরে পরিশোধ করবো। তার কারণ, খোঁসার ওঁজে বাস করছি...আশ্রয়, সে আশ্রয়কে নিবিয় দি রাখা সব-আগে কর্তব্য!

উমেশ বাবু চট করিয়া একবার জবাব পাবলেন না। একথার তাঁর মনের মধ্যে নান জোটে পাকাইয়া উঠিল। সকলের টাকার মেসের চল...কাহারো টাকা বাকী থাকিলে কত দিকেও পড়ে, মেসের মানেজারী করিয়া তিনি তাহা নরো বোঝেন। বাকী-বকেয়ার জন্ত কাহা-কও তিনি তা অব্যাহতি দেন না। শুধু এই আদিত্য...আদিত্য এ আছে অনেক দিন। ছ'এক মাস সে টাকা দিতে

নাই, এমন ঘটনা বহুবার ঘটয়াছে। বই লেখে বলিয়া সকলে তার দায় কোনো মতে সামলাইয়া লইতেছে... চিরদিন। উমেশ বাবু ইদানীং নিজের পকেট হইতে তার জন্ত গরুও কিছু দিয়াছেন। এ গরুটা দিয়াছেন গু'সাহিত্যের বাতির নেয়, জিতীয়-পক্ষ অলক্ষ্যে আছে আদিত্যের সহায়, তাই। কিন্তু তা বলিয়া ছ তিন মাসের টাকা বাকী...এখনো ক'মাস বাকী পড়ে—আর পাঁচ মাস কি বলিবে?

আদিত্য বলিল—আপনি দয়া না করলে আমার দাক্ষিণিঙ যাওয়া হবে না উমেশদা! একটু দয়া করুন...নট ওয়াং বাটু টু ইয়ং হার্টস...

উমেশ বাবু বলিলেন—এক মাসের কুড়িটা টাকাও দিতে পারবে না আদিত্য? মানে...

আদিত্য বলিল—কুড়ি কেন, চল্লিশ টাকা দিতে পারি...কিন্তু সেখানে কোনো কারণে যদি অভাব ঘটে, গিয়েই হতো কেন্দে যাবে! জাহ্নবী দেবীর কথা মনে...বোম্বেন আসে! আপনার বয়স হয়েছে, সাংসারিক ভজ্জতা প্রচুর...জাহ্নবী দেবীর বাবা হলেন বড়-মামুয় লোক...ওঁদের মনে কি সেহ-মামুয়া আছে, না, বিবেক আছে? ওঁদের মন একবারে টাকা-পরসা দিয়ে গাঁথা... বাকী বলে মেটালাড়! তাছাড়া আমার সঙ্গে মেসের বিয়ে কি ওটা সাধে রাজী হয়েছেন? একটা মাজ মেয়ে...তার জেদ...যদি একটু ক্রটি পান...তাহলেই...কথার শোষণ বলা হইল না। আদিত্য উমেশ বাবুর হট্টা হাত চাপিয়া ধরিল।

উমেশ বাবুর বুকখানা ছলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—আজ, উমেশ যখন নেই! কিন্তু ওখানে বসে যা বললে, এ তিন ভদ্রমূলের উপভাস্যখানি লিখে ফেলো আদিত্য, না হলে আমি এরিকে সামলাতে পারবো না। বোঝো এটা আমার বলতে গেলে ছুটি সংসার...তোমার বৌদির জজই মাসে কম্‌সে-কম্‌ আমার বারো-চোদ্দ টাকা বাড়তি-খরচ পড়ে।

আদিত্য বলিল,—তা আর বুঝি না?...তালো কথা, এ মাসের 'কনকপ্রভা'র আমার ভালো একটা গল্প বেরিয়েছে। বৌদির জন্ত এক-কপি কনকপ্রভা আমি

এনেছি। আপনাকে বি...কালই সোটা বৌদিকে আপনি দিয়ে দেবেন বাড়ী গিয়ে। ভুলবেন না। পড়ে বৌদি খুব আশ্রিয়গিয়ে করবেন!

৪

শিলিঙড়িতে নামিয়া আদিত্য কিনিল সেকও ক্লাশের টিকিট; শিলিঙড়ি পর্যন্ত বার্ড ক্লাশে আসিয়াছে।

দাক্ষিণিঙ-সাইনের গাড়ীতে সেকও-ক্লাশ কামরায় বসিয়া মনে পড়িল অতীত কৈশোরের কথা। কালী-ঝোয়ার তার শৈশব কাটিয়াছে। বাপের ছিল শিলিঙড়িতে কাঠের কারবার। কারবারের বৌলতে অবস্থা ছিল ভালো। তার পর ঘটিল শিতার মৃত্যু। সে মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যে বড় ভাই বিজয় কি ময়-বলে যে কারবারকে চালাইয়া আদিত্যকে ছাটিয়া বাহির করিয়া দিয়া বলিল,—নিজের পথ দাখো...সে যেন স্বপ্ন!

সেদিন হইতে আদিত্য ভাগ্য-গঠনে নামিয়াছে। কোনোমতে কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হয়। টুইশনি করিয়া লেখাপড়া শেষে। আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে, এমন সময় বীণাপাণি হঠাৎ তাকে টানিয়া সাহিত্য-কাননে আনিয়া ফেলিলেন। সে গল্প আর নভেল লিখিতে শুরু করিল; এবং আজ এই সাহিত্যই তার একমাত্র নির্ভর।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। অঁকিয়া-বঁকিয়া পাহাড় ঘুরিয়া ট্রেন চলিয়াছে। লাইনের দুদিকে ঘন জঙ্গল...এ পাগলাঝোরা...মহানদী...কার্শিং ষ্টেশন...দূরে এ দেখা যায় কাকনজখা, কবর...জঙ্গর ভূঙ্গ শিবর। তার পর আদিত্যর কামনার তীর্থ দাক্ষিণিঙে।

প্লাটফর্মে নামিয়াযাত্রা হাজিচ্ছল ছুটি চোপের দৃষ্ট। জাহ্নবী আসিয়া বলিল,—কাল টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। ভাগ্যে টেলিগ্রাম করেছিলেন, না হলে...

না হইলে কি? আদিত্য চারিদিকে চাহিয়া দেখিল...জাহ্নবীর বাবা আসিয়াছেন না কি? মা? সঙ্গে সেই মুহূল ব্যারিষ্টার?

আদিত্য বলিল—আপনি একলা এসেছেন?

জাহ্নবী বলিল—কাকে আর সঙ্গে আনবো, বনুন? টেলিগ্রাম না করতেন যদি, তাহলে আশ আমাকে

এখানে প্ৰেতভণ্ড না! কালিম্পঙে চলে যেতুম। নেমস্তর।
মুহুর বাবুর কথা লিখেছিলাম না? মুহুর বাবুরা এখন
আছেন কালিম্পঙে। তাঁর ছোট বোন সীতার আঙ্গ
জন্ম-তিথি। তার নেমস্তর।

মুহুরের নামে আদিত্যর যে-বুক দশ হাত নামিয়া
গিয়াছিল, সে-বুক উঁচু হইয়া পড়িয়াছিল। মুহুর হাতে
আদিত্য বলিল—আমার সৌভাগ্য।

জাহ্নবী বলিল—আপনার লাগেজ?
আদিত্য বলিল—একটা স্ট্রটেকশন আর বেজি...
বাস!

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসছেন তো?
আদিত্য বলিল—আমি ঠিক হব? আপনারদের
বিরক্ত হব। আমি একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি
এখানকার হিল-ভিউ হোটেল...কামরার জন্ত। আমার
এক বন্ধু দাক্ষিণীয়ে এসে সেই হোটেল থাকেন। উঁরি
কাছে শুনে...বানে...

জাহ্নবী ভুরুটি-ভঙ্গী করিল, বলিল—আমাদের ওখানে
তাহলে থাকবেন না?

আদিত্য বলিল—আপনার গেষ্ট হয়ে থাকতে পারি।
কিন্তু আপনারদের বাড়ীতে আপনার বাবা হলেন হোট।
টীকে...ঐ...তার বয়েসেই সেখানে থাকবার কথা?

জাহ্নবী বলিল—বাবা-মা জানেন না আপনি আসছেন।
মুহুরবাবুরা চলে যেতে একলাটি আমার ভারী কাঁকা
কাঁকা লাগছিল, তাই কি মনে হলো, আপনাকে আসতে
লিখেছিলাম। ভাবিনি, আমার কথায় আপনি সত্যিই
আসবেন!

আদিত্যর মনের মধ্যে রামধনুর সাতটা রঙকেবারে
কলমল করিয়া উঠিল। নিসঙ্গতা মোচনের জন্ত
জাহ্নবী তাকে শ্রম করিয়াছে!

বিমুগ্ধ মনে আদিত্য চাহিয়া রহিল জাহ্নবীর পানে।
জাহ্নবী বলিল—আপনার ও-হোটেল কোন্ মহল্লায়?
আদিত্য বলিল—জগদাণীহাড়ে।

জাহ্নবী বলিল—ও...আমরা থাকি ক্যালকাটা
রোডে। দরীদ্রানাথের 'হরশা' গর পড়ছেন তো? সেই
যে যে-রাস্তায় নবাবজাদীর সঙ্গে দেখা?

মুহুর হাতে আদিত্য বলিল—নিশ্চয় মনে আছে। তারবে, পাড়াড থেকে নিশ্চয় পড়ে গেছি। আর
কালিকাটা রোড নামটা তাই থেকে মনে পৌঁছে আছে।
জাহ্নবী বলিল—তবু, ছুখানা রিক্স নিয়ে বেরিয়ে
পড়ি। আপনার হোটলে নেন আপনার সব গুহি...
গাছিয়ে দিয়ে তার পর বাড়ী যাবো।

আদিত্য বলিল—আপনার বাবামা সত্যি জানেন-কেন?
না, আমি আসছি?

—না। আমাদের ওখানে যদি এখন যেতে
তাহলে বলতুম, আপনার সঙ্গে ঠেঁসেই হঠাৎ যে
হলো। অর্থাৎ আমি যেন আপনাকে লিখিনি। আপনাকে
এখন এসেছেন!...তা আপনি যখন আমাদের ওয়াক্ষর
যাচ্ছেন না, তখন আর এরকম ভঁরের সারগ্রাহীকে
দেবো'খন। সন্ধ্যার আগে আপনি রিক্সের কা
আমাদের ওখানে যাবেন। যে-কোনো রিক্সওয়ালার
বললেই আমাদের বাড়ীতে আপনাকে সে পৌঁছে
দেবে।...আপনি গেলে আমিও তখন এমন ভাব দেখাবো
যেন আমি জানি না আপনি এসেছেন বা আসবেন।
বুঝলেন?

আদিত্য বলিল—কিন্তু আমি খুব ওয়েলকাম-
হবো কি?
জাহ্নবী করিয়া জাহ্নবী বলিল,—সাহিত্যিক
বুঝি...আপনার হাতে আমাকে গুঁরা দান করবেন
মাংস পরে, আর আপনাকে গুঁরা ওয়েলকাম করবেন
আদিত্য বলিল—তা বটে।

ছদ্মনে প্রান্তিকের বাহিরে আসিয়া ছুখানা
লইল; এবং রিক্স আসিয়া ধামিল হিল-ভিউ হোটেল
সামনে। ম্যানেজার আসিয়া, আদিত্যর
পাইয়াছে...আদিত্যর জন্ত কামরা ঠিক করে
ছদ্মনে আগিল নির্দিষ্ট কামরায়। ছোট কার
স্থশ্চিত। ব্যবস্থা ভালো।

জাহ্নবী বলিল—যান্... আপনি স্নানাহার
নিন। দেরী করিবেন না। আমি আপনার কিনি-
গুহিয়ে রাখি। আমিও আর দেরী করবো না। বাড়ী
কিছু না বলে এসেছি। কখন বেরিয়েছি...উঃ!
দেখী দেরী করলে বাড়ীতে ছদ্মস্তার সীমা থাকবে

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

জাহ্নবী বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।
আদিত্য বলিল—আমাদের ওখানেই আসবেন।

রহিয়াছে। সে টিকিট আদিত্য খুলিয়া ফেলে নাই।
জাহ্নবী টিকিট দেখিল...দাম সাতষাট টাকা।

দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল!...সাতষাট টাকা খরচ করিয়া
বসিয়াছে একটা স্ট্রটেকশন পিছনে!...দাক্ষিণী...আদিত্যর
জন্ত...নিশ্চয়। আদিত্যকে এত দিন সে দেখিতেছে...
কখনো তাকে স্ট্রটেকশন দেখে নাই! হঠাৎ এ বিলাতী
পোষাকের ভূতে তাকে পাইয়া বলিল কেন?

মুখ-হাত দুইয়া আদিত্য কিরিল...বলিল—কি
হচ্ছে ও?

জাহ্নবী বলিল—এ বেশে আপনার কচি হলো কব
থেকে?

আদিত্যর মনে হইল, চমৎকার হৃৎস্পন্দ...এই
পোষাককে কেন্দ্র করিয়া একটা স্ট্রটেকশন...সে-হিটে
জাহ্নবীর মনের কথা জানা যাইবে...এ মুহুর ব্যাটীটারের
সঙ্গে!

আদিত্য বলিল—তুমি চিঠিতে লিখেছো এখানে
তোমার সব রেসপেক্টবল বন্ধু-বান্ধব আছেন—ঐদের
সামনে পাছে খেলো বলে...

ছ'টো ফুলাইয়া জু বাঁকাইয়া জাহ্নবী বলিল—
আপনার যে কমতা আছে, তার দাম এ বিলাতী
পোষাকের চেয়ে বেশি বলে' আপনি মনে
করেন না?

আদিত্য খুশী হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল বাংলা
দেশে লেখকদের প্রতিভার মর্যাদার কথা! লেখককে
কেনা মানে এ দেশে! সে বলিল—লেখার জন্ত আমার
মনে এতটুকু সাহস বা শক্তি পাই না।

জাহ্নবী বলিল—তার মনে হইবে।
আদিত্য বলিল—আমার লেখা বই ক'জনই বা পড়ে!

তাহাড়া বই বিক্রী হয় চাকের বাজিতে! আমার বই
যতই ভালো হোক, চাক বাজিতে আমার দলের লোক
যদি তার কথা প্রচার না করে, বাংলা দেশের পাঠক-
পাঠিকা সে লেখা ভালো লাগলোও কখনো বলবে না,
আমি ভালো লিখি। দেখছি তো...বাংলা দেশে
গাহিতোর দাম-কবাকবি করে পাঁচ-সাতটা বাজান্দারে!
এদের দল আছে। নিজের দলকে প্রচার করা হলো

এদের পেশা। যাত্রা দলের নয় তাদের করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য।—

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—আপনি ভাবেন, ঐ চাকের রাজনাই জয়ী হবে?

আদিত্য বলিল—তার মানে?

জাহ্নবী বলিল—আমার মনে হয়, যে-লেখা সত্তি-ভালে, যে-লেখার প্রচারের জন্ত চাক-চৌলের দরকার হয় না। চাক-চৌলে যে-লেখার প্রচার হয়—গ্রামে তো দেখি, পাণ্ডুর চাক-চৌল বন্ধ হলে চড়ক-ভলা যেমন ধাঁধা করতে থাকে—তেমনি দলের লোকের সমালোচনার চৌলধামার সঙ্গে সঙ্গে সে সব লেখার পানে কেউ কিরেও আকৃষ্ট না।—কিন্তু না—এ সব আলোচনার সময় পাওয়া যাবে পরে অনেক। দেড়টা বেজ্ঞ গেছে—আপনি খেয়ে নিন। বরকে ডাকুন—আমি আসি। ছটার মধ্যে আসবেন? কিন্তু আমাদের ওখানে। আসা চাই।—বুঝলেন?

কথাটা বলিয়া জাহ্নবী যাইতে উভত হইল—আদিত্য ডাকিল—জাহ্নবী...

জাহ্নবী ফিরিল। মুহূর্ত্তে হাতে বলিল—পেছ ডাকলেন?

আদিত্য বলিল—একটা কথা...

—বলুন...

আদিত্য বলিল—তোমার বিবাহের সম্বন্ধে তোমার বাবার আর মার মত বদলাবে না?

জাহ্নবী বলিল—আপনার সম্বন্ধে? বোধ হয়, না।—

বাবা-মা বিয়ের সম্বন্ধে কোনো কথা তোলে না বুঝেছে—তোলা হোপলেশ!

আদিত্য বলিল—কিন্তু ওদের মনের ইচ্ছা, তোমার মতো ধর্মীর সঙ্গে তোমার বিবাহ জান্।

জাহ্নবী বলিল—ওদের সে ইচ্ছা পূরণ হতে পারে না।

—যদি দশ বছর আগে আমার বিয়ে দিতেন!

এ সব আলোচনা তো অনেক বার হয়েছে! এতদিন শপথ করেছিলেন একমাত্র বংশধরকে কৃতজ্ঞতা, আপনার দৈর্ঘ্য আছে?—কিন্তু না, কথায় কথা বংশধর প্রকট হওয়ায় ও মানুষ করে তুললেন।

আমি আর একটি কথাও কবো না।—ডাকলেন?

ফিরবো না।—চললুম। সন্ধ্যার সময় বেগুনী আসবেন আমাদের বাড়ীতে। ছটার মধ্যে। আর আছে তো—আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি—

জানিও না যে আপনি দার্কিংগিয়ে এসেছেন—

কেন?—

মুহূর্ত্তে আদিত্য বলিল—একথা মনে থাকবে—

জাহ্নবী চলিয়া গেল।

আদিত্য নিঃশব্দে ঝাঁড়াইয়া বহিল। মন ভাঙে।

পরিপূর্ণ। গল্পে-উপল্লাসে প্রেমের কথা অনেক লিখিয়া

...জু-চার জন সম্পাদক সে-লেখায় স্বখ্যাতি

বলিয়াছেন,—ভারী আট আর ডেলিকেট ট

...কিন্তু এমন? সত্যকার এই প্রেম—জাহ্নবী

ভালোবাসা—মনে হইল, কলমের লেখায় নারীর

অধিকতর—কিন্তু নারী-চরিত্রে এমন কমনীয়

এমন মানুষী—এ তার কমনীয়তায় কখনো উ

নাই!

প্রীতি-কুঞ্জে

(পর্ব)

পরীক্ষার ঠিক ছ'মাস আগেও ছেলের পড়বার পড়লেন না। তাঁর স্বামীর মৃত্যু শয্যায়

প্রকট হওয়ায় ও মানুষ করে তুললেন।

দীপু অর্থাৎ দীপক, মার কাছে ধমক খেয়ে এবার

মার তরিরে ও কড়া-শাসনে, ছেলের পড়া চলছে।

দীপকের পড়ার খবর

জানিও না যে আপনি দার্কিংগিয়ে এসেছেন—

কেন?—

মুহূর্ত্তে আদিত্য বলিল—একথা মনে থাকবে—

জাহ্নবী চলিয়া গেল।

আদিত্য নিঃশব্দে ঝাঁড়াইয়া বহিল। মন ভাঙে।

পরিপূর্ণ। গল্পে-উপল্লাসে প্রেমের কথা অনেক লিখিয়া

...জু-চার জন সম্পাদক সে-লেখায় স্বখ্যাতি

বলিয়াছেন,—ভারী আট আর ডেলিকেট ট

...কিন্তু এমন? সত্যকার এই প্রেম—জাহ্নবী

ভালোবাসা—মনে হইল, কলমের লেখায় নারীর

অধিকতর—কিন্তু নারী-চরিত্রে এমন কমনীয়

এমন মানুষী—এ তার কমনীয়তায় কখনো উ

নাই!

বছরের ছেলে। এখনও ভাল কোরে গৌফের রেখা দেখা যায় নি। কথা বল দার্শনিকের মত।

কিন্তু তর্কে তার মতই না ভিৎ হোক, বিবেকের কাছে সে মানে পরাজয়। দীপক ভাবে, কত তপস্বী কোরে না জানি সে এমনি না পেয়েছে। স্বামীর পরিত্যক্ত বিস্তার পরিমাণও বড় কম নয় স্বভাব উপযুক্ত পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থব্যয় করতে তাঁর কুষ্ঠার কারণ নেই।

তাপসের মত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে সে পড়ে পরীক্ষার পড়া। ভাল অনাংশের উপর তার কৌক নেই। তার একমাত্র আগ্রহ, মাকে শ্রদ্ধী করা।

যথাকালে তার পরীক্ষা শেষ হয় এবং দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটির পর তার ফলাফলও বের হয়।

দীপক পায় ফাষ্ট ক্লাশ—কিন্তু ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট নয়।

একটু মেয়ের কাছে দীপকের এই প্রথম পরাজয়।

দীপক হাসে, শিশুর মত হৃদয় হাসি। সে হাসিতে তার ভাসা ভাসা চোখ দুটো আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সে বলে:

যে তোমার মুখ রাখলুম না; কিন্তু একটা মেয়ের কাছে হার হোল। জেনো, এ শুধু এক-কোথো একজামিনারদের কারপাজী। নইলে মেয়ে আমাকে হারায়? একবারের যা-তা!

ছেলের মুগের খাম পরে মেছে নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে তার মা বলেন:

কী নিবি বল—তোর পাশের প্রাইজ?

জবাব দেয় দীপক: একটা মেয়ের কাছে হার মেনে কোন্ লজ্জায় আর প্রাইজ নেব না! কিন্তু সত্যি, সে মেয়েটা আমার যদি পোড়াগুড়ুয়ে গিয়ে হানা দেয়? তখন কী হবে? বল ত! কী ভাবছ তুমি?

সম্মিত দুটিতে তাকিয়ে থাকেন মা। হাসি পায় ছেলের কথা শুনে। সে হাসি পর্বের। মুখে বলেন:

বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাহিত্যিকদের

চিত্তাকর্ষক সমাবেশ—

বড়দিন সংখ্যা “সংস্করণ”

: দীপু, ভাবচি আমি, তা হ'লে ভালই হয়।
ছেলেদের জন্মের ভাঙ্গে। আচ্ছা বরষা নিম্ন ত'
মেঘটি কে ?

: দায় পড়েছে আমার। কোথাকার কে ছায়াদের
মেয়ে হবে। হয় ত' খুবই গরীব নয় এমনখয়ের
বুকওয়াশ!

বাংলা সাহিত্যের এম-এ ক্লাশে ১৭টি মেয়ে আর
১৬টি ছেলে। মোটমোট মেয়ের সংখ্যাই বেশী।

এতদিনে শুধু গেজেটের পাতায় যে নামটি প্রকাশ
হয়েছিল হঠাৎ একদিন এই বাঙালার ক্লাশেই তাকে
আরো বেশী দৃষ্টান্ত কোরে তুললেন অধ্যাপক সুনীতি
চাট্টোয়াল।

: ইনিই সেই শোভাগ্যবতী, ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট—
স্বপ্নীতি রায়।

মনের জালা, চোখের দৃষ্টিতেও ফুটে ওঠে দীপকের...
একদম বাচ্চা—তাকাতো মায়ী হয়।

আর স্বপ্নীতি ? আজ নিয়ে কতবার না দেখেছে এই
ছেলেটিকে। হাসিতে-খুসিতে-আলাপে উজ্জ্বল, স্বন্দর এই
ছেলেটি। যেন বয়সে সকলের ছোট অথচ মনে হয় যেন
বিজ্ঞান-বৃত্তিতে আলাপ আলোচনায় সবার চেয়ে
পরিপক্ব। কি নিষ্ঠা ওর মুখ আর চোখ ছুটি। যেন
নিটোল একখানি মেয়ের মুখ।

দীপক এসে সে দিন সন্ধ্যায় মাকে বলে

: ঠিক বা ভয় করছিলাম; তাই হোল মা। স্বপ্নীতি
হায় আবার এম-এ পড়েছে এবং বাঙাল্যভেই। একদম
রোম মা; ছোট—

মা হেসে বলেন: তবে তুই কী ভেবেছিলি একটা
২২২৪ বছরের শাড়ী মেয়ে হবে? আমি যে বার বি-এ
পাশ করি তখন আমার বয়সও উনিশ পেরিয়ে যায়নি।

পুজোর বছর ঠিক আগে কী যেন একটা
periodical পরীক্ষা হচ্ছে। দীপক তখনও পর্বত কোন
বই-এ হাত দেয় নি।

পুজোর বছর ঠিক আগে কী যেন একটা
periodical পরীক্ষা হচ্ছে। দীপক তখনও পর্বত কোন
বই-এ হাত দেয় নি।

পাশাপাশি পরীক্ষা দিতে দিতে দীপকের
পড়লো স্বপ্নীতির উপর। তার সামনে খাতা খোলা
একটা ভাঙ্গা পেনসিল হাতে।

হঠাৎ তার দিকে খানিকখানি তাকিয়ে দীপক
করলো:

: আপনি যে কিছু লিখছেন না বড় ?
পরম সফলতার সংগে স্বপ্নীতি জবাব দিলে:
পেনসিলটা হঠাৎ ভেঙ্গে ফেললাম এবং
পেনও নেই।

দীপক তার কালি পোরো দামী শেফারের কল
স্বপ্নীতির দিকে এগিয়ে দিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মাকে
টেবিলে নিজের সাদা খাতাখানা চাপা দিয়ে হঠাৎ
কোরে হুঁ থেকে বেরিয়ে গেল। সকলেরই দৃষ্টি
নিজ নিজ খাতার উপর আবদ্ধ। কেউ এটা লক্ষ্য করে।

না। হতবিরল স্বপ্নীতি কলমটি তুলে নিলে নিজ
—দীপক তখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

খটনাট মাকে-রিপোর্ট কোরতে দীপকের
দেবী হবার কথা নয়। মা শুনলেন টিগুনী
ছেলের উজ্জ্বল।

: মেয়েদের রকমই এই। একটা পেনসিল
পরীক্ষা দিতে গেছেন। একদম মা-তা!

দেড়মাস পরে।
পুজোর ছুটির পর ক্লাস খুলেচে। এক খটনাট
করবার পর মেয়েদের কমান কমানের সমুদ্রে দীপক পরীক্ষা
স্বপ্নীতির চোখে চোখে।

: কলমটি যে ফেঁদে নেওয়া হোল না বড় ?

: ভগবান সে সুযোগ দিলেন কৈ? পুজোর
হয়ে গেল যে। তা ছাড়া গোটা পাঁচকে কলম
এখন কোথেকেই খোঁজা হয় নি। ওটা আপনার বাবা
পাক না!

: না; সেটা ভয়ানক অজ্ঞায় হবে।

দীপক প্রতিবাদ করে বলে:

: মোটেই না। বরষা পরীক্ষার সময় পেনসিল
মানবর মত জুল আপনার শোধরাবে।

: কেন আমার কী কলম নেই না কী ?

দীপক বললে: বেশ। Let there be a fair
exchange; আপনার কলম আমার দিন।

স্বপ্নীতির চোখ ছুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে তার
রাইজের তলা থেকে স্বন্দর একটি কালো কলম
হাতে তুলে দিলে। দীপক সেটিকে পকেটে রাখলো।

অনেকদিন যায়। দুজনের কথা নেই। হঠাৎ এক
দিন নিউ মার্কেটে দেখা, মুখোমুখি কালীচরণের বইএর
নিজ নিজ খাতার উপর আবদ্ধ। কেউ এটা লক্ষ্য করে।

স্বপ্নীতি বললে: কী কিনেছেন, অত সব বই ?
দীপক দেখালো তার সিলেক্ট করা একরাশ বই—
দেখার ডামা, আর্ট, কবিতা।

হঠাৎ বইগুলো নাড়া-চাড়া করতে করতে কী যেন
করে স্বপ্নীতি বললে:

: দীপকবাবু, আমাকে একখানা বই বেছে দেবেন—
এক বাচ্চকি দেবেন, তার Birthdayতে gift.

দীপক জবাব দেয়: বেশ ত' কিন্তু আপনার বাচ্চকীর
রকম চেষ্টা বুলুন।

: তার চেষ্টা কোন দিকে আমার সত্যি জানা নেই।

: তবে আপনার রুচিমত দিন

: আমারও কোন বিশেষ রুচির পরিচয় দিতে

দীপক বলে: কিন্তু পরীক্ষায় ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট হবার
লোহা ত' রুচি ছিল।

স্বপ্নীতি জবাব দেয়: আপনি বিশ্বাস করুন: সে

আপনার বাবার ভয়ে।

: আপনার বেলার বাবা! কিন্তু আমার যে আমার

না। অর্থাৎ বুড়ি বছর আগের প্রাক্কুরেই। জানেন

নিঃস্বয়, শুধু আপনার জন্মে মাকে আমি খুশী করতে

পারিনি না। আচ্ছা চলুন না আমাদের বাড়ীতে।

আমার মাকে দেখবেন। আপনার কথা মা আমার মুখে
শুনেন খুব খুশী হ'ন। আমার হাতে আপনার কলমটি
দেখে মা কী বললেন জানেন? মা বলেন: দীপু, দেখিস
যেন লক্ষীর কলম তোর হাতে পড়ে শ্রদ্ধা হারান না।
আচ্ছা লক্ষীরা আবার কোন কালো কলমের ভক্ত
ছিলেন। বরষা আপনাকে বলা চলে জ্যাস্ত সরস্বতী।
এমন চলুন আমাদের বাড়ীতে।

স্বপ্নীতি সব শোনে। খুশীতে ভরে ওঠে তার মন।
সে বলে:

: তার চেয়ে চলুন না আজ আমাদের বাড়ী।
আমার বাবার সংগে আলাপ হোক। কিন্তু জানবেন,
বাড়ীতে আপনার মত আমার না নেই। আমি মাছ
হয়চি একরকম বাবার হাতেই।

স্বপ্নীতিদের বাড়ীতে সেদিন নতুন অতিথির পরিচর্যা
পালা।

প্রচুর আলাপে ও প্রচুর আহ্বারে খেতে রাত হয়ে
গেল। স্বপ্নীতিকে নিয়ে আর তার বাড়ী যাওয়া
হোল না।

: যাবার আগে স্বপ্নীতিকে একটুখানি একান্তে পেয়ে

দীপক বললে:

: কী চমৎকার লোক আপনার বাবা!

: আর আমি বুদ্ধি নজরে পড়বার মতই নয়—

কৃত্রিম কোপে স্বপ্নীতির মুখখানা আরো স্বন্দর হয়ে ওঠে।

: আচ্ছা, কে বলেচে সে কথা? বরষা আজই রাতে

আমি একটা গান লিখবো আর সে গানে থাকবে

আপনার সত্যিকারের পরিচয়। মাছের ভেতর ও

বাইরের রূপটা নিয়ে গান লেখা আমার বাতিক। আর

সে গানে আমি দেব স্বর। আর বরি দয়া করে কাল

আমাদের বাড়ীতে যান—চাই কী গাননাও আপনারকে

শুনিয়ে দিতে পারি।

অসীম তৃপ্তিতে, কঠে মধু ছড়িয়ে জবাব দেয় তরুণী:

: নিশ্চিত যাব কাল। কিন্তু গানখানা আমার

একবারে দিয়ে দিতে হবে। আর তার copyright থাকবে একইসঙ্গে আমার। আর তার স্বরূপটা আমার শিখিয়ে দেবেন।

জ্ঞান দেয় দীপক : তাহা !

স্বমিলাসী তরুণের জীবনের প্রথম রাত্রি। অন্ধরের পৃষ্ঠভূত আনন্দের উজ্জ্বল সঙ্কলন কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ছড়িয়ে পড়ে কাগজের বুকে। আজ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বিলাসের চরম পরীক্ষা। রচনার দিকে চোখ রেখে, একটা বাশের বাঁশিতে সে তার প্রত্যেকটি কথাই ধরতে চায় স্বপ্নে। দীপক বাড়িয়ে চলে :

হাঁরা দীপ, কী সকাল থেকে পোঁ ধরেছিস— একবার অর্ধেক একবার বাঁশিতে।

ঐকটা গান লিখেছি কাল রাত্রে। কিছুতেই কান্দায় আনতে পারছি না মা। একটা লাগ-টসে স্থর দিয়ে স্বরলিপি কোরে দেবে ?

মা জ্ঞান দেয় : সেখি যদি পারি। দে তোর গান। কি রকম লাগ-টসে স্থর বল ত' ?

এই ধর শাস্তিনিকেতনী স্বপ্নের চেয়েও মিষ্ট— হেসে জ্ঞান দেয় : তাই হবে !

আজ্ঞা, না হয় তুমি একটা অরিজিটাল স্থর দাও— এই যেমনটি আর কেউ কোণায় শোনে-নি-

বলি বিকলে বেলো ভোর বান্ধবীকে শোনাযি ত ?

কী কোরে জান্লে মা ? Exactly তাই—

শিখিয়ে তার চোখ চুটো আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মারেরা সব জানতে পারে, বোকা ছাড়া। এমন দে তোর গান।

বিকলে যখন সময়ে স্বপ্নীতি এলো পায়ে হেঁটে। বাজী তাদের মাইল বানেকের বেশী নয়।

পোষাকে ও প্রসাধনে একটা মার্জিত রুচির শ্রী নিয়ে সে এলো দীপকের ভবনে। এমন হৃদয় তাকে দেখেনি কখনো দীপক। দেখেনি কখনও তার হাত ভরা চুড়ি, গলায় মিনে করা মোটা হার, কানে তার কটকী কাজ করা ফিলিগ্রাফ কানবালা আর কপালে তার ঝরঝরে রংয়ের মারাঠি টিপ।

ছেলের বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে এলেন— এমন মা ? এমন তার রূপ ?

অবাক চোখে চায় স্বপ্নীতি। যেন দীপকের থানা শোনায়ে ছব্ব বসানো। তবু রং তাঁর দীপকে চেয়েও যেন চুপ্ত ফণী।

প্রণাম কোরতে মা তাকে জড়িয়ে ধরলেন একে বুকের মাথায় : কী মিষ্টি মা তুমি, কী হৃদয়, এক এস, আমার মা লক্ষী এসো—

মাঝা-মাঝার এসে বসে স্বপ্নীতি। সেজা মা ছুঁয়ার প্রকাণ্ড প্রাচীর পেছিয়ে। কিন্তু সামনের কণ্ঠে মাঝা-মাঝার গমল জ্বলি।

হু চোখ ভরে দেখে স্বপ্নীতি—মা ও ছেলেকে।

অনেক আদর, অনেক গল্প, অনেক কথার পর যান ভেতরে বাবারের তলিহরে।

স্বপ্নীতি বলে তখন অনেক থানি সন্ধ্যাক কালিয়ে : মনে আছে প্রমিস ? আমি বেশী কিছু মাঝারী দেখবেন, বাগান দেখবেন, আমার পড়ার ঘর না।

মাঝারী আমার সূর্য। এবার শোনায়ে আসবে।

গান। লেখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

আপনার কী মনে হয়—

মনে হয়, মেয়েদের যারা কোন্ দেবিয়ে গেলো বানায় আপনি যে দলের নন। কিন্তু উঠুন ছা— অর্ধেকনে পিছে।

দীপক তার রচনার গাভাখানি তার গোপন হৃদয় থেকে বের করে টেনে। এগিয়ে যায় অর্ধেকনের কণ্ঠ আর পাশে রাখে স্বরলিপির খাতা। মার হয় স্বরলিপি ছবার বাড়িয়ে যায় ক্রমাগত। স্বপ্নে স্বপ্নে ওঠে ঘর। তারপর মধুর উদাত্ত কণ্ঠে সে 'চলে গে' গান শেষে দীপক তাকাত্তে গিয়ে থমকে যায়।

কী স্বপ্নীতির ? তার চোখে কী জ্বল ?

কীসে এ বেন্দনা ? কেন এ অশ্রু ? কে বেরে উত্তর ? মা আসেন নানা রেকাবী ও বাটিতে প্রস্তুত নিয়ে। মার নিজের হাতে ঠৈয়ারী মিষ্টি, নোল, পরমায়।

দীপক গান তুমি এর পরে আরো শুনো মা। তুমি একখানা আমাদের গান শোনাও ?

মাঝারী যেন স্বপ্নীতির চমক ভালে। সে জ্ঞান দেয় : মা, আজ-আর এ অহরোধ কোরবেন না। আমার গলাটা আজ ভাল নেই। বরং মা জানি আর জ্ঞান আপনাকে শোনাবো।

মা তাকে নিশ্চিন্তি দেন এবং এগিয়ে যান আবার ঘরে।

সেই অবসরে দীপক পালন করে তার প্রতীকশ্রুতি। গানবাঁশি ভুলে দেয় তার হাতেতে।

আর স্বরলিপি ?

এটাও দিতে হবে না কী ? কিন্তু এটা যে আমার মার হাতে, আমার পানের প্রথম স্বরলিপি।

স্বপ্নীতি জ্ঞান দেয় : তা হোক দীপকবাবু, মার হাতের আমি কোরবো না। আমাদের ঠাকুর ঘরে ঐ স্বরলিপি নিত্য পাবে আমার পুজো।

আজ্ঞা তা হ'লে চলুন ভেতরে যাই ; আমাদের মারেরী দেখবেন, বাগান দেখবেন, আমার পড়ার ঘর দেখবেন।

তারপর বীরে বীরে শুরু হয় দেখা শোনার পালা। পালা শেষে আসে বিদায়ের মুহূর্ত। দীপক ও স্বপ্নীতি জ্ঞান বাজী গলগল উজ্জ্বলের একবারে, এক হাসিমুহানার গোপন পাশে।

স্বপ্নীতি বলে : আজ যাই।

দীপক বলে প্রতিবাদের স্বরে : যাই নয় আমি। : অনেক পেলাম, অনেক নিলাম আজ। কী বলে জানাবো রক্তভূতা ? মা কেনম জানি না, আজ মাকে জানলাম। আর পেলাম এমন কিছু, যার দাম মুখের কণায় দেব কেনম কোরে ?

কিন্তু অনেক নিলে একটুখানিও যে দিতে হয়— নইলে যে হুং থেকে যায়—

আমি জানিনি কি আমি দিতে পারি। কী আমার আছে ? আমার মুখে আসচে কেবলি বলি— তুমি নাও, তোমার মা খুঁচী নাও—দীপক চোখ চুটি বুজিয়ে আসে স্বপ্নীতির।

তরুণের সবল বাহর গভীর আড়ালে তরুণী মুখে ফেলে দিনান্তের সূর্য তার শেষ বিদায়ের সোনালী আলো। মাত্র একটা চুহর সরস পরশে তাতে মাখিয়ে দেয় সরসের গুণ।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা ; জানে না এরা, হাসানাহার সেই মিলন-তীর্থ জননীর দুটিকে ফাঁকী দিতে পারে নি। জানেনা দীপক, জানেনা স্বপ্নীতি— এমনি বাঁশি বহর আগে, স্বপ্নের কোন এক গোপনিতিক এমনি কোরেই দীপকের বাবা তার মার অধরে প্রথম চুম্বন দাগ দিয়েছিল। সেদিনের যোগটি ছিল গোলাপের। যার ফুল আর নেই কিন্তু কাঁটাগুলো বিঁধে আছে গভীর বেদনায়—পরম পুলকের মধুর হৃতির অক্ষয় ঐশ্বর্য !

বিশ্রুতি শ্রীকালিদাস রায়

ভাগ্যে ভুলি তাই বাচোয়া

নইলে হ'তো বিষম দায়,

পূরণো না যত্নে পরে

কেনমে ঠাই মৃত্যু পায়।

জ'মে হ'ত হৃতির রানি

বন্ধ হ'তো মনের দ্বার,

প্রেম নিষেধ হ'তো আলোর

মন যে হ'তো অন্ধকার।

ভাগ্যে ভুলি তাই হ'তো

আমার লগ্ন মন কাঁকা,

কল্পনারা উড়ে বেড়ায়

মেলে তাদের নীল পাখা।

ভাগ্যে ভুলি দেখে মনে

হালুকা তাই হ'য় বোকা।

তাইত জীবন মাত্রা পথে

ক্লমপদে যাই সোজা।

ইন্দি

(সমস্যা-ধূলাক উপন্যাস)

স্রী অমল ঘোষ

[১০০]

[ইন্দি]

কলেজে ভর্তি হবার পর ওর নটোরাইটি যখন চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন ছেলেদের মধ্যে অনেকেই মেরেছিল ওর সংগে আলাপ কোরতে, কিন্তু অনেক চেষ্টায় যখন কিছুতেই আর সাধো কল্যাণ না, তখন বাধ্য হয়েই তারা নিরন্ত হয়েছিল। কিন্তু চুপ করে থাকা যাদের ক্ষুণ্ণত দেখে না, তারাই লেগেছিল ওর পেছনে একদল পাগলা কুকুরের মত। কেউ কেউ প্রতিবাদ কোরতে বলত, হেসে ও জবাব দিত, "Let dogs delight to bark and bite." একদিন কে রসিকতা করে জানিয়েছিল, ওকে কোনো বিশেষ সভার সভানেত্রী হবার জন্তে, উত্তরে সে জানিয়েছে, "বাংলা দেশে সভানেত্রীর অভাব নেই, আমাকে প্রয়োজন বোধ করি তাদের চেয়ে বেশী নয়।" প্রত্যুত্তর আসেনি, তবে কলেজের চার দিকে রটানো হয়েছিল সে নাকি "পাহাড়ী চন্দনা"। নামটা কি করে ওর দাবার কানে পৌঁছেছিল, তাই কথায় কথায় একদিন সে জিজ্ঞাসা করে, হায়ে পাগলা ছোঁড়া-গুলো তোকে খুব ক্যাপায় না? হেসে ও বলেছে, পাগলের কথায় যদি স্বপ্ন নাহনের ক্যাপায়নি তবে তবে তাকে স্বপ্ন বল কি হিসাবে দাদা। দাদা এই অতি তেজস্বিনী বোনটির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিল, শিকা তার সর্গক হয়েছে, মুখ বলেছিল, তা বটে।

সংসারে হুই ভাইবোনের উৎকর্ষ রকম রেজ্জার বাপের চোখে জন্মশই অস্বপ্ন হয়ে উঠছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, কী করে এমনটা হল। একে একে শুক শাসন উপেক্ষা, সমস্ত কিছুকে উড়িয়ে দিয়ে তারা আপন হিসাবেরই পথ বেঁচে চলে, তাদের তিনি ফেরানেন কোন উপায়ে। সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে চাইলে যারা ত্যাগ হ'তে চাননা, খালি তরু করে মুক্তির

পোলাগুলি ছুঁড়ে তাঁকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তাদের অগ্রাঙ্ক করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। অথচ সংসার হয়ে উঠছে যেন ক্রমশঃ হোটেলখানার মত, নীতি ধর্ম, শৃংখলার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নেই, যার যা ইচ্ছে, নিজের খেয়াল খুশিতেই যেন তা করে চলছে। কিন্তু এমনি করে আর কতদিন যা চলতে পারে? 'আজ ক' মাস ধরে তাঁর ঘুম নেই, সমস্ত রাত্রি একটা গভীর ছুঁড়ানার মধ্যে দিয়েই কেটে যায়, কিন্তু কিই বা তিনি করতে পারেন! কত ব্রহ্ম, কত আশা নিয়ে তিনি এই যেনে ছেলেটিকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কই সে আশা তাঁর মিট না। আজ ছেলে হয়ে বাপের জাখা সমান দেওয়াকে সে গ্রাষের মধ্যে আনে না। তিনি লক্ষ্য করেছেন, অষ্টগ্রহের যেন কিসের একটা বিধেয় বাপের তার দ্ব'চোখের মধ্যে শানিয়ে রেখেছে, কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের তিনি জবাব পান না, শুধু মনে হয়, পূর্ব পুরুষের কোনো জীঘ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন আজ তার মধ্যে দিয়ে স্বক হয়ে গ্যাছে। দিনের পর দিন, একটা গভীর ত্রিভুজের তাঁর সমস্ত মন ভরে উঠছিল। তাই সামনে একদিন সেই মহাপাতকক লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন, চোখের সামনে যেন সে আর না আসে। সংগে সংগে জবাব পেয়েছেন, কাছটা শক্ত, তবে বাপানের ওপরে তিনি যদি আর একটা মহল তোলবার বন্দবস্ত করেন, তবে নান্দ সে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারে। আশাতের মধ্যে মধ্যে তিনি একবারে নীরব হয়ে গ্যাচ্ছেন, ভেবে পাননি, আরো কত শান্তি ঈশ্বর তাঁর জন্তে তুলে রেখেছেন।

শান্তি তিনি যতই পান মনে মনে তাঁর সংকল্প ছিল। এর প্রতিবিধান তাঁকে করতেই হবে। কিন্তু কো

রূপে যেসে সুযোগ উপস্থিত হবে, তা' তিনি জানতেন না। দ্বীর কাছ থেকে প্রত্যেকদিনই অভিমোদন আসত, যেহেতু একটা গতি না করা হয় তবে তিনি আত্ম-হতাশ হতেন। মেয়েছেলেকে যে মাশ্ব কী করে এত দৃঢ় দিতে পারে; যা হয়ে সে কথা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর এমন মেয়ে দুর্নীতি-প্রায়া হয়ে উঠছে। শিকা! ঝাড়ু, মারো শিকার নাখায়, মরে এমনাজ 'হানি' রাখা ঘরে, কী প্রয়োজন আছে মরে হুড়ি হুড়ি টাকা খরচ করে লেখাপড়া দেখানোয়। সে লেখাপড়া শুধু সংসারের বিকল্পে মেয়েগুলোকে গিয়ে তোলে, নীতি, ভক্তি কর্তব্যকে ধাপ্পাবাজী মনে গ্রহণ করতে শেখায়; বাপ মাকে তার জাখা মনে থেকে বঞ্চিত করে, তাকে তিনি কোনোমতেই বলা করতে প্রস্তুত নন; এর চেয়ে ঢের ভাল তাদের ক্ষেত্র ঘূর্ণ হয়ে থাক।

হঠাৎ বোকাবার চেষ্টা করতেন, চরিত্র গঠনের ব্যাপারে মজলী শিক্ষাকে দ্বারী করা তুল। খোঁজ নিলে হয়ত বোকাবার, কলেজ জীবনের পর কত মেয়েই এমন মনের মত দেখি যার সংসার কোরছে। কিন্তু কই, তারা ত কী লিটারার মতন নয়। তাঁর মতে ছেলেমেয়েদের গঠন গঠনের ব্যাপারে তাদের নিজের সংসারই হল গাই। তার কারণ চরিত্রের প্রথম কাঠামো গড়ে সংসার, সুস্থির শিক্ষা শুধু তার ওপর রক্তের পোছ চেনে চলে। গিরি কংসার যিমে বলেছেন, সংসারে তোমার মনেকে ধরে কোন কৃশিকা দেওয়া হয়েছে শুনি? যুগ্মধরে জবাব হয়েছে, কৃশিকা সে পেয়েছে বৈকি। চড়া হুরে প্রশ্ন হয়েছে, তার মানে? স্পষ্ট উত্তর হয়েছে, যে আহা-ওয়ায় রেবাথ, তাকে বিবাহ করে তোলাবার জন্তে গোপকের হস্তার হামনি। তারপর কিছু উত্তেজিত স্বরেই তিনি বলেছেন, যার চরম বেজাচারের ফলভোগ আজ তোমার আমায় সমাজভাবে ভোগ করতে হচ্ছে, হ্যাঁ সে আর কেউ নয়, সে গোমার বোজ ছেলে শংকর। তাঁর প্রতিবাদের মধ্যে উঠেছে, না, কক্ষমা নয়, শংকর আমার আর বাপ হইবে, সে পুঙ্খ মাখ্য, তার সব কিছুই মাছে। গিরি তোমার আদরিণী, সে কী মেয়েছেলে? পুরুষের নকল

করে যে নিজেকে বাহাদুরবী বলে মনে করে, তাকে তুমি মেয়েছেলে বলতে চাও? যাকে একদিন শ্রমদানের বা হতে হবে, পুরুষের অংশভাগিনী হতে হবে, তার কি এত দোমাক, এত অহংকার সহ্য করবার, তারপর কিছু খেমে বলেছেন, আজ স্পষ্ট দেখাচ্ছি, জীবনে ওর অসমস্ত দুর্গতি আছে। আর সত্যই যদি এর জন্তে কেউ হয়, সে তুমি। কষ্টী আখাত পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন তরু করা এখানে নিপ্রয়োজন, তাই আলোচনা আর এগোয়নি, কিন্তু ভেতরের ভেতরে অশান্তির মাজা জন্মশই বেড়ে চলেছিল।

সংসারের সমস্ত আবহাওয়া যখন একটা দারুণ গুমটে জরে উঠছিল, তখন বড় ভাই তারাদাসের হঠাৎ হুঁস হুঁস, সভাই এবার তাঁর কিছু বলবার সময় হয়েছে। নচেৎ নিজের সংসারের শান্তি স্বভাব রাখা হলে তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। ইদানিং নাকি প্রতি রাজে তাঁর শয্যাস্থ পণ্ডিত আর মোটেই প্রথকর হয়ে উঠছিল না। দ্বীর প্রত্যেক রাত্রির অহযোগ আর অভিমোদের আয়তন এমনি যারায়ক রকম বেড়ে চলেছিল, যাকে নাকি তাঁর জাখা আর মোটেই pending-এ স্থলিয়ে রাখা চল না। তিনি বুঝেছিলেন, অভিমোদিত কি, আর অহযোগটাই বা কিসের? প্রথম প্রথম আভ্যামোড়ার আর আলস্যের মারফতে তিনি চেষ্টা করতেন সেগুলো এড়িয়ে যেতে। তাই মনে বলতেন, যেতে দাওনা বাপু, ওতে তোমারি বা কি, আর আমারি বা কি। ওরা বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে বা! ভাল বিবেচনা হয়ে তাই করবে। মিথ্যে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমার আমার লাভ কি? এই বলে দ্বীর দিকে এমন এক সহস্রায় কটাক করেছেন, যাতে আলোচনা আর বেশী দূর এগোয়নি সেই রাত্রির মত, ঘরের আলো নিভিয়ে পরম নিশ্চিন্তেই তাঁরা শয্যার কোলেই চলে পড়েছেন। কিন্তু এমনি করে বেশী দিন চল না, মুখের ওপরই দ্বীর মতামত শুনলেন, তাঁরই মত নাকি পোটা পুঙ্খ জাতটা ভয়ংকর রকম স্বার্থপর; নিজেরদের স্বখটা পূর্ণ মাজায় বজায় থাকলে নাকি তারা আর কোনো দিকেই চায় না। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাস্য করেছিলেন, ব্যাপার কি, হঠাৎ এত মারফত হয়ে উঠলে কেন? উত্তর হয়েছে, হব না, বাড়ীর

বড় ছেলে হয়ে যে মা বাপের চুপের দিকে চায় না, ছোটদের শাসন করে না, সে আবার মাহুবা!

তিনি বুকে ছিলেন, ব্যাপারটা গড়িয়েছে অনেক দূর। তাই সেদিন আপিস থেকে ফিরেই ঘটনা তিনি মায়ের ঘরে এসে চুকলেন। মা প্রশংসক দৃষ্টিতে তাকাতই, তিনি বলে উঠলেন, মনে করছি লগিতার এবার যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে? মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ওর আর কি ব্যবস্থা করব বাবা। আশা-সুচক ভাবে উত্তর হল, সে তোমার ভাবতে হবে না মা, যা করবার সে আমিই করব। মা বললেন, তুমি ভুল করছ তারাদাস, ও যেনে ত যে সে যেনে নয়, ওর ব্যবস্থা করতে যাওয়ায় মঙ্গলের বিপদ বাড়বে বই কয়েক কি? অবজ্ঞা ভরে তিনি জবাব দিলেন, যা: বিপদ হলেই হল আর কি, কেন ও আমায় মারবে নাকি? অতি দুঃখেও মুখে হাসি টেনে এনে মা বলেন, ও মারল বোধ করি সেটা সম্ভব হবে, কিন্তু ওত মারে না, ওর কথাগুলোই যে মায়ের অনেক বেশী হয়ে আখাত করে বাবা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারাদাস বলে উঠলেন, সে আমি দেখব মা, তোমায় ভাবতে হবে না। এখন যে কথা বলতে এসে এখনও বলিনি, তাই শোনো, কারণ এতে তোমার মতামতটাই আমার আগে জানা দরকার। মা চুপ করে রইলেন, তারাদাস বলে যেতে লাগলেন, ভুল পাজের একটি স্থান পেয়েছি মা, ছোটলি আমাদেরই আপিসের Senior clerk বেশ মোটা মাইনে পায়, প্রায় 'শ' তিনেকের উপর। আর স্বভাব চরিত্রের কথা যদি জিজ্ঞাস্য কর, তবে বেলব, আজ কালকার দিনে এমন পাজের ছোড়া পাবে না। আর বয়স, সেটা এমন কী বেশী। আমার চেয়ে হয়ত এই বয়স চারেকের ছোট হবে, তারপর কী ভেবে কিছুক্ষণ তিনি চুপ করলেন, তারপর বলে যেতে লাগলেন, গেল আশ্বিনেই না আমার চুল্লিগির বহর পূর্ণ হয়েছে, যদি তাই হয়, তবে চল্লিশের সে এক চুল ও আর এদিক ওদিক হচ্ছে না। এইখানে যেন কিছু উল্লেখিত হয়েই তিনি বলে উঠলেন, বল না মা, আমি কি তোমার বুড়া হয়েছি। মা হাসছিলেন, কিন্তু মুখে বলেন, ছেলে কি কখনও মায়ের কাছে বুড়া

হয়? তারাদাস উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, তাই বলেন, তবে, এমনই যা কী তার বয়স হয়েছে? উনি বছরের মায়ের পক্ষে সে কী বেশ মানানসই হবেন মা? মা বলেন, তা ভবেই, বয়সটা তার এমন কী বেশী। তারের দাদা বশাই তো ছিলেন তেরো দিমিয়ার চেয়ে প্রায় উনত্রিশ বছরের বড় কিন্তু এ নিয়ে কি তাঁরা কোনোদিন অস্বস্তি হয়েছিলেন মনেযাবহুনের স্বপ্ন, সেটা কপালেই লেখা থাকে, বর টমসো গুলো কিছুই নয়। নচেৎ রাজপুত্রের মত স্বামী পেয়েও দেখেছি অনেক মেয়েকে চিরকালটা নাকি ঝাঁটা খেয়ে মরতে। উত্তর হল: তাত বরই কিন্তু তাহলে আমি চেষ্টা করি—কি বল মা? নচেৎ এমন পর একবার হাতছাড়া হলে কি রফে আছে! কল্যাণ-প্রদেব বলত একেবারে মুখিয়েই আছে, খবর পেলেই হ'লি! তবে কি জান মা, একটু জোরে হেসে উঠে তিনি বলেন, ব্যাপারটা খুব Confidential কি না, তাই এ নিজে ছাড়া অন্য কারো ব্যক্তি এর ছিটে কীটো জানে না। মা এবার একটু জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, যেন আপ মনেই বলতে লাগলেন, মায়ের বরাত! ও হতজাতি কপালে কি আর এত স্বপ্ন আছে। তারপর জিজ্ঞাস্য করলেন, ছেলেকটিকে দেখতে ভালত ত? মুহূৰ্ত্তেই একদমর কেরেট নিয়েই তারাদাস যেন রজপত করলেন, তার মানে সে কী জানোয়ার নাকি, যে তার রূপে ব্যাখ্যা করতে হবে! মা আহত হয়ে বলেন, আমি কি তাই বলছি বাবা, জিজ্ঞাস্য করছি শুধু সে স্বাস্থ্যবান? মাংসে মাংসে উত্তর হল, নিশ্চয়ই, চাকরীতে আসে যেন সে তার বাপের বিষয় সম্পত্তি দেখতে, তখন শুনেছি, হ্যাঁ থেকে প্রায় ছ'মাইল পথ ছুঁমন মোটা পিঠে করে স্টার সে বাড়ী ফিরে এসেছে। স্বাস্থ্যবান মানে! মা ঐক্য চিন্তিত হয়ে বলেন, কেন তাদের কি আর লোকের ছিলনা—ভাড়া—তার কথা প্রায় লুফে নিয়ে উত্তর হল, পাগল না কেন গড়া গড়া, কিন্তু দলদলী যাতে, অপর ওপর নির্ভর করতে পাবে তারা কিসের জাতি, বুঝলেন, ছেলেকটি হুন্দর না হলেও বিষয় সম্পত্তি আর

কিছু। তবু জিজ্ঞাস্য করলেন, তার লেখাপড়া? চমকে দেওয়া আওয়াজ হৈনে, জবাব এল, যে ছেলে মাসে তিন পাচ মাইনে পায়, তার আবার লেখাপড়া! হু, গুরুত্বক ভাবে তিনি বলেন—I. A. টা সে বেশ ভাল করেই পাশ করেছিল। মা দেখলেন মনে তার এর এর ছাড়া, উপরস্থ সে অল্প জ্ঞাতের নয়, শিক্ষার যে তার চেয়ে হালী, তাকে কি মনে ধরবে না, কিন্তু মুখে কিছু না বলে তিনি বলেন, চেষ্টা করে দেখ—এতে লগিতা যদি রাণী হয়, তবে আমারি বা আপত্তি কি। অভিমানেই স্বপ্নের জবাব হল, ও বুঝি, তোমার পছন্দ মিলি, বেশ, দরকার নেই, এসব বিষয়ে আর স্বকমারী, কিছু করতে না আসাই দেখছি ভাল, দরকার নেই, আমার কি দরকার! মা অবাক হয়ে বলেন, যে কিসের, আমি কি তোকে অজায় কিছু বলছি, নিশ্চয় রাগ করি কেন বাবা? না: দেখছি অকারণে, তরু আর রাগ সঠাটা তাদের বংশগত হয়ে ঠাঁড়িয়েছে। এবার যানিকটা নরম হয়ে উঠে তারাদাস বলেন, না, রাগ করতে যাঁব কেন, আমি শুধু ভাবছিলাম, আজকের দিনে এমন হলে একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে, তখন আর লগিতারের সীমা থাকবে না। মা বলেন আমি কি তাই তোকে বলছি, দেখনা লগিতাকে যদি রাজী করতে পারিস। আর কষ্টও না এ বিষয়ে আপত্তি হবেতো তা আমি মনে করিনি। তুই ওদিকটা একবার চেষ্টা করে দেখ মা? গালভরা হাসি হেসে তারাদাস বলেন, আরে বলছিই ত সে ব্যবস্থা আমি করব। মা বলেন, ঐশ্বর যেন তাই করেন।

গরীকার ব্যাপারে খুব বেশী ব্যস্ত থাকায় লগিতার নিম্নাঙ্গ ফেলবার অপর্যায় ছিল না। সন্ধ্যা সন্ধ্যায় মেঝাকে তার হুকুম ছিল বাড়ী থেকে যেন সে না বেরয়, স্বাধীন একজামিনের পাঠা মুখের ব্যাপারে মেঝাকে মাপেলে তার একমুহূর্ত্তও চলবে না, মেঝা তার প্রথমে জামিৎ আনিয়েছিল, ভাগিভ তোর পড়া ওর জগে ঐতিহ্য লোকের আবার দরকার হয় নাকি? লগিতার অভিমানে হয়েছিল কিনা বোকা যারিনি, উত্তরে শুধু বলেছিল, পাখার মত না খেতে পরিশ্রমের মাজাটা যদি

একটু কম হয়, তবে তোমার সাহায্য করতে আপত্তি কি শুনি? উত্তরটা অপর পক্ষের কাছে অনাবশ্যক ছিল, তাই সেদিন থেকে সে বোনের আদেশ মেনে চলছিল। পড়াশুনোর ব্যাপারে মেঝার সাহায্য যে লগিতার কাছে কতবড়, তা সে চিরদিনই জানে। তার মনে হয়, জীবনের সমস্ত কাজে অমনি একটা লোক যদি তাকে সাহায্য করে, তবে বতবড় কঠিন পথেই তার সামনে আবহ, অনায়াসেই সে তাতে উত্তীর্ণ হবে। মেঝা তার গোপনে লগিতা করে দেখেছে, জীবনের সমস্ত কিছু ব্যাপারে যেন তার এই অতি আদরের ছোট বোনটি কিসের একটা মীমাংসা চায়। কিন্তু বিনাকর্তে কোনো কিছুকে স্বীকার করে নেওয়ায় লগিতার আপত্তি আছে, ওটা নাকি তার কাছে কাপুরুষতা, তাই প্রথম প্রথম তরুর ঝড়ে ও চেষ্টা করে অপর পক্ষকে একেবারে বিপর্যস্ত করে তুলতে, কিন্তু একে একে সমস্ত যুক্তিগুলো যখন তার একখানা পুরানো দলিলের মত শুঁড়ো শুঁড়ো হয়ে যায়, তখন বিপর্যস্ত প্রবীর মতো সে এমন করণ হয়ে থাকিচ্ছে, তাকে তার মেঝার মত এমন কঠিন প্রকৃতির লোকও কোমল হতে বাধ্য হয়েছিল, তাই তরুর মতো অবাক হয়েই সে শুনেছে, যা সে জানতে চায়, তরু করে বৃষ্টিতে চায়।

সেদিনও তরু চলছে কি একটা বিষয়ে, লগিতা বলছিল, না কিছুতেই নয়, এ আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই দাদা, যে প্রশ্ন আমি স্থলের ছেলেনেয়েদের কাছেই প্রত্যাশা করি, সে প্রশ্ন তোমার মুখে শুনলো, এ আমি কোনোদিনই আশা করতে পারিনি। উত্তর হয়েছে, স্থলের ছেলেনেয়েদের মুখে কি অনেক সময় অনেক বড় প্রশ্ন জাগে না? তাঁর প্রতিবাদের লগিতা বলেছে, না, তা জাগতে পারে না। যদি প্রশ্নই জাগে, তবে তারা নিজেরাই জানে না কি তারা জিজ্ঞাস্য কোরছে, আর সে সময় সত্যই যদি কেউ সে প্রশ্নের সীমায়ো করে, তবে বোকার মতই তারা সেটুকু শুনে যাবে, তপিয়ে দেখবে না? কী প্রশ্নের তারা কি জবাব শুনলো। যেমন, কোনো ছেলে যদি জানতে চায়, পরমাণু কি? তবে কি সে তার প্রশ্নোত্তরকে সম্পূর্ণ বুঝে

উঠতে পারবে? হো হো করে হেসে মেজলা তার বলে, প্রাণের উপাযোগী করে যদি জ্ঞাব বোধগা হয়, তবে কি প্রশংসারীয় নয় নিয়ে কিছু বাবে আসবে? প্রতিবার বল নিশ্চয়ই। উত্তর হয় না। নিশ্চয়ই নয়, যেহেতু ফল আসে সেটা উত্তর-দাতার বক্তব্য নিয়ে। ধর আদি মানুষ আকাশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেছিল, মানুষ কে? সেদিনও সে জ্ঞাব পেয়েছিল, আজকের মানুষও নিজের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছে সে কে? তাই আজকের জ্ঞাবও সে পাচ্ছে। কিন্তু 'দেখ প্রশ্ন সেই একই' বলে, একটু তার নড়চড় হয়নি। কিন্তু উত্তরটা? কত আকাশ পাতাল তফাৎ বলত! তাই আজ যদি রাগ করে বলিস, স্থলের ছেলের মত তাকে প্রশ্ন করছি, তবে কুল করবি, কারণ প্রশ্ন এক হলেও, উত্তরটা তোরা কাছ থেকে টিক এক তাহেই আশা করি না। এই পোশাকী পরাশর, লজিতা যে কী উত্তর দেবে তাই ভাবছিল, এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ এল, তেতের আসতে পারি কি?

আম্বলক ভাল করেই জানতেন, বিনা অহমতিতে বাড়ীর আর সমস্ত জায়গায় তাঁর প্রবেশাধিকার থাকলেও এখানে নেই, অবশ্য বাধ্য তাঁকে কোন দিনই কেউ দেয়নি, কিন্তু তবুও যেন কিসের একটা বাধ বাধ ভাব তিনি বদ্যবাই বোধ করে এসেছেন। এই নিয়ে এ ঘরের বাসিন্দারা কত হাস্যাহাসিই না করেছে, কিন্তু তবুও কেমন যেন একটি কিছ্র বাধ্য ঐ বিষয়ে মোটেই সাহসী করে তোলেনি। তিনি জানতেন, যাদের কাছে তাঁর প্রয়োজন, তারা ঠিক আর পাঁচজনের মত নয়, কেমন যেন বামখোলা, উপাসীন উদ্ধত ভাবের বাবহার। তাই কোনো কথা বলার আগে, এমন একটি সংকোচ তিনি বোধ করেছেন, যা কোনো মতেই তাঁকে ছুটির বেশী ভিনটি কথা বলার শক্তি ছোঁয়ায়নি। কিন্তু আজ যে প্রয়োজনে তাঁর আসা, সেটা নাকি এমননিই দায়িত্ব-পূর্ণ, যাকে তিনি ব্যক্তিগত ক্ষমতা অক্ষমতার দিক দিয়ে মোটেই বিচার করতে রাজী নন। তাঁর দায়িত্ব, কঠোর কর্তব্য যখন কোনো কিছু করতে বাধ্য করায়, তখন নাকি মানুষের যাদুগাণ্ডা সুস্থিগুণা, ফল এই সম্ভান-

সম্ভান বোধের কোনোই মূল্য নেই। তাই বৃহৎ বোধ তিনি এসেছিলেন, কিন্তু বন্ধ বোধের মাঝে এসে হঠাৎ মুখ থেকে তাঁর কি করে যে অস্বস্তির প্রার্থনাটা বেরিয়ে এল তা তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারলেন না। যার হোক, ভেতরওয়ালার অস্বস্তি যখন এল, এক মনে বীরি দর্পেই তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ভেতরে বাসিন্দারা বৃষ্ণল, এবার বাসিন্দারা ধরসের অবতারণা হবে, তাই বেশ গম্ভীর মুখেই তারা বসেছিল।

তারাঙ্গা আশা করেছিলেন, লজিতাকে যদি একলাই দেখতে পাবেন, কিন্তু পরিবর্তে যে আরো একজন সেখানে প্রতীক্ষা করছিল, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাই যে সংকল্প নিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে প্রথম পদাশ্রয় করেছিলেন, সে সংকল্পের ভিত্তি যে হঠাৎ কোথায় আশায়া হয়ে গালাস, কিছুতেই সে সেটাকে তিনি পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারছিলেন না। কিন্তু সেটার সম্পূর্ণ আয়ত্রে তাঁর সমস্ত মূল্য চব্বিটা এমনি করণ হয়ে উঠেছিল যে, ভেতরের বাসিন্দারা বাসীর একজন বলতে ছাড়াইনি, চোয়ারটার বোশো এক।

চোয়ারটা দেখে হঠাৎ যেন তিনি একটা প্রকাণ্ড অবলম্বন পেলেন। তাই ঝরিত পতিতে সেটা অবিকার করে তিনি যেন কোনোবাকমে বলে ফেলেন, ই্যা বাবাই নিশ্চয়ই বসব, বাসিন্দার বদ্যবাই জন্মেই ত এগেরি কথারটার উত্তর দেবে কে ঘরের উত্তরেই যখন তাহলে তখন গম্ভীর হয়েই লজিতা তার মেজাজকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, বড়দার বোধ হয় এখানে খুব জঙ্করী বা আছে, না মেজলা? সংকল্পেই জ্ঞাব হ'ল, সেই বোধ মনে হচ্ছে। তারাঙ্গা যেন খুব ব্যস্ত ও কৃতান্ত হয়েই এমনি ভাবে বলে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমারা ঠিকই করে আমার কাজটা একটু জঙ্করীই বটে, তবে মনে হয় তোমারা যেন একটু ব্যস্ত ছিলে, তা থাক কি বল, অমর কাজটা না হয় পরেই হবেখন—অ্যা? তাঁর কথায় এ বাধ্য দিয়েই যেন লজিতা বলে উঠল, কাজটা জঙ্করীই হয় তবে বলেই ফেল না, pendingও যদি এলে তাহা ত কি? তারাঙ্গা জানতেন, ওটা ব্যাঙ্গ, তাঁর

pending শব্দটি প্রায় তিনি ব্যাচার করতেন বলে, ওটা হ্যাঁ একরকম মূহুরোয়েই পরিণত হয়ে গেছিল, যা ঘিরে ওরা ছজন কতই না ঠাট্টা করেছে, কিন্তু সেটা হৃদয় যখন তিনি সেটা এড়াতে পারলেন না, তখন হ্যাঁ তিনি আবিষ্কার করলেন, মনের ভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে, এমন একটা লগাশই শব্দ বাংলা বা অন্য অধিকানে মেলা অসম্ভব। তাই হোক যেন মনে গেই অপমান বোধ করলেও মুখে তিনি বলেন, বেশ বেশার যদি অস্বস্তিই না হয়, তবে বলেই ফেলি, কিন্তু এই বলেই তিনি অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে মেজলায়ের মুখের দিকে ঝরলেন, কিন্তু যার উদ্দেশ্যে তিনি দৃষ্টি প্রয়োগ করেছিলেন সে তখন টেবিলের ওপর সোজা হুজি পাঁচটা লক্ষ্য করে দিয়ে, সোজা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বসে। লজিতার মুখে নিতে কষ্ট হল না, বাধ্যটা যে মেনেদানে! কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই ও বলে উঠল, কি খামলে কেন, বলে যাও। উত্তরে কিন্তু বলেই থামার তিনি পূর্ব দৃষ্টিরই অঙ্গুরণ করলেন। লজিতা মার হুজি চেপে না রাখতে পেরে বলে উঠল, ওঃ! হুজি, তোমার আপত্তি কোথালো? কিন্তু থাকলেই য়ও, ত্র নেই জঙ্করী কথায় তোমারা ও কাণ দেবে না। ভাষার মেজ ভাবের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখ এদিকে যে কোন শিঙনা? বড়দা জঙ্করী কথা বলছে। তারপর তারাঙ্গাকে হাতের ঐংগিতে বলে, নাও, ক্ষুর কর—

তারাঙ্গা জানতেন, যে বিষয়ে তিনি লজিতার যোগে আলোচনা করতে চান, সেটা আলোচনা এই তৃতীয় ব্যক্তির মাঝে না হওয়াই ভাল, কারণ যে প্রকৃতির সে যোগ্য সমস্ত জ্ঞান হতে বিকট হেসে উঠবে, যা ভাষার রকম ঠাট্টা করতে সক্ষম করবে। তাই তিনি ইতস্তস্ত পরহিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকটা কেমন পেরে বসে, কোনোমতে বলে উঠলেন, যানে হ'চ্ছে, এই যার কি, কি বলে, যা' বলতে চাইছি সেটা তোমার দৃষ্টিতে নিয়েই, যানে এককথায় কি বলে, তোমার একটা পাকা বন্দবস্তই আমি করতে চাইছিলুম আর কি! হ্যাঁ—নাশে...

অহরকণ করে লজিতা বলে উঠল, মানে কি বলে এই আর কি, আমার বর্তমানটা তোমার কাছে খুব কাঁচা বলেই মনে হচ্ছে, না বড়দা? তাই কি বলে, ভবিষ্যৎ-যাতে সেটা বেশ পোক্ত হবে, সেই চেষ্টাই তুমি করতে চাও, এইত, অর্থাৎ মানে কি বলে, এক কথায় আমার একটা বিষয়ে করা উচিত, এই না? তারপর বেশ সহজ প্রণয় বলে, তা সামান্য এই কথাটা বলতে গিয়ে, তুমি একে কিছ্র হচ্ছে কেন? তার অল্প কষ্টেরই বিন্দুতো নিশ্চয়সাধিত না হয়ে তিনি বলেন, তা' তুমি আমার ব্যস্ত করতে চাইছ কর, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, কত বড় দায়িত্ব আজ আমার মাথার ওপর, যানে এ ঝুঁকি যদি নামতে না পারি, তবে হয়ত বাপ মার কাছে, সমাজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে আমার চিরনিই অপরাধী হ'য়ে থাকতে হবে, তাই—তাঁর কথায় বাধ্য দিয়ে লজিতা বলে উঠল, আহা কে জেনেছিল, দাদা আবাদের অভিমাত্রী, সামান্য কথায় তাঁর চোখ ছলছল করে কাঁদা পায়, তারপর কাউকে যেন না লক্ষ্য করে বলে যেতে লাগল, দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে করে যারা সমস্যার সমস্ত হুখ কষ্ট নীরবেই যেন গেল, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেববার মত একটা লোক জোটেনা, কিন্তু কেন জোটেনা, এর উত্তর বিতে গেলে দেখি, সেজন্তে আমরাই দায়ী, আমাদের খার্বার খার্বার থেকেটারকেই আজ সে জন্তে দায়ী বলে উঠিত। হঠাৎ প্রশংসক দৃষ্টিতে তারাঙ্গার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, না বড়দা, তাই না? জ্ঞাব বোধগাত হুয়ের কথ হঠাৎ যেন কেমন তিনি হতভয় হয়ে পড়েছিলেন, সেদিকে লক্ষ্য না করেই লজিতা বলে চলেছিল, সেই জন্তে আজ আমরা যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ই্যা আমিই ঠিকই বলছি নচেৎ সমাজ ঈশ্বর আর বাপবার কাছে আমরা অপরাধী থাকতে হবে, কিন্তু সে আমি কিছুতেই পারবো না। আড়চোখে একবার বোনের কাণে দেখে, মেজলা তার উদ্ধত হাসিকে কোনোরকমে মাঝে নিলে কিন্তু লজিতা বা তারাঙ্গার সেদিকে লক্ষ্য ছিলনা। লজিতা তখনও বলে চলেছে, তাই আজ আমরা অশুদ্ধ হতে হবে, ই্যা না বাবা, সমাজ ঈশ্বরের অধি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে

না বড়না ছুনি সেই চেষ্টাই কর, যাতে তোমাদের
নিমিস্তের ভাগী না হতে হয়, আমি বিয়েই করব।
তারাদাসের মনে যেন খোর লেগেছিল, কিছুই যেন বুকে
উঠতে পারছিলেন না, কেবলি মনে হচ্ছিল, হয়ত ওটা
একটা ভয়ংকর রকম ঠাট্টা নয় আর কিছু, তিনি আর
ভাবতে পারছিলেন না, মাথাটা কেনন যেন ওলিয়ে
যাচ্ছিল, তাই ফ্যাল ফ্যাল করে তিনি ললিতার মুখের

দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে একটা চাপা
নিঃশ্বাসের সংগে কেনন ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠে-
সবই বরাত, কে জানতো ছোটোদের বিক্রম
করবার জন্মেই ঈশ্বর বড়দের সৃষ্টি করবেন। হা
স্বরের মধ্যে একটা অস্বস্তি কোমলতা এনে ললি
বলে উঠে, নাঃ মাথো কি বলেছি দাদা আমার
অভিমানী...

[ক্রম

চারণের গান

অবস্খী সান্ধ্যান

বহুমারী-কড় স্বাপটা দিয়েছে এ মহাদেশ
দীর্ঘ জীর্ণ, ললাটে কালের শত প্রহার
এঁকেছে চিহ্ন, পীড়িত ক্লান্ত কঙ্কালশর।
এমাটি আমার প্রথম কামনা, কাম্য শেষ।

নিঃকরিয় হুরুক্ষেজে পৌরুষ নিঃশেষ ?
প্রতিহিংসার আত্মি শিখায় জন্মেজয়ের যাপ
প্রচ্ছন্ন। আত্মিক যত আহুক বজ্রতার
সম্প্রিয়। ধুম বোয়ায় রাখবোনা অবশেষ।
অতিশয় সে পিতৃলোকের বইবোনা দায়ভাগ।

কঙ্কালে তবু জাগে শিহরণ, ধ্বস্ত বাহুতে প্রাণ,
সহস্র পথে মিছিলে মিছিলে পদাতিক আশ্রয়ান,
একি অভিনব ! মারী-সন্ধ্যাসে বিদূর গবেজ্ঞান
হাঝারো মাহুৎস মুহূর্তে ভালো দূর্গতি অপমান।
হে মহাতারতী ! আমারও আজিকে সৈনিক সন্ধান।

গভীর

(পদ)

পালায়নী বল আর যাই বল ; স্থবীর কিং প্রতিজ্ঞা
বুকে—ব্যাচারামের অসহ জীবনটাকে সে স্থগত ক'রে
দুবাই।

...বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে ঠোট টিপলেন।

বেচারি বেচারাম ! পা-ছুটো তার একেবারেই নেই !
জন্ম থেকেই ও-ছুটো বিধাতা পুরুষ বাজেরাশ্র ক'রেছেন।
হনেছি, জন্মান্বদের নাকি চোখের জন্মে ততটা কষ্ট
হয় না, যতটা হয় তাদের—যারা চোখ হারিয়েছে এই
বাল্য-ভরা পৃথিবীটার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকার
শোটা পাকা হবার পর।

ব্যাচারাম জন্ম-বধ ; তাই তারও পায়ের ছংটা তত
প্রল ছিল না। ব্যাচারাম নিজেও অন্তত তাই বলে।
সে বলে,—যে শালা আফিম খেলোনা কোনোদিন,
আফিম না খাওয়ার ছংটা সে শালা বুকেবে কী ক'রে
বুন ? সে বুকেভেন আমার পিসে ! বয়ে পেতায়

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিও

হেড অফিস :—ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট বিল্ডিংস
বোম্বে

স্থাপিত :—১৯১৩

চলতি বীমা ২ কোটি টাকার উপর
মোট সম্পত্তি ৪৩ লক্ষ টাকার উপর

চীফ এজেন্টস্—

মোহন এণ্ড কোম্পানী

১০ নং ক্লাইভ রো

কলিকাতা

ফোন :—

ক্যালকাটা—২০৫৪

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

তারপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ না দিয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বাচারাম আর ভিকে করে না। বাস ছুয়েক হ'ল একটা ছোটখাটো তেলভাষার দোকান খুলেছে। পুত্র প্যাসারাম বেগুণী ভাঙ্গে, বাচারাম দোকানের হিসাব রাখে। সম্ভ্রতি স্বহীরের কাছে বানানু ক'রে বই পড়তেও শিখেছে। সন্ধ্যাবেলা রোজ স্নান ক'রে মহাভারত পড়া চাই। শুভ্র প্রতি সন্ধ্যায় অশ্রুত অবশ্যসারের পর দেখা যায় বেচারাম চারটে পঙ্কতির পাঠোচ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। যাই হোক, বেশ স্বখেই আছে, বাসা আছে বাচারাম।

স্বহীর ভাবে, তার প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে এতদিনে। বাচারামের জীবনটা সুস্থ হয়েছে বৈকি! গর্ভের আনন্দ আর স্মৃতিতে স্বহীরের মন উৎপন্ন পড়ে। সে আপন মনে চিন্তার ক'রে গুঠে—বাচারামকে আমি স্বহী করছি। সে স্বহী, সে স্বহী, সে স্বহী!

...অলক্ষ্যে বিবাহাপুণ্য তাঁর উপাত্ত হাসিটাকে হেঁচে, কেশে, ঘাড় চুলকে কোন রকমে চাপা দিলেন!

সেদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে স্বহীর বাচারামের দোকানে গিয়ে হাছির। বাচারাম পুত্র প্যালা বেগুণী ভাঙেন। প্রতিদিন বাচারাম পুত্রের পাশে বসে কেনাবেচা করে। তাঁকে দেখতে না পেয়ে স্বহীর ভিজ্জেন করে—তোমার বাবা কোথায় যে প্যালা?

বেগুণী ভাঙতে ভাঙতেই প্যালাবাম জবাব দেয়—সকালবেলা চোঁড়া গুলুতে বসে হঠাৎ যে ছাই হ'ল তাঁর উনিই গুলুতে; সেই থেকে গুলে কয়ে কেবলই স্বাদতে লেগেছেন—সারাদিন কিছুটা ধীরে কাটেন নি।

স্বহীর মনে মনে ভাবে, বোধ হয় কোন নিষ্ঠুর আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে বাচারাম। কিংবা হয়ত শুনের দেশে বানু এসেছে। কিংবা হয়ত আর কিছু।

স্বহীর ধীরে ধীরে পাশের ঘরে প্রবেশ করে। দেখে, বাচারাম তক্তপোষের ওপর উণ্ডু হ'য়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। স্বহীর দেখের সঙ্গে ডাকে—বাচারাম।

বাচারাম স্বহীরের গলা পেয়ে মড়মড় ক'রে উঠে; তারপর ধরা-ধরা গলায় বলে—আজ্ঞে। স্বহীর বলে—স্বহীর খারাপ?

—না, বাবু।

—কোন ছুঃসংবাদ পেয়েছ কি? আত্মীয়-স্বজনদের—

—আজ্ঞে না।

—তোমাদের দেশে কি বজা—

—দেশই আমার নেই তাই!

—তবে? কিসের তোমার অভাব তাই? কিসের কষ্ট তোমার ব্যাচা? কি ছুনি চাও? আমি আমি তার ব্যবস্থা করছি।

স্বহীর মনে মনে ভাবে, কীই বা চাইতে পারি বাচারাম! ভাল কাপড়? ভাল জামা? কিছু টাকা? কি হয়ত আরো কিছু মূল্যবান, আরো কিছু দুঃখাপা? তাই যাই হোক, যত মূল্যবানই হোক, স্বহীর তাঁর বেগুণী বাচারামের কাছে যা' মূল্যবান, স্বহীরের কাছে তারই এমন কিছু গুরুতর হবেনা—এ বিষয়ে স্বহীর নিঃশব্দে

স্বহীর আবার বলে—কী ছুনি চাও ব্যাচা?

ব্যাচারাম কথা বলে না! নিঃশব্দ ঘরের মধ্যে একটা টিক্‌টিক মাঝে মাঝে ভেঙে উঠছিল!

স্বহীর আবার বলে—বলা, কী চাও ছুনি?

সহসা নিজের মূর্তিবৃদ্ধ হাতের ভেতর থেকে একটা মোমুড়ানো খবরের কাগজের চোঁড়া বের ক'রে ব্যাচারাম স্বহীরের হাতে এগিয়ে দিয়েই হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে চোঁড়ার গা থেকে স্বহীর লক্ষ্য করবার মত পানি ছাড়া পড়ে পড়ে। আনন্দবাহারের পেগোয় পাতা দিয়ে তৈরী করা একটা গামাখ চোঁড়ার ভেতর কী থাকতে পারে বা' বাচারামকে এতবড় একটা আনন্দ দিতে পেরেছে! স্বহীর কিংকর্ষব্যবস্থিত হ'য়ে পরে

সহসা চোঁড়ার গায়ে পোঁড় পালের যে ছবিটা রয়েছে, সেই দিকে স্বহীরের দৃষ্টি আকর্ষিত করে গেল বাচারাম আনন্দবাহ ক'রে গুঠে—কী ছুনি বলে হতে চাই!

সঙ্গে সঙ্গে স্বহীরের জ্ঞানহীন দেহটা মাটিতে পড়ে!



মরার বাবুর মিত্র

[আলেকজান্দার পুশকিন]

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র

মরার বাবুর মিত্র আজিয়ার প্রোখোরোফের বাকী মিত্র-পত্রগুলো: মরা-টানা গাড়ীখানার ওপর রাখা হয়ে ছুটে নিষ্কীর ঘোড়া এই চতুর্ধবার বাসমানিয়া থেকে নিবিঃসন্ধিয়ার দিকে চলতে লাগল। মিত্র

গোনে বাড়ী বদলে যাচ্ছে। বোকানে তালি লাগিয়ে সে দরজায় একখানা পিচ-বোর্ড টাঙিয়ে লিখে দিলে—“বাড়িখানা বিক্রয় করা বা

মরা দেওয়া হবে।” তারপর হেঁটে চলল তার নতুন বাড়ির দিকে। হলদে রঙের ছোট বাড়িখানার কাছে গিয়ে সে কিছু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, তার

কোনো বাড়িখানি জন্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সেখানে যাইবা বহর ঘরে বিরাজ করেছে কঠোর শৃঙ্খলা। মিত্রের কাছ-কর্ষ ক'রে বসে তার মেয়ে ছুটি ও

স্বহীরকে সে মমকাতে স্তব্ধ করলে; তার পর নিজেই মরার মাহাঘর করতে লেগে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়িখানিতে শৃঙ্খলা দেখা দিল—রাসদার ও

চৌকিখানায় মনিবের ব্যবসায়ের মালপত্র রাখা হ'ল—নানা রঙের ও নানা আকারের মরার বাবু, লোকের

গোড়া টুপি, কোক ও মশাল। বাইরে দরজার মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল দৃষ্টদৃষ্টি

ভিতর গদি আটা হয়; মরার বাবু ভাড়া দেওয়াও হয়।

মেয়ে ছুটি তাদের ঘরে ঢলে গেল; আজিয়ার তার বাড়িখানার সব ঘুরে পরিদর্শন করলে; তারপর জানালার ধারে বসে চাদের সরগম সাজাতে বসলে।

শিক্ষিত পাঠকেরা জানেন, শেক্সপীয়ার ও ওয়াল-টার স্ট্রট হ'লই তাঁদের কবর-খনককে খুঁড়িবাঁধ ও

বাতাল করে তৈরী করেছেন, যাতে বৈদ্যপুত্র খুব বেশী করে আমাদের চোখে পড়ে। সত্যের খাতিরে, আমরা তাঁদের উদাহরণ মেনে চলতে পারি না, আমরা স্বীকার

করতে বাধ্য যে, আমাদের মরার বাবুর মিত্রটির নিরানন্দ পেশার সঙ্গে তার মেজাজের বিপরীত ছিল

চরমকথা। আজিয়ার প্রোখোরোফ ছিল খাদ্যগত: বিশ্বাস ও চিন্তাশীল। তার মেয়েদের যখন সে অলস ভাবে

দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে পথিকদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখত তখন তাদের ব্যবহার জন্ম ছাড়া অথবা তাদের

তার মালপত্রের আবশ্যক হবার মতো চুড়ীয়া—কখন কখন সৌভাগ্য—হ'ত তাদের কাছ থেকে খুব ভাড়া দাম

তার অস্ত্রাঙ্কিত পোষাকগুলোর অবস্থা ছিল শোচনীয়। সে আশা করছিল, দোকানদারের স্ত্রী বুঝা জুখিনার অস্ত্রাঙ্কিত থেকে তার এই লোকসানটী পূরণ করবে; সে এক বছরেরও ওপর মর মর হয়ে আছে; কিন্তু জুখিনা মুহূর্তশযায় রয়েছেন, রাসগোয়াউলি যাইতে প্রোথো-রোফের ভয় হচ্ছিল, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, পাছে তার উত্তরাধিকারীরা তাকে ততদূরে থেকে পাঠাবার কষ্টকর স্বীকার না করে কাছের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলে।

এই চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়ল দরজায় খুব জোর তিনটে শব্দ।

মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করলে, “কে?”

দরজাটা খুলে গেল; তারপরই ঘরে ঢুকল একটা লোক। প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে একজন জার্মান কারিগর বলে চেনা যায়। সে হাতখ মুখে মিস্ত্রির কাছে এগিয়ে গেল।

যে রুম ভাষা আমরা আজও না হেসে শুন্তেছি না, সে সেই ভাষায় বললে, “হে-সম্মানিত প্রতিভা! আমাকে কমা করুন। আপনাকে বিরক্ত করবার জ্ঞানামাকে কমা করুন।—স্বত স্বীয় সম্ভব আমি আপনাকে সঙ্গে পরিচয় করতে চাই। আমি একজন মুচি; আমার নাম গটলিয়ার শালৎজ। আমি রাস্তার ওপাড় আপনাদের জানালার সামনে ঐ ছোট বাড়িখানাতে পারি কাল আমার বিবাহের রোপা-জুবিলা উৎসব হয়ে আমি আপনাকে আর আপনার মেয়েদের আমদের সাথে খাবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।”

নিমন্ত্রণটা আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হল। মরার বাস্তব মিস্ত্রি মুচিটিকে বসতে ও এক পেয়াদা চা খেতে বলল। গটলিয়ার শালৎজ লোকটা ছিল দিল-খোলা। আরম্ভে মধ্যেই ছদ্মনে গল্প জুড়ে দিলে।

আসিয়ান জিজ্ঞাসা করলে, “আপনার ব্যবসা চলছে কিনা?”

শালৎজ উত্তর দিলে, “একরকম। আমি জুহুয়োগ করতে পারি না, আমার মাল-পত্র আপনাদের হাতে না। যারা বেঁচে থাকে তারা জুতো পায়ে না দিয়েও গলাতে পারে, কিন্তু মরা মানুষের বাস্তব না হলে চলে না।”

আসিয়ান বললে, “খুব গতি; কিন্তু জীবন্ত মানুষের জুতো কেনবার যদি কিছু না থাকে, আপনি জ্ঞান দোষ দিতে পারেন না, যে খালি পায়ে থাকে; কিন্তু মরা জিনিস বিনা পয়সাতেই তার বাস্তব পায়।”

এই ভাবে ছদ্মনে মধ্যে কিছুক্ষণ জ্বালাপ চলল, অবশেষে মুচিটি উঠে বাড়িয়ে মিস্ত্রির কাছ থেকে বিদায় নিল এবং তার নিমন্ত্রণটা আবার স্বাগিয়ে দিলে।

পরদিন ঠিক বারোটার সময় মরার বাস্তব মিস্ত্রি আর তার মেয়েরা তাদের বস্ত্র-কেনা বাড়ি থেকে বার হয়ে তাদের প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে চলতে লাগল। একালের ঔপজ্ঞানিকদের রীতি অনুযায়ী না চলে আমি আসিয়ান প্রোথোরোফের রুম-কাফশন বা তাঁর মেয়ে আনুলিনা ও দারিয়ার ইউরোপীয় প্রশাসনের বর্ণনা করব না। কিন্তু তাদের ছদ্মনেরই পায়ে যে হলদে স্নোক, পায়ে লাল জুতো ছিল এ কথা বলা অনাবশ্যক বলে মনে করি না; কেবলমাত্র বিশেষ উৎসবের দিনেই তারা এইভাবে পদত।

মুচির ছোট বাড়িটি নিম্নলিখিত গিয়েছিল ভরে। তাদের অধিকাংশই সস্ত্রীক জার্মান কারিগর ও তাদের স্ত্রীমহাদেবীরা। রুম সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিল মাত্র একজন। সে হচ্ছে, ফিন দেশের অধিবাসী ইওনকো—একজন চৌকিদার। নিমন্ত্রণের কর্মচারী হলেও গৃহবাসী তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখছিল। পচিশ বছর ধরে সে বিশ্বস্তার সঙ্গে তার কর্মব্য পালন করে আসছে। ১৮২২ সালের যে অধিকাংশও প্রাচীন রাজ-ধানীটিকে ধ্বংস করে ফেলে, তাতে তার হলদে রঙের ছোট চৌকি-ঘরখানাও গিয়েছিল ছাই হয়ে। কিন্তু শব্দের ভাড়িয়ে দেবার পরই, সেই ঘরখানার জায়গায় দেখা দেয় যেটে রঙ করা, সাদা রঙের ডোরিক স্তম্ভ বেওয়া নতুন আর একখানি। ইওনকো তার কুঠার ও

পায়ে লোহার বস্ত্র এঁটে আবার তার সামনে পাচারি করতে থাকে। যে-জার্মানরা নিকিংস্কাইরা ফটকের কাছে বাস করত, তাদের অধিকাংশেরই কাছে সে পরিচিত ছিল। এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার বাড়িতে রবিবারের রাত থেকে সোমবার অবধি কাটিয়েছে।

আসিয়ান অবিলম্বে তার সঙ্গে পরিচয় করলে যেন শীঘ্র বা দেহিতে তাকে তার দরকার হতে পারে। এবং নিম্নলিখিতেরা টেবিলে তাদের জায়গায় বসলে, তারা ছদ্মনে বসল পাশাপাশি। হের শালৎজ, তার স্ত্রী ও তাদের মেয়ে, লোৎচেন, সম্ভবত এক যুবতী, পাচককে পরিবেশনে সাহায্য করতে লাগল। বীয়ার বয়ে যেতে লাগল স্নোভের মতো; ইওনকো খেতে লাগল চার জনের খোরাক; আসিয়ান তার কাছে আর স্বীকার করলে না; তবে তার মেয়েরা নিজেদের মধ্যদা বজায় রাখল। জার্মান ভাষায় কথাবার্তা চলছিল; কিন্তু ক্রমে তা হয়ে উঠছিল অসংযত।

গৃহবাসী হঠাৎ সকলকে তার কথায় মনোযোগ দেবার অনুরোধ করে একটা বন্ধ বোতলের ছিপি খুলে রুম ভাষায় জোরে বলে উঠল:

“আমার প্রিয় লুইসার স্বাস্থ্য!”

ফোন : কলিকাতা ১৩৩২ গ্রাম : “ব্যাক্স ত্রিপুরা”

দি

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক

অফ ত্রিপুরা লিঃ

পৃষ্ঠপোষক : শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এল, আই

চীফ অফিস—আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট

হেড অফিস—গঙ্গাসাগর

কলিকাতা অফিস—১১, ক্লাইভ রো

ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ :

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মহারাজকুমার প্রজেক্টরিশোর দেববর্ধন

গোলাঘাট (আসাম) ব্রাঞ্চ ও মহ (হীহট) সাব-ব্রাঞ্চ

খোলা হয়চ্ছে।

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথায় কবে

?????

কিন্তু তার স্মৃতিকে
বাঁচিয়ে রাখা যায়
ছবির ভিতর দিয়ে।

সুন্দর স্টুডিও

আউট : কে, সি, খান্না
১৩৩৩, রসা রোড, ভবানীপুর।
(হাজরা রোডের মোড়)

ফোন : সাউথ ৪৪৫



করতে এল না কি? অথবা আমার নির্বোধ মেয়েগুলোর প্রশংসা। ওদের কাছে আসছে? নহে হচ্ছে, ভাল কথা নয়।"

মিজি তার বন্ধু ইওরকাকে ডাকবার কথা ভাবলে। কিন্তু সেই মুহুর্তে আর একটি লোক ফটকের কাছে এল। লোকটি ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে কিন্তু গৃহবানীকে তার দিকে তাড়াতাড়ি যেতে দেখে সে ঠাঁড়াল; এবং মাথা থেকে তার তিন কোণা টুপিটা হুল্লা। আফ্রিয়ানের মনে হল, তার মুখখানা চোনা, কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভাল করে দেখতে পারল না।

আফ্রিয়ান এক নিশ্বাসে বলে গেল, "আপনি এসে আমাকে অগ্রহণীয় করছেন। বিনতি করি ভেতরে চলুন।"

লোকটি খন মনে গলায় উত্তর দিয়ে, "বাবা, ভদ্রতা দেখাবার দরকার নেই। প্রথমে আপনাকে ভেরতে চুকুন; আপনাদের নিমন্ত্রিতদের পথ দেখিয়ে দিন।"

সৌভাজ দেখাবার সময় আফ্রিয়ানের ছিল না। সে ফটক খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল; তার পিছনে চলল সেই লোকটি। আফ্রিয়ান তার ঘরে লোক চলা-চল দেখে শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

সে মনে মনে বললে, "এ সবের মানে কি!" এবং তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে গেল। কিন্তু যে-দুশ্চ তার চোখে পড়ল, তাতে সে ঠাঁড়াতে পারলে না।

ঘরখানা মৃতদেহে ভরা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তাদের হৃদয়ে ও শীল মুখ, বসা গাল, রান, অর্ধ নিশীলিত চোখ, ও উঁচু নাক আলোকিত করে তুলেছে। আফ্রিয়ান তাদের নিজে সমাহিত করেছিল সেই সব লোককে চিনতে পারল; ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগল। আর যে-নিমন্ত্রিত তার সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল, তাকেও সে চিনল। যে ত্রিগোড়িয়াটিকে সে সেই প্রথম বৃত্তিতে সমাহিত করেছিল, লোকটা হচ্ছে সে। তারা সকলে, পুরুষ ও নারী, তাকে ঘিরে মাথা হুইয়ে, হাত তুলে অভিবাদন করছে। কেবল একটি লোক, এক হতভাগ্য ভিক্ষু, তাকে গম্ভীর বিনা পরসায় সমাহিত করা হয়েছিল, সে নিজের বেঁড়া ময়লা

পোষাকের দরপ লঙ্ঘিত হয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। সর্বস্বত্বের কাছ থেকে দূরে একটি কোণে মুখে ঠাঁড়িয়ে আছে। আর সকলেই পরে আছে পলিগো পোষাক। নারী মৃতদেহগুলোর মাথায় রয়েছে টুপি। রিবন, পদম্বল কণ্ঠসারীর গায়ে রয়েছে ইউনিফর্ম। তার তাদের দাড়ি কামানো নয়। আর, বাসখানারীরাও আছে উৎসবের দিনের কাফতান।

সেই সম্মানিত জনতার পক্ষ থেকে ত্রিগোড়িয়া বললে, "দেখুন, প্রোধোবাক, আপনাদের নিমন্ত্রণে আসতে উঠে এসেছি। কেবল ঘাঁড়ের আসবার সময় নেই, ঘাঁড়া ভেঙে শুঁড়িয়ে গেছেন, কেবল হাড় ছাড়া ঘাঁড়ের আর কিছুই নেই, তাইই রয়ে গেছেন। আর এঁদের মধ্যেও একজনের ঘাঁড় থাকবার ঐর্ধ্য ছিল। তিনি এসেছেন—তার আসবারও আপনাকে কেবল ঠাঁড় এত ইচ্ছা।"

তখন একটি ছোট কদাল জনতার মাঝ দিয়ে পথ করে আফ্রিয়ানের দিকে এগিয়ে এল। তার মাথায় মুখে হাসি দেখা গেল। তার গায়ে এখানে-সেখানে ফুলছিল সবুজ ও লাল কাপড়, হেঁড়া, পচা ছাভাক্সের কপের কোলে খুঁটির গায়ে। আর, হাটবানবিশের মা উঁটির মতো তার পায়ের হাড়গুলো জ্যাকবুটের মতো করতে লাগল—বটু-বটু।

কদালটি বললে, "প্রোধোবাক আমাকে তুমি মিস পারছ না। আমাকে ভোমার মনে পড়েন না? হুইকি মনের সেই অবসরগ্রাণ্ড সারজেন্টি পিটার পেংরোভিৎ ফৌরিলকিন যার কাছে ১৯২৯ সালে তুমি মরার বাব্বর পেয়েছিলে—তাও ওকের বদলে বামোটি করেদারসিন করেই।"

এই কথা বলে সে অগ্রিম হাত ছুঁবানি আফ্রিয়ানের দিকে বাড়াল। কিন্তু আফ্রিয়ান, তার সমস্ত শক্তি চীৎকার করে উঠে তার কাছ থেকে তাকে ছেঁদা গরিয়ে দিলে। পিটার পেংরোভিৎ টলতে উঠে পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। মৃত্যু গুলির মধ্যে উঠল ক্ষোভের গুজন; সকলে তার সম্মানসম্বন্ধে উঠে ঠাঁড়াল; তারা আফ্রিয়ানকে এক

ঝোড়ে ও পালাপালি দিতে লাগল যে, তাদের চীৎকারে তার কানে তালি ধরে গেল; সে ভয়ে প্রায় মারা যেতো হয়ে মনের হৃদয় হারিয়ে ফেলল এবং বসরগ্রাণ্ড সারজেন্টি হাড়গুলোর ওপর টলে পড়ে মরে গেল।

যে বিধানাটতে মরার বাব্বর মিজি শুয়েছিল তার ওপর বহুকণ বোম এসে পড়েছে। অবশেষে সে চোখ মেলে দেখে তার সামনে কুত্যাটি চা উঠেই করছে। আফ্রিয়ান আতঙ্কে আগের দিনের সমস্ত ঘটনা মনে করতে লাগল। তার মানসক্ষে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠতে লাগল, জুবিনা, ত্রিগোড়িয়ার ও সারজেন্টি ফৌরিলকিন। সে অপেক্ষা করতে লাগল, পলিগোরাটি ধন্য তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে গত রাতের ঘটনার মনেদ্রা তাকে দেবে।

ক্রোশ গাউন্ট তার হাতে দিতে দিতে আক্সিনা ফলে, "বাবা, কেমন ঘুমিয়ে ছিলেন? আপনাদের প্রতিবেশী দর্জি এসেছিল; আর চৌকিদার আপনাকে খবর দিতে এসেছিল যে, আজ তার নামকরণের দিন। কিন্তু

আপনি এখন ঘুমিয়েছিলেন যে, আপনাকে আমাদের জগতে ইচ্ছা হয় নি।"

—"পরলোকগত জুবিনার কাছ থেকে আমার কাছে কি কেউ এসেছিল?"

—"পরলোকগত? তা হলে কি সে মারা গেছে?"

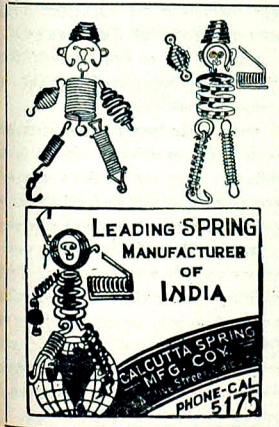
—"কি বোকা তুমি! তুমি নিজেই কি কাল আমাকে তার অশুষ্টির জিনিষপত্র ঠিক করতে সাহায্য করনি?"

—"আপনার কি বাবা খারাপ হয়ে গিয়েছে, বাবা, না, কালকের সেই মদের খোর এখনও আপনার কাটে নি? আপনি সারাদিন ঘরে জামানটার বাড়ীতে নিরন্তর খেয়েছেন; তারপর বাতাল হয়ে বাড়ী এসে বিছানায় পড়েছেন। তারপর এককল অবস্থা ঘুমিয়েছেন..."

—"বাস্তবিক!" মরার বাব্বর মিজির মন খুব হালকা হয়ে গেল।

—"তাই তো।"

—"ব্যাপার যখন তাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চা উঠেই করে আমাদের মেয়েদের ভেঁকে দাও।"



ফোন :
বি, বি ৭৭২

হাল ক্যাসানের
জড়োয়া গহনার
বিশস্ত প্রতিষ্ঠান

শোভরাজ এণ্ড সন্স

(হীরা, মুক্তা ও শ্লিক ব্যবসায়ী)

আসল হীরা, মুক্তা, পাঠা ইত্যাদির
সর্ববিধ অলঙ্কার স্বেচ্ছা মূল্যে
আমদারী প্রস্তুত করি।

শো রুম : ডি.১, সার হুইটলি হপ বার্কট

আপিস : ৮১, হারিসন রোড,
(কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়)
কলিকাতা।



মুক্তোত্তর ভারতের সংগঠন

স্মার, এম. বিবেচনাধার, প্রেসিডেন্ট, অল ইণ্ডিয়া ম্যাগনাকচারার্স অর্গানাইসেশন।

(বঙ্গভাষায়)

মুক্ত জমাগত যতই আমাদের অহুসে যাইতেছে, মুক্তোত্তর কালীন সংগঠন প্রশ্ন ততই মুক্তের জাতিদের চিত্র মনোযোগে আকর্ষণ করিতেছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থ, মনোভাব, ও দৃষ্টিভঙ্গি অস্বাভাবিক নানাকল্প, ধৃষ্টতা ও বিবিধ ব্যবস্থার সমাবেশ হইতেছে।

মুক্তোত্তর আন্তর্জাতিক কার্য—মুক্তোত্তর সংগঠন কার্য দুইটি পৃথক ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে যথা—(১) মুক্তের অব্যবহিত পরে, মুক্তাবস্থা হইতে শান্তির দিকে পরিবর্তন রূপ কার্য (২) জাতির জীবনের অন্তর্নিহিত অবস্থাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত যুদ্ধের সংগঠন কার্য। বোধ হয় সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে, হলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী হইতে অবসর প্রাপ্ত লোকদের কাজে নিযুক্ত করা ও তাহাদের উপযুক্ত কাজ অন্বেষণ করা। যাহারা মুক্তের কাজে সংশ্লিষ্ট ছিল, এবং যে সকল বৈশ্বাধিক কল্পী মুক্তের সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের জন্য বিশেষ প্রকারের কাজ শ্রমগ্ৰহণ করিতে হইবে। কিছু লোককে অবশ্য সমুদ্র পরিবহিত আবাদ ভূমিতে নিয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু এদেশের কৃষি ভূমিতে লোকসংখ্যার অত্যন্ত অধিক চাপ পড়ায়, কারিকরদিগের অধিকাংশকেই শিল্প ও কৃষিবিহীন কর্তব্যে নিযুক্ত করা মুক্তিসঙ্গত।

প্রথম ভাগের পরিবর্তনের মধ্যে আর একটি কার্য হইতেছে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি, শিল্প, ও কারখানা প্রভৃতিকে সাময়িক অবস্থা হইতে শান্তির উপযোগী করিয়া তোলা।

কয়েকটি সময় উৎপাদনকেন্দ্র ও যন্ত্রপাতি, 'ডিসেম্বর' বিভাগের অল্প ও গোলাবারুদ প্রভৃতির জন্য চিহ্নিত ভাবে চালাইতে হইবে। সময় উৎপাদন কেন্দ্র একে একে সৈন্যবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি প্রদেশে বন্টন করা যাইবে। কৃষিকার্য সংস্থার আকাঙ্ক্ষা করে, চাষ চক্রবৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থশাস্ত্র চাষ পরিচালিত ব্যক্তি। গভর্নমেন্টের কেন্দ্রস্থলে শাসন প্রণালীর যে বাধা আমাদের জানা আছে তাহা হইতে মুক্তোত্তর কোর্টাই পূর্ণ হইবার আশা নাই।

যুদ্ধের জন্ম এমনি যে সকল 'এমার্জেন্সী' বিপর্যয় গড়িয়া উঠিবে, অবস্থা স্বাভাবিক খাটলেই তাহাদের ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

সংগঠন কমিটির মনোযোগ আকর্ষণ করিবে প্রথম সমতার ব্যবহার, মুদ্রাক্রান্তিনাশক ব্যবস্থা ও যুদ্ধ শ্রমিকসমূহ। তাহা ছাড়া যুদ্ধ শিল্প ও যন্ত্রের একটি শাখা হইলে তাহাদের যথার্থ বৃত্তা নিকারিত হওয়ায়ও সকল যন্ত্রপাতি ও ক্রয় সম্ভার সম্ভারহাদের সুবিধা হইবে।

প্রকৃত সংগঠন কার্য—যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরে যাহা যাহা কর্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। বিপর্যয় পূর্ণকালের অর্থ, জাতির ভবিষ্যৎ পন্থার একটি অঙ্গীকার মূলক নীতি নির্ধারণ করা। এই নীতি মানব জীবনের বৈদিককে স্টেটন করিবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শ্রমিক, শিকার। অধিকাংশ জাতিই অর্থনৈতিক ব্যাঘাত অথবা প্রধানতঃ জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যাঘাতে সংগঠনকার্য সীমাবদ্ধ রাখেন। মুক্তের

[১৫০]

প্রকারে ধাতুকে শিল্পকে ভারতীয় বণিকদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা হইয়াছে। এই জন্য ভারতীয় স্বার্থের ক্ষেত্র ব্যাপ্যত করা হইয়াছে, সংগঠন কালে তাহার সম্ভব প্রতিকার ও পূরণ করিতে হইবে।

সরকারী কার্যস্থলী ও শাসনপ্রণালীর চরম লক্ষ্য যেরূপে করা যাইবে জনসাধারণের জীবন বাপনের আদর্শকে প্রকাশ করা যায়। কৃষিকার্য সংস্থার আকাঙ্ক্ষা করে, চাষ চক্রবৃদ্ধি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থশাস্ত্র চাষ পরিচালিত ব্যক্তি। গভর্নমেন্টের কেন্দ্রস্থলে শাসন প্রণালীর যে বাধা আমাদের জানা আছে তাহা হইতে মুক্তোত্তর কোর্টাই পূর্ণ হইবার আশা নাই।

যুদ্ধের জন্ম এমনি যে সকল 'এমার্জেন্সী' বিপর্যয় গড়িয়া উঠিবে, অবস্থা স্বাভাবিক খাটলেই তাহাদের ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

সংগঠন কমিটির মনোযোগ আকর্ষণ করিবে প্রথম সমতার ব্যবহার, মুদ্রাক্রান্তিনাশক ব্যবস্থা ও যুদ্ধ শ্রমিকসমূহ। তাহা ছাড়া যুদ্ধ শিল্প ও যন্ত্রের একটি শাখা হইলে তাহাদের যথার্থ বৃত্তা নিকারিত হওয়ায়ও সকল যন্ত্রপাতি ও ক্রয় সম্ভার সম্ভারহাদের সুবিধা হইবে।

যন্ত্রের সৌন্দর্য্য আসবাব পত্র।

বেঙ্গল ফার্মিচার

—সিগ্ণিকট—

মিলিটারী ও গবর্নমেন্ট সাম্রাজ্য

৮বি, রমা রোড, ভবানীপুর

(চিত্তরঞ্জন সেবাগদনের সম্মুখে)

ফোন—২৮৫ ৭২৭

আমাদের তৈয়ারী আধুনিক রুচিসম্মত

ফার্মিচার ব্যবহারে আপনাদের মার্জিত রুচির

বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

[মুক্তোত্তর ভারতের সংগঠন]

জাতির অতীব অভিযোগ তলাইয়া দেখুন এবং এক নতুন জাতি নির্মাণের জন্য গঠনমূলক নীতির উদ্ভাবন করুন।

শিল্পকে উৎসাহ দান—পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়, নিজে একজন কতগুলি শিল্পের নাম করিব। আমরা সর্বসাধারণকে ঘোষণা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করি যে সরকার নব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সম্ভব সহায়তা করিবেন। প্রয়োজনীয় প্রধান শিল্প—রেসলিং, দাহগর্ভ ইঞ্জিন, মোটরকার, বিমান, জাহাজ নির্মাণ, যন্ত্র প্রভৃতির জন্য যন্ত্রপাতি ও অজান্তে বয়সি নির্মাণ, ইলেক্ট্রিক শিল্পের বিস্তার, ধাতুজ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ধাতুজ, পদার্থ শিল্প, রজন শিল্প ও রজন শিল্প।

“অল ইণ্ডিয়া ম্যাগনাকচারার্স অর্গানাইসেশন” একটি কার্যস্থলী তৈয়ার করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে অবস্থিত দুইটি করিয়া ধাতুজ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য প্রাদেশিক প্রধান পৌরজনকে অবহিত করা হইবার চেষ্টা

সমগ্রাণমূলক উপপন্থা। ...সমান্তরাল সংস্থার ও প্রাথমিক শিল্পীদের সংগত প্রচলনরূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। —“আনন্দবাজার পত্রিকা”

সমগ্রাণমূলক উপপন্থা **ছবি** 'বেদান্ত' প্রণীত মূল্য—১।০

‘নৃতন ধরণের উপপন্থা লেখক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। —“শনিবারের চিঠি”

‘বিভিন্ন চরিত্রের আলোচনা স্বল্পরূপে অঙ্গিত হইয়াছে’ —‘হোটেলাইব’ (নিউ থিয়েটার)

‘উপপন্থাধার্মিক মধ্য দিয়া একটি চিত্রাঙ্গীল সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়’—

কবি—‘প্রবাসী’ ও ‘Modern Review’র পৃষ্ঠক সমালোচক

(‘প্রবাসী’ ও ‘Modern Review’র পৃষ্ঠক সমালোচক) প্রাণিস্থান: ডি, এম, লাইব্রেরী

সর্বত্র অথবা ৪২ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

Distributor : SUDHIR BOSE

16, Beadon street, Calcutta.

করিতেছেন। যদি এই চেষ্টা ফলবতী হয় তাহা হইলে ভিন বৎসরে আমাদের দেশ এই দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইয়া পড়িবে।

মুক্তাবস্থায় পূর্বতন শিল্পকে কাজে লাগান হইয়াছে, মুন্দের সহায়তা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি নূতন শিল্প জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু, সরকারের নিষ্কৃত্যতা দেওয়া স্বত্বেও শিল্পের যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রসর করিবার দিকে দেশ যুক্তপ্রভুত এই সুযোগ মোটের উপর গ্রহণ করিতে পারে নাই।

দেশরক্ষার জন্য লোকবল ও যন্ত্রবল:—ভারতকে স্বাধীনশাসন দেওয়ার অঙ্গীকার করা হইয়াছে। যখন ইহা বাস্তবে পরিণত হইবে, তখন দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম অবশ্যই করিতে হইবে।

ভবিষ্যৎ দেশরক্ষার ব্যবস্থা দুই প্রকারের হইতে পারে (১) সামরিক বিজ্ঞানের শিক্ষা, সামরিক কায়দা ও নিয়মাহুর্বাতিতা এবং (২) সাজসরঞ্জাম ও দেশরক্ষার যন্ত্রাদি নির্মাণের ক্ষমতা। ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিই সামরিক বিজ্ঞানের নৌবিতাগের ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ভান লইবে। পৃথক সামরিক বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে।

যদ্যে শিল্পিত দেশরক্ষার যন্ত্রপাতির মধ্যে থাকিবে কামান বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বিমান, ট্রাক, গুলিবন্দুক, জাহাজ ও সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ। বেসামরিক শিল্পকে যদি পূর্ণাঙ্গ করা যায় তাহা হইলে যুদ্ধকালে এই সকল জরায়ির প্রয়োজন মিটাইতে পারে। জাহাজ নির্মাণ দেশরক্ষা ও বেসামরিক ব্যবহারের জন্য বিশেষ দরকারী।

সংগঠন কমিটির সমুখে কর্তব্য:—ভারতের রাজনৈতিক ও সাধারণ জীবনযাত্রায় বহু অস্বাভাবিকতা প্রবেশ করিয়াছে। একমাত্র ব্যাপক ও মৌলিক সংগঠন বিধি দ্বারা ইহা অপনয়। বিদগ্ধ পৌরজনের কমিটি জগতের আধুনিক জ্ঞান, সামাজিক বৈজ্ঞানিক আদর্শ ও দেশসেবার আদর্শে সমৃদ্ধ হইয়া অহুমোদন করিলে তবেই এই কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রথম প্রয়োজন দেশকে স্বাবলম্বী করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত ধাতুজ ও কেমিক্যাল শিল্পকে যুদ্ধকালে দেশ হইতে

দূরে রাখা হইয়াছে যথাশক্তিব শীঘ্র তাহার প্রবর্তন করা যে সকল ধাতুজ শিল্পের নাম আনি পূর্বে করিয়া তাহার প্রতি আমি সকলের বিশেষ ভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করি।

দেশের শিল্প জীবনকে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে শিল্পের জন্য পাঁচ বৎসরের কার্য্যহীনতা অহুসারে ১০ হাজার কোটি টাকার মূলধন ব্যয় করা দরকার। ব্যবসায়ী অথবা মহাজন গৃহিণী গর্ভমেটের দৃষ্ট প্রভেদে ভারত প্রদত্ত ভ্রব্যসামগ্রীর বিপুলতা ও মূল্যের কথা অস্মি আছেন তাহার অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে এই প্রকল্প কিছু অসম্ভব নহে।

ঐ পঞ্চবাৎসরিক কার্য্যহীনতার অন্তর্গত এই ব্যয় থাকিবে যাহা দ্বারা ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে রূপী শিল্প হইতে উৎপাদন হ্রাস হয়।

প্রত্যেক জেলায় নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত যথার্থ উৎপাদন সংখ্যা ও বিবরণ তালিকা রাখা হইবে। ইহা হইতে নিরূপিত হইবে যে যে জনসাধারণ যে ভ্রব্য উৎপাদন করিবে বা তাহার যাহা উপার্জন করে তাহা তাহাদের জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট কিনা। এই বিবরণী তালিকা অভাব শাসনতন্ত্রের স্থিতিস্থাপক করে এবং বর্তমান মত জরুরী অবস্থায় এক মহা বিপদের সৃষ্টি করে।

যেক্ষণ রাশিয়ায় সম্ভ্রুতি চেষ্টা করা হইয়াছিল, সেখানেও শতকরা ১০ হইতে শতকরা ৬০ পর্যন্ত শিল্পিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। বায়তম জনশিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার সমর্থক প্রদ্বারা। যতক্ষণ না কোন জাতি শিক্ষিত হয় ততক্ষণ জানিতে পারে না কিরূপে জীবিকা অর্জন করিতে কিরূপে আয়ত্ত্ব করা করিতে হয়।

সংগঠনের দ্বারা কর্মী তাহার এমন পদ্ধতি অর্জন করিবেন যাহাতে সকল ব্যবসায়ের কর্মে দক্ষ বাকি উন্নতিশীল দেশসমূহের আদর্শাধ্যায়ী নিজ নিজ বৃত্ত কার্য্যাপযোগী সর্বোচ্চ বিভাগ গুলি, ও সামগ্রী অর্জন করি শিক্ষা পায় ও তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইতে অবসর পায়। *

* "ইণ্ডাস্ট্রি"তে নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।

বর্ণে টকীজের "হানারী বাত"

চিত্রের দুইটি দৃষ্ট



দেবিকারাগী



মমতাজ আলী ও

তার সঙ্গিনী





“তানসেন” ছবিতে
তানির ভূমিকায়
খুরশীদ

“তানসেন” ছবিতে
নাম ভূমিকায়
সায়গল



চলতি ছবির সমালোচনা

য়ানসেন—সিলেট পিকচার্সের পরিবেশনায় ত্রিগুপ্তি ভিটোনের “তানসেন” গত এই নভেম্বর থেকে—উত্তরা, পূর্ব, পূর্ববী ও জ্যোতি এই চারটি সিনেমাগৃহে একই মত প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন ময়র দেশাই এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন খেমচাঁদ প্রকাশ। আলোকচিত্র গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণের ভার যাক্সো পোর্জনভাই প্যাটেল ও কে, জি, সাহার ওপর ছিল।

ভারতীয় গানের শ্রেষ্ঠ গুণী তানসেনের জীবনীকে বস্তু করে ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। এক গরীব কুম্বলমানের গৃহে তানসেন মাহুদ হ'ন। বাল্যকাল থেকে তানসেন ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়। অল্পদিনের সঙ্গীত শ্রবণের ফলে তানসেন হয়ে ওঠেন একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। এই সময় হঠাৎ তাঁর আলাপ হয় তানি বলে একটি চাষার মেয়ের সঙ্গে। এই তানির সহ-জীবিতায় তানসেন লক্ষ্য করেন যে সঙ্গীতের আত্মা এই রস, শুধু মাত্র এই কায়দার মধ্যেই নেই—এই ভাল, বেগ, লয় সব কিছুই অতীত লোকে তার বাস। তানসেনের প্যানের প্রাণ ও প্রেরণা ছিল এই তানি—তানির সঙ্গে তাঁর গান এক হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেসব ছিলেন তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে অক্ষপায়ক, মানে, গান বলতে ধারা শুধু গলাবালিই বরুতেন তাঁদের ভুল ভেঙ্গে দিতে। তানসেনের গানের ব্যাতি শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—তাঁর নিয়ন্ত্রণ আসে যোগল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে। তাঁর নব-রত্নের নবম গুণী আসন পূর্ণ করতে হয় তানসেনকে। তানিও তাঁর সঙ্গে আগায় এসে মিলিত হয়। আকবর তানিকে

সরিয়ে নিতে চাইলেন—তাঁর গানের একনিষ্ঠতা বাধা হতে পারে ভেবে। তানি যে তানসেনের কণ্ঠখানি তা তিনি জানতেন না। তানির সঙ্গেই তানসেনের প্রাণ থেকে গান চলে গেল।

এর মধ্যে আকবরের কড়া অস্বস্তি হয়ে পড়েন। তাঁর মন ভাল রাখার জন্ত তানসেনকে একখানি “দীপক রাগ” গান গাওয়ার জন্ত বলা হয়। বহু অধরোদ্বের পর তানসেন “দীপক রাগে” গান করেন। কিন্তু এই “দীপক রাগ” তানসেনের শরীরে ও আত্মায় আত্মীয় আশ্রয় জাগিয়ে দিল। কন্ঠব্যবস্থায় তিনি বেরিয়ে পড়েন তানির উদ্দেশ্যে। পথে দেখা হয় তানির সঙ্গে। তানি “মলহার”

শহরের ধূলিধূসর ও কৃত্রিম পরিবেশের
বাহিরে পল্লীর স্নিগ্ধ শ্যামলতার মধ্যে
পরিকল্পিত

ইকোণ টকীজের
শহর থেকে দূরে

রচনা ও পরিচালনা :
শৈলজানন্দ

ভূমিকায় :
জহর, দীপাজ, মলিনা, রেমুকা,
নরেশ মিত্র, প্রভা প্রভৃতি।

আসন্ন-মুক্তি প্রতীক্ষায়।

রাগে গান ধরে, সেই গানে আকাশ থেকে নামে বৃষ্টি।
তানসেনের গানের আশ্রিত নিতে যায় এই বৃষ্টির জলে—
এইভাবে তিনি বাঁচায় তানসেনের প্রাণ।

ছবির চিত্রনাট্যের রচনার মধ্যে খুব সামান্যই
ঐতিহাসিক ঘটনার সন্নিবেশ দেওয়া হয়।
পরিচালক জয়ন্ত দেশাই কাহিনীর দিকে লক্ষ্য না রাখায়
ছবিখানি হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকটি সঙ্গীত ও শব্দর
দৃষ্টান্তবীর সমাবেশ। ছবির গানগুলি সত্যই প্রশংসনীয়।
সঙ্গীতপেশা অধিক প্রশংসনীয় ছবির চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ
—তারতীয় চিত্রে একপ্রকার উজ্জ্বলতার চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ
খুব অল্পই দেখে পড়ে। গানের স্বর সংযোজন ভালই।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই
বলতে হয় যে অভিনয় মনোভূমি দেখাবার স্বেযোগ কাহারও
যেলেনি। তবে তানির ভূমিকায় দুরদীর্ঘের অভিনয়
তানসেনের ভূমিকায় গায়গলের অভিনয় অপেক্ষা ভালই।
অপরায়ণ ভূমিকায় মননসই। সাধারণ ও পুরস্কারের গান
ছবিখানির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

ছবিখানির কাহিনী চর্চাল হলেও সঙ্গীতমুগ্ধ ছবি
হিসাবে “তানসেন” একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি একথা বলা চলে।
দেবর :—গত ৬ই নভেম্বর থেকে ইন্সপ্তরী ইন্ডিওর নতুন
বাংলা ছবি “দেবর” চিত্রায় চলছে। স্বীয় রচিত
কাহিনীকে অলঙ্কর করে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন
প্রবীণ পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। গানের
স্বর দিয়েছেন সুবল দাসগুপ্ত এবং চিত্র গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ
করেছেন অমল দাসগুপ্ত ও জে, ডি, ইয়াগী। বিভিন্ন
ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন যমুনা, অহীক্স, ছবি, ইন্দু, জহর,
জান লাহা প্রভৃতি আরো অনেক।

সুখের সংসারে ছুটি প্রাণী—যেহুশীল ভাই স্বরেন
আর যেহুয়ী ভগ্নী নমিতা—এদের দু'জনকে কেন্দ্র করেই
ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। স্বরেন ব্যাঙ্কে কাশিমিরের
কাজ করে আর নমিতা পড়ে কলেজে। নমিতা ভাল-
বেসেছে এক পরিচরয়ী শিল্পী রবীনকে। হঠাৎ স্বরীর
নামে একটি ভীষণ চরিত্রের লোক আবির্ভাব হয় স্বরেনের
জীবনে এবং তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই সুখের
সংসারে তানন ধরে। স্বরীরের প্রেরণাচনায় স্বরেন

ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে বিশ হাজার টাকা নষ্ট করে
তার ফলে স্বরেনের প্রায় জেলে যাওয়ার অবস্থা হয়।
ব্যাঙ্কের ম্যানেজার স্বরেনের সহপাঠী পাকায় সে সাহ-
সিনের সময় পায় এই টাকা পরিশোধ করবার। যি-
সাতদিনে এত টাকা সে পাবে কোথায়? সে খির কয়
পৈতৃক বাড়ী বিক্রী করতে এবং তার বরিসদারও ছুটি
দেয় স্বরীর। হুঁচকায় যখন দেখা দেয় তখন সকল মি-
থেকেই দেখা দেয়। এদিকে নমিতার বন্ধু রবীন্দ্র
যেতে হয় সাগর পারের শিল্পী সখিলিনীর সভায় যোগদ-
ন করতে। নমিতা ঘৃণাক্ষরেও দাদার এ বিপদের সা-
জানতে পারেনি। প্রথম সে জানল যেদিন বিপদটি
বন্ধু ধনী যোগেনবাবু বাড়ী কেনবার জন্ত তাদের বাড়ী
এলেন। যোগেনবাবু বাড়ী দেখতে এসে তখন
নমিতাকেও দেখে গেলেন। রব্রের ম্যানেজার বিয়-
টার সঙ্গে নমিতার বিবাহের প্রস্তাব করে কিন্তু যোগ-
বন্ধু যোগেনবাবুর সহিত ভদ্রীর বিবাহের প্রস্ত-
প্রস্তাধান করে। এদিকে দেখতে দেখতে সাত দিন
কেটে যায়। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কোন করে
স্বরেনকে ধরবার জন্ত পুলিশ যাচ্ছে আর এ কোন করে
নমিতা। নমিতা বন্ধু পরিকর হয় তার দাদাকে বাঁচা-
নিজের জীবনের স্বপ্ন স্বাক্ষর বিসর্জন দিয়ে যোগ-
বাবুকে জানায় যে সে রাজী আছে তাঁকে দিয়ে করবে
যোগেনবাবু টাকা দিয়ে তাঁর শালার মান বাঁচ-
নমিতার বিবাহ হয় যোগেন বাবুর সঙ্গে। প্রক-
নমিতা তাঁকে পারেনি স্বামীকে অধিকার দিতে, যি-
কিছুদিন পরে সে তাঁকে বাসীরে পূর্ণ অধিকার দে-
ওদিকে স্বরেন এ ব্যাপারে ভেঙ্গে পড়ে স্বরীরের সা-
যনিতভাবে পরিচিত হয়ে স্বরীরের প্রকৃত রূপ দেখ-
পায় ও তার কবল থেকে উদ্ধার করে যা-
পরিভক্ত। এক রমণী—চন্দ্রাকে। স্বরেন চেষ্টা যা-
চন্দ্রাকে নমিতার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে। এদিকে
যোগেন বাবুর ভাই ফেরে বিলাত থেকে—নমি-
দেখে যে তার দেবরই হচ্ছে সেই পরিচরয়ী
রবীন, যাকে একদিন সে তার মনপ্রাণ দিয়েছিল।
রবীন দাদার এই জঘন্য কাজকে ক্ষমা করতে পারে

করবে দাদাকে। জাতগত প্রাণ বন্ধ যোগেন
বাঁইয়ের শোকে প্রাণ হারালেন—নমিতা হ'ল
না। নমিতা আসে রবীনের কাছে তার দাদার
স্মৃতি তার হাতে তুলে দিতে, কিন্তু রবীন সম্পূর্ণ চায় না
পূরণো দিনের মত ফিরে পেতে চায় নমিতাকে।
সমস্যা জটিল বরদাস্ত করতে পারেনা আর নমিতাও
মন পূরণো দিনে ফিরে যেতে। তারপরের ঘটনা
নি অল্পে পড়লো—নমিতা তাকে নিয়ে এলো তার
পিত্ত, নমিতার সেবায় সেের গুটে রবীন। এতদিনে
রবীন তার জুল বোঝে এবং নমিতাকে তার প্রাণ্য
বিহার “নৌদি” বলে সম্বোধন করে। এদিকে স্বরেন
তার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে কিন্তু সত্যতার স্বরীর
এ বাধা দেয় এই বিয়েতে—কারণ চন্দ্রা স্বামী
বিভ্যক্তা, সমাজের চোখে পতিতা। বরপক্ষ হয়
স্বামী রিতে অসম্মত—কতাপক্ষকে অবমাননার হাত
কর রাখে করে সমাজক্রোধী রবীন। রবীন ও তার

নববিবাহিত পত্নীকে আশীর্বাদ করতে এসে নমিতার
মিলন হয় স্বরেনের সঙ্গে। এই ধানেই হয় ছবির
পরিসমাপ্তি।

ছবির কাহিনী রচনায় জ্যোতিষবাবু সমাজের বিরুদ্ধে
ধানিকতা অভিযান করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ
পর্যন্ত রুতকাণ্ড হতে না পারায় ছবির কাহিনী হয়েছে
সাধারণ শ্রেণীর। পরিচালনার মধ্যেও তিনি বিশেষ
কিছুই নতুন দেখাতে পারেননি। তরুণ সঙ্গীত
পরিচালক সুবল দাসগুপ্তের সঙ্গীত পরিচালনা ভালই—
তবে শব্দ গ্রহণের জটিল জন্তে গানগুলি যায়গায় যায়গায়
ভাল শোনায়নি। গানগুলি মোটের উপর চলনসই।
শব্দ গ্রহণ ও চিত্র গ্রহণ নিখুঁত নয়।

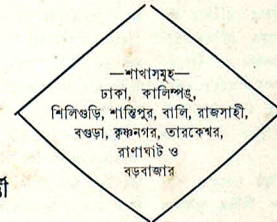
অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই
যমুনা দেবীর অভিনয়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর মার্জিত
এবং সংযত অভিনয় সত্যই প্রশংসনীয়। এর পর
অভিনয়ের অন্য প্রশংসা দাবী করতে পারেন অহীক্স

— জাতীয় কলাপেীর আদর্শে অনুপ্রাণিত —

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :
৩ ও ৪, হোয়ার ষ্ট্রট,
কলিকাতা



ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
মিঃ এম. কে. চক্রবর্তী

ফোন :
ক্যালকাটা—৬১১

শ্রাম্যবাজার শাখা
খোলা হইয়াছে।

চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস এবং ইন্দু মুখার্জি। অপরাপর ভূমিকায় বেহু সিংহ, শ্রাম লাহা ও রমাদেবী চলন সহ। জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় হয়েছে সাধারণ শ্রেণীর। শুধু শুধু এই রকম একটি ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীকে chance দেওয়ার কোন কারণ দেখি না। আভ্যকাল দেখা যাচ্ছে যে পরিচালকগণের জহর গাঙ্গুলীকে ছবিতে chance দেওয়া যেন একটা mania হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মনে হয় নিজের সুনাম বজায় রাখার জন্তে জহর গাঙ্গুলীও মধ্যে মধ্যে ছবি থেকে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

ফুডিও কথা

এম, পি, প্রোডাকশন—প্রেমেন শিত্তের পরিচালনায় শীঘ্রই এদের নতুন বাংলা ছবির কাজ আরম্ভ হবে। কাহিনী রচয়িতা হচ্ছেন পরিচালক স্বয়ং। আপাততঃ ছবির নামকরণ হয়েছে “বিদেশিনী”। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন শ্রীমতী কানন আর নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। অপরাপর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্ত শ্রাম লাহা, শৈলেন চৌধুরী, রবি রায় প্রভৃতি মনোনীত হয়েছেন। গানের স্বর দেবার জন্ত মনোনীত হয়েছেন কমল দাসগুপ্ত।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ—কয়েকটি ছোট ছোট ‘স্টাং’ ছাড়া পরিচালক হেমচন্দ্র “ওয়াপস” এর কাজ প্রায় একরকম শেষ করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন ভারতী দেবী এবং প্রেমের প্রত্যাশাবীতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিরাবে দেবা দেবেন অসিতবরণ এবং ধীরাজ। ভারতী দেবীর নৃত্য ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রাইচাঁদ বড়াল। ছবিখানি আগামী বড়দিনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুক্তি পাবে বলে কর্তৃপক্ষেরা আশা রাখেন।

সুখোব নিজের পরিচালনায় “হুই পুস্বে”র কাজ অর্ন্তভাবে এগিয়ে চলেছে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন চন্দ্রাবতী, ছবি বিশ্বাস, অমীক্স চৌধুরী নরেশ মিত্র ও আরো অনেকে। এই ছবিতে লভিকা

ব্যানার্জি নামে একটি নবাগতা অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া বাবে। পঙ্কজ মল্লিকের ওপর সঙ্গীত পরিচালনার জা পড়েছে।

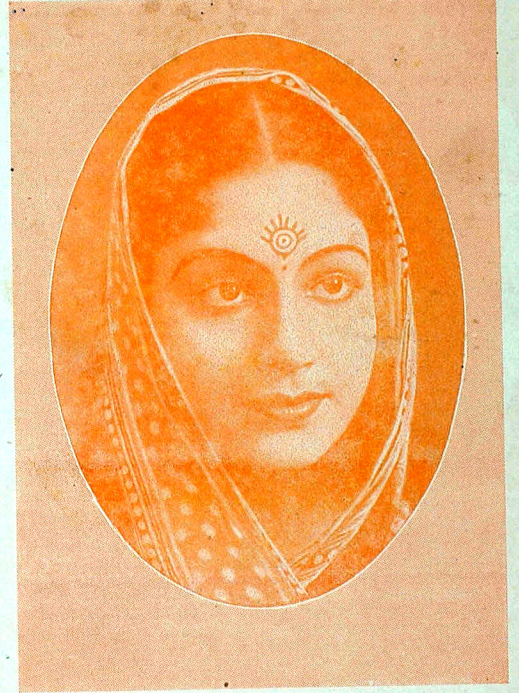
শহর থেকে দূরে—শৈলজ্ঞানন্দের পরিচালনায় ইষ্টা টকিজের “শহর থেকে দূরে”র কাজ ক্রম সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানি আগামী ১৭ই ডিসেম্বর রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপায়িত করেছেন জহর, মলিনা, রেণুকা, ধীরাজ, নরেশ মিত্র ও আরো অনেকে।

বম্বে টকিজ—পরিচালক ব্রজীল মহম্মদার যা টকিজের হয়ে যে ছবি পরিচালনা করবেন এখন তার কাগজপত্র নিয়েই ব্যস্ত। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্তে নগিনী জয়ন্ত মনোনীত হয়েছেন।

এদের দৈবিকারাগী অভিনীত “হামারী বাত” বোম্বাই শহরে মুক্তি পেয়েছে। বোম্বাই-এর দর্শকগণ ছবিখানি সাদরে গ্রহণ করেছেন। ছবিখানির পরিবেশনা যা পেয়েছেন মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স। পরিসরের সম্বন্ধে জন্তে মানসাটা ফিল্মকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে হয়েছে।

নবাগতা অভিনেত্রী—সিনেমা জগতে যে কয়েকটি নবাগতা অভিনেত্রীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নিউ থিয়েটার্স লিঃ। এবারও তাঁরা কুমারী বিনীত নামে এক নবাগতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে কুমারী বিনীতা পাটনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারকর্ত্তা। তিনি সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সঙ্গীতও ইনি বিশেষ নিপুণ। আমরা এঁরা অভিনেত্রীর আগমনে তাঁকে আমাদের সাদর সম্ভ্রান্ত জানাচ্ছি।

মেঘদূত—অমর কবি কালিদাসের “মেঘদূত” গ্রন্থ পরিচালক দেবকী বহুর প্রচেষ্টায় চিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। ছবিখানির শুভ মহরৎ গাত সম্ভ্রাহ ইন্দুপুত্রী ইন্ডিয়ান সম্পদ হয়ে গেছে। যন্ত্রের ভূমিকাকে ছবিতে রূপ দিয়েছেন বিমান ব্যানার্জি এবং যন্ত্র বিরহিনীর ভূমিকায় চিত্রে ফুটিয়ে তুলছেন পদ্মা দেবী।



দ্রামতী অরুণা

মহেশ্বরী “শিকচাসের পাগলী” চিত্রের নায়িকা





শ্রীমতী বামুনাদেবী

[ক্রিষ্ণা ছায়াচিত্রের সৌন্দর্য]



১৩৫০]

ভিক্টোয়া ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটাস—এদের নতুন বাংলা ছবি “ছদ্মবেশী” আশাবী ১৮ই ডিসেম্বর উত্তরা, পূর্ববী ও পূর্ব এই তিনটি চিত্রগৃহে একই সঙ্গে মুক্তি পাবে। উপেক্ষা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন অজয় ভট্টাচার্য। গানের স্বর দিয়েছেন হুমায় শচীন দেববর্ধন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, পদ্মা দেবী, শান্তি গুপ্তা, ছবি, সন্ধ্যা, মিহির, হরহ, শৈলেন চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

অদল-বদল—বোম্বাইয়ের নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান ফিল্মস্তান অশোককুমারকে শালিমার পিকচার্সে অভিনয় করার জন্য অমৃত দিগেছেন ও তার বদলে তারা শালিমার পিকচার্সের স্তম্ভবী অভিনেত্রী মীনাকার দিয়ে একখানি ছবি তুলবেন। এ রকম অদল-বদল প্রথা মন্দ নয়।

বিপর্যয়—কালী ফিল্মস বহুদিন পরে আবার নিজে-সে ছবি তুলছে। “বিপর্যয়” ছবিখানি পরিচালনা করছেন সমিতির পরিচালক শৈলজানন্দ। গত সপ্তাহে শৈলেন চৌধুরী, শেফালিকা, মাষ্টার শম্ভু ও কাহ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেটে দেখা গিয়াছিল। পরিচালক মহাশয়কে অত্যন্ত সন্তোষ দেখে মনে হ’ল তিনি যেন দ্রুত ছবিখানি শেষ করতে চান।

পরিচালক বিমল রায়—নিউ থিয়েটার্সের আলোক শ্রী বিমল রায় পরিচালকের পক্ষে উদ্বীত হয়েছেন। গত ২৪শে নভেম্বর নিউ থিয়েটার্সের তরফ থেকে তিনি গীর প্রথম বাড়লা ছবি “পূর্বাচল”এর কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন জ্যোতিষ্ময় রায়। নায়কর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য শঙ্করলাল ভট্টাচার্য মনোনীত হয়েছেন। অপরাপর ভূমিকায় দেবী মুখোপাধ্যায় (বিচারের), বিশ্বনাথ ভাট্টাচার্য, মীরা লতা, রেখা মিত্র ও আরো অনেকে অভিনয় করেছেন। অল্প উল্লিখিত নবাগতা অভিনেত্রী বিনীতা বর এই ছবির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

সন্ধিতে সুনন্দা—অপূর্ণ মিত্রের পরিচালনায় চিত্র-কলাপ বোভারী চিত্র “সন্ধি”র কাজ ইঙ্গপূরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার

[ছায়ালোক]

অজ নিউ থিয়েটার্স সুনন্দা দেবীকে ধার দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। বিমান ন্যান্সিক্স নায়কের ভূমিকায় রূপ দেবার জন্য মনোনীত হয়েছেন।

পোস্তপুত্র—পরিচালক-সতীশ দাসগুপ্ত ভারাইট পিকচার্সের হয়ে “পোস্তপুত্র”এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। শ্রীমাকান্তের ভূমিকায় শিশির ভাট্টার স্টুডিও ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। অপরাপর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, রেখা রায়, সন্তোষ সিংহ, প্রমোদ গান্ধী, সাবিত্রী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য পরে রাধারাণী, পান্না ও বেবাল্লা মনোনীত হয়েছেন।

ছবিখানি শীঘ্রই মিনার, ছবি ঘর ও বিজ্ঞপীতে একই সঙ্গে মুক্তি পাবে।

হিন্দুস্থান

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—

স্থাপিত—১৯২৮

হেড অফিস :

৫ ও ৬, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা সমূহ—

বদরগড়, কাটোয়া, ভবানীপুর,
বরগড় (উরিয়া), চক্রধরপুর,
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এস, এন, রায়চৌধুরী

সবাক চিত্রের ভবিষ্যৎ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায় [সম্পাদক, "কিষ্ণু ষ্ট্যাণ্ডার্ড"]

কেউ কেউ বলছেন, কলকাতার থিয়েটারগুলি নাকি শীঘ্রই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে যে, টকী বা সবাক চিত্রের বর্ধমান প্রতিষ্ঠা আর থাকবে না। এই কথা মেনে নিতে গেলে বিশ্বাস করতে হবে যে, টকী বা সবাক চিত্রের উপর লোকের ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে। এখানে অবশ্য চিত্র বলতে দেশী চিত্র বুঝতে হবে। থিয়েটার-গুলি এখন কিছুদিন আগেকার মত হীনপ্রভ নয়, যদিও সবাক চিত্রের দর্শককে মঞ্চ চিত্রকালের মত ভাসিয়ে নিয়ে আসতে পারবে—এমন চিত্রা করবার মত কোন লক্ষণই বর্ধমানে দেখা যাচ্ছে না। মঞ্চের পূর্ণভন গৌরব ফিরে পাওয়া সম্ভব কি-না অথবা কতখানি সম্ভব, এ সংক্ষেপে একটু আলোচনা করলে মন্দ হবে না।

প্রশ্নমতঃ ধরা যাক, থিয়েটারের অবনতি বাস্তব দেশে হ'ল কেন? সিনেমার আত্মদয়, বিশেষতঃ সবাক সিনেমার আগমনই থিয়েটারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ। সবাক সিনেমা তার স্বল্প পরিগরের মধ্যে থিয়েটারের যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা সবই দেখায়। তার পর অল্প সময়ের মধ্যে এবং থিয়েটারের অর্ধ-খটো-বাপী অবকাশকে নিমিষের মধ্যে দিয়ে সবাক চিত্র দর্শকের কাছে নিজের লোকপ্রিয়ত্ব ক্ষমতাকে প্রদর্শিত করে দিল। তাছাড়া আরও একটা জিনিষ বিশেষ-ভাবে সবাক চিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলল—সেটা হল তার নায়কী ক্ষমতা, তার illusion সৃষ্টি।

রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শকের করনার মীমা ছাড়িয়ে যায় না, কারণ তার সৃষ্টির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সুতরাং রক্তবাসের ব্যক্তির মঞ্চের উপর দেখেও দর্শক যেন তাদের মধ্যে অভাবনীয় কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু চিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রী—যে মনে এক অশরীরী বিশ্বাসের পূর্ণপ্রকাশ! ফটো-লেপে আলো-ছায়া সৃষ্টি করে, নানা ঘটনা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ছায়াদেহী

মননারীকে দেখায়। সেই হয় বেশী প্রিয়। আজ এসে টেকীর চেয়েও এটো গার্বেশের নাম ছাড়িয়েছে বেশী কেন? এলেন টেকী অভিনয় শিল্পের সম্রাজ্ঞী হিসেবে কিন্তু ক্যামেরা যতরকম ভাবে পরেছে এটোকে অহং কলাজ্ঞানসম্পন্ন এক ছায়াময়ী রহস্যের আধার রূপ দেখিয়েছে। সিনেমা তার লোকপ্রিয়তার জন্ত নিন্মী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির কাছেও বোধ করি ততটা দাঁ নয় যতটা তার ক্যামেরা ও আলোক সম্পাতের দায় মোহ সৃষ্টি করবার ক্ষমতার কাছে।

অন্তরিকে দেখা যাক, সবাক চিত্রের যে সৌন্দর্য সেটা মুখ্যতঃ রক্তিম বলে যে দোষ দেওয়া হয় সে অপবাদ না সত্তি। অনেক সমালোচকের মতে সবাক চিত্রের আবেদন নাকি খুব ব্যাপক বা গভীর না একথা কখন ভুললে চলবে না যে নিন্মীক চিত্রের মুখ ফটোগ্রাফীর যে প্রাধান্য ছিল, মুখ চিত্রাভিনয়ের সমাপ্তি হওয়ার পর তা অনেক পরিমাণেই কমে গেছে এখন অভিনয় হয়েছে বাকুপ্রধান। বচনভঙ্গীর কার্যকার্য উপর সাফল্য নির্ভর করে সব চেয়ে বেশি, এই কারণে মঞ্চাভিনয়ের পদ্ধতির সঙ্গে সবার চিত্রাভিনয়ের সম্পর্ক বেড়ে গেছে অনেক। কাজে কাজেই পূর্ণভন ব্যবধান হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে সেই রাস্তাই এসে যেতে পারে, অতীত

এস, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

জ্যাম, জেলি ও চাইনি

খাওয়ার স্বাদে ও রুচিতে বিশিষ্টতা দান করে

১০১, চক্রবেড়িয়া রোড, ভবানীপুর।

[১০৬]

মোহিত্য দেখার পর যা নবীনতাকারী মনকে পীড়িত করতে থাকে।

ওদেশের কোন কোন বিজ্ঞ ও বুদ্ধশ্রী সমালোচক বলেছেন যে টকীর আদর নাকি বেশী দিন থাকবে না যে ফলে তার স্থায়িত্ব হবে সম্ভাব্য। তাঁরা বলেন টকী চিত্রের সবচেয়ে বড় দৌর্দল্য হচ্ছে তার conventionality বা গতানুগতিকতা। এ সংক্ষেপে লেখক অন্ততঃ ইটো মত পোষণ করেন। নিন্মীক চিত্রের conventionalities এর ব্যাপক ছিল। কারণ বোর্ডের উপর সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভক্তিমূলক যে নাটকই চিত্রগৃহীত হোক না কেন, যথাযথ আবেদনের মধ্যে মুকাতিনয়ই ছিল

তার প্রাণ। কিন্তু সবাক যুগে সিনেমার প্রদর্শন কৌশল ও শব্দবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ইঙ্গিত প্রদায় হয়ে পড়ায় তার আকর্ষণের বৃদ্ধি হয়েছে, কারণ এখন সিনেমা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবাহুসারী। সবাক চিত্রের যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্র সৃষ্টি হচ্ছে অনেক পরিমাণে। নিন্মীক অভিনয়ের চরম উৎকর্ষ দেখা যেত করুণ রসান্বিত চিত্রের মধ্যে। কিন্তু আজ আর একথা বলা চলেনা যে করুণ রসই শ্রেষ্ঠ রস। "অল কোয়ার্টেট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট", "ডক্টর জিকিল ও মিস্টার হাইড", "ম্যাডাম বাটারফ্লাই", "থারেন্স এ্যাণ্ড দি বাউলার" প্রভৃতি চিত্রের রস মূলতঃ বিভিন্ন। সুতরাং সবাক চিত্র conventional একথা বলা চলেনা।

বাগিগঞ্জের আধুনিক ফার্মিচার প্রস্তুতকারক

শো-রুম— কারখানা—

১৬, বাসবিহারী এডিনিউ ৬, যতীন দাস রোড (রোপা রোডের জংশন)

বিক্রয়ের উৎসবে প্রিয়জনের যুখে হাসি ফোটাতে হ'লে আর সেই সঙ্গে নিজের মার্জিত রুচির পরিচয় দিতে হ'লে 'আসবাব'এর আসবাব একসেট উপহার দিন।

আসবাব

মুদ্রাণ ওয়ালনাট ও উৎকৃষ্ট সেগুনের ফার্মিচার একমাত্র আসবাব ইতরী করে থাকি।

[ছায়ালালক]

Remember B. I. S. W. Brand for quality

TOOLS CUTLERY

for Carpentry Tea garden	Machinery Engineering Agricultural	for Table Kitchen Garden
--------------------------------	--	-----------------------------------

Any Requirement Every Purpose

Suppliers to Govt., Railways, Native States.

India's foremost manufacturer

BENGAL IRON & STEEL WORKS.

Mg. Agents : K. Smith & Sons, 8, Canning Street, CALCUTTA.



নারীর মর্যাদা

দ্বিতীয় অধ্যায়

Moses এর আইনেও নারীর স্থান উন্নত ছিল না। Old Testament-এর অনেক জায়গায় নারীর গোঁণাবস্থা দেখা যায়। Jewদের ধারণা ছিল যে কতটা প্রসবকারী জননী পুত্র প্রসবকারীর চেয়ে দ্বিগুণ অপরিষ্কার এবং সেজন্য তাকে দ্বিগুণ উপবাস করতে হতো। এই ধারণা এখন খৃষ্টান পাদ্রীদেরও ছিল। তারা বলতেন নারী মোহের প্রতিমূর্তি ও বন্ধন স্বরূপ, তার মন বিখ্যাত, তার দেহ অপবিত্র ও পঙ্কিল। নারীর প্রতি লোভ করাও পাপ। বর্তমান Protestant church ধার উপদেশ ব্যতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই St. Paulও বলেছেন “পুরুষের পক্ষে নারীকে স্পর্শ না করাই ভাল।” “নারী নারীর সম্পত্তি নয়, নারীই হেরের অধীন।” “নারীর জন্ত নদের সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে নদের জন্ত নারী।” বালিকা এবং নারীরা সব সময়েই পুরুষের ইচ্ছার অধীন বলে মনে করা হয়েছে এবং St. Paul বেয়েদের “স্বাভাবিক ব্যবহার” সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। কাজেই, আমাদের বিশ্বাস হয় না যখন সর্বপ্রথম খৃষ্টানদের গির্জা আইন (Ecclesiastical law) বলে “পুরুষই ভগবানের প্রতিমূর্তিতে গঠিত হয়েছে, নারী নয়। সেজন্য নারী পুরুষের পরিচর্যা করবে এবং তার দাসী থাকবে।”

আমি আগেও বলেছি যে কোন কোন মুসলমান সম্ভাব্যের বিশ্বাস যে নারীর কোন আত্মাই নেই। এই ধারণার জন্ত তাদের বিশ্বাস যে নারীকে বধ করলে কোন পাপ করা হয় না। এইজন্যই যদি কোন স্ত্রী, উপপত্নী

বা দাসী তার প্রভুকে রুষ্ট করতো, তবে তার বাবার দরের চেয়ে অল্প কোন কথাই সেই নারীকে তাগ করার পথে তার প্রভুকে বিচলিত করতো না। এই ধরনের তাগ বহু লোমহর্ষণ উপায়ে করা হতো। প্রবুর হাতের জীবমৃত্যু নির্ভর করতো, সেজন্য খুন করার অপরাধে জন্ত প্রভুর কোন চিন্তা ছিলনা, আর অন্যর মহলের ঘর বড় একটা প্রকাশও পেরে না।

চীনাদের মধ্যেও এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। হুয়ু বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাচ্চা মেয়ের ফেলার চেয়ে, আচার্য্য কতকো হত্যা করা তাদের কাছে অনেক সহজ ছিল বোধহয় এখনও প্রত্যাহ চীনে কৃতদাসী বাসির বিক্রী হয়।

শিশুহত্যা মানে কতাহতাই বোঝাত। ইউরোপ ও এশিয়াতে এ জিনিষটা সমভাবেরই ছিল। ইউরোপে নবজাত শিশুকে তার পিতাকে দেখান হোত এবং তিনি ছত্ব দিতেন যে তাকে পালন করা হবে না মেয়ে কোরবে। বিশেষকরে কতাদেরই বধ করা হোত, তার তাদের প্রতিপালনের গরজ ছেলেদের মতই বেশী একষ্টদাধ্য; আর যখন তারা এই কষ্টের প্রতিদান দেয়া মত পরিশ্রম করবার জন্ত সক্ষম হোত, তাদের আকতকণ্ডা অপরিচিত স্বামীই আরামে ভোগ করতো। এই জন্তই স্বামীর কাছ থেকে দাম চাওবার প্রথাের উদ্ভব। এখনও অনেক জায়গায় এর চলন আছে এবং এই মূল্যবানের জন্ত কতটা স্বামীর দাসী ও সম্পত্তি

[১০৫]

মিল হয়ে পড়ল এবং স্বামী তাকে যা খুশী তাই করতে পারতো।

নারীর এই নিকৃষ্টতা, প্রজ্ঞার ভাবে আজও প্রায় সব পশ্চিম দেশেই প্রচলিত রয়েছে, তার কারণ আমেরিকার ইউরোপের আইন রোমান আইনের উপরই মুখ্যতঃ প্রভাবান এবং রোমান আইনে পিতা বা প্রভু তার সাদাসী, স্ত্রী, রকিতা, এবং পুত্র কন্যার জীবননয়নের বিধাতা ছিলেন। স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি, এবং আইন বলে, স্বামী তার দাসদাসীর মত স্ত্রীকে গ্রহণ করতে একমাত্র সম্পত্তিভাবে নিজের উপকার ও ভোগের জন্ত। যখন গীর্জা আইন রোমান পৌর আইনের উপরে কর্তৃত্ব করল, তখনও নারীর মর্যাদার বিশেষ উন্নতি হয়নি।

[নারীর মর্যাদা]

Napoleon-এর Code ত সম্প্রদেই বলেছে, নারী পুরুষের সম্পত্তি, এবং নারী সমষ্টিগত ভাবে রাষ্ট্রের। এই সব আইনের মূলে ছিল সেই আদিম কল্পনা যে সমস্ত নারীই গৃহ কর্তার বশীভূত, এবং তিনি অল্প লোকের স্ত্রী, উপপত্নী, বা দাসীরূপে তাদের যথেষ্টভাবে বিলি, বিক্রয়, বা বদলাবদলী করতে পারতেন। বোধ হয় Troglodite ageএ যখন নারী ছিল দাসী, এবং বন্দী করে বিবাহ করা চলিত ছিল তখন থেকেই এই ধারণার উদ্ভব হয়।

অতীতের ইংলণ্ডেও প্রায়শই স্ত্রী ছিল স্বামীর ক্রীতদাসী। ইথেলবার্টের আইন বলেছে, যদি কেউ কোন free-man-এর স্ত্রীকে অপহরণ করে, তবে তাকে সেই লোকের জন্ত নিজ ব্যয়ে স্ত্রী কিনে দিতে হবে। রাশা

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :—৫৬, হোয়াট স্ট্রট, কলিকাতা।

শাখা :—সমলপুত্র, মেদিনীপুর, পাবনা, হাওড়া, বালিগঞ্জ ও কুমিল্লা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—

মিঃ এ. রায় চৌধুরী।

জীবন বীমা করুন—

ইণ্ডিয়া এম্বিকেল

প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ

(স্থাপিত—১৩৩১)

হেড অফিস—৫ ও ৬ হোয়াট স্ট্রট, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—

মিঃ এ. রায় চৌধুরী।

**বীহার
আমলা**
একুপম দুগন্ধি
বিশতিল



নিয়মিত ভারতীয়
মহিলা নীতম দাম
ও বেশ সুস্বাদু

ব্রীশ কেমিকেল ওয়ার্কস, কলিকাতা



১০ টাকায়
১৮ পাউন্ড উৎকৃষ্ট ব্রেও চা
(পাতা-গুড়া-জোকন)
বিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পত্র জাহান।

বার্ড টি কোল্লানি
২৭২, ক্যানিং স্ট্রট ও ১৩৭, বোবাজার স্ট্রট
অথবা
দি এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অফ ত্রিপুরার
যে কোন শাখায়।

Canute-এর আইনে ব্যাভিচারিণী নারীর চুল, নাক, কান কাটবার নিয়ম ছিল, কিন্তু স্বামীর ব্যাভিচার, আইন নগণ্য বলেই মনে করতো। মাত্র ১০৮০ বছর আগেও ব্যাভিচারেরে জন্ত স্বামী স্ত্রীকে divorce করতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর অশুদ্ধ পুত্র অভিযোগ ছাড়াই না। 'Encyclopaedia থেকে জানা যায়, ১৮৮৫ খৃঃ অব্দেও পৌর আইন স্বামীর ব্যাভিচারকে অপরাধ বলে মনে করতো না। মধ্যযুগ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাভিচারী স্বামীদের উপর জরিমানা আদায় করে গীজা সংশ্লিষ্ট আদালতগুলির ইংলণ্ডে প্রভূত অর্থগণন হোত, কিন্তু পরে এ জরিমানাও বর্জন করা হয়।

মধ্যযুগ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে বিবাহিত রমণীর স্বামীর বেজব্রাহ্মত দান ছাড়া আর কোন অধিকার ছিল না। উদ্ভবের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর আত্মীয়দের হাতে যেত, স্ত্রী বিধবা ছেলেমেয়েরা তার উত্তরাধিকারী ছিল না।

স্বামীর মতে যদি স্ত্রী চাবুক খাবার উপযুক্ত হয় তবে চাবুক মারার অধিকার তার ছিল এবং এখনও কোন কোন দেশে তা আছে। এই চাবুক প্রায়ই আদেশ অমাজ করার জন্ত দেওয়া হোত অথবা যদি স্ত্রী স্বামীকে অসন্তুষ্ট করতো কোনরকমে। মাত্র ৩০ বছর আগেও কোন আমেরিকান আদালতে এই চাবুক মারার অধিকার স্বামীর আছে বলে স্বীকার করা হয়েছিল।

Lupercalia নামক রোমান উৎসবে একটা অশ্বচালন ছিল নারীদের ও বালিকাদের সম্পূর্ণ নগ্নদেহে দৌড়। নগ্নদেহে দৌড় করান হোত কারণ তাতে তাদের উত্তরু জ্বলবে সহজেই চামড়ার চাবুক মারা যায়। এই ক্রিয়া তাদের স্বাস্থ্য অশুদ্ধ রাখবে, তাদের আরও উদ্ভীর্ণ করে তুলবে এবং অক্লেসে প্রসব করিয়ে দেবে এই ছিল তাদের বিশ্বাস।

এই চাবুকের ধারণা ইউরোপের অনেক স্থানেই নারীদের কাছে স্থপরিচিত এবং এই জন্তই বোধ্য হয় তারা সহজেই চাবুকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। রাশিয়া

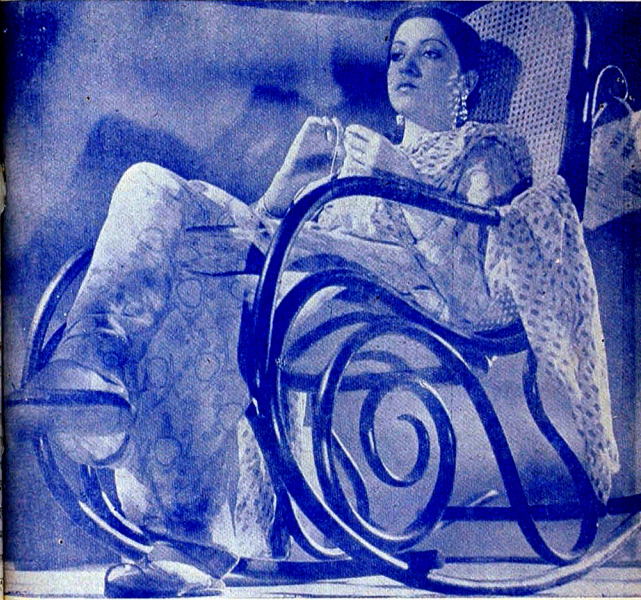
এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে এই বিশ্বাস মেয়েদের মনে এত দৃঢ় যে যারা স্বামী স্ত্রী ও স্বাস্থ্যবর্তী জননী হতে চায় তারা যদি স্বামীদের কাছ থেকে চাবুক না খায় তবে মৃত্যু করে তাদের স্বামী গুণি তাদের উপেক্ষা করচে, অন্য তাদের ভালবাসে না।

১৮৮৮ সাল পর্যন্ত জাঙ্গাণীতে স্বামী চাবুকে সামনে স্ত্রীর উত্তরু নিতম্বে চাবুক দিতে পারত যদিও মনে করতো তা। গত যুদ্ধে যে বেলজিয়াম জন্ত আরমেনিয়াতে জাঙ্গাণ সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী আচরণ করে ছিল তাতে আর আশঙ্কা নাই। আর এ যুদ্ধের নিহতদের কথাতো লেখা হতে এখনও বাকী রয়েছে!

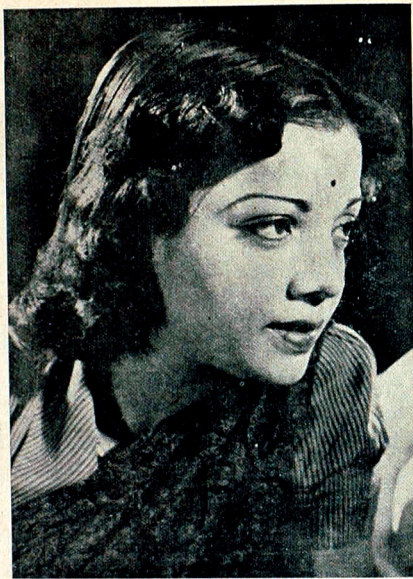
অসভ্য জাতীর মধ্যে সর্বপ্রথম নারী বলবানের শিল্প যুদ্ধের লুট, জব্দী অথবা অপহারকের দামী হয়েই আসে তার কোন অধিকারই নেই, এবং সে গৃহপালিত পশুর একজন। গৃহপালিত পশুর মতই তাকে পুরুষের ইচ্ছা মতের বিক্রী বা বধ করা যেতে পারে। নারী কে পণ্য, যা কেনা বেচা বা আদান-প্রদান করা যেতে পারে সে পুরুষের কাম চরিতার্থ করবে, তার কাজ করে দেবে এগিয়া ও আফ্রিকার কোথাও কোথাও নারী যত ভারবাহী পশুর মত এবং এই থেকেই বোকা মার ও নারীর মর্যাদা কত নিম্নতর!

দারিদ্র্য বিধা তার চেয়েও ভয়াবহ কোন অসভ্য পরবর্তী কালেও স্ত্রীজাতির ভাগ্যে জুটেছে। মধ্যযুগ যুদ্ধে অজান্তে বহুমুখা যুদ্ধতরাজের সামগ্রীর সঙ্গে নারী বালিকারাও সমানভাবে স্থান পেয়েছে। সভ্যতাবিন্দু পাশ্চাত্য দেশে মনোস্থিতির করে এই বলে, যে, বালিকা তাদের যুদ্ধে প্রচলিত হওয়া সম্ভব হোত, না যদিও কোন বিরুদ্ধমস্তক লোকের নেতৃত্ব অকণ্য আত্মীয় ছনরা (অর্থাত্ জাঙ্গাণী) এই মধ্যযুগীয় প্রথাতে প্রচলিত করতো এবং তাদের ও অনিষ্টকর দেশমুখ্য নারী ও বালিকাদের যুদ্ধের আইনমগ্নত শিকার উপহার বলে ব্যবহার করতো।

(ক্রমশঃ)

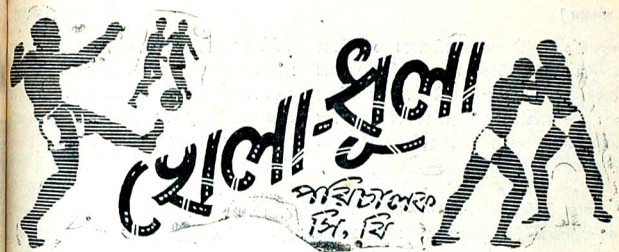


“পুজি”র একটু দৃষ্টে রাগিনী দেবী



“লড়াই-কে-বাক” চিত্রে চঞ্চলমতি

স্নেহপ্রভা



বেঙ্গল এমেচার অ্‌ইমিং এসোসিয়েশনের একটি সভায় থিয় হয়েচে যে বাঙ্গালার বর্তমান আর্থিক ছরবছার জন্ত এই বছরে বাঙ্গালা হইতে কোন গাঁতাক দল লাহোরে নিবিল ভারতীয় গাঁতাক প্রতিযোগিতায় যোগদানের হু পাঠান হুবে না।

প্রথম অষ্টেলিয়ান টেষ্ট ক্রিকেট দলের একমাত্র দর্শিষ্ট খেলোয়াড় মিঃ টি ডবলিউ গ্যারেণ্ট ৮৫ বৎসর বয়সে গিডনীতে মারা গিয়াছেন।

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলী একটি সভায় স্থির করেছেন যে, এই বৎসরে বাঙ্গালা দল আন্তঃ-প্রদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে না যে কলকাতায় এই প্রতিযোগিতার অস্থগান সম্ভব হইবে না।

মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল গম্মিলিত দল এবং এলায়েড সার্ভিস দল ক্যালকাটা মাঠে একটি চ্যারিটি টিফল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কোন দলই গোল হিতে না পারায় খেলাটি অসীমাসীতভাবে শেষ হয়।

বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন নতুন নিয়মাবলী প্রথম করেছে। এই নিয়মাবলী প্রথম সাধারণ আর্থিক সভার অস্থগান হয়। এই সভার পরে পরিচালক-

মণ্ডলীর একটি সভা হয় এবং এই সভায় মিঃ জে সি মুখার্জি, মিঃ এ এলেশলী, মিঃ পি গুপ্ত এবং মিঃ এ এন ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি সহসভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পুনর্নির্বাচিত হন।

এলায়েড সার্ভিস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলাটি ক্যালকাটা মাঠে অস্থগিত হয়। মেফেরার দল এই খেলাটিতে তাহাদের বিপক্ষ বেলেভডিয়ার দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করিয়া প্রথম বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইবার পৌরব অর্জন করিয়াছে।

সিদ্ধ পেন্টাথ্লার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার রৌপ্য জয়ন্ত্রী উৎসব উপলক্ষ্যে করাচীতে হিন্দু এবং অবশিষ্ট দলের একটা প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয়। বর্তমান সিদ্ধ পেন্টাথ্লার বিজয়ী হিন্দু দল প্রথম ইনিংসের ফলফল

শ্রীকার্তিকচন্দ্র স্বর্ণকার

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক।

ছুর, গীতাচার কঙ্কণ ইত্যাদি নববুগের ফলাসনে তৈয়ারী করা হয়।

১২এ, মোহিনীমোহন রোড,
পোঃ এলগিন রোড, ভবানীপুর।

অহুযারী ও উইকেটে জয়লাভ করিয়াছে। রেট দলের মার্কস্টীন এই খেলাটিতে ১১৩ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। অবশিষ্ট দল প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রাণ করিয়া তাহাদের ইনিংস শেষ করে। হিন্দু দল ও উইকেটে ২৮৪ রাণ করিলে দুইদিন ব্যাপী খেলাটি শেষ হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় রোহিন্টন-বারিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলাটি আগামী ১৮ই, ১৯শে এবং ২০শে ডিসেম্বর বাঙ্গালোরে অর্থাৎ মহীশূর এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি এই খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ড এবং চায়না রিলিফ ফণ্ডে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লাহোরে কয়েকটি প্রদর্শনী টেনিস খেলা হয়। চীন ডেভিস কাপ খেলোয়াড় ডবলিউ সি চয় ৮-৬, ৭-৫ গেমে এল এল আর সোহানীকে পরাজিত করেন। গাউস মহম্মদ ৬-০, ৭-৫ গেমে ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করেন।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য পাঞ্জাব প্রাদেশিক এসোসিয়েশন নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করেছেন। প্রকাশ-নাথ, দেবিন্দার বোহন, জি জুইস, বি সি দত্ত, মিস পুশ আনন্দ, মিসেস জুইস, জহর আমেদ, হরনারায়ণ, হুলতান, হোসেন, জি আর হুস, গুরুপ্রসাদ এবং জে এল মলিক।

এক বঙ্গের স্থিতি থাকার পর বোম্বাই পেণ্টাথুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলাগুলি এই বঙ্গেরে অর্থাৎ হচ্ছে। পার্শীস, ইউরোপীয়ানস, মুসলীমস, হিন্দুস এবং অবশিষ্ট দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

অবশিষ্ট এবং মুসলীম দল দুইটির সেমিফাইনাল খেলা শেখোক্ত দলের জয়লাভ প্রায় নিশ্চিত বলে প্রতীয়মান হলেও শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট দল জয়লাভ করে ফাইনালে উদ্রীত হয়। হিন্দুস এবং ইউরোপীয়ানস দলের অর্থ সেমিফাইনাল খেলাটিতে হিন্দুস দল অন্যায়সে এ ইনিংসে জয়লাভ করে। এই প্রতিযোগিতার প্রথম খেলাটিতে পার্শীস এবং মুসলমান দল প্রতিযোগিতা করে। অবশিষ্ট দলের ডি এল হাক্কুরী ক্রীত্ব প্রদর্শন করিয়া একাই ২৪৮ রাণ করায় মুসলীম দল সেমিফাইনালে পরাজিত হয়। হিন্দুস এবং অবশিষ্ট দলের ফাইনাল খেলাটি আরম্ভ হয়েছে।

বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত তৃতীয় বামিক বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নসিপ প্রতিযোগিতাটি সাকল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ডি এ ব্যাডগতকার তাহার বিপরীতে মুসলীম বহুকে পরাজিত করে পর পর তিন বঙ্গের বিপরীতে হবার স্থান অর্জন করেছে। পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে ব্যাডগতকার ও মুসলী বহু এক সঙ্গে যোগদান করে। ফাইনাল খেলায় ডি এ ব্যাডগতকার ও মুসলী বহু এক সঙ্গে যোগদান করে। ফাইনাল খেলায় ডি এ ব্যাডগতকার ও মুসলী বহু এক সঙ্গে যোগদান করে। ফাইনাল খেলায় ডি এ ব্যাডগতকার ও মুসলী বহু এক সঙ্গে যোগদান করে।

বাঙ্গালা দল নিখিল ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য ৮ই ডিসেম্বর বোম্বাই যাত্রা করে।

৮ই, ৯ই এবং ১১ই ডিসেম্বর রেড জুজ ফর সাহায্যার্থে ক্যালকাটা মাঠে তিনটি প্রশর্শনী ফুটবল খেলা হবে। এই একই উদ্দেশ্যে ৯ই ডিসেম্বর কালীঘাট মাঠে একটি প্রশর্শনী ক্রিকেট খেলাও ব্যবস্থা হয়েছে।



দ্রুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর পত্ররয় ও ভারতীয় রাজনীতির সংশোধিত পন্থা—

সম্রাট শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত সচিব, বড়লাট, ও

মহাশয় গান্ধীর কাছে ভারতীয় রাজনীতির দ্বারা সংরক্ষণ



শ্রীনিবাস শাস্ত্রী
এক দেশেন্দ্রব্রত কারাগারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের
পত্ররয় আলোর সন্ধান দিল। সকল পক্ষেরই মনোভাবের

বতকটা পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ছে। পত্ররয়ের চূড়ক
দেওয়া গেল। :—

“প্রিয় মিঃ আমেরী,

...স্বাধীনতা: আপনাদের উদ্দেশ্যে (নূতন বড়লাটকে) বর্তমান অচল অবস্থার অবগানে অগ্রণী না ইহা বরং কংগ্রেসের উদ্ভব কর্তৃপক্ষ তাহাদের দোষ স্বীকার এবং আপত্তিকর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছেন। কিছুই না করার বর্তমান নীতিতে তাহাকে আবদ্ধ করা কি ভায়সরয় হইয়াছে? ...আপনার নির্দেশগুলি মাত্র অপেক্ষা অমাত্র করাতের তাহার প্রতি অধিকতর স্থান প্রদর্শন করা হইবে। মৌখিক রূপে পূর্ণমাত্র প্রত্যাখ্যান করাই পরিবর্তিত মনোভাবের আসল কথা নহে। যে সমস্ত ব্যাপার ঘটনাছে তন্মধ্যে কংগ্রেসী নীতির বার্ষিকী সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রা উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে মিঃ চাক্রিল যখন মন্তব্য গিয়াছিল তখন কি তিনি অহুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন? ...আমাদের শ্রদ্ধের নেতৃবর্গ গজলনয়ন অহুতাপে বড়লাটের প্রাসাদের তোরণে পাড়িয়া থাকিবেন—এইরূপ দাবী করিবেন না। আপোষ নীতিমালাকারী রাজনীতিবিদদের “জায় আচরণ কখন।”

“মাননীয় বড়লাট বাহাদুর,”

আপনার চূড় সন্ধান, নিরপেক্ষ বিচার শক্তি ও উদার
দৃষ্টিভঙ্গী আছে বলিয়া আমাধিপত্যে আশ্বাস দেওয়া

হইয়াছে। ইহা—যথেষ্ট নহে। সরকারী পরামর্শদাতাদের সর্বাঙ্গ গণ্ডির বাহিরে দৃষ্টিপাত করতে এবং যে সমস্ত স্বদেশ প্রেমিককে এখন ঘুরে রাখা হইতেছে তাহাদিগকে আপনার সাহায্যার্থ আদান করিতে পারেন? ৯৩ খারার সাহায্যে শাসনের অবসান ঘটা হইতে এবং আইন সভা সমূহকে পূর্বের ভ্রায় কাজ করিতে দিতে হইবে। যাহাতে আমাদের প্রতিনিধিগণ সামান্য সম্মেলনে, কিম্বা বিশ্বশান্তি সম্মেলনে—সমান মর্যাদা সম্পন্ন ভ্রবস্বায় বোধ্য হিতে পারেন—তত্ত্বজ্ঞ কেম্ব্রী গভর্নমেন্টকে এক্সপেক্টর ও মর্যাদা দিতে হইবে যেন, জগতের চক্ষে প্রতিভাত হয় যে, ভারত সত্তর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিলে। ইহা একটা বিরাট পবিত্রকর্ম।

জন্ম অবিরাম পরিমল আবজ্ঞা।...আমি সাম্প্রদায়িক সমতা বিস্তৃত হই নাই। ইহার মীমাংসার জন্ম মানিশিই একমাত্র সম্ভবপর ও সম্মানজনক পন্থা বর্মীয়া মনে হয়। যদি গভর্নমেন্ট আন্তরিকতার সহিত মহাত্মাকে করিতে এবং তাঁহাদের বিপুল প্রভাব প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে মতৈক্য ঘটাইবার বেশ সম্ভাবনা আছে। আমার আশা প্রবল, শান্তির খাতিরে বড় বড় শক্তি যাহা মানিয়া লয়, কোন পক্ষের অবিরামের মধ্যে কোন সম্ভাবনা তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইবে না। ভারত সচিব আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ভারতের পক্ষে উপযোগী নাও হইতে পারে। তিনি আমাদিগকে নতুন একপ্রকার গণশাসনোক্ত উদ্ভাবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এখন যদি আমাদিগকে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং আমাদিগকে অল্প একটি পরিকল্পনার স্বত্বান প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে সমস্ত কাজ অসিদ্ধি কালের জন্ম স্থগিত রাখা হইবে। বর্তমান কালে, কোন জাতির স্বাধীনতা অধীকার করা হইলে, কিম্বা স্বাধীনতা স্বীকার বরিত ত বিলম্ব হইলে তত্ত্বজ্ঞ শাস্তি ভোগ না করিয়া রেহাই পাওয়া যাইবে না।

“প্রদ্বয় মহাত্মা গান্ধী,
আমার অসতর্ক ভাষা আপনাকে আর একবার লজ্জা করিতে হইবে। যতদিন নয় কোন পরিকল্পনাঘাচা

কার্য্য করিতে থাকেন, ততদিনই তাহা আশাপ্রসূ থাকে। সরকারী বেসরকারী সকলেই আপনার দিকে চাহি থাকে। এক্ষণে স্বযোগ উপস্থিত, এক্ষণে স্বযোগ আশ্রয়ণ আসে নাই, এবং বহুকাল আসিবে না। শ্রম স্বদেশন আসি। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্মিশ্রণে, যা সাম্য ও মৈত্রীর বাঁধারা পক্ষপাতী, জগতের সমস্ত জাতি তাঁহাদেরই সহযোগিতার সন্ধান করি। আপনাকে সে সম্মিলনে থাকিতে হইবে। আপনি কি সেই পরম মুহূর্ত্তে পাওয়া যাইবে না? শ্রম অসিদ্ধা—যখন যেখানে উচ্চাভিলাষ হইবে তখনই যি সকলের মনে গান্ধীর নাম জাগরুক হইবে। প্রাচীন জগৎ আপনাকে চাতিতেছে, আপনি আশীর্বাদ কর এবং আশার বাণী প্রচার করুন। আপনি মূল নদ এক্সপলসিভন না, সকলেই আপনার প্রতীক্ষায় আসি। আপনি যদি তাহা উপলব্ধি করেন, তবেই আপনি হইতে পারেন। আপনার শেষ আন্দোলন আশীর্বাদ ফলপ্রসূ হয় নাই। আপনি অবশ্যই নতি স্বীকার করেন তবে তাহা অদৃষ্টের নিকট, মাহুদের নিকট নহে। হটম অবশ্যই জয়লাভ হইবে।”

বর্তমান সময়ে এক্সপলসিভন, নিষ্ফল নির্দেশ করে দেয় নাই। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সকলেরই মজবুত

ছদ্মকীর প্রতিকারে বড়লাট

সচকে কলকাতার করাল রূপ দর্শন করবার লজ্জা ওয়াড়েলের কার্যাবলীরা থেকে মনে হয়, যিনি সমস্তার ভার তিনি স্বহস্তে নিয়েছেন, এবং সমস্তার পন্থাও পরিকল্পনা করেছেন। মিলিটারীরা গ্রাণের আবজ্ঞাতা লর্ড লিউগিগো দমদম করা পানেননি। কলকাতা থেকে ছদ্মকীর অকলে প্রস্তাবের ব্যাপারে বাংলা গভর্নমেন্ট একজন বেসরকারীকে সহযোগিতা পাবেন। বাজমন্ত চন্দ্র নিরদয়ের জন্ম আশ্রয় স্থলে বসিবার, বোকাবা ও টাঙ্গা ভাঙার প্রভৃতিও সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে করা হয়। মিলি গভর্নমেন্টের বার্ষিকতার প্রতিকার হইতো হইবে, কিন্তু কয়েকটি জিনিষ মনে রাখতে হবে।

মহুই পরিমল বাজমন্ত সরবরাহ করতে হবে। সেই বাজমন্ত বিভিন্ন এক্সপলসিভন স্থানীয়ভাবে ভাগ করে দিতে হবে। সহরে যে সব নিরদয়ের ভিত্তি হয়েছে তাদের হস্ত, ঔষধ ও আশ্রয় দেবার এবং আমন ধান কাটবার আগে প্রয়োজন পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই সব ব্যাপারে প্রস্তুতি হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু বহু জম্ম: উত্তর দিকে বেলেই মনে হয়। এবং বেসক ও সেবিভের মধ্যে দৃষ্টিতা ও আস্থা সঞ্চারিত হওয়া চাই।

হোয়াইট পেপার ও বাঙ্গলায় ছদ্মকীর

মি: আমেরী হোয়াইট পেপারে ছদ্মকীর কারণ বর্ণনা করেছেন। একদশে হুজুত হওয়ায় অস্থবিধার নই, ৪২ সালের ঘূর্ণিঝড়, মাল মজুদ করার আগ্রহ, বিমান হানা, ও আমন রেলপথ ভগ্ন হওয়া। স্বাভাবিক মহাশয় বাঙ্গলার সমতা অতিক্রম করা হয়, আমনকার ক্রমবর্ধমান জমি গুব কম এবং নিজ প্রয়োজনের মতই তারা উৎপাদন করে। যুদ্ধের সৈন্যিক মাটিকিটের হযোগ তারা পায় না।

আমেরী সাহেব প্রবল, বাতা বিমানহানা, মজুত করার অভ্যাস প্রকৃতি যা বলেছেন তা অবজ্ঞা। প্রকৃতি হযোগ বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে। বিশ্ব এ ছদ্মকীর যে মাহুদের যুদ্ধে এজন যেতো না তা মাহ পর্যায় কেউ বলেননি। আমেরী সাহেব যা বলেননি তাও কম গতা নয়।

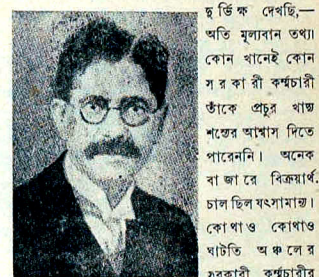
বাংলায় বিক্রম

বাংলার সর্গর এবং বিশেষত: নেত্রকোণায় ক্ষুধার পীড়নে মাহুয় তার মাহুয় হারিয়ে ফেলেছে। যে মাহুদের পিতামাতা ঘেহ-ভালবাসা দিয়ে মাহুয় করে এসেছে, সেও আজ একটা বোকা, তাকে বিক্রয় করে যদি কিছু পাওয়া যায় তা এক দিনের খোরাক চলেতে পারে। নেত্রকোণায় পবিকালয়ে ৩ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গলাদের নিম্নমিতভাবে বিক্রয় করা হয়েছে। তাদের বয়স ১০ থেকে ১৪ টাকার মধ্যে। ফরিপুরে ২৬/

টাকায় বিধবা যুবতী স্ত্রীলোক বিক্রীত হয়েছে। এ সব গাণ্ডাপুরি গল্প নয়। আধুনিক সভ্য যুগের পরম শ্রাব্য দৃষ্টান্ত। আমরা শিকিত হয়েছি, অনেক রকম ism শিখেছি, কিন্তু নিজেদের জোরে নিজের পায়ে পাঠাবার বল অস্থগিত হয়ে গেছে। আমাদের বাঁচতে শিখতে হবে কারণ বাঁচতে আমরা জানিনি।

পণ্ডিত কৃষ্ণর অভিজ্ঞতা

পণ্ডিত দ্বন্দ্বনাথ কৃষ্ণক ব্যাপক ভাবে বাংলা এবং উড়িষ্যা পরিভ্রমণ করে প্রত্যাক যে অভিজ্ঞতা গম্ভীর করেছেন তা আমাদের কাছে—যারা কেবল কলকাতার



ছদ্মকীর দেখছি,—অতি মূল্যবান তথ্য। কোন খানেই কোন সরকারী কর্মচারী তাঁকে প্রচুর খাত শব্দের প্রশংসা দিতে পারেননি। অনেক বাজারে বিক্রয়ার্ণ, চাল ছিল যৎসামান্য। কোথাও কোথাও খুঁটিত অফিসের সরকারী কর্মচারী নিম্নলিখিত সংবাদে বিশ্বাস না করিয়া কর্তৃপক্ষ চলিতে ছিলেন। এই সমস্ত অফলে গাঞ্জমবাসীরা বামনহনও তিনি চলাচল করতে দেখেননি। পেশাবার ভিক্ষকেরা মো মারা গিয়াছেই, ক্রম ও মজুররাও তাহাদের সহায়ী হয়েছিল। কলকাতা থেকে নিরদয়ের অপসারণ করা ভাল কিন্তু তাদের আপনাপন দেশে যাতে তারা বাজমন্ত পায় তার ব্যবস্থাও দক্ষতা সহকারে করতে হবে। পণ্ডিত কৃষ্ণর মতে বাংলার গ্রামাঞ্চলের অর্ধেক অনশনে বিনষ্ট হইয়া এ কথা ধরে নিলেও, সারা বাংলায় সমগ্রাছে অস্থত: ৫০,০০০ হাজার লোক পুণ্ডি থেকে বিদায় নিচ্ছে। দ্বন্দ্ব-চন্দ্রনাথ আর আমাদের করণার উদ্দেশ্য হয় না। অকল্প এই সংসার।

সমাজ সচেতন হয়েছেন। আজ বাংলার চরম দুর্দিনে মাতৃমরণের করাল অঙ্ককারে কোনো কবিতা হির থাকতে পারেননি, যে পাণ্ডিট-মহাজন ও মজুমদারদের অতিলোভের ফলে লক্ষ লক্ষ বদেশবাসী অনাহারে অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল, সেই দেশভ্রোহীদের উদ্দেশে তাই তিনি

- (১) উত্তর আকাশে দেখি কমানীন হৃদয় শুধু জ্বলে
আসে এক হৃদয় আছে মাহুঘের দ্বন্দ্বের তলে।
সে অরের অতিশাপ দেয় আজ সহস্র ভিক্ষুক;
তোমার স্বর্গদিনে শতাব্দীর আশ্রম লাগুক।

(অতিশাপ—এম কবিতা)

- (২) হাওয়ায় হাওয়ায় শোনো পিশাচের তীক্ষ্ণ এক হাসি
দহনীন জরলাব লালসার লালসার চোখ—.....

(চক্ৰবর্তী—৬৪ কবিতা)

তাই আজ কামাক্ষীপ্রসাদের মত মিততাবী সৌন্দর্য-বিলাসী কবির মুখে শুনি তীর ব্যঙ্গোক্তি; আজ তাই চাঁদকে প্রাণহীন শাদা ফাংশ মনে হয়;

- (৩) চাঁদটা শাদা আলোয় ভরা ফাংশ কি
মুঠপাতের ধূলায় ওরা মাহুঘ কি?

(প্রশ্ন—গয় কবিতা)

আন্তিকের দিক দিয়ে “রাজধানীর তক্তা” শীর্ষক কবিতাটিতে কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব চোখে পড়ে যদিও বিষয় বস্তুটি কামাক্ষীপ্রসাদের মৌলিক। “কোনো মুহূর্তে” ও “ছায়া” শীর্ষক কবিতা দুটি ইংরাজী এপিগ্রাম জাতীয় রোমান্টিক কবিতা। শিল্পী হিতাবন্ধুমেহন রায় আশ্রিত প্রবন্ধপটটি সমালোচনাপাঠ্য।

মিছিল (ছোট গল্পের বই)—অনিলকুমার সিংহ। জ্ঞানদাল বুক এজেন্সী, ২২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম ১।০
লেখক সাহিত্যিক সমাজে সম্পূর্ণ নব্যগত নন। ইতিপূর্বে তাঁর “সোভিয়েট নারী” ও অজ্ঞাত দু’ একটি প্রবন্ধের বই বেরিয়েছে। আলোচ্য বইয়ামিতে মোট আটটি ছোট গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্পের স্বতন্ত্র সমালোচনা স্থানান্তরে সম্ভব হ’ল না তবে গল্পগুলি সুশিখিত। প্রাজ্ঞ ও বশিষ্ঠ ভাষায় শিখিত গল্পের চরিত্রগুলি

লেখকের সমাজ সচেতন চিত্র ও হৃদয় মনস্তত্ত্ব বিচারে শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিতে উজ্জল। গল্পলেখক হিসাবে অনিন্দ আধুনিক পাঠক সমাজে আপদ্বক হ’লেও খ্যাতি অর্জনে উপাদান তাঁর রচনার মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিঘ্নের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা ভাঙনধরা মধ্যস্থিত সমাজ ছবিগুলি অনিলবাবুর লেখনীতে সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। বইখানির প্রাক্করপট একেছেন অধুনা-বিত্ত শিল্পী হৃদয় রায়।

সংস্কৃতির দুর্দিন (প্রবন্ধের বই)—বিনয় মোহন বসু। পাবনা, ৩৩২ শঙ্করচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। (ফাসিটি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের গল্প মূল্য ১/০ আনা।)

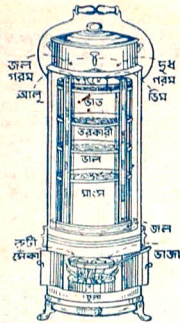
লেমিন বলেছেন, “প্রকৃত সোশ্যালিস্টকে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে হবে। একটামাত্র বিষয়ের সীমিত জ্ঞান নিয়ে মার্ক্সবাদ বোকা যায় না। দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য—সকল বিষয়ে বই পড়ার গভীর জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।” বাধে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজজীবনে, বাংলার সংস্কৃতিকের সমস্ত তত্ত্ববাদ যে বিপুল আলোচনায়ই কণ্ঠে ত্যাগের চিন্তাশীল থাকিই অস্বীকার করবেন না। বাংলার সাংবাদিক, লেখক ও সাহিত্যিকরা বাংলায় নবজাগরণ এবং জীবিত ইতিহাসের এই নতুন পতিবিরহ দেশবাসীর প্রতিয়ম করিয়ে দিতে উৎসাহক। নব্য উপন্যাসকে ব্যাপক করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। “স্বাধীন আলোচনী কাল সিবিল” এই লেখকদের প্রয়োজনীয় নিয়মিত প্রকাশ করে দেশের প্রথম কলাগণ সাধন করে আলোচনা পুথকটি বিখ্যাত স্কল সমালোচক ও সাংবাদিক বিনয় মোহনের চারটি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম প্রবন্ধটিতে ফাসিজমের স্বাধীন দেশে দেশে শিল্পী, সাহিত্যিক, স্বরকার, জ্ঞান বৈজ্ঞানিকদের অবস্থার কথা। দ্বিতীয়টিতে অসহযোগ ইতিহাসে জাতীয় সংস্কৃতির অধ্যাত্মিকতার কলিত্রাণীতে জাপানী ফাসিজমের সংস্কৃতির আলোচনা চরুচিহ্নিত সোভিয়েট, চীন, ভারতবর্ষ ও অজ্ঞাত দেশ শিল্পীদের অভিমানে বিষয়ক বাহিনী লেখকের চরিত্রবলিষ্ট ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ক্ষর পুথক প্রাক্করপট ও মুদ্রণ পাবনা পাইপাই পেশসনীয়। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।



রূপ-ছায়া



ডাঃ ইক্সমিক মলিক
এম. এ. এম. ডি. বি. এল.
আনুগত্য



বিক্রয়
পাঠ্য

ইক্সমিক ক্রকার

১৯১১এ, বহরাজার ট্রাট, কলিকাতা

বাংলার মহানারী ও বিলাতের মিঃ আমেরী—

হৃদয়ঙ্গমী মহাকালের তাকব মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাতে
মোহর কত সংসার যে আন্ধ অশানে পণিহত হ'ল কে তার
বিষ মেবে ? আন্ধ হৃদয়ের দৌলতে লক্ষ লক্ষ অঙ্গারী
বিহু চলাচলের জন্ত খাটি বাংলায় বরুণ সোকেত চোখে
গমন। যেদিন ক্যান্সিটরা বিলুপ্ত হবে, কাণিকাখানের
মৃত্যু ত্রিদিনের জন্ত মিটে যাবে, যেদিন বাংলা দেশ থেকে
কম দক্ষ দেশবিশেষী মিত্রশক্তিই সৈকতের বিজয় ঘরো যে যার
নেম ফিরে যাবে সেদিন বাংলাদেশের হৃদয়ঙ্গমের কাল
মৃত সোকেত চোখের সামনে প্রকট হয়ে দেখা দেবে।
যেদিন বাংলার কোলাহ কোলাহ শত শত জনসমূহ পমীর
কিঁকিঁকারী মৃতি দেখে আমরা আতঙ্কে শিকরে উঠবো।
হল, কল্যাণসার অর্থবিশি দেশবাসীর উপর মাতোষিয়ার
কালম আরাে জীবন আরাে সপ্ননাশ। নিরন্তর হুর্দল
হৃদয়ে অক্ষ আর বাহির সজে সংগ্রাম করবার সামর্থ
কিঁকিঁকারী হৃদয়ে ফেলে দলে দলে হতবরণ করছে। অচ
যেকার নীরব, দেশ নীরব, শাসন-সমুদায় উদাসীন। মাঝে
মাঝে শুধু কর্ণাধের মূখ থেকে বহুর সমুদ্রপারে প্রাণাত্য
বরা বজ্রতা লহরী জেসে এসে আমাদের সব সমতার বাহয়
সম্মান করছে। আমরা পরাবান, আমরা নীরবে আমেরী
মায়েরের মিটে মুলি সহ করতে বাধ্য, কিন্তু ইচ্ছাভের প্রাণত
মরীম জনসাধারণ আমেরীর “বিক্রমে” সহ্য করনি। গত
১৫ ডিসেম্বর বার্লিনহাম সহরে এক জনসভায় বাংলার
মিঃ সম্পর্কে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী যখন বক্তৃতা
করিলেন, তখন তাঁর বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ বাধা দেওয়া হয়,
কুঞ্জার মশৌই স্রোতাদের প্রণবনা তাকে জর্জরিত হ'তে

হয়। শুধু তাই নয় গোলমাল ও হাতাহাতি বামাবার জন্ত পুলিশ
আমাদানী করতে হয় এবং গোলাবের ফলে সত্তা জেদে
হয়। সংবাদে আরাে প্রকাশ, মকে উপবিষ্ট সদস্যরা কাঠের
সদীত আরম্ভ করলে স্রোতার দল আতঙ্কিত সত্তা
আরম্ভ করে। দেখা যাচ্ছে বাংলার বাহসমত্তা নিয়ে মিঃ
আমেরী এ যাবৎ যে সব কথা বলেছেন, সত্তা সোপান করে
যে সব বিরতি প্রচার করেছেন, তা বিলাতের জনসাধারণেরও
বৈধাযুতি খটিয়েছে। বাংলার হৃদয়ঙ্গমী ও তার ফলে
লোকস্ব যে গভর্মেন্টের ঊদাসীন ও অব্যবহারই শোচনীয়
কল সে কথা ইচ্ছাভের সোকেতবাত হয়ে কেলেছে।
বিশং শতাব্দীতে একতর একটা ব্যাপার ও মাতায়ক হৃদয়
যথা সময়ে আত্মরিক চেঁচা থাকলে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট প্রতিরোধ
করতে পারতেন না একথা বাস ব্রিটেনের লোকেরা বিশ্বাস
করে না তাই—মিঃ আমেরী সাহেবের সাক্ষাৎ তাহা বরাদ্দ
করতে পারেন।

জেনারেল আইসের নব-বিধান

লন্ডনের এম্পারার পার্লামেন্টের এনসিয়েশনের সভায়
দক্ষ আত্মরিক হারোগ্রু আইস সম্প্রতি এক ভদ্র গভীর
বক্তৃতা করেছেন, বক্তৃতাটি শুধিকার আকারে সভার বিতরণ
করা হয়েছিল। তাঁর মতোমিহু বক্তৃতা এই যে বর্তমান হৃদয়
পর জগতে যার ভিতরে শক্তি শেষ পর্যন্ত উঠে থাকবে,
আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া। তাপ মরছে, ইতালীর
ভৌগোলিক সভা বিশ্বর হৃদয়ে বলালেই চলে, জাতিগত
অস্তিত্ব লোপ পাবে আর জাতিগতের হাত পা জেতে তার
মিচ্চের যৌগে দীপ্ততার বাস করতে বাধ্য করা হবে। তাপের
সত্তা বা বহুভা শাসন ও স্রোত করবে আমেরিকা, ব্রিটেন
ও রাশিয়া। গায়ের জোরে এই তিন শক্তি হুঃমমতী
পৃথিবীকে ঘর্ণে পণিহত করবে। আত্মরিক আইসের বক্তৃতা
ইচ্ছাভের জনসাধারণ সার ভিত্তে পারেন। অনেক

পূর্ণ প্রেক্ষাপারে—
২য় সপ্তাহে চলিতেছে

ডাক্তার: ডহর
শ্রীমাজ, নরেশ
ফনী, ঘলিতা
রেণুকা, প্রভা

অন্ততঃ ছ' খণ্ডের জু
আপনারা থাকলে
বাঙলার একটা গ্রামে
সহজ সাধারণ অথচ
কতকগুলি মায়েরে
কাল্লা হাসি এবং সানার
জীবনের খটনার মাক
থানে, তাদের মনে
বেদনা, রহস্ত ও সর্বাধ
তার মুকুর দেখেছেন কত
বিশ্বয়, কত গভীরতা।

শতাব্দী
এক
দুই

ইক্সমিক টিকিটের টিকিট নিবেদন
ইক্সমিক ও পরিচালনা:
শেলড্যানন্দ
চলচ্চিত্র: সুবল দ্বাশগুপ্ত

রূপরাণী

বি. বি. ১৯১৩
প্রভা: ২-৩০০ ৫-৩০০ ৮-৩০০
১৯১৩ ১৯১৩ ১৯১৩

সম্প্রদায়

২০২০

১৯১৩ ১৯১৩ ১৯১৩

এই মিলনকে পরম শ্রদ্ধা দিয়ে এসেছে, নারীকে মহা-
শক্তির আধার বলে কল্পনা করেছে, পুরুষের ভিতর
দিয়ে দেবে এসেছে পুরুষোত্তমকে। সামাজিক বিবাহের
সংক্রান্ত অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়ে হিম্বু
মন এই শ্রদ্ধাকেই বিবিধভাবে প্রকাশ করে এসেছে, এর
অস্বাভাবিক সাদিক ভাবটিই তাঁর কাছে আনন্দময় হয়ে
উঠেছে। বিবাহ যে শুভ অমুহুর্ত, এর কারণ কি? একে
মঙ্গল-অমুহুর্ত কেন বলে? এত আনন্দ আর উৎসব
আয়োজনের পিছনে আসল কথাটা কি? এ সব প্রশ্নের
উত্তর আমরা সহজেই অমুহুর্ত বলতে পারি।

পৌরাণিক কালের ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে
হিন্দুর ইতিহাসের যুগে এসে পৌঁছেছে। অমুহুর্ত বিবাহ
প্রথায় আমরা দেখতে পাই হিন্দুরা সেই পৌরাণিক
নীতি ও রীতিকে অক্ষরপূর্ণ করেছে। একদা মূনি
বিহামিঙ্গ রামচন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন জনক রাজার
সভায়, সেখানে যোগ্যতার পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হয়ে রামচন্দ্র
পরীক্ষাত্ত করেছিলেন। অজুন লক্ষ্যেও ক'রে পেয়ে-
ছিলেন দ্রৌপদীকে। অর্থাৎ রামায়ণ এবং মহাভারতের
ছুটি বিরাট সভ্যতার কাহিনীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়,
এক দিকে পুরুষের অসীম যোগ্যতা এবং অপর দিকে
নারীর মহীয়সী রূপ—এই দুইয়ের ব্যৱধান মিলন।
আমরা একালে অর্থাৎ ইতিহাসের আধুনিকতর অধ্যায়ে
বিবাহিতা সতীনারীর কল্পনা করেছি, যেখানে নারী
পুরুষের ক্রীতদাসীমাত্র। স্বপ্ন, অযোগ্য, বিকৃতস্বভাব,
বীরহীন এবং শক্তিশাল্যহীন কোনো পুরুষ কোনো
নারীর বরমাণ্য লাভ করিতে পারতো না; এবং সেকালে
নারীও বহুবিভা পায়দর্শিনী মহিষী না হ'লে উপযুক্ত
পুরুষের স্ত্রী হ'তে পারতো না। সীতা কেবলমাত্র
অশ্লশজলা সতী নারী ছিলেন না—রাবণের মতো প্রবল
দুষ্টশক্তিকে তিনি দূরে রাখতে পেরেছিলেন, আশ্বত্থাণের
দ্বারা বহুবল্লভের রাজকে তিনি সম্বরণ সাধন করেছিলেন,
লব ও কুশকে বীরত্বের আধার করেছিলেন। ইতিহাসের
যুগেও আমরা লক্ষ্য করি এখানে-ওখানে স্বয়ম্বর সভা।
মহীয়সী ব্রহ্মপা নারীর হাত থেকে বরমাণ্য লাভের
আশায় যে সকল রাজা ও রাজকুমাররা প্রতিযোগিতায়

নামভেন, তাঁরা সকলেই কিছু অযোগ্য ছিলেন না।
কিন্তু মালদান হোতো যোগ্যতর পুরুষের প্রায়।
অর্থাৎ ক্রি-মেয়ে কি-পুরুষ—উভয়কেই যোগ্যতার মান
ক'রিতে হতো। পুরাণ এবং ইতিহাস থেকে বহু
উদাহরণ তুলে দেখানো যায়, বিবাহ ব্যাপারে স্ত্রীলোকের
ব্যক্তিত্বাত্ম্য, স্বকীয়তা, স্বাধীনতা এবং ইচ্ছা-অভিচ্ছিক
হিন্দুরা স্বীকার করে এসেছে। আধুনিক ইতিহাসে
যুগ ছাড়া বিবাহ-প্রথায় ও বিবাহ অমুহুর্তে হিন্দু
প্রথাগত নারী ও নারীদের অমীমাংস ঘটতে দেখি।
কেবল তাই নয়, যে-মিলনে দেশের, জাতির ও সমাজে
কল্যাণ হবে বলে হিন্দুরা মনে করেছে, সেখানে বি
নারীর অস্বৈর প্রায় ও ছাড়পত্র পেয়ে অবস্থিত কেঁ
পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নরনারীর মিলনে
পিছনে মছে আশ্রয় যেখানে নেই, ভালোবাসা যেখানে
লোকস্বভার আসনে বসনি, যেখানে ব্যক্তিগত হিং
স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া মিলনের আর কোনো লক্ষ্য নেই—
সেই প্রকার বিবাহ হিন্দুরা বরদাস্ত করেন। বার
প্রত্যেক হিন্দু সমাজ সেই আদর্শেই গঠিত এই
পরিচালিত।

হিন্দুসমাজ আর হিন্দুধর্মের বাইরে এমন অম
দল আছে, যারা বলে থাকেন হিন্দুর বিবাহ প্রথা
বিবাহ অমুহুর্ত নানাবিধ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় কুৎসার্যাক্ষ
আমরা বিচার ক'রলে দেখতে পাবো অজ্ঞাত পাশ্চাত্য
দেশে বিবাহ অমুহুর্তগত ও নানাপ্রকার অস্বাভাবিক
ক্রিয়া মেনে চলেন। অমুহুর্তকে আনন্দময়ক ও দীর্ঘ
করার জ্ঞান অনেক রকমের প্রচলনকে যোগ্য ক'রে বে
হয়। এতে আমোদ আর কোতুক বাড়ে। গি
স্বাধীন-বিবাহ, প্রথম-বিবাহ, গন্ধর্ব-বিবাহ—ইত্যাদি
প্রকার বিবাহই পুরাকাল থেকে হিন্দুরা মনে এসেছে
স্বভাৱ বিবাহ করেছিলেন অজুনকে নিজে রথ চালিয়ে
জিতামাত্র বিবাহ করেছিলেন বাসুদাতীকে নিজের ম
শকুন্তলা নির্বাচন করেছিলেন চন্দ্রায়তকে। ইতিহাসে
যুগেও দেখি সংস্কৃত স্বয়ম্বর সভায় এসে পাড়ানো, য
নিঃস্বের ভগ্নী দুই জাতির মিলনের করনায় স্ত্রী
আকবরের কাছে গেলে, দু'হাজার বহর আর

দলোয়ার রাজকুমারী মাধবিকা গ্রীক রাজকুমারের
পলায় বরমাণ্য দান করেছিলেন। পুরাণ এবং ইতি-
হাসের বহু উদাহরণ বিচার ক'রলে দেখা যায়, হিন্দুরা
বিবাহ প্রথার মধ্যে প্রেমের ও কল্যাণের আদর্শকেই
উচ্চাঙ্গ দিয়ে এসেছেন, কুৎসার্যকে তাঁরা প্রসন্ন করেন।
ইতিহাসের কালে এসে পৌঁছে আমরা দেখি হিন্দুধর্মের
মনে উচ্চ-নীচের ভেদ-বুদ্ধি দেখা দিয়েছে। উচ্চবর্ণ
এক উচ্চশ্রেণীর পুত্র অথবা কন্যা নিম্নবর্ণ ও শ্রেণীর নর
নরনারীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারছে না।
হবেই নীতি হিন্দুবিবাহ আদর্শের প্রতিক্রিয়া রক্ষা
করেনি। যেখানে আদর্শ রক্ষার প্রয়োজন বলা
যেখানে অহিন্দু-অধর্ম-অনন-গ্রীক-ইরাক-মুসলমান-
নিধি-বৌদ্ধ—ইত্যাদি সকল জাতি ও সকল ধর্মের সঙ্গে
প্রতিটি হিন্দুরা নিজেদের সমাজ ও ধর্মকে প্রসারিত
করেছেন।

পুরাকাল থেকে ইতিহাসের যুগ অবধি হিন্দুকল্পনা
নারী নির্বাচনে দেখেই স্বাধীনতা পেতেন। এ নিয়ে যদি
যা-কোথাও বিরোধ দেখা দিত, সেটা ব্যক্তিগত নয়—
সামাজিক অথবা রাজনীতিক। কন্যারা তাঁদের শিকার
ও সংগ্রহিত গুণে স্বাধীনতার পতি নির্বাচন করতেন,
যখন উপযুক্ত পাত্রের নিরীক প্রণয় জ্ঞাপন করার সুযোগ
লাভ করতেন। কন্যার যিনি অভিভাবক—পিতা ভ্রাতা
অথবা অপর কে—তাঁরা কন্যার স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ না
ক'রে মঙ্গল অমুহুর্তে যোগ দিতেন এবং আশীর্বাদ
দেতেন। সমাজ আনন্দে মুগ্ধহিত হয়ে উঠতো।
পৌরাণিক কালের মধ্যে সাবিত্রীর উদাহরণ এখানে
দেখা। রাজা অশ্বপতি বহু স্ত্রী ক'রেও স্বভাব উপযুক্ত
পাত্র খুঁজে পেলেন না। অশ্বপতি কন্যার স্বাধীনতা
স্বীকার করে বলেন, তুমি উপযুক্ত স্ত্রী খুঁজে আনো।
সাবিত্রী অস্বপতি গিয়ে কাঠুরীয়া সভাবানকে স্বামী নির্বাচন
ক'রে এলেন। কিছুকাল পরে সর্গপাত্রে কাঠুরী
স্বামীর দ্বারা মলে। যে-প্রেমের কারণে আশ্রয় সাবিত্রী
কাঠুরীয়ার সঙ্গে দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন, সেই প্রেমের
মহত্ত্বভারা সভাবানকে তিনি জীবন্ত ক'রে তুললেন।
বহু ভালোবাসার অন্তরে যে প্রাণদায়িনী শক্তি নিহিত,
ওই হিন্দুস্বাধীনতার করেছ আপন রূপকল্পনা।
আধুনিক কালে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী সাবিত্রী ব্যা-
ধিকরণ পাত্রী। কিন্তু আমি বলতে চাই, এ সকল ক্ষেত্রে
নারীর স্বাধীনতা, আত্মস্বাধীনতা, স্বাধীন প্রণয় ও নারীর
স্বাধীন প্রতিভাকে হিন্দুধর্ম ও সমাজ মানলে মনে
দিয়ে। আর একটি উদাহরণ দেবো। দেবতার বর মনে

ক'রে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয়েছিল। সেই নারী পুরুষের
বশেষ যুবরাজত্ব পিতার রাজত্ব পরিচালনা করতেন।
তিনি ছিলেন স্বাধীন, বেচ্ছাধীন—তাঁর অবাধ ও
স্বচ্ছন্দ পতিবির ছিল। নারীর এই আশ্চর্য শক্তি
ও প্রতিভা হিন্দুস্বাধীনতা ও নারীর মনোভাবেরই পরিচয়
দেয়।

দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসের অপেক্ষাকৃত আধুনিক
যুগে বিবাহিত নারীর অস্বচ্ছন্দতাকে পরিকল্পনা এসেছে।
নারী হোলো পুরুষেরই অপর অংশ—এই ভাবটি আগে
প্রচলিত ছিল—যেমনটা নিয়ে নিজেদের আড়ালে রাখার
দরকার হয়নি। অতিও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে যেমনটার
এত প্রচলন হয়নি, সিংহিত হিন্দুর বিদ্যুৎ দেওয়াও অনেক
ক্ষেত্রে আশঙ্ক ও অপ্রতিভ। মনে হয় পাত্র ও মোগল
যুগ থেকেই উত্তর ভারতে যেমনটা দেওয়ার রীতি আরম্ভ
হয়েছিল। এ যুগে হিন্দুবিবাহের অমুহুর্তে আমরা দেখি
সমাজের আশীর্বাদ ও সম্রাট নেওয়ার জ্ঞান জনচেতা
আয়োজন করা হয়। নাগরিক সভ্যতাতা হাল-আমলের,
হস্তধার তাঁর কথা বাহু দিই। কিন্তু অগেগেকার লোক
যখন বিবাহের উৎসব ঘটুতো—তখন সেখানকার ইতর-
জ্ঞত সর্গপাশ্রয় সেই অমুহুর্তটিকে গাফল্যমগ্নিত করার
জ্ঞান সচেতন করে। স্বয়ম্বর, কনকর্তা, চমকাই, স্বর্ণকার,
রজক, তক্তাবা, প্রামাণিক, মৎস্তজীবি, গৃহ-নির্মাতৃস্বামী,
যাদব, ময়রা—ইত্যাদি সকল সম্ভাব্যকে নিয়ে যেমন
এক-একটি আদর্শ গ্রাম ছিল, তেমন সবাই এসে মঙ্গল,
অমুহুর্তে মনবের হাতে উৎসব করতো। শম্ভবজ্ঞে,
বাড়ী, উল্লুরের, মঙ্গল ঘটায়, মল্লোচ্চারণে, হোমযজ্ঞে—
হিন্দুরা যোগ্যতা করেছ বিবাহ উৎসবের ব্যতী। বর-
বশে যিনি এলেন, তাঁকে মর্দাণ দেওয়ার জ্ঞান মেনে
পুরুষ মাত্রকেই স্বগন্ধী মালা বিতরণ করা হয়। কজাকে
মর্দাণ দেওয়ার জ্ঞান মেনে সকল বিবাহিতা নারী
কজাকে বরণ ক'রে সম্ভ্রান্তান সাহায্য করতেন। সমুদ্রে
দেবাদিদের নারায়ণ, হোমায়ির অভ্য, দুষ্টজিকার
রোমাঞ্চকর বস্ত্র, বোধশত্রু মাফা—এদের সমুদ্রে আসনে
উপবেশন ক'রে নর ও নারীকে চিরজীবনের জ্ঞান, জন্ম-
জন্মান্তরের জ্ঞান প্রতিশ্রুত হ'তে হয়—তুমি আমার,
আমি তোমার। সেখানে দেব-বিজ্ঞ-অগ্নি-পিতৃস্বপ্ন-
মহাশক্তিকোপ সাধারণ শাস্ত্রম্বর্জী সত্যটির আশ্রয়—
সমস্তই সেখানে উপস্থিত হয়েছে ওই ব্যাকটি শোনার
জ্ঞান, তুমি আমার, আমি তোমার। হিন্দু বিবাহ-প্রথা
ও বিধি, সর্বকালোত্তরী হিন্দুধর্ম, হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু
ধর্মকেই গৌরব ও সম্মান দিয়ে এসেছে।

ইতিহাস

ঐতিহাসিক যোয

মাকে মাকে ইতিহাস পথ ভুল করে
অসিখিত চেতনার মহাগল্পের,
চন্দ্রায় গ্রহভাঙা উজার আলো
ছড়ায় যেটুকু দুহিত মন্দের ভালো
তাই নিয়ে গর্ভের অস্ত্র না পাই
দোষকটি বরাবরের স্বপ্নে চাপাই
স্বপ্নের বুনোহীন স্রুখেই চরে।

ভুল পথে পোনা যায় বন্দীর পান
আলেনা সমাজে তাই সঙ্কটপ্রাণ,
এলোমেলো যুক্তির ঘৃণীপাকে
আদর্শ ভূবে যায় ক্রটির পাকে,
তুষ্টি আনায় শুধু মুষ্টিমেয়
বহুর বেদনা আছো অপরিমেয়
তুষ্টির আগুনে জলে শত শত প্রাণ।

কতু ক্রত কতু ধীর কালের গতি
অসম অবাধ তার ছন্দ যতি;
অর্ধচন্দ্র চক্রের সামাজিক রথ —
গোলাক ধাঁধায় ঘোরে একটানা পথ,
মাকে মাকে ভেঙে যায় স্রুতরেখা
ভালে ভালো পা-ফেলার ছন্দ দেখা—
হুক হয় গুচে যায় অসঙ্গতি।

নব নব চেতনার স্পর্শ লাগে —
মরাভালে কিশলয় নিভুতে জাগে
যন্ত্রের মূর্খনা কাঁপে মৃৎ-মন্ডলে
জাগ্রত জীবনের এ সমাজ ভয়ে,
দেশে দেশে মিলনের সাম্য-সেতু
উড়ায় জগতভূড়ে বিজয় কেতু,
পুমতাগা ইতিহাস রক্তরাগে।

এগুতো এগুতো ফের পেছনে হটে,
মুখে মুখে উল্টে কাহিনী রটে,
পিছু দিকে মুখ ক'রে এগোয় ক্রত
গতিটাই শেষে হয় মনঃপুত।
প্রলয়ের গুরু গুরু গিরি-বিদারণ
গ্রাস করে শিলাপিপিত ভাষাশাসন
রাখেনা চিহ্ন প্রাণ-সিদ্ধান্তটে।

কার বর্ণায় ছিল কতখানি ধার,
কটা মাথা কেটেছিল কা'র তলোয়ার
কামানের কেরামতি দূর পান্নায়
ক'রে গেছে মানোয়ারী মাঝি-মাঝায়
সে সব কাহিনী নয় মানবেতিহাস
অথবা অশ্রুজল দীর্ঘনিশাস,
প্রগতি শব্দমুখী অকূল অপার।

মাকে মাকে স্বার্থের রণকোলাহল —
উল্লার ক'রে যায় স্রুধা হলাহল,
ভেঙে যায় জুগোলের পাঁচিল খেরা
যাযাবরী আত্মার মাটির ডেরা,
মিশ্রিত নব নব রক্ত ধারায় —
কুণীল জাতির কৌলীয়া হারায়
জাগে নব-সভ্যতা প্রাণ-চঞ্চল।

আত্মহত্যা

নিশীথের সারারাত বড় অশোয়াস্তিতে কেটেছে।
নাঃ, আত্মহত্যা তাকে ক'বুতই হবে। এ ছাড়া
দশ পথ আর আছে বলে তার মনে হল না! এক দূর
সম্পর্কের যুবতা ওকে মাহুষ করেছেন আই-এ পাশ
করিয়ে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। সেই পরীক্ষায় ফেলার
ধর পাওয়া গেছে কালকে। বুড়ে মশাই যন্ত্রের
বাঁচারে নগদ কারবার করে বেশ ছ' পয়সা জমিয়েছেন।
তিনি নগদ-নগদ কথা-বার্তা পরিষ্কার করতেই ভালো
বাসেন। যে বাবসায় বোঙ্কাসানের ইসারা পান তিনি
চুপুপি সেখান থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

নিশীথ তার কাছে লোকসানের ব্যবসা। তাই তিনি
মুখ জবাব দিয়ে দিয়েছেন, আর নিশীথকে পড়ানো
টার পক্ষে সন্তবপর হবে না, সে যেন তার নিজের রাস্তা
নিজে বেছে নেয়।

বাস্তব-জীবনে নিশীথ একবারে অসহায়। কেউ
যদি ওকে চালিয়ে নিতে পারে তবে সে ঠিক আছে,
নইলে একবারে কাদার মতো নেতিয়ে পড়ে। সে
খার বি, এ, পড়তে পারবে না শুনে একবারে অঁপে
হলে পড়ে গেছে। ওর বন্ধ-বান্ধবদের মধ্যে কত ছেলে
টিউশনী করে পাশ করেছে কিন্তু নিশীথ ও-সব কাজে
একবারেই পুঁট নয়। সারারাত ছাদে শুয়ে সে কেবল
রোজেরে, কি করা যায়? শেষ কালে সে স্থির করে
ফেসেছে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।
মধর যখন একবারে স্থির হয়ে গেল সেই সময় তার
চোখে এলো ঘুম—তার আগে নয়।

সকাল বেলা চোখ মেলে চাইতেই দেখে রোজুদু
গোটা বাড়ীটাকে একবারে গ্রাস করে ফেলেছে। ওর
পরিকল্পনা ছিল 'অজ রকম'। তেবেছিল অন্ধকার থাকতে
বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে তারপর প্রথম ট্রামটা ধরে
পুখা লোভাকুরদের সঙ্গে গল্লা পরাধ পৌঁছে গেলে যে
বরেই হোক সে আর সঙ্কটমুক্ত হবে না। কিন্তু এতখানি
বেলা যখন হয়ে গেছে সে ফেরে আর একটা দিন

অপেক্ষা করাই বিধেয়। শায়ে বসেছে, হুট করে কিছু
করতে নেই!

এক কাপ চা নিয়ে সে খবরের কাগজের
পাতাটা খুলে বসল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা
বিজ্ঞাপনের ওপর। বিজ্ঞাপনটা এই রকম:

আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান?
যদি আত্মহত্যা করাই আপনিন মনস্ব করে থাকেন তবে
আপনার জীবনের ওপর নিজের আর বিদ্‌মাজ মোহ
নেই। নিজের জীবন সম্পর্কে যখন আর আপনার
মায়্য নেই তখন আত্মহত্যা করার আগে আবার সঙ্গে
দেখা করায় কোনো বাধা আছে কি? ইতি
সাক্ষ্যপ্রার্থী—
ঐম্বরলীধর গান্ধলী

১০৭ নীতারাম যোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটা পাঠ করে নিশীথ ভারী অবাক হয়ে
গেল। বিজ্ঞাপনদাতা নিশ্চয়ই কোনো ত্রিকালজ্ঞ মনীষী
হবেন। নইলে তিনি তার মনের কথা জেনে এমন ভাবে
বিজ্ঞাপন দেবেন কেন? বিজ্ঞাপনটাও একদিন পরেও
বেকতে পারবে। নিশীথ তাড়াতাড়ি জানা গিয়ে দিয়ে
মুরলীধর বাগার টিকানার উদ্দেশে রওনা হল।

পূর্বোক্ত টিকানায় মুরলীধরবুর সঙ্গে নিশীথের আলাপ
হল। চান্‌চকার অমারিক লোক। তিনি যা বলেন তার
সার মর্ম হচ্ছে এই যে, নিশীথ যখন আত্মহত্যা করাই
স্থির করে রেখেছে এবং তা' থেকে এক পা এবং এক
চুলও নড়বে না—তখন মরবার আগে কিছু দেশসেবা
করে গেলে শেষ কি? কাজটাও বিশেষ কিছু শক্ত
নয়—বর্ধমান বন্ধায় দেশ ভাড়াভাগি হয়ে গেছে সেই-
খানেক দিন কয়েকের জন্মে আত্মনিয়োগ।

নিশীথ ভেবে দেখলে, মম কি? বুড়া মশাই যখন
নিজের রাস্তা নিজেই বেছে নিতে বললেন তখন
এই অপরিচিত পথে খানিকটা হেঁটে দেখলে ক্ষতির

কোনো সঙ্কল্পনা নহে। আশ্রয়তা সে ত' নিজের মুঠোর মধ্যেই রাখে। এখন খুশী দেখে থেকে প্রাণটাকে আশা করা দেখা!

নিশীথ রাজী হলে সেইখানেই রয়ে গেল। চান্দ-চাঁদ আর কিছু পুরানো কাপড় নিয়ে সেই রাতেই নিশীথকে বস্ত্র-অঞ্চলে রঙা হতে হবে। সঙ্গে যাবেন আর একটি বেশবস্ত্রিকা। তিনি মেয়েদের স্তম্ভ-স্বপ্নি দেখে বিনে আর নিশীথ চাঁদ আর বস্ত্র বিতরণের বাস্তব।

মুক্খীনার দুজনকে ছানামি ময়াম শ্রেণীর টিকিট কিনে গাড়ীতে তুলে দিলেন। প্রথমটা ছাঁজনে একেবারে চুচুটি। নিশীথ ত' ইতিপূর্বে অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে মেলায়ে দেন কবীর ভূষণগাই পায়নি। তাই শিক করে কথা শুরু করার এই কথা ভেবেই সে রীতিমত করে উঠল।

মেয়েটি প্রথম অস্বস্তিরে বাঁধ ভাঙলে। তখনো, আপনি কি আশ্রয়তা করবেন স্থির করেছিলেন?

নিশীথ তার মনের কথা শুনে চমকে উঠল। এরা সবাই ওর মনের কথা জানতে পারলে কি করে? ওর মুখে কিবা কপালে সঁটহাতে কঁপে উঠে দেখেছে নাকি? নিশীথ প্রথমটা তার কথার জবাব দিতে পারেনে না।

মেয়েটি ধানিকণণ বাদে আবার জিজ্ঞেস করলে, বহন না, লজ্জা কি? আমরা ত' এখন একই সেধাকার্য নিয়ে নিকটবর্তনের পথে রওনা হয়েছি। কাছেই পরস্পরকে আমরা বস্ত্র বদলে ধরে নিতে পারি, কি বলেন?

নিশীথ কথার খেই হারিয়ে ফেলে। তবু অগ্রসরতের শেষ সীমানায় পৌঁছে নিজেদের প্রসন্নভাবে সামলে নেয়; তারপর জবাব দেয়—জানেন যখন তখন আর আপনাদের কাছে কিছুই ফেঁদে না।

মেয়েটি দ্বিগু করে হেসে ফেলে জবাব দেয়, জানি না আমি কিছুই—তবু ত' আচ করতে পারি। এইবার নিশীথের একটি সাহস বাড়ল। সে জিজ্ঞেস করে, কি করে আপনি ঠাহর করেন যে, আমি আশ্রয়তা করতে চেষ্টা করছি?

মুখ নীচ করে মেয়েটি বলে, এইখানে এসে এই মনেপুরা আগে আমার মনেও সেই সঙ্কল্প ছিল কিনা একই সাধু সঙ্কল্পের লোক দেখলে বেশ চেনা যায়—এই বলেই মেয়েটির মুখে আবার সেই বহনময় হাসি। এইবার নিশীথের আশ্চর্য হবার পলক। সে বিধি দৃষ্টান্তে তখনো, আশির্বাদ আশ্রয়তা করতে চেষ্টা করেন বলে কি। আপনাদের আবার কি ভয়।

মেয়েটি নিজের চুলের গোঁছায় আঙুল জড়ানোতে বলে, দুখটাকে কি আর সীতার মতো গাঠেনে আটকে রাখা চলে না। ওর অব্যবহিত পতি' মেয়ে সেখানে, যাকে তাকে ও গিয়ে বিনে নাটিনেই জায়গার আর তার মধ্যেই এই ভয়-সঙ্কল্প মনে আবে। যারা বাজে কথা, এইবার আপনি বলুন কি করে যা হাজার ভয়সঙ্কল্প এখন আপনাদের মাথায় এসে।

নিশীথ মনের মতো খোঁচা পেয়ে নিজের কান্না সন্নিবেশে জানিয়ে দিলে। তারপর মুখ তুলে এইবার আপনাদের ইতিহাসের দারোয়ান করতে চেষ্টা করল। ভালো কথা, আপনাদের নামটাই যে জানা হয়নি।

মেয়েটি চোখের ওপর থেকে চুলের গোঁছা সরিয়ে সত্যত বলে, নাম? নাম দিয়ে কি করবেন? যদি আমার ডাকে আলো বলে। আর আমার কান্না কখনো জিজ্ঞেস করছেন? গরীব বাপ-মা যখন যে বিয়ে দিতে পারেন না তখন সেই মেয়ের বাস্তব্য হাড়াডোনা ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে যা বসতে পারেন নিশীথবাবু?

নিশীথ আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস মনে মনে মর্মে গুঁজে গেলে না। তবু থেকে থেকে কেরলি মনে হতে লাগল—নিশীথ মনে—নির্ভীত রাস্তা পর-আদোর দেখা। সেই আদো তার জীবনে কখনো কখনো পাগো জালাবে না খোয়া বিকীর করে কে জানে?

নিশীথকে চুপ করে থাকতে দেখে আলো নিশীথবাবু, কাজ আমরা টিক করে যাবো। মুক্খী আমাদের খরচপত্র করে পারিয়েছেন আর এই মুক্খী বাবুর পেছনে একটা বড় সত্য আছে শুনেই গা

কাছেই তাদের অর্থের অপচয় জানাবা কিছুতেই হচ্ছে দিতে পারিনে। তবে আমাদের নির্দিষ্ট কাজ শেষ হবার পর আপনাদের যখন আবার আশ্রয়তা করা হবে আপনাদের আবার জানাবেন। পোটাগিয়ার রায়নোড, আমার সঙ্গেই আছে

এই ঘটনার দু'মাস পরের কথা। কলকাতার একটি মিস্ট্রিন অঞ্চলে—ততোধিক মিস্ট্রিন একটি বাড়িতে, অতি সামান্য ভাবে, একটি বিবাহের ঘটনা। পুরোহিত রাতে সেখানে, একমাত্র, নিমন্ত্রিত প্রতিবি হচ্ছেন মুরগীধর বাবু। বিবাহ অল্পদূর হতে যাবার পর মুরগীধর বিশেষ গীর্বাণ্ডিকের দরখ, একটি, গান গাইলেন। খির খির করে ভেসে আসছে বাতায়ন পথে দক্ষিণ-সমীপ।

বেল-উঠল টিকি-টিকি-টিকি।

চুলের মালা সেই সমীপে হুড়তি সববাহ করছে। নিশীথের দেখে মনে একটি স্বপ্নময় তত্ত্ব। হঠাৎ ছন্দ-গতনের মতো মুরগীধর বলে বসলেন, তাইলে নিশীথ ভাবা সত্যি আশ্রয়তা করলে?

নিশীথের বুকটা ছাঁচ করে উঠল। এমন রাত্রি... ছাদের সন্নিবেশে ছোয়াংসা এসে পড়েছে—পালে বলে প্রিণা-গান গাইছে, উভলা বাতাস তার কোঁকচা চুল নিয়ে খেলা করছে। এমন সময় এই বুক-টুকো কোনো জিজ্ঞাসা। নিশীথ ভয়ে ভয়ে প্রস্তুত করলে, একথা হঠাৎ আপনাদের মনে এলো কেন মুরগীধর গাইছেন মুরগীধর মুহু হাতে, জবাব মিলেন, আশ্রয়তা... ছাঁচা আর কি বলতে পারি—বলো? বিবাহ—মানসেই ত' প্রাত্যহিক আশ্রয়তা! দেবদেবের গায়-টিকিটিকি... উঠল টিকি-টিকি-টিকি।

হাস্যিক

(১)

অষ্টরঙ্গ

ত্রিবার্জন্ত বলেছিলেন স্পষ্ট, বলাই হতো হতো, কী হতো হতো, তাই দুনিয়ার বুক যদি শাখি আসতে চায়; তবে মাছের কাছে সব খোঁসা করে বাও; আর দু'মাসের ধরে আগাগোড়া চাবকা।

কিন্তু কাজের বেলায় দেখিচি সব অষ্টরঙ্গ; তাই বলে, যা করতে কখন না-আদারবা, তাই করে, তাই ভবিষ্যতি অপরাধ।

কিন্তু মাছের বুকবে না; কি হবে অপালে? বিস্তর ছাং দেখিচি রয়েছে কপালে।

অষ্টরঙ্গ

ইন্দিরা

(সমস্যা-ধূলাক উপন্যাস)
শ্রী অমল ধোম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একবারে কিছুমাত্র বোঝবার শক্তি নেই, তারপর গলীর স্বর আরো একটি কোমল করে এনে বলে, 'সত্যই বলছি বড়দা, চাঁচা তোমার সংগে আমি করিনি। যা বলছি তা অশ্রু থেকেই বলছি, হঠাৎ এই অভাবনীয় কণ্ঠস্বর তোমাদের তাকিয়ে গেলেন সে মুখ এক অশ্রু বিক্ষতায় ভরা, বিক্ষুব্ধ বা অজ্ঞতার চিকমাকি সেখানে অবশিষ্ট নেই। মনে মনে তিনি বলে উঠলেন, নারী চরিত্র কী চিরদিনই রহস্যময়! কোথা থেকে যেন প্রাণের মধ্যে ঠাঁর উজ্জ্বলের বজা ভেঙে উঠল। আবেগের সংগে তিনি বলে উঠলেন, বোঝবার শক্তি আমার কতটুকু বোন, সামান্য লেখাপড়া শিখে এই বিশ বৎসর কেরানীগিরি করছি, অত শক্ত কথা বোঝবার মত ক্ষমতা আমার কোথায়, সংসারী মানুষ আমরা শুধু একটুইই বুঝি, খেয়ে পূরে আনন্দ করে কোনো রকমে ভাণ্ডাংগ করে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল, কী হবে অত তব্ধকথা বুঝে, যা কোনোদিনই এই মাথায় সেঁদুবে না, সংসারের কাছে লাগবে না। উত্তরের মধ্যে এক স্বলক হাসি ফুটিয়ে ললিতা বলে উঠল, তুমি ভুল করছ বড়দা, সংসারে বোঝাবুরি তরুণী তোলাই অজ্ঞায়, কারণ তোমার আমার আর পাঁচজনের বোঝাবুরি মধ্যে তন্ময় থাকলেও বোঝাটা বোঝাই থেকে যায়, জোর করে বলা যায় না কার বোঝাটা বেশী আর কারটা কম; সংসারকে তুমি যে চোখে দেখেছ, সে চোখে হয়ত' আমরা নাও দেখতে পারি, তাই আমার কাছে যেনো তব্ধ নয়, সেটা তোমার কাছে তব্ধ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ঘরের কোন থেকে একটা উজ্জ্বল হালি রোল

উঠে, সব কিছুকে যেন বিপর্যস্ত করে দিলে, দুই লোকের কাছে হঠাৎ বহুপাত হলে, চমকে উঠে যেমন একবার চারিদিকে তাকায়, তারাদাসের স্বা যেন কতকটা সেই রকম হয়ে উঠল। এতক্ষণ যেন কিছু ভুলেই গেলেন, ঘরে আরো একটা লোক বেশ বিড়ি মনেই এতক্ষণ তাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। ও মনে হল, কে যেন তার উৎসাহের আশ্রনে হঠাৎ বাসতি জল ঢেলে দিলে, যে কথা তিনি বলতে যাচ্ছিল সে কথা আর বলা হল না, সমস্ত কথাই হারিয়ে বোকার মত তিনি ললিতার দিকে চেয়ে রইলেন। ললিতা তাঁকে আশস্ত করার জন্যে হঠাৎ চেয়ারে উঠে পড়ল, তারপর তারাদাসের পিঠের কাছে এসে তাঁর মাথায় হাত বুলািয়ে দিতে দিতে বলে, ওদিকে কী কান দিও না দাদা, একবার যখন কথা দিয়েছি, সে কথা আর নড়চড় হবে না, হঠাৎ সে তার মুখটা তারাদাসের কানের কাছে নামিয়ে এনে, একটু লজ্জাজড়িত আঙুরাজে শোমাল, পাত্র কী তুমি ঠিক করেছ দাদা মাথা নেড়ে তারাদাস সায় দিলেন। প্রশ্ন হ'ল, কবে আমায় দেখতে আসবে বল না? তারাদাস এবার দিকে দিকে তাকালেন, তাঁর মনে হল, লজ্জায় যেন ললিতা সমস্ত মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে আর তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগলেন, কিন্তু বাইরে হু কিছুমাত্র পরিচয় না দিয়ে শুধু মুখে বললেন, যেদিনই মনে করবে, সেই দিনই। উত্তর হল বেশ কালই সে আমায় দেখে যাক না, যদি পছন্দ হয়, হু দেবি করবাই হু কি প্রয়োজন আছে। যে ঘরে একটা দিন দেখে তখন.....ললিতা হঠাৎ রূপ করে গেল তারাদাস তার বুকের দিকে তাকিয়ে কি যে বুঝে

[১০৫ -]

[ইন্দিরা]

না তিনিই জানেন। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি বুলেউলেন, বেশ তাই হবে। তারপর দীপ্ত বিজয়ীর ভগ্নিতে একবার মেঝেভাঙের দিকে স্থল্লার দৃষ্টিতে থাকিয়ে তিনি আশস্ত আশস্ত খর থেকে বেরিয়ে গ্যালেন। ঠাঁর অত্যাচারের সংগে সংগে ললিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, Poor fellow!

হঠাৎ টেবিলের অঙ্গ প্রাঙ্গণ থেকে শব্দ হ'ল, অভিনয় চলেগো পরম জীত হলো। আদেশ কর কী পুরস্কার তোমায় দিতে পারি। সারা মৃতের ওপর একটা বিশ্বাসের স্বপ্ন আরবণ হঠাৎ এনে ললিতা করুণ স্বরে বলে উঠল, ah you cruel universe! তারপর যেন কী রকম লীল্য দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে, তারিফের মেজাজ ইচ্ছাকৃত ও বলে উঠল, বিরুদ্ধের এই শেষ লগ্নে আঙ্গ ভায়ায় বলতে দাঁও মেঝেদা:

আমি কেহ নই। তাই হবে বিচ্ছেদ আমার।
নাগীর নিয়তি এই। হায় এই কথা,
কত না ভেবেচি মনে,
কিছুই কি নই মোরা! বাসিকা বেলায়
আমাদের বিনগুলি স্থল স্বপ্নধার
কেটে যায় পিতৃগৃহে; কে জানিত
অজ্ঞতা সে কখন ভাঙারে পায় স্থান।
তাই বুঝি লজি যবে বিকচ যৌবন, লজি দৃষ্ট সংসারের,
সে মুহূর্তে নিকষিত, নির্বাণিত, পরিত্যক্ত মোরা
অজানা মনের কাছে, অজ্ঞাত প্রবাসে পয়া সম
পাই স্থান;
পিছে কালে চির চেনা পিতা মাতা দেশতা গৃহের।
—নহে ইহা বরদাতা কিংবা চির উৎপীড়ন, তবু
একটি নিশীথে লজি জীবনের সে কী রূপাঙ্কর;
তারপর একদিন সেই চির দাগস্থ শৃংখলে
আমাদের প্রয়োজন শুভি করে বলে এত ভালো,
এই ভালো, এই ভালো, ইন্দের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।
আগতি শেষ হবার সংগে সংগে উভয় দিক দিয়ে
ঐক্য হাততালি আর হাসির আওয়াজ সমস্ত ঘরটাতে
ঘন ঝড় বইয়ে দিলে।

হঠাৎ ললিতা শুনলো, মেজদা তার বলে চলতে, ah 'tis beautiful, splendid, superfine, climax- এর একেবারে চূড়ান্ত! বাঃ, বাঃ! বেশ সুন্দর, Bravo ললিতা Bravo!
হঠাৎ বাড়ির দিকে নজর পড়তে লাকিফের উঠে সে বলে, সাতটা দশ! নাঃ আমরা দেখছি দিনের পর দিন ভয়ংকর রকম punctual হয়ে উঠছি। ললিতাকে তার দিকে জিজ্ঞাস্ত দৃষ্টিতে তাকাতো দেখে সে বলে উঠল, তোরা একেবারে জ্ঞানতে জ্ঞানতে আমাদের ঘরে, ভাবের অতুত একটা সংশ্লিষ্ট হওয়ায় মনে পড়ল 'আজ কোথায় না আমাদের একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার কথা ছিল।
স্বরিত গতিতে চেয়ারটা পিছনে সরিয়ে দিয়ে ললিতা বলে উঠল, চুপসের যাক সব! সেটা যে কায়দা-বেরে ডাক। এতক্ষণ ভুলেই গেলুম। ভাগিস তুমি মনে করিয়ে দিলে, দাঁড়াও আমি আসছি। উত্তর হ'ল, আমি ওটা মনে করায়নি যে, ওটা তোর লকিতারই কাজ।
ললিতা খর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, কবিতা আমার দীর্ঘজীবী হোক।
সভা বসেছিল রঞ্জন নামকরা সাহিত্যিক আর কবি নিয়ে। আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা আর ইংরেজী কবিতার ওপর। একে একে সমস্ত রচনার ওপর মতব্য টিপ্তনী আর প্রশংসার ছুফান ভুলে সভাপতি যখন আসন ত্যাগ করতে যাবেন, তিক সেই মুহূর্তে কৌতুকলী দর্শকের চোখের সামনে দিয়ে ওরা মৃতিমান স্বর্জের মত এসে সভাপতিগৃহে প্রবেশ করল। ওদের দেখে, জনতার মধ্যে খানিক চাকলসের সাড়া পাওয়া গেল। মুহূর্তের কেউ কেউ বুল্লে, 'মামিক জোড়ি দেখছি সময়ই এসে পড়েছেন।
দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে, বছর সত্তরোটা আঠারোর এক ভবী এক রকম চুটে এসেই ওদের অভ্যর্থনা করল। সভাপতির আসনের পাশে ছ'খানা চেয়ার যেন ওদের জুড়েই এতক্ষণ থালি করে রাখা হয়েছিল। আগন্তুদের সে ছ'খানা অধিকার কববার পর ললিতা একবার অজ্ঞার দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়ে নিয়ে

পরিষ্কার গলায় বলতে লাগল, আজ আপনাদের কাছে আমি এমন একজনকে পরিচিত করব, যাকে হয়ত আপনারা অনেকই চেনেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধারা একে চেনেন, আমি নিশ্চয়ই একথা তাঁরা স্বীকার করবেন, প্রতিভা আর পশ্চিমতা এর আসন বত উঠতে; কিন্তু জগতকে ইনি যে চোখে দেখেছেন তাতে আশ্চর্য-প্রতিভার আকাঙ্ক্ষা একে কোন দিনই প্রবল করতে পারেনি, তাই সাধারণের কাছ থেকে ইনি আছো অজ্ঞাত রয়ে গ্যাছেন। যাকে নিয়ে এতক্ষণ বক্তৃতা চলছিল, হঠাৎ সে গীড়ির উঠে বসে, মাগ করবেন, নিছক কৌতূহল মেটাবার জন্তে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে কারো মুখ থেকে আমি নিজের আশ্চর্য-প্রশংসা শুনতে চাই না। তবে দেরিতে আসার জন্তে যে রস থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি, তাইই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি আপনাদের সামনে ব্যক্তিগত পড়ব। সভাপতির অহমতির অপেক্ষা না রেখে পকেট থেকে এক টুকরো গরখণ্ড হার করে সে স্থল করল :

I know, I see the sun.
Like silvery honey-combe it sprinkles
honey on my way,
And the golden eve like some sacred
dietary
Blows from her conch
A pearl bright call of the future.
I dream, my long expected hour has
come and tremble
Like a blue sweet flame in my dream.
I see,
Upon the golden ground of eternity
A temple all made of the bubbles
of the stars.
The door wide open, and upon its
diamond turret

A green pigeon of tranquility, sitting
all alone Like
Watcher.

I hear its musical voice says, stop
your mourning
O pilgrim
You have left the earth
Now keep the promise.

আমুটির শেষ হল, কিন্তু তার স্বংকার যেন তখনও ময়ূষ্ম জনতার কানে বেজে চলেছিল—upon the golden ground of eternity A temple all made of the bubbles of the stars,—কিন্তু সেই শ্রিত্ব দ্বারা আবহিতভাবে কে যেন মুহুর্তে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তা উঠল, যে শ্রেণীর গীতি কবিতা আছো পর্যন্ত এক জায়গা নাহলেই মনে আনিবের কাজ করে চলেছে, কবিতাকে আমি কবিতা বলব না, বস্তুতে sorcerer incantation যার magical energy একদিন সন নাহলেই মুক্ত করেছিল ক্রসংস্কারের অন্ধকারে ভরি নিয়ে গেলে।—হ্যাঁ, আছো যারা এই শ্রেণীর কবিতার মাধ্যমে মাতালের মত ঢলে পড়ে, যত আনন্দে আবেলি তাবোলা যা' শুনী বলে যায়, যদি ভাষায় সেই সব রসাত্ম্যটির দল হ'ল সব বর্ষ অর্ধেকো কাছ দিয়ে, মনের মনে সেই আদিত্য গুণ্ডা ভাষাশেষকে আছো বশেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাও যাবে।—

নির্দোষ শিশুর আঙুল চোখের মতন যারা এক অতুল রোক্তক আনন্দের মধ্যে আছো পর্যন্ত নিম্নে জড়িয়ে রেখেছে, আজ জোর করেই বলবো তাদের যে আদিত্য অরণ্যেই ফিরে যাওয়া উচিত যেখানে তাঁর ওখা পুষ্পতের দল তাদের মনোভা যেখানে animal তাদের একমাত্র জীবন দর্শন। তারপর কি ভবে বলতে লাগল তবে আজ যদি কারো প্রশংসা উদ্ভূত ছিল আমার এই গীতি কবিতা পড়বার? বলবো, ওটা আমারি একটা স্ব-বর্ণিত incantation মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল।

কারো মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিনা, কোন্সাম অহমান আমার সভা। তাই এই গীতি কবিতাকে অস্বীকার করার মত আমি পূর্ণ এবং পরবর্তী কালের সমস্ত গীতি কাব্যরস কলানিদের এই জাতীয় কবিতা অগ্রগাঢ়ভাবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এই কবিতাকে আজ এই খানেই মুক্তি দিলাম। কবিতার সংগে সংগে হাতের সেই পরখণ্ডকে সে এক গজীর অংকায় সংগে দল থাকিয়ে পায়ের কাছে নিক্ষেপ করল।

ললিতা অরাক হয়েছিল ওর কাণ্ড দেখে, স্বপ্নেও সে কোনদিন হারিনি মেজধা তার কবিতা লেখে। কিন্তু প্রবলে মনে হচ্ছিল এত ভালো যে কবিতা লেখে সে জন্ম Romantic তাই মনে মনে সে বিরক্তই হয়েছিল, কিন্তু lyricism এর শ্রদ্ধা করে এখন সে তার কবিতাকে দলা থাকিয়ে পায়ের কাছে ফেলে দিলে, তখন কে যেন তার হৃৎ থেকে একখানা দমনশীল পাখর আনিবের দিল। সমস্ত মৃত্যুর একটা শূন্য তার এমন হঠাৎ দৃষ্ট ভগ্নিত হয়ে উঠে সে বললে, এর বক্তব্যকে আমি শ্রদ্ধার সাথেই সমর্থন করছি। তবে শুধু Romanticismই নয়, যারো একশ্রেণীর কাব্য আছে যার ওপর আজ সভাই কিছু না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হল যারো একটা ব্যক্তিগত wish fulfilment এর একটা কি—যার মারকুতে আমরা দেখতে পাই emotion এর সংগে বিকৃত কামের বিশ্রাম জনিত এক অতুল ভবি, যাতে না আছে স্পষ্ট কোনো অর্থ না আছে ধৃগিগত বা দৃষ্টান্ত কোনো Harmony, সনিকিছু বিশিষ্ট সে যে কি বস্তু হয়ে ওঠে কোনো বিতর্ক Psychiatricist যৌহ হয় তা বলতে পারেন। কিন্তু বস্তুতে পারি ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনের উৎপীড়নের ফলে কবির স্মৃতিহীন ও অর্থহীন কাম জীবনের যা শোচনীয় পরিণতি তারই প্রতিফলন বহে এমন আঙ্গণের দিনে অত্যাধিকার সত্যগুলি। সাধারণভাবে সেগুলিকে আজ Surrealism, mysticism, cubism, impressionism & symbolism বলে পরিচয় করানো হচ্ছে, কিন্তু কিসের symbol ওগুলি? যারই হোক; আশা করি ভবিষ্যতের কোনো মনস্তাত্ত্বিক তার রহস্ত উন্মোচন করবেন।

কথা শেষ হবার সংগে সংগে চারিদিকটা একবার তাকিয়ে নিয়ে শংকরের হাতে সে একটা মুহূর্ত টান দিয়ে তারপর কারো প্রতিবাদের পূর্ববর্তী তারা—বিদ্যাপতিতে সেই বিশিষ্ট কৃষ্ণ ও কৌতুকাবিত দর্শকদের পেছনে ছেলে সভা থেকে অদৃষ্ট হয়ে যায়।

বাড়ী ঘিরে এসে ললিতা জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটিকে চিনলাম না? প্রশ্ন হল, কার কথা বলছিল, হুজুরতার? বললো নাটো জ্ঞানতামা না এইমাত্র জ্ঞানলাম, কিন্তু ওর সংগে তোমার আলাপ হল কি করে? উত্তর হল, 'কেন ওকে ছুই চিনিম নাকি? ললিতা বললো না, কিন্তু কোথায় দেখে থাকবো বলে মনে হচ্ছে। জবাব হল, সে-আর আশ্চর্য্য কি, ওর আর কবির বাদশা নস্কিনী নয়, যে দেখতে পাননি। হ্যাঁ ওকে দেখেছি বলেই ত জিজ্ঞাসা করছি ওর সংগে তোমার আলাপ হল কি করে? সংক্ষেপে জবাব হল ওর ভায়ের মারকুতে। ললিতার কৌতূহল অবশেষেই বেড়ে চলেছিল, তাই বলে, একমুহূর্ত, তোমাকে বেশ উঁচু নজরেই ও দেখে। উত্তর হল কারো নজরটা আমার হাতের নয়, আমারে বশি ওর ভাল লেগে থাকে তবে কতি কি? ওরকম রূপসীর নজরে বসতে বড় একটা কারো বারতে জোটে না। হঠাৎ এক অতুল খের ললিতা বলে উঠল, বস্তুতঃ। অলসেই একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে বলে উঠল, অর্থ্যং? ললিতা এবার তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, অর্থ্যং an awful tragedy of a genius. প্রশ্ন হল, ঠিক বুঝলুম না? পূর্বস্বরেই ললিতা বলে, বোঝাবুঝিটা নির্ভর করছে ব্যক্তির সভা স্মীকারোক্তিতে, হঠাৎ খুব জোরে হেসে ওঠে, শংকর বলে, নৈর্বাচিক উত্তরে abstraction এর তেজাল চিরদিনই অবলোযোগ্য, স্পষ্ট উত্তর চাই? বলি বলি করেও যে কথাটা ললিতা বলতে পারছিলেন, হঠাৎ সেই কথাই ওর মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে গেল, ভূমি প্রাণে পড়ে? সহজ ভাবেই উত্তর হল সেটা এমন কি খারাপ কাজ? এমন কি খারাপ কাজ! আশ্চর্য্য হয়ে ললিতা ওর মুখের দিকে তাকাল, ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না একথা কোনো দিন সে ওর মুখ থেকে শুনতে পাবে, ললিতার মনে হল, এতদিন যে লোকটিকে সে জীবনের একমাত্র

আদর্শ বলে মনে করেছেন—আজ তার একটি কথা যেন সেই আদর্শের বিশালতম রূপ, এক মহতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে গেল। এই মহতে যেন ঐ ভণ্ড প্রভাবের মূখের দিকে তাকাতে তার সমস্ত মুখ ঘুয়ায় সংকুচিত হয়ে উঠছে। তাকি বহুকাল চুপ করে থাকতে দেখে শংকর বলে উঠল, ভয়ংকর রাগে তুই ফুলে উঠছিল না রে? তারপর অন্তদিকে মুখ ফিরিয়ে ললিতার উল্লেখই যেন বলে চলল, নারীহরণের এই বানোই তফাৎ, “The masculine method of thought is said to be massive and deliberate, the feminine method quick to perceive, but nimble to act. The latter method is apt to fall into error, but is agile in retrieving an error.” ভেবেছিলুম, তোর complex টিক সাধারণ মেয়ের মত নয়, কিন্তু দেখলুম তা’ হতে পারে না, নারী নারীই, ঘুমা ঈর্ষা লোভলুতাকে তারা কোনো দিনই সাংঘাতিক মনের চাপে দাবিয়ে রাখতে পারে না, ঐচ্ছিক অবস্থায় একদিন তা হুটে বেসেদেই, নিম্নে এতদিন তোকে শিকা দিয়েছি তুই যা’ চিরদিনই তাই তোকে থাকতে হবে, আমার মাথা কি তোকে মুক্তি দিই; যে গুণগুলো তাদের বেহ-মনের চিরদিনের সম্পদ, তোকে কি একদিন বলালো যায়। এর জন্তে বহু দিনের সাধনা দরকার, হয়ত’ অসংখ্য সামাজিক বিপদাঘের মধ্যে দিয়ে সে যুগ একদিন দেখা দেবে, যেদিন অন্ধ সংস্কার থেকে তোরা মুক্তি পাবি, সহজ ভাবে জীবনকে দেখতে শিখবি; কিন্তু আজ না। আজ শুধু মাছদের ভবিষ্যৎ জীবনের খেজকেই তৈরী করবে, যার ওপর ‘হয়ত’ একদিন মাছদের হুতন ফলসকে ফলতে দেখবে। প্রত্যেকটি কথা যেন এতক্ষণ ছুঁড়ির ফলার মত ললিতার বুকে এসে বিঁধছিল, কিসের যেন একটা অসঙ্গ বেন্দনকে জোর করে সে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল, যার ফলে তার মনে হ’ল, সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে।

কিন্তু ললিতা ঠিক সে জাতের মেয়ে ছিল না, যারা

সামাজ্য আঘাতে একেবারে মাটিতে মিশে যেতে চায়। তর্কের কারখানায় যুক্তির আগুন তাকে যে শিখা দিয়েছে, তাতে সাধারণ চিন্তাবৃত্তিগুলো কোনো দিনই তাকে সাধারণের সমকক্ষিতে টেনে আনেনি। তাই মা যখন অকারণে অভিমান করেছেন, তখন সহজ হয়ে ও বলেছে, philistine sentimentalism, বন্ধুদের মধ্যে যখন উজ্জ্বলের বন্ধা ডেকেছে মুখের ওপরেই ও তনিয়েছে, obsessional, সংসারের ক্রটি-কুটিরিয়ে বাপ যখন জীঘ রেগে চাঁৎকার করে উঠেছেন, অশু-শব্দে ও বলতে ছাড়েনি, neurotic। তবু আমের আশাতকৈ যেন কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিল না, প্রথমে ওর মনে হয়েছিল, কে যেন একখানা ময়ম সাঁড়ালী দিয়ে তার ছলপিঙটাকে জোর করে চেপে ধরেছে। মনকে ও কিছুতেই বোকাতে পারছিল না, এ আশাতকৈ যে অগ্রাহ্য করে হেসে উড়িয়ে দেয়। তার মনে হ’ল, চোখের তারা হুটে যেন কিসের প্রচণ্ড চাপে টেন উঠ করছে, মনে হয় কিসের একটা ঝড় যেতে যে বস্তার মত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। গি না কিছুতেই তা হতে পারে না। কপালের সূত্র মাংস পেশীকে প্রাণপণে সংকুচিত করে ও মাথাটা বুকে ঠিক দিগিয়ে নিয়ে এল।

প্রায় তিন চার মিনিট কাটবার পর হঠাৎ বাধিনীর মত মাথা উঁচু করে বসে, তুমি যিথোখী ভণ্ড, প্রভাবার। এতকাল ধরে আমার শুধু যিথোখী শিখিয়েছ, কিন্তু জিগেয়াস করি, যে মাছের কানি নিচেরে কথার ও কাছে এসে নয়, কী সাহসে সে অপরোক্ষ শিকা দিতে আসে। জীবনের যা সত্য, যাকে অস্বীকার করার অধিকার কারো নেই, সেই প্রেম, ভালবাসা, সমাজ, সহায়ত্বত্বকে, কত যাকে কী করে সে অপরোক্ষ বুদ্ধিতে এসেছে ওগুলো কিছু নয়, ধার্মাধারী; মন করে না একজন অতি সাধারণ নারীর চোখে একটা ফুলে আদর্শের ছবি তুলে ধরে তার সমস্ত জীবনকে এক করে নষ্ট করে দিতে? যাকে লক্ষ্য করে এক

বিষয়ে বাপ বর্ণন হচ্ছিল, সে তখন— (কম্প)

শয্যা-প্রহরিনী

—স্বপ্নীরেজা-সাহায্য

কর্ণধীবনের প্রথম প্রফেশনাল কন্। শহরের বাইরে রেল স্ট্যাডিয়ামে প্রাণী বোস, ফিরছিলেন কলকাতার গার্গেল এক্সপ্রেস-এর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ‘কুউপ’-এতে যুগে যুগায় সাইজের এক কেবিন টাক যাকে সতরাচার মধ্যমে বলে হুটখুটে; একটি হোল্ডস-অল ও একটি ইকোয়ের টিকিট কেন্দ্র।

মুছের বাজারে, নানা অনিশ্চয়তার মধ্যেও, ভাগ্যক্রমে একটি বার্ষ সে বিজ্ঞাপন করতে পেরেছিল। আর গাড়ী হাড়ার নুগে, তার চেয়েও বড় আরাম সে পেলে, মনে দেখলো সে কামরার ভাগীদার আর কেউ নেই।

বিজ্ঞানটি বেশ নিপুন করে বিড়িয়ে, পরনের হুট খেছে, রাত-কাপড়া চড়িয়ে, বার্ষের পানের সাইড-লাইট টিপে দিয়ে, প্রাণী তার কর্ণধার দেহকে শয্যার উপর ছড়িয়ে দিলে।

ততক্ষণে না জানি কোন একটা ঠেঁসে এসে গাড়ী-বানি ধেমে গেছে। বানিক পরেই প্রাণী শুন্ততে পেল হারের হাতল নাজার খুটখুট শব্দ। কমাগত-খুট খুট ঠুট-শব্দ বেড়েই চললো।

বিস্তৃত মুখে, ভেতরের বোটটি আলুপা কোরে, রজাটি খুলে ধরতেই, প্রাণী দেখতে পেল—সুওভার-বোটে সর্দার চাকা একটি মেয়ে (তরুণী বলাই ঠিক) যার তার পেছনে কুলীর মাথার বিজ্ঞান ও টাক, হাতে বোলানো এক টিফিন কেরিয়ার।

দরজা ছাড়ুন কথা করে; আমাকে ভেতরে যেতে দি। একখানা মা মেয়ে-গাড়ী, তাও স্নায়ালো-গীতান ছেলে-বুড়ো ও মেয়েতে ঠাশ। ঢোকবার উপায় পড়ি নেই।—মেয়েটির গলার ধরে কুঠাভজিত গারততার আভাষ।

: কিন্তু এটা যে coupe—আর আমি মাত্র একলা গুফ। প্রাণী কোন গতিক জানালো।

: হোক coupe; আর মোটে সময় নেই। আমাকে যে প্রকারে হোক যেতেই হবে এ গাড়ীতে কলকাতায়। আপনি পথ ছাড়ুন!

পথ ছাড়তে বিলম্ব হোল না। কিন্তু তার চেয়েও কম সময়ে মেয়েটিকে দেখা গেল একধারে তার লগেজ-গুলি সরিয়ে রেখে, প্রাণীর রাগ ঢাকা বিজ্ঞানার এক কোণে বসে, হাঁপাতে শুরু করেছে।

গাড়িতে ঠাড়িয়ে তখনকার অবস্থাটি বোঝবার চেষ্টা করছিল প্রাণী। কোন ঠাঁকে সে বলে ফেললে:

: আপনি তা হ’লে না হয়...

বাধ্য দিয়ে মেয়েটি জানালো

: আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। আমি বানিক পরেই আপনার বার্ষ-এ আমার বিজ্ঞানটি বিড়িয়ে উঠে পড়ছি।

: কিন্তু এ ভাবে সারারাত একজন অপরিচিতের সংগে যাওয়া...আপনার বয়স কম; গায়েও যথেষ্ট গহনা রয়েছে...

মেয়েটি পরম সজ্জিতের মত জবাব দিলে। সে জবাবের স্বর যেমন স্পষ্ট, তেমনি সোজা।

: আপনি যে একজন ভদ্রলোক, তা চেহারাতেই বুঝতে পারছি। আর তা ছাড়া যদি প্রয়োজন হয়, জানাবেন, I can well take care of myself.

বলে কী মেয়েটি! তবু যেন মনে হয়, তার সজ্জিত আত্মপ্রকাশের মাঝে কিছুমাত্র দৃষ্ট প্রকাশের চেষ্টা নেই। কিন্তু বিবিত প্রাণী, দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগেই দেখতে

জবাব দেয় স্বর্ণ : বাজীতে বৃষ্টি মার আপনি একমাত্র
আছরে থাকা ?

: থাকা নয় ; হাবুল। কিন্তু আপনি কী কোরে
জানিলেন ?

: জানেন না, মেয়েরা হাত গুণতে পারে যে। আজ্ঞা
আর কেউ নেই বাজীতে ? এই যেমন আদর করে

ভাকবার মত ছোট্ট একটি 'কেউ' ?

: এভাবে আলোর মত উজ্জ্বলিত হাসিতে বৃকের
মুখ চকিতে উজ্জল হয়ে ওঠে। সে জবাব দেয় সপ্রতিভ

ভাবেই :

: 'ঐ 'একটি কেউ' ছাড়া আরো আছেন অনেকে।
বড়দি, ছোট বোন ও আমার দল। আজ্ঞা আপনার ?

: একদম ভিন্ন ভক্তি। একুল-ওকুলে একমাত্র আমি
আর আমার বৃকের মেয়েরা।

: আপনি বৃকি মেয়েদের পড়ান।

: হ্যাঁ, একটা মেয়ে-স্বপ্নে মাঠারী করি। কিন্তু
মাইনে মা পাই, তা থেকে কামেলা পোয়াতে হয় বন্ধী।

: এমন বুঝছেন 'ত' আমি কাজে কমে ফেরার্যাদ হলো
আট-সেটের দর্শনাধারী মন্দিরাধী নই !

: কিন্তু এত কম বয়সে ?

: আমার বসন্ত তোলা ? চোখে-মুখে ক্রুটিন কোপ
হুটিয়ে, তখনই হেসে জবাব দেয় স্বর্ণ : কেন, আমার

বয়সটা কম হোল কী কোরে শুনি ? শ্যামনের
জাহ্নমারীতে আমি একদে পড়ব।

: ও : তবে লাভার থেকে অনেক ছোট। আমার
বয়স ছাশিলি। লাভার বয়সে পূর্ণ হয়েচে।

: আজ্ঞা, আমি যদি এখানেই, এই ধারটুকু বেঁধে
একটুখানি ঘুমিয়ে নিই, আপনি জেগেই থাকবেন ত ?

: তা থাকব।

: আর মালগুলোর উপর একটু নজর রাখবেন ত ?
নিউ হেসে জবাব দেয় স্বর্ণ : তাও রাখব। আর

প্রদীপ নিজেই করে দেয় তার পাদপূরণ : আর
জমিন, তারা হয় ঘোড়া, নয় গাধা। ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে
দিখি ঘুমোয়।

: স্বর্ণের রাগ বানানি ধানিকটা অংশ মনের খোয়া
গানের উপর টেনে নিয়ে চোখ বোঁজেন প্রদীপ। সে
অনেকটা ছোর কোরে, জেব বজায় রাখতেই। পা ছেঁ
আড় ভাবে ভেঙে কোরে সিটের পিঠের দিকে যথাসা
ঠেলে রাখে। তন্নতর এই সংঘর্ষটুকু আর আঁখি
বলে মনে হয় না। কৃষ্ণি দেয় স্বর্ণকে নানা ভাষা
সে দুষ্ট।

: খোলা আঁখি ছুটো বন্ধ কোরে তখন প্রদীপ ঘেঁ
আর এক রাজ্য। যে দুষ্ট ভেসে ওঠে তার চোখে
তার সবটুকুই যেন কোন অজানা আলোর বন্ধকারী
উজ্জল। আর তার মাঝে আরো উজ্জল হয়ে ওঠে
ছুটো ভ্রমর-কালো চোখ। যে চোখের দৃষ্টিতে কে
মায়ার তর্পণ। কোন বিজ্ঞপ, কোন শব্দের চিহ্ন ম
নেই। তার ভাষায় ধরা পড়ে না কোন অয়েম
কৌতুক ; কোন জিজ্ঞাসা। সে দৃষ্টি যেন বলতে চায়
তোমায় আমি জয় করেছি, আমার দিয়েছি—তুমি আমায়
ভুমি আমার। তোমায় আমি অস্ত্র দিয়েছি, মা
দিয়েছি, লজ্জা তোমার জয় কোরেছি—তুমি আমায়
ভুমি আমার !

: তার পর, ধীরে ধীরে, ঐ রহস্তভরা চোখদৃষ্টিকে ঘি
ভেসে ওঠে তার মনের পটে—নিটোল একখানি নাই
মুখ। স্বপ্ন প্রসাদনের স্বাভাবিক লাভবো অনাড়ম্বর
জী। অভিশপ্ত বস্তুর আলগলহীন বৈরাগ্য ছা
লাভ্যাকে স্নান করে নি ; বরং দিয়েছে তাতে আর
নিটোল, আরো জমাট, অস্বস্তি বধু মধ্যায়
যৌবনের আটটি সম্পদ।

: গভীর স্থিরতার মাঝে নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে যে
কখন, কে জানে।

: তরুণের তন্মাত্রা স্বপ্ন, কত রূপে, কত রসে, ক
ছবি একে যায় তার মনে। আর সেই ঘুমন্ত দৃষ্টি
দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রহরের পর প্রহর পোনে হয়
এই অচেনা, অজানার মাঝে হঠাৎ যেন ধরা পড়ে

হির-চেনা। একবারে এগিয়ে পড়া হাত দুটির উপর
বৃষ্টি ধীরে ধীরে সজলেন বাব, তার একটু হাত।
মুখোটা মরম আঁখিগুলি দিয়ে বৃষ্টিয়ে যায় তার জী
পূর্ণ। এ যেন ছরপ পিপাসার বারির মতই স্নানিক ও
উভোগ্য। সে উভোগ্যে জালা বাড়ি, তবু পিপাসা
মেটে না। এই 'ত' পুরুষের যুগ। তবু কঠিন নয় ;
নির্মল নয় ; আশ্রিতবর্তার সঠিকই অর্থ সম্মে, বিদে,
হুতায় ও স্বতাবলক শিষ্টায়, যে কোন নারীর নিষ্ঠা
দানের কাম্য। 'কত সহজে এরা বিশ্বাস করে : নির্ভর
যে নারীর উপর, ধরা দেয় বিনা বিধা ও বাধায় ;
স্বত্বভিত্তে পাওয়া কবিকের আশ্রয়ে। ছেড়ে দেয় এদের
নিজের স্বত্বাকে।

: স্বর্ণ দেখে ওর উড়ে প্রহর, লুপ্ত, মালতী চুলগুলি
এসে থক করে আলো। প্রহর, লুপ্ত, মালতী একবারে
কাঠের আদে-পাশে। কত স্বপ্ন ও কৌকড়া কাল
বালচুলগুলি ওর। যেন 'শিচরিত' মাতিলি হয়ে তার
হাতখানি এগিয়ে যায় সেদিকে। অবাধ্য কেশগুলি
নিঃস্বপ্নে খোলালে বেলা করে তার আঁখিগুলি হঠাৎ
হাতে। কিন্তু সে পথের শেষ পরিণাম-কী, আজ্ঞে
বুঝলো হয় বৃকের ঘোরে প্রদীপের হাত ছুটো কিসের

স্বপ্নানে এগিয়ে আসে কপালের দিকে। সে হাত ছুটোর
মাঝে আঁখিতে—পথে তার নিজের হাতখানি।
প্রতিবোধের মিলি নেই সে হাতের। পুরুষের কর-
কবলিত স্বপ্নের একখানি জীক হাত—এসে পড়ে প্রদীপের
বৃকের উপর। খসে যায় তার গতি।

: ধীরে ধীরে তখন যায় বৃকের স্পন্দন ! অবশ্য বয়োভা
চুড়িগুলোর বেন আঁধ হারা। নেই—নিষ্ঠার অপরোক্ষ
ব্যুষ্টিয়ে যায় তার শা-রি-গা-না। ইং-ইং ; ইং-ইং ;
ইং-ইং !

: আঁখি-খোলা আঁখিতে তখনও অস্ত্রার জড়িম। সে স্বপ্ন
ভরা চোখের গামনে চমকে দেখে প্রদীপ—তার রাতের
প্রদীপ—তখনও জেগে আছে তার শয্যা আগুনে—
চোখে সেই মায়ার কাঙ্কল। দৃষ্টিতে সেই হৃদীর আশ্র-
প্রত্যয়। আর তার নরম, নিটোল শীতল হাতখানি,
কী যেন গোপন গুলকে, তার ছিট কঠিন করপেশিত
বৃকের আশ্রয়ে, তেমনি গভীর নির্ভরতায় বন্ধী হয়ে
থাকে। তাকে মুক্তি দেবার পথ আছে খোলা ছন্দরই
হাতে। কিন্তু সে পথের শেষ পরিণাম-কী, আজ্ঞে
বুঝলো হয় বৃকের ঘোরে প্রদীপের হাত ছুটো কিসের

— তাই, ১৩৫০ সন ১৩৫০ সন ১৩৫০ সন —

পঞ্চিক

তত্ত্বাবধী

পঞ্চিক, যদি এলেই আমার মার, তোমায় আমার আশ্রিনাতে,
শোনো ও তোমার গান আমার এই জন্মে আলাপ নিশিগরিতে,
ছিন্নবিধার তারে। ভোয়ের হওয়ায় যুগের তুলে দুলব ছন্দে ॥
জানি তোমার নেইকো সময়, জানি তুমি পঞ্চিক, তুমি চাওনি কর্তৃকারি,
বিনে হয় এই শুধু ভয়, বিনে হয় এই শুধু ভয়,
বিভার হয়ে চলে তুমি দূর অজানার পাশে।
সংক্রান্ত স্বপ্নের প্রদীপ আমার মারের কোন, অদেখার পুক ভেসে যায়,
চাঁপার স্বপ্ন, চাঁপের আলো ছড়িয়ে যাবে বনে।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :—ইষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট বিল্ডিংস

বোম্বে

স্থাপিত :—১৯১৩

চলতি বীমা ২ কোটি টাকার উপর

মোট সম্পত্তি ৪৩ লক্ষ টাকার উপর

চীফ এজেন্টস্—

মোষ এণ্ড চৌধুরী

১০ নং ক্লাইভ রো

কলিকাতা

ফোন :—

ক্যালকাটা—২০৫৪

— জাতীয় কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত —

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বুকের ব্যাক লিমিটেড

হেড অফিস :

৩ ও ৪, হেমার স্ট্রিট,

কলিকাতা

— শাখাসমূহ —

ঢাকা, কালিঙ্গা,
শিলিগুড়ি, শান্তিপুর, বালি, রাজগাহী,
বগুড়া, কুমিল্লা, ভারতেশ্বর,

রাণাখাট ও
বড়বাজার

ফোন :

ক্যালকাটা—৬১১

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :

মিঃ এস; কে; চক্রবর্তী

শ্রামবাজার শাখা

খোলা হইয়াছে।

“যুদ্ধের দক্ষণ কোন কোন মালের
ঘাটতি পড়ায় এবং রেল কর্মচারীদের
উপর অত্যধিক কাজের চাপ পড়ায়
রেলওয়ে সমূহকে অত্যন্ত অসুবিধার
মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইতেছে।”

ভারতবর্ষের রেলওয়ে কর্মচারীদের

প্রতি বড়লাটের উক্তি—১৯৪৩

রেলের ভ্রমণ করিবার সময় যদি আপনার অভিযোগের কোন কারণ ঘটে
তখনই মনে করিবেন যে, রেলওয়ে সমূহকে বিধম অসুবিধার মধ্যে কাজ
করিয়া যুদ্ধ জয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। কাজেই
বর্তমানে আরামের অভাব ও অসুবিধা ইত্যাদিকে একটু সহ্য করিয়াই
চলিতে হইবে।

ই, আই, এবং বি, এণ্ড, এ, রেলওয়েস্

.....আমাদের এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করার জন্য
গ্যারান্টি সার্ভিস সার্টিফিকেট ক্রয় করুন।

অবচেতন মনের যৌন তাগিদে আজকের মানুষ কেন মানুষের ভগ্নাংশমাত্র—

স্বয়ং-প্রমুখের পুথিতে আমরা পড়েছি, মানিকবাবুর উপন্যাসে যেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই বলে মনোবিকলনের মতবাদ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটে মানিকবাবু বাজারে ছাড়েন না। কারণ পুথিগত বিচারে পক্ষপাতী তিনি সত্যি নন, তা ছাড়া প্রধানতই তিনি পাকা ঔপন্যাসিক। তাঁর লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য, মনস্তত্ত্বের তথ্যমাত্র নয়।

সবচেয়ে অবাক লাগে কত ব্যাপক ক্ষেত্রে কি অনারাসে তাঁর আনাগোনা! প্রদ্বানলীর মাঝি বা “পুতুলনাচের ইতিকথা” আর “চতুষ্কোণ” বা “অমৃতন্ত পুত্রাঃ”, “সহরতলি” আর “দিবরাত্রির কাব্য”, “প্রাগৈতিহাসিক” আর “অতসীমামী”—এ সমস্ত বই-এর লেখক একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলেদের জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন ফুরফুরে মেয়ে, মল্লুরদের নোরা বস্ত্র আর কোমল শূরের মধ্যবিত্ত রোমাঞ্চিক আবহাওয়া—সর্বত্রই তিনি সমান সহজ আর সমান নিখুঁত। আর সর্বত্র চেয়ে দেখছেন সামাজিক মেকি চমকটা খুলে—মানুষগুলো এলোমেলো, খাপছাড়া আর ভাঙাচোরা।



লিখবার জন্ত কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন—এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। মানিকবাবু ব্যবহার করেন—পার্ক ইনক্। বলেন—“পার্ক ইনকে লিখে দেখছি কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই কালি ব্যবহার করতে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করছি না।”



রমেনকে দেখেই বাড়ীর সকলে কেমন অবশিষ্ট হয়ে ঈরতে লাগল।

অত্যন্ত সাদাগসিধে ছেলে। চেহারা সাধারণতঃ সৌন্দর্য দিয়েই সাধারণ। তবু সে যেন আর দশটি রূপের মত নয়। স্বকোমলের কথাই ধরো। এ কীর্তি থেকে পড়াশোনা করার জন্ত সেও কদিন ঘরে এসে পৌঁছেছে। দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয়ের মূল আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে বাড়ীতে এসেছে। এইভাবে লম্বা গ্রন্থ করতে কারো অসুবিধা হয়নি। ছেলেটা যে কীর্তি এসেছে বিশেষভাবে সেটা অমূল্য করতেই গিয়েছিল। প্রকাণ্ড হলদে রঙের ট্রাঙ্ক আর একটি বাক্স সতরঞ্চি নিয়ে রমেন এসে দাঁড়ানো নাজ মনের মনে হতে লাগল, এ যেমন তেমন ছেলে নয়, একে আদৃত করা সহজ হবে না।

তার চেহারা আর জামা কাপড়ে সে যে অনেক দূর থেকে আসছে তার প্রমাণের একান্ত অভাবটা সকলের চোখে অত্যন্ত খাপছাড়া ঠেকল। চশমি খন্টার বেশী রেসে লম্বা কাটিয়েছে অথচ জামাকাপড়টা তার পরিষ্কার, লম্বা খাঁচড়ানো, চোখে মুখে তার এতটুকু শাস্তির চিহ্ন নেই। সারারাত সে যেন বাড়ীতেই আরাম করে কামছে, ঘুম থেকে উঠে মুখোস্ত হয়ে চা জলখাবার হয়ে পানভাড়া সাই আর বৃত্তি পুরে এখন যাচ্ছে বাইরে। রমেনের কথাটা সকলের মনে পড়ে যায়। তার দি বোটে দশ ঘণ্টা জার্মি। কি মুক্তি নিয়েই সে এসে গিয়েছিল। ঐজ্ঞানের কড়া রোদে যেন খন্টা দেশকল রায় মূলোতে খেলাগুলো ছুটোছুটি করে এসেছে।

প্রথম এসে দাঁড়িয়ে লজ্জাসঙ্কোচে স্বকোমল কারো কি মুখ তুলে তাকাতে পারেনি, কথা বলেছিল শুধু প্রশ্ন হলে তার জবাব দিতে। এ ছেলেটার এতটুকু নিয়ন্ত্রণ তার নেই। এ বাড়ীতে এই যেন তার প্রথম পার্শ্ব নর, বাড়ীর মানুষগুলো অচেনা নয়, এ বাড়ীতেই রমেন বরাবর বাস করে আসছে।

বেউ মুখ খোলায় আগাগেই রমেন অমায়িকভাবে গলাকে জানিয়ে দিল, ‘গাড়ীটা আঠার মিনিট লেট হয়েছে।’

তোমরা সবাই ভালো

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠার মিনিট লেট। সারারাত উর্ধ্ববাসে ছুটে কলকাতা পৌঁছতে আঠার মিনিট লেট করে গাড়ীটা কি অমায়িকীয় অপরাধই তার কাছে করেছে!

দিবাকর বাবুর বোন সুবলা জিজ্ঞেস করল, ‘গাড়ীতে ভিড় ছিল না?’

‘জীশন জি’। কোনমতে একটু বসবার ব্যাগা পেরেছিলাম।’

সুবলা ভাবল, ছেলেটা কি মিথ্যাবাদী! সারারাত গাড়ীতে জেগে বসে এলে কারো এমন তাড়া চেহারা থাকতে পারে!

‘সারা রাত ঘুমোও নি?’

‘ঘুমিয়েছি। আমার এই ব্যাগে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বেড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি একবারে নৈশটি পৌঁছে গেছি।’

স্কুলের ফৌড়ায় কটকিত তার ট্রাঙ্কটির দিকে তাকিয়ে কেবল সুবলা নয় উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল। ট্রাঙ্কের গুপ্ত বিছানা পেতে নিয়েছিল নিশ্চয়? কিন্তু বিছানা কই রমেনের? সকে তো শুধু একটা সতরঞ্চি!

‘আমি তো তোষক বাগিনে শুই না। রমেন বলল, ‘চৌকীতে সতরঞ্চি বিছিয়ে চারপ পেতে নিই। শক্ত বিছানায় শোয়া খুব উপকারী পিসীমা।’

‘পিসীমা? কাকে সে পিসীমা বলছে?’

‘আমি তোমার পিসীমা নই।’ সুবলা প্রতিবাদ জানাল।

‘পিসীমাই হন আগসিন।’ রমেন মুহু মুহু হাসছে!

‘আমি তোমার এই পিসে মশায়ের বোন—ছোট বোন।’ সুবলা দিবাকর বাবুকে দেখিয়ে দিল।— ‘তোমার পিসীমা রামাশয়ের আছেন।’

মনে মনে হুবালা ভীষণ চটে গেল। কোথাকার হুম্যান ছেলে! দিবাকর বাবুর বয়স ষাট হতে চলল, রমেনের পিসীমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আর তাকে সে মনে করে বলল পিসীমা, বয়স তার এখনো সাতাশ হয়নি। চোখে না দেখে থাকলেও এটুকু তো তার জানা আছে যে তার পিসীমার বড় ছেলেরটার একটা মেয়ে হয়েছিল সস্ত্রী, তার পিসীমার এখন ঠাকুরমা পদবী!

রমেন বলল, এই পিসীমার সম্পর্কে আপনাকে পিসীমা বলিনি। নন্দ পিসে মশায়ের সম্পর্কে আপনি পিসীমা কেন!

শুনেন কেমন হুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই থ যেন গেল। সকলের মনে পড়ল, সত্য সত্যই রমেনের সঙ্গে হুবালায় ছ'দিক থেকে সম্পর্ক আছে, সে তার এক পিসেমশায়ের বোন এবং আরেক পিসেমশায়ের স্বীয় পক্ষের স্ত্রী। দিবাকর অনেক দূর সাপেক্ষের পিসেমশায়, কিন্তু প্রথমে রমেনের বাবার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলে হুবালায় স্বামী নন্দগোপাল তার বাঁটি মাসতুতো পিসেমশায়। ছেলেরটা তবে ভুল করেনি, হুবালাকে জন্মে কর্কশো চোখে না দেখে থাকলেও যে যে কে যেন মনে মনে আন্দাজ করে তার সঙ্গে ভবল সম্পর্কের মধ্যে কোনটা বেশী লাগসই তাও স্থির করে ফেলেছে। এতো যেমন ভেমন ছেলে নয়।

ইতিমধ্যে দিবাকর বাবুর স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। মাহুখী তিনি রোগা এবং লম্বা, মুখখানা বদমেজাজী। চশমা তার ভেতর দিয়ে রমেনকে নিরীক্ষণ করে তিনি খাবাবিহিত মেহাজ বিষয়ের উদ্ভতা করে বললেন, 'ওমা, তুমি চাকরদার ছেলে?'

রমেন বলল, 'বাবাকে আপনি দাদা বলেন পিসীমা? আমি শুনিলাম বাবা আপনার চেয়ে ছোট।'

পিসীমা চক্ করে একটা চৌক গিলে ফেললেন। নিরুপিত করে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলি।' তারপর প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'নাও, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

রমেনের প্রণাম গ্রহণের জন্ত শুক্লজনেরা প্রায় হয়ে একতল অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন প্রণাম করার কথাটা বুঝি তার মনে নেই। রমেন আর বোতাম খুলতে আরম্ভ করার হুবালা আর চুপচাপ থাকতে পারল না।

'পিসীমা পিসেমশাইকে প্রণাম কর রমেন।'
'আমি তো কাউকে প্রণাম করি না, হ্যাঁ পিসীমা?'

'প্রণাম কর না?'

'প্রণাম করা ছেড়ে দিয়েছি।'
এমন ভাবে রমেন কথাটা বলল, যেন একটা জব্দ অভ্যাস ছিল, খুব মনের কোর দেখিয়ে অজান্তে ত্যাগ করেছে। হুবালা আর পিসীমা বাক্যহার্য্য তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিসীমার সেগে যে রাগী খিয়াখিল করে হেসে উঠেই বিবর্ণ হয়ে চুপ হয়ে গেল। দিবাকরবাবু ঘরে আছেন ভুলে গিয়ে সে যে ফেলেছিল। বাড়ীতে, বিশেষ করে তার সামনে, ব্যস্ত শব্দ করে হাসাটা দিবাকরবাবু পছন্দ করেন না। জ সময় হযতো তিনি হাসি বন্ধ করা সত্বেও রাগী মনকে দিতেন, এমন নবাপাত ছেলেরটার চমকও পাকাবিত্তে শুদ্ধিত হয়ে যাওয়ার বেয়েকে শাসন করে বোধ হয় ভুলে গেলেন। যতদূর বয়সপ্রাপ্ত হোক বাড়ীতে যে পা দিয়েছে মোটে পাঁচ মিনিট তার ওপর গর্ক করে ওঠা উচিত নয় ভেবে আশ্বাসপ্রদেয় একি কষ্টের চেষ্টায় কাতর হয়েই লম্বনত: তিনি হঠাৎ ধপ ধপ চৌকীতে বসে পড়লেন। চৌকীটা কচমুচ শব্দ প্রত্ৰিভাদ জ্ঞানাল। দিবাকর বাবুর দেহাট প্রকাণ্ড, পাক মরলেও গায়ে তার এখনো অসম্ভব ঘোরে এই কদিন আগে তার বিরাট খাবার খাবড়া যে মেছলেছল হুসাহ ভিরিমি থেয়ে পড়ে গিয়েছিল। সকলের মুখের ভাব দেখে রমেন কি বুদ্ধলোকে জানে, কমা প্রার্থনার স্বরে ধীরে ধীরে বন্ধ লাগল, 'তাই ব'লে শুক্লজনের ভক্তি করি না ভাববেন না কিন্তু ছোট পিসীমা। মাহুখের পায়েক মূলোখাগি ময়লা লাগে, পায়ে হাত দেয়া উচিত নয় বা

প্রণাম করি না। বাবাও তাই বলেন। শুক্লজনকে ভক্তি করি, পায়ের ময়লাকে তো ভক্তি করি না। একজনের পা থেকে ময়লা নিয়ে নিজের কপালে লাগানোর কোন মানে হয়?'

দিবাকরবাবু আর শায়লাতে পারলেন না, সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, 'মানে বুঝেছি' তুমি একটা এক নবের ছাড়া ছেলে। যা, ওপরে যা।'

রমেন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, একপা দিবাকরবাবুর কাছে এগিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল 'রাগ করেছেন পিসেমশাই?'

দিবাকরবাবুও নির্ঝাঁক বিষয়ে একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চৌকী ছেড়ে উঠে গটাগট করে খর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন আপন মনে বলল, 'পিসেমশাই রাগ করেছেন।'

সে যেন বুজতে পারছে না কেন দিবাকরবাবু রাগ করলেন, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না দিবাকরবাবু সত্য সত্যই রাগ করেছেন।

লো ভদ্রন প্রায় এগারটা বাজে! রমেনকে নিয়ে বাবা থানানোর সময় কারও ছিল না। লোক তো বাড়ীতে কম নয়, নাওরা বাওরার হাসানও তাদের সহজ নয়। তাছাড়া আশ্রিত হিসাবে বাড়ীতে থাকবার জন্ত যে এসেছে তাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব ব্যস্ত হবার গরজই বা হবে কার।

রমেনের টাকটাক বৈঠকখানা থেকে ভেতরের একটা ঘরে নিতে সাহায্য করে সেই যে চাকরটা কোথায় গেল তার তার পাতা নেই। দরজার সামনে দিয়ে খাবার সময় হুবালা একবার রমেনকে চান করে নিতে বলে গেল, আর কেউ খবর নিতে এল না। ঘরটা বেশী বড় নয়, ছোট চৌকি একটা টেবিল আর ছ'খানা রঙ করা মোহার চোয়ার আছে। ছোট চৌকীতেই বিছানা শুটানো আছে, একটা হুকোবাল, অজট দিবাকরবাবুর ছোট ভাই হুসাহরবাবুর শালা রক্তিতের। টেবিলের একপাশে এই একসায়ে বই, বাকী অংশ জুড়ে স্থলের নীচ হালের ইংরাজী বাগা অঙ্কের মলাট হেঁড়া বই আর

বাটা ছড়ানো। দেয়ালে বসানো কাঠের তাক ছ'টিতে গুড়ি লাটাই, মার্বেল, রবারের বল, টিনের কোঁটা, কাগজের বাঁকে থেকে ব্লক করে পালিশ-চটা জুতো পর্যন্ত কি যে নেই বলা কঠিন। হুকোবাল আর রক্তিত এই ঘরে থাকে এবং বাড়ীর গত্তা দেড়েক ছেলে মেয়ে ছবেলা এই ঘরে বসে নকুল শাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করে।

হুকোবাল সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে ছ'চারটি কথা বলায় চেষ্টা করে রমেন সুখিা করতে পারল না। 'কাটা কাটা জবাব দিয়ে হুকোবাল কুটিল চোখে তাকে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল। রমেন যখন টাক খুলে তার বই আর কাপড় বার করছে, হঠাৎ সে টিবিযে টিবিযে মন্থনা করল, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় ওপরে ভাল খরে থাকতে দেবে।'

'ঘর খালি নেই নিশ্চয়।'

'নেই? দেখে এসো না আছে কিনা। দোতলায় আছে তিনতলায় আছে। সব বুঝমানার নিজের লোকের দৃষ্টি—এক একজনের এক একটা ঘর। খাটো না শুলে বড়মানার ছেলেমেয়ের ঘুম আসে না।'

'খাটে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো।'

হুকোবাল কৌশ করে উঠল, 'আমরা কেন নীচের স্যাতসেতে ঘরে গারাগাদি করে থাকব?'

'পিসেমশায়ের ভাইও তো নীচের তলায় থাকেন ভাই।'

'স্বাধে থাকেন? বাত নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলে। ছোট মামীরা ওপরে থাকেন।' রাগে অভিমান হুকোবালের মুখখানা ঝাঁক দেখায়, 'এইতো সবে এলে ছুঁনি থাকো, টের পাবে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে তাই যেন চের!'

রমেন একপাল হেসে বললে, 'খেন, তাই কখনো হয়? বাগার ব্যবহার যদি করবে' বাড়ীতে থাকতে দেবার দরকার! মনে কই দেবার জন্মে কেউ কাউকে ইচ্ছে করে বাড়ীতে রাখি না? হুকোবাল হতভয়ের মত বলল, 'রাগে না?'

গমনে বাগ, 'কেন রাখবে ?' একজনকে কষ্ট দিলে
নিষেধও কষ্ট যথ্য, সিদ্ধান্তিহি নিষেধ কষ্ট পাশে এমন
করে কেউ নয় তাই। আমরা জোর করে থাকতে
আমতায় তাঁহলেব বধ্য ছিল। তাতে আমরা
আসিনি। আমরা কথা রঁঠো। বাবা পিসেমশাইকে
সিখলেন আমি এখানে থাকতে পারব কি না,
পিসেমশাই জবাবে আমাকে পাঠিয়ে দিলে সিখলেন
সিখলেন, কোন অস্থিবে নেই। অন্যদর করবার
মন্তে আমাকে ডেকে আমার তাঁর কি দরকার
ছিল ? বাবাকে তাহলে গিয়ে সিখলেন অস্থিবে নেই না।

কথা বলতে বলতে রমেন টেবিলে ছড়ানো বই-গুলি গুছিয়ে ফেলেছে। বইখাতা সমস্ত টেবিল জুড়ে ছিল, এখন দেখা গেল টেবিলে অনেক জায়গা। তাকের জ্ঞানগুলি সরিয়ে, নামিয়ে, শাঙ্কিয়ে গুছিয়ে যায়গা খালি করতে করতে রমেন হঠাৎ বলল, 'তুমি ওপরের ঘরে থাকবে তাই? আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

রমেন ব্যবস্থা করে দেবে! সেই যেন বাড়ীর কষ্ট! স্বকোমল চটগিয়ে একটা ব্যালোক্সিকি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হল রমেন বাহাদুরী করে নি, ওপরে তার থাকবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতার নিজের বিখ্যাসটা শুধু প্রকাশ করেছে। 'আমার দরকার নেই।'—স্বকোমল বলল।

এগারটা পর্য্যন্ত নীচের তলায় কোনরকম গোলমাল ছিল না তারপর এমন হৈ চৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল যেন হাট বগেছে।

সুকোমল বলল, 'বড় মামা ওপরে গেলেন।'

এ বাজীতে বিবাকের বাবুর প্রচণ্ড শাসন কেবল তার নিজস্ব সুখবিধি। আর জালাতন হওয়া না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চোখ আর কানের আড়ালে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে তার কিছুকাজ মাথা ব্যাথা নেই, তার সামনে সশাি ভয়ে ভয়ে সশূর্ণণে ঢালোফেরা করবে, জোেবে কবা বলবে না, হাসবে না, ছেলে মেয়েরা পর্যাণ্ট চোঁচা দেখে হুহুগুগু বন্ধ রাখেবে—নাইলে হঠাৎই তিনি সজ্ঞে ভাবি তিন একজনে আমলে পোলাগা হানি পেয়ে

শক্তি হয়ে ওঠে, দোতলার উঠে গেলে একতলার ফু
হয় চৌকোমেচি ঝগড়া বাঁটি, মারামারি। বড়রা অথ
মারামারিটা করে না, সেটা ছেলেনমেয়েদের একচেঁটা
হয়েই থাকে, বড়রা শুধু তাদের মারে। যখন তখন যা
যাকে খুশী হরদম মারে। বনের মধ্যে সকলে বেনি
জাল পুনেয়েথেকে, ছোটদের গুপার কারণে অকার্য
জাল না কেড়ে থাকতে পারে না।

নিষেধই ব্যাখ্যা গুঁড়িয়ে রমেন একা খবর বর
আছে। স্বকোপাল বলেছিল, সারাদিন মা খেয়ে মা
বসে থাকলেও কেউ আর তাকে ভাকতে আসবে না।
রমেন তা স্বীকার করেনি এবং তার ভুল ধারণা ভেদে
দেবার জ্ঞান তাকে নাইতে পাঠিয়ে নিজে প্রতীক
করছে। তখন মেখে গামছা হাতে সে একেবারে ঠেঁই
হয়ে আছে, ছ' চার মিনিটেই মাঝেই সে আদর আসবে
আসবে তাতে যেন তার কিছু দ্বন্দ্ব সন্দেহ নেই।

স্বাকর বাবুর স্ত্রী মনোরা মাভাগতাই প্রবন্ধে বিনি
টের মধ্যে ঘরে এলেন। ঠিক নাইতে বাওয়ার আশায়
নিয়ে নয়, পরিত্যক্ত করতে। রমেনের বোদাবির গর্হই ব্রী
মোহেই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে উপভাসে পালিত
হয়েছে, মনোরা একতম তাই শুনিছিলেন। দিবাকরবাবু
স্ত্রী অহুপনা আর স্বাকরবাবুর স্ত্রী মনোরা এই দুই
জায়ের মনের গতি সর্বদাই পূর্ব আর পশ্চিমের মত পরস্পা
বিরোধী। একজন লালপাড় শাড়ী পরয়ে অজ্ঞান পরে
কালোপাড় শাড়ী, একজন কইমাছ খেলে পরে অজ্ঞান
ধান নৈ বাছ, একজন কারো নিম্নে করলে অজ্ঞান প্রা
প্রশংসায় পক্ষমু হয়ে ওঠেন। একজনের কোনে হো
বা মেয়ে পরখু যদি অজ্ঞানের একটু বেশী আদর
নিজের সেই ছেলে বা মেয়েকে হতে তার বা আঁকা ব্য
পিটিয়ে দেন। এখন, রমেন যখন আজ এল, মনোরা
কাছে সংবাদ ঠিকমতই পৌঁছেছিল কিন্তু অহুপনা তার
আর্থনা করলে গিয়েছিলেন বলে বিনি তাকে এর
চোখের দেখতে বাওয়াও উচিত মনে করেন নি। তার
পর অহুপনা যখন তীক্ষ্ণভাবে রমেনের নিম্নে হুকু করলে
এবং শব্দ ভাষাতেই যোগ্যতা করে যিহেনে সে বাঁধা
ছেলেদের মাথা ধাবার জ্ঞ এ শনিএধকে তিনি বাঁধা

স্বপ্না দিতে পারবেন না, হুঁচকাননি সেথেকে দুই দুই করে
 বিদীরে বেনেন, তখন মনোরমার মন হল এই তেঁকী,
 বিধিবক, আদর্শ চিরজ ছেলেটির সঙ্গে তো অতি অবশ্য
 গার ভাব করা দরকার। যের চুকেই তাই হাসিমুখে
 গায় মিটি স্বরে বললেন, 'একলাটি বসে আছ বাবা ?
 গায়ী ছেড়ে এসে মন কেমন করছে' ?
 রমেন কান কান হয়ে বলল—'হ্যাঁ'।

মনোরমা একটু ভড়কে গেলেন। এত বড় ধাক্কা
হল তার ঘেঁষা এমন ধারা জ্বাব কি শোভা পায়? বাড়ীর
মহল ঘন কেমন করার অভিযোগ রমেন অস্বীকার করলে
তিনি ভাবকে কি বললেন মনে মনে তাই মনোরমা ঠিক
হবে রেখাঙ্কলেন, চার পাঁচ বছার তেজস্বর মত সে
হল ধাক্কা জ্বাব দিয়ে যাবার তাকে ছেদার কি
লগেন থানিকক্ষণ তিনি ভেবেই পেলেন না। বোকা
কি নাহতা হেতু? মাখার কোন দোষ নেই তো?
স্বপ্নও অকৃত্রিম থাকেবর অন্যভাঙ ধাক্কা গামলে
মনোরমা তারপর বললেন, 'অঁখম ছুঁচার তিনি ওগমস
গাবো বাবা।' তা আমরাও তোমার পর নই। আমি
লগিয়ে তোমার—' মনোরমা থমকে থেমে গেলেন।
তিনি রমেনের কে হন? বর সম্পর্কেবর পিসীমা জা'এর
কি কি সম্পর্ক হল। 'আপনি আমার ভালো পিসীমা।'
পিসীমা? তাই হবে, রমেনের পিসীমা তিনি যখন
পিসীমা, তখন কি পিসীমা রমেনের পিসীমা হন হবে। কিন্তু
কো পিসীমা মনে? ছোট, বড়, মেজ, লো, রাঙা,
কো মাসী পিসী দিদি বৌদি শুনেছেন, ভালো-পিসী-
কো কোনেবন কখনো। তিনি কি ভালো? রমেন
থেকেই চিনেছে তিনি মাহুয়া মল নন, মন তার
কো? মনোরমা একটা মনোরমার আনন্ড অহুভব
হল। অনেক বিন ধরে যখন ওপর যেন বকটা তার
গোনা ছিল, ভারটা হাঙা হয়ে গেছে। কতকাল ধরে
মন আসছেন তিনি হিংস্রটে, স্বার্থপর, স্বগড়াটে এবং
ও অনেক কিছু। শুভেত শুভেত ধারণা মনে গেছে
তিনি মতাই তাই। হিসসা, স্বার্থপরতা আর স্বগড়াটা
হইবে দিনও তার কাটছে বৈকি। রমেনের কাল শুনে
মন যেন হল. ওগব কিছ নন, অনেক কাল আগেও

বয়সে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন,—সাদাসিধে
ভালোমামুষ। তিনি ভালো।

কাছে বাসিয়ে আদর করে মনোমরা রমেনকে খাণ্ডাখালে। অল্পস্বাভাবিক জিনিয়ে বার বার বদলে খাণ্ডাখালে, খাশা ছেলে দিদি। 'ছেলেমেয়েদের একটরার বমক ছিলেন না, কারো দিকে কড়া চোখে তাকালেন না, ছেলেবুড়ো চাকরবালি এততোলের সবেক কথা ছিলেন হাসিমুখে। মনে হতে থাকে, খোলা ছেড়ে মনোমরা যেন নতুন মাহুদ হয়ে গেছেন। খাণ্ডার পুর ভাষি রমেনকে বলছেন, 'এইটুকু ঘরে কি তিনমুদরের মায়াগা হয়? তুমি ওপরে থাকবে রমেন।' তখন রমেন বলল, 'ভালে-পাণ্ডারি, আমি এ ঘরে থাকি, শুকোকাবলকে পিঠিয়ে যান।'।

মনোরমা হেসে বললেন, 'এ ঘরে থাকতে চাও
তুমি ? বেশ বাবা, তাই হবে। স্বকোমল ধীরেনের
ঘরে যাক, তুমি এখানেই থাকো।'

এ ব্যবস্থায় খুশী হওয়ার বদলে শ্রমকোমল কিন্তু
মানক চটে গেল। তার আত্মশ্রমানে বা লাগল
কিনা। এতদিন বাজীর লোকের উপেক্ষায় তার
অভিমানের সীমা ছিল না, আশ্র তাদের পক্ষপাতিত্বে
সিংহাসয় পুত্বে লাগল। তাকে কেউ গ্রাহও করে
না, রমেনের খুশের কথায় তার দোতলায় ভাল খেয়ে
শ্রমকর ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাজীতে পা দিয়েই
ছলটার এতখানি প্রতিপত্তি অর্মে গেছে ?

কৃতজ্ঞতাভাবের করার বদলে রমেনের বিরুদ্ধে সে তীব্র
বিরোধ অহুভব করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল,
স্বপকার করার বদলে রমেন তাকে জীশ অপমান
করেছে। মনটা তার আরও বেশী খিচরে গেল, ওপরের
তার যেতে একান্ত অনিচ্ছা, জানতেও কেউ বখান
তার কথা কানে তুলল না, ধন্য দিয়ে কোর করে
তার বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দোতালার।

কেবল সুকোমল নয়, অধুপমারও এমন রাগ হল
লবার নয়। একে তো প্রথমেই রমেনের ব্যবহারে
তিনি বিক্রম হয়ে উঠেছিলেন, তার ওপর তার সম্পর্কে
তার বাড়ীতে এসে মনোরমার দলে ডিড়ে তাকে যে

অপমানটা সে করল তার জালা চেপে রাখতে গিয়ে গায়ে বর আশার মত শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন। মুখে যাই বলুন, হৃদয়নি দেখে সত্যি সত্যি কি আর রমেনকে তিনি ভাঙিয়ে বিতেন? এখন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন তেবারি পোয়ানোর আগে হোঁড়াটাকে তিনি বিদেয় করবেন, কাও করে ছাড়বেন একটা। তাকে ভিজিয়ে তার তাইশোকে ছোট-বৌ কিসের জোরে দলল করে তাও দেখে নেবেন।

ছুরুলেটা একবার অহুমান ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে রমেনের সঙ্গে তাকে গল্প করতে দৈর্ঘে মনোরমার চন্ডমা পরা চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হল।

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, না, আগে রমেনকে বাজী থেকে ভাড়াই হবে না। আগে শিক্ষা দিতে হবে ছোট-বৌকে। রমেনকে বশ করে গুকে দিয়ে অপমান করাতে হবে। ডাকলে রমেন ছোট-বৌয়ের কাছে যাবে না, কথা বললে শুনে না, অবজ্ঞা দেখাবে, অপমান করবে—এই যদি করতে পারেন তবেই অহুমানার বেঁচে থাকা সার্থক।

রমেনকে দেখেই সকলের মনে যে একটা ছুরোঁয়া অস্পষ্ট আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল সেটা একেবারেই অসম্ভব নয়। ছেলোটাকে আশ্রয় করা একরকম অসম্ভব। তাকে দেখে করার, খাতির করার, খুশী করার, আশ্রয় দেওয়ার কোন প্রচলিত পদ্ধতি থাকে জানা নেই। নিজে থেকে কাউকে সে এড়িয়ে চলে না, কারো সঙ্গে বেশী খাতির জমানোর চেষ্টা করে না, একজনকে ছোট করে আরেকজনকে বড় করার এতটুকু উৎসাহও তার নেই। বেশী বেশী আদর যত বেশী মমতা দিয়ে তাকে বশ করে যেমন অসম্ভব, অবজ্ঞা আর নির্বৃত্ততা দেখিয়ে তাকে কাঁদা করাও তেমনি অসম্ভব। মমতা আর অবহেলার দাম তার কাছে যেন সমান। কয়েকদিনের মধ্যে তার ব্যাপার দেখে অহুমান আর মনোরমা ছ'জনের যেন ধাঁধে লেগে গেল। প্রাপণ পট্টা করেও তাদের ছ'জনের মধ্যে কেউ রমেনের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব অর্জন করতে

পারলেন না। কিশোর সন্ন্যাসীর মত সে যে এক লুরে নির্ভিকার হয়ে থাকে না নয়, তাঁর দোখালে শিশুর মত খুশী হয়ে ওঠে কিন্তু গলে পড়ে না। ভালবাসা দেখানোর আগে যেমনটি ছিল তেমনি থাকে। লেজও নাড়ে না, পা'ও চাটে না।

প্রথমদিন অহুমানা ভেবেছিলেন, মনোরমা আর তার খুব অভিমান হয়ে গেল। বানিক পরেই রাগিকে আরম্ভ করেছে তার সঙ্গে তিনি বোঝা হয় পরে তার তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে উল্লাসভাবে বললেন, দিতে পারবেন না। বিকালে মিটি আসিয়ে হুমানার নিম্নে শুনতে বেশ ভাল লাগছিল, না বাবা? তেজে রমেনকে খেতে দিলেন। 'অঁজ সকলেই খেতে লুচি আর মিটি খেল, কিন্তু তার মিটি কল পেল শুধু রমেন। পুলাকিত হয়ে অহুমানা লজ্জা বরদা এ বাজীতে তাকেই যেন সে আপন মনে করে, বসেই আর যাই যেন সে চায়, এমনি ভাব রয়েছে নতুন পরিচয়ের সাক্ষাৎ নেই, পর মনে করে গেলেন হাঙ্গির কথা বলেছেন এমনি ভাবে হেসে ফেলল। কি আগ্রহের সঙ্গেই রমেন জিজ্ঞাস্য করল, 'আগে সেই প্রাইজগুলি আছে পিসীমা? দেখাবেন আমায়? করে সেই অল্প বয়সে সেলায়ের কাশ বহরিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালবাসতেন গানের জন্ম অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন, যা কাছ জুনে সেগুলি দেখবার জন্ম রমেন উৎসাহ আছে! মনটা অহুমানার কেমন করে উঠল। দশ বিশ বছরের মধ্যে কেউ তো কোনদিন এমনি আগ্রহ জানাননি তার এককালে বিশেষ কি জিনিস কিসের জন্ম বাজীতে আর পাড়াতে এককালে সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতেন। এ আড়ালে কোকে তাকে শুটকি মাছ বলে, মাধায় নাকি ছিট আছে, গাদা চোপে ভাজা ছেলেপিলে ভস হয়ে যেতে পারে বলে তিনি চন্ডমা পরে থাকেন। সত্যি কি তিনি! এই মাদিয়ে? বড় ট্রাকের তলা থেকে খুঁজে পেতে পারেন দিনের প্রাইজগুলি দেখাবার সময় রমেনের জো বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখে তো তার মনে হচ্ছে তিনি সেই আগের অহুমানার মতই আনন্দে হাসিখুশী ভাব আর মিটি স্বভাবে সবাই মুগ্ধ, যেত, পাড়ার মেয়ে বৌ ভিড় করে যার কাছেই যেমনি শিগতে আর গান শুনতে!

অহুমানা স্পষ্ট অহুভব করতে লাগলেন ভেতরটা তার অনেকদিন শুকনো হয়ে ছিল আজ হঠাৎ ভারী একটা মধুর আবেগে ভিজে সরস হয়ে উঠছে। দ্রিক এরই মধ্যে মনের অবস্থা ছিল বলে সন্ধ্যার পর মনোরমার ঘরে রমেনকে দেখে রাগ হবার বদলে অহুমানা কাতর হয়ে বললেন, 'তুবি কি জানবে, তুবিই আমার মম বলে। যার জন্মে বত করি তার রাগে আনি তত মন্দ।' রমেন হেসে ফেলল, অহুমানা মনে হাঙ্গির কথা বলেছেন এমনি ভাবে হেসে ফেলল। 'আগে সেই মম বলে না পিসীমা। আপনি কেন মম হতে যাবেন। ভালো-পিসীমা নিম্নে করেন নি, ছুর বহরিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালবাসতেন

ভালো-পিসীমাকে এখন আর বাসেন না। শুনে আনি কি বললাম জানেন? 'কি বললে?' বললাম, তা নয় ভালো-পিসীমা, পিসীমার শরীর ভাল নেই। সত্যি নয়?'

সত্যি নয় আবার! আজ কতকাল ধরে কত অল্পে কুণ্ঠছেন পিসীমা কে তার খবর রাগে? কে তাকিয়ে আছে তারে তার দিকে, তিনি মরলেই বা কার কি এসে যায়। সংসারের জন্ম উদ্বাস্ত তিনি খেতে যাবেন, সকলের ভাবনা ভেবে জর্জরিত হবেন, তা'হলেই বুঝে যুগী। কিন্তু এ ছেলোটার দয়ামা আছে, দেখেই বুঝতে পেরেছে তার শরীর ভাল নয়।

'ছোট বৌ কি বললে?' 'বললেন স্বর্ণশিল্পর খেলে আপনার উপকার হবে। শুঁও এক বামা কবিরাজী করেন, তার কাছে খাঁটি ঔষধ পাওয়া যায়, আনিরে যেনে বললেন।' অমেককাল পরে সেদিন রাতে হেসেলে খেতে বসে অহুমানা আর মনোরমার মধ্যে কিছুক্ষণ হুহুহুহুহুহু গল্প হল।

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথায় কবে

????
কিন্তু তার স্মৃতিকে
বাঁচিয়ে রাখা যায়
ছবির ভিতর দিয়ে।

সুন্দর ষ্টুডিও

আর্টিস্ট: কে, সি, খান্না

১৩৩৮, রসা রোড, ভবানীপুর।

(হাজরা রোডের মোড়)

ফোন: সাউথ ৪৪৫

ফোন: কলিকাতা ১৩৩২ গ্রাম: "ব্যাংক ত্রিপুরা"

দি
এসোসিয়েটেড ব্যাংক
অফ ত্রিপুরা লিমিটেড

পৃষ্ঠপোষক:
শ্রীশ্রীমুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর
কে, সি, এস, আই

চীফ অফিস—আগারতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট
হেড অফিস—গঙ্গাসাগর
কলিকাতা অফিস—১১, ক্লাইভ রো

ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ:
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ধন
গোলাখাট (আসাম) ব্রাঞ্চ ও মহা (শ্রীহট্ট) সাব-ব্রাঞ্চ
খোলা হইয়াছে।

ওরা কারা ?

শ্রীমতী পত্রী

ওরা কারা ?

সারাদিন খেটে মরে অনাহারে

দানব যন্ত্রের মত অবিদ্যম—

আশুপ্রাণ, উচ্চকীর্ত শশকের প্রায়—

উদয়াস্ত নিবিবাদেরে,

ওরা কারা ?

বৃত্তকার আর্তনাদে

যাদের—সারা পৃথিবী কঁপে ওঠে,

মর্মযাতনার স্পৃহণে রসাতলের

বাহুকারী বৃক ও নড়িয়ে তোলে—

ছিন্ন বস্ত্র, ক্রিম মুখের

কণার অস্তিত্ব দিয়ে

যাদের চলার পথ ঘেরা,

ঠিক খিল অঁটা কপাটের মত—

পুরণির জলশ্রোতের মত—

ফোটার আগে করে যাওয়া

গোলপ ফুলের মত

ওরা কারা ?

অস্তরের বাসনাকে যারা

উৎকণ্ঠ শাসন দণ্ড দেখে

বৃকের মাঝে চেপে রাখে

রোলার বুলান বাসের বনের মত,

লোকচারণকে যারা

দেবতার মত পূজা কোরে

আসছে শাশ্বত কাল থেকে—

তাদের মাংসখনি থেকে

কেছে নিয়ে যাদের পাড়া কোরে রেখেছে—

মাথা হুলে দাঁড়াবার ভয়ে

গিঠের পাঁজরগুলো

দিয়েছে ভেঙ্গে, ভুগড়ে একাকার কোরে

দিক একপিঠ ভাঙা কই হাছের মত

ওরা কারা ?

ওরা কারা ?

বার বার প্রশ্ন জাগে

কালের বৃকে

কলের দৌলতে

রোজকারের উদ্দাম বাসনা নিয়ে

দিনের পর দিন,—রাতের পর রাত

খেটে চলে কলের গাড়ীর মত—

স্বার্থ তাদের কতটুকু ?

অর্থ তারা কি পায় ?

তবু পাটে—

বিরামবিহীন,

ওরা কারা ?

প্রশ্ন জাগে—

তর্ক করতে মন লাগিয়ে উঠে

অসতর্ক মুহূর্তের

আত্মবিশ্লেষণ করতে বসে

আত্মবিসর্জন দিয়ে বসি

যাদের ভূতৎ মন টলে

কিন্তু গলা ফুলিয়ে বলতে পারি না

এমনি ধারা যারা

ওরা কারা ?

প্রশ্নের জবাব মিলে না

কেউ বলে বাটুক,

না খাটলে থাকে কি

কেউ বলে জন্মাস্তরের তপস্যা।

হাসি পায়—

মুসুরির আত্মচেতনা নেই

বলে মানুষ কি এমনি

নির্জন হার্য পূজবে ?

এমনি ভাবের চিন্তাশ্রোত

বয়ে চলে নদীর স্রোতের মত

উত্তর মিলে না

শুধু বাস বাস—পরি

ওরা কারা ?



ভবিষ্যৎ

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রমোদা হুথোপাধ্যায়

বাড়ি পাঁচটার সময় আদিত্য আসিয়া হাজির হইল
গানকাটা রোডে চিত্তাহরণের গৃহে।

পরিচ্ছন্ন ছোট বাড়লো। সামনে একটু খোলা
বাগান। রকমারি ফুলে বাগান যেন আলো
হেরা আছে!

বাগানের বারান্দায় একথানা ইঁজি চেয়ারে বসিয়া
গিরিবালা। গিরিবালার মাথার চুল এলানো। মাথার
গাধড় নাই। কাছে একজন দাসী একটা বেতের
বোঁটার বসিয়া গিরিবালার মাথার পাকা চুল তুলিয়া
হিঁতেছে।

গিরিবালা যেভাবে বসিয়া আছেন, তাহাতে ঊর
যমনে গিয়া না ঠাড়াইলে আদিত্যের উপস্থিতি তিনি
ইঙ্গিত করিতে পারিবেন না।

কাহ্নোয়ো সাড়া নাই। আদিত্য ঠাড়াইয়া চারিদিকে
দেবার চাহিল। ঘরের খোলা খড়খড়ির দিকেও দৃষ্টি
লাইল। খড়খড়িতে শাশি অঁটা। শাশির কাঁচের
দিকে শুধু নীল রঙের পর্দাটুকু দেখা গেল। ভাবিয়া—

ইহা, ওখানে হয়তো দেখিবে আশীষের দৃষ্টি চেহারা। নাই।
গিরিবালার মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত আদিত্য
হেরা ঠাড়াইয়াই থুসু-কুসু করিয়া কাশিল।

কাশিতে বিভ্রান্তের প্রবাহ ছিল না। কিন্তু যে-শব্দে
গিরিবালা খড়মড়িয়া ইঁজিচেয়ার হইতে দেখ-ভার তুলিয়া
—খাশে পর্দা টেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—

পাঁচলের প্রান্তটুকু বেস্কের উপর দিয়া বুটাইয়া চলিল।

খবর চুকিয়াই দাসীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—
কে ভদ্রলোক এসেছেন রে। বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে
সব বগলা।

দাসীর নাম বগলা। গিরিবালার কথায় বগলা
আগন্তকের পানে চাহিয়া। চাহিখামাজ চিনিলা। এক
চিনিখামাজ তার মুখে-চোখে হাসির দ্বিত্ব ফুটিলা।
আদিত্যের অভ্যর্থনা না করিয়া সেও গিয়া ঘরে ঢুকিল—
চুকিয়া অকুট কঠে বলিল—ভদ্রলোক নয় গো মা—
কলকাতার আদি বাবু।

আদিত্য কথাটা শুনিলা। শুনিয়া সে সাগ্রহে ঠাড়াইয়া
রহিল।

পরক্ষণেই বেস্কের অঁচল টানিয়া মাথার তুলিয়া
গিরিবালা আবার বাহিরে আসিলেন। আসিয়া
আদিত্যকে দেখিলেন। বলিলেন,—ও বাবা, তুমি
এসেছো! তা এসো, এসো—

আদিত্য হাসি-মুখে বারান্দায় উঠিয়া গিরিবালার
পায়ের কাছে জুইটি হইয়া প্রণাম করিল।

গিরিবালা আশীর্বাদ করিলেন। তারপর বলিলেন,
—ঘরে এসো বাবা।

বারান্দায় ছাঁটারখানা বেতের চেয়ার ছিল। আদিত্য
বলিল—এই বারান্দাতেই বসি। চারিবার দেখা
যাচ্ছে। চমৎকার! পঞ্চ কত বকেবের দোকান
চলেছে।

গিরিবালা বলিলেন—হ্যাঁ। আজ ছাঁটা-বার কি না!
বসিবার এখানে ছাঁট বসে। ছাঁট থেকে সব ফিরছে।
তা, ভালো আছো বাবা ?

আদিত্য বলিল—আচ্ছা, হ্যাঁ।

গিরিবালা চাহিলেন দাসী বগলার পানে। বগলা
পর্দার আড়ালে ঠাড়াইয়া ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করিয়া
গিরিবালা বলিলেন—তোরা দ্বিমিনিবে খবর দে। বল,
আদিত্য এসেছে।

বহলাকে বাইতে হইল না। সজ্জিত বেশে জাহ্নবী নিম্নে আসিয়া বারান্দায় উদয় হইল।

আসিত্যকে দেখিয়া জাহ্নবী বলিল—এ কি আপনি হঠাৎ কোথা থেকে?

আসিত্য বলিল—ছুটি ছিল—বেড়াতে এলুম।

গিরিবালা বলিলেন—এখন তো ট্রেন নেই—লেট হয়েছিল রথি?

আসিত্য বলিল,—না। আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

গিরিবালা বলিলেন—এতকথ পথে পথে ঘুরছিলে না কি বাড়ীর সন্ধানে?—এ বাড়ীর টিকানা—

জাহ্নবীর চোখে হাসির ক্ষীণ বিদ্যুৎশিখা—মুখ গম্ভীর—আসিত্য তাহা দেখিল। ইঙ্গিত বুঝিল। সুখিয়া আসিত্য বলিল—পথে ঘুরিনি। এখানে এসে আমি জলাপাহাড়ে হিল ভিউ হোটেল আছে, সেই হোটেলের উঠেছি।

গিরিবালা বলিলেন—আমার এখানে জায়গা থাকতে পরশা বরচ করে আবার হোটেলের ওঠা কেন বাবা? এই সেদিন আমার এক বোনপো এখানে এসে পাঁচ দিন থেকে গেল। কখনো সে দার্জিলিং জাখেনি—বললে, তোমরা আছো মামিয়া—ট্রেন ভাড়া বরচ করে দার্জিলিংটা দেখতে এলুম।—কলকাতাতেই সে চাকরি করে—এবারে ছুটি পাবে না। ছুটির সময়েও তাকে অফিস করতে হবে। সাহেব তাই বলেছিল—ছুটির আগে সাত দিনের ছুটি দিচ্ছি, ঘুরে এসো বিনোদন—যদি চাও।—সে ছিল এখানে, তার জ্ঞান আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

ভিতরের ঘর হইতে চিত্তাহরণের সাদা জাপিল। চিত্তাহরণ কহিলেন,—কার সঙ্গে কথা কইছো তোমরা? নেপথ্যভারালের সে কণ্ঠ উদ্দেশ্য করিয়া গিরিবালা বলিলেন—আসিত্য এসেছে গো।

—আসিত্য! বলিয়া চিত্তাহরণ বারান্দায় আগিলেন তাঁর পরশে পট্টর বীশে, গায়ে ভারী একটা ওভার-কোট চাপানো, বাবুর কাপ।—

চিত্তাহরণকে একবেশে আসিত্য পূর্বে কখনো দেখে নাই! সে জানিত, পরশার পাহাড়ে উঠিয়া বলিলেও

চিত্তাহরণ বিলাতী হুটের মায়ায় উদ্ভ্রান্ত হইবার কোন নমুনা।

ভূমিষ্ঠ হইয়া চিত্তাহরণকে সে প্রণাম করিল।

চিত্তাহরণ কহিলেন,—বেড়াতে বেরজিঙ্গুম জাহ্নবী তাড়ায়। আজ একই অবসর আছে—ও বলে, দার্জিলিং এসেও পরশার মধ্যে মুখ জুড়ে থাকবে—ঘুরে কোথাকার দেখবে না বাবা? কাছের বললুম, চাও কোথায় এখানে আছে ডিক্টোরিয়া ফল্গু—ও কোথায় ফল্গু দেখাতে নিয়ে যাবে।

হাসিয়া জাহ্নবী চাহিল আসিত্যর পানে, বলিল—জানেন আদিত্যবাবু, এখানে কি আছে আর কিনে তার মধ্যে বাবা জানেন এখানে আছে শুধু আরও সাইড গ্যারাজের বড় সাহেব হুয়ার্ট, গভর্নমেন্ট এক্সিমেন্ট প্রাইস আর কোথায় নতুন ব্রিজ ঠৈরাই হচ্ছে, সেই বিয়ে পাহাড় আর বাড়ী!—এতদিন এখানে এসেছেন, কোথাও একদিন বাবাকে নিয়ে যেতে পারিনি!

চিত্তাহরণ হাসিলেন? কহিলেন—সোহা-লকড়ি আর কিছুর পানে চাইতে পারিনি যে। ভাবি, আর কিছুর যখন জীবনে দেখা হলো না—যে কটা দিন আছি—কিছুর আর সে-সবের পানে চেয়ে কি-বা লাভ হবে! তার মধ্যে কইতে এসেছি—তাই করে চলে যাচ্ছি!

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—জন্ম মেছো বলতে চাও, গাছের মতো কি-রকম, শুনি?

আসিত্য এক-কথার জবাব দিল না। লজ্জায় যেন হীরা পড়িল। গিরিবালা বলিলেন,—তোমার এ অন্তর

গা। ওই এ বয়স—মনে কত সাধ—কত ইচ্ছে। পরশা রোজগার করতে এসে বলে—এক দণ্ড ইচ্ছা, মেলাবে না? এখানে এসেছে—দুদিন এখানে থাকলে দেহ-মন তাজা হবে—খাটবার সামর্থ্য বাড়বে, তাই!

চিত্তাহরণ বলিলেন—ওটা ভুল কথা! বেড়াতে আসে বাহু সমের জ্ঞান! দেহ-মনের শক্তি-সামর্থ্য—যে জ্ঞান দ্বারা জীবিত হয়ে ছাড়া খাবার দরকার হয় না।

গিরিবালা বলিলেন—যত তোমার অনাঙ্গশক্তি বৃদ্ধি পায় যে করে কাজের মধ্যেই সে উৎসাহ পায়, শক্তি পায়—সব-কিছুই পায়। তা নয়,—পথ হয়েছে বেড়াতে—খাটবার—তার উপর দার্জিলিং বেড়াতে আসা হলো মন্ত দান। যদি বলো সমের জ্ঞান এসেছি তো মানতে চাইব না—পথ করে বলেছো!—

চিত্তাহরণ হাসিলেন, বলিলেন—যাক—আজ তো রাই বাজিলুম তোমার মেয়ের সঙ্গে ফল্গু দেখতে। পরশা বলে কি, যদি বলতিস পাহাড়ী কথা দেখবে—তাহলে মনটা বৃষ্টি হতো! মনে হতো, বিধাতার সৌন্দর্য্যে অপূর্ণ জিনিস দেখেবা গিয়ে! কিন্তু যেই হইল, ভিক্টোরিয়া ফল্গু—অমনি মনের উৎসাহ পর পেছে! এ নান জনলে মনে হয়, বাহুয় বৃষ্টি হওয়ার উপর কোনোরকম কারচুপি করেছে—সেই রূপ প্রচার করছে এই মর্জার নাম দিয়ে!—তা—আসিত্য এখানে কোথায় এসেছিল? কোনো দর ছিল?

সলজ হাতে আসিত্য বলিল—সাজে না, কাজ নয়। হীরা হলো, তাই একটু বেড়াতে এসেছি।

—কার কাছে এখানে এসেছো? কোথায় উঠেছো?—করে বাড়ীতে নয়। এসে উঠেছি এগারকার ডিক্টি হোটেলের।

চিত্তাহরণ বলিলেন—বেড়াতে এসেছো! তাও কারো দ্বারা? তার উপর হোটেল! এই জনতে পাই, কিছুর কোনো মতে পরশা-কড়ি রোজগার করছে। লিখে লিখে রোজগার হয়! হুঁ! সে টাকা ধরচ করতে নতুন হয় না? হোটেলের কত দিন থাকবে? দৈনিক খেতে মতো কি-রকম, শুনি?

আসিত্য এক-কথার জবাব দিল না। লজ্জায় যেন হীরা পড়িল। গিরিবালা বলিলেন,—তোমার এ অন্তর গা। ওই এ বয়স—মনে কত সাধ—কত ইচ্ছে। পরশা রোজগার করতে এসে বলে—এক দণ্ড ইচ্ছা, মেলাবে না? এখানে এসেছে—দুদিন এখানে থাকলে দেহ-মন তাজা হবে—খাটবার সামর্থ্য বাড়বে, তাই!

চিত্তাহরণ বলিলেন—ওটা ভুল কথা! বেড়াতে আসে বাহু সমের জ্ঞান! দেহ-মনের শক্তি-সামর্থ্য—যে জ্ঞান দ্বারা জীবিত হয়ে ছাড়া খাবার দরকার হয় না।

রাজী বাছি! তা না বলে তোমাদের ঐ সব স্বাভা শক্তি সামর্থ্য—ও সব কথা ভুললেই না তর্ক বাধে!

আসিত্য শিহরিয়া চুপ করিয়া রহিল! যার ঢাকা আছে—পৈত্রিক সম্পত্তি নয়—নিজে খাটিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছে, তার কাছে টাকা-রোজগারেই স্বাভা-শক্তি-সামর্থ্য—ওজহ বা খেলা-খুলাকে সে ব্যক্তি বাহুয়ের তুচ্ছ-তাক্ষিয়া করে! এমন কথা ছুটার জ্ঞানের মুখে শুনিয়াছে। কথাটা হয়তো সত্য! এবং বিখ্যা যে নয়, চিত্তাহরণ তার পরম হুটান!

ভাবিল, উনি রাগ করিলেন? সে গরীব—তার উপর উনি জানেন, পর-উপন্যাস লিখিয়াই তার উপার্জন। উপার্জনের এ ভিত্তিকে অতিরিক্ত তুচ্ছ বলিয়াই চিত্তাহরণের ধারণা, আসিত্য এক-কথা শুনিয়াছে। আরো শুনিয়াছে, তার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহ দিতে চিত্তাহরণের যে-মত, সে মতে নির্ভর জাহ্নবীর জিন্দগু ছাড়া আর কিছুই উপরে নয়। আশিত্যর দার্জিলিং আসাকে গরীবের অসুযোগী বলিয়া বলিয়া হয়তো চিত্তাহরণের ধারণা! তা যদি হয়—

গিরিবালা করিলেন স্বামীর কথার প্রতিবাদ। বলিলেন,—তোমার মতো বাহু—ওজহ ভূমিই আছে এক! না হলে টাকা-পরশা রোজগারের সঙ্গে পৃথিবীর পানেও চাইতে হয়! তাতে মহাভারত অন্তত হয়ে যায় না।

১০ টাকায়

১৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দার্জিলিং ব্রেও চা (পাতা—গুড়া—ব্রোকন)

নিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পত্র জাহ্নম।

বাবু টি কোম্পানি

২৭২, ক্যানিং স্ট্রীট ও ১৩৭, বোম্বার স্ট্রীট

অথবা
দি এসোসিয়েটেড ব্যান্ড অফ জিপ্রুয়ার
যে কোন শাখায়।

এ সময়ে বাদ্যহরণে চিত্তাহরণের স্রুতি ছিল না। জাহ্নবীর পানে চাহিয়া চিত্তাহরণ বলিলেন—বিশেষকৈ বল, আসিত্যর জন্ত চা দিয়ে যাবে। খাও আসিত্য, চা খাও...তার পর চলে, একসঙ্গে সব বেড়িয়ে আসি। জাহ্নবী বলছে কি ওর ভিক্টোরিয়া ফলস্? বেড়াতে এসেছো, বেড়াও। উনি যা বললেন, পৃথিবী দেখা... ভালো। মানি...কিন্তু পৃথিবীর পানে চাইবে কখন? যখন নিজে কামেরী করে' পৃথিবীতে দাঁড় করাতো পূরবে, তখন। তার আগে নয়!—আহ...

জাহ্নবীর ভালে লাগিল না। বাহুয় আসিগামাত্র এমন করিয়া তাকে দমাইয়া দেওয়া! তবে বাপের স্বভাব সে জানে...ওজন করিয়া কথা বলেন না। একালে যাকে ফর্মালিটি বলে, সে ফর্মালিটির তিনি ধার ধারেন না। যার সঙ্গে কথা বলেন না, তাকে রসাতলে বাইতে দেবিলেও বাবা একটু কথা বলিবে না। আবার যার সঙ্গে বলেন, তার কাছে কথার কোন-খানে এতটুকু বাধা-বন্ধ থাকে না!...

সে বলিল—বিশেষকৈ তাত্ত্ব দিয়ে আমি চা আনাই! ...ভূমিও চলে না বেড়াতে!...খাবীর সামনে ছুপা চার-পা চলা ছাড়া একদিনও কোথাও তোমাকে ঘুরে নিয়ে যেতে পারবু না! ওঠো...কাপড়খানা বদলে গরম কাপড়-চোপড় পরো। এখানে আসবার সময় তোমার জন্ত যে নতুন গরম কোট তৈরী করানো হলো, সেইটে পরে এসো। বুকে...নাও, ওঠো। দেবী নয়।

গিরিবাল্য বলিলেন—আমাকে টানাটানি করিস কেন? তোরা হাঁটরি খোড়ার মতো; আমার কি পায়ে হাঁটা অভাস আছে! হুঁ! তোমার ওর পাল্লার পড়ে গাড়ী চড়ে-চড়ে পায়ের মাথা খেয়ে বসে আছি, ছাই! এই পর্যন্ত বলিয়া গিরিবাল্য চাহিলেন আসিত্যর পানে। বলিলেন,—ওহু চা নয় বাবা, ঘরে বগলা চমৎকার বাজা তৈরী করেছিল...ছ'খানি সেই বাজা খাও, আর তার সঙ্গে চা।

আদিত্য ক্লান্ত মনে বলিল—থাকো। গিরিবাল্য বলিলেন—রাড্ডে এইখানেই থাও না আজ!

আদিত্য কি জবাব দিবে, স্থির করিতে পারিল না। নিয়েরের বিধা!...

সে বিধা ভাগিয়া চিত্তাহরণ বলিলেন—হোটেল বলে আসতে হয় তাহলে! তারা রাড্ডে খাওয়ার জায় নেবে। তার চেয়ে কাল তোমার এখানে খেতে বসো...হোটেল ও আগে থেকে বলে দেবে, তাহলে যাবে পরশা খরচ হবে না!

আদিত্য বলিল—তাই হবে। কাল রাড্ডে যাবে তাহলে!

গিরিবাল্য বলিলেন,—বেশ, তাহলে এই কথা রইলো।

আদিত্য মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যে-বাহুয় টাকা জমা, কত দিকে তার লগ্না রাড্ডে হোটেলের খাওয়ার ব্যয় করাই যা তার এর দিকে লগ্না ছিল না! কিন্তু চিত্তাহরণের কি গভীর লগ্না! মাধে তিনি এত টাকার বাহুয়! কথায় বলে একই পরশাকে তুচ্ছ ভাবিয়া না...সেই একটি পরশা তোমাকে লক্ষ পরশা আনিয়া দিবে!...পরশার দর জানে না বলিয়াই সে এমন লগ্নীছাড়া!

৬

ক'জনে বেড়াইতে বেড়াইতে পথে অনেকদূর গিয়াছেন...ভিক্টোরিয়া ফলস্ দেখা হইল! কারবার নদী...পাহাড়ের পা বহিয়া কত নীচে নামিয়া গিয়াছে। কার-চক্কু জল!

গিরিবাল্য বলিলেন—কাছাকাছি দেখবার এত সু-ভিনিস রয়েছে...তা আমাকে কি একদিন নিয়ে আসবে নাই জাহ্ন?

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল—বা রে, আমি তো তোমাকে রোজ বলি একটু বেড়িয়ে আসবে চলে মা...কুঁড়ী তো সবসময় মতেরো বরখের কাছ আছে বলে দেখা চাও না!

গিরিবাল্য বলিলেন—সাধে চাই না? পাহাড়ে গরম একবার নামো, একবার ওঠো!...বয়স যখন আর পাঁচজনে দাঁজিলে বেড়াতে আসতো, ওকে কতখানি তখন বলছি যে চলে না গো, সকলে যায়...একরা

দাঁজিলে চলে...ওর কি অবসর হয়েছিল কখনো ঘরবার? এবারে যে এসেছেন, সে দাঁজিলেইয়ের গিয়া। তাও দাঁজিলি এর জন্ত দাঁজিলিয়ে আসেন নি, এসেছেন ঐ সরকারী পুল তৈরীর কাজে!

চিত্তাহরণ বলিলেন—ওহুই ঘুরবি রে জাহ্নবী?...মাথাও ঘসবি না?

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল,—তোমার পা ব্যথা করছে কি?

চিত্তাহরণ বলিলেন—একটু করছে বৈ কি! সারাদিন গাড়ির পিঠে চড়ে ঘুরেছি...তাতে কম বেহেনত হয় নি...বাড়ী ফিরে তাই পা-হাত ছড়িয়ে একটু আশ্রয় দিই!...এ যে ঐ ঝাউ গাছটা...পাশে বেশ বড় বৈ...এ, ঐ বৈকিতে গিয়ে সকলে বসি।

সকলে আসিয়া বলিল পথের ধারে পাথরের বেকে। জাহ্নবী বলিল—একটি দিন ভূমি আমার কথা শোনো না, আমার সঙ্গে ঘুরে দাঁজিলি ছাড়া...কাজ যো করছো সারা জীবন। একটি দিন...যাকে বলে সিডে...কি বলা?

দুই হাতে চিত্তাহরণ বলিলেন—হুঁ! আচ্ছা, বেশ, গাি আছি।

জাহ্নবীর আনন্দের সীমা নাই! সে বলিল—কবে? গল তাহলে?

চিত্তাহরণ বলিলেন—কাল নয়। কাল আমাদের এক-গাড়ী জয়েট আসছে...দেখে এ্যাক্সড করবার কথা আছে। কাল নয়...

জাহ্নবী ক্রুদ্ধিত করিল, বলিল—তবেই আর হচ্ছে!

—না রে না, হবে'ধন।

জাহ্নবী বলিল—কবে...তোমাকে বলতে হবে।

—হুঁ...পরন্তও নয়। প্রাইস সাহেবের সঙ্গে পরন্ত সিডিও যেতে হবে।

জাহ্নবী বলিল—এই হুস্তাতেই কিন্তু তোমার হাড্ডি

চিত্তাহরণ বলিলেন—বেশ, সামনের বেশপতিবার।

জাহ্নবী বলিল—বেশ...বেশপতিবারই হোক! কিন্তু বাড়ী গিয়ে তোমার ডায়েরিতে লিখে রাখবে। সেদিন সকালে চা খেয়ে আমরা বেরুবো...সঙ্গে খাবার-দাবার নেওয়া হবে। আর সঙ্গে থাকবে বামুদত্তিন রিকশ-গাড়ী, বুকে...বাংলোর নীচে ভুটিয়া বস্তা...সেখানে আছে গোশ্কা। গোশ্কা দেখে আমরা পার্ক-জিউ পার্ক যাবো। সেই পার্ক বসে খাওয়া-দাওয়া করবো। তার পর...আচ্ছা, আচ্ছা বাড়ী গিয়ে আমি নারা দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলবো...কেমন?

চিত্তাহরণ বলিলেন—বেশ।

জাহ্নবী বলিল—সেদিন যে ফের ভূমি কাজের জল করবে...তা করতে পাবে না। করলেও আমি অনুবো না। আমার প্রোগ্রাম যদি ভূমি মাটা করে দাও, তাহলে আমি শুক্লমধ্যের ট্রেসে কলকাতা চলে যাবো...একলা...কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না...বুকে?

চিত্তাহরণ বলিলেন—হুঁ!

জাহ্নবী বলিল—আমাকে চেনো তো।

ভুল গিরির হুকে বলিয়া বৈকি চাহিয়া ডাঙো, কি বিজি শোভা...ওদিকে ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘা...

জাহ্নবী বলিল—এই বৈ কাঞ্চনজঙ্ঘা। আচ্ছা বলুন তো আসিত্যবাবু, আপনি তো মস্ত লেখক, কাঞ্চনজঙ্ঘা কথটা এলো কোথা থেকে?

আদিত্য বলিল—কাঞ্চন বর্ণের জল্যা...তাই না কি?

জীবন বীমা করুন—

ইণ্ডিয়া এমিকেবল

প্রভিডেন্ট ইন্সিউরেন্স লিং

(স্থাপিত—১৯০১)

হেড অফিস—৫ ও ৬ হোয়ার স্ট্রট, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

মিং এ. রায় চৌধুরী

হাসিয়া জাহ্নবী বলিল,—না। তিস্তাতী কথা আছে কাং-ছেন-হাভাং-গা। তাই থেকে হয়েছে কামনজন্ম। আপনাদের সোনার জন্মার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তিস্তাতী কথার মানে হলো সোনার তোবাখানা।

মেয়ের গবেষণায় বা গিরিবালার মন আনন্দে গরুে ভরিয়া উঠিল। গিরিবালার বলিলেন,—ভূমি এই প্রশ্নব এসে দাখিলিগে আদিত্য?

আদিত্যর মনে আবার বিধা। ভাবিল, সে এই প্রশ্নক আসিয়াছে সত্য...কিন্তু সেকথা বলিলে যদি চিত্তাহরণ ভাবেন, জাহ্নবীর জন্ম আসিয়াছে এত টাকা খরচ করিয়া! হয়তো আবার রাগ করবেন! তাছাড়া...

তাই সে বলিল—না, আমার শিলিগুড়িতে থাকুন ছেলেবেলায়। শিলিগুড়িতেই আমার জন্ম। দাখিলিগে প্রায় আসতুম। এখন কলকাতায় আছি, কাছেই সব সময় আসা হয় না, তবু মাঝে মাঝে আসি। এ জায়গা আমার এত ভালো লাগে! বস্তু আকর্ষণ! ছুদিন বিশ্রাম নেবার দরকার হলে আমি দাখিলিগে আসি, আর কোথাও যাই না। জানা-জানা বন্ধ-বাংবন্ধও এখানে আসেন।

এত কথা বলিবার প্রয়োজন হয়তো ছিল না! কিন্তু কথার পিঠে কথা একেবারে ভিড় করিয়া জমিতে লাগিল! তাছাড়া মনে হইতেছিল, গিরিবালার প্রশ্নের উত্তরে এ কথাগুলো বলা ভালো! বাজীতে চিত্তাহরণ বিলাসের যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিত জাহ্নবী চূর্ণ হইবে! অর্থাৎ তার দাখিলিগ আসার বিলাস নাই! শিলিগুড়িতে জন্ম...এখানে পাঁচবার আসিয়াছে, তাই কোথাও বাহির হইতে গেলে এখানকার কথাই সকলের আগে মনে আসে!

ছ-চার দিনে এ বাজীর সঙ্গে আদিত্যর চমৎকার বনিয়া গেল। পয়সার সাহায্য চিত্তাহরণ সারাদিন বাহিরে থাকেন। জাহ্নবীর সঙ্গে সকলে থানিকটা ঘুরিয়া বেড়ানো...গিরিবালাকেও লগ্নে বইয়া বাহির হয়। খন্ডা-খানেক ইটিবার পর গিরিবালার বলিল, আর নয় বাবা, আমি এখন ফিরি। জাহ্নবী বলে, এর মধ্যে

বাজী কিরবো কি? না! টিক করেছি—কাল দুপুরেই পাছফুটা পর্য্যন্ত যাবো। গিরিবালার বলিল, আমি আর শারছি না মা চলতে! তার উপর সংসার আছে। আদিত্য বলে জাহ্নবীকে,—ভূমি এ পথ দিয়ে সেই ওপরে গিয়ে ওয়েই করো, মাঝে বাজী পৌছে দিবে আমি গিয়ে তোমার খীট করবো।

তাই হয়। মা চলিয়া আসেন এবং মায়ের উপর আদিত্যের এতখানি দরদ...

এ দরদ নিজের পেটের মেয়ের কাছে গিরিবালার পান নাই। জামাই! এখনো জামাই হয় নাই—বলিয়া জাহ্নবী এতখানি দরদ করিতেছে! নারী যেহ-কাজাল মন...আদিত্যর উপর মায়ের মায়া ছুটিতে নিবিড় হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধবার সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিয়া আদিত্য নিদ্রা চাইল। জাহ্নবী বলিল—একটা কথা আছে।

—কি কথা? জাহ্নবী বলিল—নতুন বিলিভী হাট করিয়ে এনেছে সে হাট পরে একদিনও আসেন না কেন?

আদিত্য বলিল—লজ্জা করে।

জাহ্নবী বলিল—লজ্জা করে যদি তো ও-পোয়া করানেন কেন? বাবা মাধে বলে, বাজে খরচ।

আদিত্য বলিল—তোমার চিঠি পড়ে কিনেছিছ তোমরা এখানে মাহেবী ঠাইলে আছে...ব্যারিষ্টার বন্ধব তোমাদের বাজীতে আসেন। দেখে মুগ্ধ হইবে এলে যদি রাগ কেত না পারি। বিশেষ...

কথা বাধিয়া গেল।

জাহ্নবী বলিল—বিশেষ...কি? বসুন...

আদিত্য বলিল—সকলের কাছে পরিচয় দি

দাও যদি...তোমার সঙ্গে...

জাহ্নবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। জাহ্নবী বলিল নতুন করে পরিচয়ের দরকার হবে না। মুকুল বার জানেন। মুকুল বাবুর মায়ের কাছে বা বড়ো তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেয়ের বিয়ের কি করছে তাতে মা জবাব দিলে, বিয়ের ঠিক হয়ে আ

মায়ের বোধে মায়ের ১০ তারিখে বিয়ে। মুকুল বাবুর দাখিলিগে কলকাতা, ছেলে কি করে? তাতে মা বললে, হেথেকে...এখন ভালো ভালো যা-কিছু গল্প-উপজ্ঞাস দেছে, সে সব ঐ জামাইয়েরই লেখা!

আদিত্য শুনিল; কোনো জবাব দিল না।

জাহ্নবী বলিল—শুনে ভাব লাগলো? কি ভাবা হচ্ছে?

আদিত্য বলিল—কি ভাবছি? জবাবি, এ কি সত্য মাহেবী যে ভূমি আমাকে ভালোবাসো! এত ভালোবাসো যে...আমার মতো লক্ষীছাড়া, হতভাগার গলায় ধরালা দেবে!

জাহ্নবী চারিদিকে চাহিল—তারপর কণ্ঠ হুহু করিয়া বলিল—এর পরেই আপনাদের সেই “মনোবীণা” উপজ্ঞাসের ন্যায়ক হৈমবতীর কথায় আমি জবাব দি,—“উপজ্ঞাসের মধ্যে এ সব...পাল-ভরা, কথা কোনমতে গওয়া যায়, সত্যিকার জীবনে কিন্তু জলবিচ্ছুরিত জ্বালা দরায়! উপজ্ঞাসের নারীক! যখন নায়ককে ডাকে,—প্রিয়তম... জীবনবসন্ত...তখন মন লাগে না! কিন্তু সত্যিকার জীবনে নারীক! যদি নায়ককে ঐ কথা বলে” ডাকে, নায়ক তাহলে হে-হে! করে হেসে উঠে...বলবে,—“আ, ঐ তোমার করাছো!”

আদিত্য শুনিল একাগ্র-মনে-বাগে। জাহ্নবীর কথার দি ছিল...আদিত্যর মনোবীণার তারগুলো সে কথার ঘরে ছিড়িয়া গেল।...

জাহ্নবী বলিল—আবার ভাব লাগলো না কি?

আবেগ-ভরে জাহ্নবীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া আদিত্য বলিল—সত্যি ভাব দেগেছে, জাহ্নবী! আমার এ-লোখা এখন করে ভূমি মনে রেখেছো। আমার এ-লোখা দি পুখিরি। আর কোনো লোক না পড়তো...কিন্তু পড়ে বড়ো, কিছু হয়নি, তাতেও আমার কোনো ছুঃখ পড়তো না!...আমার এ-লোখা সার্থক যে ভূমি পড়েছো এমন করে!

হাতখানা টানিয়া লইয়া জাহ্নবী বলিল—কবিত নয়, আমি বা বলছিছ...—

—বলো...

জাহ্নবী বলিল—কাল সকালে দেববার কথা...মনে আছে? বেশ্পতিবার!...সকালে এখানে চা খেতে আসবেন...সেই বিলিভী হাট পরে...বুঝলেন? ধুতি নয়।

আদিত্য বলিল—বিলিভী হাট?

—হ্যাঁ। অত টাকা দিয়ে ১০ তারিখে কেলে রাখবার কোনো মানে হয় না। কলকাতায় গিয়ে ও-হাট যে আপনি কোনো দিন পরবেন না, এ আমি দিখি গেলে বলতে পারি!...সেখানে সব চেনা লোক। এখানে ও-হাট পরে গিয়ে সেইয়ে অভ্যাস করে নিম। আমাকে খুব ইচ্ছা করছে, কাল আপনি ঐ হাট পরে আমাদের এখানে আসবেন! ঐ হাট পরেই পিকনিকে যাবেন! আদিত্য বলিল—সারাদিন ঐ পোষাক পোরে থাকবো?

—নিশ্চয়!...না হলে...

আদিত্য আর বিরক্তির করল না...বলিল,—বেশ।

বৃহস্পতিবার।

জাহ্নবীর কথামতো আদিত্য মাহেবী-সাজে তাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চিত্তাহরণ কহিলেন,—বাঙাল বই লিখলেও এ পোষাকে তোমার অঙ্গটি নেই?...তাড়ালে!

গিরিবালার বলিলেন—আচ্ছা, ও-পোষাক কে না এখন পরছে?...তাছাড়া কোনোদিন তো ওর বোঁজ-খপর মিলে না...লোহা মাথায় বহেই দিন কাটাচ্ছে!...ওদের খুব বড় কাঠের কারবার ছিল শিলিগুড়িতে...মা-বাপ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

অন্ন-বয়সে বাবা গেল... তারপর যা হয়ে থাকে! যে-সব ভৃত ছিল বাপের আশ্রিত, কারবারটাকে শুষ্টে তারা খেয়ে ফেললে! আহা!

... চিত্তাহরণ বলিলেন—শিলিগুড়িতে তোমার বাপের কাঠের কারবার! বাবার নাম?

আদিত্য বলিল—দুর্গাপাণ্ড... দুর্গাচরণ চৌধুরী।

চিত্তাহরণ স্তম্ভিত গহনে কিছুক্ষণ যেন সন্ধান করিলেন। তারপর বলিলেন—না, তিনি না।

টমসেট সারিয়া জাহ্নবী আসিয়া দেখা দিল। বলিল,—বাঃ, বিদেশীকে এখনো চা দিতে বলেনি!... বলিয়াই সে হাঁকিল—বিদেশী...

বিদেশী জবাব দিল,—নিয়ে যাচ্ছি দিমিগি... বিদেশী বলিল ট্রেতে লইয়া চায়ের কেটলি, পেয়ালা...

জাহ্নবী বলিল—ঠাকুরকে বল মোহনভোগ আর লুচি-টুচি দিয়ে যেতে। তারপর চুই আর দেবী করিশনে, তৈরী হয়ে নে। বড় টিফিন-কারিয়ারে রাগা

মাংস আর ঠাকুর যা যা দেখ, ভরে নে। কি এসেছে?

বিদেশী বলিল—হাঁ। কোঠো এসেছে।

জাহ্নবী বলিল—আর একখানা আসবে। তিনবার হলেই চলবে। আমরা হেঁটে যাবো। মার যদি চলে কষ্ট হয়, মার জন্ম একটা রিকশা; একটায় থাকবে খান্না দাবার; আর-একখানা থাকবে বালি... সঙ্গে সঙ্গে যাবে মার দরকার হচ্ছে, চড়বে।

চিত্তাহরণ বলিলেন—গোটা আমার জন্ম রিকশা রইলো!... তোমার হাতে যখন পেড়েছি, আমি, নাটানা না করে! ছাড়বে না।

জাহ্নবী বলিল—নাটানা বুঝ মানে?

চিত্তাহরণ বলিলেন—কোথায় কতদূর পর্যন্ত বন্ধ করা হবে, কে জানে!

জাহ্নবী হাসিল, হাসিয়া বলিল—সত্যি বাবা, আমি এমন তা জানি না। দাঙ্জিবিয়ের পথে-পথে বজাতি পারি, ঘুরবো... যতক্ষণ না স্বর্গ্যস্ত হয়! বাইরে যে স্বর্গ্যস্ত দেখে তবে, বাড়ী ফিরবো।

গিরিবালা বলিল—বগলা যাবে বলে বায়না করি... সে যাবে রে?

জাহ্নবী বলিল—না মা, ও বাড়ীতে থাকুক। আর এর পর যেদিন যাবে, সেদিন শুকে সঙ্গে নেবো।

চা ও লুচি-মোহনভোগের পর সারিয়া বিধি খাবার-দাবার তুলিয়া দেখাও হইল। তারপর খান্না... ফটকের বাহিরে পা দিয়াছে, সামনে মুকুল... তার পোন গীতা।

মুকুল বলিল—কোথায় চলেছেন সব?

চিত্তাহরণ বলিলেন—জাহ্নবীর শখ, সারাদিন খোঁজা বলে... হাঁলিডে।

জাহ্নবী বলিল—কালিগপণ থেকে কবে ফিরবেন—কাল রাতে। ঠাণ্ডা-পাড়ীতে করে এসেছি।

গীতা বলিল—চমৎকার লাগলো তাই জাহ্নবী।

গিরিবালা বলিলেন—সকলে ফিরেছে? মা? বাবা?

গীতা বলিল—না, বাবা-মা ফেরেনি। আমরা দুই শুধু... ভাতী ফাকা লাগছিল! কথা কবো, এমন কে নেই, মাশিমা।

জাহ্নবী বলিল মুকুলকে—যাবেন আমাদের সঙ্গে?

লুনা না... বেশ হবে।

মুকুল চাহিল গীতার পানে। গীতা বলিল—চলো মামা। সত্যি। এখানে এলুম... কদিনের এক-রাশ খপর

হাজা হয়ে আছে... জাহ্নবীকে বলবে, বলছিলো...

জাহ্নবীর মুখে আনন্দের দীপ্তি। জাহ্নবী বলিল—সত্যি? কি খপর, মুকুলবাবু?...

না, তাহলে ছাড়বো না। আহুন আমাদের সঙ্গে।

মুকুল বলিল—কখন ফেরা হবে?

জাহ্নবী বলিল—বাইরে স্বর্গ্যস্ত দেখে।

মুকুল বলিল—আমার বাড়ীতে বয়স্ক কিন্তু সব ভেবে থাকল হবে।

গীতা বলিল—এখানে কেউ নেই? কাউকে দিয়ে খপর পাঠিয়ে দাও না।

জাহ্নবী বলিল—হ্যাঁ... হ্যাঁ... হ্যাঁ।

তার আগ্রহ প্রাণের ভাবে উজ্জ্বলিত হইল!... জাহ্নবী হঠাৎ বিদেশীকে, বলিল,—মাগিনাকে বল, এখনি

মুকুল সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে খপর দিয়ে আসবে, হাজার আর দিমিগি রাতে বাড়ী ফিরবে।

বিদেশী গেল মাগিনাকে বলিতে।

মুকুলের হাত ধরিয়া জাহ্নবী টানিল, বলিল—আহুন। বলতে বলতে চলুন রান্নার কি সব খপর সংগ্রহ করে

এনেছেন!... তোমরা? মা... বাবা... আদিত্যবাবু...

কথাটা বলিয়া জাহ্নবী কিন্তু কাহারো পানে তাকাইল না; মুকুল এবং গীতাকে লইয়া পথে বাহির হইল।

তাদের পিছনে গিরিবালা। গিরিবালা বলিলেন—এখনি গাড়ীতে চড়বো না। পা খাখা করলে চড়বে! খুন!

গিরিবালা ও চিত্তাহরণের সঙ্গে চলিল আদিত্য; এবং সকলের পিছনে তিনখানা রিকশার পরিচালক-রূপে ভৃত্য বিদেশী।

পিকনিকের নামে আদিত্যর মন ঘে-ওড়ে রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, সে-ও কোথায় মিলাইয়া গেল! সে চলিয়াছে... কোনামতে যম-চালিতের মতো... সামনে

যন কুয়াশার রাশি। মনে হইতেছিল, এত দিনের যত কুয়াশা সব যেন আজ জ্বাট যন বাপে ভরিয়া চারিদিক

ঢাকিয়া অম্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বাংলার সর্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দু মিউচুয়াল

লাইফ এসিয়ারেন্স লিঃ

অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কৃতিত্বময় জনসেবার ইতিহাস

হিন্দু মিউচুয়াল হাউস

কলিকাতা।



আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আমলকীর অশেষ গুণের উল্লেখ রাখিয়াছে। ইহা জরা প্রতিরোধের অমোঘ অস্ত্র।

আমলকীর তেলও আমলকীর বহুগুণ বর্তমান।

“নীহার আমলা” সেই আমলকী তেল হইতে

প্রস্তুত অকুরিম ও মহোপকারী কেশ তৈল। মস্তিক

শীতল রাখিতে ও চুলের অকাল পকতা নিবারণ

করিতে ইহা অদ্বিতীয়। বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে

আমলকীর তেলের সহিত অশ্বাশ্ব বনজ তেজ

“নীহার আমলা”কে অধিকতর ফলপ্রসূ করা

হইয়াছে।

শ্রীশ.কেমিকেল ওয়ার্কস্

১৫ডি, ভবনাথ সেন ষ্ট্রিট, কলিকাতা

শরীরবাসু—(বাড়ীর দরজার কাছে এসে) আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

সঞ্জয়—অবনী—আমরা বাড়ী ভাড়া নিতে এসেছি।

শরীরবাসু—ওঃ। বহন।

[বসবার জায়গা ছিল না, কাজেই সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদ্যুবাণী মাথা খোঁচা দিয়েছিলেন, মুহুরের বললেন]

বিদ্যুবাণী—এরা ঘর দেখেছেন। পছন্দ হয়েছে। কাল থেকে আসবেন। ভাড়া দশটাকা স্থির হয়েছে। একটা রসিদ লিখে দাও।

শরীরবাসু—দুই। মশাইর নাম?

সঞ্জয়—শ্রীসঞ্জয় চৌধুরী।

শরীরবাসু—একটু ঠাণ্ডান আমি লিখে আনছি। [প্রস্থান। অবনী—(বিদ্যুবাণীর প্রতি) আলো নিয়ে যিনি এলেন তিনি আপনার মেয়ে না?

বিদ্যুবাণী—হ্যাঁ।

অবনী—এখনও বিয়ে হয়নি?

বিদ্যুবাণী—না বাবা। পছন্দমত পাঁজ পাওয়া যায় না, তাই এখনও বিয়ে হয়নি। তাছাড়া আমরা গরীব নাহুব। একটু ঠাণ্ডাও তোমরা! উনি আবার কেন দেবী করছেন, দেখি!

সঞ্জয়—এই যে উনি এসে পড়েছেন।

শরীরবাসু—এই নিম্ন রসিদ! কালই আসছেন?

সঞ্জয়—হ্যাঁ।

শরীরবাসু—তা' ছেলেপুলেদের খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবেন? এখানেই সব বন্দোবস্ত করতে বলি একবেলার মত, কি বলেন?

সঞ্জয়—আমার ত' ছেলেপুলে নেই। আমি একাই আসব।

শরীরবাসু—আপনি কি বিপত্রীক?

সঞ্জয়—না আমি অবিবাহিত।

শরীরবাসু—তা এ কেমন হ'ল?

অবনী—কেন? আইরুডো ছেলেকে ঘরভাড়া দিতে কি আপনার কোনও আপত্তি আছে? তাহলে আপনি টাকা ফেরত দিন, আমরা রসিদ ফেরত দিচ্ছি।

শরীরবাসু—না! সে কি ভাল হবে? ভুললোকে আবার বিপদে ফেলা! তা'র চেয়ে; কি বলে সঞ্জয়বাসু, আপনি আহুন কাল, কিন্তু অস্থবিশেষ হয় যদি তা'রসে আপনাকে সাতদিনের নোটিশেই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।

সঞ্জয়—তা' দেব! এখন তাহলে আসি। নমস্কার। শরীরবাসু—নমস্কার!

[সঞ্জয় আর অবনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গ্যাসপোর্টের তলয় দাঁড়িয়ে অবনী বলল]

অবনী—একটু থাম জয়। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।

[বাড়ীর ভেতরে এ সময় চৌচাকি শোনা গেল।]

নেপথ্যে

বিদ্যুবাণী—পোড়ারমুখী মেয়ের ছোট জান। নেই। নিম্পদ পুরুষের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলি কেন! আক্কেলে মুখগুড়ি? কেন, ইলেকট্রিকের কথা বলতে পারতুম না আমি?

অতসী—কেন? কি হয়েছে তাতে? না হুঁ মেয়ে হ'লেই জন্মেছি। কারুর সঙ্গে কথা বলতে পাখোনা তাই ব'লে?

বিদ্যুবাণী—ফের মুখের উপর চোপা! মেয়ে পিঁ, তক্তা বানিয়ে দোব!

শরীরবাসু—আহা বাবো না গো! পাড়ার লোক জড়ো করবে শেষকালে!

মঞ্চে

সঞ্জয়—কিরে? তোরা সিগারেট যে আর ধ'রেই না! অবনী—ইচ্ছে ক'রেই দেবী করছি। সব ভুলি ত সঞ্জয়! ঐজ্ঞেই অবিবাহিত ভুললোকে ঘরভাড়া দিতে কতামশয়ের আপত্তি!

সঞ্জয়—চল চল তোর মন নয় ত' আঁতাকুড়।

অবনী—তা' যা গুণী বল। কিন্তু নিতান্তই যদি থাকতে হয় ত' সাধবান থেকে। তাই! জড়িয়ে

গু! এ আবার সিধে জাল নয়—টানা পোড়েন কো!

সঞ্জয়—কি রকম?

অবনী—বরাত্তে লেখা থাকে ত' বুঝতে তোমাকে হবে!

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাস্য পর্বে। সঞ্জয়ের নতুন বাসা। রাত প্রায় দুটা। অবনী এসে দরজার কড়া নাড়ল। শব্দ গুন অতসী বেরিয়ে এসে বলল]

অতসী—কে?

অবনী—আমি অবনী। সঞ্জয় বেরিয়েছে কতক্ষণ

হ'ল? কখন ফিরবে বলতে পারেন?

অতসী—রোজ ত' এই সময়ই ফেরেন। হু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন বোধ হয়।

অবনী—বড় টায়ার্ড হয়ে পড়েছি। তা যাক, ঠেই না হয় ঘুরেই আসি।

অতসী—তার চেয়ে কেন গুর ঘরে বসে অপেক্ষা মন না?

অবনী—তা মন্দ হয় না।

[ঘরের মধ্যে ঢুকে অবনী একটা ইঁজি-চেয়ারে গা ঝুঁয়ে দিল। অতসী ঘরে ঢুকে ঘুরে একটা টিপয়ের গুল আলো জ্বলে দিল। এক কোণে একটা কুঞ্জোর ঘরে একটা কাঁচের মাস চাপা দেওয়া ছিল। অবনী ঠেঁ গিয়ে কুঞ্জোটা উপুড় ক'রে দেখল জল নেই ঠেই।]

অবনী—গুল খাওয়াতে পারেন একটু?

অতসী—এই যে আমি।

[অতসী চলে গেলে অবনী উঠে আয়নার সামনে গিয়ে চুলটা ঠিক ক'রে নিল। ফিরে এসে ইঁজিচেয়ারে

গোঁদ সঙ্গে সঙ্গেই অতসী জল নিয়ে ঘরে ঢুকল।]

অবনী—(হাত থেকে মাসটা নিয়ে) মজাবাদ! ঠিক কট দিলো। এবার ভেতরে যান। নইলে

আপনার মা আবার বকাবকি করবেন।

অতসী—বাই। (বাবার উত্তোষ করল)

অবনী—ভুলন।

অতসী—কি?

অবনী—আমাদের সঙ্গে এভাবে বেলোমেশ করবার জ্ঞে বাড়ীতে খুব বকুন। থাম—না?

অতসী—(হাসল)

অবনী—সত্যিই আমাদের অভায়। আপনাদের বাড়ীতে এসব অপছন্দ। তবে মুখিল কি জানেন? আপনাদের সঙ্গে কথা বলা যে অভায় তা' কিছুতেই মনে করতে পারিনা।

[অতসী হেসে চলে গেল। অবনী একখানা বই এনে আলোর কাছে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানা খুলে বসল। ভেতরে জড় গর্জন শোনা গেল]

নেপথ্যে

বিদ্যুবাণী—দিন দিন কচি বুকী হচ্ছে নাকি? ফিল্ম মেয়ে! বেহায়া! লজ্জা নেই এতটুকু!

মঞ্চে

অবনী—সঞ্জয়টা এলে বাচি।

নেপথ্যে

শরীরবাসু—ও ঘরে আলো জলে কেন? সঞ্জয়বাসু বেড়িয়ে ফিরেছেন?

বিদ্যুবাণী—যা কোথাকার অথোদে ছোঁড়াগুলো, রোজ রোজ এসে জটলা করবে। ভুললোক ঘরে বাস



করবে তা' নয়, দিনরাত এরকম আচ্ছা, তরু, গল্প।
আবার শুধু কি তাই? যখন তখন মেয়েটার সঙ্গে মাথা-
মাথি করছে। তুমি বাপু শীগগিরই ওকে ঘর ছেড়ে
দিতো বল।

শরৎবা—এমনি ক'রে ত' একটা ভাড়াটেও টকতে
দিলে না।

বিন্দুরাণী—কি? কি বললে?

শরৎবা—না বলছি কি, যে দেখি ভেবে চিন্তে।

মঞ্চে

[অগ্ণষ্ট অন্ধকারে অবনী চূপচাপ বসে আছে, সঞ্জয়
ঘরে চুপল]

সঞ্জয়—ঘরের মধ্যে কে রে? ও, অবনী? কতক্ষণ
এসেছিস?

অবনী—এই মিনিট ফুটি হোল।

সঞ্জয়—কেশ যা হোক। এতক্ষণ বসে আছিস?

অবনী—কি করি বল? হু' মিনিট চার মিনিট
ক'রে তুমি এত দেবী করবে কে জানত?

সঞ্জয়—যাক। বি এ্যাট হোমু নাই বয়। যতটা
পারো আরামের ব্যবস্থা ক'রে নাও।

অবনী—তা' নিচ্ছি। এখন এক কাপ চা খাওয়াও
দেক।

সঞ্জয়—নাড়া, ষ্টোভটা আলি।

[অবনী কিছুক্ষণ চূপ ক'রে বসে রইল]

সঞ্জয়—হ্যারে আজ ব্যাপার কি বলত? তোর মনটা
কি ভাল নেই?

অবনী—না।

সঞ্জয়—(ষ্টোভ জ্বালতে জ্বালতে) কেন?

অবনী—কেন জানব? আমার এ ঘরে থাকি ব'লে
বাড়ীর ভেতরে একটি মেয়েকে কত লাঞ্ছনা সহ করতে
হয় তার খবর রাখ?

সঞ্জয়—কিন্তু তাতে আমাদের ত' হাত নেই।

অবনী—কেনই বা নেই?

সঞ্জয়—[জলন্ত ষ্টোভের ওপর চায়ের কেটলিটা বসিয়ে
দিয়ে] থাকবে কি ক'রে? আমার বাইরের পোক,

অভিভাবকদের কাছে বাধা দেবার আমাদের কি অধিকার
আছে বল? তবে এক কাজ করলে হয় বটে। 'আমি
যদি এখান থেকে চলে যাই—

অবনী—তাতেই বা লাভ কি? যিনি আসবেন তাঁরে
উপলব্ধ ক'রে আবার এই রকম ব্যাপার পড়ে উঠবে।

সঞ্জয়—কি করব বল? একটা সংসারের বিধা,
সংসার, রীতি নীতি শুধু তরু ক'রে বললে দেখা যায় না,
এ কথাটা ত' বোঝ?

অবনী—তা বটে। কিন্তু একটা উপায় কি হয় না?

সঞ্জয়—ভেবে দেখি। [গরম কেটলিটা হাতে করে
টিপের কাছে আনতে আনতে সেটা ফেঁদে পড়ে
গেল] উঃ!

অবনী—কি হ'ল? দেখি দেখি, হাতটা কি খুব বেঁ
পড়ে গেছে?

[গোলমাল শুনে অতসী ঘরে চুপল।]

অতসী—(সঞ্জয়কে) কোথাও পড়ে গেছে?

সঞ্জয়—কিছু না। হাতটায় সামান্য—কিছু না।

অতসী—আসছি। একটু দাঁড়ান।

[অতসীর প্রস্থান]

নেপথ্যে

বিন্দুরাণী—কি হয়েছে রে সূরী?

অতসী—গরম জল লেগে সঞ্জয়বাবুর হাতটা পুড়ে
গেছে।

মঞ্চে

[বাটের ওপর বসে সঞ্জয় হাতটা নাড়ছে, মুক্
যন্ত্রণায় বিকৃত]

অবনী—একটু অগিল অয়েল কিনে আনক?

সঞ্জয়—না। থাক।

[অতসী এক হাতে একটা স্ট্রীটের বোতল, আর এক
হাতে এক কেটলি গরম জল নিয়ে ঘরে চুপল]

অতসী—দেখি হাতটা। [পাতলা স্নাকডাটা শ্রুতি
ভিজিয়ে মোচা জামপার ওপর দিয়ে] শুকিয়ে গেলে
অল্প অল্প ক'রে ঢেলে নেবেন। চা খাওয়া ত' হয়নি।
দাঁড়ান ক'রে দিই।

[অতসী চা করতে লাগল। সঞ্জয় তার হাত নিয়ে
বসে। অবনী মুখ চোখে অতসীকে দেখতে লাগল।]

অবনী—আমাদের কপাল ভাল যে আপনাদের হাতের
গাধা। কিন্তু আপনাদের—

অতসী—বলুন। পামলেন কেন? [হাসল] আমার
রুকি?

অবনী—তিনি আপনাকে বকতে পারেন ত'?

অতসী—পারেন বৈকি। মা মেয়েকে বকতে
পারেন না।

সঞ্জয়—কিন্তু আমাদের জন্যে আপনি কেন মিথি মিথি—
অতসী—[ছ কাপ চা ছ'জনকে দিয়ে] মিথি মিথি
বোন্টা? আপনাদের জন্মে, সেইটা? না, বকুনীটা?

[একটু থেবে] দেখুন, আমি যা' করি তা' করি।
তৌ সত্যি সত্যি কি মিথি মিথি সেকথা আপনাদের
গাধার দরকার নেই। [অবনীকে] আর আমার
গাধার কথা? সে আমি বুঝব।

নেপথ্যে

বিন্দুরাণী—অতসী!

অতসী—যাই যা!

[অতসীর প্রস্থান]

অবনী—জয়, ব্যাপার কিছু বুঝি?

সঞ্জয়—[অজমদগতভাবে] বোঝাবার আর কি আছে?
অবনী—না, বলছিলাম কি, শব্দ ক'রে বকুনী খাওয়াটা
কি ভাল?

সঞ্জয়—[যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠল] কিসের শব্দ?

অবনী—কি ভাবছ হে?

সঞ্জয়—কিছু না।

অবনী—কি হ'ল তোমার? শরীর খারাপ? মন
নয় নেই। তাহ'লে আমি এখন আসি, কি বল?

সঞ্জয়—আচ্ছা।

[খতম বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গী ক'রে অবনী চলে
গেল। সঞ্জয় উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।
টবিলের কাছে গিয়ে একখানা বই গুলে বসল।

কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠে পড়তে বাধ্য হ'ল।
তার হাতে বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল। ডাকের উপর থেকে
শ্রুতির বোতলটা নিয়ে হাতের ওপর খানিকটা শ্রুতি
ঢেলে দিল। বোতলটা রেখে দিয়ে ঘরের মাঝখানে
ফিরে আসতে যাবে এমন 'সময়' আলোর তেজটা
হঠাৎ কমে গেল।]

সঞ্জয়—[চমকে উঠে] কে?

অতসী—আমি অতসী।

সঞ্জয়—কিন্তু আলোটা ক'রিয়ে দিলেন কেন?

অতসী—মাকে বলছি আপনাদের হাত পুড়ে গেছে,
আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। আর বলছি যে
আমার—আমার শরীর ভাল নেই, আমি নিজের ঘরে
চলবুম। তাই।

সঞ্জয়—তাই কি?

অতসী—তাই আলো ক'রিয়ে দিয়েছি।

সঞ্জয়—কিন্তু কাজটা কি ভাল হ'ল? আপনাদের
মা যদি আমাদের ছ'জনকে এই অবস্থায় দেখেন
তাহ'লে—

অতসী—তাহলে এমন একটা ব্যাপার ঘটবে যা'
একবারেই বিধি নয়, সম্পূর্ণ নিশ্চিত, আর সেই ব্যাপারটা
খুব খয়ের হ'বে না—এই ত' বলবেন? আমি জানি।

কিন্তু আপনাদের হাতটা কেনম আছে? ওকি স্নাকডাটা
যে একবারে শুকিয়ে গেছে। জ্বালা করছে না?

সঞ্জয়—আইন অম্বলারে হয়ত করাই উচিত, কিন্তু
কৈ, টের পাচ্ছি না ত'!

[অতসী স্ট্রীটের বোতল থেকে সঞ্জয়ের হাতের
ওপর আরও খানিকটা স্ট্রীট ঢেলে দিল।]

এস, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স এর

জ্যাম, জেলি ও চাটনি

খাওয়ার স্বাদে ও রুচিতে বিশিষ্টতা দান করে

১০১, চকবড়িয়া রোড, ভবানীপুর।

অতী—দেখুন ত' মিছিমিছি কি কাণ্ডটা করলেন ?
চা খানেন, একথা আমাকে বললেই হ'ত।

সঞ্জয়—না বলাটাই কি ভাল হয়নি ?

অতী—ভাল হ'বার মধ্যে ত' আপনার হাত পুড়ল।
সঞ্জয়—তুচ্ছ কি হাতই পুড়ল ? আপনার হাতের চা পাওয়া গেল। তাছাড়া সেবা—

অতী—সেবা না ছাই! আচ্ছা সঞ্জয়বাবু, আপনি বড়
হোটেলের কিছা ভাল মেসে না থেকে এখানে থাকেন কেন ?

সঞ্জয়—কেন বলুন ? আপনারদের কি কোন
অসুবিধে—

অতী—না না, সেজন্তে নয়। আমি এনি জিজ্ঞাসা
করছিলাম।

সঞ্জয়—তবে শুধু। কারণ অর্থাভাব, উদ্বেগ ব্যয়
সঞ্চার। আপনাদের এখানে অল্প খরচে চলে এই জন্তে।

অতী—কিন্তু অল্প খরচে চলাতে চেষ্টা করার ত'
আপনার কোন দরকার নেই।

সঞ্জয়—নেই কেন ?

অতী—আপনি ত' গরীব নন।

সঞ্জয়—কে বললে ?

অতী—আমি জানি। আমার বাবা মা আগেই
ববর নিয়ে জেনেছেন।

সঞ্জয়—বটে! আমার সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহলের
দেখছি আর সীমা নেই।

অতী—আমায়ও প্রায় তাই! (গম্ভীর ভাবে)
চাঁটা থাক। দেখুন সঞ্জয়বাবু, একটা কথা আমি প্রায়ই
ভাবি। আমার এই প্রণের একটা সত্যি জবাব আপনি
দেবেন ?

সঞ্জয়—কথাটা কি বলুন। বৃদ্ধিতে যদি কুলোয় ত'
জবাব যা' হয় একটা দেবো বই কি।

অতী—সঞ্জয়বাবু আপনারদের দেবে আমার হিংসে
হয়।

সঞ্জয়—আমাদের কি দেখে ?

অতী—স্বাধীনতা দেখে। চলাফেরার, নিজের
জীবিকা নিজে অর্জন করার, আপনার জীবন আপন
পৃথক কাটাবার স্বাধীনতা।

সঞ্জয়—কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বত্বটুকুই আপনার নজরে
পড়ল, অথচ এর সঙ্গে যে দায়িত্বের বোঝা থাকে
সেটার কথা একবারও ভাবলেন না।

অতী—সেই কথাটাই আমি বেশী ক'রে ভাবি।
দায়িত্ব বহন করার শক্তি জাগিয়ে তোলবার জন্তেই
এই নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা দেবার প্রথা। কিন্তু এই আন্দ-
এই বিপদ থেকে আমাদের আপনারা বঞ্চিত কয়ে
কেন ? কোন্ অধিকার ?

সঞ্জয়—দেখুন, আপনি নিজেকে যতটা সফল ব'লে
মনে করেন আপনি সত্যি সত্যি হয়ত ততটা সফল ন'ন,
আর এই জন্তে আপনার বাপ-মা হয়ত আপনার
স্বাধীনতা দিতে ভয় পান।

অতী—তাহালে ত' আমার কোন ক্ষোভই থাক-
না, সঞ্জয়বাবু। সেহের বিরুদ্ধে ত' কোনও নালিশ নেই।
কিন্তু, এয়ে সম্বন্ধে। কখন কি ব্যাপার করছে সর্বদা
এই চিন্তা। আমার আত্মসম্মান বোধকে যদি টুটি
টিপে 'মারে তাহ'লে আমার অবস্থা না হয়ে
উপায় কি ?

সঞ্জয়—কিন্তু প্রতিবাদ করলে যেখানে হাঙ্গামা
বোড়েই যায়, সেখানে প্রতিবাদ করে লাভ কি ? তু'র
চেয়ে তাঁদের ইচ্ছামত চলাটাই কি ভাল নয় ?

অতী—সে পথটা যে বড় ঝাঁক। নিজেকে গোপন
রাসলে যে তাঁরা শূণ্যী হবেন না। কিন্তু এও আপনাকে
বলছি যে মেয়ে মানুষের লোকদেখানো লজ্জা দিয়ে পুষ্-
শীকার করতে আমার অভিতাবকেরা আমাকে শোকে
চাইলেও আমি তা' করতে পারব না।

সঞ্জয়—কি করবেন তাহলে ?

অতী—সময় যদি আসে ত' মূর্খের মত, অন্ধের দর
নিজেকে বিলিয়ে দেব—হিসেব কোরব না।

সঞ্জয়—তাহলে ঠকবেন। জানেন ত, অযোগ্য
বিশ্বাস করার মত বোকামি আর নেই।

অতী—যোগ্যতার মাপকাঠি ভালবাসার ক্ষে-
ত্রে।

সঞ্জয়—কিন্তু ভালবাসার অস্তিত্বও যে আশ্রয়
হিসেবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিদে যখন নিষ্ঠুর

গুণে, না গিয়ে তা'র উক্টো দিকে চলতে থাকে তখন
দরজার ভালবাসা মাথা হ'য়ে আকাশে মিলিয়ে যায়।

অতী—কিন্তু অভাবের সংসারে কি শান্তি নেই।
মৃত্যুকার ভালবাসা কি আমাদের এই সব অসুবিধের
নখালের বাইরে নিয়ে যেতে পারে না।

সঞ্জয়—আমাদের কথা বলতে পারি না। তবে
আপনার স্বামী যে দরিদ্র হ'বেনই এমন কোন কথা নেই।

[দৃশ্যটি চূপ করে রইল।] দেখুন, কিছু মনে করবেন না।
এন আপনার ভেতরের যাওয়াই উচিত নয় কি ?

অতী—হ্যাঁ। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্তে লজ্জিত।
ঐশা তা'র হয়ত প্রয়োজনই নেই। আমি চলে গেলেই
আপনি ত' গলা ছেড়ে হাসবেন।

সঞ্জয়—হাসব কেন ?

অতী—যে তামাসাটি দেখলেন তা' উপভোগ

করবেন না ?

সঞ্জয়—এ আপনি বলছেন কি ? আপনাকে উপহাস
কর আমি ?

অতী—গোড়ায় বললেই পারতেন, এ আপনি
হেলেনাহুদী ব'লে মনে করবেন—কোনও বিদ্রোহী
ব্রেকের প্রতি সহ্যহুজুতি বোধ করার মত মনের বল
আপনার নেই।

সঞ্জয়—পদ্মাস করুন, আপনার মনে কষ্ট দেবার কোন
অভিপ্রায় আমার ছিল না। তবু আমার অজান্ত
অপরাধের জন্তে আমি মাপ চাইছি। আমায় ক্ষমা
করুন।

[অতী ধীরে ধীরে বাড়ীর ভেতরে যাবার দরজার
দিকে এগোয়।] ওকি কোথায় চলেছেন ?

অতী—অনেক রাত হ'ল।

[অতী আস্তে আস্তে দরজার কপাট খুলল। গুলেই
বেল, সামনে ঝড়িয়ে তা'র বা আর বাবা। অতীকে
সেইই তা'র মা চীৎকার ক'রে তিরস্কার করতে গেলেন।
শব্দবাবু তাকে থামালেন। তারপর ঘরের মধ্যে এগিয়ে
এসে রাস্তার দিকের দরজাটা গুলে দিলেন। সেই খোলা
দরজার দিকে ঝড়িয়ে তিনি বাইরের দিকে স্নান
করাবেন।]

শব্দবাবু—(অতীকে) এই ঘর কিছা রাস্তা।
আমার বাড়ীতে নয়।

বিন্দুবাহি—পোড়ারমুখী মেয়ে! কুলে কাশী দিল—
শব্দবাবু—চুপ।

[অতী ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় চলে
গেল, সঞ্জয় এগিয়ে এসে অতীর বাবার সামনে
ধাঁড়াল।]

সঞ্জয়—ঘরটার ভাড়া আমি দিই। আমার অসুস্থতি
না নিয়ে আপনি ঘরে চুকেছেন কেন ?

শব্দবাবু—পথেও হাগবে আবার হ্যাঁগও রাস্তায় ?
জ্ঞান! বোকনা কেন ?

সঞ্জয়—আপনার মেয়ে আমার অসুস্থতি নিয়ে তবে
আমার ঘরে চুকেছেন। আপনি এমন অভদ্রতা করছেন
কেন ?

বিন্দুবাহি—ভদ্রতা শোচ্ছান উনি! চ্যাংড়া ছোড়া
কোথাকার! মেয়েটিকে ফুলে বের করবার জন্তে
টিপিটিপি চলেছে কতদিন ধ'রে—আবার চ্যাংড়া চ্যাংড়া
বুলি! (স্বামীকে) ওকে পুলিশ দাও তুমি!

শব্দবাবু—(জীকে) তুমি চুপ কর। (সঞ্জয়কে)
দেখুন আমি কেলেক্সারী করতে চাই না।

সঞ্জয়—ভাল কথা।



শব্দবাবু—আপনার কাছে ভ্রম ব্যবহার আমি পেলাম না। কিন্তু গোড়াতে আপনাকে ভুললোক বলে ধরে নিয়েছিলাম, তাই শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে ভ্রম ব্যবহারই আমি কোরব। আপনাকে আমি জানাচ্ছি আপনি শতদিন পরে এ ঘর ছেড়ে দিন।

গজয়—প্রীত হ'লেম। কিন্তু এতখানি অহুগ্রহের আবশ্যকতা নেই। আমি কাল বাদ পরঙই উঠে যাবো।

শব্দবাবু—আমার যে কৃতি আপনি করলেন তা' আর পূরণ করা চলে না। আমার বংশের মান-সন্মান সমস্ত গেল। মেয়েটার বিয়ে দিই এমন ভরসা আর রইল না।

গজয়—আপনার পারিবারিক জীবনের স্রুৎ ছুৎ সম্বন্ধে আমার কোন কৌতুহলই নেই।

শব্দবাবু—পাজী, রাঙ্গেল, ঠুপিড, নজ্জার কোথা-কার! আমাকে মাটির মাছ পেয়েছে তাই হাজার রকমের অপমান।

গজয়—দেখুন, বিনা কারণে গালি গালাজ করবার স্রুৎ হ'য়ে থাকে তা' আর কাউকে গাল দেবেন। আমি গালের বদলে গাল দিই না, মার দিই।

শব্দবাবু—আজ যদি আমার একজন উপযুক্ত ছেলে থাকত—

গজয়—সেই অমূল্য সম্পদ যখন নেই তখন আপনি না হয় দামে পড়ে একটু ভরই হ'লেন। আপনারা ততক্ষণ বৃত্তি করুন পাড়ার কোন ভুললোককে দিয়ে এই উপযুক্ত ছেলের কাজটুকু করিয়ে নেন, আমি খানিকটা ঘুরে আসি, কাজ আছে।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় দৃশ্য

[সেই রাত্রির ঘটনা। স্থান, প্রথম দৃশ্যের অঙ্গরূপ]

ল্যাপ পোলের তলায় অতী দাঁড়িয়ে আছে। হান আলোয় তার মুখের চেহারা ভাবী করণ দেখাচ্ছে। গজয় একটু ক্ষতবিক্ষেপে এসে ঢুকল। তারপরই থমকে দাঁড়াল। তারপর একটু একটু তার অতীীর কাছে

এগিয়ে, এল। অতীীর চোখ দিয়ে এক কঁটো জল গড়িয়ে পড়ল।]

গজয়—(অতীীর কাছে হাত তুলে দিয়ে) কীধ কেন অতী?

অতী—জানি না।

গজয়—আমি জানি। তোমার অপমানের আমি সাক্ষী ছিলাম বলে।

[অতী দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস নাড়ল।]

গজয়—(হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে দু হাত দিয়ে ধরে অতীীর মুখ নিজের মুখের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে) আজ তুমি এসব সহ্য কর কেন? সহ্য কর কি ক'রে?

অতী—(গুব আস্তে, প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট, মনের মধ্যে বেন ছুঁচ বিঁধে যায়) উপায় নেই বলে।

গজয়—উপায়, উপায়! উপায় আমি কোরব। তুমি চল, তুমি চল আমার সঙ্গে। আজই—এখনি।

অতী—কোথায়?

গজয়—জানি না। একটা কোথাও নিশ্চয় জুটে যাবে। কিন্তু আর নয়। চল, এখনি।

[গজয় অতীীকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। অতীী বাধা দিল।]

অতী—না।

গজয়—(হঠাৎ নিতে গিয়ে) না কেন? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

অতী—সেজ্ঞে নয়। তবে আপনার ওপর বোঝা হ'য়ে থাকতে আমার ইচ্ছে হয় না।

গজয়—(রেখে) তবে কি ইচ্ছে হয়? এইখানে পোষা পাখীর সত পাখা ঝাপটাত! অতীী তোমার শরীরকে আমি ভালবাসিনি। তার ভাল মন্দ'র কথা আমি ভাবিও না। কিন্তু তোমার মন—সে যে কথ বড় তা তুমিও জান না। তোমার সে মনকে তুমি নষ্ট করেনা। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে পড়। যেমন ক'রে হোক তুমি তোমার জীবন কাটাও—কিন্তু এই দাসের আবহাওয়ায় আর তুমি থেকো না।

অতী—আপনার এই সব কথা, এই সব কাহের কতখানি দামিয়ার তা' আপনি বুঝতে পারছেন?



শ্রীমতী সিতারা

বজ্র অতিনয়ে পারদর্শিনী। (সিনেমা টাইমস'এর সৌভাগ্য)



মৃতাশ্রমিকী সাধনা বসু



সঞ্জয়—খুব ভাল, ক'রেই পারছি। কিন্তু আমি জানি আমি শুধু উপলক্ষ্য। তোমার জীবনে এ ঘটনাই। তবু তুমি বেঁচে থাকো তা' এ পরিবর্তন একদিন ঘাগবেই। নিজের মনকে বিক্রী ক'রে যারা জীবনকে থাকড়ে ধরে থাকে তুমি তাদের মত কোনও দিন হ'তে পারনি, কোনও দিন হ'তে পারবে না। তোমাকে চলে আসতেই হ'বে। চল, অতী চল।

অতী—উপস্থিত আপনাদের সঙ্গে—তারপর কোথায় জানি না!

সঞ্জয়—হ্যাঁ।

অতী—বেশ। কিন্তু একটা কথা। যদি কখনও আমাকে আপনার বোশা ব'লে মনে হয় তা' জানাবেন। যদি এই ব্যাপারটা আপনার মৃত্যুর উত্তেজনা হয় তা' তারস্রবিধে আপনার কাছ থেকে আমি কখনও নেবো না।

সঞ্জয়—(একটু ভ্রান্ত হয়ে চেয়ে থেকে) আচ্ছা... (একটু থেমে করুণভাবে) বলতে পারলে এ কথাগুলো?

অতী—সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে পারা ভাল।

সঞ্জয়—(হেসে) আচ্ছা এইবার চলো।

অতী—বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি।

সঞ্জয়—কেন?

অতী—একখানা চিঠি লিখে আসব।

আর তোমার জিনিষ পত্র!

সঞ্জয়—ও হ্যাঁ! আমারও চেক কয়টা নিতে হ'বে চল।

[তারা বাড়ীর দিকে এগোল।]

পটক্ষেপণ

চতুর্থ দৃশ্য

[কয়েক মিনিট পরে। স্থান, প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ ঘরে কেউ নেই। সঞ্জয় এসে তাঁর ব্যাগ আর চেক বৈ নিল। অতী কাগজ কলম নিয়ে একখানা চিঠি লিখে মাকের টেবিলের উপর সেট রেখে চলে গেল। এরা ছুজনে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করবাবু আর বিদ্যাপাণি ঘরে ঢুকলেন।]

শঙ্করবাবু—কোথায় গেল বল দিকিন দুজনে?

বিদ্যাপাণি—দিনকতক ঘুরে বেড়াবে আর কি! দেখি না কি চিঠিখানা লিখে গেল। (চিঠি পড়ল) “মা বাবা-তোমাদের কথামত চলতে পারব না ব'লেই চলে যাচ্ছি। আশা করি কিছু মনে করবে না বা ছঃখিত হবে না।”—কি ভেঙ্গ! (স্বাধীকে) দেখ, ও মাগ চেয়ে চিঠি লিখলেই যে তুমি অমনি মাগ ক'রে ব'লে থাকবে তা' হ'বে না। ও চিঠি লিখুক একখানা, ছইখানা, তিনখানা, চারখানা—বেশ দিনকতক জুগুত তা'র পর আমি দেখব। এত তেজ—খুবড়ী হ'য়ে ব'সে ছিল—গতি হ'ল একটা! সে কার জেজ? আর আমাকেই—হতভাগী, হতজাড়ী—

শঙ্করবাবু—(মুখে চাপা দিয়ে) আঃ চূপ কর, চূপ কর! পটক্ষেপণ

পঞ্চম দৃশ্য

[স্থান, প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। সঞ্জয় আগে আগে আসছে। অতী পেছনে। খুব ধীরে ধীরে। অতী ল্যাম্প পোষ্টের তলায় এসে দাঁড়াল। হঠাৎ পোষ্টটোতে চেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ও হো হো ক'রে হাসতে লাগল। সঞ্জয় অবাক হয়ে এগিয়ে এল।]

অতী—হা হা হা—বাবা মা, এরা ভাবছেন কেমন আমাকে গছিয়ে দিলেন তোমার হাতে—কেমন মজা—কেমন শীকার—হা হা হা—(হঠাৎ তাঁর হাসি থেমে গেল। সঞ্জয়ের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতী বলল) সঞ্জয় তুমি সরল, তুমি শিশু, তুমি যাও—আমি তোমার সঙ্গে যাবো না—আমি যাবো না—(অতী স্বরস্বর ক'রে কঁদে ফেলল।)

সঞ্জয়—(ছু হাতে অতীকে ধ'রে) অতী, আমি জানি—তুমি আমাকে ঠকাওনি। যে যাই করুক তুমি কখনও আমাকে ঠকাতে পারবে না। ছিঃ কাঁদে না—এসো—এসো—আমার সঙ্গে।

[দুজনে বেরিয়ে গেল। অতী কান্নার অশ্রু অশ্রুধরনের ওপর পড়া পড়ল।]

যাবনিকা

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী মনীষী চিত্তামণি করের
যুদ্ধবিশুদ্ধ যুরোপের একটি অশ্রুজ্বলিত কান্টিন

ফরাসী শিল্পী ও সমাজ

দাম—জুই টাকা

বইখানি শিক্ষিত পাঠকমহলের লোভনীয়

শশধর দত্তের

দেবী ও দানব

দাম—দেড় টাকা

কেশবচন্দ্র গুপ্তের

কার দোষ ?

দাম—এক টাকা

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

মিছে কথা

দাম—এক টাকা

গীতা ঘোষের

নিজের হারায়ো খুঁজি

এক টাকা দশ আনা

সরোজকুমার নন্দীর

পৃথিবীর রসমঞ্চে

দাম—দেড় টাকা

আশাশুভ বহু অনুদিত

কুমার-সম্ভব

মূল্যবান কাগজে বহু অর্থব্যয়ে
মুদ্রিত প্রাতি-পুণ্য চিত্রে
পরিশোধিত। কালিদাসের
রসময়ির গ্রন্থের সুললিত
অনুবাদ। এখানি পাঠক
মহলেরই চিত্তাকর্ষণ করিবে।
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চিত্তামণি
কর অঙ্কিত আটখানা বহুবর্ণ
চিত্র গ্রন্থের সৌন্দর্য ও গৌরব
বৃদ্ধি করিয়াছে।

দাম—চার টাকা

প্রবেশদরকারের সমুদ্র প্রকাশিত

জীবন-সৈকত

দাম—জুই টাকা

স্বাধীননাথ সরকার অনুদিত

সত্যপ্রকাশিত

সাগর সঙ্গমে ডন নদী

য়ুরোপীয় যুগ-সাহিত্যের এক-

খানি অপূর্ণ রত্নের প্রকাশ

অনুবাদ।

দাম—নাড়ে তিন টাকা

প্রবেশদরকারের
সমুদ্র প্রকাশিত নতুন উদ্ভাস

শ্যামলীর স্বপ্ন

দাম—আড়াই টাকা

পদ্মার সহজ স্বচ্ছল অশ্রুধূল
সংসারে স্বপ্ন উঠিল কেন?
কিসের অপরাধে এবং কাহার
অপরাধে কোন দুর্বল অবি-
খ্যাসারে রক্ত পুষে বাহিরের
ধূলিকাজল তাহার জীবন আবি-
করিয়াজুলিল? পতিতা শ্রাবণী
কেমন করিয়া উত্তর পরিত্রা-
লাভ করিল, তাহার চিত্রাচিত্র
কাহিনী এ গ্রন্থের বক্তব্য নয়—
তাহার সেই পঙ্কজ জীবনে
কেমন করিয়া উজ্জল জীবনের
বীজ লুকান ছিল তাহাই
প্রবেশদরকার নিপুণ ভূমিকায়
হুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এই যুদ্ধ

দাম—দেড় টাকা

অস্ত্রের যুদ্ধের মরে বাহুধ
অস্ত্রের যুদ্ধ মরে মানবতা

শ্রীযু প্রকাশিত হইবে

প্রবেশদরকারের

নতুন বই

পায়ে হাঁটা পথ

হুম্মীল রায়ের

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপু

দাম—দেড় টাকা



“ধড়ীবাজ”

(ইংরাজি গল্পের ছায়াবল্লভে)

—শ্রীনির্মল দত্ত

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর ধারে ছিপ হাতে বসে আছি,
স্বপ্ন আর নড়ে না। এদিকে হৃদ্যদেবও মাথার উপর
গোপ রাঙ্গাচ্ছেন। কিছু হল না ভেবে এখনটা মুণ্ডে
পড়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ খোলা হ'ল, সত্যই ত সবই ত
‘কন্টোল’ হয়েছে, মৎস-রাজ্যে কি আর ‘কন্টোল’ হতে
বাঁকি আছে?

বসে বসে যখন এই সব আঙুলি কমনীয় মত, সেই
ময় পিছন দিক থেকে কে জ্বাল—“বজ্র, বলি ভাগ্যে
কিছু জুটল পুণ্ড্রন ফিরে দেখি একজন ডমলোক, আস্তে
মুখে এসে আমার পাশটোতে বসল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা
করবার পূর্বেই এর হ'ল—“খড়ি আছে? কটা বাজল?
আমার ঘড়িটা আমাকে জ্বলে গেছে।” আমার সোণার
ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে দেখে বললাম “একটা।”
মনেই সে যেন চমকে নিজে মনেই বলে উঠল—“হী টিক
বাঁজি, আর হী টিক একটায়।” তারপর আমার দিকে
জান দৃষ্টি ফেলে বসে “টিক একটা?” কৈ দেখি ঘড়িটা...
টিক মনে-আছে, এক বৎসর আগে আজকের দিনে টিক
একটার সময়ই...হৃদয় তখন অল্প পশ্চিম হেলেছেন...”
বলেই যেন অজমলম্বভাবে হঠাৎ চূপ করে গেল।

আমি প্রশ্ন করলাম—“ব্যাপার কি?”
উত্তর হ'ল—“হী টিকই, এক বৎসর আগে আজকের
দিনে আর টিক একটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে” একই খেমে
আবার বসে “একটা আশ্চর্য, অদ্ভুত ব্যাপার, এই ঘাটেই
টিক এই জায়গাটোতে ঘটেছিল—সে দিনও আমি এ-সে-
হিলাম খালি হাতে আর ফিরে গেছি পকেটে একটা

সোণার খড়ি নিয়ে। তোমাকে যখন বহু বলেছি তখন
সবই বলব একে একে, কিছু লুকাব না বা মিথ্যা বাড়িয়ে
বলব না।”

নবজন্ম বহুটা একটু দম নিয়ে হুহু করল—“সে সময়
আমি বেকার অবস্থায় বাড়ীতে বসে আছি, যদিও
আজও আমি তাই। তার পূর্বে আমি এক টিয়ার
কোম্পানীতে চাকরি করতাম...অল্প কএকদিন কাজের
পরই মনিবের সাপে হল মতের অমিল, দিলাম চাকুরী
ছেড়ে। তারপর থেকে রোজই ছিপ হাতে নদীর ধারে
বসি, আর বাড়ী ফিরি হ'ল একটা মাছ হাতে নিয়ে। আজ
হতে এক বৎসর আগে আজকের দিনে, তুমি যে
জায়গাটোতে বসে আছ তিক সেই জায়গায় আমি ছিপ
ফেলে বসে আছি। রত্নের হল তবুও একটা মাছ পেলাম
না। মনটা বড় দমে গেল; কি করি! উঠব কিনা ভাবছি।
এমন সময় হঠাৎ নারী-কণ্ঠের করুণ সঙ্গীত আমার কাছে
ভেসে এলো—মনে হল এ সেই গান—‘কাণের জিতর
দিয়া মরবে পশিলা গো আকুল করিল মোর প্রাণ’।
আর বসতে পারলাম না, উঠে পাড়িয়ে সেই মন তোলা
গানের অধিকারিণীকে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কাছে বা
দূরে কোকেও দেখতে পেলাম না। আবার নিজের
স্থানটোতে ফিরে বসে বাড়ী করে বললাম...তখনও সে গান
গেয়ে চলেছে; নিম্নমই এ কোন হৃদয়ীর কণ্ঠ
নিঃসৃত। আজও তার হু’ এক কলি মনে আছে,
জ্বলতে পারি নি” বলেই বহুটা স্বর করে গেয়ে
উঠলেন :

“ও মাঝি রে—

আজি ঝড় তুফানে চালাও তরী হসিয়ার হসিয়ার হো,
ওরে ঝড় আসে তো আনন্দ আমার তুফানে কি ডর,
জিলকিঠাটা শাখের সান্না—নদীতে যার ধর।”

হ’ তিন লাইন গেয়েই একটু থেমে আবার আরম্ভ করল—“অল্পমনস্ক হয়ে কতকক্ষণ ছিলাম জানি না, হঠাৎ জলের পানে দৃষ্টি পড়তেই দেখি কতকগুলো বুঝি উপরের দিকে উঠে আসছে, ঠিক ঐ খানটায়, যেখানে তোমার ফংনাটা চেউয়ের উপর উঠা-নামা করছে। সেই বুঝিগুলার এক একটা ফাটছে আর গানের এক একটা কথা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে... মনে হয় যেন জলের তলায় জল পরীদের জলসা সেজে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ভ্রমর হয়ে বসে আছি, একসময় দেবলাম জলের অন্ন নীচেই অসংখ্য হীরা-বসান রুপার পাতের উজ্জ্বল একটা বড় মাছের মত—খেলা করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ অম্মার ছিপের ডোরে টান পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে নারীকণ্ঠে করুণ ‘উঃ’ শব্দ। ছিপটা উপকরে তুলে নিলাম, দেখি যে তাতে এক গোছা মেঘের মত কাল বড় বড় চুল। নিজের চোথকে বিশ্বাস হল না। হাতের মধ্যে চুলগুলো তুলে নিলাম—উঃ সে কি নরম, তার মধ্যে থেকে একটা নিষ্টি গন্ধ এসে আমাকে অভিভূত করে দিল। ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি না ত? নিজের গায়ে চিমটা কেটে দেখলাম—ঐ না, গায়ে বেশ ব্যথা লাগল।

জলের উপর দৃষ্টি রেখে, পাড়ের উপর থেকে নেমে গেলাম একবারে জলের ধারে—তারপরই কি দেখলাম জানি? দেখি, অপরূপ এক নারী মূর্তি; যৌবন তার ফেটে পড়ছে, কোটিদেশ অবধি জলের উপর জেগে; আর জলের মধ্যে মৎসজগৎ। বড় বড় কুমুমের চুল কোটিদেশ ছাড়িয়ে জলের মধ্যে ডুবে আছে। শরীরের কোথাও তার আবরণ নেই, গায়ের বর্ণ যাকে বলে দুধেআলতা। মটরের মত বড় বড় মুক্তার মালা কণ্ঠ বেয়ে পরিপূর্ণ নিচোলা বক্ষের মধ্যদিয়ে নাতি পর্যন্ত নেমে আছে, ক্ষীণ কোটা বেড়ে রয়েছে মুক্তারই মেঘলা। বুঝলাম ‘মৎসজগৎ’। পাগল করা দৃষ্টি

হেমে, ‘মুহু হাসল, তারপর পাতলা টুকটুকে ঠোট দুটা মেড়ে আমার বন—’ভয় কি, আমার কাছে এসে একটু খেলা করি, দেখ কি নিষ্টি জল।—আমার বাখা যেন গুলিয়ে গেল, বলে ফেললাম—না ভা হয় না, বুঝি যে মৎসজগৎ। ফিক করে হেসে ফেল সে বন—হঠাৎ কি? আচ্ছা এক মিনিট অপেক্ষা কর আমি আসছি। এই বলেই সে জলের তলার অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমি তার ফেয়ার পথের পানে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইলাম। পরমুহুর্তে সে উঠে এলো। নিষ্টিহেসে বন—তোমার রক্ত একটা উপহার এনেছি নেবে? এই দেখ। দেখি একটা হৃদয় সোনারখড়ি। আমার বড় লোভ হল, অবশ্য ছুটার উপরই। ‘দাঁও’ বলে যেই হাত বাড়িয়েছি অমনি সে চকিতে সরে গেল আর আনিটাটা সামনে ন পেরে জলে পড়ে গেলাম। সে আমার হাতটা ধরে ফেলল। বুকের ভিতর টেনে চুমু খেয়ে বন—এই খড়ি তোমাকে দিলাম, এখন এসো একটু জলকেলি করি। উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমাকে জলের নীচে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। জলের মধ্যেও সে কি মাতাল বন হাসি আমি চোখ বুজে তাকে জাপটে ধরলাম খড়িটা কিন্তু আগেই পকেটের মধ্যে পুরেছিলাম।

কতকক্ষণ বাদে জানি না, চোখ মেলে দেখি, নদী পাড়ে আমার মাথা, আর সমস্ত দেহটা জলের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আমাকে চোখ চাইতে দেবেই, মৎসজগৎ ‘আর নাছ মেরো না, বড় কষ্ট হয়’ এই কথা বলে মুহূ হেসে ধীরে ধীরে জলের তলায় মিলিয়ে গেল। ‘আ আমি কোনও রকমে উঠে উলতে উলতে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পথে পকেটে হাত দিয়ে দেখি খড়িটা ঠিকই আছে। আমি তারপর থেকে আর মাছ ধরি না। আজ আবার এসে ছিলাম, যদি তার দেখা পাই।”

বন্ধুর একটা দীর্ঘনিখাস ফেলে চুপ করল। আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না, হো হো করে হে হে উঠলাম, বললাম—“তোমার স্বপ্নটা কিন্তু চমৎকার। বন্ধু রেখে উঠে বন—স্বপ্ন কি রকম? খড়িটা এখনও আছে, সেটা ত আর স্বপ্ন হতে পারে না। আমিই প্রথমই বলেছি, মিথ্যা বল না—এখন তোমার অভিজ্ঞ



শ্রীমতী লীলা দেশাই

আজকাল বাংলার বাহিরেই কর্মকণ্ডলাতা দেখাচ্ছেন।

(দীপালীর সৌভাজ্য)



বিবাহ কর বা না কর—আমি নাচার।" এই বলে বন্ধুর
উঠে পাড়াল, আমার হাত তুলে একটা নমস্কার করে আমার
বিছু না বলেই ধীরে ধীরে চলে গেল।

আমি চুপ করে বসে বসে উড়ে বন্ধুর কথাগুলো
নাড়াচাড়া করছিলাম, আর মনে মনে হাসছিলাম।

হঠাৎ মনে হল, তাই ত অনেক দেবী হয়ে গেছে,
দুখও পেয়েছে। তাড়াতাড়ি কটা বেজেছে দেখবার
ঘর পকেটে হাত পুরে দেখি, ঘড়ি নেই। মাথায় হাত

দিয়ে বসে পড়লাম। মনে পড়ল, বন্ধুটা ঠিক একটা
বেজেছে কিনা দেখবার জন্ত ঘড়িটা নিয়েছিল, আর
ফিরিয়ে দেয় নি। সুকল্যাম ঐ ঘড়িটা সরাবার জন্তই
তার এত ভগিতা।

এতকণে বিশ্বাস হল, বন্ধুর বা বলে গেল তার
অন্ততঃ শেষের কথাটা সত্য—“এসেছিলাম খালি হাতে
আর ফিরে গেছি পকেটে একটা সোনার ঘড়ি নিয়ে।”
আজ্ঞা ধড়িবাজ যাহোক।

কর্ণ-বিক্র
সকল প্রকার
কান পাকার
মহৌষধ

ডাক্তার এ. কে. চৌধুরীর
TRADE MARK

দ্রুত-নাশিনী
দাঁদের ততি
উৎকৃষ্ট মালম
জ্বালা যন্ত্রণা
হ্রাস না

খোস
পাড়ভাব
মাননীয় খোস
পাছদার পরিমিত
মহৌষধ

ক্রিয়-নাশিনী
মধ্য প্রকার ক্রিয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ
পৃথক জেলাপ
পরিমিত বর্ণনা
লাগে না

জগদ্রু
সিল
সকল প্রকার
জ্বরের মহৌষধ

সুতিকা-নাশিনী
দুরারোগ্য সুতিকারোগের
অত্যন্ত মহৌষধ
সোল এজেন্ট
মেসার্স এম. সি. চৌধুরী ও সাদার
৫০ নং আগস্ট স্ট্রীট, কলিকতা

স্ত্রী-অয়েন্টমেন্ট
স্ত্রী ও যক্ষ্মের
অব্যর্থ মহৌষধ



কালিন দেবী

এম. সি. চৌধুরী শ্রীর নাশিনী ক্রিয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ





সোভিয়েট কৃষির ইতিহাস

ত্রিগিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম, এ

ইয়োরোপ বা আমেরিকার মত কৃষিরায়ও কৃষি-ব্যবস্থা নানা বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে ক্রমে উন্নতি লাভ করেছে। প্রথমে কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সংস্থান করার মত ব্যবস্থাই ছিল সব দেশের কৃষিকাজের গোড়া। তারপরে ধীরে ধীরে আসে তিন-নকশা, বন্ডোবস্ত, টুকরো টুকরো জমিবিধি, জমি কেনা-বেচা প্রকৃতি নানা স্তর। কৃষিরায় আর সব দেশের মত একটু সূচক বিভিন্ন প্রদেশের সমান উন্নতি ঘটেনি। আবহাওয়া, জমির উর্বরতা, যাতায়াতের সুযোগ, বাজারের স্থিতি—এই সব নানা জিনিষের উপর নির্ভর করে চাষের উন্নতি। কৃষিরায় মত এত বড় বিরাট দেশে এক প্রদেশের সঙ্গে অল্প প্রদেশের নানা পার্থক্য। তা' ছাড়া, কৃষির কৃষি, ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সোভিয়েট বিপ্লবের আগে পর্যন্ত কৃষির কৃষি-ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নিষ্ফল ধরণের। কৃষির উত্তরাংশে বিপ্লবের আগে পর্যন্তও অনেক জায়গায় আদিম কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বনজঙ্গলে আশ্রয় দিয়ে পরিষ্কার করে সেই সব জমিতে একনাগাড়ে কয়েক বছর চাষ করা হত। তারপর সেই জমিগুলো কেলে রেখে অল্প জঙ্গল কেটে আবার নতুন চাষ শুরু হত। বনে জঙ্গলের কাঁকে কাঁকে যে সব পরিষ্কার মাঠ থাকত, সেগুলো গোচারণ জমির মত ব্যবহার করা হত।

এর পরে মধ্যপ্রাচ্য প্রচলিত হ'ল তিন-নকশা চাষের ব্যবস্থা। গ্রামের মধ্যে চাষবাসের উপযোগী জমি তিন ভাগে ভাগ করা হ'ল—এক অংশ শরৎ কালে রাই, আর শীতের গম বোনা হ'ল, অল্প আর এক

ভাগে বসন্ত গম, বীণ, মটর এই সব লাগান হ'ল। বাকী কৃষীর অংশ থাকত পড়ে। সেটা চাষ হ'ল না। গোটা গ্রামের পক্ষায়েতরা বসে স্থির করত কোন অংশে কী লাগান হবে। অষ্টাদশ শতাব্দী কৃষিরায়ও এই ব্যবস্থাই চলতি ছিল। তখনো কৃষি ব্যবস্থা আদিম সামান্যাদী প্রথাই গোটা গ্রামের স্বার্থে গ্রামের পক্ষায়েত দিয়েই পরিচালিত হত।

ক্রমে হতে লাগল দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসা। গ্রামের সঙ্গে শহরের হল ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। চাষীদের দেবল যে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা চাষ করে বাড়তি ফসল বিক্রয় বেশ ছ' পয়সা রোজগার হতে পারে। তাই তারা আগের পক্ষায়েতী বন্ডোবস্ত তুলে দিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে চাষ আবাদ শুরু করল।

চাষের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া খুবই ধারাপন্ন ফলা পেলে। অধিদারের মধ্যে যেমন এতদ্যেকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরাধিকারী দের ভেতর ভাগ হয়ে যাওয়ায় জমির আয়তন কমে থাকে—কৃষিরায়ও ঠিক তাই হ'ল। ছ'চার পুরু যেতে না যেতেই সমস্ত চাষের জমি এক ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল যে, তা থেকে কেবল ফসল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। গরীব চাষীর তখন বাধ্য হয়ে জমি বিক্রী করে বিন-মজুরে পরিণত হতে থাকল। আর সেই জমি কিনে নিয়ে একদল জোতদার শ্রেণী সৃষ্টি হ'ল কৃষিরায়। এদেরই বলা হয় “কুলাক”। কুলাক প্রথায় অল্প কিছু একটু স্থিতি হ'ল—এই বৃত্তে, তাদের একার অধীনে অনেক জমি হওয়ায় চাষ-বাসে ফলনের পরিমাণ কিছু বেড়ে গেল।

[১৩৫]

কৃষিরায় কিন্তু কুলাক সৃষ্টি ব্যবস্থায় তেমন তাড়া-হাড়াই হয় নি। ১৯১০ সালেও কৃষিরায় ছিল এক কুটীলার মতো লালস।

একদিকে বেশী জমি না থাকলে কখনই চাষের গর-বোঝার উন্নতি সম্ভব নয়। চাষের জীবজন্তু প্রতিপালনের জন্য প্রচুর খাস বিচাণী খাবার চাই। তা পাওয়া তিন-নকশা-জমি ব্যবস্থায় কখনই সম্ভব নয়। ফলে জমি যেমন দ্রুত ছোট অংশে বিভক্ত হয়েছিল, তেমনি গরবাড়ো প্রকৃতি জীবজন্তুরও অবনতি হ'ল।

এমন সময় এল যুগান্তকারী কৃষিবিপ্লব। বিপ্লবী সরকারের প্রথম আইনই হল জমিদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে সরকারের হাতে খাস করে নেওয়া। সেই সব জমি পরীষ চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

সেই সময় কৃষিরায় নানা রাজনীতিজ্ঞরা জমিফটন দখলাকে নানাবিধ থেকে দেখেছেন। কিন্তু লেনিন দখল থেকেই বলেছেন যে, কৃষি বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে শ্রমিক ও দলক সবাই একজোটে জমিদার ও কৃষি সাম্রাজ্যের নিকরের পক্ষ করবে। কিন্তু কৃষিকোষ সব এক শ্রেণীর না, কেউ গরীব, কেউ মাঝারি আবার কেউ আছে বড় বড় জোতদার শ্রেণীর। যদিও এরা সবাই জমিদারী ও রাজস্বের উচ্ছেদ চাইবে, তবু কিন্তু এরা সবলেই এক-ভাবে কৃষক-শ্রমিকদের রাষ্ট্রকে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করবে না। সর্বদ্বারা একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে হলে কুলাকদের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। বিপ্লবের প্রথম স্তরেই লেনিনের কথার মতাতা প্রমাণিত হ'ল। দরিদ্র কৃষক ও দরিদ্র মজুরের সঙ্গে জোতদারদের মধ্যে গুলো দিল। কিন্তু চাষীদের সংখ্যাই বেশী। তারা মনে প্রাণে সোভিয়েট শাসন চায়, কারণ একমাত্র সোভিয়েট শাসনেই জমিদারদের জীবন যাত্রা সহজ হতে পারে। জোতদাররা চায় শুধু নিজের স্বার্থ—যে করে লাভ বেশী করা যায়। কাজেই রাষ্ট্র সাহায্য দিতে লাগল গরীব চাষীদের।

বিপ্লবের পরে যখন ঘরোয়া ব্যাপার সব সমাধান হয় নি তখন চারদিক থেকে প্রায় সব বন্যাতান্ত্রিক রাষ্ট্র-বলো-সোভিয়েটকে আক্রমণ করে বসল। সেই দিন

[সোভিয়েট কৃষির ইতিহাস]

হচ্ছে সোভিয়েটের সবচেয়ে দুর্বল। বন্যাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সোভিয়েটের কৃষি-ব্যবস্থার নতুন কোনও উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ আশঙ্ক্যের প্রয়োজনে চাষীদের উপর নানা বাধানিয়ে আদেপ করা হয়। তখনকার ব্যবস্থাগুলোর বিশেষ নামকরণই হয় “সামরিক সাম্যবাদ” বলে। তাতে চাষীদের একাত প্রয়োজনীয় শস্তের ওপর যা কিছু বাড়তি থাকবে—তাই বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা হয়, এবং সমস্ত জমি জমা ও চাষ-বাস যুদ্ধের প্রয়োজন অহুপাতে পরিচালিত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন নীতি যাতে বহুভাবে পরিচালিত হয়—কুলাকশ্রেণী বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাষীরা যাতে বাধা দিতে না পারে তার জন্যে “গরীব চাষী সমিতি” গঠন করা হয়। সেই সমিতি শস্ত কেনা-বেচার সরকারকে সাহায্য করত।

কিন্তু বছর থাকেবের ভেতরেই দেখা গেল যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাষীরা কুলাকদের দলে না ভিড়ে গরীব চাষী ও সোভিয়েট সরকারের দলে—এসে গেছে। তখন সোভিয়েট সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাষীদের সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করার নিদর্শন দিলেন। গরীব চাষী সমিতিও তুলে দেওয়া হল।

ফলে গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীরা নিজের নিজের জমিতে সাধ্যমত আবাদ বাড়াতো থাকে। কিন্তু ততও যুদ্ধের কারণে কৃষিরায় যত শস্ত উৎপাদন হ'ত ১৯২০ সালে তার অর্ধেকও উৎপন্ন হয়নি। চারদিকে কেরোমিন তৈল, ধাতু, লবণ ইত্যাদির জন্য হাচকার পড়ে গেল। বন্যাতান্ত্রিক আক্রমণের হাত থেকে কৃষিরা যদিও ততদিনে আশ্রয়লা করতে পেরেছে—কিন্তু তখন দেখা দিল সারাদেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কাল ছাড়া। যতদিন যুদ্ধের উদ্ভাদনা ছিল ততদিন শ্রমিক ও গরীব চাষী যৎপরোনাস্তি স্বার্থভ্যাগ করেছিল। এবার তাদের দুরবস্থা মেরেন সীমা অতিক্রম করল।

সমস্ত কৃষিসাম্রাজ্যী তখন জীবন আন্দোলন চলতে থাকে। টুটুখী-প্রমুখ একদল নেতা চাচ্ছিলেন জোর করে চাষী-শ্রমিককে সাম্যবাদের পথে টেনে আনতে। তাদের দুরবস্থা দেখে গীমা অতিক্রম করল।

স্বার্থাশেষী। তাদের নিজেদের চেষ্টায় কখনই সাম্যবাদ প্রবর্তন হতে পারে না। সব সময় তাদের থাকতে হবে শ্রমিকদের ঔষে।

কিন্তু সোনিদের মত ছিল অস্ত্র রকম। তিনি বললেন যে, কোরে চারকৈকে সাম্যবাদে টেনে নিতে দেশে দেশে বিদ্রোহ দেখা দেবে। শুধু তাই নয়। তখন সোভিয়েট সরকারের এমন কর্তৃত্ব না যে, দেশব্যাপী এ বিরাট বিদ্রোহ দমন করতে পারে। সুবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে জোর করে সাম্যবাদের পথে চালু—এক পা নিখিঁয়ে এসে—দেশের মধ্যস্থিত স্বয়ংক ও জোতদারদের মতি লাগ দিয়ে চালু। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সাম্যবাদের নীতি উঠিয়ে নেওয়া হ'ল। আগের উদ্ধৃত বাজেন্দ্র-প্রশ্নও তুলে দেওয়া হল। তার বললে প্রবন্ধক চাচা হল শশু নিয়ে বাজনা দেবার প্রশ্ন। এই সাম্যবাদের পরিমাণও ছিল আগের তুলনায় অনেক কম।

‘উজ্জ্বল বাৎসর্যপুৰণ’ প্রথা তুলে বেঙারায় মথবতি
কৃষ্ণকোণ্ড সোভিটেট সরকারকে নানা বিষয়ে সাহায্য
প্রদান লাগিল। সোভিয়েট সরকার তাই বলে প্রধান
কথন আর্থিক ঋতি কপাই হাতছাড়া করেন। ব্যর্থ
বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কল, বৈদেশিক বাণিজ্য—সবই
তারের অধীনে পরিচালিত হত। কাজেই সোভিয়েট
রাজত্ব উঠতে পারার আশঙ্কা ছিল না। অথচ এই নতুন
বাহ্যায় দেশে আবার কৃষি ও শিল্পের পুনরুত্থান সম্ভব
হল।

এতেই সব সমস্যার সমাধান হ'ল না। কৃষিকুলের হাতে ক্ষমতা আসায় তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হল সন্দেহ নাই; কিন্তু তখনো তাদের ছোট ছোট জমি নিয়ে কাজ করতে হওয়ায় দেশের কৃষকসংখ্যান প্রয়োজনীয়তার অমুপাতে তারা খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারছিল না।

খুদে ব্যবসায়ীরাও শহরে একটু স্বাধীনতা পাওয়ায় সব জিনিষের দর চড়িয়ে দিচ্ছিল। সরকারের বাধা দরে কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে গ্রামের গরীব চাষীদের অবস্থা হ'ল অত্যন্ত কাহিল। তারা

বাধ্য হয়ে শহরের জিনিষ কেনা বন্ধ করে দিল।
 দেখতে দেখতে আবার গোটা দেশব্যাপী অর্ধসংকট দেখা
 দিল। যে সব জিনিষ কলকারখানায় উৎপন্ন হ'ল—তা
 বিক্রী না হলে কি করে কাজ চলবে ?

সোভিয়েট সরকার তখন খুব কড়াভাবে শাসন করেছিল। সেই সময়ে চাষীদের শুল্ক দান বন্ধে দেওয়া হলে এতদিনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পোত শেখ নতুন এরোপা নিয়ে কাজ করছিল। দিবে দিবে শিমের গাছ রোপণ হচ্ছে; শিমের তাগিদে নানা নতুন ব্যাংকাল উৎপন্ন করতে হচ্ছে। একের পর এক শহর গড়ে উঠছে কৃষিকার বুক। এদের সবার চাহিদা মেটাতে উপযুক্ত শুল্ক তখন সোভিয়েট সরকারের হয়ে ছিল না। সোভিয়েট সরকার এক বিষম বিপদে সম্মুখীন হলে।

অবস্থা বিবেচন করি ট্যাগলিন জিহলেন যে, উষ্ণতা পরিবর্তন, বা দ্রব্যপণ্ডুর স্বাভাবিক সঙ্গতিত আত্মীয় যে দেশে এই শক্তাভাব দেখা দিয়েছে তা নয়। বৈশেষিত্তির কারণ একক্রেপ্ত লোক কোনও পরিবর্তন অধ্যয়্যায়ী করনা একক্রেপ্ত বয়স্ক তার প্রতিকূলতায় করছিল। সেই স্ব্যেবাগে ক্রুদাক শ্রেণীও নিজেই দল ভাঙ্গী করছিল।

সময়েই ভয়ের কথা যে গোটা দেশের ক্রুদকলে হাতে উষ্ণ শতই ছিল না বেশী। আগেই বলা হয়েছে যে, ছোট ছোট দাগে জরি চাষ করায় বোত ফলেই পরিণাম তখন বাড়ত পারেনি। ছোট জমিতে অধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাগ সম্ভব নয়। এর জন্তে দরকা সম্ভাব্য পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা প্রস্তুত।

পিরবের পর লেনিনও এক উপায় বাতলাসেন।
কমরে সমবায়ের গুণীতে খানবার জ্বয়ে তিনি
মরে তাদের মধ্যে ফসল বিক্রয়ের জ্ঞান সমবায় প্রণার
গর্ভে রক্ষেন। সকলের জমির ফসলে এক করে ভাল
মরে বিক্রীর বন্দোবস্ত করায় কমে গিয়ে চাষীরা সমবায়ের
পির উপকারিতা বুঝতে পারল। এর পরে তাদের
করে প্রের্ষন করতে গেল—সমবায় প্রণার চাষ
পিরকে যেমন বুঝিয়ে শুনিবে কৃষকের সমবায় ক্ষেত্রে
করবে হাঙ্গ, বস্তু দিকে মোড়িয়ে সরকারকেও তেমন
করবে হাঙ্গ জমিতে ভাল করে চাষাবাদ করে
গাছিত পুরিচালিত ক্ষেত্রে উপর চাষীদের প্রদা
করা হবে। প্রত্যেক সমবায়-পথী চাষীর দলকে
পিরকে যথাগাছ সাহায্যও করতে হবে।

কয়েক বছরের অবিচ্ছিন্ন প্রচাদের ও সমন্বয় প্রথার
ফলস্বরূপ ফলে কৃষকেরা ধীরে ধীরে সাক্ষর হয়ে সমন্বয়
প্রথা চাষ করতে এগিয়ে আসে। চাষীরা যতই
ধীরে প্রথায় কাজ করতে থাকে ততই কৃষিকার্য দেশে
সামগ্রিকভাবে হলে যায়। ১৯০৬ সালে চাষীদের শতকরা
৩৭ ভাগই সমন্বয় পদ্ধতিতে চাষ করতে থাকে।
কয়েক চাষের জমীর পরিমাণ ছিল চিরিষ কোটি চিরিষ
কড়র! এখনও সাড়ানার মূলে ছিল কিন্তু চাষীদের
সাক্ষর হয়ে গিয়ে। জোর করে শোভিত সমন্বয়
প্রথা চালু করে না।

নবাব পঞ্চদশে চানু খামার পরিচালনের ভিত্তি
কালেব অধুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া। যে
রূকম নিজের জমিজমা, হাল পর নিয়ে তাতে
নিয়ে পারে। এক এক খামারের ততটা দরকার
জমি সোয়েডেট সরকার থেকে চিরদিনের জগো
দিয়ে দেওয়া হয়। দরকার হলে কলের লাঙ্গল
রাই থেকে ধার দেওয়া হয়। একদিনে নির্দিষ্ট
বিগ জমি চাবাকে একটা 'বান' ধরা হয়। সেই
বান মাপে প্রত্যেক চাষীকে তার প্রাপ্য ভাগ করে
দেয়া হয়।

সবায় খামারের কর্তারা ঠিক করেন কি হারে
ঠিক প্রাপ্য দেওয়া যাবে। হয়তো ঠিক হল যে, পাঁচ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে

১৫৫ কুম্ভ কালি



বসায়নামের অতি বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্যে
ও উৎসাহে ব্যবহৃত অংশগুলির ফলে
“ক” ইচ্ছা কালি আশ্বাদের ফলটি
পেনে বাহারের দ্বারা বহু আশ্বাদে ও অর্থ
ব্যায়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চম্পোর
ব্যবহারে বাহারে মূল্যবান ফলটি পেনে
কোনও বসমে অসম্মান করিয়া লেখা চলে
না যিকি এবং কালি বৈজ্ঞানিক,
প্রতিষ্ঠা ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদি
ইচ্ছা সতর্ক-পুষ্টি রানি “ক”
ইচ্ছা প্রস্তুত করা হইয়াছে।



* ତିବେ ମନ୍ତ୍ରିଚା ଧରେ ତା

- * ଅବାର୍ଦ୍ଧ ଗତିରେ ଲେଖା ହୁଏ
- * ଉତ୍ତରାସି ଖଣ୍ଡେ ଲା

বালিগঞ্জ কেমিক্যাল ওয়ার্কস
বালিগঞ্জ : কলিকাতা

একর চাষ করাই হবে প্রাপ্যের মানসপু। যে দশ একর জমি চষতে পারবে সে পাবে দুই গুণ। কিংবা হয়তো দশ সের গম ভালোও মানে হতে পারে। চাষীরা অনেক সময় বুদ্ধি খাটিয়ে দুই দিনের কাজ একদিনেই করতে পারে। তাই বলে আর প্রাপ্য কিছু কমে না। সে দুই দিনেরই পোষব পাবে। এই ভাবে সারা বছরের হিসাব রাখা হয়। বছরের শেষে প্রত্যেক খামারের উৎপাদনের হিসাব হয়। তখনই সব চাষীদের পাতনা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

*মনও হতে পারে যে, কোনও চাষীর হয়তো কাজে মন লাগছে না। সে কাজে নাও যেতে পারে। তবে এসব জিনিসের প্রশ্ন দেওয়া হয় না। কারণ শুল্কলা বজায় না থাকলে কাজে এগোনো কঠিন। কোন সভা যি বার বার এইভাবে গাফিলতী করে তবে সমিতি থেকে তার নাম বাতিল করে দেবার বন্দোবস্ত করা হতে পারে। তখন তার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বৃকিয়ে দেওয়া হয়। সে যতটা মূলধন দিয়েছিল সবই ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাকে।

বহু চাষী মিলে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করায় এখন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শ্রম হ্রাস হইয়াছে। সোভিয়েট সরকারের আমলে বহু দূরের গ্রামেও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে কাজ হচ্ছে। কাজেই চাষীদের শারীরিক পরিশ্রম খুব কমে গেছে। এখন সোভিয়েট রাষ্ট্রের চারিদিকে জাবের মত নানা যন্ত্রপাতি ও কলের লাঙ্গলের খাট হওয়ায় চাষীদের পক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার খুব সহজ ও সস্তা হয়েছে। ১৯৩৬ সালে ৬৩৬৬টি শক্তি-কেন্দ্রে প্রায় ৩২৪,০০০ কলের লাঙ্গল, ১২৭,০০০ একই-সঙ্গে-কাটাई-ও-মাড়াই-এর যন্ত্র (Combined harvester) ও ২২,০০০ ভারী মোটর লরী থাকত। অনেক সময় বড় বড় সমবায় খামারের নিজেদেরই এই সব জিনিস থাকে।

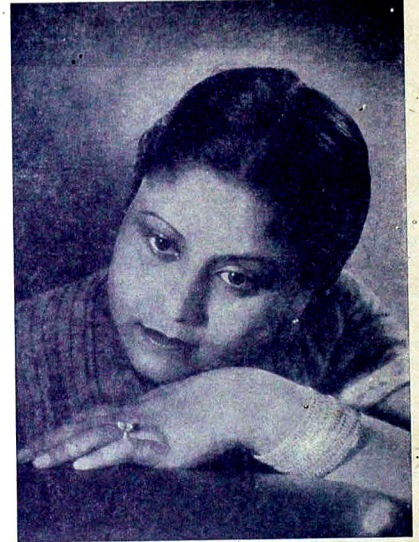
সোভিয়েট দেশে বর্তমানে ২,৪০,০০০ সমবায়-খামার আছে। প্রত্যেকটিতেই যান্ত্রিক যন্ত্র: একজন করে কৃষিবিদ, পশুবিদ, ও পণ্ডিতিকর থাকতে পারে তারই চেষ্টা চলছে। এরা খামারের পক্ষিপালককে উৎপাদন সহজে নানা প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। কি করে পুষ্কপাল নিবারণ করা যায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রজনন প্রসার করা যায়, অল্পে অল্প ভেড়া চরিকিসা করা যায়, এ সমস্ত বিষয়ে তাঁদের বুদ্ধিই খাটে। ২০,০০০ বড় খামারের প্রত্যেকেরই নিজস্ব উৎকৃষ্ট গবেষণাগার আছে। এদেরও উপরে গোটা সোভিয়েটে ৫০৭টি আদর্শ খামার ও ৩৬৭টি গবেষণাগার আছে। এছাড়াও ৯০টি

কৃষি-গবেষণাগার আছে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ১৯৩৯ সালে প্রায় ১৪,০০০ বিজ্ঞানী কৃষি গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন।

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ কৃষি গবেষণাগার হচ্ছে 'লেনিন কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র'। এর পরিচালক হচ্ছেন—এন, আই ভাসিলভ—এবং এর নামেই এই কেন্দ্রটিও পরিচিত। এখানে প্রায় ৩০,০০০ বকবো গয়ের মনুনা আছে। ভেড়াসার কৃষি বিজ্ঞানী লাইসেরো এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে শীতের গম বসন্তে ফলিতে পারেন। এমন কি, সারা বৎসর ধরে যেন গম ফলতে পারে তেমন আবিষ্কারও সোভিয়েটের বিজ্ঞানী করেছেন। এখন তারা শীতের জমার বরফের দেশে চাষবাগ করছেন। বর্তমান যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। জার্মানী ইউক্রেন দখল করলেও যে আজ সোভিয়েট অনাধারে আত্মসমর্পণ করেনি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সোভিয়েট কৃষির সাফল্য।

জাবের আমলের অজানাতা ও দারিদ্র্যের বদলে আর্থ সোভিয়েট চাষী হয়েছে শিক্ষিত ও মাহুষের মত মাহুষ। স্বর্ণ ও অলঙ্কারে এম, বি, সরকার এও মগ্ন। যুদ্ধের বাজারে অজ্ঞাত জিনিসের মত সোণার দাম হু বোড়ে গিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের আগ্রহ হ'চ্ছে এখন অজ্ঞাত বিলাস সামগ্রীর জ্ঞাত অর্থব্যয় না করে স্বর্ণ অলঙ্কারেই অর্থব্যয়—যথা, অর্থ সঞ্চয় করা। এম কথা হচ্ছে পাকা সোণা অপেক্ষা গিনিসোণার অল্পার চাহিদা কেন বেশী। তার কারণ গিনি সোণার অলঙ্কার টেকসই হয় এবং স্বল্প কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং চাকচিক্যও এর বেশী হয়। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বিলতেও স্বর্ণমুদ্রা গিনি প্রচলিত ছিল। পরে সোণার সঙ্গে নির্ভরিত বাদ মিশিয়ে এই গিনিসোণা তৈরী হ'ত। এখন বিলাতী মুদ্রা অল্পকল্প বিপ্লি সোণাকে গিনিসোণা বলা হয়। কিন্তু বাজারে সোণা দানের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জুয়েলারি' বাজারে পাকা সোণা ব'লে প্রচলিত সোণার সঙ্গে তামা মিশিয়ে গিনিসোণা তৈরী করে। এই সোণাকে ব'লে 'মেল গিনি'। কেহ কেহ ইহাকে আল গিনি ব'লে চালিয়ে থাকেন। পাকা সোণার দানের কম বেশী সঙ্গে ইহার মূল্যের কম বেশী হয়। অল্পপাত দি থাকিলে তাহা গাট 'মেল গিনি'। এ বিষয়ে বাসোয়া জুবিয়াত জুয়েলারি' এম, বি, সরকার এও মগ্ন ক্রেতাগণকে স্বপরাশর দিতে পারেন। কারণ ইহায়ে প্রস্তুত অলঙ্কার অতিশয় নির্ভরযোগ্য।

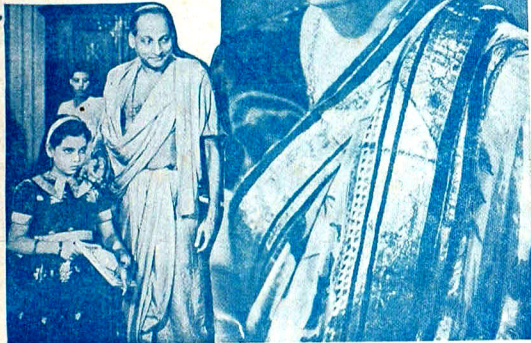
খুব থেকে দূরে' চিত্রে এর অনবদ্য
জিনিসে সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছেন।



শ্রীমতী মলিনা দেবী



নিউথিয়েটাসের আখ্যানী বাঙালী ছবি
“ছইপুরুষ” চিত্রে অহিন্দ্র ও
লতিকা রায়ানাজি
পরিচালনায়—স্ববোধ মিত্র



চলতি ছবির সমালোচনা

শহর থেকে দূরে—ইষ্টার্ন টকিজের দ্বিতীয় বাংলা
বি “শহর থেকে দূরে” গত ২৪শে ডিসেম্বর থেকে রূপ-
রাগিতে চলছে। স্বীয় কাহিনীকে অবলম্বন করে ছবিখানি
পরিচালনা করেছেন শৈলজানন্দ। গানে শ্রুত সংযোজন
করেছেন সুবল দাসগুপ্ত। আলোকচিত্র গ্রহণ ও শব্দ
গ্রহণের ভার যথাক্রমে অজয় কর ও জে. ডি. ইরাণীর
গপর ছিল। ছবির বিভিন্নার্শে মলিনা, রেণুকা, অজয়,
রাগ, নরেশ মিত্র, ফনি রায় প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।
বীরভূম জেলায় ছোট একটি গ্রাম, নাম তার রূপসা।
এই রূপসা গ্রামের অধিবাসীদের দৈনিক জীবনের ঘটনা-
লীকে কেন্দ্র করেই ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। গ্রামে
না আছে পোষ্টাফিস, না আছে ইন্ডাল, থাকবার মধ্যে
বাড়ি কেবল ডিক্টেটবোর্ডের ডাক্তারখানা। এই রকম
এক গ্রামে বাস করে রতন নামে একটি লোক—আর এই
ভরই হচ্ছে গল্পের নায়ক। রতনের স্বভাব একটু অদ্ভুত
সময়। সে একটু নেশা করে কিন্তু সাধারণ গ্রামবাসীর
সর কলহস্ত্রিয় নয়, সে চায় গ্রামের সকলকে মনোগ্রাণ
দিয়ে ভালবাসতে আর সর্গদাই সে থাকতে চায় শান্তিতে
যদি সকলের চেয়ে অশান্তি তার নিজের ঘরে। তার
সোনা ছেলে না হওয়ায় সর্গদাই তার স্ত্রী ও তার মধ্যে
গাড়া বিবাদ হওয়ায় তার মনে কোন শান্তি থাকেনা।
এই সময় গ্রামের ডাক্তারখানার আসে এক নতুন ডাক্তার,
সর থাকবার ও বাওয়ার ব্যবস্থা হয় ডাক্তারখানার
রাসিওপ্যাথির সাধক গোবুল কপ্পাউগারের বাড়ী।
ডাক্তারের বন্ধু হয় রতনের সঙ্গে ও কপ্পাউগারের মেয়ে
মহার সঙ্গে। কপ্পাউগারের ইচ্ছা জম্মার সঙ্গে ডাক্তারের
দিয়ে দেয়, কিন্তু যখন যে স্তনল যে ডাক্তারের হোমিও-
প্যাথিতে বিশ্বাস নেই তখন সে হয় বিবাহ দিতে অস্বীকারী!

এদিকে রতনের মা বংশলোপের ভয়ে রতনের সঙ্গে
বিয়ের ব্যবস্থা করে জম্মার। কিন্তু সেখানেও বাধেলা এক
গোলমাল। ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট বড় জম্মার
লোক।—মুগ্ধে সর্গদাই ঠাকুরের নাম করেন, কিন্তু মনে
মনে সর্গদাই মতলব আটেন। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে
শিবুর সঙ্গে জম্মার বিবাহ দিতে মনস্থ করেন এবং তার জন্ম
তিনি কপ্পাউগারের কাছে গিয়ে ডাক্তার ও জম্মার নামে
নানা কুৎসা রটান। এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে একজোট হয়ে
ডাক্তারকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তারের
প্রকৃত বন্ধু রতন এসে পাড়ায় তার বিপদে—তবুও
ডাক্তারকে চলে যেতে হয় গা থেকে।

এমনি করে রতন যখন পতের ভাবনা তারছে
তখন তার নিজের বাড়ীতে অশান্তির আশ্রয় জলছে।
রতনের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে শান্তী-বৌএর ঝগড়া
এসে দাঁড়াল শেষ পর্য্যায়। শান্তীকী বঙ্গদেশে গৃহত্যাগ
আর বৌ নদীতে গিয়ে স্বাঁপ বিল। ওদিকে প্রেসিডেন্ট
জম্মার সঙ্গে শিবুর বিয়ে পাকাপাকি করে ফেলল।
রতন পড়ে মুগ্ধিল—বিয়ের দিন রাতে নানা উপায়ে
জম্মাকে সে সরিয়ে ফেলল এবং জম্মার বদলে কদে
শান্তিমে হাজির করল গ্রামের একটা ছেলেকে।
জম্মাকে বাড়ীতে আনবার পরই ফিরে আসে তার
গৃহত্যাগী মা। মা ভাবেন রতনই বোধহয় জম্মাকে
বিয়ে করেছে। মাকে জম্মাকে পাহারা দিতে বলে
রতন যায় ডাক্তারের বৌকে। কিন্তু ডাক্তার তখন
জল থেকে উদ্ধার করা রতনের স্ত্রীর টিকিৎসাতেই
বাস্ত। রতনের জেদেজ্বলিত ডাক্তারকে চলে আসতে
হয়।

রতন যখন চলে আসে তখন তার স্ত্রী স্তনল
যে রতন এসেছিল। রতনের নাম শুনে তার স্ত্রী

তাড়াতাড়ি চলে আসে তার বাড়ীতে। গাড়ীতে আসতে আসতে ডাক্তারের কাছে রতন শোনে যে তার রুগী সন্তান-সম্ভবা। বাড়ী এসে দেখে সে বাড়ীতে বিবাহ অহুতান চলছে। সে ভাবে, বোধহয় জয়ার সঙ্গে রতনের বিয়ে। কিন্তু দেখল যে তা' নয়। জয়ার সঙ্গে ডাক্তারের বিয়ে। জয়কে সে অন্নহায় দেখে ডাক্তার বলল এইত তার রুগী। তারপর সকলে জানল যে রতনের এবার পুত্র হবে এবং তাদের সংসারে হাসি ফুটবে। তারপর আসে বিদায়ের পালা। জয়কে



জহর গাঙ্গুলী

সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার শহরের উদ্দেশ্যে বিদায় নিল। এইখানেই হয় ছবির পরিসমাপ্তি।

ছবিখানি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হ'লে এখানেই বলাতে হয় যে দর্শকের চোখ যখন একদেয়ে শহরের ছবি দেখে পরিশ্রান্ত তখন এই রকম গ্রাম্য-জীবনের ছবি সত্যই আকর্ষণ এবং সেই জন্তই দর্শক-মহল ছবিখানিকে এত সাদরে গ্রহণ করেছে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সংলাপ রচনার গুণে ছবিখানির movement খুবই জড়ত হয়েছে। এইখানি শৈলজ্ঞান-দেবের পরিচালক জীবনের তৃতীয় ছবি। অপরাপর

ছবির মত এখানিও একখানি সুন্দর ছবি। এই ছবি মধ্য দিয়ে তিনি খুব হালকা রস পরিবেশন করেছেন। গানের স্বর সংযোজনায় মন্দ নয়। আলোক চিত্রগ্রহণও শব্দগ্রহণ ভালই।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হ'লে গ্রাম্য-জীবনকে সুন্দররূপে সূচিয়ে তোলার জন্ত জহর গাঙ্গুলীর নামই প্রথম উল্লেখ করিতে হয়। জহর গাঙ্গুলীর পক্ষেই অভিনয়ের জন্ত প্রশংসা দাবী করিতে পারেন রেজুকা রায়। জয়ার ভূমিকাকে তিনি বেশ সুন্দর রূপেই সূচিয়ে তুলেছেন। অপরাপর ভূমিকায় বলিনা, ধীরাজ, নরেশ মিত্র ও ফণি রায় ভালই। বিশেষ করে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের ভূমিকায় ফণি রায়ের অভিনয় অত্যন্ত মার্জিত হয়েছে। অজান্ত ভূমিকা চলনসই।

ছবির বিশেষ কোন খুঁতই আমাদের নজরে পড়েনি এবং আশা করি ছবিখানি এ বছরে শ্রেষ্ঠ ছবির তালিকায় একটি বিশেষ স্থান অর্জন করবে।

জ্যোতিতে ফরিয়াদ—রঞ্জিত মুভিটোনের নতুন ছবি "ফরিয়াদ" ২৫শে ডিসেম্বর হইতে জ্যোতি সিনেমায় দেখান হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন জয়দেব শেখারী। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন ঈশ্বরলাল ও শামিম। অপরাপর ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন সুবারক, রাম শুকল, নুরজাহান, রাজকুমারী শুক্লা, মৃত্যিমণী অলকনন্দা প্রমুখ। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন খেমটাদ প্রকাশ।

ফুডিওর কথা

চিত্ররূপা লিঃ—দেবকী বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালক অপূর্ণ মিত্র এঁদের শোভাযাত্রী চিত্র "সঙ্গীত" কাজ আবার শুরু করেছেন। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শৈলজ্ঞান ও ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী। একটি বিশিষ্ট চরিত্র অঙ্কনের জন্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মনোনীত হয়েছেন।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ—এঁদের নতুন হিন্দি ছবি "ভ্যাপস" বোম্বাই শহরে মুক্তিলাভ করেছে এবং

গানের দর্শক মহল ছবিখানিকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

পরিচালক সুরবীধ মিত্র বোম্বাই থেকে ফিরে এসে দুয়ার "দুই পুরুষের" কাজ নিয়মিতভাবে শুরু করেছেন। সঙ্গীতের ভূমিকায় রূপ দেওয়ার জন্ত হুনসাই দেবী মনোনীত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠাংশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী। অপরাপর ভূমিকায় চন্দ্রাবতী, ধীর, ছবি, নরেশ, নবাগতা অভিনেত্রী ললিতা চান্দার্কি প্রমুখ অভিনয় করছেন। গানের স্বর দিচ্ছেন গণ মল্লিক।

নিউ সেপ্টুরী প্রোডাকশন—প্রসিদ্ধ অভিনেতা দ্বিবিধাঙ্গ এঁদের তরফ থেকে শ্রীভারতলক্ষী ইন্ডিতে একটি বাঙলা ছবি পরিচালনা করছেন। ছবি বিখ্যাতের পরিচালক জীবনের ইহাই প্রথম হাতে বাড়ি। ছবির

গল্প লিখেছেন প্রেমেন মিত্র এবং গানের স্বর দেওয়ার জন্ত নিযুক্ত হয়েছেন দুয়ার শতীন দেববন্দী। ছবিখানির আপাততঃ নামকরণ হয়েছে "ভেদাভেদ"। বিভিন্ন পুরুষ ভূমিকায় অভিনয় করার জন্ত শৈলেন চৌধুরী, পরেশ ব্যানার্জি (দশ বাজে চিত্রের), রবি রায়, হাবি লাহা প্রমুখ মনোনীত হয়েছেন। স্ত্রী ভূমিকাও আশা করা যেতে পারে যে সুন্দর অভিনেত্রীর দ্বারাই গঠিত হবে।

হামারী বাত—মানসটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্স পরিবেশনায় বয়ে টকিজের নতুন চিত্র "হামারী বাত"

শীঘ্রই নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে। বয়ে টকিজের অপরাপর চিত্রের মত এই ছবির সঙ্গীতও একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। অনেকদিন পরে দেবিকারণীকে এই ছবির নারিকার ভূমিকায় দেখা যাবে। নায়কের ভূমিকায়

বড়দিনের অভাবনীয় আকর্ষণ।

সঙ্গীত ও সঙ্গীতবেদনে পূর্ণ

রঞ্জিত মুভিটোনের

ফরিয়াদ

শ্রেষ্ঠাংশে ঈশ্বরলাল, শামিম, সুবারক,

নুরজাহান ও রামা শুক্লা

পরিচালক : জয়দেব শেখারী

শুভমুখি শনিবার, ২৫শে ডিসেম্বর

জ্যোতি সিনেমায়

পরিবেশক :

মানসটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

৩২এ, দক্ষিণাঙ্গা স্ট্রিট, কলিকাতা

অভিনয় করেছেন অরাজক এবং অপরাধের ঝাঁপ। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন তাঁরা! হচ্ছেন শানওয়াঙ্ক, ডেভিড, প্রভা, মনতাজ আলী, হুসিয়া ও রাজকুমারী তুলা।

রূপত্ৰী লিমিটেড—তিনা যাচ্ছে হুকুমার দাশগুপ্ত শীঘ্রই এদের একখানি নতুন বাঙলা ছবি পরিচালনা করবেন।

উদয়ের পথে—বিসল রায়ের পরিচালনায় নিউ-থিয়েটারের বাঙলাছবি ‘উদয়ের পথের’ কাজ স্নর্গভাবে এগিয়ে চলছে। দ্বন্দীর কন্ঠার ভূমিকায় বিনতা বহু নামে একটি নতুন অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন জ্যোতিষ্ময় রায়। পূর্ণের জুলবশতঃ ছবিখানি ‘পূর্ণাচল’ নামে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

পোষাপুত্র—প্রমোদ গাঙ্গুলীর অসহ্যতার জন্ত গত এক সপ্তাহ ছবির স্রুটি বন্ধ থাকায় ছবিখানি বড়দিনের আসরে চিত্রপ্রিয় দর্শকের সম্মানে বাজির হতে পারেনি। এই সপ্তাহ থেকে ‘সত্যী’ দাশগুপ্তের পরিচালনায় ‘পোষাপুত্রের’ কাজ পুনরায় শুরু হয়েছে। পরিচালক মহাশয় যাতে ছবিখানি এইমাসের মধ্যে শেষ হয় তার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করছেন। চরিত্রগুলি এইরূপ:— ভাস্কর্য—শিশির ভাট্টা, রজনীকান্ত—শৈলেন চৌধুরী, মেম—সত্যী সিংহ, কটকটকা—জহর গাঙ্গুলী, যোগেশ—বেচু সিংহ, যোগেন—ইন্দু মুখার্জি, পাণ্ডা—ক্ষিরায়, নিবাজি—বেহুকা, শান্তি—সাক্ষি, সিদ্ধেশ্বরী—প্রভা, বরমজী—সেবালী প্রভৃতি।

কলিকাতা নতুন চিত্রগৃহ—বর্তমানে কলিকাতাগৃহ ৪০টি চিত্রগৃহ আছে। তার ওপর আরও দু’টি নতুন চিত্রগৃহ হ’ল। একটি প্যারামাউন্ট সিনেমা ও অপরটি নাট্যভারতীর স্বলে দীপক সিনেমা। দ্বিতীয়াট ভিল্লু পিকচারের দীপটাক কলিকটার দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এখানে কেবল হিন্দী ছবিই দেখান হবে বলে শুনা যাচ্ছে।

ইন্দুপুত্রী ষ্টুডিও লিঃ—প্রবীণ পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের বাঙলাছবি ‘কলঙ্কিনী’র কাজ শেষ করছেন এবং আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই ইনি এঁদের হয়ে

একখানি প্রচার-মূলক চিত্রের কাজ আরম্ভ করবেন ‘কলঙ্কিনী’ চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকার অর্ধাংশ, জহর, সাক্ষি, পূর্ণিমা প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

মেঘদূত বাধা—গতবারে আমরা জানিয়েছিলাম যে প্রবীণ চিত্র-পরিচালক দেবকী বসু ইন্দুপুত্রী ষ্টুডিও ‘মেঘদূত’র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। কিন্তু কিঞ্চি বন্টনে হওয়ায় তাঁর নতুন ছবির জন্ত কিঞ্চি না পাওয়ায় ‘নেতৃত্ব’এর কাজ আপাতত বন্ধ আছে। তবে আর আশা করি তিনি শীঘ্রই কিঞ্চি পাবেন এবং তাঁর নতুন ছবির কাজ পূর্ণোচ্চমেই আরম্ভ করবেন।

পরলোকে অজয় ভট্টাচার্য

চিত্র-পরিচালক ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য গুরুত্বপূর্ণ সন্ধ্যায় ৫৫, ডোভার সেনস্‌ নিম্ন বাসভূমিতে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। অজয়বাবু কিছুদিন বাবু রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে ভুগিয়াছিলেন এবং ঘটনার দিনে অকস্মৎ প্রকৃত্যে কিম্বা বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীমত ভট্টাচার্য্য ভিত্তিয়ার অস্বর্গত ভ্রাতৃপন্থির মহত্বপূর্ণ স্থানগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অজয়বাবু গীতাভিলাষী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৯১৯ সালে বাঙ্গালার প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাঠ্যাবস্থা হইতে তাঁহার কাব্যাহরণ প্রবল ছিল। প্রথম তাঁহার হিন্দী ছবি ‘কলঙ্কিনী’র কাব্যার্থে ‘কবাইত-ই-হাফিজ’ প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি সঙ্গীত রচনা করেন। প্রথম ‘ও পিয়াসী, লাইলী আমার’ গানটি তাঁহার সঙ্গীত। ইহার পর হইতে পর পর কতকগুলি সঙ্গীত পুস্তক, উপভাস ও চিত্রলগ্নপত্রের উপভাস প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে ‘যেথা নাই প্রেম’ (উপভাস), ‘যে ব্যাক’ নামক পুস্তকের অসহ্যার গুণ, সুরপরা (গানগানের বই), ‘আজি আমারই কথা’ (সঙ্গীত পুস্তিকা), ‘রাতের রূপকথা’ (কবিতার বই), ‘শুকসারী’ (সঙ্গীত পুস্তক), ‘সৈনিক ও অজ্ঞাত কবিতার’ (শেষ বিতার বই) নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি কুনিষ্ঠা ভিত্তিকারি কলেজে এক বৎসরের মধ্য অধ্যাপকের কার্য করেন। তৎপর তিনি কলিকাতার দ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ ও গীতিকার হিসাবে বিশেষ ব্যক্তি লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বাণীপক্ষে তীর্থপতি চিঠিটিউশনে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি বাঙ্গলা চিত্রলগ্নপত্রিতে বিভিন্ন চিত্রের সঙ্গীত রচয়িতা ও গল্পলেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং ১৯৪১ সালে শিক্ষকের কার্য হইতে বহরার গ্রহণ করিয়া চিত্রলগ্নপত্রিতে যোগদান করেন।

তিনি বাঙ্গলা চিত্র ‘অশোক’ ও ‘ছদ্মবেশী’ (মুক্তি প্রতীকিত) পরিচালনা করেন। সম্ভ্রুতি মতিমহল থিয়েটার হইতে ‘ঐতর্য্য’ চিত্র তাঁহার পরিচালনায় সঙ্গীত হইবার কাজ ছিল। ‘মায়ের প্রাণ’, ‘কবি কাহিনী’ অবলম্বনে তোলা হইয়াছিল। নাট্যলগ্নপত্রেও সঙ্গীত রচয়িতারূপে তাঁহার অবদান যথেষ্ট। রেডিও ও বেকিং জগতেও তাঁহার অবদান প্রচুর। তাঁহার মৃত্যুতে একজন জনপ্রিয় গীতিকারের তিরোধান ঘটিল।

মৃত্যুকালে শ্রীমত ভট্টাচার্য্য স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমত বিজয় ভট্টাচার্য্য (চাকার দরকারী বিভাগস্বরের প্রধান শিক্ষক) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহিত্যিক শ্রীমত সত্য ভট্টাচার্য্যকে বাঁধিয়া গিয়াছেন।

আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি ও ভগবানের কাছে অজয় বাবুর মৃত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

‘ত্রীতম’-এ শরৎচন্দ্রের ‘বিপ্রদাস’

অপরাজেয় কাশানী শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের দেখা পারিবারিক উপভাস ‘বিপ্রদাস’ গত কয়েকদিন যাবৎ শ্রীতম নাট্যমঞ্চে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে। নাট্যকার বিদ্যাসক ভট্টাচার্য মূল কাহিনীকে বিস্তৃত না করিয়া যথেষ্ট সংঘর্ষের সহিত ইহার নাট্যরূপ দিয়াছেন। নাটকটি পরিচালনা করিয়াছেন নাট্যচার্য শিশিরহুমায়ের উপযুক্ত জ্ঞাতা বিশ্বনাথ ভাট্টা।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই ‘বিজ্ঞান’এর ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করিতে হয়। মিহিরবাবুর অভিনয় ও অভিব্যক্তি দর্শক সমাজের বহুদিন যেন থাকিবে। এঁর পরই অভিনয়ের জন্ত প্রশংসা দাবী করিতে পারেন চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা। শ্রীমতী মলিনা ‘বন্দনা’র ভূমিকাকে আশাতীত স্নানরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ মিহির ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী মলিনার অপূর্ণ অভিনয়। ‘বিপ্রদাস’এর ভূমিকায় ‘বিশ্বনাথ ও ‘রায় সাহেব’ এর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর অভিনয় ভালই। কিন্তু ব্যারিষ্টারের ভূমিকায় কাহ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন।

স্বদীর্ঘকাল পরে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে একখানি স্নানরূপ নাটক দেখিয়া সত্যই আনন্দ হইল কিন্তু পরিচালক মহাশয়ের কাছে অস্বস্তি যে তিনি যেন শেষ গানটি বাদ দিয়া নাটকটিকে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া তোলেন।

আর্ট ফিল্মস্

৫৮, চৌরঙ্গী রোড

পি, কে, ৯২২



এক অভিনয় কাহিনীতে কেন্দ্র করিয়া গঠিত আমাদের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদনের পরিচয় শীঘ্রই পাইবেন। সঙ্গীতে সত্য, অভিনয়ে উজ্জ্বল এবং পরিচালনায় নিখুঁত এই চিত্রখানিকে আপনি নিশ্চয়ই অভিনন্দিত করিবেন।

“আর্ট ফিল্মস্”এর প্রথম অর্থ—“দ্বন্দ্ব”

আমার কথা

—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী

নাটক হচ্ছে জীবনের দর্শন; যে দর্শনে নিত্য প্রতি-
ফলিত হয় বাহ্যের স্বপ্ন-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্র
ও হৃদয়াকার।

• বীরা সেই নাটকের চরিত্রকে নিজের অন্তরের
সম্বন্ধিত দিয়ে প্রকাশ করেন অভিনয়ে, প্রকাশ করেন
নানা ভাবের অভিব্যক্তি ও ব্যঙ্গনায়, উঁরাই শিল্পী।
এদের বিচার, তাদের আটের ভেতর দিয়ে, তাদের
স্বস্তির ভেতর দিয়ে—যে স্বস্তি মাহুষের রসগ্রাহী ও জুখাফুর
মনের ধোঁয়ার দ্বিগুণ করে তুলে দিতে পারে।

বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে, নানান চরিত্রে,
নিত্য নতুন ভোলু বদলে বীরা আত্মপ্রকাশ করেন মঞ্চ
ও পর্দায়, তাঁরা দৃষ্টান্ত: বহুজগৎ হ'লেও আদতে তাঁরা
রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষই। সেই আত্মসংযতন
মাহুষের মন, নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে, অভিনীত
চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিত্য প্রকাশ করে তার সত্যকে।
এই প্রকাশ-নৈপুণ্যের উপরেই অভিনেতা ও অভিনেত্রী
যোগ্যতা নির্ভর করে।

আমরা যে সব চরিত্রে অভিনয় করি, ব্যক্তিগত
জীবনে তা থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কারণ
কোন মাহুষই ঠিক এক মন ও এক রচি নিয়ে জন্মায় না।
আমাদের নিজের মনের ইয়ুটান দিয়ে তাদের দৃষ্টিতে
তোলার চেষ্টা করি রূপে ও রসে। বহু রূপের মধ্যে
নিজেকে বেনাজুর বিশিয়ে দিয়ে বীরা নিজ নিজ সত্যকে
গোপন কোরতে পারেন, উঁরাই ঐক্যে অভিনয়ের
কৌশল। জীবনের পটে যে রূপ ও বর্ণের সমাবেশ,
শিল্পীর স্বস্তি তাকেই সার্থক কোরে তোলে, প্রাথমিকের
অপরিমেয় প্রাচুর্য তাকে সজীব ও মুগ্ধ কোরে তোলে।

দর্শকের চিত্তবিস্ময় ঘটতে পারেন উঁরাই, বীরা
অভিনীত চরিত্রের মধ্যে বেনামূল্য ভলিয়ে গিয়ে, নিজের

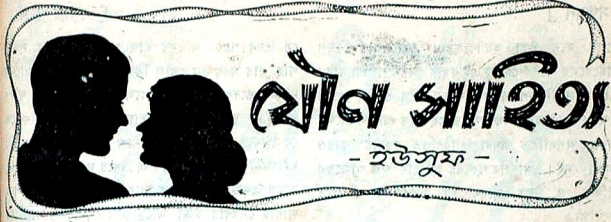
ব্যক্তিগত সত্যটিকে লুকিয়ে ফেলতে পারেন। এর
জন্মেই শিল্পীদের যা কিছু সাধনা ও তন্ময়াহা। নকলের
মাক দিয়ে আসলের মাদুর প্রকাশ করার মধ্যেই তাঁ
অভিনয়ের সার্থকতা। বীরা সেই কাজে, আসল ও



লেখিকা

মকলের প্রভেদ কৃষ্ণিয়ে দিতে পারেন, উঁরাই স্বস্তির
শিল্পী নামের যোগ্য।

শিক্ষক বাদ দিয়ে শিল্পীর বিচার আটের ক্ষেত্রে
চলে না। দর্শার অন্তরালে যে জীবন, সে শিল্পীর একাধি
নিজস্ব। সে জীবনের কথা জ্ঞানবার জন্মে বাদে আরও
তাদের কৌতুকল মেটাতে চলে প্রত্যেক শিল্পীকে
আত্মজীবনী লিখতে হয়। তুর্ভাগ্যের কথা, Isadora
Duncan-এর মত সাহস ও অধ্যবসায় নিয়ে এদেশের
[শেখাংশ ৩৩২ পৃষ্ঠায়]



নারীর মর্যাদা

নারীজাতির দাসত্বের সবচেয়ে হীন উদাহরণ পাওয়া
যায় মধ্যযুগে স্ত্রী-বন্ধনী (chastity belt) ব্যবহারে।
এ ধাতুনির্মিত কাঠামোটিতে তাল-চামির বন্দোবস্ত
থাকতো এবং অপর পুরুষের সঙ্গে অর্ধে যৌনমিলন
বিরোধের জন্য স্ত্রীর কোমরের চারিদিকে ও উরুর
মধ্যস্থানে তাকে বাঁধা হতো। প্রায় একশত হু'শত
মসর আগেও এই বেষ্টগুলির প্রচলন ছিল। ইউরোপের
বিভিন্নদেশে আজও এই ধরনের অনেক বেষ্ট প্রদর্শিত
যা।

কবিত আছে যে Crusade এর সময় একজন
মর্যাদা সম্রাট Saracen-দের বিরুদ্ধে তার বিজয়
জিনান থেকে না ফেরা পর্যন্ত স্ত্রীর স্ত্রী-বন্ধনী
ব্যবহার জন্য এক কর্মচারকে ডাকান ও তাঁর স্ত্রীর
উপর একটি লোহার সরঞ্জাম ঝালাই করে এটে
নে। কোন কোন লেখকের মত যে ইউরোপের
যনক আধুনিক জাতির মধ্যে মারেরা তাদের মেয়েদের
এভাবে বন্ধন করতেন।

একজন লেখক প্রাচ্যের হারেমের মধ্যে এই
প্রাচ্যের প্রচলন সম্বন্ধে লিখেছেন। যখন কোন স্বামী
তার স্ত্রী অথবা উপপত্নীকে কোন বন্ধন বাঁধা বাবার
মহাতি দিত এবং কোন নপুংসককে সঙ্গে বাবার
গোলা করতো পারত না তখন সে এই ধরনের
কিছু সরঞ্জাম সেই নারীর সঙ্গে নিবদ্ধ করে দিত।
এই জিনিসটিও একটি বেষ্ট—কোমরের চারিদিকে
বান্ধা হতো এবং পিছন থেকে যে ৪০ ইঞ্চি কাঠ-

ফলক যুক্ত একটি চামড়ার বা লোহার ফিতা বুলত
তা এখন ভাবে তলা দিয়ে এনে বেষ্টের সঙ্গে চাপি দিয়ে
দেওয়া হতো যে সেই কাঠফলকটি স্ত্রী অঙ্গে দৃঢ়ভাবে
প্রতিষ্ঠ হয়ে থাকত। কাঠফলকের নীচের দিকটি হাঁটু
পর্যন্ত লম্বিত থাকার যে অস্থবিধার স্বস্তি হতো তা স্ত্রীকে
তার স্বামীর অধীনত্বের কথা বাববার স্মরণ করিয়ে দিত।
এই প্রকার পুখুপুখু প্রচলন সম্বন্ধে অবশ্য কোন খ্যা-
যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে প্রাচ্য দেশগুলিতে
বিবাহের পূর্বে পর্যন্ত কন্ডার এবং স্ত্রীর স্ত্রী-বন্ধনী
ব্যবহার জন্য chastity belt-এর ব্যবহার হয়তো প্রচলন
ছিল।

রোমান অস্থবিহিত নারীদের মধ্যে প্রচলিত অপেক্ষা-
কৃত কম জন্ম Zona বা Zona Virginalis এর ব্যবহার
প্রথা একই কল্পনাসম্মত জিনিষ। এটা একটা মেম্বলার
মত জিনিষ, পাছার এবং তলপেটের চারিদিক থেকে,
কুমারীর উদরের পরিধি নিরূপণ করা হ'তো, বিবাহের
দিন স্বামী সেই মেথলাকে অপসারিত করে দিত, তার
ইঙ্গিত এই যে এরপর উদর গর্ভসন্ধারে বিস্তৃত হোক।

সকলদেশে সর্বত্রই আজও ধর্ম সম্মত বিবাহে
এবং গোড়া বিবাহে যে সমস্ত আচার পালন করা হয়
তাতে কন্ডাকে স্বামীর আজ্ঞানী বাববার প্রতিজ্ঞা নিতে
হয়। কোন পুরুষ-অস্থবীর দ্বারা সম্পাদিত "কন্ডাদান"
নামক প্রথাটি তাকে আজও স্মরণ করিয়ে দেয় যে নারী
পূর্বে ছিল পুরুষের দাসী এবং বর্তমানে তারই তরল
সংগ্ৰহ সে। ইউরোপেও নারীর অধীনত্ব নীতি সম্মত

মলেই মনে করা হয়। খৃষ্টান সমাজের ভিত্তিবল বাইবেলের অনেক শ্লোকে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এই সমস্ত নির্দেশ কখনও নাকচ করে দেওয়া হয়নি এক ধর্মসমাজের শিক্ষাহুম্মারে এই সমস্ত প্রাচীন নির্দেশ নাকচ, অপসারিত অথবা পরিবর্তিত করার কারও ক্ষমতা নেই। স্বার্থপর পুরুষের প্রবিচার জ্ঞানজ্ঞানের শিক্ষিত ও উন্নত জীসামাজের উপরও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

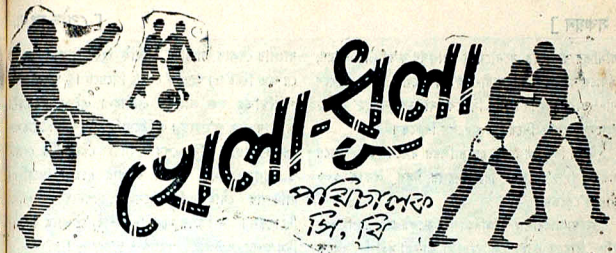
কয়েকজন ইউরোপীয়ান লেখকদের দ্বারা তুলে বিশ্ব লাগে। তারা সমস্ত দোষ, এমন কি তাদের নারীজাতির দাশয় বরণও প্রাচ্য প্রচার ওপর চাপায়। তারা বলে যে বাইবেলের এ সমস্ত শিক্ষা এসিয়া-বাসীরাই ইউরোপীয়ানদের দিয়ে ছিল এবং সে দানের কৃষ্ণল তারা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ডাঃ ওয়াল তাঁর অপূর্ণ বিশ্বকোষজাতীয় পুস্তকে বলেছেন—“এই সমস্ত শিক্ষা (বাইবেলের) Mosesএর যে বিধান রমণীজাতির উপর অভিশাপের দ্বারা দ্বিত-প্রাচ্য থেকে প্রেরিত এবং Moses একজন প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তি।” Moses বলেছেন, “He shall rule over thee.” এ সমস্ত নারীজাতিই এই ধরনের শিক্ষায় পরিপোষক এবং বিশ্বাসী। এজন্য বাইবেল যখন এসিয়াবাসীদের দ্বারা লিখিত হয় কয়েক হাজার বছর আগে তখনকার সেই অধীনতার গহ্বরে পড়ে তারা অথবা আজকের সভ্য নারীজাতির তথ্যে অবশিষ্ট রয়ে গেছে, প্রাচ্য নারীদের মধ্যে তা বচুই।

কিন্তু সত্যই কি সমস্ত প্রাচ্যদেশেই নারী জাতির স্থান ছিল দাশয়ের স্তরে? যদি অনেকেরই সেই স্তরে ছিল তাহলে এখনও কি তারা সেই স্তরেই আছে? বিদেশীজাতির সার্বভার দ্বারা যে সমস্ত প্রাচ্য রমণীই নিগূহীতা। যারা আমাদের দেশের নারী জাতি, অমতভারাক্রান্তা সখিৎহারা গৃহপিঞ্জরবদ্ধ, নিপীড়িত প্রাণী এবং স্বামীরা দাগী বলে বর্ণনা করে, আমার দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি তাদের মতের বিরুদ্ধতা করি। যখন কোন ভারতবাসী সত্যার-রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানে

সে এমন এক অভিনব রাজত্বের ও রাজার সম্মান পায় যার ধরন ডাঃ ওয়াল কিংবা কোন বিদেশীই জানেন না। যুদ্ধেব একবার বলেছিলেন—“নারী যথেষ্ট বীরাহীন হুর্লল, তথাপি যাহদের ওপর প্রভুত্ব করতে যে সক্ষম ও পটু।” যুদ্ধেব নিজে বিবাহিত ছিলেন এবং মহাজ্ঞানী ছিলেন। এখন এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব হওয়া যায়, কারণ একটা জির নিরুদ্ধে ভারতীয় নারী সঞ্চকে পরে আমার লেখবার ইচ্ছা আছে এবং সেখানেই আমাকে জ্ঞাতব্য জানা যাবে।

পূর্ণ বক্তব্যে ফিরে এসে আমার দেখতে পাই যে নরের নিষ্ঠুরতা ও শিপার অধিকারে নারীর আত্মসম্পদ মানব জাতিতে অসভ্যতা থেকে স্তম্ভভাতার আলোকে নিয়ে এসেছে। কারণ, নারীর কৃষ্ণকোমল বুদ্ধিও, পুরুষহৃদয়ে নিগূহ্যভাবে যে কাজ করে এসেছে তার ফলেই রূপ পেয়েছে আজকের সভ্যতা। নরের ইচ্ছার ওপর নারীর যৌনাকাংখা নির্ভরশীল হওয়ায় তার পাশবিক ইচ্ছা দমিত হয়েছে; এই দৈহিক অনাসক্তির গুণ্যের ও নৈতিকতার অবলম্বন। পুরুষের প্রতি রমণী স্বাভাবিক জীতি করেছে নারীকে অত্যাচার-স্বাহি, নিপীড়িত নিগূহীতার প্রতি ঘেহ-কাতর ও পেশু, শক্তিমানের কাছে ভীরু, এবং এই সকল রমণীজন্মেরই মনোবৃত্তিই নবনীত শিল্পকলা ও ধর্মের পথকে উন্মোচিত করেছে। এরাই করেছে পরঃস্বংহে পরম দান ও সেবা যা আজকের Nursing ও Red Cross সম্ভের মধ্যে অপূর্ণভাবে রূপান্তরিত।

গত অর্ধ শতাব্দী কেবল বিজ্ঞানের নব নব বিকাশ পার্শ্ব নৈতিক জয়যাত্রায় মুগ্ধরিত হয়ে ওঠেনি—এই স্বপ্ন অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যুগযুগান্তের পুত্র নারী বন্ধনগাভী চূর্ণ করে এবং শতাব্দীর পুঞ্জীভূত পুঙ্খবুদ্বি নাপাশ থেকে নারীকে মুক্ত করে তার অগ্রগতি উন্নতির যত্ন করে দিয়ে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে বর্তমান মহাযুদ্ধের অস্ত্রে আমার নিখিলরমণীকে পুঞ্জী-বিস্তৃত রক্তময় আরও বহুজনে বিচরণ করছে সেখানে।



রেডক্রস ফুটবল—গত ৬ই ও ৯ই ডিসেম্বর রিটারার রেডক্রস সপ্তাহ উপলক্ষে দুইটা চ্যারিটা ম্যাচ খুঁট হ'য়েছে। প্রথম দিনে মিলিত মোহনবাগান ও ইংলিশ দল 'পার্সি' দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। পরের দিনে অবশিষ্ট বাছাই করা একদল 'বাল্লালী' দলে এক গোলে পরাজিত হ'য়েছে। যাই হোক এই তেও ফুটবল খেলা সম্ভবপর হ'লেও দর্শকদের আকর্ষণ হতে পারেনি। ফলে টাকার মাত্রা খুব কমই হ'য়েছে।

ক্রিকেট

বোম্বাই পেটাদুলাল—বোম্বাই পেটাদুলাল প্রতিযোগিতা শেষ হ'য়েছে। এ বছরে অনেক বিষয়ে রমণী ক্রিকেট জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিশ শতাব্দী হিন্দুরল 'অবশিষ্ট' দলকে হারিয়ে জয়ী হ'য়েছে তবু অবশিষ্ট দলের ক্রুতিত্ব সভ্যই প্রশংসনীয়। জয়ী দলের নেতা বিজয় মার্কেট টিক সময়সত নিজ দলের ইনিংস স্ব-ইচ্ছায় শেষ করার বিশেষ দক্ষতার প্রিয় দিয়ে হিন্দু দলকে এক ইনিংস ও ৬১ রাণে জয়ী হ'য়েছেন। কিন্তু বিজিত দলের বিজয় হাজারী যমকটা রেকর্ড ক'রেছেন।

১। বিজয় হাজারী নিজেই ৩০৯ রাণ ক'রেছেন।
২। দ্বিতীয় ইনিংসে চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পরে (২৪৭—২২৫) ১২২ রাণ ক'রেছেন।

৩। বিজয় হাজারী ও তাঁহার ভাই বিক্রম হাজারী হারদের জুটিতে চতুর্থ ও ষষ্ঠ উইকেটে ৩০০ রাণ হ'য়েছেন।

রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতা—এ বৎসরে সর্বশ্রমেত ১৯১১ প্রাদেশিক ও ভারতীয় করদ রাজ্যের দল ভারতের অন্ততম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রণজি ট্রফিতে যোগদান ক'রেছে।

পশ্চিম বিভাগে বোম্বাই দল বরোদাকে পরাজিত ক'রেছে। ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া এন্ট্রি নাদওয়ানগর দলকে ১৩১ রাণে হারিয়ে দিয়েছে। শিবুপ্রদেশ গুজরাট দলকে ৫৭ রাণ ও ৯ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে।

পূর্বভারতে হোলকার রাজ্যের দল যুক্তপ্রদেশ দলকে ৩০২ রাণে হারিয়ে দিয়েছে। তারা এখন বাংলার সঙ্গে খেলবে ক'লকাতায় ৭ই, ৮ই ও ৯ই জানুয়ারীতে।

বাংলা ও বিহার—প্রদেশের মধ্যে খেলায় বাংলাই জয়ী হ'য়েছে। এই জয়ের ইতিহাস না লিখে একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে—কেবল নিছক নিষ্কারিত সময়ের দোহাই দিয়েই বাংলার দল জয়ী হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে বিহার দল ৫৯৯ রাণ ক'রেলে বাংলা তার প্রকৃতিতরে ২৪৯ রাণ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে বিহার দল ৭ উইকেটে ২৬১ রাণ কোরে ডিক্লেয়ার করে। এর মধ্যে এসু বানাজী (ছোট) একাই আউট না হ'য়ে ১০১ রাণ করেন। এটা হ'চ্ছে তৃতীয় দিনের চলতি খেলা। বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে মাত্র ৮৮ রাণ করেন। নিষ্কারিত সময় তাঁদের এ যাত্রায় রক্ষা ক'রেছে। যাই হোক, বাংলা দলের নেতা নবীন মহারাজকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সঙ্গে বাংলা দলের গঠনের বিশেষ একটু অদলবদলের প্রয়োজন রয়েছে। সে বিষয়ে আমার বাংলা দলের নির্দোষ

সমিতির কর্তব্যের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। কারণ, এবারের বাংলা দল বিহারী-বাঙ্গালী দলের সঙ্গে খেলবে না—তারা খেলবে মেজর সি, কে, নাইডুর নেতৃত্বে যুক্তকৃত্রিম প্রকৃতি নিয়ে গঠিত দলের বিরুদ্ধে।

উত্তর বিভাগে দিল্লী, গোয়ালিয়র দলকে ৪১৯ রানে পরাজিত করেছে। দিল্লী দলের ইদ্রুশ, একাই ১০৬ রান করেছেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ভারতে কাহিনালে মাস্তাজী ছাত্ররা মহীশূর দলকে ২২৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে।

মুষ্টি যুদ্ধ—কলিকাতা মুষ্টিযুদ্ধ এসোসিয়েশনের বাহাই বঙ্গা দল গ্যামিস্টন খিয়েটাবে অমূল্যত এক প্রতিযোগিতায় রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি দলকে ১১—২ পর্যায়ে পরাজিত করে রাঙ্গালী মুষ্টি যোদ্ধার কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

ব্যাটমিন্টন—বোম্বাইয়ে অমূল্যত নিখিল ভারত ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতায় মাত্র পাঁচটি কি ছটি প্রদেশ যোগদান করেছিল। “এতে প্রতিযোগীদের সংখ্যা কম হয়নি। তার প্রমাণ কেবল প্রথম দিনেই পচিশটি খেলা হয়েছে। বাংলা দেশ থেকে মাত্র পাঁচজন খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে বাংলায় এক নম্বর খেলোয়াড় ম্যাদগাফকাইই একটু নিপুণতা দেখিয়েছেন।

আমার কথা

(৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কোন লেখক বা লেখিকার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু যে পথ যদি বোলা পাড়তে, হঠাৎ এদেশের শিল্পীদের বিভিন্ন আয়তনের অভিজ্ঞতার কাহিনীও সাহিত্যে নানার পথে।

জীবন সম্বন্ধে ধারা চিন্তা করেন অথবা প্রকাশের পথে নানা বাধা, তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ধারা লিখতে পারেন এবং লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, আমার মনে হয়, তাঁদের উচিত নিজের জীবনী লেখা। কারণ শিল্পীরা অল্প বিস্তার সকলেই মনে প্রাণে জানেন, তাঁদের কথা জানবার জন্যে সাধারণের কৌতূহল বড় কম নয়। বরং অপূরণের লেখায় যে ভুল বা অসামঞ্জস্য ঘটা স্বাভাবিক, নিজের কথা নিজে লিখলে তার হাত থেকে পরিজ্ঞান পেতে পারেন।

বাংলার বেলায় ষ্ট্যান্ডার্ড বোম্বাই এবং পাঞ্জাব অফেন যে-কত নিমিত্ত প্রত্যক্ষ দেখা গিয়েছে। অবশ্য মুম্বই পরিহিতের জন্য বাংলায় খেলাধুলা এইরূপ শোভা অর্থহীন এসে পড়েছে। প্রতিযোগিতা খুব সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে; যদিও শেষ পর্যায়ের খেলাগুলি বোম্বাই ও পাঞ্জাব দলের ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাতিদার বোম্বই সিরিলসে প্রকাশনাথকে হারিয়ে দিয়েছেন। নারীদের মধ্যে মিস্ তারা দেওদার (পূর্ণা) মিস্ সুনন্দ দেওদারকে পরাজিত করেছেন।

টেবল টেনিস—এবারে সোয়েডিশ কাপ প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের এক নম্বর প্রমোদ ইট্ট, এম, চক্র শিবরামকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। বাংলার খেলোয়াড় মরিশটন ছাড়া আর কেহই সাফল্য লাভ করতে পারেননি। **টেনিস**—রেজেন্স ফাউন্টেন্স প্রদর্শন মেলা মার্কিন বিখ্যাত খেলোয়াড় এবং ইট্ট ইন্ডিয়া টেনি প্রতিযোগিতায় জয়ী হল সাকেশ, লেজ সিঙ্গার এবং কুমন্ত মিশ্রকে হারিয়ে দিয়েছেন।

ইট্ট ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। প্রায় সকল বিখ্যাত খেলোয়াড়রাই যোগদান করেছে। গম্ভীর মহম্মদ, ইংলিশার আত্মজ, দিলীপ বোস, হা সাকেশ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহু লেখকের লেখার মধ্যে দিয়ে, আমার নিজেরও যখন পাণ্ডিত্য, তখন আমি এই ভেবে নিজেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে আমি কী আশঙ্কী মানুষ। আমাদের রূপের বর্ণনা মনের বর্ণনা, সৃষ্টি বর্ণনা, ব্যক্তিগত জীবনের কত কিছু নাটাই এঁরা লেখেন। এদের লেখায় ভাবোচ্ছাসে অকল্পিত কল্পিত সত্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সে বাইরেও এঁদের প্রত্যেকটি বর্ণনা আমাদের কৃষ্ণি দেয় এই ভেবে আমারই ছোট্ট জীবন নিয়ে এঁদের কত না জ্ঞানি ব্যস্ত ও কৌতূহল। কল্পনার বিপরীত বর্ণনা ফলিয়ে, এঁরা যে ছবি আঁকেন, সত্যি তার সঙ্গে আমার কষ্টটি মিল আর কতই বা অমিল? তবুও এই মিল ও অমিলে সীমা ছাড়িয়ে, আমার সব চেয়ে বড় আশা, যে আমি এমনও এঁদের মনে বেঁচে আছি। বেঁচে আছি অপর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, তৃপ্তিতে, অহুস্তিতে। এই ক্ষুদ্র আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ; কারণ কোন শিল্পীই না, মানুষ তাদের জুল যায়!



বাংলাদেশের সমস্যা ও মহামারীর আশঙ্কা—

কলনের করাল প্রাণে বাংলার যত লোক প্রাণ দিয়েছে, তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার মত অবস্থা গ্রহণের কবে হবে তা জানা নেই। কিন্তু যাতে সেপারে রোগা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না পায় তার চেষ্টা করতেই হবে। বা বালা গর্ভমন্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে সে চেষ্টা সম্ভবী হবার সম্ভাবনা অল্প। অনশনের ফলে জাতির ক্ষতি অসংখ্য। সর্বত্র শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বারা অনাহারে এতদিন কোন প্রকারে বেঁচে আছে বারা বহুদিন উল্লস। নিউমোনিয়া তাদের দিকে সরেগে পড়তে হোতে কতক্ষণ। ম্যালেরিয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রসিদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত কলকাতায় ম্যালিগনান্ট মাইগের খড় বেশী আধিক্য দেখা যাচ্ছে। মক্ষম্বলের কথা বার দিনস, বড় বড় টাউনে ও কলকাতায় কুইনাইন না। ভার। অথচ কর্তৃপক্ষ বলচেন কুইনাইনের অভাব নেই। আমার কলকাতাও ম্যালেরিয়ার মত আগর ধাকিয়ে বসেছে। এই অবস্থায় মধ্যবিত্তদের স্বীভাবের মীন ব্যাপ্তি হচ্ছে তা বলনা করলেও ভয় হয়। আমন মল জল হয়েছে আর কি। কিন্তু যদি সকলে ম্যালেরী, কলেরা এবং শীতের মত বা অসুস্থ হয়ে থাকে তো রক্ষালার অধিক কি? এরপর ব্যবস্থার গর্ভমন্ডে এতদিন যে সোংসায়ে লেগে গেছেন। কিন্তু অসুস্থিকগুলি যদি মহাজলিত থেকে যায় তবে সে উৎসাহে নৈরর্থক হবে কিংবা কাউকে বলে দিতে হবে? আমরা আশাকরি দেশের জনমানবরা এবং গর্ভমন্ডে একবারে যেন

অমের ব্যবস্থা করচেন তাঁরা বন্ধের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সমান গুরুত্ব নিয়ে করুন। পরে যদি আবার মহামারীতে দেশ দখল হয়ে যায় তখন “ভগবানের মার” এ দোহাই চলেবে না। মেজর জেনারেল ইষ্টার্ট স্বত্বকে দেখেচেন যে এদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থার দিকপ অভাব, শীতবন্ধের দিকপ অভাব এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, ও নিউমোনিয়ার দিকপ প্রকোপ। তিনি কি বলতে পারেন যে কোন স্বভাৱ দেশে দারিদ্রশীল গর্ভমন্ডের শাসনে মরণের রথ এমন উদ্ধামভাবে কোথাও চলেছে?

অমুশোচনীয় অতীতকে আমরা খণ্ডন করতে পারব না, কিন্তু মজুতবিরোধী আমোদগমনের পরও যদি মুরাবদী সাহেব বলেন যে অবস্থার গুরুত্ব তিনি হৃদয়ঙ্গম করেননি, তবে তা তাঁকে কার্যপট্টের প্রশংসাপত্র এনে দেবে না।

আমচর্চের বিষয় কেবল আলোচনাতেই বিন কাটতে। বহু বিলম্ব যদি বা জনগণ আমন ফসল পেয়ে নিম্নতি পেল, অজ্ঞান ব্যবস্থা সম্বন্ধে গর্ভমন্ডের সেই চিরাচরিত উদাসীনতা! এদিকে ডিপার্টমেন্টের তে অভাব নাই। হেলথ ডিপার্টমেন্টের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ উদ্দীপনাময় কোন সংবাদ আমরা পাই না, কাপড়ের ছুঁখা বিজ্ঞমান, সকলেই আশা করে আছে সরকার আছেন।

হুজিৎকের দায়িত্ব ভগবানেরই হোক বা গর্ভমন্ডেরই হোক বা প্রাকৃতিক ছুঁখোয়াই হোক আজকের প্রধান কর্তব্য তা নিয়ে গবেষণা করা নয়। হুজিৎকের অবশ্যজ্ঞানী পরিণাম মহামারী যা আজ বাংলার বুকে তাওব নুতর

আয়োজন করচে। এর চাই প্রতিরোধ, চাই প্রতিকার। ভিভামিন, ক্যাপসুল ও কুইনাইন আছে বললেই কাজ শেষ হয় না। কাজ শেষ হবে সেইদিন, যেদিন ঘুরোঘোর ঘনঘটা অভিজ্ঞতাকর করে বাংলার সৌভাগ্যবর্ধা আবার শোভিত হবে। গভর্নমেন্ট কি সেদিন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার বাণীতে অভিভূত হয়ে ধজ মনে করবেন না?

বাংলার সরকারের খাতিরনীতি—জনসাধারণের অবস্থা জাগিয়ে তোলবার জন্য, ঝুঁকি, সরবরাহ ও স্টকপের জন্য ও মূল্যনিয়ন্ত্রিত রাখবার জন্য গভর্নমেন্ট আঁটিয়াহাতি, তাই গভর্নমেন্ট স্থির করেছেন বাংলাদেশ থেকে কোন কার্যনেই ধান চাল রপ্তানি হবে না। কলিকাতা এবং শিলিগুড়িতে বেশি প্রযুক্তি হবে, অসম্ভব প্রধান প্রধান সহরেও সেই ব্যবস্থা করা হবে। পরিকল্পনা অমুখ্যায়ী একটি কাজ করে যাবে। একটি কৃষিকারী বোর্ড গভর্নমেন্টের পক্ষে থেকে সমস্ত ধান ও চাল কিনে নেবে। খাজ ও সরবরাহ বিভাগের কমিশনার হবেন এর চেয়ারম্যান। চীফ এক্সেকিউটিভ হিসাবে কতকগুলি ফার্ম স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিউজ এক্সেকিউটিভ, কৃষকদের ও সমবায় সমিতিগুলির কাছ থেকে জেলায় জেলায় ধান কিনবে। ঘাটতি জেলাতে ধান খরচ করে তা সেখানেই রাখা হবে। বাড়তি জেলাতে ধান খরচ করে অতিরিক্ত ধান ঘাটতি অঞ্চলে চালান দেওয়া হবে। শিলিগুড়ির চাহিদা মেটাবার জন্য সরকার বাংলার বাইরে থেকে সরবরাহ করবেন। কোন প্রতিষ্ঠানই এলা জাহাজীরা পর বাজারে ধান কিনতে পারবে না। বাড়তি জেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে। চালের কলকল সরকারী বাণসায়ী ড্রাডা আর কাকেও ধান বিক্রী করতে পারবে না ২০শে ডিসেম্বর থেকে।

কাকেও ২০শে মার্চের বেশি ধান বাঁচ রাখতে দেওয়া হবে না। এইজন্য বাজীর সমস্ত লোককে একজন বলে ধরা হবে। চোরাবাজারের মাল, সরকার আটক করবেন। মুদ্রা রাস করবার জন্য সরকার কৃত্তবাসের। মুদ্রা যাতে উৎপাদক এবং ক্রেতার উভয়ের অসুবিধা হয় তা দেখা হবে। হিসাব পত্রের কড়াপড়ি থাকবে।

বাংলাকে ৭টি এলাকায় বিভক্ত করে অসামরিক ভূ ভেটটি ডিরেক্টরের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। ২৩৯ শাহকারী ডিরেক্টর ও ৪০০ ইনসপেক্টর এঁদের সাহায্য করবেন।

আশাকরা যায় এ নীতি যথার্থ কাজ করলে খাজ সঙ্কট অর্থাৎ হবে।

কলকাতায় দিবালোকে বিমান হানা—এ বছর চুপচাপের পর ৫ই ডিসেম্বর সাইরেনের আওয়াজে সকলে চকিত হয়ে উঠে এবং বেলা ১১টার সময় ও ১২টার সময় দুবার জাপানী বিমান চলা এলাকায় বোমা ফেলে। আমাদের anti-aircraft gun শব্দের ভীষণ শব্দে বাধা দেয়। জাপানীরা গুলি ধরনের বোমাই ফেলেছে। কিন্তু দিনের বেলা গুলি নি শব্দেও অনেক গুলি ডক এলাকায় কাজ করছি। কুলিদের ব্যারাকগুলির উপর সোজা বোমা পড়ার আশংকা হয়েছে এবং বহু প্রাণ হারিয়েছে। ডক এলাকা বোমা পড়বেই যদি ভবিষ্যতে কলকাতায় বোমাপত্রে অথচ শোনা গেল ডক ভাগ shelter এর ব্যবস্থা নেই। কুলিদের জন্য তো মোটেই নেই। ডকের কতগুলি জানা উচিত যে বোমারু বিমানকে কলকাতার উপর আসা বন্ধ করা অসম্ভব এবং ডকের মত জায়গায় দুই অঙ্গের জন্য খাড়া কাজ করে তাদেরও জীবনকে অবলম্বন করা যায় না।

অপূর্ব বিচার—ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় এক বেতা সৈনিক একজনের কাছে ২ টাকায় ৩টি হাঁস কিনে ভাত ১ টাকায় দিতে সে আপত্তি করায় তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে হত্যা করে। সাক্ষিগণ ঘটনা এই। ২৯ Special Jury তার বিচার করে, এদের মধ্যে ৮ জন জিল সামরিক ও ইউরোপীয়ান। দায়রা জজ ৩০২ ধার (গুন) তাদের মত জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসামীর নির্দেশ্য হলেন। ৩০৪ (ক) ধারার (অবহেলায় মৃত্যু ঘটনো) অভিযোগেও জুরি একই মত প্রকাশ করেন। আসামী বেকসুর খালাস পায়। জজ সাহেব মন্তব্যে সন্তোষ মামলাটি হাইকোর্টে কাছে পেশ করেননি। কিছুদিন আগে একটি কেসে হাইকোর্ট স্তম্ভিত হয়ে ৪৭

বু আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, এক্ষেত্রে সে আগ্রহ দেখা যাবে না কি?

শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সাভারকার—শ্রীযুক্ত শ্রীমত প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ১৯-৬ ভোটে হারিয়ে শ্রীযুক্ত সাভারকার যে হিন্দুসাহসার সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হলেন তার জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করি।



বীর সাভারকার

দুসতরে হিন্দু মহাসভার রক্ত-জয়ন্তী উৎসব হচ্ছে। শ্রীযুক্ত সাভারকার শ্রীমত প্রসাদবাবুরকে অ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করতে অহরোধ করছেন। গত ২শে ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত সাভারকারের অহরোধিততে ডাঃ শ্রীমত প্রসাদ পৌরহিত্য করবার জন্য অমৃতসহরে পৌছলে, বিদ্যে জনতা তাঁকে সহরের মধ্য দিয়ে তিলকনগর, অমৃতসর মিছিল করে যাচ্ছিল, সেই সময়ে পুলিশ মিছিল নে-আইনী ঘোষণা করেন। ফলে মিছিল বন্ধ হয়। শ্রীমত প্রসাদ গভর্নমেন্টের এই ঘোষণার কোন অর্থাৎ বুঝা গেলেন না।



ডাঃ শ্রীমত প্রসাদ

ভূতপূর্ব গভর্নরের পরলোক প্রাপ্তি—মৃত জাভারের পর আর একজন গভর্নর বাংলার প্রাণত্যাগ করলেন। ১২ই ডিসেম্বর তার জনহান্সিট ইহলীলা সংবরণ করলেন। চারি বৎসর অসুস্থতার পর অকালে মারা যান তিনি পদত্যাগ করেন। ভদ্র স্বাস্থ্যের জন্য গভ তিনে মাস পাকস্থলের ক্ষতরোগে অশেষ যত্না ভোগ করে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তার জন্মের শাসনকাল 'বাংলাদেশের পক্ষে নানান দিকে মর্মেচ্ছদ হয়ে আছে। কিন্তু এই বিধগ স্মৃতির মধ্যেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে তার জন্ম এসেছিলেন এক সঙ্কট মুহুর্তে এবং বাংলার অবস্থা যে এর চেয়েও খারাপ হতে পারত। এজন্য মৃতের উদ্দেশে আমরা কল্যাণ কামনা করি। সেটি দেবী হান্সিটক আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাতে চাই।

ফেডারেল কোর্টের অধিকার বৃদ্ধির প্রস্তাব— প্রধান বিচারপতি তার উইলিয়াম স্পেন্স (Spence) ভারতের মর্যাদার জজ ও আইনজীবী এবং আমেরিকার উপকারিতার জজ ফেডারেল কোর্টের অধিকার স্বয়ং বৃদ্ধির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে শাসনতন্ত্রতঃ এমনই এই কোর্টের অধিকার পড়ে মাত্র। ভারতীয় মামলা সমূহের চূড়ান্ত নিশ্চিতির ভার প্রিন্সিপাল জজের উপর না রেখে অজান্ত ভোমনি-নিম্নের জায় তা এই কোর্টের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করাই তার স্পেন্সের কাম্য। কিন্তু এই কাম্যনা বাস্তবে পরিণত হবে কবে?

অচল অবস্থা সমাধানে মার্শাল চিয়াংএর আবেদন—মার্শাল চিয়াংকাইশেক কংগ্রেস নেতাদের রাজনৈতিক বিরোধ মিটিয়ে ফেঞ্চার আবেদন করেছেন। জাপানীদের বিরুদ্ধে সমর প্রচেষ্টায় তাঁরা সহযোগিতা করেন। ভারতবর্ষ যেহেতু ব্যাপক অভিজান চালনার কয়েকল হবে, এখানকার আভ্যন্তরীণ সমস্তা ও দুহিতিক বেন শত্রু বাহিনীর ব্যাঘাত না ঘটায় এজন্ত তিনি মহাশয় প্রমুখ নেতাদের এখন থেকে যত্নবান হতে অহুসার করেছেন।

বলা বাহুল্য কাংগ্রেসনেতারা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী এবং তাঁদের মুক্ত করার গণতন্ত্রের কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। বন্দীদশায় নেতাদের সহযোগিতার ইচ্ছা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ সমস্তার সমাধান হওয়া দূরহ।

বড়নাটের প্রথম বক্তৃতা—এসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্শ ২০শে ডিসেম্বর লন্ডন ওয়াশেল তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ব্যঙ্গসমস্তা, যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠন সংক্ষেপে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অচল অবস্থা দুই কারণের কোন আভাস দিতে পারেননি। এ হিসাবে তাঁর বক্তৃতা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বক্তৃতার ব্যক্তিগতগার দেওয়া গেল।

লর্ড ওয়াশেল বলেছেন বর্তমানে যুদ্ধের প্রতি মন্দা, কারণ সমস্তা যুদ্ধ-পরিচালনার নিরুপস্থ কাল। যুদ্ধের প্রধান সমস্তা যানবাহন চলাচল ব্যবস্থায়। বর্তমানে

আমরা জয়লাভের আশা পোষণ করতে পারি তুমি সে প্রতিশ্রুতি কত দূরে তা নির্ণয় করা যায় না। জাতিগণের মনোবলের উপর তা নির্ভর করছে। জাতিগণ মত জাপানকেও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে না পারলে অর্থনৈতিক বা সামরিক নিরাপত্তার আশা করা যায় না।

ব্যাগপরিস্থিতি সংক্ষেপে জানা দরকার, অধিকাংশ লোকের আয় এত কম যে তারা প্রয়োজনানুসারে অল্প খেয়েই জীবনধারণ করে। কৃষকেরা অল্প দরিদ্র ও কোন প্রকারে জীবনধারণ করে না। সেজন্য দুঃসময়ে তাদের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক অবস্থার আবহাওয়াতে মধ্যবিত্ত ক্রমশঃ অতিরিক্ত চাল মজুদ করেছিল। তা ছাড়া অনেক সোভিট মাহুল আছে যাদের নির্দোষ বলা যায় না। ব্যাংক সমস্তা একটি সর্বাভারতীয় সমস্তা। ফসল ভাল হওয়ায় এটা সুরাহা হয়েছে বটে, কিন্তু লোভ দমনের জন্ত আমাকে সচেষ্ট হতে হবে। বাংলাকে আনির্ভরশীল হয়ে জগৎ চক্রে করতে হবে। ব্যাংক-নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা। ব্যাংক-সমস্তা সমাধানের দায়িত্ব এবং বাংলাদেশের ও বাংলা গণ-মেটের ফসল সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজ গভর্নমেন্টের।

মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার উপায়ই হচ্ছে নিরস্ত্রিত মূল্য জনসাধারণের কাছে বেশী পরিমাণে ব্যাংক সরবরাহ করা। বস্ত্র শিল্প সংক্ষেপে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় সফল দেখা গেছে। ঔষধপত্রের এখনও কোন ব্যয় করা হয়নি। সামরিক প্রয়োজনে অনেক জিনিষ হুম্মাণ হয়ে উঠেছে।

মিঃ মার্ভারের শিক্ষা পরিকল্পনার জন্ত ব্যয় করার মত অর্থ বর্তমানে ভারতের নেই। শিক্ষা বিষয়ক উন্নতি অগ্রদূত হচ্ছে শিল্পবিষয়ক উন্নতি।

সমাজ সেবার কাজগুলি নিম্ন পর্যায়ে হওয়া উচিত—প্রধানতঃ যানবাহন, পরে স্বাস্থ্য ও তারপর শিক্ষা।

ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর পূর্ণ সহায়ত্বই না আছে এমন নয়, তবে তিনি একথা বিশ্বাস করেন যে এখনই কেবল সেই সংক্ষেপে বাক্য প্রকাশ করে রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান তিনি করতে পারবেন।

দ্ব্যুপাতঃ আমাদের কর্তব্য যুদ্ধ জয়লাভ ও অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করা। শাসনকার্য নিরীক্ষার দ্বারা রাজনৈতিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করা। শাসনকার্য নিরীক্ষার দ্বারা রাজনৈতিক মতবৈধ দূর করা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।

শোক সংবাদ—রিপন কলেজের অধ্যাপক বিশিষ্ট শিকারভী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষের মৃত্যু-সংবাদে আমরা ছুঃখিত হয়েছি। তিনি ৩০ বৎসর ব্যাপীনা করেন ও ১১ বৎসর অধ্যাপকের কাজ করেন। এছাড়া তিনি সিনেটের ও সিন্ডিকেটের সদস্য ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে ইংরাজীর লেকচারার ছিলেন। ম্যাট্রিক থেকে প্রথমটায় বৃত্তি পরীক্ষার তিনি পরীক্ষক ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য তো ছিলই, ইতিহাস ও র্পনও তাঁর ব্যাতি কম ছিল না।

দেশবন্ধুর আমাতা কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত স্বরূপী রায়ের অকালে অবসিক হত্যাত আমরা মর্শ্বাহত হয়েছি। একটি কেস পরিচালনা করতে করতে হঠাৎ তিনি থম্বোসিসে আক্রান্ত হন ও আশ্রয়তার মধ্যে আদালতেই পরলোক গমন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি বংগের কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। সঙ্গীভেত্ত তাঁর বিশেষ পায়দর্শিতা ছিল। ১৯২৬ সালে তিনি শেখবন্ধুর কজা অর্পণ দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর তিন পুত্র ও তিন কজা। শ্রীযুক্ত রায়ের পরিবার-বর্কে পুত্র অর্পণ দেবীকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

শ্রীকবি মানকুমারী বসু ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন শাপকড়াড়ি গ্রামের বিখ্যাত দত্তবংশের কজা। মধুসূদনের বিরাট কাব্য প্রতিভার কিছু অংশ মানকুমারী পেয়েছিলেন। তাঁর সন্তান, ছন্দর গজ ও পঞ্চ সৌষ্টব সৌহৃদ্যার্থে বাংলাকে চুষ করেছেন। মানকুমারীর জীবনে দুঃখ ছিল প্রচুর। ১২ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং ১৩৪৫ সালে

তাঁর একমাত্র কজার মৃত্যু হয়। শোকাবেষেই তাঁর প্রথম কাব্যরচনা—“প্রিয়প্রসঙ্গ”। তারপর তিনি কাব্য-কুসুমমালি, কনকাজলি, বীরকুমারবধ প্রভৃতি লিখে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়েছেন।

বাংলার মৃতন গভর্নর—বিশ্বাতের সরকারী দপ্তর থেকে সম্ভ্রুতি প্রকাশ করা হয়েছে যে অষ্ট্রেলিয়া-অধিবাসী মিষ্টার আর, জি, কেসী বাংলার গভর্নরের পদীতে নিযুক্ত হলেন। এই নিয়োগ সম্বন্ধে পণ্ডিত কুঞ্জক ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত কুঞ্জক বলেছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার যখন কোনও ভারতবাসী হারিভাবে বাস করতে পারে না, তখন একজন অষ্ট্রেলিয়ানকে এইরূপ উচ্চ আসন দেওয়া ভারতের পক্ষে অপমানজনক। শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়ও এই মতকে অহুমোদন করে বলেছেন যে অন্ততঃ “প্রিন্সিপলের” জন্ত মিষ্টার কেসীর নিয়োগ অম্মায়।

বিশেষী খবর।

(১) কায়রো বৈঠক—কায়রোতে স্কজভেট, চাঞ্চিল ও চিয়াং কাইশেকের মধ্যে ও তাঁদের সামরিক ও



কূটনৈতিক পরামর্শদাতাদের সাহায্যে যে বৈঠক শেষ হয়েছে, তাতে জাপানকে চরম আখ্যাত হানবীর ব্যবস্থা গ্রহীত হয়েছে। নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে :—

“সামরিক মিশনগুলি জাপানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সামরিক কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। তিন



চার্লিস

প্রধান মিত্রশক্তি
উাহাদের মৃশশ
শরুর বিরুদ্ধে
হলে, জ লে
ও অস্ত্রীক্ষে
অনমনীয় ভাবে
চাপ দিবার সম্ভব
প্রকাশ করেন।
এই চাপ ইতি-
মধ্যে বৃদ্ধি
পা ই তেছে।
জা পান র

আক্রমণ সংঘত করা এবং আক্রমণের জন্ত জাপানকে
শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন প্রধান মিত্রশক্তি
এই যুদ্ধ চলাইতেছে। নিজেদের জন্ত কোন লাভের
লোভ উাহাদের নাই এবং নিজেদের রাজ্য বিস্তারের
কোন অভিপ্রায়ও উাহাদের নাই। উাহাদের উদ্দেশ্য
হইতেছে, জাপান ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বসময়ের প্রারম্ভ
হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে মত দ্বীপ দখল করিয়াছে,
সেগুলি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা এবং চীনাদের নিকট
হইতে মাফুরিয়া, ফর্মোজা, পেসকাদার প্রভৃতি যত
রাজ্য জাপান হরণ করিয়াছে, সেগুলি উদ্ধার করিয়া
পুনরায় চীন সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা। জাপান
অজ্ঞাত যে সকল স্থান লালসার বশবর্তী হইয়া বল-
প্রয়োগে দখল করিয়াছে, সেগান হইতেও তাহাকে
বহিস্কৃত করা হইবে।”

(২) **তেহেরান সম্মিলন**—কার্যের বৈঠকের পর
রুজভেট, চার্লিস ও ষ্টালিন এই প্রথম মিলিত হন।
তেহেরানে ইউরোপের নৃননীতি আলোচনার জন্ত।

তেহেরান থেকে যে যুদ্ধ ইস্তাহারে প্রচার করা হয়েছে
তা’ দেওয়া হোল :—

“আমরা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, বৃটেনের
প্রধান মন্ত্রী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী



ষ্টালিন

গত চার দিন ধরিয়া আমাদের মিত্র ইরাণের এই
রাজধানীতে বৈঠক করিয়া আমাদের সাধারণ নীর
নির্ধারণ ও বলপূর্ব করিয়াছি। আমরা আমাদের এই
সম্মত ব্যক্তি করিয়াছি যে, আমাদের তিন জাতি যুদ্ধ
সময় এবং যুদ্ধের পর শান্তির সময় একত্রে কাজ করিবে।
যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের স্ব স্ব সেনাপতিমণ্ডলী পরস্পরে
সহিত গোপনভাবে আলোচনার যোগদান করিয়া জাতি
বাহিনীকে ধ্বংস করিবার জন্ত আমাদের পরিকল্পনা
স্বয়ংক্রিয় করিয়াছেন। পূর্ষ, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক
হইতে যে আক্রমণ চালানো হইবে, উহার সময় ও
ব্যাপকতা সম্পর্কে আমাদের পূর্ব মতৈক্য হইয়াছে।
আমরা যে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি, তাহা
আমাদের জ্ঞান নিশ্চিত হইয়াছে।

“প্রার শান্তি সম্পর্কে আমাদের স্থির বিশ্বাস, আমাদের
উপর ও সম্মিলিত জাতির উপর যে চূড়ান্ত দাবি

হইয়াছে, তাহা আমরা পালন করিতে পারিব। যে
গৃহিণ হইতেছে এমন এক শাস্তি স্থাপন করা যা
বিশ্ববাস জনগণের সমর্থন লাভ করিবে এবং যুদ্ধের
পর দরকাবলের মত দূর করিয়া দিবে।

আমাদের কূটনৈতিক পরামর্শদাতার সহিত একযোগে
যমরা ভবিষ্যতের সমগ্রাণ্ডলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া
থিয়াছি।

আমাদের নিজেদের দেশের জনগণের মত অজ্ঞাত
চোঁড় যে সকল দেশের জনগণ সর্বাধিকারযোগ্য অত্যাচার



হের হিটলার

গ্রহণ প্রকাশ করিবে আমরা তাদের তাহাদের
গ্ৰহণ করিব। জাতিগত সৈন্যবাহিনীকে স্থলপথে, তাহাদের
ইচ্ছাভুলিক জলপথে এবং তাহাদের প্রজ্ঞা কারখানা-
গুলিকে বিমানপথে আমরা ধ্বংস করিব। পৃথিবীর
কোন শক্তি তাহাতে আমাদের বাধা দিতে পার
না। অবিরত ও ক্রমবর্ধমান গতিতে আমরা আক্রমণ
সম্পাদিব।

এই সম্মেলনের পর আমরা আশ্বাস সহিত সেই
দিনের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছি, যেদিন পৃথিবীর সমস্ত
বন্যাদার অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন জীবন
যাপন করিতে এবং নিজেদের নিজস্ব অভিত্য ও
দৈবিক অহংকারে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

আমরা আশা ও চূড় পণ লইয়াই এখানে আসিয়াছিলাম,
আজ মনোভাবে আদর্শ ও বাস্তব ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপেই
আমরা বিদায় লইতেছি।

তেহেরান

১লা ডিসেম্বর

১৯৪০

(স্বাঃ) রুজভেট

ষ্টালিন

চার্লিস

এই দুই বৈঠকে প্রধানতঃ সামরিক বিষয়ই আলোচিত
হয় কিন্তু তা গোপনীয়। তবে কতকগুলি বিষয় এখনও
অপরিষ্কার রয়ে গেছে যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রত্নত্ব,
ব্রহ্মদেশ, মালদ্বের স্বাধীনতা, তেহেরান বৈঠক রুশয়ার
১৯৪১ সালের গীতাশ মেনে নিয়েছে, তার মানে
ইউরোপে রুশয়ার প্রভুত্বের সম্ভাবনা রহিল।

(৩) **ভূরক্ষণনীতি**—বলকান অভিযানে ভূরক্ষের
দৃষ্টিভঙ্গি জানবার জন্ত প্রেসিডেন্ট ইনোন্স কারোয়াতে
আমন্ত্রিত হন। মনে হয় ভূরক্ষ যখন যুদ্ধে যে জাতিমূর্তি
পক্ষ থেকে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তখন তার ষাঁটি মিত্রপক্ষকে
ব্যবহার করতে দিতে পারে কিন্তু ভূরক্ষের সিদ্ধান্ত অজ্ঞাত
হলেও পররাষ্ট্রগতিব যোগ্যতা করেচেন, যে মিত্রপক্ষের
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবুদ্ধি সম্বন্ধে ভূরক্ষের পররাষ্ট্র নীতি অপরি-
বর্তিত আছে।

(৪) **মিঃ চার্লিস**—তিনটি বৈঠকের পরই প্রধান
মন্ত্রী মিউনোনিয়ায় শ্যামাশায়ী হয়ে পড়ায় সর্বত্র উদ্বেগের
সৃষ্টি হয়। ভগবানের রূপার তিনি ক্রমশই রোগমুক্ত
হচ্ছেন শোনা গেছে। মিঃ চার্লিসের মত কর্তব্যের
এমন দরকার আছে যুগাই।

(৫) **যুগোস্লাভিয়া ও বর্তমান যুদ্ধ**—বলকানে
নাৎসী গভর্নমেন্ট করিয়াছে হলেও যুগোস্লাভিয়া প্রথম
বাৎসরী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সিমাভিসের নেতৃত্বে
পল্কে সরিয়ে পিটানকে সিংহাসনে বসান হয়। তারপর
জাপান আক্রমণের সাহায্যে ক্ষুদ্র যুগোস্লাভ বাহিনী গাঁড়তে
পারেনি। পিটার বৃটিশের আশ্রয় নেন। কিন্তু যুগোস্লা-
ভিয়ার পার্শ্বভা অঞ্চলের প্রতিরোধ তখনও শেষ হয়ে
নয়নি—সেখানে চলবে গরিলা সংগ্রাম। গরিলাদের
শক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল জেনারেল মিহাইলোভিচ ও
টিটোর পৃথক পৃথক দলে। প্রবাস যুগোস্লাভ গভর্নমেন্ট

মিহাইলোভিচকে সমরসভির করেন এবং রুটিশ তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু সোভিয়েট গভর্নমেন্ট টিটোকে সমর্থন করেন। মিহাইলোভিচের দল সার্বদের নিয়ে তৃতীয়—এরা কমিউনিষ্ট-বিদ্রোহী, এরা চার সার্ব-মার্কী ফ্যাসিজম। টিটোর দল সোভেন, ফ্রোণ্ট ও সার্বদের নিয়ে, এ-দল প্রকৃত গণপ্রতিনিধিবলক। কিছুকাল থেকে টিটো বুটেন ও আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছেন অল্প দলের চেয়েও বেশী। সেজন্য মিহাইলোভিচের দল এখন শিথিল হয়ে পড়েছে এবং তারা কমিউনিষ্ট-বিরোধিতা করছে। কিন্তু কায়রোর যুগোশ্লাভ গভর্নমেন্ট টিটোকে স্বনজের দেখেন না। নভেম্বর মাসে টিটো যুদ্ধ অব্যাহত একটি অস্থায়ী গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা করেছেন। মিঃ হিউন বলেন আপাততঃ কায়রোর গভর্নমেন্টকে অস্বীকার করা হবে না। কিন্তু মিলপুক টিটো গভর্নমেন্টকেই যে সমর্থন করছে তা স্থগিত। এখনো অজ্ঞাত জিয়ানো গভর্নমেন্টের পক্ষে এ সংবাদ বড় মথুর হবে না। টিটো অবশ্য স্বার্থবুদ্ধ করে ধীরে দেখিয়ে স্বদেশের সাধীনতা পুনরুদ্ধারে আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন এবং তার উচিত মূল্য পেয়েছেন। তারা বাইরে বসে কেবল কর্তৃক করতে চায় তাদের একেজেরে স্থলবার কিংই নেই।

(৬) **সাম্রাজ্যের ক্ষমার প্রয়াস**—মার্কিন লেখক ডিয়ারী বেস মন্তব্য যে প্রথম দ্বিতীয় মার্কিনদের যুদ্ধভার পৃথিবী গঠনের ভান ত্যাগ করতে বলেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক। মিঃ বেস লিখেছেন—আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রথা বজায় রাখা নয়, শক্তিশালী রাষ্ট্রায়াকে হারাণ ও আমাদের উদ্দেশ্য। কারণ আমাদের বিজয়লাভের অর্থ শক্তিশালী রাষ্ট্র। যে সব নিজ শক্তির সাম্রাজ্য আছে যুদ্ধে যোগদানের পূর্বে তারা সকলেই জানিয়েছিলেন যে, তারা সাম্রাজ্য বজায় রেখে যুদ্ধ কাটিয়ে উঠতে চান। জাফা ও জাপানী সাম্রাজ্য গঠন প্রয়াসে মার্কিন স্বার্থ বিপর্যয় হওয়াতেই আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয়।

(৭) **ভারত যুদ্ধ প্রচেষ্টা প্রচার**—আমেরিকা ও বুটেনের জন সাধারণকে ওয়াকিবহাল করার জন্য হুজুন বেসরকারী ভারতীয়কে বক্তৃতা দেবার জ্ঞপ্তি পাঠান

হয়েছে। এ যুদ্ধকে ভারতীয় কেস্ট্রী পরিষদে গভর্নমেন্ট কন্সজের নিদানী করা হয়। এর উত্তরে একজন প্রচারক মিঃ ভোলে বলেন, কেস্ট্রীয়া ব্যবস্থা পরিষদ এখন যা প্রতিনিধি মূলক নয়, কারণ আভিষদর আগে তার মতাবলি নির্ধারিত হয়েছিল। মিঃ ভোলে কোনও সত্য ভারতের কোন কার্যে প্রতিনিধি না করে কোন প্রস্তাব একথা বলেন? তিনি স্বতন্ত্রতা ও নন, অথচ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর উক্ত গল্প কেন?

প্রাচ্যের যুদ্ধের দিনপঞ্জী

১৯৪১ সনের ২ই ডিসেম্বর জাপান প্রশান্ত মহাসাগর মার্কিন নৌবাহিনী পার্শ্ব বন্দর আক্রমণ করে। নীচে প্রাচ্য যুদ্ধের যুদ্ধের দুই বৎসরের একটা মোটামুটি বিন্যাস দেওয়া হলি:—

১৯৪১

৭ই ডিসেম্বর—পার্স বন্দরে জাপানীদের আক্রমণ।
৮ই ডিসেম্বর—সোভিট পাঁচ খণ্ডী ধরিয়া প্রতিরোধের পর পাইল্যান্ড কর্তৃক নিজ দেশের মধ্যে দিয়া জাপানী সৈন্য চলাচলের অসুবিধা দান।

৯ই ডিসেম্বর—মালয় ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সৈন্যদের অবতরণ।

১০ই ডিসেম্বর—মালয়ের উত্তর উপকূলে জাপানী বোমায় ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ “প্রিন্স অব ওয়েলস” ও ক্রুজার “রিপালস” ডুবি।

১০ই ডিসেম্বর—জাপানী সৈন্য কর্তৃক ওয়াশিংটন অধিকার।

১৪ই ডিসেম্বর—পাইল্যান্ডের মধ্য দিয়া জাপানী সৈন্যদের ব্রহ্ম প্রবেশ এবং ভিক্টোরিয়া পরগণে উপস্থিত হক-এ বাপক আক্রমণ আরম্ভ।

১৮ই ডিসেম্বর—জাপানী আক্রমণ আশকাহু নদ ব্যবস্থা হেতু ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ সৈন্যগণ কর্তৃক দ্বীপের অবতরণ।
প্রশান্ত মহাসাগরে পূর্ব দ্বীপ জীপ টিমর দখল।

২৪শে ডিসেম্বর—জাপানীদের ওয়েক দ্বীপ অধিকার।
২৫শে ডিসেম্বর—হক-এর আত্মসমর্পণ।

২৭শে ডিসেম্বর—সুরকিত ম্যানিলার (ফিলিপাইনের প্রধানী) জাপানী বিমানের বোমাবর্ষণ।

১৯৪২

৫রা জানুয়ারী—জেনারেল ওয়াভেল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত মহাসাগরীয় এলাকার মিজবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত।

১১ই জানুয়ারী—ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানী সৈন্যদের অবতরণ।

২০শে জানুয়ারী—জাপানীদের সলোমন দ্বীপ দখল।

২৫শে জানুয়ারী—ম্যাকাসার প্রণালীতে নৌ-যুদ্ধে মার্কিন কনভয়ের প্রকৃত ক্ষতি।

২৮শে জানুয়ারী—ম্যাকাসার প্রণালীতে প্রচণ্ড নৌযুদ্ধ। জাপানীদের একটি বিমানবাহী জাহাজ এবং যুদ্ধ জাহাজ ১০টি জাহাজ ধ্বংস।

৩১শে জানুয়ারী—সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ আরম্ভ।

৩রা ফেব্রুয়ারী—মার্শাল এবং গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন নৌবহর কর্তৃক জাপানীদের সাতট নৌবাহিনী দখল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—প্রাচ্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের দ্বিতীয় পরামর্শ কনফারেন্স জেনারেলসিঙ্গে ডিয়ারী হিগেনেকের দিল্লী আগমন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—সিঙ্গাপুরের পতন।

৫রা মার্চ—সুদূর প্রাচ্যের অধিনায়ক ডাডিয়া মার্সেল ওয়াভেলের ভারত আগমন ও ভারতের সিঙ্গাপুরে গমন প্রবেশ।

৪টা মার্চ—জেনারেল ম্যাকআর্থারের বিমান বহর কর্তৃক ফিলিপাইনে স্থলিক উপসাগরে তিনটি জাপানী জাহাজ ডুবি।

১৫ই মার্চ—দেখু পরিত্যাগ। জাপানীদের নিউগিনি দ্বীপের অবতরণ।

১০ই মার্চ—কমন্ড সডায় মিঃ হিউন কর্তৃক হক-এ জাপানীদের নির্ভর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা।

১০ই মার্চ—অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিন সৈন্যের আগমন।

১৮ই মার্চ—জেনারেল ম্যাকআর্থার সিঙ্গাপুরের পূর্ব-খণ্ডে মিজবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত। নিউগিনি দ্বীপের নিকট মার্কিন নৌবহরের আক্রমণে ২৩টি জাপানী জাহাজ (৫ হাজার মধ্যে ১২টি যুদ্ধজাহাজ) হয় জলমগ্ন, ১১টি হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৫শে মার্চ—জাপানীদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার।

৫ই এপ্রিল—কলম্বোতে জাপান বিমানের হানা। আক্রমণকারী ৭৫টি বিমানের মধ্যে ২৭টি ধরাশায়ী।

২৫ই এপ্রিল—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ব্যাটান যুদ্ধের অবসান।

১৮ই এপ্রিল—টাকিও, কোবে, ইয়াকোহামা ও বাস জাপানের আরও কয়েকটি শহরে মার্কিন বিমানের বোমাবর্ষণ।

৬ই মে—ফিলিপাইনে কবিত্তির দ্বীপের আক্রমণ।
৮ই ও ৯ই মে—প্রবাল সাগরে ভীষণ নৌযুদ্ধ। যুদ্ধে জাপানীদের ১৫টি এবং আমেরিকার ৩টি জাহাজ ডুবি।

১০০টি জাপান বিমান ধ্বংস।

১১ই মে—সুপারিয়ার ব্রহ্ম গণপুত্রের ভারত আগমন।
৬ই হুইতে ৮ই জুন—জাপানীদের নিউগুয়ে দ্বীপ আক্রমণ। যুদ্ধে জাপানীদের ১৫টি যুদ্ধজাহাজ ও ৪টি বিমানবাহী জাহাজ ডুবি।

২২শে জুন—এলগুয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপান সৈন্যগণ কর্তৃক সিঙ্গাপুর দখল।

২৪শে জুলাই—নিউগিনি দ্বীপে পাপুয়ায় উত্তর উপকূলে জাপান সৈন্যের অবতরণ।

৩১শে জুলাই—মোরোস দ্বীপের দিকে জাপানীদের প্রচণ্ড চাপ।

১৮ই আগস্ট—সলোমন দ্বীপে মার্কিন সৈন্যদের অবতরণ।

২৬শে হুইতে ২৭শে আগস্ট—সলোমন দ্বীপের নিকট বিরটি নৌ ও আকাশযুদ্ধ। জাপান নৌবহর উত্তরভাগে বিভাজিত ও প্রকৃত ক্ষতি।

১০ই সেপ্টেম্বর—মোরোস দ্বীপের অতিমুখে জাপান আগ্রগতি প্রতিহত।

১লা অক্টোবর—নিউগিনি দ্বীপে জাপানীদের পঞ্চদশপদসংগ্রহ।

৭ই অক্টোবর—সলোমন দ্বীপে গুয়াডালক্যানালে জাপানী সৈন্যের অবতরণ।

২২ই অক্টোবর—এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের আত্ম দ্বীপ পরিত্যাগ।

১৫ই অক্টোবর—জাপানীদের গুয়াডালক্যানাল পুনর-বিহারের চেষ্টা এবং প্রকৃত কতি বীকার।

২৬শে অক্টোবর—উত্তর-পূর্ব ভারতের বিমান ধাঁচিতে আশ বিমানের হানা।

১লা নবেম্বর—ষ্টার্ট দ্বীপমালার নিকট নৌযুদ্ধে জাপানী জাহাজ দুটি অথবা কতিগ্রস্ত।

১২ই ডিসেম্বর—ভারত মহাসাগরে ভারতীয় মাইন তোলা জাহাজ 'বেঙ্গল' কর্তৃক একটি জাপানী হানাদারী জাহাজ নিমজ্জিত।

১৫ই-১৬ই ডিসেম্বর—সলোমন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন নৌ ও বিমান বহরের বিরাট জয়লাভ। ২০টি জাপানী জাহাজ ডুবিল এবং ২৪ হাজার জাপান সৈন্য নিমজ্জিত।

২০শে ডিসেম্বর—বঙ্গ লীমাত্তে মিজবাহিনীর আক্রমণ; আরাকান পর্যন্ত অগ্রসর।

কলিকাতায় সর্বপ্রথম বিমান আক্রমণ।

১৯৪৩

১৬ই জানুয়ারী—কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার সময় ব্রিটিশ বিমানবহরের হাইট সেক্‌ফটোনাট প্রিং কর্তৃক পাঁচ মিনিটে ভিত্তি শূন্য বিমান ধরাশায়ী।

৪ঠা ও ৫ই মার্চ—বিসমার্ক সাগরে নৌযুদ্ধে জাপানীদের বিপুল কতি। ২২টি জাহাজভর্তি সৈন্যদল উৎখাত; ৭০টি বিমান ধ্বংস এবং ১৫ হাজার স্বেচ্ছাস্থ নিমজ্জিত অথবা বিহত।

৩০শে মার্চ—বাল্লার দেশ "বিপজ্জনক এলাকা" বলিয়া ঘোষণা।

১১ই মে—আরাকানে মিজবাহিনী সৈন্যদলে মদে পরিত্যক্ত।

২০শে মে—ত্রিগেডিয়ায় উইনগেটের পরিচালনাদীনে একদল সৈন্যের মধ্য ব্রহ্ম হানা দিয়া তিনমাস ধরিয়াজাতিমান—চালনা।

২৩শে মে—এলুশিয়ানে আত্মদ্বীপে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান।

১২ই জুন—চীনে চেকিয়াং প্রদেশে চীনা সৈন্যদের জাপ বিমান পাঁচ কিলোমিটারে প্রবেশ।

৩০শে জুন—সলোমন দ্বীপপুঞ্জে নিউ জর্জিয়া এলাকায় বেনডোজদ্বীপে মার্কিন সৈন্যদের অবতরণ।

মিজবাহিনীর আক্রমণকর দ্বন্দ্ব আশ্রয়।

৮ই জুলাই—সলোমনে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপে মার্কিন সৈন্যের অবতরণ।

২২ই জুলাই—জল ও স্থলপথে অসম্ভব হইয়া মৃত্যু পরিবেষ্টিত জাপানী সৈন্যদের বিপথগত অবস্থা।

২৪শে জুলাই—নিউগিনি দ্বীপে নাশাউ উপসাগরে মার্কিন সৈন্যের অবতরণ।

৬ই আগষ্ট—মিজবাহিনী কর্তৃক মৃত্যু অধিকার।

২১শে আগষ্ট—মার্কিন সৈন্যগণ কর্তৃক বিনা বাধ্য কিসা দ্বীপ (এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ) দখল।

২৩শে আগষ্ট—দুই বৎসর পর চুক্তিতে এ প্রথম বিমান আক্রমণ।

২৫শে আগষ্ট—লর্ড হুই মাউন্টব্যাটেনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মিজবাহিনীর সর্বাধিনিষারক নিযুক্ত।

২৬শে আগষ্ট—নিউ জর্জিয়া দ্বীপে জাপানীদের প্রতিরোধের অবসান।

১লা সেপ্টেম্বর—মার্কাস দ্বীপে মার্কিন বিমানের হানা।

১৪ই সেপ্টেম্বর—মিজবাহিনী কর্তৃক সালামাউয়া দ্বীপে ১৬ই সেপ্টেম্বর—নিউগিনি দ্বীপে অস্ট্রেলিয়া সৈন্যগণ কর্তৃক জাপানী লে অধিকার।

২রা অক্টোবর—অস্ট্রেলিয়া সৈন্যগণ কর্তৃক পের উত্তর পূর্বে ফিনশাফেনে দখল।

৭ই অক্টোবর—লর্ড হুই মাউন্টব্যাটেনের দ্বিতীয় আগমন।

১০ই অক্টোবর—রাবাইলে মিজ বিমান বহরের প্রথম আক্রমণে জাপানীদের তিনটি ডেপ্লোয়ার ও চারটি জাহাজ ডুবিল এবং ১০০টি বিমান বিধ্বস্ত।

২রা নবেম্বর—সলোমনে মার্কিন সৈন্যগণ কর্তৃক জাপানীদের শেষ পাঁচ বৃগণভাঙিয়া ধরা আক্রমণ।

১৫ই নবেম্বর—রাবাইলে মিজ বিমানের আক্রমণ।

২১শে জাপানী জাহাজ জখম।

২৩শে নবেম্বর—মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে দুইটি দ্বীপে মার্কিন সৈন্যের অবতরণ।

২৩শে নবেম্বর—মার্কিন বাহিনী কর্তৃক মেলি অধিকৃত।

২৪শে নবেম্বর—মার্কিন বাহিনী কর্তৃক বেতিও দ্বীপ অধিকৃত।

২৬শে নবেম্বর—নিউগিনিতে অস্ট্রেলিয়ান বাহিনী কর্তৃক জাউলবার্গ অধিকৃত।

২৮শে—ফেব্রিতে জাপ বিমানের হানা।

২৯শে নবেম্বর—পূর্বপর্বতে বিমান ধাঁচিতে জাপ বিমানের হানা।

৬ই ডিসেম্বর—কলিকাতা এলাকায় দিল্লীতে জাপ বিমানের হানা।



শ্রামালীর অশ্রু (উপভাস) প্রবেশকুমার সাজাল।
কোশক: শ্রী পাবলিশিং কোম্পানি, ২০৩৪, কর্ণওয়ালিস
স্ট্রিট, কলিকাতা হাইট।

মূল্য আড়াই টাকা।
সাজালের সাহিত্য রসিকদের কাছে প্রবেশকুমার
সাজালের মত সন্মানমণ্ড সাহিত্যিকের নতুন করে পরিচয়
গোড়া অনাবশ্যক। নির্ভিক, বেশেরা, চন্দ্রাভা জীবন
সিদ্ধান্তে প্রবেশকুমার যে অদ্বিত গম্ভীরপন্য পরিচয়
দিয়েছেন তা' বিশ্বব্যয়, প্রবেশকুমারের ভাষা কতকটা
ব্রহ্মবীরের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর উপভাস গুলিতে
গোপনের বর্ধমানমণ্ড সমাজের ভাঙনধরা বাস্তব দিন
সামনের করুণ চিত্রগুলি জীবন্ত ভাষায় রূপপরিগ্রহ
রেখেছে। অমণ কাহিনী রচনাতো তিনি অসামান্য শক্তির
ধরন দিয়েছেন, এ বিষয়ে বর্ধমান সাহিত্যিকদের মধ্যে
প্রবেশকুমার অধিষ্ঠায়। আলোচ্য উপভাস "শ্রামালীর
অশ্রু" প্রবেশকুমারের সাহিত্যিক দৃষ্টি ভঙ্গীর সম্পূর্ণ
নিপুণত্ব হচ্ছে, যে সব কথা মার্কিনার চরিত্রে এবং বাস্তব
জীবনের লেখনীতে স্পষ্ট হয়েছে "শ্রামালীর অশ্রু" নায়ক-
নায়িকা ভাবেই থেকে সম্পূর্ণ গতি গোয়ী। চরিত্র-
বর্ণনা বাস্তবের কঠোরপন্যের কবে বেশেই মনে হয় যেন
কণ্ঠে বেশী রকমের সখ্যবী জীবনমণ্ডের ছাঁচে ফেলা
গোয়ীকি ধরনের। অথচ উপভাসের প্রধান নায়ক-
নায়িকা বাস্তববাহী হুহাং হুহাং রায়ের দৃষ্টিতে জীবনের
সিদ্ধান্তিক মানসমণ্ডগুলি প্রবেশকুমারের স্বকীয়
চরিত্রায়নসম্পন্ন সাহিত্যের পথ্যোয়ে উদ্ভীত। প্রধান
নায়িকা, চন্দ্রাভা ভাবোজ্ঞানী দেহপণা গ্রামালী প্রবেশ
কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠমণ্ড দরদী মনের বিচিত্র সৃষ্টি-
সৃষ্টিধর—মানস-করা বদলেও চলে। আদর্শবাদী
ধরন নায়ক হুহাং হুহাং রায়ের মনে গ্রামালীর প্রভাব অপরি-
শীত-তাই দেখতে পাই কলঙ্কিনী দেহ-পশারিনী গ্রামালীর
সমাজিক কঠোরপন্যের ভাব্যব কঠোর ও প্রাণোজ্ঞানী
সমাজিক ধরনে হুহাং হুহাং রায়ের অদ্বিত ভাবান্তর, ফলে
গ্রামালীকে সামাজিক ও আধ্যাতিক মূল্যদানের জন্ত
ধর্মশালী হুহাং হুহাং রায়ের কী প্রাণপণ প্রচেষ্টা। হুহাং

রায়ের শাস্ত্রীর চরিত্রটি কিন্তু আমার কাছে খুবই
অপ্রাণবিক বলে মনে হ'ল। এই অমণ পরিচয়কে
বইখানির বিশদ সমালোচনা সম্ভব হ'লনা। বইখানি
পড়লেই মনে হয় প্রবেশকুমার যেন নায়ক নায়িকাদের
চরিত্রগুলি আধুনিক ছায়াচিত্রের উপযোগী করেই
লিখেছেন, পাকা ডিরেক্টরের হাতে পড়লে বইখানি
বাস্তবিকই খুব জনপ্রিয় ছায়াচিত্র রূপান্তরিত হ'তে
পারে। বইখানির ছাপা বাঁধাই মনোহর, প্রত্যেক
লাইব্রেরীতে রাখার যোগ্য।

সূর্য প্রদীপ (কাব্যগ্রন্থ)—অবন্তী সাজাল।
প্রকাশক: পূর্ববী পাবলিশার্স। ৩২, হারিসন রোড,
কলিকাতা। মূল্য—বারো আনা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের লেখক অবন্তী সাজাল
আধুনিকদের মধ্যে তরুণতম কবি। বয়সেও তুনেছি
তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে কবিতম, কিন্তু লেখকের
রচনামাফি প্রকাশনালী—মাকে মাকে কাঁচা হাতের
পরিচয় থাকে সত্ত্বেও। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা
যায় সমসাময়িক অনেকের তুলনায় লেখকের কবিতা-
গুলি উন্নত স্তরের। 'হৃদয় প্রণামের' কবি তাঁর
লেখাগুলির মধ্যে কোথাও নিজেদের প্রভাবের কবন
নই—তব্ধে, বিশ্বম-বৈচিত্র্য, সমাজ সচেতন চিন্তার
বল্লভ প্রকাশে, কবিতাগুলি সার্বিক রচনা। প্রথম
কবিতার কবি হিসাবে অবন্তীবাসুর স্বয়ংপ্রণাম আধুনিক
পাঠক সমাজে আর পাবে। আজ বৈশ্বিক যুগ-
সঙ্কটের ফ্যানিশি, সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অত্যাচারে
গ্রামালী পৃথিবী যখন কৃত্তবিকৃত, উৎপাদিত নির্যাতীত
মানবগোষ্ঠী যখন স্বস্তি-মুক্তি-স্বাধীনতার জন্ত ব্যাকুল-
তখন স্বয়ং দেখার অবসর কোথায়? কোথায় তখন
মেঘহৃত ভগ্নর বৈশ্বায় চক্কর অবসর? আজকের
কবিতা তাই জনসাধারণের হাতে হাতে মিলিয়ে
পাড়িয়েছে—যুব যুগের বলছে ফ্যানিশি দৃষ্টিভঙ্গির ধ্বংস
চাই—চাই মানব সমাজের মুক্তি। দেশে দেশে প্রকৃত
প্রতিবাদী কবিশ্রী ভাষ্যের তাই কবি কামানের সামনে,

সংখ্যায়]

[পৌষ সংখ্যা]

বোম্বার মুখে কবির মত আত্মবিসর্জন দিচ্ছে আর বলছে, "আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগরে সকল দেশ।" স্বর্গে প্রাণের কবি তেজস্বী, তাই তার মুখেও তাঁর মত তরুণের লেখাতেও তিনি :—

(১) আমার কলম ভেঙে শক্তি আজ তীক্ষ্ণ হাতিয়ার,
আমার মৃতন মাঝা—স্বর্গের প্রান্তর বন্ধুর,
গণমুক্তি সংগ্রামের আমিও যে এক ভাগীদার—
শোণিতের বিনময়ে ঘেঁষি আজ মুক্তি কতদূর।

(চীন—১৯৪২)

অবশী সাহায্যের মত তরুণ কবিকে তাই বাটি আধুনিক কবি সমাজে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। স্থানান্তরে ঠিক ঠিক সমালোচনা হ'লনা, কাব্য রসিকদের বইখানি পড়ে দেখতে অস্বপ্নে করি। স্বন্দর প্রচ্ছদ পটটি—শিল্পী হৃদয় রায় এঁকেছেন।

সংকেত : (জৈনাসিক সাহিত্য—সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা।) সম্পাদক—কামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৩নং শতাব্দী পণ্ডিত স্ট্রীট, সংকেত-কার্যালয় থেকে প্রকাশিত।

এই লুক্কিনে—বাংলাদেশের চরমতম দুর্দশার কাল-জারিতে—'সংকেত' যখন হাতে এল তখন প্রথমেই প্রশ্ন জাগলো—এই শ্রেণীর উচ্চস্তরের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ কেনম করে সম্ভব হ'ল? মহত্ব নিখাতনের মধ্যেও বাংলার সাহিত্যিকেরা মরেনি, তাঁদের স্বপ্নের হারায়নি

এইটাই তার প্রমাণ। এ শ্রেণীর জৈনাসিক পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র বাহ্যিকতরী সম্পাদকবৃন্দের।

"সংকেত"র প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক ও আর্থ প্রাদেশিক সাহিত্য পরিচয়। বর্তমান সংখ্যায় উই অমিয় চক্রবর্তী লেখা প্যাকবের কবি 'ভাইবীরসি'—শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। তার পরেই চৈনিক সাহিত্য বিষয়ক "লিউ-ই-লিঙের বাংলাভাষায় অনূদিত প্রবন্ধটি বাংলার পাঠক সমাজকে চীনের সাময়িক সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। শ্রীমুক্ত রাজশেখর বসুর "ভাষায় বিতর্ক" ও শ্রীমুক্ত হুম্মতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাতৃভাষায় চর্কা নামক প্রবন্ধ দুটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় সুসিদ্ধি, তাঁদেরই যোগ্য রচনা। মাসিক বন্দোপাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্য মৈত্র ও ইয়াও দী-ইনের তিনটি ছোটোগল্প, কামাকীপ্রসাদের একটি কবিতা উপভাষ্য। বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সন্দের সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রবি মজুমদার, ও বিমলা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।

বিশেষ করে বুদ্ধদেব বাবুর "বাংলারঙ্গ মন্দের কথা" লেখকের জীবন কৃতির একটি অংশ ও অত্যন্ত সংখ্যা। তাছাড়া স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনাগুলিও এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। এ শ্রেণীর জৈনাসিক পত্রিকা প্রকাশের জন্ত সম্পাদকবৃন্দের কাছে পাঠক সমাজ কৃতজ্ঞ থাকবে, আমরা পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

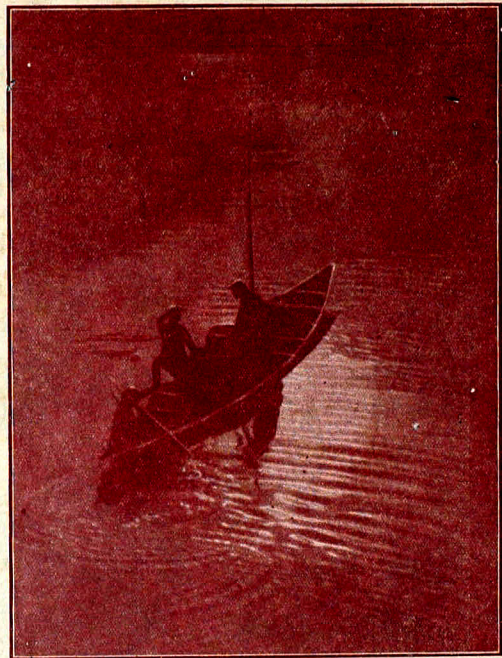
শুভ নববর্ষ—

গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গ ও পৃষ্ঠপোষকগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাই

আধুনিক রুচিসম্মত বহুবিধ হাল ফ্যাসানের
পোষাক ও বহুবিধ শাড়ী সর্বদা মজুত থাকে

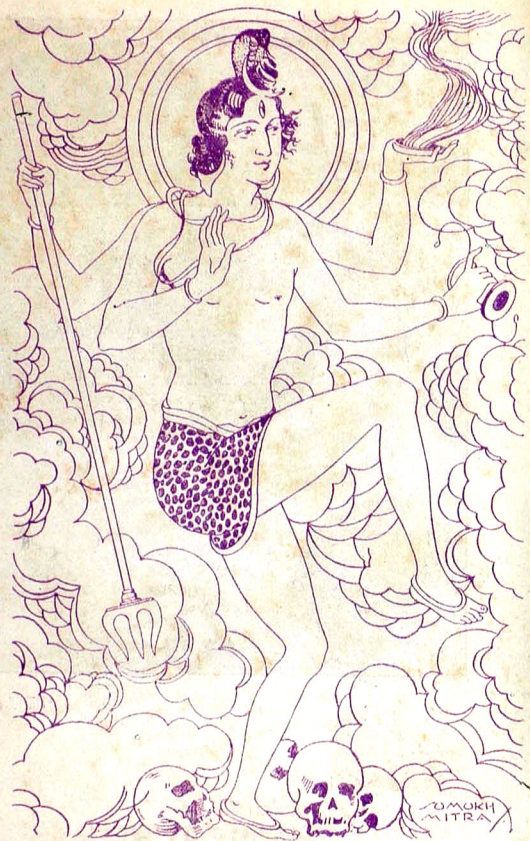
কমলালয় ফোঁস লিমিটেড

১৫৬, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা



পারের খেয়া





নটরাজ



Sanco's
CASTOL



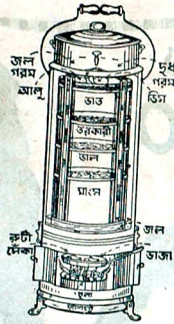
Best Scented & Medicated Castor Oil
Conducive to luxuriant growth of Hair.



শোভন দেশের প্রসাধনে
—বর্ণে—গন্ধে অতুলনীয়
হৃৎসরিত্ত্ব নারিকেল তৈল।

Products of
SANCO CHEMICAL WORKS
11 GANGAPRASAD MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA.

তৈয়্যারিক পাক যন্ত্র
ডাঃ ইমশানক বনিক
ডাঃ এ. এ. জে. ডি. বি. এল
আবিস্কৃত



এক ঘণ্টার মধ্যে সু
ভাবের খাবার তৈরী হয়
কাজে লাগে যত্ন
পরিমার্জন করুন। ফলে
ভিত্তি নিশ্চিন্ত

ইকমিক কুকার

১১১১৫, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

এম বি সরকার ঙ্গ মন্ডল

সন ১৩ প্রাণ্ড সঙ্গ জ ফাল ট বি সরকার

একমাত্র সারি স্বর্গের প্রবেশদ্বার এক যৌগিক বাসনা
নিম্নোক্ত

অসহায় নির্মাণে তি আ টি নেক সো টি
অনেকের কাঁচ এবং ঘর্ষণে বিশুদ্ধতা ই
আপাদেক্স টেনসিফাই। আমায়ে কোকলে নিজ
কার্যনাথ এজুত একমাত্র গির্জা স্বর্গের নানাবিধ হাল
ফায়ানের অসহায় ও রৌপ্যের বাসনাগি সর্বদা বিকসার্য
মুক্ত থাকে এবং অর্ধাৎ বিশেষ স্বপ্ন সময়ে স্বপ্ন মত
জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যবনের অর্ধাৎ
জি.পি.ডাক পানাম হয়। সুপাতল স্বর্গের পরিবর্তে নতুন
অসহায় পাওয়া যায়। ক্যাডেক স্বপ্ন কল না কা
জ অর্জনা কাডেক টি স্পর্শক এবং প্রত্যেকটি
অসহায়ের হস্ত প্যারিট থাকে।



১২৪.১২৪-১, বোম্বাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

সফল

একমাত্র সারি স্বর্গের প্রবেশদ্বার এক যৌগিক বাসনা
নিম্নোক্ত

১১১১৫, বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

বাংলাদেশের সমস্যা—

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা তার অর্থ নৈতিক দুর্গতি।
একে দূরিত দেশ, তাতে অনশনে জীবনীশক্তি হারি,
হার উপর আবার নানাপ্রকার রোগ প্রযোগ বুকে
বাংলাদেশ আক্রমণ করে বসেছে। এদেশের মহামারী
দূর না হ'লে দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া অসম্ভব। আজ অনেক
বহুমায় এত লোক ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে
মৃত্যুশায়ী যে বানকচাঁটার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হ'ছে
না। চাঁদপুর এদের মধ্যে অজ্ঞতম। ব্যাধির প্রকাশে
হাজার হাজার বাসালীর মৃত্যু হ'ছে। এদের মধ্যে
কৌর ভাগই রুমক, শ্রমিক ও কারিগর, যারা সমাজের
কেউও স্বল্প।
কুইনাইন নাই, ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা প্রয়োজনের
পক্ষে নগণ্য, চিকিৎসা কেন্দ্র ততোধিক কম, সুতরাং
প্রহার্য বাসনা বড়ই অকিঞ্চিৎকর। তিন মাসের জুজ
স্বস্ত ২৮০০টি কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে, মজুর হ'য়েছে
১১ লক্ষ টাকা, কিন্তু বাংলাদেশের দুর্গতির পরিমাণে
একী ভ্রম প্রাচেষ্ট। আমরা আগণ্ডে বসেছি—আবার
সেইই আমন শত ভাল হওয়ার ওপর যেন দেশের
বহির্ভে না ছেড়ে দেওয়া হয়। বর্ধমান মহামারীর
প্রতিকার চাই। "নিউজ ক্রনিকল" ভাবী বিপদ সম্পর্কে

যে সতর্কবাণী দিয়েছে তাকে স্বপ্ন করে সাবধান
হ'তে হবে।

মহামারীর প্রতিকার

কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত যেভাবে প্রতিকার করবার
চেষ্টা করেছে, তা বিশেষ কার্যকরী হয়নি; সেজন্য
দেশের সমগ্র শক্তিকে সংহত করা এবং দেশবাসীর
সহযোগিতা গ্রহণ করা দরকার। চিকিৎসার কেন্দ্র
বহু ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত পল্লীবাসী কর্মীদের
সাহায্য নিতে হবে। আজ বহু কংগ্রেস-কর্মী কারাগারে,
বর্ধমান সড়কে তাঁদের কর্মেওলাহ কিরণ সাহায্য
করতো তা বিবেচনা করে তাঁদের অধিরে মুক্তি দেওয়া
আদর্শক। বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক
সমস্যা সমাধানের পক্ষে রাজনৈতিক বিশ্বস্তির ভাব
প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তা হ'লেই জনসেবকদের
সহায়তা ও আশ্রিততা লাভ করা সম্ভব হবে, কেবল
সরকারী কর্মচারীরা কাগজপত্রে scheme ও budget
তৈরী করে এই জুগ-বজের লাঘব করতে পারেন
না। কলোরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া পল্লীকে বিস্তৃত করে
ফেলেছে। জন-স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী বলেন যে ববর
অতিরিক্ত। বলাবাহুল্য তিনি যে হিসাব দেখিয়েছেন

করিয়া জগদ্ব্যপার চরণে আশ্রয় লইল। তখন হইতেই শাক্তপরাবলীর স্রষ্টি। রামপ্রসাদ শুধু শাক্তপরাবলীর প্রবর্তক নহেন—তিনি এদেশে মহাশক্তির পূজারও প্রবর্তক। যে বৈষ্ণব ভারতের শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদির ভিত্তি সেই বৈষ্ণবই রামপ্রসাদ-প্রবর্তিত শাক্তধর্মেরই ভিত্তি। কাজেই শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সহিত রাম-প্রসাদের শাক্তধর্মের কোন ধ্বংস নাই। রামপ্রসাদের শ্রামাসঙ্গীত সর্বধর্মসম্মতের স্বর ধ্বনিত হইয়াছে। পঞ্চশত বৎসরব্যাপী ধর্মবিশ্বের অবসান হইয়াছে রাম-প্রসাদের পরাবলীতে। বঙ্গদেশে আমাদের আশ্রানে যদি শ্রামা আসিয়া নাও থাকেন—বৈষ্ণবপরাবলী সাহিত্যের প্রতিজ্ঞা, শাক্তপরাবলীর উত্তর হইয়াছে একথা বলিলে খুব অসমত কথা বলা যায় না।

রামপ্রসাদের পর এদেশে অসংখ্য শ্রামাসঙ্গীত রচিত হইয়াছে—শতশত কবি রামপ্রসাদের অঙ্গুরণে শ্রামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদই তাঁহাদের স্রষ্টা। রামপ্রসাদের মত সাধকতা ও কবিত্বের শক্তি তাঁহাদের কাহারো ছিলনা। এক কমলাকান্ত রাম-প্রসাদের শক্তি কতকটা পাইয়াছিলেন।

যে যোগসাধনার কথা চর্যাপদের কবিদের এবং নাথ যোগীদের সাহিত্যে বার বার উক্ত হইয়াছে—বৈষ্ণব সাহিত্যে বা মঙ্গলকাব্যে তাহা স্থান পায় নাই। সাহিত্যে যোগসাধনার প্রভাব দেশে দেশে একপ্রকার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। শাক্তকবিগণ আবার রামপ্রসাদের অঙ্গুরণে তাঁহাদের গানগুলিতে যোগের কথা সমাবেশ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের পরবর্তী শাক্তগীতগুলিতে কবিত্বের অভাব আছে বটে, কিন্তু ভক্তির গীতবান নাই। ইতিহাসে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের আকিঞ্চন বহুপদেই দেখা যায়। সাহিত্যে সেগুলির স্থান আছে—কিন্তু সেগুলি পুথক পুথক ভাবে আলোচনার বস্তু নয়।

যে আবদার অভিমানের স্বর রামপ্রসাদের পদ গুলিতে কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছে—তাঁহাদের গীত

গুলিতে তাহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—সর্বশক্তি শূন্য কলহ কবিবার সাহস তাঁহাদের হয় নাই। রামপ্রসাদের ধর্ম নয়। প্রসাদ-প্রবর্তিত ধর্মসম্মতের দ্বারা তাঁহারাও অসংখ্য রচনা করিয়াছেন—শ্রামাসঙ্গীতের অভেদ সূত্রে তাঁহাদের রচনার জমিদারবংশের অনেক রাজা, মহারাজ ও কুমার কোন গানের দেখা যায় না। রামপ্রসাদের নিকট ভক্তিসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। আদর্শও তাঁহারা অঙ্গুরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের প্রবর্তিত বিজয়া-পানের ধারাতিকে কমলাকান্ত অধিবাসী পরিশুদ্ধ করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা আয়তনের হইয়াছে। শাক্তসঙ্গীতের সুরধুনী এদেশে কবি-পানের মধ্য দিয়া যাত্রাপানের সমস্ত ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে।

যে সকল গীতি জনবলভ্যতা লাভ করিয়াছে, সেগুলির নরেন্দ্র রায়, কুমার শঙ্কু চন্দ্র রায় ইত্যাদি ভূবাসিন্দাই যে রসের দিক হইতে উৎকর্ষে তাহা ন্য-অন্য পরচনা করিয়াছেন। রাজা মহারাজার দেওয়ানরাও জমিদার প্রচার বেশি হইয়াছে। এই গীতিকা রচিতেন—দেওয়ান রত্ননাথের পদগুলি দেশ-গীতির অনেকগুলি কেবল শ্রামা মায়ের রসগিরি রূপে রচিত। এইগুলি ছাড়া, দেওয়ান নন্দকুমার রায়, বর্ননা—কতকগুলি কেবল স্বেচ্ছাধীন পদের ও বিশেষ তালিকা—কতকগুলিতে স্বেচ্ছাধীন পদের ও বিশেষ গুলি স্ট্রেন্ডেড (Strained metaphor)। রচিত। কতকগুলিতে শুধু তত্ত্বকথা—কতকগুলি রামপ্রসাদের কথাই পুনরাবৃত্তি। যেমন—কাদীনাম সঞ্চল করি সন্ধ্যাবন্দনার প্রয়োজন নাই—গয়া গঙ্গা দুটি প্রয়োজন নাই—ঘটা করিয়া পূজাবিসদানও অন্যায়। একথা অনেকেই বলিয়াছেন। সাধনার পথে পঞ্চমুখ প্রাপ্তি, দারাস্ত, পরিবার, বিষয়শক্তির বাধার স্বাভাবিক বহু পদেই আছে। রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

‘যেমন চিত্রের পথেতে পড়ে ক্রমের জুলে রঙে
‘মায়ের মুক্তি গড়াতে চাই নানের ক্রমে মাটি দি-
ইত্যাদি কথাগুলির প্রতিধ্বনি বহু পদেই পাওয়া যায়। সাহিত্যের দিক হইতে এই গীতগুলির মূল্য বার হউক—এইগুলি শত শত কণ্ঠে গায়ে গায়ে গিয়া হইয়া এদেশে যে ভক্তির ধারাতিকে সঙ্গীতবিত্তির মধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চর্যাপদ-রচয়িতারা যে সকলেই সিদ্ধপুত্র—বৈষ্ণবপদ-রচয়িতাদের প্রায় সকলেই তেমন সাধক—শাক্তপদ-রচয়িতাদের ছই চার জন ছাড়া কেহই তেমন সাধক নহেন—গৃহী ভক্ত মাত্র।

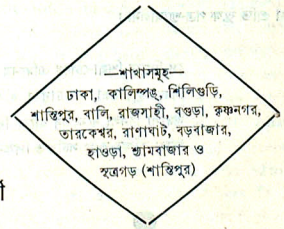
শাক্তধর্ম গৃহীতই ধর্ম—আশ্রম কুল, আখড়া, মঠ, দেওয়ান রায় চুল্লা নন্দী, দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় ইত্যাদি দেওয়ানদের পদও পাওয়া যায়। বিখ্যাত কবিদের মধ্যে দাশরথি রায়, রাম বসু, নিম্বাবার, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, কাজী ফিরিক চাঁদ শ্রামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এতদিন সাহেবকেও ভোলাময়রার সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া শ্রামা মায়ের মাহিমা কীর্তন করিতে হইয়াছে। সকলেই যে শ্রামাভক্ত ছিলেন এবং ভক্তিবশেই পদ রচনা করিয়াছেন তাহা নয়। সঙ্গীতের দ্বারা রসের জন্মও শ্রামামায়ের শব্দ লইতে হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ কবিশক্তি হয় কীর্তন, নয় বাড়িল, না হয় পাঁচালী-সঙ্গীতে নিয়োজিত হইয়াছিল। বাকি যাহা ছিল—তাহা সঙ্গীতের অজ্ঞা দ্বারা রসের জন্ম প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। শ্রামা সঙ্গীতই এদেশে সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গের দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

দেওয়ান রায় চুল্লা নন্দী, দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় ইত্যাদি দেওয়ানদের পদও পাওয়া যায়। বিখ্যাত কবিদের মধ্যে দাশরথি রায়, রাম বসু, নিম্বাবার, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, কাজী ফিরিক চাঁদ শ্রামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এতদিন সাহেবকেও ভোলাময়রার সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া শ্রামা মায়ের মাহিমা কীর্তন করিতে হইয়াছে। সকলেই যে শ্রামাভক্ত ছিলেন এবং ভক্তিবশেই পদ রচনা করিয়াছেন তাহা নয়। সঙ্গীতের দ্বারা রসের জন্মও শ্রামামায়ের শব্দ লইতে হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ কবিশক্তি হয় কীর্তন, নয় বাড়িল, না হয় পাঁচালী-সঙ্গীতে নিয়োজিত হইয়াছিল। বাকি যাহা ছিল—তাহা সঙ্গীতের অজ্ঞা দ্বারা রসের জন্ম প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। শ্রামা সঙ্গীতই এদেশে সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গের দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

— জাতীয় কল্যাণের আদর্শ অনুপ্রাণিত —

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড



হেড অফিস :
৩ ও ৪, হোয়ার স্ট্রিট,
কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর :
শি: এস, কে, চক্রবর্তী

ফোন :
ক্যালকুটি—৩১১

দার্জিলিং, কাড়গ্রাম ও
বেলুড় শাখা শীঘ্রই
খোলা হইবে।

[୩୩]

বসন্তে আজিকে

বিজ্ঞেন্দ্রলাল নন্দী

ধ্বংসে বাজুক তপ্ত মকছুনি।
হিংসে বায়ু ফেলে উচ্চ নিঃশ্বাস,
বালুকণা ওড়ে,
চারিধার ভ্যাল পূর;
দৃষ্টি অন্ধ হয়ে বৃষ্টি
ধূলির ছুঁধোগে।
তবুও
অশোকরোডের 'পরে কেরাণী
গৃহেতও
শিবুলের শাখে আগে
নব শীপ শিখা।
বোগেনভালিয়া রাঙা
উইগুর মেয়ে
বিশাল রবির সোনা চাঁদোয়ার তলে,
কাঁকে কাঁকে চীরা চলে গেয়ে।
প্যারাম্পুলেটের সারি;
আদ্যদল
চকল।
সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে নামে।
দপ্তর ফেরৎ আসে বেয়ারা, পিয়ন,
আয়ারা মাস্তিরা ওঠে
হাসি, কথা, হুসে
চকুলীপার চকল,
যৌন স্ফূর্ত্তা যৌবন সাক্ষে।
আরাবল্লীর রক্ত পাপরের মাসে
পলাশের রাঙা হাসি উঠেছে ফুটিয়া,

“বীজে” ডাকে মধুর মধুরী আজি
চাঁদিনী পাগল!
অমিয়া করিয়া পড়ে
চাঁদের আলোকে!
যৌবন-পশরা নিয়ে সারা দেহে
লীলারিত, রঙীন
ফিরিঙ গী মেয়েরা যুগে
মোপা অভিযারে
প্রিজেক্স পার্কে আর
আশে পাশে,
নেচে ওঠে বুকের জমাট কোমলতা
নিতম্বের তালে
প্রতি পদক্ষেপে
বসন্তে আজিকে!
পাতার পতন শব্দ তখন
ধীর বা জোরে,
পশ্চিমী হাওয়া বহে অস্থকণ
রাতটী ভোর।
সব্ সব্
ছব্ ছব্
ধীর বা জোরে
রাতটী ভোর।
মহা শমানেই এই মার্চে
ধব্ ধব্
আলো ছায়া সেরা শালবাটে
ধব্ ধব্।
ধীব্ বা জোরে

রাতটী ভোর
ধব্ ধব্
সব্ সব্
জোছনায় নাওয়া কুকুকে
কয়টা কণ
ভোরের ভারকা করুণনে
নীল গগন!
ধব্ ধব্
সব্ সব্
কয়টা কণ
নীল গগন।
নিভতি রাতের বিদায় বাধী
যাই যাই—
অরুণ তপন আসিবে এখন
নাই নাই!
কয়টা কণ
নীল গগন
যাই যাই
নাই নাই।
নিশীথ পবন হাঁকিয়া বলে
সব্ সব্
স্বরা পাতাগুলো পড়িয়ে দলে
ছব্ ছব্।
যাই যাই
নাই নাই
কয়টা কণ
নীল গগন!

ইন্দ্রি

(সমস্যা-ধূলেক উপন্যাস)
শ্রী অমল ঘোষ

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

রাত্রি, তখন পরম কৌতুকে মুহু মুহু হেসে চলেছে।
মুখ পরে হাসির মাত্রা হ্রাস করে সে বলে উঠল,
Hysteria is a disease which affects the
whole nervous system and more especially
the brain.” হ্যাঁ এক রকম মানসিক ব্যাধি বলেই স্বীকার
কর নেওয়া হয়েছে, শুধু তাই নয়, সন্ধানী বলছেন,
“even among bees, it is said, that when
a band of brigand bees enters a strong
hive to despoil it of honey, the owners
of the hive are themselves so carried away
by the contagion of rapine that they will
then go to the robbers' side and assist in
destroying the result of their own labour.”
যুঁই হুগে হচ্ছে একটা কথা ভেবে যে তোর আমার
জির যে বিশাল মোচাককে পাড়ে ভুলতে চাইছিলাম,
হুগে কোথা থেকে একদল ডাকাতে মৌমাছি এসে
হুগে একবারে মধুহীন করতে চাইছে, আর তুই
হুগে আক্রমণের হোঁরাচে নিজের কথা এতদূর ভুলে
গিয়ে যে, নিজের হাতে এতবড় একটা পরিশ্রমের
ফলস্বরূপ তোর ভেঙে ফেলতে কিছুমাত্র বিধা হচ্ছে
না। কিন্তু ভেবে দেখ, কারা ঐ ডাকাত। সাধারণ
মানুষের এ প্রতিভাগুলো থাকে নিয়ে তারা হাসে, কাঁদে,
ভয় করে, সন্তানের জন্ম দেয়। যে প্রস্তুতিগুলোর
শরিক পরিণতিতে আজ জগতের সমস্ত চেহারাটা
সী নোংরা নরনার মত পাবলি হয়ে উঠেছে,
ইন্ডোলাই কি ঐ আক্রমণকারী নয়? যারা প্তের

আমার মনের নীচের তলায় গুঁড়ি মেয়ে বসে আছে
শিকারের প্রত্যাশায়, সেগুলো কি আজ হুম্বোগ
পেয়ে তোর মনের ওপর-তলায় উঠে আসেনি?
যেখানে তোর এতদিনের পরিশ্রমের মধু জমে
উঠেছিল, তাকে কী আজ সামান্য উত্তেজনায় চির-
দিনের মতই বিসর্জন দিবি? কিন্তু সত্যি যদি
তোর সংযমের অভাব ঘটে থাকে তবে বোলবো না
ঐ কাছ তুই করে যা। তাতে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত
করবি। কারণ স্বাভাবিক যাদের ছব্বল, মানসিক শক্তির
অধিকারী তারা কোনোদিনই হলে পারে না। তাই
আজ তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বোলবনা, আমার কথা
মেনেই তুই চল, কারণ পকাশ বহুর আগে ওরা
Hysteria বোকাতে গিয়ে বলছে “the loss of the
inhibitory influence exercised on the
reproductive and sexual instincts of the
woman by the higher mental and moral
function.”

নিঃস্বপ্নের মত এতগুলো কথা একসঙ্গে হজম করে
লজিতার মনে হল, হঠাৎ যেন কঠিন রোগশয্যা থেকে
এইমাত্র ও উঠে এসেছে। সমস্ত দেহ মনের মধ্যে
প্রচণ্ড একটা ছব্বলতাকে সে বোধ করতে লাগল।
কিন্তু যোর কেটে যেতে তার বেশীক্ষণ লাগল না।
সামনের নির্বিকার মাথুটাকে দেখে ওর মনে হ’লে
লাগল, ও যেন কোন অজ্ঞাত দেশের মাথু, বিচিত্র
অদ্ভুত রহস্যময় যার চরিত্র—মাথুনের অন্তরমহলের
সমস্ত কিছুই সগে যার পরিচয়, যাক ও চেনে না।

জানেন না তবু যেন কত পরিচিত, কত আপনায় সে, যাকে সে যেখানে তার রোগ শয্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। সে তাকে মুক্তি দিয়েছে সমস্ত ব্যাবির হাত থেকে উদ্ধার করে। রোগের যন্ত্রণায় প্রলাপের ঘোরের হ্রত কত কঠিন কথাই তাকে শোনাতো সেখানে। অথচ বিনিময়ে কী কল্পনা কত সহ্যহৃৎভিত্তি সে পেল, হিছি লঙ্ঘ্য যে আজ মাথা তুলে ঠাঁড়াবে কী করে! আশু আশু একটা করুণ কৃতজ্ঞতার ছবি ওর চোখে মুখে ফুটে উঠতে লাগল, ও ভাবলে চূপ করে থাকলে আর চলবেনা, বুঝার দেবার সময় হয়েছে। কিন্তু কী ও দিতে পারে? হঠাৎ নিজের স্বরের মধ্যে যেন সে তার অতীতটাকে খুঁজে পেল, মনে হতে লাগল, কিছু যেন তার হয়নি, ও সেই আগের লজিতাই আছে। ও বলে যাচ্ছিল, বাবারে, কথায় কথায় যেন মাহুয কী করে এত Serious হতে পারে, বল্পেও তা ভাবতে পারিনি। মাঝাজ কথায় একবারে মহাতারতের অবতারণা! আশ্চর্য্য মাহুয বটে।

একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের সিকে তাকিয়ে মেজদা যেন তার কি আবিষ্কারের চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বেশ সহজ কৌতুকেই সে বলে উঠল, 'Tis a pretension but no mystery. সহজছন্দেই উত্তর হল, let it be ever so, but in reply to your highest form of flattery.

পরের দিন সকালে কি একটা কাজে লজিতা বেরুতে যাচ্ছে, এমন সময় বড়দা এসে বলেন, মানে ইয়ে আবে তোমাকে কি বেরুতেই হবে লজিতা? অবজ্ঞা বাধা তোমাকে আমি দেবনা। কিন্তু তার কথায় বাধা দিয়ে লজিতা বলে উঠল, ও সে বুঝি আর বসতে হবে না। তিনি এসেছেন, এইত? গালভরা হাসি হেসে বড়দা বলেন, এ হা হা, তুমি ঠিকই ধরেছ, তিনিই এসেছেন বটে। এতক্ষণ তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে তোমাকেই খোঁজ করছিলাম। তাই বেরিয়ে যাচ্ছ দেখে, মানে সেই বরটা দিয়ে পেলুম। আর কি লজিতা যেন পরম কৃতার্থ হয়েছে এমনি ভাবে বলে উঠল, বাহা তা হলে ত তোমার

ভারি কষ্ট হয়েছে দেখছি। আচ্ছা, চল এখনই ভরসাভরনেই এটা আমায় করতে হল। একে ভুলদী, না হুছা, তার ওপর অদ্ভুত বিচিৎ এই ব্যবহার। যাড়ে গদানি বিশাল বদী-বদনের মত আশ্চর্য্যই যেন লোকটির চোখে একটা বিষয়ের ভাব ফুটে চেহারা যেন লোকটি তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখের মিলিত, এ বিশ্ব বোধ কবি সহস্রগুণ ভাল ছিল, যদি না বিফারিত করে যখন ঘন দোরের দিকে তাকাচ্ছিল, চোখটা এই নির্জন ঘরে এই অপরূপ অপরিত্যক্ত সান্নিধ্যে তার দৃষ্টিকে জ্বলসে দিয়ে যেন এক টুকরো অক্ষরকে আশতে হ'ত। স্বাভাবিক উত্তেজনায় মত কিসের বিভ্রান্তও সেই ঘরের মধ্যে ঠিকরে পড়তো। কেরেই উত্তেজনায় তার মনে হল তেতরটা ঠিক বাশপাতার বাঘের মুখে হঠাৎ মেঘশিশির নিরীহতা, ফুটে উঠলে তেতরটা গেল। জলিতা লক্ষ্য করল ওর সমস্ত পালানটায় যেমন বিচিৎ দেখায়, লজিতার মনে হল সোফার শেষের বিস্মৃতিগুলো যেন শিশির কণার মত ফুটে উঠেছে। থাকা লোকটি যেন তারই একটা মুদ্রাস্বরূপ। মুদ্রাশাশ্বত। বুকে নিতে ওর কষ্ট হলনা। কিন্তু মুখে বল্ল দৃষ্টিতে তার আশাদমস্তকের সমস্ত সূঁটিনাটকজনার পোষ ধিয়ে খুব গরম মনে হচ্ছে, না? বলার সংগে লজিতার চোখে যে ভাবে ফুটে উঠছিল, তাতে মনেমেটে উঠে গিয়ে সে দেওয়ালে পাথার Regulatorটা বেশ কৌতুহলেই সে বোধ করেছে। এই সময় কেইদেববারে শেষ সীয়ায় চলে দিলে। তারপর চেয়ারের করে লক্ষ্য করলে হয়ত দেখতে পেত কিসের এক ইচ্ছার সঙ্কল্প ভংগিতে বসে পড়ে জিগ্যাস করলে, হাসি যেন লজিতার চাপা চোখের কীক দিয়ে ঈর্ষ্যমুখে খেলেন? জবাব দেওয়া দূরের কথা, কেমন মারবে।

যরের মধ্যে ঢুকেই বড়দা বলে উঠলেন, মানে শাপ দেখে নিলে, প্রশ্ন হল, পছন্দ হয়েছে বোধ হয়। বলে ইয়ে, শুকে তুমি নমস্কার কর লজিতা! একরাশাশ্বত হঠাৎ মনে হল, মাঝাজ একটা মেয়ের সামনে মেয়ের মত ছোট্ট একটা নমস্কার করে, সামনের একদম বড় একটা কামুফলতা দেখাবার জন্তে সে প্রস্তুত থাকি চেয়ার অধিকার করে সে বসে পড়ল। কত এসেছে নাকি? কোথা থেকে তার স্বপ্ন পুঙ্খবহু দেখলেন, লজিতার মুখে যেন জন্মশঃ লঙ্ঘ্য রাগা ভাবান্তে আসতে জেগে উঠতে লাগল, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ উঠেছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দেই কাটল, বড়দা লক্ষ্য মনে ওঁটার আগে ও বলে উঠল, এর জন্তে সে প্রস্তুত ছিলেন, বড়টি তাঁর মাঝে মাঝে বেশ মুড় পুষিয়ে আসেনি। কিন্তু সে কথাগুলো স্পষ্ট না হয়ে কেমন লজিতাকে দেখে নিচ্ছিল। মনে মনে বোধ করি কবিতা শোনা। শব্দ করে হেসে উঠেই লজিতা কথা ভেবেই তিনি মুখী হজিলেন, আর কি কাজ ওর, তাই নাকি? তারপর কিছু গম্ভীর হয়েই বলে, এগিয়েই এসেছে, শুধু যা, হঠাৎ চেয়ারের ওপর ঘোঁরা কি করতে এসেছিলেন তুমি? লোকটি এবার অসম্ভব রকম জ্ব করে দিয়ে লজিতা তাক্যে স্বহৃদেই অব্যব দিল, সেটা আপনায় বড়দাদাকেই জিগ্যাস উঠল, বড়দার যদি এখানে কোনো কাজ না থাকে, তাই বেরবেন। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার সংগে কথা না শেষ করে সে দোরের দিকে ইংগিত করায় লজিতা সেখানে আমায় ডেকে এনেছে। তারাদাসের মনে হল, সে যেন তাঁর মাথায় একরাশাশ্বত উদ্ভিত শিকা, বুকে পুঙ্খের হাসি বজায় রেখেই থানটি ছুঁতে মারলে। একটা কথাও উচ্চারণ না করে লজিতা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, tut, tut, dont মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে য় থেকে বেরিয়ে যেতে too much sentimental.

তাঁর চলে যাবার পর, মনাগতটির মুখের ওপর যে রাগাতঃ ভাবেই উত্তর হল, Sentimental মানে দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলে উঠল, মাপ করবেন, কি দেখছি যে ইয়ে। লজিতা যেন সে কথা শুনেই

পায়নি, এমনি স্বরে বলে উঠল, না না নিজে একটু ভেবে দেখুন যার সঙ্গে একদিন ঘর সংসার করতে হবে, তার পরিচয়টা একটু আগে থেকে জেনে রাখা দরকার না কি?—তার মানে আমি কি ঊর্ধ্বানে কৃপানদের মত Courtship marriage করতে এসেছি না? লজিতা বলে, Courtship marriage না করণ Trial marriage করতেই বা আপনায় আপত্তি কি তুমি?—এবার বেশ বড় গলায় প্রশ্ন হল, তার মানেই Trial marriage মানে? অদ্ভুত হাসির সঙ্গে লজিতা এবার বলে উঠল, মানে পরস্পরের দেহ মনের স্বত্ব কতদূর জেনে নেবার জন্তে দিনকতক আইনভাঃ স্বামী-স্ত্রী ভাবে কাটানো আর কি? মানে পরস্পর পরস্পরের বিহীনত্বের উপযোগিতা বুকে যদি পরস্পর পরস্পকে চায়, তবে বহুৎ আচ্ছা। নচেৎ এখানেই ইতি। অসহ্য রাগের ধমকে লোকটির দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় গিয়ে উড়ল। তীব্র ঘৃণার স্বরে প্রতিবাদ করে ও বলে, কী, আপনি আমায় prostitution করতে বলেন? হিছি ভরসাভরনের মেয়ের মুখে এমন কথা শুনেবা বলী আশা করতে পারিনি। বিহীনত্বের উত্তেজিত না হয়ে লজিতা বলে, ভরসাভরন বলতে কি আপনি আমাদের মত prostituteদের বাপ ঠাকুরদার কথাই বলছেন? লোকটির মনে হল এই নিয়ে তর্কাতর্কি করলে অপমানের মতো বেড়েই যাবে, ফল হবে না। যে রকম দুকানা কাটা যাবে। তাকে নিরস্তর থাকতে দেখে লজিতা বলে উঠল, আমাদের বাপ ঠাকুরদার কথাই রাখার রকম ভরসাভরন ছিলেন, তা তাঁদের সীতা সাবিত্রীর মত মেয়েদের কথা মনে করে হাজার বার স্বীকার করি। কিন্তু অভয় বর্তমান জগত যে ভরসা আজ কামনা করছে তার definitionটা একটু অস্বরকম হওয়া চাই। কিন্তু experiment ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। ঐ experiment এর মধ্যে দিয়ে যখন সেটা ক্রমে adaptable হয়ে উঠবে, তখন সাধারণ তাকে স্বীকার করে নিতে কিছুমাত্র আপত্তি করবে না। নিজেই আর চেপে রাখতে না পারে লোকটি ধমক দিয়ে উঠল, চূপ করণ আপনায় কাছে আমি lesson নিতে আসিনি। সহজ হুদেই এবার হল,

lesson না নিন, হুংখ করবনা। কিন্তু আজ যদি আমার চূপ করে থাকতে দেখে আপনার পছন্দ হত। তবে ভবিষ্যতে হয়ত একটা treason এর অভিযোগে আমার অভিযুক্ত করতেন। কিন্তু তার আগে কি সমস্তটা জেনে নেওয়া ভাল নয়? লোকটি এবার কর্কশ গলায় বলে উঠল, তাই যদি হত তবে সে ব্যবস্থা আমি করতুম বৈকি। কিন্তু আপনার মত বাদেও স্বাভাবিক, চূপ করে থাকবই বা তারা কি করে? কথা না বললে যে তারা হাঁসিয়ে ওঠে। আর সত্যিই যদি আপনি চূপ করে থাকতেন, তবে ভবিষ্যতেও হয়ত আপনার মুখ খুলত না। সাধারণ হিন্দুদের মতই তখন স্বামীর সংসারকেই বড় করে দেখতেন, হ্যাঁ, সংসার এমনই জিনিষ। তারপর একটু দম নিয়ে বলতে লাগল, আমি লক্ষ্য করছি, ঘরে চোকবার পর থেকেই আপনি যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ভাবিনি যে চঞ্চলতা—শুধু এত কথা বলবার জ্ঞে, হ্যাঁ আপনার মত মেয়েদের জাতই আলাদা। বাদেও মুখে বা কাজে কিছুই বাধে না, Highbrow কিরিশি মেয়েদের মতন ব্যাড়া চম্পিশ খট্টা নাকটা উঁচু করেই রাখে। সমাজ-যুচক ভাবে খাড় নেড়ে লগিতা বলে উঠল, quite justifiable, নাকটা আমার একটু উঁচুতেই থাকে বটে। কিন্তু তার কারণ কি জানেন, সৌটা শুধু নীচের দিকটা উপেক্ষা করবার জ্ঞেই, যেখানে আপনারদের জগৎ। হ্যাঁ, অপরের ভাষাতে বলি তখন: "The world was full of fathers, was therefore of full of misery full of mothers of therefore of every kind of perversion from sadism to chastity, full of brothers, sisters, uncles, aunts, full of madness and suicide."

তবে এটা হ'ল Highbrow christian লগয়ে ছবি, না জানি আমাদের জগতের ছবি তাই হলে যার কত বীভৎস হবে। কারণ ছবি জগতের standard of living ত সমান নয়। তাই যাকে আপনি সংসার বললে ঐতিহ্যের মত একবার সেখানে মাথা গললে নিরুৎসাহ হবে? সংগে সংগেই গংগালাভ। কিন্তু এটা ছবি মনে আসে আরো একটি কথা, Home, a few small rooms, stiffly over-inhabited by a man, by a periodical teeming woman, by a rabble of boys and girls of all ages, no air, no space, as under sterilized prison darkness, disease and smells." কিংবা যেটা "as squalid physically as a midden, hot with the friction of tightly packed life reeking with the emotion" হুটো ছবিই বেশ চমৎকার, না? হতভম্বের মত লগিতা মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লোকটি বিকৃত হয়ে বলে উঠল, cynic, লগিতা এবার কঠিন স্বরেই বলে উঠল, আবজ্ঞানার দুর্গন্ধে গা বমি বমি করবে না? আমি cynic হই, তবে চিরদিনই আমি ভাবি হঠাৎ সোফা থেকে উঠে পড়ে লগিতার মুখের ওপর একটা জলন্ত দৃষ্টি ফেলে লোকটি বলে উঠল, আর আসি তবে। মনস্তাত্ত্বিক তার বিশাল দেহটি দেখেও মনস্তাত্ত্বিক মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লগিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, dullard.

[জনশ:]

আমি ত এককণ দেখতে পাইনি। আজ যার পেড়ে কাজ নেই—আর বসেন না যান। আপনার অর্থ কবুলে এই বিদেশে দেখবে কে? আমি ও মন ভাববুন সত্যিই আমার এখানে দেখবার কত কেউ নেই। তাই সেই তেজা দেহ নিয়ে চলে এলুম আমার দেশে ছোট বরতীতে। বাস্তবিক সেদিন আমার শরীরটা যার থাপপাই হয়েছিল। তাই আর কিছু না গেয়েই

‘হারিয়ে-গেছি’

‘এগান তোমার শেষ করে দাও
নতুন স্বপ্নে বাঁধ বীণাখানি’

আপনভালা একটা নাম-না-জানা পাগল পশিক হয়ে উপর দিয়েই গেয়ে চলছিল গানখানা। হারানো বদন বাহুয়ের প্রাণের পঙ্কায় এসে পুনরায় লাগে পুনি বাবার ভুলে থাকা প্রাণ চলে যায় সেই পুরানো হারানো দিনের পথে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই হয়ে মনের নাকে টেঁচে বামিয়ে দেয় আর তাহারই প্রাণভালে নেচে ওঠে পাগল পারা নয়। রাগ হচ্ছে ও আত্মলুপ্তি কেশে উদ্ভক্ত গলাবন্ধারে প্রিয়মিত্রীর মত চেয়ে বসে আছে আরতি তার মাষ্টার হায়েবের স্বপ্নীক প্রতীকায়। প্রজাপতি এখনও তার পাশে বসে গান গাইছে। বারকতক মানসপটে বসেছিল বটে, প্রেমের সন্ধ্যার নিশ্চল মেঘমুখ আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে সে—এমন সময় তার দোহাওয়ায় প্রাণের স্তব্ধতা, তাতে জেগে উঠল কালবৈশাখির স্বপ্ন। বিকেল সন্ধ্যা হলেই শুরু হ'ল সন্ধ্যার আগমনী গান, আর ঘরে ঘরে উঠল মঙ্গল-বীণ। সূতি তখনও শেখ হয়নি, সেই রাতি রাতি দুর্ঘ্যাণের ভিতর পনের টাকা মাহিনার হাতেই মাষ্টার বসি বেরিয়ে পড়ল। আশেপাশে অবস্থায় প্রাণের দরজার বীণা এসে পৌঁছল; পদশব্দে অপেক্ষিতা হাতের ঘুরে গেল। তারপর এটা শুটা সোটা জিজ্ঞাসা করে পর বন্দ—মাষ্টার মহাশয়! আপনি যে ফিল্ম গিয়ে। আমি ত এককণ দেখতে পাইনি। আজ যার পেড়ে কাজ নেই—আর বসেন না যান। আপনার অর্থ কবুলে এই বিদেশে দেখবে কে? আমি ও মন ভাববুন সত্যিই আমার এখানে দেখবার কত কেউ নেই। তাই সেই তেজা দেহ নিয়ে চলে এলুম আমার দেশে ছোট বরতীতে। বাস্তবিক সেদিন আমার শরীরটা যার থাপপাই হয়েছিল। তাই আর কিছু না গেয়েই

শ্রীমতাকান্ত রায়

স্বপ্নে পড়লুম। এবং মনে মনে হিসাব করতে লাগলুম যে বাহু এখনও হয়। তবে যে প্রবাদ আছে বাহুয় যুগপৎ অস্থায়ী চলে; কিন্তু তার অর্থাৎ কই? কেনে-ছিলাম বাহুয় বড় হলে তার অভিজাতা বাড়ি এবং জন্মে আমার মত ভববুদ্ধের সাথে বাস্তবিকদের কণ্ঠিক বিরক্ত হয়। কিন্তু লোকের সাথে আমি যত মিশিছি তত দেখছি যে সবই ভুল। নাইনটম্ ফটি কোরের মেয়েরাও যে এমন কল্যাণময়ী হয় আরতিই তার চরম নিদর্শন। বড়বয়ের মেয়ে বলে তার কোন গর্ভ নেই। দরিদ্রের প্রতি কল্যাণ, স্বাধীর প্রতি দয়া, ভিক্ষকের প্রতি কৃপা, প্রতিশোধ বৃক ভরসা, শোকার্জের মুখে সাহসনা, এ কটা মেয়ে আজকালকার দিনে দেখায? আমার সহিত আজ ছুঁনাসের আলাপ। তাছাড়াই তার শিশুর মত সরল প্রাণটার পরিচয় আমি পেরেছি।

হবেনা ছুঁটা উড়িশা আর দিনের বেলা বিজ্ঞাসাগর কলেজের ফোর্স ইয়ার ক্লাস। এই আমার নিত্যকার স্কটিন। সেদিন ২২রা শ্রাবণ। সন্ধ্যা একটু উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; আমি প্রাত্যহিক স্কটিন অস্থায়ী পড়াতে গিয়েছি। পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি কেউ নেই। অনেককণ বসে থাকার পর-তার বাবা এসে আমার দেখেই—আরতিকে ভাক দিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। আরতি তখন কোন স্বপ্ন রাখে যে কিরণ কল্লি তা বৈজ্ঞানিক। আগামী ২২শে শ্রাবণ তার ছুতন সংসারে প্রবেশের দিন ধাওয়া হয়েছে। অভিমান, বাধ্য তার প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। আজ থেকেই তার পড়ার দক্ষা বতম্। এক দরিদ্র অনাথ হতভাগ্য প্রাইভেট মাষ্টারের জবাব। যাকে সে এতদিন তার ছাত্রের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে সান্ত্বিয়ে রেখেছিল আজ সে কোন্ মুখে তার কাছে গিয়ে বলবে—মাষ্টার মহাশয়! আমার বিয়ে, আমি আর পড়ব না। নিজের স্বপ্নের জ্ঞান আর একজননের অসমর্থতা

বাধা প্রদান করিয়া গীতাংকু কহিল, 'নিশ্চয়ই! সে ছুবি না বুললেও বুঝতে পেরেছি। এমন লোকের কথাতো গোয়েন্দা করে যে Politics এর পও জানে না।

দীপালী আপন অহমানের স্বয়ং বুলিল। গীতাংকু পাছে আরও অন্তর্গত বাক্য উদ্ধারণ করিয়া আপনাকে হেয় অভিপন্ন করে এই ভয়ে সে বলিল, এখন রওনা না হলে সময়ে পৌছিতে পারবোনা। চল।

দিনকয়েক পরে গীতাংকু বলিতেছিল, 'গান্ধীজির জীবনীর তৃতীয় খণ্ডটা পাচ্ছি না। পেলে দ্বিতীয়বার পড়তাম।'

সেইদিন হইতে দীপালী গীতাংকুর মনের গতি লক্ষ্য করিতেছে। উপরন্তু সে তাহার পূর্ব মতামতের ও ববর রাখে। গীতাংকুর কথার উত্তরে তৎক্ষণাত্ কহিল, 'বই কেনা একটা expensive hobby নতুবা আমি ওটা কিনতাম।'

গীতাংকু অস্তরে উল্লসিত হইল। দীপালীর মনের ববর জানি না। অপর একদিন গীতাংকু বলিল, 'জহর-লালকে অহরোধ করা হয়েছে তাঁর একটা জীবনী লিখতে। তিনি লিখবেন ন'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

'তখনবাবুকে তা'হলে আমি অহরোধ করবো তিনি যেন ওটার বঙ্গাভাষার যত শ্রীষ পানেন, করেন।' তা হ'লে অনেকের সুখিবা হবে? গীতাংকু এইশর ও উল্লসিত। সে এই পুস্তকের বঙ্গাভাষ্যকারের সংবাদ রাখে না। উল্লাস গোপন করিয়া কহিল, 'জহরলাল তো বিভ্রমলক্ষী পণ্ডিতকে বিবাহ করবেন। জহরলাল বিদেশে গেলেন তাঁর পক্ষাৎ পক্ষাৎ অমনি বিভ্রমলক্ষী ও ধাবিত হ'লেন। অজুহাত দেখালেন বেহু অজুহাত।'

'সত্যি? জওহরলালকে অস্ত্রপণ তেবেছলাম।'

গীতাংকুর তো এমন উল্লাস যাহার অপ্রকাশিত অর্থবা নিতান্ত ক্রেশকর। এবং হাসিবার বেগুনে পথ নাই সেখানে পরপ্তারের সত্যের মত জন্মদেয় আশ্রয় লওয়াই শ্রেয় কিন্তু সত্যের মত এমন উচ্চ জন্মদেয় হেতু এবং পারিপার্শ্বিকতা গীতাংকুর নাই। তবে সত্যের

মত চিন্তা করিল যে চীনজাপান, যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে এক বোমা আসিয়া তাহার জন্মনিরূপক পল্লিতে পতিয়াই পৃথিবীতে তাহার একমাত্র স্নেহের আশার লুপ্ত হইল সে অভিশয় বিদগ্ধিত হইয়া উঠিল। শুককণ্ঠে কহিল 'এস দেখে আমার কায়া পায়। ভারতের ভাগ্যের সত্যই মোক্ষকর।'

বিষয়কয়েক পরে গীতাংকু পুনরায় আসিলে দীপালী কহিল, 'আপনি তো ইলাকে চেনেন। নুপেনবাবুকে নিশ্চয় জানেন?'

'জানি ঐ কি। উনি ইলায় কে হ'ল না?'

'হ্যাঁ পাতানো দাদা বোনের মধ্যে ও প্রেমের চরিত্র হয়, বিবাহ না করে ভাল করি নি। এমন কই ইলা ও নুপেনবাবুর বিয়ে।'

গীতাংকু কবে উক্ত কথা বলিয়াছে অগ্নয় করি পারিল না। কিন্তু ইহা যখন ভবিষ্যদ্বাণীর credit করিতেছে তখন creditটুকু গ্রহণ করিবার পোত মনে করিতে পারিল না—সুহৃদক হাত করিল। বলিল, 'সত্যি নুপেন ইলা অতি নিচট আদ্যায়।'

দীপালী কহিল, 'আর আজকাল আপন ভাইয়ে যখন হচ্ছে তখন তো কথাই নেই।'

'কাদের?'

'বরুণ, চা নিয়ে আসি।'

গীতাংকু ভাবে, 'হঁ ময়েদার করবে রাজনৈতিক সব বল মোটে না হাঁ ময়েদারি তার আবার তত্ত্ব আবার

এক বিপ্লবের নিয়মিতরূপে দীপালী ও তাহার বনমাণী পাঠককে বলিয়া। বনমাণী পাঠে মগ্ন। গীতাংকু লিপনরতা। সমুখে দুইটা পুস্তক। একটা মুক্ত অঙ্গ বদ্ধ। একটা ইংরাজী হইতে বাংলা অভিধান।

ককটী নাতিলীষ কিন্তু সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা সে বরুণ মনে। বনমাণীর একমাত্র আনন্দ পুস্তক জয়ের অধ্যয়নে এবং দীপালীকে তাহা অধ্যাপনায়।

বনমাণী দীপালীর বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভগ্নাংশ পরম্পর প্রীতি প্রীতিতে পরস্পরের দ্বন্দ্ব উল্লসিত। বনমাণী

সহজ দীপালীর শিক্ষা ও সংগঠনের ভার লইয়াছে।

এর সময়ে তৃতীয় আসিয়া সংবাদ দিল গীতাংকু রাহা। পাঠরত বনমাণী শুনিলা। দীপালী বসে হইল—এমন সময়ে গীতাংকু কখনো আসে না।

দীপালী গেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দাদা গাইবার পূর্বে নিশ্চয়ই কক্ষ ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প লই, কিন্তু সে উঠিলে তাহার অব্যবহার ছায়া পুস্তকে

বসে বনমাণী দৃষ্টি তুলিল, 'কোথায় থাকিস?'

'গীতাংকুবা এসেছেন।'

'তা' এখানেই আছেন না।' বলিয়াই বলিল 'তোরা

কি তাঁর কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে?'

'না।' দীপালী 'না' বলিতেই বনমাণী তৃত্যকে

স্বাত্ত্বিক এই কক্ষে প্রেরণ করিবার জন্ত আদেশ দিল।

দীপালী নিরুপায় হইয়া তাহার পাতা বন্ধ করিল।

এ পুস্তকখয় আনবারীর ভিতরে রাখিবার জন্ত উদ্ভত

হইল।

বনমাণী কহিল, 'কেন? তিনি কি জীর্ণিকার

দীপালী নন?'

দীপালী দ্বিতীয়বার নিজেকে নিরুপায় জ্ঞান করিল।

যেই বাতা পূর্ণস্থানে রাখা করিয়া চোয়ানে বলিল।

দীপালী প্রগতিপূর্ণ পুস্তক, আধুনিক, উদার মূলক

স্বাধীন লগাটে বনমাণী কর্তৃক এই বিভ্রম আরাপিত

হইতে দেখিয়া সে বলিল, 'না, না—মোটো তা' নয়।

দীপালী পক্ষে তোমার চেয়ে অধিক চুক্তির বাণ তাঁর

মত।

বনমাণী অভিমান্য পূর্ণকিত হইয়া উঠিল। সেই

দীপালী গীতাংকু প্রবেশ করিল। গীতাংকুকে আপনায়

বৈঠানিয়া সে সোৎসাহে কহিল, 'এই তো চাই।

দীপালী বিষয়ে আপনায় মত অভিমান সকলে পোষণ

হইল আমি সত্যি স্বহী হ'বো।'

গীতাংকু প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া কক্ষের চতুর্দিকে

দীপালী দৃষ্টিপাত করিল। এই কক্ষে সে এই প্রথম

বর্ণিত করিয়াছে। কক্ষে পুস্তকের আধিক্য দর্শন করিয়া

দীপালীর সমুখে রক্ষিত পুস্তক এবং বাতা গেলিল

দীপালী সে কথার তাৎপর্য্য দৃঢ়দৃষ্ট করিল। পরে বলিল,

'সে তো ঠিক কথা। হিটলারিজম আমি একবারের পছন্দ

করি না।' হস্তব্রিত পুস্তক টেবিলে ধীরে রাখা করিয়া

বনমাণী কহিল, 'হ্যাঁ, যথার্থ বলেছেন।' এই দেখুন

না এজ্ঞ আমি দীপালীকে নিজে পড়িয়ে থাকি। এই

যে সব বই দেখছেন, কয়েকখানা বাদে সে সব

পড়োছে। কোন কোন অব্যবহার ছায়া পুস্তকে

কোন কোন বই নিজের ভাষায় reproduce করেছে।

আজও পড়তে বসেছিল—এমন সময় আপনি এলেন।

আজকের পাঠ কি ছিল জানেন? জওহরলালের

আত্মচরিতের বঙ্গাভাষ্য। বেশ কতকটা লিখেছে।

আমাকে এখনো দেখাননি। বলে শেষ করে একবারে

দেখাবো। প্রথম তো করতাই চায় না, বলে, পারবো

না, বলে সন্তোষবাবুর অহবদাটা একবার পড়ে নি।

আমি কিছুতে রাজী হইনি। কি বলেন, ভাল করি

নি? তাহ'লে originality থাকতো কি? ঐ বইয়ের

ছায়া এসে পড়তো। গান্ধীর আত্মকথায়ও সে অহবদ

করেছে যদিও—বুলেন না?'

বলিয়া দীপালীর পানে

অপাঙ্গে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

গীতাংকু দৃঢ়দৃষ্ট করিল কেন দীপালী গান্ধীজীর

আত্মকথার তৃতীয় খণ্ড জয় করিবার অর্থ সংগ্রহ



এক ভূমুকেই রোজায়া

টমের চা

করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেন সত্যেনবাবুকে জগদ্বন্দ্বীর আত্মজীবনী বঙ্গবন্ধু করিতে অস্বস্তি করিবে। কেন সে অন্তিমতে ইজা-নুগেন পরিণয় যত্নে আবদ্ধ হইবে?

সীতান্তর দৃষ্টি হইতে মধ্যাহ্নমার্গের ধরবোস্ত্র নিম্নে অস্তর্য্য হইল।

দীপালীর কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। সীতান্তকে নম্রকার জ্ঞান করিয়া সেই যে বাহিরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়াছিল তাহা এখনো কিরায় নাই।

মাস দুয়েক পরে সীতান্ত তৃতীয়বারের চেষ্টায় দীপালীর কক্ষাভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িল। দীপালী তখন আগ্রাম কেন্দ্রার অর্ধ শায়িতাবস্থায় কড়িকাঠে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া কি ভাবিতেছিল। পদশব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র দৃষ্টি নামাইল এবং উদ্বিগ্না দীর্ঘায়া যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিল। একটা চৌকি সীতান্তর অভিমুখে টানিয়া দিয়া অস্বস্তি করিল, 'বহন!'

'না, বসবো না!'

দীপালী সীতান্তর পানে চাহিল। সীতান্ত বলিল, 'মানে বসার দরকার নেই।' একটু থামিয়া কহিল, 'আমি মার্জনা চাইতে এসছি।'

দীপালী নির্বাক রহিল।

সীতান্ত ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, 'তোমাকে সত্যি ভালবেসেছি দীপালী!'

দীপালী মুহূর্ত্তে কহিল 'অযাচিত উপদেশের বাহ্যায় হইতে পারি, কিন্তু দান্তিক সংশয়ের কটককে বড় ভয় করি।'

পতনের কুশাগ্র সীতান্তর জ্বর হইতে শোণিত ফরণ করিল।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে



'কে' ইঙ্ক

প্রস্তুত হইতেছে

রসায়নশাস্ত্রে অতিশয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে
• উপায়ে অধিকতর অম্লভাবের ফলে
'কে' ইঙ্ক কালি আশ্রয়িত হইতেছে
শেয়ে ব্যবহারে অল্পক্ষণে আশ্রয়িত হইতেছে
যাহে একত্র করা হইয়াছে। এই হ্রস্বপের
বাহ্যেও বাহ্যেও কালিও ফাউন্টেন পেনে
কোনও রকমে অক্ষত রাখিয়া দেওয়া যাই
সে মিলে এবং কালিও উৎকর্ষ,
স্থিতি ও দৃঢ়তা ইত্যাদির
বিশেষ সুরক্ষা-পূর্ণ রাখিয়া 'কে'
ইঙ্ক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

'কে' ইঙ্ক

কমহারে



* নিবে ঘনিষ্ঠা ধরে তা
* অখাণ্ড গতিও লেখা হয়
* তলানি পড়ে' তা

বালীগঞ্জ কেমিক্যাল ওয়ার্কস
বালীগঞ্জ • কলিকাতা

BC3

© SP5

হসনিকা

(২)

প্রেম

দুঃখ দাস, এম, এ, পাশ,

কর সচরিত্র পাত্র—বেরিয়েছেন সবেমাত্র

মন, তারো চেয়ে! হেঁ হেঁ হেঁ!

ইরাকীতে একবারে ফাস্টো কোলাশ।

বোজ্জি থামে বাস,

দোর মিডিয়েট দ্বাশ,—

সেতে শুনাতে? সত্যই সাবাস!

কি করবে এম, এ, পাশ!

অগত্যা দীর্ঘাশ্বাস, আর হা ত্তাশ।

মিয়ার,

দিকও গুল্টায়

গোমপৌরিক রাস্তায়

জরদিন এ শুকে জানায়...

হায়,

কতারা কেউ রাজি নন,

সোজা কক, বরদাস্ত হবে না আচরণ!

ভয়ংকর রক্ষণশীলতার গর্জন।

জ্বালায়,

দু'জনে পালায়

একবারে দুধুর আমবালায়।

দু'বাড়ীর মা,

ছড়িয়ে হাত পা,

কি কামাটাই না কাদেন, আহা!

তারপর,

দীর্ঘপত্র, প্রতিচ্ছত্র ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা হয়,

আর এইত চেয়েছিল উভয়

অতএব শুনছেন মশয়

চিরদিন প্রেমেরই হয়ে থাকে জয়।

—আরম্ভণক

নীহার
আমলা
অনুপম দুগ্ধাঙ্গি
কিম্বাটিল



নিয়মিত হারমোনে
মস্তিষ্ক শীতল রাখে
ও বেশ সুস্থি করে

শ্রীশ কেমিকেল ওয়ার্কস-কলিকাতা

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আমলকীর অশেষ গুণের উল্লেখ
রহিয়াছে। ইহা জরা প্রতিরোধের অমোঘ অস্ত্র।
আমলকীর তেলেও আমলকীর বহুগুণ বর্তমান।
“নীহার আমলা” সেই আমলকী তেল হইতে
প্রস্তুত অকৃত্রিম ও মহোপকারী কেশ তৈল। মস্তিষ্ক
শীতল রাখিতে ও চুলের অকাল পকতা নিবারণ
করিতে ইহা অদ্বিতীয়। বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে
আমলকীর তেলের সহিত অমৃত্যু বনজ তেজ
“নীহার আমলা”কে অধিকতর ফলপ্রদ করা
হইয়াছে।

শ্রীশ কেমিকেল ওয়ার্কস
১৫ডি, ভবনাথ সেন ষ্ট্রিট, কলিকাতা

“অঞ্চলের-নিধি”

(এক-নাটক)

রচনা—কুমারী প্রতিমা ঘোষ

ভানুদাস বাচস্পতি—টোলের প্রধান অধ্যাপক ও অতিথিতা।

মনোমোহিনী—বাচস্পতির স্ত্রী। সুপ্রভা—হীরালালের কন্যা। মীনা—সুপ্রভার কন্যা। হীরা মা—মি।

প্রথম অঙ্ক

(১ম দৃশ্য)

[বাচস্পতির বাড়ীর অন্দর মহলের একাংশ। রাত্রাঘরের দালানে মনোমোহিনী রাত্রার জোপাড় করছেন, কাছেই হীরা মা বাটনা বাটছে। বৈঠকখানার দিক থেকে বাচস্পতির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।]

সরস্বতি মহাভাগে খিঁজে কমললোচনে
বিরূপে বিশালাকি বিজ্ঞান দেখি নমস্কতে।

হরিয়া, এই হরিয়া।

মনো—হরিয়া নেই, বাজারে গেছে, কী বোলছ?

বাচস্পতি—এদিকে একবারটা এসো, আচ্ছা বাচ্চ, আমি-ই যাচ্ছি।

(বাচস্পতি উঠে এসে, হাতে কয়েকটা কাগজ ও পেন্সিল)

—হুঁ, কী বোলছ, হরিয়া বাজারে গেছে? না—আচ্ছা জালালে তো। আচ্ছা বাচ্চ, হ্যাঁ দেখ—রাত্রাটা আজ একটু তাড়াতাড়ি কোর, টোলে আবার একটা মিটিং আছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে—বুঝলে? দেখো যেন দেবী না হয়।

মনো—এই কথা বলবার জেজ হরিয়া হরিয়া কোরে সাতপাড়ার লোক জড় করছিলে? আর রাত্রার কথা যে বোলছ—রাত্রার আবার কোন দিন দেবী হয় তুমি? যা বললে বয়ে—এরপরে কোন দিনও আর আমাকে এ বিষয়ে কোনরকম অপব্যব্র দেবেনা বলে রাখছি। নিজের যেতে হয় দেবী! আর আমার রাত্রার দেখ হ'ল? বলি, কী! নদিন সকাল সকাল রাত্রা করে রাখিনি

বলতে পার? কী, কথা কইছ না যে? মুখের রাগ

বুঝি একেবারে হরে গেল?

বাচস্পতি—(আমতা আমতা করে) কী যে বলছ? তোমাকে কি সেকথা বলতে পারি—তুমিই দেখা হচ্ছে। আমি কি মন থেকে পড়ব—তুই-ই এবাড়ীর কী বলে একেবারে লম্বাঠাক্কণ! তোমার

বলিনি—

মনো—থাক্ খুব হয়েছে, এখন ভাবছিলে কেন না বাচস্পতি—ও! হ্যাঁ দেখ—হরিয়াকে কিছু বলতে আনতে দিতে হবে। হাতের কাছে যা বাতাপজরী সব লিখে ফেলছি, এখন পরিকার কাগজ আর একটা নেই, সব ফুরিয়ে গেছে, সেইজন্মে ডাকবিহীন বোটাচ্ছেলে কখন আসবে বলতে পার?

মনো—কি এত লিখেছ তুমি?

বাচস্পতি—মেজ বো, এবার এমন জিনিষ আর করেছি, যার তুলনা নেই। শব্দগুলার বাংলা অর্থ বের দিচ্ছি, কী স্থলর যে হচ্ছে কী বোলব, একটু মজ দিচ্ছি? তুমিবে না? আচ্ছা দেখ—এই যে (কাগজগুলি দেখাওলেন)

মনো—কি! এই সকালবেলাতেই আবার ভানুদাস শুরু হল! এর বেলা দেবী হচ্ছেনী? রাত্রা সাদা পরিষ্কার বৃথবে কাগজ এনে বলে কিনা—শব্দগুলার লিখি! কেন বো? না হয় মুখ্য-ই, জাতির সঙ্গে, তাহ'লে আর বাটতে হ'ত না হীরা মা, তার নেহাই কই মাতের প্রাণ, তাই বেরোয়ায়।

মত পণ্ডিত-ই নই—সেইজন্মে এত খোয়ায়?

(চোখে কাগজ দিয়ে)

বাচস্পতি—মেজবো—ও মেজবো—বিবাস

আমি অতটা ভাবিনি। দেখা বাতাতা না এনে

৫০০]

মনো—ভুল, ভুল, খালি ভুল। এমন করে আমার কী আশিষে, মুড়িয়ে খেলে।

বাচস্পতি—কি মুসকিল, কি মুসকিল! কী আর বলতেছি যে, না: আজ দেখছি সকাল থেকেই মেঘলা

বদল—যাই এগুলো রেখে আনের উদ্যোগ করিগে। (প্রস্থান)

হীরা মা—ও মা, এগুলো তুলে রাখ, বাটনা বাটা

মনো—দেখলি, হীরা মা, কাণ্ডটা একবার, সাদা

করে কাগজগুলো এনে বসেন, 'পড়ে দেখো, কেমন

বদল—হীরা মা—বাবা আমার মাতার মামুষ—একেবারে

বদল—হীরা মা—বাবা আমার মাতার মামুষ—একেবারে

মনো—পাম বাচ্চা, আবার গুর হয়ে ওকালতী শুরু

মনো—চিঠা কাগ আমার এমন জলে পুড়ে গেলো।

মনো—কিছুই যদি ঠিক থাকে। রাত্রার

মনো—একটা না একটা কিছু হারিয়ে আসবে।

মনো—আবার ন'কাকার সঙ্গে কোথায় যেন যাচ্ছিল

মনো—করে—যখনই কণ্ঠাকটার এসে পাশে দাঁড়ায়,

মনো—একবার করে টিকিট করে—এমন করে

মনো—সাতখানা কি আটখানা টিকিট করেছিল। তুমি

মনো—হেসে মরি।

৪-ক

[অঞ্চলের নিধি]

চট করে, ততক্ষণে আমি ডালটা গাঁতলে দিয়ে

আসি। (রাত্রাঘরে ঢুকলেন)

(বাচস্পতি বৈঠকখানা থেকে হস্তদ্বন্দ্ব হরে বেরিয়ে এলেন)

বাচস্পতি—উঃ কি ভয়ঙ্কর দেবী হয়ে গেছে, আমি

চান কোরতে থাকি, ওগো শ্রীমুগির ভাত পাও।

হীরা মা—বাবা—ভাকছিল কেন গো?

বাচস্পতি—ও হ্যাঁ—গামছা—গামছাটা কোথায় গেল

বলতে পার? এ বাড়ীতে যদি কোথাও কিছু ঠিক থাকে,

তেল মেখে তখন থেকে ঘুরছি, সারা ঘর তোলপাড়

করছি, অথচ গামছা পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার মা কোথা

গেল? বল বল শ্রীমুগির করে দিতে।

হীরা মা—ওমা, বাবা গামছা চাচ্ছেন যে এসে দিয়ে

যাও।

মনো—(বেরিয়ে এলেন) হীরা মা তুইও কি জানা

হলি? আর তুমি বুঝি চোখের মাথা খেয়ে বসে

আছে? গারা ঘর তোলপাড় করছি, গামছা পাওয়া

যাচ্ছে না? অহা-হা! বলি, গামছা কোঁচ করে যে

ঘরে বেড়াচ্ছো, সে খোয়ায় আছে? বয়েসটা দিন

দিন কমছে না বাড়ছে?

বাচস্পতি—এ্যা, কী? আরে তাইতো, তাইতো,

খিঁজি ছিঁ, কি মুস্কিল, আমি বুঝতেই পারিনি বুঝতেই

পারিনি। (প্রস্থান)



হাসর না—(হাসিতে হাসিতে) চের চের মাহুশ দেখিতে যা—

মনে—ধামি, বাহা, নিজের জ্বালায় মদুছি আমি... আর বোলোনা একেই তুলের অন্ত নেই, তার গুপের গুপকীর্তন হচ্ছে শুনেই হয়ত ইচ্ছে করেই আদো কুলো সেজে বসে থাকবেন। তখন মরতে হবে আমাকেই।

(২য় দৃশ্য)

[কয়েকদিন পরে—বাচপতির বাড়ী, বাচপতি আহারে বসেছেন, মনোমোহিনী হাতপাখা নিয়ে হাওয়া কোরছেন।]

মনো—দেখো, ওবাড়ীর সার্বিকীটাকরণ বহুজ্বলেন যে ছবিয়ার, যারেনে, তাপের যদি ছবিধে হয় তাহলে বদনীনাথও দর্শন করে আসবেন—বেশ ছবিধে আছে মাঝার। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিজন, যে আমি যাব কিনা। তুমি কি বল? আমার তো ইচ্ছে যাই।

বাচপতি—ঠাঠী কোরছ মেজবো? তুমি যাবে আমাকে একলা রেখে? যেতে পারবে?

মনো—সে কি গো? যেতে পারবনা কেন?

বাচপতি—কখনো যেতে, পারবে না দেখো—আমাকে একলা ফেলে—অসম্ভব।

মনো—উহ, এবার আমি যাবই—একলা রেখে মানে? এই বুড়ো ব্যসেও ভয়? কচি বোকা যেন।

বাচপতি—সে যাই হই না কেন? সত্যি বোলেই মেজবো? একটুও গিযো না?

মনো—বিশেষে হবে কেন? সত্যিই যাব।

বাচপতি—কখনো না—এবার তোমার, যাওয়া হ'তেই পারে না। তুমি গেলে আমাকেও যেতে হবে। কিছুদিন আগে চৌলটা নতুন খুল্লম, ভুল করে চালাতে যবে পুঁটা। এখন যদি আমিই চলে যাই—তাহলে ওটাকেও এই সঙ্গে বতম কোরতে হয়—তাহলে ধর না—

মনো—সুখেরই না—না। এখন যাব, খেলতে নেই, পুলে নেই। খুব কোন সখ নেই, আমিও আচ্ছা

করবার কিছুই নেই।। যাবার মধ্যে যাই শুধু আমার বেশি আমার যাওয়ায় বাধা দেবার সাধ্য হয় কার? নাকে একবার করে তীব্র কোরবে, তাতে আমার বাধার না তোমার, বোমার? ও কি, খাও?

বাচপতি—আহা রাগ কোরছ কেন? আমি কিছুই করছি। হুন্নে বিষ সমস্ত, রাগতে শিখতে দিন দিন (ভাতের পালা টেলে ফেলে চলে গেলেন)।

মনো—রাগ দেখনা। ওর জ্বালায় বাইরে কোথাও নেবোরাতো পারব না, কি আশার। রাগ করে ভাত তখন এবার কোথাও না হয় নাই গেলে। শেষকালে যেতে উঠে যাওয়া হ'ল। দেখি ভাল একটু থেয়ে—ওঁবা মতো, হুন ঠিক হয়েছো তো। তবে ব্যাপার কি? ভাতের পড়েছে, বুকে দেখ মেজবো, যা বলছি ঠিক কি না।

মনো—রেখে দাও তোমার বোকাবুজি। আমিও রাগ দিয়ে গেল—বেশ লোক তো! যা কুলো বুন। জানি বাপু হবিধে হলেই লোকো যায়। এর ভেতর খাওয়া দাওয়ায় সময় না বললেই হ'ত, যাই দেখিগে রাগ কোরবার কি আছে? এবার আমি যাবই, তোমার রেখে কোথায় গেল। আমার বুদ্ধিগে ছবিধে যেতে যাবার কোন দরকার নেই। দাদারা আছে, বসে বসে এখনি তোমার একটু দেখা শুনে কোরতে। তার চৌলের ছেলেরা রইলো, ভাবনা কি? ও কি না শুটোলে কেন?

বাচপতি—একটু হুন এনে দাওতো।

(মনোমোহিনী হুন দিলেন।)

মনো—ওকি অতখনি হুন, সবটাই বেখে দেবে? এর পর যে মুখে তুলতে পারবে না?

বাচপতি—একবারে হুন দাওনি ভাল? তোমারও হয়—বুকে লে?

মনো—তোমার মত হয় না। থাকগে, এবার যাও—হ্যা দেখ—অন্তদূরে নাও যদি যাই, বস্তিনায়ে যাবই যাব। কিছুতেই আটকাতে পারবেনা, নতুন একটা বাড়ী করেছেন শুনিছ, এবার যাও একদিন।

বাচপতি—(হাত গুটাইয়া) না না, মেজবো বৃথতে পারছনা, এবার অনেক কুয়াশা, বরফ টোমা...

মনো—রেখে দাও তোমার বোকা। কতকাল তো শুনিছ, পড়বার নামও তো দেখছি, এখনো পড়তে পারছনা, এবার অনেক কুয়াশা, বরফ টোমা... আমি আচ্ছা—দুপুরে বড়দার কাছে লোক পাঠাচ্ছি।

বাচপতি—(বেগে উঠে) ছুত্তোর খাওয়া, খাওয়ার কিছুই করেছো। হুন্নে বিষ সমস্ত, রাগতে শিখতে দিন দিন (ভাতের পালা টেলে ফেলে চলে গেলেন)।

মনো—রাগ দেখনা। ওর জ্বালায় বাইরে কোথাও নেবোরাতো পারব না, কি আশার। রাগ করে ভাত তখন এবার কোথাও না হয় নাই গেলে। শেষকালে যেতে উঠে যাওয়া হ'ল। দেখি ভাল একটু থেয়ে—ওঁবা মতো, হুন ঠিক হয়েছো তো। তবে ব্যাপার কি? ভাতের পড়েছে, বুকে দেখ মেজবো, যা বলছি ঠিক কি না।

মনো—রেখে দাও তোমার বোকাবুজি। আমিও রাগ দিয়ে গেল—বেশ লোক তো! যা কুলো বুন। জানি বাপু হবিধে হলেই লোকো যায়। এর ভেতর খাওয়া দাওয়ায় সময় না বললেই হ'ত, যাই দেখিগে রাগ কোরবার কি আছে? এবার আমি যাবই, তোমার রেখে কোথায় গেল। আমার বুদ্ধিগে ছবিধে যেতে যাবার কোন দরকার নেই। দাদারা আছে, বসে বসে এখনি তোমার একটু দেখা শুনে কোরতে। তার চৌলের ছেলেরা রইলো, ভাবনা কি? ও কি না শুটোলে কেন?

বাচপতি—একটু হুন এনে দাওতো।

(মনোমোহিনী হুন দিলেন।)

মনো—ওকি অতখনি হুন, সবটাই বেখে দেবে? এর পর যে মুখে তুলতে পারবে না?

বাচপতি—একবারে হুন দাওনি ভাল? তোমারও হয়—বুকে লে?

মনো—তোমার মত হয় না। থাকগে, এবার যাও—হ্যা দেখ—অন্তদূরে নাও যদি যাই, বস্তিনায়ে যাবই যাব। কিছুতেই আটকাতে পারবেনা, নতুন একটা বাড়ী করেছেন শুনিছ, এবার যাও একদিন।

বাচপতি—(হাত গুটাইয়া) না না, মেজবো বৃথতে পারছনা, এবার অনেক কুয়াশা, বরফ টোমা...

মনো—রেখে দাও তোমার বোকা। কতকাল তো শুনিছ, পড়বার নামও তো দেখছি, এখনো পড়তে পারছনা, এবার অনেক কুয়াশা, বরফ টোমা... আমি আচ্ছা—দুপুরে বড়দার কাছে লোক পাঠাচ্ছি।

হুপ্রভা—বড় পিসী কোথায়? বাচপতি—দাদার ঘরে, গেছে বোধ হয়—যা দেখনা গিয়ে। মিছ—না, শীনা—এসতো পিসি আমার কাছে...

শীনা—না... আমি মার সঙ্গে যাব... বাচপতি—হুপ্রভা—তোমার মেয়ের বেখছি আমাকে পছন্দ হ'ল না—হা-হা-হা—

হুপ্রভা—বাবুনা শীনা—দাদার কাছে, আমি একুণি আসছি।

শীনা—না আমিও যাব...

হুপ্রভা—জাচ্ছা চ।

(শীনা সহ হুপ্রভার প্রস্থান)

(বাচপতি দেখায় মন দিলেন, কিছুক্ষণ কেটে গেলে, পুনরায় হুপ্রভার প্রবেশ)

হুপ্রভা—পিসেমশাই, ও পিসেমশাই—পিসী কোথায়? মারা বাড়ী, মাঝ ছান, পর্যাপ্ত হ'লে ওল্ল, কোথাও নেই—

বাচপতি—ও হ্যা হ্যা—বড় ভুল হয়ে গেছে, বড় ভুল হয়ে গেছে, তোর পিসী তো এখানে নেই, তোর বাবার সঙ্গে গেছে বস্তিনায়ে, সে প্রায় অনেকদিন হ'ল রে...

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

হুপ্রভা—আচ্ছা তুমি কি বলতে? পিসেমশাই, বাবা যে বস্তিনায়ে গেলেন তা জানি—কিন্তু বড় পিসীকেও যে নিয়ে গেছেন তাতো শুনিনি। আর সেও তো এখানেই হ'ল—প্রায় তিন চার মাস হ'তে চলল—এতদিন পিসী নেই, অথচ সব ভুলে গিয়ে নিস্কিয়ারে তুমি বলে দিলে, "তোমার বড় পিসী রান্নায়ে!" উঃ কী দারুণ লোক তুমি!

বাচপতি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ তোরা পিসেকে তো জানিনা
না লক্ষী, সস্তি তোকে খুব কষ্ট দিখ্য, নারে! আচ্ছা,
তুই একটু বোস—আমি চট করে এই পরিচ্ছেদটুকু শেষ
করে নিই, কি বল?

(লেখায় মন দিলেন)

মীনা—মা বড় তেঁতা পেয়েছে, একটু জল খাব...
হুগুড়া—ঐ যে একটা জলের কুঁজো রয়েছে, দাঁড়া
দিচ্ছি। ওমা—একটাও গেলাস নেই যে, তুই বোস—
নিয়ে আসি আমি।

(হুগুড়ার প্রস্থান)

মীনা—(কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) দাছ তুমি কি
লিখছ? আমি তোমার থেকে ভাল লিখতে পারি...
ইরিভিতে—

বাচপতি—বটে! তা তুই পারবি,—খীকার করছি,
কত বড়লোকের নাতনী তুই বল দিকিনি।

মীনা—বলব? আমার দাদুর নাম হচ্ছে—মিষ্টার
স্বামদাস পণ্ডিত বাচপতি।

বাচপতি—হাঃ হাঃ হাঃ—কে শেখালে তোকে
এরকম করে বলতে, এ্যা? সেতো দেখছি মহাপণ্ডিত,
বাক বল মহামহোপাধ্যায়...

মীনা—মা শিখিয়েছে। বাবার নাম বলব? বাবার
নাম—শিখের মাই ফাদার চট্টোধ্যায়, মার নাম মা
চট্টোধ্যায়—দিদির নাম...

(হুগুড়ার প্রবেশ)

হুগুড়া—বাচ্চা গুণগির...পাপলের মত কি সব বকে
চলছি?

মীনা—বাবার—দাছ জিজ্ঞাসা কোরলে...

বাচপতি—ওকে বকছি? কেন? যেমন তুই
শিখিয়েছিস, তেমনি তো বলবে? বলতো দিদি, তোর
নিজের নামটা—

মীনা—(ভয়ে ভয়ে) মাই নেমিচ্চ মীনা চট্টোধ্যায়।

হুগুড়া—আবার? এক নখের কান্দিছ? হয়েছে
বেটেটা—চট্টোধ্যায়? চট্টোধ্যায় কিরে?

বাচপতি—তুই-ই তো শিখিয়েছিস—সেইজন্মেই তো
চট্টোধ্যায়ের আরণ্যার চট্টোধ্যায় হতে হয়েছে। যেমন
শুক... ..

হুগুড়া—তখন তোমার কাছে থাকতেই চাইলনা
—আর এখন অনর্থক বকছে...

বাচপতি—এতক্ষণ ও আমাকে দেখে মনে মনে
টিক করে নিয়েছে যে আমাকে ভয় করার মত কিছু
নেই, নেহাৎ-ই ভাল মাছ, চুপচাপ লিখি বসে।
কি বলবে?

হুগুড়া—হ্যাঁ তোমার কাছে বসবে বৈকি? মীনা
ওঠ, পিসেমোশাই, চল আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাচপতি—কেন কেন—কি হ'লে পরাগী? ঐ
এলি, আবার একটা চলে যাবি—তার মানে? না
হয় তোর পিশিই নেই—তাব'লে একুশি চলে যাবি!
থাক না ছুদিন, রান্নাবান্না কর, খাওয়া দাওয়া কর।

হুগুড়া—সে কথা আর বলতে? যা যরদোরে
অবস্থা করে রেখেছ, সমস্ত যরগুলো জুড়ে আরগোলা
আর মাকড়সার বিরাট রাজত্ব। রাজ্যের মূলে, আবর্জনা,
পানের পিচ-এ বাজী ভর্তি। আলুনাটা দেখতো একবার?
রাশি-প্রমাণ জামা কাপড়ের ভাণ্ডার ওর হুঁকটা, পঞ্চর
মূলে গেছে। ছিছানার চাদরময় কালির ছাপ, ঐ বেস
এখনও দোয়াতটা দিয়ে কাপী পড়ছে...কি বলতো তুমি!

বাচপতি—তোরা পিসেকে তো চিনিস? না, আমি
কি আর ওসব পারি? না, পোষায় আমার? তোর
পিশী সব জন্মেও এখানে এলো না, বলতো দর-
দোদের এই অবস্থার জন্মে আমি দায়ী, না তোর
পিশী দায়ী?

হুগুড়া—যেই দায়ী হও—তোমাকে দেখে সচি
মায়া হয়। জলখাবার জন্মে গেলাস আনতে গিয়ে
যদিও বা একটা কাচের গেলাস যোগাড় করছ,
তাও তার মধ্যে একগাদা আরগোলা। একটুকু
সাবানের জন্মে বাথরমে গিয়ে বেথি, সাবানদানীতে
জলে আর সাবানে একাকার, তার ওপর জাল বুকে
রাজ্যের মাকড়সা। আর অজ কোন পোশাক নেই!

বাচপতি—থাকবে কোথা থেকে, একটা ছিল...
দি সেও তো একটো; আমার জন্মে একটা বাটি,
এটা গেলাস আর একটা থালা বাইরে রেখে তোর
পিশী সব বাসন সিন্দুকে পুরে রেখে গেছে।...ছবিয়া
রোটে থেকে ভাত এনে দেয়—তাতেই আমার চলে
যায়।

হুগুড়া—তোমার চলে যেতে পারবে, আমার মায়
না বাবা—প্রাণ আমার হাপিয়ে উঠল মাত্র এই
ময় খট্টা এসে, আর তুমি এতদিন রয়েছ সম্পূর্ণ
নির্ভর করছ? এরকম নিশ্চিন্ত হওয়াই বোধহয়
যোয়ের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য? নমস্তার প্রতিভার
শ্রী, এখন চল আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে চল—
বাচপতি—নেহাৎ-ই এখন তুই থাকবি না—তখন
হ'বেই আসি। তোর পিশীর যে কবে দয়া হবে
কেনো...হুগুড়া—হুগুড়া—

(৪র্থ দৃশ্য)

গানবাস বাচপতির গৃহের বৈঠকখানা। বাচপতি ধীরে
ধীরে বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরছেন...

বাচপতি—মেয়েটাকে পৌঁছে আসতে আসতেই
য সব্বো হয়ে এলো। উঃ আচ্ছা কি চাঁদের
মাস? চতুর্দশীর চাঁদ...ভয়ের দিন আজকে। টায়ে,
বাস, রাশায় সকলেই আজ জলখাবি করছিল যে
য নাকি একটা কিছু হবেই হবে...কে জানে আজ
কাজে কি আছে... (দূরে সাইরেনের শব্দ) ঐ রে
হিয়ে...এ্যা সাইরেন বাজছে যে...সরুশাশ, কি হবে।
এবার, পিরা ছুটোছুটি কোরছে, ও-মামা এলোয়নের
বগরাজ যে পাওয়া যাবে...কান্দানী মেন নিশায়ই এটা।
ওঁ গো একটান আওয়াজ। কি করি? গিগী, ও গিগী...
হুগুড়া-বিভিন্নভাবে বসে, যখন বিদ্যা হবে তখন বুকেবে।
গায় যাক গিগীর বিদ্যা হওয়া—উপস্থিত থাকি এখন
ইরি...আমি যে মারা পড়ছি। চুকে পড়ি টেবিলটার
সান...এই যে একটা সত্যকথি রয়েছে...বাবা হাত পা

ওলো টুকটুক করে কাপছে যে...আচ্ছা করে এটা দিয়ে
মুড়ি দিই (সত্যকথি মুড়ি দিলেন) ওঃ এবার ঠিক হয়েছে।
মিসারিন, তুলো...সব ওপরে পোষায় গর। নিয়ে
আসব? না বাবা...কাজ নেই...ছবিয়া বেটাও স্নায়োগ
বুকে গর পড়েছে। যাক্কে মরি যদি আজ, তো ভুত
হয়ে থাকব, কোন বেটাকে মার এ বাড়ীতে চুকেতে
দেবনা, মায় গিগীকে পর্যন্ত না।

(যোমা কাটার মত শব্দ)

জয় জয় নারায়ণ জয় শিব শব্দ, কানটা জোরে চোপ
ধরি বাবা।

(বাচপতি চুপ করে পড়ে রইলেন টেবিলের তলায়,
সত্যকথি থলা থেকে একখানি পা শুধু বাইরে বেরিয়ে
রইলো)

(একটু পরে মনোমহিনী ও হীরালাল প্রবেশ করলেন)
হীরালাল—কইরে কেউ কোথাও নেই, বাড়ীর দরজা
খোলা...

মনো—সব আর কে বড়দা! উনি তো একাই। আমি
কোথাও গেলে একবারে একসাতা থাকেন।

হীরালাল—চাকরটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না।

মনো—সে কি আর দিনরাত থাকে! আমাকে তবু
ভয় করে, শুঁকে কোয়ার ও করে না। একেবারে মাস্তির
মায়া।

১০ টাকায়

১৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দার্জিলিং ব্রেও চা

(পাতা-গুড়া-জোকন)

বিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পত্র জাহান।

বাবা টি কোম্পানি

২৭২, ক্যানিং স্ট্রিট ও ১৩৭, বোম্বাই স্ট্রিট

অথবা

দি এসোসিয়েটেড ব্যান্ক অফ ত্রিপুরা

যে কোন শাখায়।

হীরালাল—সে কথা আর বলতে। দেখি মাতীর মাহুখ কোথায় আছেন।

মনো—এখানে তো দেখতে পাচ্ছি না। চল, ওপরে দেখিগে। তখনই, এখানে আবার যানিকল্পন আশে সাইরেন বেজেছে—ও বড়লা দেখ দেখ। আরে টেবিলের তলায় কে রে? এই হরিয়া, ওই, এখানে পড়ে আছিল কেন? (হাসি)

হীরালাল—মনো, তোর চাকরটা তো খুব মজার? এই মেটা, ওই, ওই, তোর বাবু কোথায় রে? এমনি করে বসে আছিল কেন?

মনো—ওমা, একটা পা বেরিয়ে রয়েছে। ও হরি—এতো হরিয়া নয়, বড়লা তুমি কাকে কি বোলছ? ওতো হরিয়া নয়, ওবে তোমার ভগ্নীপোতা।

হীরালাল—হাঃ হাঃ—কি যে বলিস মনো! তোর বা বুদ্ধি হচ্ছে—বোটা উড়িয়ানন্দ না হলে কি আর কেউ এরকম করে সতরকি মুড়ি দিয়ে বসে থাকে? শ্রামাদাসকে ছুতে পারনি তো—আমি তো জানি ওকে।

মনো—তুমি শুধু ছেনেজ-ই, চিন্তোতা পার নি, যদি আমার মত ওর সঙ্গে সন্সার করেতে চাহলে চিন্তে পারতে। তুমি জাননা, ভয় পেলে ও সব-কিছু কোরতে পারে—তাহাড়া পাটা দেখনা—একি হরিয়ার পা?

হীরালাল—তবে কি তোমার শ্রামাদাসের শ্রীচরণ?

মনো—আচ্ছা বড়লা, আমার কথা শোনোইতো।

আগে মুখের ঢাকাটা—

হীরালাল—(বাইরে টানলেন) গুলবো কি করে? আগে টেবিলের তলা থেকে বার কর।

মনো—(সতরকি ধরে) ওগো তুমিছো? বেরিয়ে এসো—এখানে বসে আছ কেন?

হীরালাল—নর তুই—মুখের কথা বেরোবে না, তুই পা-টা ধরতো—আমিও সতরকি শুদ্ধ, টোটা বার করছি। উঃ কী জোর দেখছি? একবারে কাঠ হয়ে বসে আছে—বাপ্পের বাপ্প—খাম বেরিয়ে গেল—

উঃ—নে এবার মুখের ঢাকাটা খোল—

(হীরালাল সতরকি শুদ্ধ বাহিরে গেলেন)

মনো—ওগো, ঢাকাটা গুলে দেখই না আমার এসেছি—

হীরালাল—শ্রামাদাস, দেখ, আমি তোমার বড়লা, হীরালাল।

শ্রামাদাস—(খীণ স্বরে) বাবা হিটলার, তুই হাজার বছর বেচে থাকো বাবা! এত কষ্ট করে তুমি এলে? আমি তো কিছু করিনি—

হীরালাল—(ধমকের স্বরে) কি যা তা বোকা শ্রামাদাস! দেখবে মজা? শীঘ্রিণ বেরিয়ে এসো দেখো, মনো এসেছে।

বাচপতি—হিট্—হিট্—তুমি এসেছ বেশ করে শালা হতে চাইছ, তাই হয়ে বাবা, প্যাচাট করে এসেছ যখন আমার বাড়ীতে, তখন যা কোরে বলবে তাই কোরব বাবা—শুধু প্রাণে মেরোনা—

মেজবো বড় কীদবে—(নিচ্ছেই কীদবে লাগিলেন)

মনো—বড়লা একী হ'ল আমার? কেন হয়ে একলা ফেলে জোর করে গিরেজিলুম—বাবা বন্ধনা ভাল করে-নাও শুকে। ওগো ভদ্রহ—

বাচপতি—(চোঁচ লাফিয়ে উঠে) শোনবি তোমাদের, 'ওগো' কে। যত কিছু বলছি না—ভালো মাহুখ পেয়ে বাড়ী চড়াও হয়ে আমার ওপরে অত্যাচার আবার সন্ধ করে নিয়ে এসেছেন একটা জাপানি সন্ন্যাস, রসো, দেখাচ্ছি মজা—(ছোট একটা প্যাচ ছ'হাতে ধরে বাচপতি আঁকালেন শুরু কোরেন)

এস—এস—মুখ দেখি—মুখ করতে এসেছ বোকা—আর এখন পেছিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এস এগিয়ে এসে দেখ, জীতু বাবালীর হাতে কত জোর—

(দীক্ষার দার প্রবেশ)

দীক্ষার মা—বাবা—ও বাবা ও কী কোরছ? তুমি মুখ লাল হয়ে উঠেছ—না তুমি কীদছ কেন? বাবু বাবাকে ধর শীঘ্রিণ—বাবা কীদবে যে—

ধর—

বাচপতি—না—বাবু মুখ চাই—মুখ—(হীরালালের হাতের মধ্যে মুখিত হয়ে পড়লেন)

মনো—(কেঁপে উঠে) দীক্ষার মা, জল নিয়ে আর তাড়াতাড়ি—এ আমার কি হ'ল গো—

হীরালাল—চুপ কর মনো—বুকেই তো পাচ্ছি ভয় পেয়েছে জীবন। একে সাইরেন বেজেছে—জীতু মাহুখ তার ওপরে—মনে মনে ভেবেই হয়ত—নার্জাল ব্রেক-গার্ড। আর—কিছু না—তুই হাওয়া কর, একটা ভাল হয়ে যাবে। (মুখে জলের কাপুটা দিলেন, মনোমহিনী বাঁচল দিয়ে হাওয়া কোরতে লাগলেন। কিছু পরেই হুঁ ভেঙ্গে বাচপতি চোখ চেয়ে উঠে বসলেন—)

বাচপতি—উঃ, আমি কোথায়—

মনো—এই যে, আমি এসেছি দেখ—

বাচপতি—মেজবো? আমার কি হয়েছিল?

মনো—অবস্থা হয়ে পড়েছিল—এখন ভাল মনে

মজা? দেখ বড়লা এসেছেন—

হীরালাল—হুহু হুহু একটু? দীক্ষার মা—তুমি টুট করে একটু হু গরম করে নিয়ে এস তো—হ্যাঁ এত দর পেয়েছিলে কেন?

বাচপতি—ভয়? ও—হ্যাঁ—তা আপনারা এলেন দী করে? আজ জীবন বোমা পড়েছে। বোধ হয় গ্যাস পাউণ্ড করে এক একটা, আমি তো ভেবেছিলাম

মনো—না থাকবার-ই জোপাড়! যা মুক্তি দেখিয়েছিল—বাবা, একমুখে ধড়ে আমার প্রাণ এলো—জয় বাবা বন্ধনা—

হীরালাল—কিন্তু বোমা কোথায়? স্বপ্ন দেখছিলে

বাচপতি—হ্যাঁ স্বপ্ন বইকি? কি জীবন আওয়া! বাপনি থাকিলেও এইরকমই হতেন।

হীরালাল—(হাসিয়া) তা বটে—আওয়া তো

মনো—একবারে তোমার বাড়ীর সামনে-ই হ'ল

বাচপতি—কী হোল তুমি। সাইরেনও বাজল—

হীরালাল—হ্যাঁ হ্যাঁ—সাইরেনও বেজেছে, বোমাও পড়েছে—তুই-ই সত্যি। তবে সাইরেন সজানোর অর্থ হচ্ছে—যে ওটাকে ঠেঁই করা ছিল—তার বোমা বলে যেটাকে মনে কোরেছ, সেটা বোমা নয়। একটা তিন নম্বর বাসনে চাষার বাই করার শব্দ, ছোট্টই তোমার বাড়ীর কাছে—কাজেই তোমার মত জীতু পোকের পক্ষে—

বাচপতি—(লজিত ভাবে)—সত্যি! আমি ভেবে-ছিলুম—

মনো—যাক আর বেশী ভেবে কাজ নেই—এই তর্কের—বাহাদুর বটে—

বাচপতি—তা যাই বল, আমার কিন্তু এখনও ভয় করতে—(মেজবোরের অঞ্চল ধরিল) মেজবো, তুমি তো আমাকে জান। আর আমাকে একলাটা ফেলে কোথাও যেওনা—বুকে? যাবে না বল আগে—না হ'লে তোমার কাপড় ছাড়ব না—এই ধরে-ই-ই-ই—

মনো—ছাড় ছাড়—দাদার গামনে যে কি কর—

আচ্ছা আচ্ছা—তাই হবে—

হীরালাল—মনো, তোর অঞ্চলের নিধিটা বেশ দ্বিষ্ট—

যা উপরে নিয়ে যা—হাঃ হাঃ হাঃ!

যবনিকা

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান
নর্দার্ন ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—৫৬, হোয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখা:—সমলপুর, মেদিনীপুর, পাবনা, হাওড়া, বালিগঞ্জ ও কদমতলা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—
মিঃ এ. রায় চৌধুরী।



ভবিষ্যৎ

(উপন্যাস)

শ্রীমোহন মোহন মুখোপাধ্যায়

৭

কুটিয়া বস্তী, গোশা পার্ক ভিউ—কোথাও আমোদ জমিল না। মুকুল এবং সীতাকে লইয়া জাহ্নবী এমন মন্ত যে আদিত্যর পানে চাহিবার কথা সে কুটিয়া গেল। পার্ক-ভিউয়ে চিত্তাহরণ আশিয়া একটা বেঞ্চে সেই যে বসিয়া পড়িলেন বন্ধ ছাড়িয়া উঠিতে চান না! গিরি-বালায় পা উঠুন করিতেছিল, তাঁকে কখনো রিয়য় চাপাইয়া, কখনো বা তাঁর সঙ্গে হাঁটিয়া অর্থাৎ তাঁর হেঁফাঙ্কতাতেই আদিত্যকে কায়-মন ঢালিয়া দিতে হইল।

বেলা তখন বারোটা...পার্ক-ভিউয়ে কৃপণমায়ার বসিয়া গিরিবালা চাহিলেন চিত্তাহরণের পানে। বসিলেন—কটা বাজলো গা?

ঝড়ি দেখিয়া চিত্তাহরণ বসিলেন,—তা বেশ! বারোটা বেঞ্চে বিশ মিনিট।

হতাসভাবে চারিদিক চাহিয়া গিরিবালা বসিলেন,—এরা গেল কোথায়? তোমার মেয়ে, মুকুল আর সীতা? চিত্তাহরণ বসিলেন—রিখিয়য় করে বেড়াচ্ছে তিন-জনে!

গিরিবালা চাহিলেন আদিত্যর পানে। আদিত্য নিঃশব্দে বসিয়াছিল একথানা বেঞ্চে। গিরিবালা ডাকিলেন,—আদিত্য।

আদিত্য ফিরিয়া চাহিল; কহিল,—আমার ডাকছেন?

গিরিবালা বসিলেন—হ্যাঁ। থিয়ে পেয়েছে তো?

আদিত্য সজ্ঞভাবে মাথা নমাইল, জবাব দিল না।

চিত্তাহরণ বসিলেন—থিয়ে পাবে না? থিয়ের অপরাধ? খোঁড়দৌড় করে বেড়াচ্ছে। তার উপর বারোটা বেঞ্চে গেছে।

গিরিবালা বসিলেন—জাথো রিকিনি মেয়ের কাণ্ড! হট্টাটাটি করে বেড়াচ্ছে! একবার জাথো তো বাউ আদিত্য, কোথায় গেলে সব। ডাকো সকলকে। বসো, মা ডাকছেন, খাবার দেওয়া হচ্ছে!

গিরিবালায় কথায় আদিত্য উঠিল। গিরিবালায় হেঁফাঙ্কতা করিলেও সে লক্ষ্য রাখিয়াছিল জাহ্নবীর দিকে। পার্কে আশিয়া গিরিবালায় হাত ধরিয়া তাঁকে যখন সে রিগ হইতে নামাইতেছিল, তখন অদূরে পাইন-কুঞ্জের আড়ালে মুকুলের সঙ্গে জাহ্নবীকে ছুটিয়া সে অদৃশ্য হইতে দেখিয়াছে, তাদের পিছনে সীতা চলিয়াছে যেন সম্পূর্ণ দ্বারে পড়িয়া অনিচ্ছায় 'মগ' শব্দীতে। এ দৃশ্য দেখিয়া অবধি তার মনের মধ্যে যা হইতেছে—অল কোয়ার্টেট কিঞ্চে দেখিয়াছিল রণ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বার্ক করিয়া চলিয়াছে অসংখ্য ক্ষৌর...তার মনের মধ্যেও তেমনি ক্ষৌর বার্ক!

গিরিবালায় কথায় আদিত্য উঠিয়া সেই পাইন ঝড়ের দিকে চলিল!

পাইন ঝড়ের নীচেই থানিকটা বাস। বাসের উপরে আদিত্যমাত্রে আদিত্য চাহিয়া দেখে, নীচে একটা পাথরের চান্দে জাহ্নবী বসিয়া আছে...একখানি পা, প্রসারিত—সীতা নির্বাণ পাড়াইয়া আছে জাহ্নবীর পাশে এবং মুকুল জাহ্নবীর সেই প্রসারিত পাখানি ধরিয়া সেই পায়ের খেঁচা করিতেছে।

১০৫

[ভবিষ্যৎ]

আদিত্যর মুখো রক্ত চন্দ্র করিয়া উঠিল। ফিরিয়া আদিত্য ফি না...চকিতের দিশা...এমন সময় সীতা তাকে লক্ষ্য করিল, ডাকিল,—আদিত্য বাবু...

আদিত্য সরিয়া আসিতে পারিল না...চুপ করিয়া পাড়াইয়া রহিল।

সীতা বলিল,—এখানে আসুন।

ঘুচা গিহেতের মতো আদিত্য সিয়া কাছে পাড়াইল।

ছুচাখের, দৃষ্টিতে একরশ বেরনা ভরিয়া জাহ্নবী বলিল,—পায়ে চোট লেগেছে!

সীতা বলিল—যে লাফিয়ে নামছিল, লাগবে না?

দাঁবার সঙ্গে হলো বাজি, আনলেন আদিত্যবাবু, বললে, লক্ষ্যেতে লাফাতে একেবারে নীচে নেমে যাবে...

দাঁবার সোপে পড়ে গেল—

জাহ্নবী বলিল—ভাগ্যে মুকুল বাবু এসে ধরলেন, না হলে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে পড়তুম?...

মুকুল একাগ্র মনে পায়ের সেবা করিতেছিল; এসব কথা জবাব দিল না...আদিত্যর পানে চাহিয়াও দেহিল না।

আদিত্য শুন্ম হইয়া পাড়াইয়া রহিল।

জাহ্নবী বলিল,—আপনি হঠাৎ এদিকে এলেন যে!

আদিত্য বলিল—আপনার মা বললেন খাবার নিচ্ছেন—সকলকে ডেকে আনো।

জাহ্নবী বলিল—পা ছাড়ুন মুকুলবাবু...বোধ হয় টাঁতে পারবো।

মুকুল বলিল—ঠিক তো? উঁঙেতে হবে পাহাড়ের গায়ে।

জাহ্নবী বলিল—চেষ্টা করে দেখি। এখানে বসে থাকলে তো চলবে না!

সীতা বলিল—তোমার জুতো কোথায় গেল? হুতো? দাও আমার হাতে।

খোলা জুতা অদূরে পড়িয়াছিল...কুড়াইয়া সীতা সে জোড়া হাতে লইল।

জাহ্নবী বলিল—এবার আমি উঠি। খার মুখ দেখে যাও উঠেছিলেন মুকুলবাবু...পদসেবা করতে হলো!

সহাতে সীতা বলিয়া উঠিল—মেয়েদের রাজ্য পায়ের সেবা...অনেক সৌভাগ্য থাকলে তবে সে অধিকার মেলে! কি বলো দাদা?

সীতার কথায় মুকুলের মুখ লক্ষ্য করিয়া হইয়া উঠিল।

জাহ্নবী বলিল—ভারী কান্না দিয়েছে কুমি সীতা...

তাছাড়া আমার পা রাজ্য নয়। রাজ্য বর তোমার পা ছাধনি। ঐ পা হুঁগানি এগিয়ে বিলে না কেন? মুকুল বাবুর সৌভাগ্য দেখে তখন আদিত্যবাবুর হিঙ্গা হতো!

সীতা বলিল—করো তোমার রক্ত! আমার থিয়ে পেয়েছে...নাশিয়া ডাকছেন, আমি পালাই...

এ কথা বসিয়া সীতা পাড়াইল না...পাহাড় ভাঙ্গিয়া উপরে পার্কের দিকে চলিল।

পাথর ধরিয়া জাহ্নবী উঠিয়া পাড়াইল। চলিবার উদ্দেশ্যে পা তুলিল।

পা কীপে...পড়িয়া বাইতেছিল...মুকুল বণ্ণ করিয়া তার হাত ধরিল।

হাত ধরিয়া মুকুল বলিল—উঠতে পারবেন না...

চলার চেষ্টা করে কাছ নেই।

অহযোগের ঘুরে কণ্ঠ ভরিয়া জাহ্নবী বলিল—বা এর, আমি তবে এইখানেই থাকবো নাকি?

মুকুল বলিল—থাকবেন কেন! আমরা ছুজন আছি...

আদিত্যবাবু আর আমি...আমরা আপনাকে কুল নিয়ে গিয়ে মাসিমার কাছে পৌঁছে দেবো!

জাহ্নবী বলিল—না...না...না। ইটু উড বী সো ক্রাসি।

মুকুল বলিল—আতুরে নিয়ম নাস্তি! বলিয়া সে চাহিল আদিত্যর পানে, বলিল—আমি পায়ের দিক ধরি...

আপনি পারবেন মাথার দিক ধরতে? আদিত্যর চোখের সামনে শুষ্ক সোঁয়ার চক্ক...কোনো-মতে আদিত্য বলিল—আমি বরং পায়ের দিক ধরি।

—বেশ...বসিয়া জাহ্নবীকে ধরিয়া মুকুল তাকে প্রায় বক্ষায় করিল। করিয়া বলিল—আপনি ধরুন পা...

জাহ্নবী বলিল—পার্কের উঠেই কিন্তু ছেড়ে দেবেন...

সত্যি! না হলে লোকে দেখল হাসবে।

—আচ্ছা...

পার্ক আসিয়া জাহ্নবী বলিল—ছেড়ে দিন...লেভেল জমি। হুইটতে পারবো...আপনারা দুজনে না হয় আমার হাট ধরে থাকুন।

তাঁহাই হইল। দুজনে হাত ধরিয়া জাহ্নবীকে আনিয়া বসাইয়া দিল গিরিবালাস্বরের কাছে বসে। সীতার মুখে গিরিবালা এবং চিত্তাহরণ তুমিরাছেন হুইটতার কথা। শিহরিয়া গিরিবালা কহিলেন—পা ডেখে বারনি তো?

মেয়েকে দেখিয়া মুকুল বলিল—না...স্নেন। গিরিবালাস্বরের চোখের পলক পড়ে না। বিক্ষারিত নেত্রে বহু উত্তেজা জমিতে লাগিল। জাহ্নবীর পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

সীতা বলিল—আমি অনেক মানা করেছি যাসিমা। দাদার সঙ্গে বাজি রেখে বললে লাফাতে লাফাতে বাড়ে নামকো—বাস!

গিরিবালা বলিলেন—তুই তো এমন ছিলি না জাহ্নবী!

মুকুল বলিল—আমার দোষ নেই যাসিমা...আপনার মেয়েই আমার বললেন, পারেন আপনি লাফাতে লাফাতে বাড়ে নামকো? আমি বলবুং, না। তাতে আপনার মেয়ে বললেন, আমি পারি। বাজি রাখুন। বাজি আমি রাখিনি...বাজি রাখবার আগেই উনি নামতে শুরু করলেন।

পায়ের ব্যথায় তিনদিন জাহ্নবীর শয্যা ছাড়িয়া নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। এ তিনদিন আদিতার বুকে যেন ভারী তিনখানা পাথর চাপাইয়া বুঝানাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। মন এ-বাড়ী ছাড়িয়া নিম্নেরে জুগ বাহিরে কোথাও যাইতে চায় না। লজ্জা ত্যাগ করিয়া কোনমতে বলিয়াছিল গিরিবালাস্বর...আপনি যদি বলেন, এইখানে থেকে আমি সেবার সাহায্য করতে পারি, না।

গিরিবালা বলিলেন—না, না, যে মেয়ে কারো সেবা পছন্দ করে না বাবা! তাহলে যে হাট ঘরে মানতে হবে।

জাহ্নবীকে একা পুইয়া অষ্টট ভায়ায় ইষ্টিতে জানাইয়াছিল—এমন তোমার অশাচ্ছন্দ্য দূর করতে...

তোমার সঙ্গে যুগে বেড়াবো। রাত্রে পায়ের চোট লাগিয়ে তুমি বিছানা নিলে। এখান থেকে উঠতে আমার মন চায় না।

জাহ্নবী বলিল—বেশ তো, যে ক'দিন আমি নড়তে পারবো না, ঘরে বসে একখানা বই লিখে ফেলুন...

আদিতার মন হঠাৎ করিয়া উঠিল। জাহ্নবী চায় না তার সঙ্গে অথচ চিঠি লিখিয়া...

মন বলিল, চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল অর কারণ মুকুল ব্যারিষ্টার তখন গিয়াছিল কালিমপুর। প্রাণের সাথী সে...দিনগুলো বিরম লাগিতেছিল, তাই! এখন মুকুল ব্যারিষ্টার আসিয়াছে...

বেদনার মন ভাঙ্গিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কোনমতে মাকে সবল করিয়া তুলিয়া আদিতা ভাবিল—মুকুলের প্রসঙ্গে জাহ্নবী সেদিন বলিয়াছিল মুকুলের মাকে গিরিবালা বলিয়াছিলেন আদিতার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহের ব্যবস্থা পাকা এবং সে কথা বলিতে জাহ্নবীর কণ্ঠ এতটুকু কাঁপে নাই! তার চোখের দৃষ্টিতে বিরাগের বাষ্প দেখে নাই। তবে...

কিন্তু প্রত্যক যা ঘটতে লাগিল...

অর্থাৎ আদিত্য সকালে চা বাইয়া হিল-ভিউ হইতে এ-বাড়ীতে আসে। আসিয়া দেখে, মুকুল বেশ পাড়ি জমাইয়া বসিয়াছে। সীতা সঙ্গে থাকে...সে বেনে সেই কাবের পাদপুরণেরে জঙ্ঘ চট্‌বট্‌তির মতো। আসিয়া কোনমতে আদিত্য দেখে, মুকুল বলিয়া জাহ্নবীর সঙ্গে লুভো খেলিতেছে...কোনোদিন রেবস্ এ্যাও ল্যাডার্স...কোনোদিন কারম্, কোনোদিন বা ব্যাণ্ডাটেল। হুং সকালে আসিয়াও দেখিয়াছে, এ ব্যবস্থার ব্যক্তিজন নাই। আদিত্য আসে, বলিয়া খেলা দেখে, চা খায়...চলিয়া যায়। খেলায় জাহ্নবী এমন বাস্তব পাকে যে তার পানে চাহিয়া তার সঙ্গে হুটো কথা কহিবে, আর খেলায় চায় না।

হিল-ভিউয়ে ফিরিয়া আদিত্য ভাবে, গল্পে উপলব্ধি নয়ককে এমন অবস্থায় ফেলিতে সে কাতর হয় নাই...

তাই কি সেই প্রাকৃতিক নায়কের অভিলাষে জীবন্ত তার ভাগ্যে...

হঠাৎ সেদিন সকালে আসিয়া আদিত্য বলিল—আজ আমি চলে যাচ্ছি...

লুভো খেলায় একই আগে জাহ্নবীর হুইটো খুঁটি মুকুল কাটিয়া গিয়াছে...ভাইস্ লইয়া নানা কলহিত বহিয়াও জাহ্নবীর হাতে ছয়ের দান পড়িতেছে...মুকুল ধ্বনিতে ছয়ের পদ ছয় ফেলিয়া খুঁটিগুলোকে পাকাইয়া ফুলিতেছে...জাহ্নবীর ধরা-মাথা কলঙ্ক করিতেছে...তার মধ্যে আদিতার মুখে এই কথা বিনির্গত হইল।

কথাটা জাহ্নবীর কাণে গেলেও মনের দার খোলা গাইল কি না কে জানে। সে শুধু বলিল,—ও...

আর কোনো কথা নয়। জাহ্নবীর দান পড়িল ছয়...দোহাঙ্গো লাল খুঁটি ঘরে বসাইয়া জাহ্নবী ভাইসের খোলে চাইমুটিকে সবেগে নাড়া দিতে লাগিল।

আদিতার বুকের মধ্যে ঝড়-বিদ্যুৎ গঞ্জিয়া উঠিল। সে ঝড়ে, যে বিদ্যুতের আগুনে বুকের ভিতরটা ছিঁদ্রিয়া পুড়িয়া বিপর্যয় ব্যাপার ঘটাবার ছো।

সেই ঝড়-বিদ্যুৎ বুকে বহিয়া আদিত্য চলিয়া গেল।

...পুষে বানিকটা চলিয়াছে, সন্ধ্যা মাথায় ক্যাপ, গলায় কফার্স খাটো, ভারী পুরানো অলেক্সার গায়ে এক ভঙ্গ...

লোক হঠাৎ ডাকিল,—স্ননজেন?

আদিত্য ফিরিল—।...লোকটা চেহারা...যাকে বলে জাপানও টাইপ!

আদিত্য বলিল—আমাকে বলছেন?

লোক বলিল—হ্যাঁ। আপনার বাড়ী না শিলিঙডিতে?

বিস্ময়ে হুই চোখ বিক্ষারিত করিয়া আদিত্য বলিল—হ্যাঁ। কিন্তু...

—না, তাই বলছি...বলিয়া লোকটা হঠাৎ পিছন ফিরিয়া অল্প দিকে চলিয়া গেল।

আদিত্য মন কাঠ। চকিতর জঙ্ঘ। ভাবিল, কে ও লোক? সহসা এমন যাড়ে পড়িয়া বলিল শিলিঙডি...তারপর আর কথা নাই...উত্তরের জঙ্ঘ তেমন আগ্রহ নাই...কপূরের মধ্যে উবিয়া গেল!

আদিত্য হতভম্ব। পাড়াইয়া অতীত বৃত্তির গহণে সন্ধান করিল,—এ চেহারার লোক...

না! মনে পড়ে না।

হিল-ভিউয়ে আসিয়া আদিত্য ম্যানেজারকে বলিল,—আজকের বেলে আমি কলকাতা যাচ্ছি। আমার হিসেবটা...

বলিয়া ঘরে আসিয়া টাইম-টেবিল পাড়িয়া বলিল। মনের মধ্যে হাজার হাজার চিন্তা সর্দীস্পের মতো কিলকিল করিতে লাগিল।

জাহ্নবীকে বলিয়া আসিয়াছে, আজ কলিকাতায় যাইতেছে। ভাবিয়াছিল, সে-কথায় খেলার নাতন তুলিয়া জাহ্নবী তার পানে চাহিবে...মান ছল-ছল ছুটি চোখ...মলিন মুখ! না হয় চোখের কোণে অভিলাষের মূহ লক্ষিত...

লুভোর ছক ফেলিয়া মুকুলকে তুলিয়া আদিতার হাত ধরিয়া পাশের বারান্দায় গিয়া পাড়াইয়া বসে...

অর্থাৎ গল্প-উপলব্ধি হইলে এমন অবস্থায় আদিত্য যেমন লিপিত। কিন্তু জাহ্নবীর দিক হইতে সে-সবের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তবে কি...

অথচ এমন সর্দী অবস্থায় আদিত্য যদি কলিকাতায় চলিয়া যায়, মুকুল যে-রকম জাঁকিয়া বসিয়াছে, কে জানে হুম করিয়া সে হয়তো জাহ্নবীর জ্বদ-হুর্গ অধিকার করিয়া বসিবে।

মাথায় মেনে আগুন জলিতেছিল। খেলা জানলা দিয়া আদিত্য চাহিল বাহিরের পানে। নীচে পাইন-বাড়ের আড়ালে কতগুলো বাড়ীলা বাড়ী...মনে হইল, ওগুলো তার মনের আগুনে যেন দাঁড়-দাঁড় করিয়া জলিতেছে!

বেলা বারোটা...বাহিরের বাহিরে তরুণীর কলঙ্ক!

আদিত্য চমকিয়া উঠিল। জাহ্নবী আসিয়াছে তবে...

যে বুক বেদনার ভারে দশ হাত নামিয়া গিয়াছিল সে বুক চকিতে থাড়া হইল। উদগ্র দ্বন্দ্বের ভারের পানে চাহিয়া রহিল...পর্দা ঠেসিয়া এখন জাহ্নবী আসিয়া যে ঘরে চুকিবে। চুকিয়া...

আছলী আসিল না। বুকখানা ধড়াক করিয়া পাतालের
অতল-ভঙ্গে হামিয়া গেল। শিখোটারে দেখিয়াছিল সীতার
পাতাল-প্রবেশ। সেই পাতাল-প্রবেশিনী সীতার মতো!

আহার্যারি সারিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না।
বাহির হইবে, হোটেলের বয় আসিয়া ম্যানেজারের বিল
দিল। আদিত্য বলিল—না, কলকাতায় যাওয়া হলে না।

বসিয়া বিলখানি ঘরের হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া আদিত্য
পাথে বাহির হইল।

এখানে-ওখানে ঘুরিল—সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন ভাবে।
কতবার মনে হইল, চিত্তাহরণের গৃহে গিয়া উদয় হইবে।
পা চুখানা কে যেন চাপিয়া ধরিল। মন বলিল, না,
গিয়া হরতো দেখিবে—মুকলের সঙ্গে মহা-উল্লাসে আছলী
লুডো খেলিতেছে!

মুকলের উপর রাগ হইল। ছিল কালিম্পঙ—
সহসা আবার দাক্ষিণ্যে আসিয়া উদয় হইল কেন?
নিচুর অভিজ্ঞ আছে—বিবাহের দিন আসয় হইতেছে,
তাই যেমন করিয়া পারে—

ভাবিল, পাথে পাথে ঘোরা নয়—হোটলে কিরিয়া
একটা গল্প লিখিবে। তরুণ ব্যারিষ্টারদের নিমজ্জ
সৌম্যপাতক কেন্দ্র করিয়া যুব একটা তীত খাওয়ায়—
সে স্ত্রীটার পড়িয়া মুহুর—

হিয়-ভিডেরে ফিরিল। বেলা তখন চারিটা বাজিয়া
গিয়াছে।

ম্যানেজার বলিল—একটি ভল্লোলক এসেছিলেন
আপনার সন্ধান করতে।

চিত্তাহরণ? না, মুকল?
আদিত্য বলিল—কার্ড দেখে গেছেন?

ম্যানেজার বলিল—না।
—নাম বলে গেছেন?

—না।
—তবে?

ম্যানেজার বলিল—আপনি কবে এসেছেন—কত দিন
থাকবেন—আসার উদ্দেশ্য—এই সব জিজ্ঞাসা করছিলেন।

আদিত্য বলিল—আপনি কিভাবে মিলেন?
ম্যানেজার বলিল—আমি বলবুম ঠগডাতে এসেছেন
এখানে!

—হঁ!—আর কোনো কথা?
ম্যানেজার বলিল—কে বন্ধ-বান্ধব এখানে আসেন-যান,
জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলবুম, চিত্তাহরণ বাবুর ঘরে
আসেন-যান—সীতার সঙ্গে বিবাহ হবে।

আদিত্য জু হুকিত করিল—কে? বলিল—ভর-
লোকটির চেহারা কি রকম, বলুন তো?

ম্যানেজার বর্ণনা দিল। সে বর্ণনা তনিবামার
আদিত্যর মনে জাগিল পাথে চকিতে সেখা সেই
কর্ণ আলুটার-পরা মুক্তি। চিত্তাহরণের গৃহ হইতে
বাহিরে আসিলে পাথে যে লোক সেই শিলিগড়ির উল্লের
করিয়াছিল!—

মনে অবস্থি জাগিল! কে এলোকে? আদিত্যর
সম্মুখে সহসা তার একোহুল কেন?

ভক্ত? তার লেখা পড়িয়া মশঙলু—তাই আসিয়া
আলাপ করিতে চায়?

কিন্তু প্রথম-দর্শনে প্রথম ছোট কথাটুকু—তাছাড়া
ভক্তির বিস্ম-আভাস জাগে নাই তো!—

আদিত্য বলিল—আবার আসবে কি না বলে গেছে।
ম্যানেজার বলিল—না—তেনম কোনো কথা বলে
যাননি।

—হঁ—
বুকে একরাশ প্রশ্ন বহিয়া আদিত্য টুকিল নিম্নের
ঘরে। ঘরে চুকিয়া দেখে, বই কাগজ-বই বিমুখলভাবে
ছড়ানো! বেশ মনে পড়ে, বই-বাতাপজ ছড়ানো ছিল।
সে জাকিল—যয়—

বয় আসিল।
আদিত্য বলিল—কে এসব বৈটেছে?

বয় বলিল—একটি বাবু এসেছিলেন। এ ঘরে বসে-
ছিলেন—তিনিই কাগজপত্র দেখছিলেন।

আদিত্য হুকিত করিল, বলিল—যর খোলা ছিল?
[সংখ্যা ৪৪০ পৃষ্ঠা]



মহীশূরের অল্প মূলধনে কুটার শিল্পে

ডাঃ আর, বালকৃষ্ণ, এম্, এ, পি, এইচ, ডি, (গণন) (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়)

(বঙ্গাব্দবাদ)

মহীশূর ইহানী সকল প্রদেশ কেন, সকল দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা শিল্প ও
বাণিজ্যে উন্নত। অতএব তার গোড়ার কথা জানা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন,
বিশেষ করে কুটার-শিল্প সম্বন্ধে। (সম্পাদক)

গোড়ার কথা

বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে মহীশূর তার
শিল্প জাগৃতির এক নবযুগ সূচনা করেছে। ১৯১১ সালের
দর্শনমিতিক ময়মা সভার প্রাথমিক উদ্বোধন ও ১৯১৩
সালের শিল্প-বিভাগ প্রতিষ্ঠা হইল তার শিল্প ইতিহাসের
এক সার্থক নিদর্শন। গত ত্রিশ বছরের শিল্প ইতিহাস
সম্বন্ধে হল তার নতুন ধরণের। অধিকাংশ বড় বড়
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সে একবারে আধুনিক রীতিতে
ব্যবহৃত করেছে। এই পরিকল্পনার অধিকাংশ
সম্মততার কারণ মহীশূর সরকারের জাতীয় শিল্প
প্রতিষ্ঠানের মধ্যাপক সরকার প্রতি বিতরণতা, প্রতিনিধিত্ব
ও উৎসাহজনক রাষ্ট্রবিধি। শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য
সহ্য মহীশূর সরকারী ব্যবস্থার একটা অননুসরণ
বিশেষ হলেও, সেটা উপেক্ষণীয় হতে পারত, অল্প
মুদ্রণী কুটার শিল্পকে বাড়িয়ে তোলা বা পূর্ণপাখ্যকতার
বি দিয়ে সেইটাই অননুসরণীয় বলেই পরিগণিত
হয়েছে। সমানে ছোটো বড়র উন্নতিক্রমে মহীশূর
সরকারের এই নীতি এবং যথাযথ সাহায্য ব্যবস্থা
শ্রমসম্মানীয় বলেই মনে হবে, যদি তার, বর্তমান শিল্প
ব্যবস্থার মধ্যে এই ছোটোখাটো শিল্পাশ্রমের স্থান ও তার
বিষয়ে সম্মতবাক্যে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

অল্প মূলধনী কারবারের বে যার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য
আছে। সাধারণতঃ এ কলকার কাজ কারবার হল
কতগুলি যন্ত্রপাতি ও অল্প মূলধন নিয়েই। উপপাদকের
প্রণালী হল যার বিপুল পরিশ্রম করে ও কারিগর ও তাঁর
স্বত্বক কলান্তরতার ওপর মোটা দক্ষিণা ব্যবস্থায়।

মহীশূরে অল্প মূলধনী কারবারের একটা প্রাচীন
ইতিহাস আছে। অল্প মূলধনের ওপর ভিত্তি করে বহু-
সংখ্যক প্রয়োজনীয় ও সমৃদ্ধিশালী শিল্পাশ্রম একদিন
মহীশূরে বর্তমান ছিল। অধুনা এই সমস্ত শিল্পাশ্রমকে
এখন দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যার মধ্যে একটি
পতনশীল ও অপরটি উর্দ্ধগামী। যে সমস্ত কুটারশিল্প
পতনশীল বা পূর্ণপাখ্য হইয়াছে, সেগুলি হল, ধাতু, গোটা,
কাগজ, কাচের বালা, তার টানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের।
ছিন্ন-ভিন্ন আর্থিক গ্রাম্য জীবনের বিশ্বজনীন কারণ
ছাড়াও, একটা নির্দিষ্ট কারণের জন্মেই এই সমস্ত
প্রতিষ্ঠানগুলি আজ নিম্নোক্ত হয়ে পড়ছে এবং প্রত্যেকে
আজ্ঞার হক্ষে।

ইংরাজ ভারতের কলে ভৈরী যুগের আবির্ভাবের
সংগে সংগেই হাতে কাটা যুগের দারুণ দুর্ঘটনা

ঘটছিল। যখন তাঁতীর দল পরম ক্লান্ত হয়ে এই সব কলে কাটা হস্তের পায়া পড়ল, তখন কুটার শিল্প হিসাবে এই সব তাঁতগুলির বাড়বিকই তিরোধান ঘটল। বাই হোক এখন মহীশুর সরকারের চেষ্টায় কৃষির সহায়ক হিসেবে তাঁতগুলিকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। ধাতুশিল্পের মধ্যে লৌহ একদিন সর্বোচ্চ স্থান জুড়ে বসে ছিল, কিন্তু কারিগরির মধ্যে নতুন প্রণালী গ্রহণ করার সামনে কুটার শিল্পকে বিখ্য নিতে হয়েছিল। ইম্পাত ও গলানো পিতলের মত প্রধান ধাতুতে নির্মিত দেবদেবীর প্রতিমূর্তিগুলি ও হস্তাক বাসনপত্র ইত্যাদি শ্রাব বেলগোলার মত জাপানীয় একদিন নির্মিত হত। সমস্ত দেশ যখন এজুমিনিয়াম ও কলামের বাসনের তোড়ে ভেসে গেল, তখন সেই সস্তা পণ্যের বিনিময়ে এইসব শৈল্পিক ধাতু প্রতিষ্ঠানের নির্বাণ লাভ ঘটল। গোটা প্রান্তের ব্যাপারে যেখানে দস্তরমত কলাকুশলতার ও হস্ততার প্রয়োজন হত, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও সেই ব্যবসায় যথেষ্ট সমৃদ্ধিশপন ছিল। এর সন্ধানটি ফল ফরাসী দেশ থেকে উক্ত মালের আমদানীর সংগে সংগেই। বর্তমানে শুধু শ্রীমঙ্গলদ্বীপের কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বতীতের বর্ষ বার্ষিকী বজায় রেখেছে। চিত্রলক্ষণের কাচের বাসা তৈরীও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু আধুনিকতার হস্তক্ষেপ এখন রকমারী বিদেশী বাল আমদানির যথেষ্ট হ্রাসের দিয়েছে। হায়দর আলির রাজত্বকালেও তার টানা শিল্পাগারটি সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু এরও পতন ঘটল দেশী লৌহ ও ইম্পাত প্রতিষ্ঠানের পতনের সংগে সংগেই।

বর্তমান অবস্থা

ছোটখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এখন দারাজী বনের পরিচয় দিচ্ছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বয়ন শিল্প সমিতি। এই প্রতিষ্ঠান এখন বহু-সংখ্যক লোকের কটর জোগাড় করছে। এবং প্রায় দেশের এক তৃতীয়াংশ উর্দু মালের চাহিদা এই সমস্ত

তাঁতগুলো মেটায়। তবু এখনো এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর যান্ত্রিক বা আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। শ্রেণী হিসেবে এই সব তাঁতীদের দুর্গতি চূড়ান্ত। কলাকুশলতার কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রাথমিক প্রণালীর জুড়ে এই সব তাঁতীদের টানা পোড়ানো করতে, মাগজোপ করতে, নুনতেই যায় বেশী সময় বেরিয়ে। গবেষণা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে, ঘুরে ঘুরে নানা জায়গায় বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে, শিল্প বিভাগ এখন বেশ মূল্যবান ভাবেই এদের সাহায্য করছে। ভবিষ্যৎ কার্যধারা হল একটি কেস্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক প্রণালীর এই হস্তোত্তীর্ণ ব্যাপারকে যান্ত্রিক উপায়ে উন্নত করে তাই থেকে এই সমস্ত তাঁতগুলিকে হস্তোত্তীর্ণ ব্যবস্থা করা। এই থেকে উৎপাদনের গতিও বাড়বে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাঁতের হারও বাবে বেড়ে। এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শৈল্পিক দিকটা সমন্বয় ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ফোন : কলিকাতা ১৩৩২ গ্রাম : “ব্যাংক জিপুরা”

দি

এসোসিয়েটেড ব্যাংক

অফ প্রিন্সিপালিঃ

পূর্ণপোষক :

শ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর

কে, সি, এল, আই

চীফ অফিস—আগরতলা, জিপুরা স্টেট

বেং অফিস—গঙ্গাসাগর

কলিকাতা অফিস—১১, ক্রাইস্ট রো

ব্রাঞ্চ ও সাব-ব্রাঞ্চ :

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে

ম্যানেজিং ডিরেক্টর :

মহারাজকুমার প্রজেক্সট্রিশোর দেববর্ধন

গোলাঘাট (আসাম) ব্রাঞ্চ ও মহ (শ্রীহট) সাব-ব্রাঞ্চ

খোলা হইয়াছে।

এই সব মালের, বহুতর কনায় স্থবিশেষ জুড়ে এবং কলে তাঁতী মালের সংগে পায়া দেবার জুড়ে এদের মাল্গুপ ভাবে উন্নত হওয়া উচিত। কার্শাস-শিল্পীদের সংগে এই সব তাঁতীদের আর্থিকতার দিক দিয়ে বিশেষ ফল নেই। তৈরীর অক্ষম প্রণালীর জুড়েই উৎকর্ষতার দিক দিয়ে এই সব মাল দুর্দশা ভোগ করে। তৈরীর মাল প্রণালীটা সাদাসিধা যান্ত্রিক উপায়ে গ্রহণ মলে মালগুলো উৎকর্ষতার দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করবে।

প্রায় শতাব্দী ধরে মহীশুরে রেসমশিল্পের অন্তিম যুগে। কবিগঙ্গাজাত আর্থিক ব্যাপারের সংগে এই রেসমশিল্প বেশ চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে গেছিল। ইংরেজ চালের জুড়ে ১৯২৪-২৭ সাল থেকে যথাসময়ে ঘির ক্ষতি ঘটতে থাকায় এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধর চাপ পড়তে লাগল। এই শিল্প অননতির প্রধান যন্ত্র হল, ভারতে চীন ও জাপানী রেসমের সংগে পোশীয় প্রতিযোগিতা। জাপানের তুলনায় মহীশুরের দ্রুত প্রতিযোগিতার কারণ হল তিনটি; (১) মহীশুর উৎপাদনের জুড়ে হয় অত্যধিক খরচ (২) জাপানের জুয়ার সফলতা এবং (৩) ভারতীয় বাজারে জার অপেক্ষা নিম্ন মূল্যে জাপানের রেসম বিক্রয়। মহীশুরে বাট রেসম কীট পালন করতে লাগে দীর্ঘ দূর এবং অবশেষে যে পরিমাণে রেসম তার থেকে গরজা যায়, জাপানী রেসম কীটের তুলনায় তা যথাস্থায়। রেসম কীটের চাষ করে মহীশুরে এই ক্ষমতাকে জয় করা হয়েছে।

অপরাপর কুটার শিল্পের মধ্যে চর্মশাষণের কারিগর ও উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যৎ উন্নতির বিপুল একটা সম্ভাবনা এর রয়েছে। এই সমস্ত শিল্পাশ্রমের বর্তমান দশা ও দ্রব্যপ্রণালী উন্নতকরণের নয়। এই সব শিল্পাগারের আয়োগোড়া একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রতিবিধানের জুড়ে যথোচ্চশ্রম শ্রমজরঞ্জাম মহীশুরে তৈরী। মহীশুরে কুটার শিল্পের মধ্যে তাঁলের গুড়ের গরবার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বাজার আর

কোনো তাঁলের গুড়ের কারবার না থাকায় মাহিয়ার চিনির কলও এখনকি তাকে হার মান্য হই পাইনি। বিদ্যুৎচালিত নিকাসন যন্ত্রের প্রবর্তন হওয়ায় ছোট খাটো ইচ্ছ ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। প্রাচ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিচয়ের দিক দিয়ে মহীশুর আজো অংশ গ্রহণ করে। প্রায় স্রবরাপ্তীত কাল থেকে এখানে কাঠের ওপর কার্শাক করা বার শিল্প-ব্যবসা চলে আসছে। মহীশুরে যে সব শ্রমকার শিল্প চলিত আছে, তাদের মধ্যে চম্পন কাঠ কোদাই আর হাতীর পাতের মিনে বসানো এই ছোটো শিল্প অল্পতম। মহীশুরের কার্শ-শিল্প-দক্ষতা হল, তার আরো কতগুলি বিশেষ পরিচয়। এই সব দক্ষতায় সবচেয়ে প্রয়োজন হল, একটি কেস্ট্রীয় ব্যবস্থার—যেখান থেকে নতুন নতুন নমুনা ও আর্থিক সাহায্য আসতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সেই সব সম্পূর্ণ মালের কাটুতি হতে পারে। তেল নিকাষণের প্রতিষ্ঠানকে এখন একটা সাময়িক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। আধুনিক যান্ত্রিকতা এখন তেল নিকাষণের বাবেকী ব্যবস্থাকে অলদ বদল করে দিয়েছে। নতুন পণ্যের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করার স্থিতি বর্তমানে দেখা দিচ্ছে। পরিশেষে বাংগালোরের ঝাঁক-বামন হল কুটার শিল্পের মধ্যে আরো একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। চারপা পরিবার নিয়ে এই সমিতি গঠিত, তারা সকলেই একই সমাজের অন্তর্গত। দক্ষিণ ভারতে তৈরী মাল বিক্রয় ও বাইরে থেকে কাঁচামাল আমদানীর ওপর নির্ভর করা লগেও এই প্রতিষ্ঠানটি যিনি দিন-প্রসারতা লাভ করছে।

অপর দেশের কুটার শিল্প

পশ্চিমের বিপুল শিল্প-প্রসারী দেশগুলির সমসাময়িক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করলে ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের পরিকল্পনার যথার্থ স্থানে ক্রিষ্ট অলোকপাত করা যেতে পারে। স্বইচ্ছাস্বাধ্যত্ব হল ইম্যারোপেরই একটি দেশ, যার অল্প মূলধনী কারবার বেশ গুরুত্বই এনেছে। অল্প মূলধনের ওপর ভিত্তি করে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মালপত্রই সে প্রস্তুত করে। হটকর্ম ও ঘড়ি তৈরীর কলকজাও

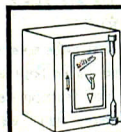
অইজারপ্যাণ্ডের হাতের কারিগরকে হার য়ানাত পাবেন। কাপানের শিল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সম্পূর্ণভাবে খুব বেশী মূল্যবনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাপানের বেশীর ভাগ উৎপাদন ছোটখাটো কুটার শিল্পের দ্বারা ই তৈরী হয়। সাইকেল ও নকল রেশম তৈরীর ব্যাপারগুলো খুব বেশী মূল্যবনের উপর ভিত্তি করেই। হস্ত ও কারুকাঠাময় জিনিষপত্র তৈরী করার ব্যাপারে বঙ্গালী দেশ হ'ল সকলের অগ্রদূত। এবং এখনি পর্যন্ত সেই সমস্ত শৈল্পিক কর্মসমূহ সেখানকার ছোটো ছোটো কুটার শিল্পই বাচিয়ে রেখেছে। ছোটো ছোটো কলকারখানাও হস্ত শিল প্রতিষ্ঠানের—সে ডির-দিনই জন্মগ্রহণ করছে। ফরাসী ছুরি, কাচির, উলহত্যোর, বেশখী কিতোর শিলাস্ত্রম যে সমান্য ও সৌন্দর্যের পরিচয় দেয়, তা একসময় কুটার-শিল্পই দিতে পারে। জার্মানীর আর্থিক উন্নতির মূলে এই সব ছোটোখাটো ব্যবসায় দক্ষর মত কাজ করে এসেছে। নরেনবুর্গের খেলনা এবং ব্রাস-ফরেস্টের হাড়ি নির্মাণও উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে থেকে ক্ষুদ্র এই প্রতিষ্ঠানগুলোর লতাই উন্নতি হচ্ছে। এইগুলো প্রায় শতকরা চল্লিশ জন কর্মীকে কাজ দিয়ে প্রতিপালিত করে। গ্রেটব্রিটেনও ছড়ানো অবস্থায় ওয়েলস থেকে লণ্ডন পর্যন্ত বহু সংখ্যক কুটারশিল্প রয়েছে। লেক-ডিউরিক ঠাঁতের ব্যবসায় মিডল্যাণ্ডের ফিডের, ডিভানসবারের মাটির খেলনার শিল্পায়ত্তগুলি বেশ মজার উদাহরণ দেয়। বার্মিংহামে ছোটো ছোটো কুটার শিল্পের জন্মগ্রহণ বজলেও হয়: যেমন বন্ধু, তাল, জড়োয়া নিশের কারখানা ইত্যাদি আর কি। ছোটো এবং মাঝারি শিল্প কুটারগুলিই হ'ল ইংল্যান্ড-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ বড় গোছের নির্মাণ।

পূর্ন জগুতির স্ববিধে

পূর্বের বর্ণনা দেখিয়েছে যে আধুনিক দেশগুলির মধ্যে উন্নততর শিল্প ব্যবস্থায় কুটার শিল্প কোন স্থান অধিকার করে আছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় কিছুবার কতি না করাই এই ছুই ধরনের শিল্প যুগপৎ এবং পাশাপাশি ভাবেই উন্নতি লাভ করতে পারে।

তাছাড়া এই ছোটো ব্যবসায়গুলির পুনরুদ্ধার কতগুলি বিশেষ সুবিধে আছে। শিল্প প্রসারের পক্ষে যেমনমাত্রা এবং কালাহুয়ারিতার দরকার তা এগুলিতে বর্তমান। গ্রাম-শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার, দেশের কৃষি-বিষয়ক অর্থ ব্যবস্থার উপকারই সম্ভব। এগুলি ফলিত কাজের সুবিধে করে দেয় এবং গ্রামের লোকদের কারখানার গ্রাম থেকে বাচায়। কুটার শিল্পের পুনরুদ্ধারের পক্ষে আগে একটি বড় মুক্তি এই যে তাতে ব্যক্তির স্বজনীয়তা—বাক্য যোগ্যত্ব করা যায় না তা বক্ষা পায়। মাইশুরের পৌর-জনক শিল্প নির্মাণের আভিসের জন্ম কুটার শিল্পই রাষ্ট্র। এই সব ছোটো ছোটো শিল্পকেসের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলি শিল্প ব্যবহার প্রয়োজন। মাইশুরের ছোটো ছোটো শিল্প ব্যবহার প্রধান ক্রীড়া হ'ল সংযুক্ততার অর্থ। রাষ্ট্রের উচিত হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সুবিধের জন্য তাদের সমন্বিতরূপে একটি খেজাসংঘ গড়ে তোলা। মূলধনের দিক দিয়ে সামান্য কারিগরদের অবস্থা সংগীন। স্বতন্ত্র হস্ত মাইশুর সরকারকে দীর্ঘকাল ধরে এই সব সামান্য কারিগরদের তাকাত্তা দাবন দিয়ে বেতে হবে। এই দাবনেই এদের স্বায়িত্ব নির্ভর করছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিল্প সংস্কার পরিকল্পনার ক্ষুদ্র কুটার শিল্পগুলি মোটেই বোধ্য নয়। সমস্ত জগতে তারা অপরূপ প্রাণশক্তির সংগে কাজ করে চলেছে। এরা স্বাধীনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব ব্যতিরিক্ত রাখতে সক্ষম বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসেবে এদেরও মূল অপরিসিত।



উইলসনের
অসহায়
সিন্দুক

ইন্ডিয়ান
মেটাল এন্ড ষ্টীল প্রোডাক্ট
১১, ক্লাইড ষ্ট্রট, কলিকাতা



সন্ধ্যার অন্ধকারে

দুঃ লিং কিয়াদ্

অনুবাদিকা—শ্রী ইন্সপী দেবী

ফাং পার্কে বসে আছে অনেকজন ধরে। মার্চ মাসের সন্ধ্যা; পেকিংএর নীলমণির মত আকাশ গাঢ় হয়ে এলো রাতির কালিমায়া। তারা মুটেছে উইলো-শ্রেণীর গাভার ফাঁকে। সহরের গলিতে এখন হঠাৎ রঙের লঠন ঝগছে; রিক্সার টুং টুং আর ফেরিওয়ালাদের একচাকার গাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ ভিত্তি হয়ে এলো চারিপাশে।

প্রাচীন চীনের স্থায়ী মন্ত্রপ্রোক্ত জীবনের মজানদীতে যারা নিম্ন শ্রেণী, তাদের দল জনশ: পার্কের অন্ধকার বীথি ভনগুলোর ফিরে আসে; সেই দৈনিক অন্ধকারের হাঁ ধরে তারা গোপা, আর বসে বসে অস্থায়ী ভাবনা, বাস কিছু ভুটেই যাবে। ফাং বোকে না, কী লাভে তারা সহরে আসে। অধুর উত্তর চীনের রূপন ভূমি স্পষ্টত্বাধী; তোকাবাকে ভোলায় না; সেখানে স্ত্রহ না গাওয়া যায় স্বভিটা আছে। কেন আসে তারা এই বাং-চীনা, আং-চুয়াপীং সহরে, কোকেন, অফিম আর বেজান নকে! দামনে দিয়ে একজন হতভাগ্য হেঁটে গেল; তার বস্ত্র বেশী হবে না, কিন্তু গাল দুটে গিয়েছে প্রায় গরুটে ঢুকে; পোষাকে গরীবী-ভক্ততার খামেজ বাই বাই করেও জড়িয়ে আছে। ফাং যদিও নিজ একজন সদৃশপাল লোকেরই ছেলে, তবু তার হঠাৎ মনে হচ্চে—এমন তার গ্রামই মনে হয়, যে ওেও চীনের সর্বহারাদের একজন; পো-শিয়ের—তার পদার্থবিজ্ঞান রাশের স্যুয়েডেটী-সম্বন্ধীর ব্যবহারটা যতদিন থেকে পোগোলেমের ঠেকেতে শুরু করেছে, প্রায় ততদিন থেকেই তার বাক্য মাঝে পেকিংএর এই সন্ধ্যার পার্কের নিজন-তায়ে কেনম একটা সর্বহারার ভাব মনে আসে। তার

ভাবতে ভালো লাগে, দুর্গত চীনের দুর্গততম সন্তানদের মধ্যে সে একজন; তার বার বার মনে পড়ে নবীন-কবি চুয়েন কুর সেই দীর্ঘ নিশাসের মত পংক্তি—

“হায় চীন! দিন চলে যায়,

সন্ধ্যা নামে।”

ফাংএর কাছে, সন্ধ্যাটা হচ্ছে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত যারা তাদের লজ্জা ঢাকবার কক্ষ অবসর। হায় চীন! দিন চলে যায়। তারি ভালো লাগে তার ভাবতে যে সে যেন চীনের সর্বহারী আত্মায় মজে একটা ঘনিষ্ঠ ধান-সাগিধো অন্তরঙ্গ হয়েছে। “হায় চীন, দিন চলে যায়।”

সেই গাল-চোপসানো লোকটি, আবার একপাক দিয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে হেঁটে চলে গেলো। ফাং ভাবলে, হয়তো ও শ্রান্ত; পার্কের বেঞ্চ খালি পাচ্ছে না, অথচ দরদী সমাজোক্তাদের লজ্জা চায়; কিন্তু তার বড়মাত্রা পোষাক দেখে পাশে বসতে সাহস পাচ্ছে না। ফাং ব্যথিত হলো। একবার অন্ধকার দৃষ্টিতে তাকালো পাশে বসা, বুড়ো ভ্রাতৃলোকের মুখের দিকে। লোকটি সিঁথি নিশিতে বসে আছে; যুব পরগাওনা লোক বসে বোধ হয় না; তবু মনে হয় না যে সে কোনোদিন চীনের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে অন্তত: একটি বিনীত রাজিও কাটিয়েছে। “হায় চীন, দিন চলে যায়।” বুড়ো ভ্রাতৃর দীর্ঘনিঃশ্বাসিত কবিতা-পাঠের অস্পষ্ট আওয়াজ পেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, “কি খোঁকা। শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি? আর হিম লাগানো ঠিক নয়। এবার বাড়ি

চলে যাও।" ফ্যাং করণ ব্যঙ্গ হাসি হেসে অভ্যন্তরিক তাকালো। আপন কখন উঠে যাবে কে জানে; উঠে গেলে হয়তো সেই সর্বস্বা হোকরাটি এসে ব্যাতোড় মারে, আর সেই সঙ্গে চীনের পরাভূত আশ্বাস সঙ্গে আভ্যন্তরিক একটা নিবিড়তম, করণতম পরিদৃষ্ট ঘণ্টা ঘণ্টাও কিছু বিচিত্র হ'বে না। ভ্রমলোক বোধ করি তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ধ্যানে জানতে পেরেই হঠাৎ একসময় উঠে চলে গেল।

ফ্যাং আজ কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলো—বুড়ো বাওয়া মাইই সেই গাল চোপসানো সর্বস্বা ব্যবসায়ী ধপ করে এসে তাঁর জায়গাটিতে বসে পড়লো। "হায় চীন, দিন চলে যায়।"—ফ্যাংএর মানসিক আবৃত্তিতে করণতর, মনুষ্যতর আমেজ এসে লাগলো। নবাগত ব্যবসায়ী হঠাৎ বিড়বিড় করে 'কি যেন বলে' আশপাশে ঘেঁষে গেলো। ফ্যাং স্বযোগটি হেলায় যেতে দিলে না। মোলায়েম অথচ যথাসম্মতি নিশ্চয় হবে, জিজ্ঞেস করলো, "বাড়ি থেকে বকর ভালো নয় বুঝি? মশাই কি অসুস্থ হ'?" ব্যবসায়ী নিজের ওপর বিরক্তি প্রকাশের স্বরে বললে, "না মশাই, বাড়ির খবর ভালোই; তবে আমার নিজের গাখামির জট্র এখন পত্তাঙ্কি; শরীরের আর দেখ কি হ'?" লোকটির কণ্ঠস্বরে কোনো দীনতা নেই, অথচ গুণ্ডিত্যও নেই। উত্তর চীনের অন্যায়ের অন্যায়িকতা এবং আশ্রয়িতা তার ব্যাপ্তবৃত্তিতে একটা মাধুর্য এনে দিয়েছে বলে' ফ্যাংএর মনে হ'লো। ফ্যাং মনে মনে উল্লসিত হয়ে তাঁর দিকে প্রশংসক মুদ্রায় চাইলো।

লোকটি বললে, "আজই সকালে এই শহরে পৌঁছলুম মশাই; উঠলুম পিশতৃত্বো বোনের বাসায়; তার পর বেয়ে বেয়ে বাজার করতে বেরিয়েছি বিপদটি ডেকে আনলুম; বাস্তবপটিতে গিয়ে একতড়া মোমবাতি কিনে বেরিয়ে দেখি যে রাস্তা চিনি না; বোনের বাসার টিকানাও গোছি ছুলে, এ হতভাগা শহরের রাস্তাগুলো একটা থেকে আর একটাকে জো চেনবার জো দ্রুই। বোনাইয়ের নামটাই জানি, কিন্তু কি ক'র করে, সেটার আর অর্থাৎ খোঁজ নিই নি; কখনো তো

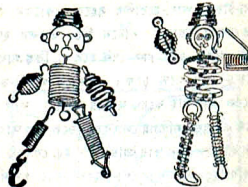
দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। সাধাদিন ঘুরেছি মশাই; খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে; সাড়ে তিন সেন্ট যা ভাঙ্গানি পেয়েছিলাম তাতে একগাল খাবার ও কেনা যায় না। এখন এতে শরীর আর ভালো থাকবে কি করে।"

ফ্যাং চুপচাপ রইল দেখে, লোকটি বানিক পরে আবার বললে, "লোককে আবার এ কাহিনী বদলার ও উপায় নেই; ঠিক ভাবুন, জোজোর হ'?"

ফ্যাং এর হঠাৎ কেনন সন্দেহ হ'লো। বললে, "আজ্ঞা, আপনার মোমবাতির তাড়াটা বোধ্যায় দেখি?"

লোকটি বিস্ময় চমকিয়ে উঠে, দাড়িয়ে পড়ে দ্বার নিজের পকেট খাড়ালা। মোমবাতির তাড়াটি নেই। ফ্যাং বললে, "দেখুন, সেটা থাকলে আপনার চমৎকার গল্পটি পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হ'তো। কোথায় ফেললেন সেটা?"

LEADING SPRING
Manufacturer of
INDIA



CALCUTTA SPRING
—MFG. COY.—

84/A, Clive Street, Calcutta.

PHONE: CAL: 5175

গলচোপসানো আভ্যন্তরিক মুকট আর দাঁড়ালো না; হন—হন করে যেন আহত আশ্বাসময় শব্দে রাড়ের পেটটির দিকে বেরিয়ে গেলো।

ফ্যাং ভাবলে, চীনে শক্তিকার দুর্যত গালি আভ্যন্তরিক শাল সাহিত্যেই বেলে, যারা করণ, সত্যবাদী, এবং একান্ত নিরীহভাবে নিঃসহায়। ছোকা বেস ফু করেছিল; এ লাইনে তার একরকম প্রতিভাই আছে স্মৃতে হবে; তবে মোমবাতির তাড়া যদি একটা আগে গাংতে জোগাড় করে রাখতো তা' হলে, এ ক্ষেত্রে দত্ততা পাততো না।

মনে মনে নিজের কাশিক সর্বস্বা প্রেমের প্রতি দ্বিধা বিজ্ঞপ্তি বর্ষণ করতে করতে ফ্যাং উঠে দাঁড়ালো; মাই হোক তাঁর মনে বৃন্দপুঙ্খবদে কাছ থেকে পাওয়া সম্ভাব্য সন্দ্বিদ্ধিততা তাকে একবারে ছেড়ে যায় নি। হঠাৎ ঘাসের ওপরে মোড়কের মতন কি একটা নজরে পড়ল। তুলে দেখে, আ কংএর দোকানের ঠাপসারা মোমবাতির মোড়ক। লোকটি যখন এসে ধপ করে বসে পড়েছিলো তখনই নিশ্চয় তার পকেট থেকে তার অজ্ঞানত্রে ছিটকে পড়েছে নিঃশব্দে ঘাসের ওপরে।

ফ্যাং সেটি পকেটে পুরে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালো রাড়ের পেটের দিকে; ঠিক তারই মতন চলার ভঙ্গীতে একটি লোক ঐ তো গেট পেরোচ্ছে! ফ্যাং প্রায় দৌড়ে চললো সেই দিকে; রাস্তার ভিড়ে মিশে যাবার আগে দ্রুত ধরা চাই; বেচারীর হাতে একটা পরস্যাও নেই যে বেশ ফিরে যায়!

হেড়ে: ভাগ্য ভাল যে তেমনার 'চীপসের' ঘোড়াটা ঘরিনি, সেটা সকলের শেষে দৌড়েছিল। দীপ্স বাতা: আপনি ভুল করছেন। আপনারা তাকে 'ব্যাক' না করলে সেই বা কেন অসুস্থ প্রথম হবে।"

যমান আক্রমণের সময় কি করে নিজেকে বাচান যায়?"

লোকটি মোড় পেরোবে কি পেরোবে না এই বিশ্বাস এদিক ওদিক করছে এমন সময় ফ্যাং গিয়ে লোক ধরলে। লোকটা আর একবার চমকে উঠলো।

ফ্যাং বললে, "না মশাই। আপনার গল্পের প্রমাণ মিলে গেছে; এই দিন আপনার মোমবাতির তাড়া।" লোকটির মুখে কথা নেই; ফ্যাং বুললে, কৃতজ্ঞতা এখন প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

ফ্যাং অভিভূত হ'য়ে বলে' চলল, "আর যদি না কিছু মনে করেন এই দিন একখানা নোট; আমার টিকানা লিখে দিচ্ছি; দেশে পৌঁছে স্বহিবে মতন ক্ষেত্রে পাঠাবেন।" লোকটি তাড়াটাড়ি নোটখানা পকেটে পুরে বললে, "ভাগ্যস্ব বাস্তব তাড়াটা খুঁজে পেলেন।" আর কোনো কথা তাঁর মুখে জোগালো না; পিকিংএর জনস্রোতে গাল চোপসানো লোকটি নিমিয়ে গেল।

ফ্যাং পার্কের বেকে ফিরে এসে বসে বসে ভাবতে লাগলো, সন্দ্বিদ্ধ ভাবটা খুঁজি ভালো, তবে বাড়বাড়িটা কিছু ভালো নয়। অথো, বেচারী, এতোটা অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল যে তার মুখ দিয়ে প্রথম প্রথম কোনো কথাই বেরোচ্ছিল না!

হঠাৎ ফ্যাংএর চিন্তাধারায় ছেঁব পড়লো। সেই বুড়ো ভ্রমলোকটি, যে প্রথমে তার এই বেকে এসে বসেছিলো, হঠাৎ এসে উঠ হয়ে বেকে পলসীটা তাঁর ছাতা দিয়ে এদিক ওদিক বোলাতে শুরু করে দিলে। কি যেন খুঁজছে।

ফ্যাং বললে, "কি মশাই কিছু হারিয়েছে নাকি?"

"হঁ। মশাই; এক তাড়া মোম বাতি।"

"আরে খুবই সোজা, কেবল ছুটাছুটা করবে; জান না অস্থির বস্তকে চীপ করে মারা সকলের চেয়ে শক্ত।"

নাট্যকার (প্রথম অভিনয়ের বিশ্রামের সময়): "আমার নাটকটা কেমন লাগছে?"

সমালোচক: "চমৎকার—মাত্র 'বিশ্রামের' সময়।"



ভারতীয় চিত্রে বিরাট অবদান
কমল রায় পিকচার্সের

শাহান শাহ
আকবর

—শ্রেষ্ঠাংশে—

কুমার, বনমালা, হুসনা বাহু
আজুরী ইত্যাদি

—কাহিনী— ● —সঙ্গীত—
দেওয়ান শারার ● ঝাঙে ঝাঁ

শীঘ্রই আসিতেছে
ভাবোচ্ছ্বাসে মধুর
সু মধুর সঙ্গীত
চিত্তাকর্ষক নৃত্য
প্রশংসা মন্থর্যে অপরূপ

বাদল

—শ্রেষ্ঠাংশে—

জহুর রাজা, রাধারাণী, উর্মিলা
প্যারামাউন্ট সিনেমা, কলিকাতা

অভূতপূর্ব ঘটনাবলি
হৃদয়বিদারক দৃশ্য
রোমাঞ্চকর চিত্রকথা

জিগোমার

—শ্রেষ্ঠাংশে—

নবীনচন্দ্র, ললিতা পাওয়ার
শীঘ্রই
আপনাদের অভিবাদন করিবে

একমাত্র পরিবেশক

চি ত্র ন া নী লি নি তে ড

৮৯বি, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলিকাতা



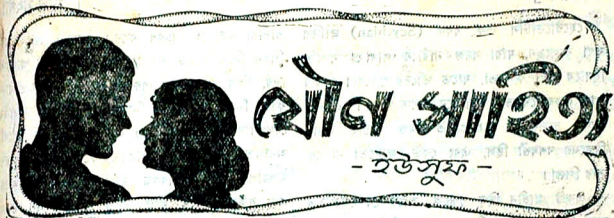
কুমারী বাসন্তী ।.....

ভারতীয় চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কিশোরী তারকা





ভাবাবেশে হান্তময়ী
নন্দ্যাসিয়ারার



শ্রী ও পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ

(পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত)

অনেক সময় বলা হয় যে নর-নারীর সর্গ প্রাচীন যৌন-সম্বন্ধ হচ্ছে তাদের বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের মূল বিভাজিত, আর ভগবান যে দিন সর্গপ্রথম পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেন, সেদিন তিনিই এই বিধান দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধের অনেক পূরের প্রতিষ্ঠান; তখন মাঘ সমাজের যোগানে অনেকটা মঙ্গল হয়ে গেছে, বৃষ্ণতে পেরেছে তার ক্রমবিস্তারনের অবশ্য, মূল প্রতিষ্ঠানকে।

আমরা জানি মাঘ উদ্ভূত হয়েছে শুভপায়ী জীবের উদ্ভব পরিণতি থেকে, এদের সপোত্র শাখা বানর থেকে নয়। সেই একই উৎপত্তি-মূল হতে সৃষ্টি, ঘাবাদের গৃহপালিত পুত্র, গরু, ঘোড়া, জাগল, ভেড়া, হুহর প্রভৃতির মত, শারীরিক ক্রমবিস্তারনের দ্বারা মাঘ দৈহিক ভগ্নিমার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাক-মানবিক পূর্বপুরুষের মানসিক লক্ষণও কিছু পেরেছে। প্রায় সমস্ত গৃহজীবী শুভপায়ী জীবের অভ্যাস যে, তারা মোড় (দম্পতি) বাঁধে না, মাংসাশী প্রাণী ও পাখীদের মত; তারা নিবিশেষে, এলোমেলোভাবে যৌন জীবন যাপন করে, অথবা একটি পুরুষ প্রাণীর প্রতি অপরকতক স্বামী প্রাণী বিভিন্ন দল গঠন করে' সংকরণ করে। এই দুই প্রকার যৌন সম্বন্ধই বোধ হয় সমভাবে প্রচলিত ছিল প্রাগৈতিহাসিক মানবের মধ্যে।

মতাদেশের পরিভ্রাজক যখনই কোন অসভ্য দেশে গিয়েছেন, তারা দেখেছেন যে কোন বিবাহ

সম্বন্ধের ওপর তাদের জাতীয় ব্যবস্থা পড়িত নেই, তাদের স্ত্রী-পুরুষ যথেষ্টভাবে কোন নিয়মের বশবর্তী না হয়ে, এবং আপনাপন কণ্ঠস্বায়ী বাসনা অনুযায়ী যৌন জীবন যাপন করছে। অর্থাৎ সত্য সমাজে আমরা যেমন বংশের সংযত মর্যাদা লক্ষ্য করি, অল্পমত সম্প্রদায়ে ও সম্ভবতঃ উচ্চতর জাতির (এখন যারা সভ্য) প্রাথমিক অবস্থায় তা' সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

এইরূপ অসংযত যৌন-সম্পর্কে পৈতৃক কুল নিরূপণ করা অসম্ভব, কারণ এ অবস্থায় মাতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধটাই কেবল জানা যায় এবং মাতাও সঠিকভাবে বলতে পারে না যে পুত্রের প্রকৃত পিতা কে।

এই জটিল বোধহয় সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার (tribal organisation) মাতার সম্পর্কেই উত্তরাধিকার স্বত্ব নিরূপিত হোত। কুলনামূলকভাবে অনেক বলেন যে পুরাতন দেবদেবীধর্ম এই প্রকার যথেষ্ট জীবন যাপন করার, শেষ পর্যন্ত মাতৃস্বামীদেবীধর্মই তাঁদের অজ্ঞাত স্বামীদের চেয়ে বেশী পূজ্যই হয়ে ওঠেন, এবং মাতৃব দেবীধর্মের পরিণতি হয়। একসা বোধহয় পুর সভ্য যে, যে সব আদিম জাতি শিকার করে, মাছ ধরে, গৃহস্থান ভাবে জীবন কাটাতো, তারা অধুনা দেবদেবী ও মাতৃবের মধ্যে প্রচলিত কুল-মর্যাদা সংকেদ নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। সেই অবস্থায় নারী ও শিশুগণ ছিল সম্প্রদায়ের অধীন ও জাতীয় সম্পত্তি।

হেরোডোটাস এক যবন (Scythian) জাতির কথা ইচ্ছাছেন, যারা সমস্ত নারীকে সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতো, যাতে তাদের পুরুষেরা একজন আর একজনকে ভাই বলে মনে করতে পারে। একজন লেখক বলেন যে Atticaতে সমস্ত নারীই অবাধ মিলনের বশবর্তী ছিল, এবং কেউ জানতো না কে তার পিতা।

একটি প্রাচীন হিন্দু পুস্তকে আছে যে বেঁচে কতক বলে একজন স্বর্গপন্থন বিবাহ-প্রথার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপূর্ববর্তী নারীরা অবলোহীন ভাবে যথেষ্ট ঘুরে বেড়াত।

চীনারা বলে যে ফোহিনামক অর্ধ পৌরাণিক নরপতিই প্রথম বিবাহের প্রবর্তন করেন। ফোহি এক কুবাকার গর্ভজাত। তিনি সামাজিক শৃঙ্খলা, বিবাহ, সঙ্গীত ও লেখাপড়ার প্রবর্তন করে নিদিষ্টার যৌন-সম্বন্ধ রোধ করেন। অজ্ঞাত জাতিদেরও বিবাহ প্রচলনের অঙ্গরূপ উপস্থান আছে।

এ্যারিস্টটল প্রবুধ প্রাচীন লেখকেরা অজ্ঞাত স্থানেও অল্পরূপ অবস্থার কথা বলেছেন; এই বিশৃঙ্খল অবস্থা আজও অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। Polynesian Island গুলিতে—যেখানে অধিবাসীরা খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হননি, সেখানে অবাধ মিলনের প্রচলন রয়েছে। একজন মিশনারি তাদের সম্বন্ধে লিখেছেন—‘এই দ্বীপ সমূহের কোথাও কোথাও, পুরুষকে একটি নারীতে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টাই, খৃষ্টানধর্মের বুদ্ধির অন্তরায় হয়েছে’।

এই দ্বীপ সমূহের কোথাও কোথাও আবার নারীর সঙ্গীত খুব উচ্চাঙ্গের ছিল এবং Samoa দ্বীপ-এরিক দিয়ে সকলের অগ্রগণ্য। অপর দ্বীপগুলিতে ব্যাভিচারের ছিল প্রাচুর্য। Hawaii দ্বীপপুঞ্জ আশীয়দের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী বদলাবদলী করার রীতি প্রচলিত ছিল এবং কোনও কোনও দ্বীপে বিশেষ করে সর্দারস্থানীয় লোকদের মধ্যে ভাই বোনের বিবাহ চলিত ছিল।

অপর কোন কোনও স্থানেও নীচ বর্ণের মধ্যে নৈতিকচরিত্র খুব উঁচু ছিল। আন্দামান দ্বীপের অধি-

বাসীরা নগ্নদেহে বিচরণ করে। সম্প্রতি জীলোকেরা পিছন দিকে একটি তৃণ নির্মিত বস্ত্রবিশেষের আব্রাশন দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এক ভাণ্ডা পরিগ্রহণই সেখানকার নিয়ম এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম করাওঁ দেখা যায় মাত্র। এরা শিশু জন্মগ্রহণ করবার আগেই অনাগত পুত্রের বা কঙ্কার নামকরণ করে, সেজন্য নামগুলি উত্তরলিপ্সি বাচক। সবচেয়ে মাত্র কুড়িটি নাম আছে এবং সকলেই তার সঙ্গে কয়েকটা বিশেষণ যোগ করে দেয়।

ব্রহ্মদেশে এক ভাণ্ডা পরিগ্রহণই নিয়ম ছিল। কিং সেখানকার স্বামীরা স্ত্রীকে কম বা বেশী সময়ের জন্য যে কোন অপরিচিতকে ভাড়া দিতে পারতো। এই প্রথা স্ত্রীজাতির গৌরব হানির পরিচায়ক বলে গণ্য হোত না এবং স্ত্রীও তার সাম্প্রতিক স্বামীর প্রতি সাধারণতঃ অহরহত থাকতো।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে আর্ঘ্য রমণী স্বামীর সঙ্গে সমান ভাবে স্বয়ংক্রিয় বহন করতেন। এবং দেশেবাসীর অধিকার পেতেন। তাঁরা দেবতার স্তুতিবিষয়ক মোকও রচনা করতেন এবং সেই সমস্ত মোকের মধ্যে প্রকৃতক কতকগুলি আর্থারমণী-রচিত।

আর্ঘ্যগীতে প্রাচীনকালে কোন যুবক তার পছন্দকৃত যে কোন বালিকাকে বিবাহ করতো এবং তারা বহু ভাণ্ডাগামী ছিলনা। অবশ্য রাজপুত্রগণও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক কারণে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেক কজাকে একজের বিবাহ করতেন।

Protestant Church এর প্রতিষ্ঠাতা Martin Luther-এর সময় পর্য্যন্ত এই নিয়ম আর্ঘ্যগীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রায় ৭৫০ খৃঃ অব্দে জার্মান জাতির ভীষণ বৈতিক অধ্যাপন হয়, এবং বিবাহের পবিত্রতা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। এই সময়ে Saxonগণ ছিল অসভ্য এবং অশৃঙ্খল, তাঁরা তাদের দেবতার কাছে নববলি দিত এবং নারীর উৎসর্গই ছিল উৎকৃষ্টতম। তারা নিজের ভগ্নীদের বিবাহ করতো।

Eskimোগণ বড়ই অপরিষ্কার জাতি ছিল, কারণ তাদের মধ্যে শীত, এতই প্রবল যে জলপশর্ও কেউ কোরত না। মায়েরা শিশুর পাভালেহন করে তাদের গা’ পরিষ্কার করে দিত, যেমন পাভী তার সন্তানকে করে। Eskimোগা এক ভাণ্ডা বিবাহ করতো, কিন্তু জীলোকের সঙ্গীকজান বড় অম ছিল। তাদের স্বামী ও আশ্রয়েরা নৈতিক ক্রটিবিশিষ্টকে উপেক্ষা করে চলতো।

Alaskaস্থানে স্থানে জীলোকেরা কোন জাহাজ দেখলেই সেখানে গিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করে উপার্জন করে এবং স্বামীরা তাদের এই প্রচেষ্টাকে মসার নিষ্ঠারের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে মনে করে।

Lacedaemonianদের সম্বন্ধে একটি অস্মৃত গল্প আছে। তারা খৃঃ পূঃ ৩২৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে যে Messina বিজয় না করে তারা ঘরে ফিরবে না। কিন্তু এত আশাতীত সময় লাগে। দশ বৎসর পরও তারা ফিরতে থাকে। তখন তাদের স্ত্রীরা খবর পাঠায় যে যোদ্ধারা যেন এমন ব্যবস্থা করেন যাতে তাঁদের স্ত্রী এবং তাঁদের স্নেহীদের (যারা ইতিমধ্যে বড় হয়েছে) স্থান সন্তাননা হয়। তখন Lacedaemonianরা তাদের মধ্যে বাছাই করা বেশ বদশালী কয়েকজন

যোদ্ধাকে দেশে গিয়ে সমস্ত জীলোকদের কুমারীদের সন্তান কামনা পূরণ করবার জন্য পাঠায়। এই ব্যবস্থায় যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাদের বলে Parthenios অথবা কুমারী সম্বৃত শিশু।

পরবর্তী কালে গ্রীকরমণীগণ স্বদর্শন যুবকদের সঙ্গে মিলিত হোত স্বদর্শন পুত্রজাতির বাসনার তাদের স্বামীদের ইচ্ছাশূন্যে। এই ব্যবস্থাকে মোটেই অস্বীকার মনে করা হোত না, এবং এতে নারীর মর্যাদার হানি ও হোত না।

যখন Captain Cook তাঁর মাল্লাদের নিয়ে প্রথম Hawaii দ্বীপপুঞ্জে যান, তারা দেখেন সেখানে অবাধ যৌন মিলনের নিয়ম প্রচলিত, এতে তাঁরা সানন্দে যোগ দেন। কিন্তু কয়েকজন মাল্লার সিফিলিস রোগ থাকায় সমগ্র দ্বীপবাসীর মধ্যে ঐ উৎকর্ষ রোগ সংক্রামিত হয়। এই ব্যাপার এই স্বাভাব্যন জাতির বিশেষ অবনতির কারণ হয়।

অনেক ভূগোলদেশেও অসংখ্য যৌন মিলন পুনঃ প্রবর্তনের বহু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু যদিও তা লোক চক্ষুর অন্তরালে Sub rosa বর্ধমান হয়েছে তবুও তা’ সরকারের অহমোদন পায়নি। (কমন্স)

আর্ট ফিল্মস্

৫৮, চৌরঙ্গী রোড
পি. কে. ৯২২



এক অভিনব কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত আমাদের স্বীকৃতি চিত্র নিবেদনের পরিচয় স্বীয় পাইবেন। সঙ্গীত, সূত্র, অভিনয়ে উজ্জ্বল এবং পরিচালনায় নিখুঁত এই চিত্রখানিকে আপনি নিশ্চয়ই অভিনন্দিত করিবেন।

“আর্ট ফিল্মস্”এর প্রথম অর্থ—“দ্বন্দ্ব”

খেলার মাঠে

বি. সর্বাধিকারী সম্পাদক, “শোভাটিং ইন্ডিয়া”

কতই না আকর্ষণ, কতই না উত্তেজনা, কতই না দর্শকের ভীড় এই খেলার মাঠে। কেবল বাংলা দেশ নয়, ভারতবর্ষ নয়, সারা জগৎ জুড়ে খেলার জন-প্রিয়তা। খেলার উৎসাহ বা জনপ্রিয়তাও আকর্ষণের নয়—যুগ যুগ ধরে খেলার উৎসর্গ ও সমাদরের কথা আমাদের জানা আছে। মহাভারত ঐতিহাসিক সত্য বলে গৃহীত না হ’তে পারে, কিন্তু তার ভেতরেও আমরা উচ্চাঙ্গের খেলার সন্ধান পাই। এই সব খেলার মধ্যে রথবিদ্যা অল্পতম এবং এই বিজ্ঞার স্রোতাচার্য, অর্জুন ও কর্ণের পারদর্শিতার কথা কার না জানা আছে? প্রাচীন রোম ও গ্রীসের খেলার ভিতর থেকে আমরা আজ পেয়েছি Olympic Games এর আদর্শ।

যে খেলা যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীতে এত সমাদৃত হয়েছে, তার নিছকই কোনও মৌহিনী শক্তি আছে। মাছুর সারাদিন কাজকর্ম করবার পর চার মনকে নবজাগরণ করতে এবং সেই নবজাগরণে দেবার সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে ক্রীড়া-কৌতুক। তাই মাছুর “স্নাতিহীন, স্নাতিহীন দিবসের” পরে ছুটে যায় খেলার মাঠে।

খেলার আর একটা বড় সিকি আছে। সেটা হচ্ছে খেলাধুলার ভিতর দিয়ে চরিত্র গঠন, নৈতিক উন্নতি, জাতীয়তা গঠন। ইংরাজী ভাষায় sportsman অথবা খেলোয়াড়ের আর একটা নাম gentleman অথবা ভলোয়ার। এতলা বোধ হয় platitude অথবা পুরোণা কথা—এর ভিতর নৃতনত্বের আভাস না থাকতে

পারে কিন্তু আমাদের মতে এগুলো চিরন্তন সত্য। খেলার ভিতর সব চেয়ে বড় জিনিষ খেলাড় পারদর্শিতা নয়—বড় জিনিষ হচ্ছে নিজে থেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজের দলের হয়ে থেলা। এই চেষ্টার ভেতর থাকবে না স্বার্থ, থাকবে না দলাদলি, থাকবে না আপন পনর ভেদাভেদ-জ্ঞান, থাকবে না নীচতার এতটুকু আভাস। জিতবার জন্য আমরা চেষ্টা করব অপ্রাণ, কিন্তু সে চেষ্টার অসহপায়েয় এতটুকু আশ্রয় আমরা নেব না। যি জিতি সে জেতার ভিতর থাকবে আনন্দ, কিন্তু থাকবে না গর্ব। যদি হারি আমরা যেন ভুলে না যাই বিপর্যয় দলের খেলা তারিক করতে—এবং সেটা শুধু মৌরিক নয়, মন থেকে। এই ভাবে বিজয়ী আমাদের মনকে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে আমাদের খেলাধুলা বৃথা, এবং যে মহৎ আদর্শ সেটা মাঠেই মারা যাবে।

এখন আমি গড় কয়েক সালের ভারতবর্ষের খেলাধুলার বিষয় কিছু বলব। ফুটবল থেকেই আরম্ভ করা যাক। কারণ ফুটবল সবচেয়ে কিছু না বললে স্বত্ত: বাংলাদেশের খেলাধুলার কিছুই বলা হয় না। আপনারা সকলেই জানেন যে গত বছর কলকাতার ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ মোহনবাগানই জয় করে। আগেকার ফুলনার মোহনবাগানের দলের, অনেকের স্বীকার করবেন বোধ হয়, আজকাল কিছু কম জোরে। খুব নামকরা খেলোয়াড়ও তাদের বেশী নেই। কিন্তু তাদের একটা মস্ত জিনিষ ছিল এবং আছে। সেটা হচ্ছে তাদের পিছনে একটা বিরাট নাম, তাদের পিছনে হাজার হাজার লোকের ইচ্ছাশক্তি এবং বোধ হয় ভালবাসা। এই সব মিলে মোহনবাগান দল যেভাবে শেষে মুহুর্তে ইষ্টবেঙ্গলের মুখের গ্রাস ডিনিয়ে নিরেছিল সেটা সত্যই চমকপ্রদ। কারণ দল হিসাবে ইষ্টবেঙ্গল লীগের সময়ও মোহনবাগানের থেকে শক্তিশীল ছিল না। ইষ্টবেঙ্গল রাইবই প্রথম মোহনবাগানকে তাদের শাফল্যের জগৎ সর্ধর্দনা করেছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। এই sportsmanship বিষয়ে যায় নি, তাই ইষ্টবেঙ্গল সাফল্য লাভ করেছিল আরও বড়

জিনিষে—আই, এক, এ, শীল্ডে। তখনও প্রথম হাত বাড়িয়ে এসেছিল, সর্ধর্দনা করতে সেই মোহনবাগান রাইবই। খেলোয়াড় খেলোয়াড়, দলে দলে যখন এই সৌহার্দ্য যেটা সাধারণের চোখ মোটাবার জন্য মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল সমিতি দল শুধু ঢাকায় নয় জিগের মাসে কলকাতাতেও প্রদর্শনী খেলা খেলেছিল, তখন দর্শকে দর্শকে বাবুবিভক্তা কণ্ঠা এবং অনেক ক্ষেত্রে এমনকি হাতাহাতি নিত্যস্থই অব্যাহত। দলে দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু সেটা যেন বিষয়ের উপর গড়ে না ওঠে, এইটাই হবে আমাদের লক্ষ্য এবং আদর্শ।

ফুটবল খেলা ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশেও হয়েছিল। কিন্তু তেমন জমে ওঠেনি। যুদ্ধের সময় টেনে যাতায়াতের অসুবিধা ও আবহাওয়াভার জগৎগতাবারের বয়ের রোডস—রাপ প্রতিযোগিতার বধে প্রদেশের বাইরের কোন লোকই নেওয়া হয় নি। তাতে অবশ্য খেলার দিক দিয়ে রোডস’ কপ প্রতিযোগিতা অল্প বছরের মতন উন্নতির হতে পারে নি।

ফুটবলের পরে সামান্য কিছু দিন বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলা নিয়ে সারা ভারতে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে। কিন্তু ক্রিকেট সবচেয়ে বলবার আগে আমি অল্প কয়েকটা খেলা বন্ধে গুই একটা কথা বলতে নিতে চাই।

প্রথমেই বলতে হয় সীতারের কলকাতার জাশনালাই হইমিং ক্লাবের দিলীপ মিত্রের বয়ের গুয়েষ্টার ইন্ডিয়া ইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুতিব অর্জন। দিলীপ মিত্র ১০০ গজ সত্তর গজ প্রতিযোগিতায়—সেকেন্ডে এই রেস জিতে, ভাঙ সীতারক বিজয়লাব কয়েক বাস আগে যে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন, সে রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। দিলীপ মিত্রের এই সাফল্যে বিশেষ করে বাংলাদেশের লোক আনুশিত হবেন।

বয়ের গুয়েষ্টার ইন্ডিয়া বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপও এবার একজন বাঙালী, প্রদ্যু দেব, জিতেছেন। প্রদ্যু দেবকে আপনারা জানেন—একজন রুতী বিলিয়ার্ডস খেলোয়াড় এবং তিনি একজন পূর্ণতন অল ইন্ডিয়া

চ্যাম্পিয়ন। এবার কিন্তু তিনি এখানকার চ্যাম্পিয়ন ডি এচ. ক্রিয়াবর ৬ পয়েন্টে হারিয়ে দেন। দেবের হয় ১০০০ আর ক্রিয়াবরের ৯৯৮। প্রদ্যু দেব এই খেলাতে ১৮ এর একটা স্কোর ব্রেক করে—এ বছরের প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় রেকর্ড স্থাপন করেন।

টেনিস খেলা কলকাতায় এবার বেশ জমে উঠেছিল। কলকাতা শাউথক্লাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে এবার দেশবিশেষের অনেক খ্যাতিনামা খেলোয়াড়র যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকার প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় হাল সারফেল ও লেজিসডার, চীনদেশের ডেনিস ক্যাপের খেলোয়াড় ডব্লিউ সি চয় এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গাউস মহম্মদ ও তাঁর দোস্তর ইফতিখার আমেদ। বাংলার তরুণ দিলীপ বহুও এই খেলার জন্য আমনেশদপুর থেকে আসেন।

এই প্রতিযোগিতার সময় সকলের বড় প্রশ্ন ছিল এই যে, কে বড়, গাউস মহম্মদ ভারতের শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড় না, আমেরিকার হাল সারফেল? সে প্রশ্নের জবাব আমরা সাময়িক ভাবে পেয়েছি। হাল সারফেল ইষ্ট ইন্ডিয়া ফাইনালে একটা সেটটা মেরেও গাউস মহম্মদের কাছে হারিয়ে দেন। গীরা এই খেলা দেখেছিলেন তাঁদের মনে কোন সংশয়ই ছিল না যে সারফেলের সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর রুতিব। সেমিফাইনালে একমাত্র ইফতিখার আমেদই সারফেলকে একটা সেট হারাতে পেরেছিলেন।

ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র দিলীপ বহুই ১৯৯২ সালে করাচীতে সারফেলকে হারিয়েছেন। কিন্তু তার পাঁচটা জবাব সারফেল গড় বয়সের ইষ্ট ইন্ডিয়া ফাইনালেই দেন, দিলীপ বহুকে শোচনীয় ভাবে হারিয়ে। এই নিয়ে হাল সারফেল পর পর দুবার ইষ্ট ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলেন।

দিলীপ বহু এবারের প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে গাউস মহম্মদের কাছে হেরে যান, কিন্তু তার আগে

তিনের ভেঁট কাপ খেলোয়াড় ডব্লিউ সি চমকে হারিয়ে তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট স্বর্জন করেন। এখন দেখা যাক এম্বাহাবের অল ইন্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে কে কি রকম খেলেন।

এইবার আমি ক্রিকেট সম্বন্ধে কিছু বলব। ভারতে ক্রিকেটের মরফম শুরু হয় করাচীতে সিও পেট্যাভুয়ার থেকে। কিন্তু সত্যি সত্যিই দর্শনীয় ও উপভোগ্য হয়েছিল বম্বের পেট্যাভুয়ার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। আশানারী বোধ হয় কানেন যে এই প্রতিযোগিতা গত দুবছর নানা কারণে বন্ধ ছিল। সে সব কারণ কি তা আমি বলতে চাই না। তবে এবারের পেট্যাভুয়ার খেলা দেখে সেই পুরোনো কথাটাই আবার প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রতিযোগিতা ভারতের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

এবারের পেট্যাভুয়ারে অরী হয়েছে হিম্মতুল। এই সন্ধানের জন্ত হিম্মতুল ও তাঁদের অধিনায়ক বিজয় মার্কেট বিশেষ হুমায়ূত হয়েছেন। হিম্মতুল প্রথম খেলায় ইউরোপীয়ানদের অতি সহজে এক ইনিংসে হারিয়ে দেন—এই খেলায় রায়মাকশ ও কিরণচাঁদ একশ'র উপর রান করেন। অপরদিকে অবশিষ্টদল মুসলিম দলকে হারিয়ে দেয়। মুসলিমদল আগেই পাশীদলকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

অবশিষ্ট দল ও মুসলিমদের খেলায় নজর মহম্মদ খুব ভাল খেলে ১৫৪ রান করেন। কিন্তু তার পরেই বিজয় হাজারী ২৪৮ রান করেন। বিজয় মার্কেটের রেকর্ড ২৪০ ভেঙ্গে দেন। হাজারীর এই খেলা অতি চমৎকার ও প্রশংসনীয় হয়েছিল।

কিন্তু এবারকার পেট্যাভুয়ার ফাইনালে—হিম্মতুল ও অবশিষ্ট দলের ভেতর তীর প্রতিযোগিতা দেখা যায়; ফলাফল নিয়ে নয়, বিজয় হাজারী ও বিজয় মার্কেটের মধ্যে রেকর্ড ভাঙ্গা গড়া নিয়ে। হিম্মতুল অবশিষ্ট দলকে এক ইনিংসে হারায়। বিজয় মার্কেট প্রথম ২৫০ নট আউট করে হাজারীর ২৪৮ রেকর্ড ভাঙলেন। দুদিন পরেই হাজারী আবার সেই রেকর্ড মার্কেটের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন ৩০৯ করে। যারা হাজারী,

একটা সাধারণ দলের হয়ে, এই চমকপ্রদ খেলা দেখেছেন তাঁরা ঠিকই বলেন যে এরকম কৃষ্টি পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে অসামান্য। খেলাখুলা বেশ হলে বিজয় মার্কেট বলেন যে বিজয় হাজারী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। একথা মার্কেটের বলা সাজে। কিন্তু আমরা বলি এ বছরের ক্রিকেট বিজয়দেরই নয় জয়কার।

প্রিন্স রণজিৎ সিংহীর স্মৃতিকরে ভারতের ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপের অনেক খেলা হয়েছে। বম্বে ও বরোদার খেলায় বম্বে জিতেছে কিন্তু সেখানেও ছুই বিজয়ের সংঘর্ষ ঘটে। মার্কেট ও হাজারী দু'জনেই একশ'রানের ওপর কয়েকজন।

বাংলা দেশে ক্রিকেট খেলায় এবারের খুব একটা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের অধিনায়ক হয়েছেন কুচবিহারের তরুণ মহারাজা। রক্ত টোফীর প্রথম

সুন্দরের সন্মিলন

!!!

যে কোন রকমের

সুন্দর ফটোর জগৎ

সুন্দর ফুডিওই

একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আফিট : কে, সি, থান্না

১৩৯৩, রসা রোড, ভবানাপুর

(হাজারী রোডের মোড়)

ফোন : সাইথ ৪৪৫

গায় " বাংলা " অতি কষ্টে বিহারদলকে হারায়। এই খেলার ফিয়ারের এক ব্যানার্জি (ছোট) ১০০ রান করেন এবং নীহার চৌধুরী ও হুটে ব্যানার্জী দু'র বল করেন। বাংলার হয়ে এস মুস্তাফি ভাইলই গাট করেন, নির্মল চ্যাটার্জীও অনেক রান করেন। বেগিএ কমল ভট্টাচার্য বেশ ভালই করেন।

গত সম্রাটে কিন্তু বাংলাদেশ হোলকারদলকে অন্যায়সে ১১ উইকেটে হারিয়ে দেয়। হোলকারদলে এসেছিলেন গাজনামা গের : ক : সি কে নাইজু ও মুস্তাফি আলি। কুচবিহারের মহারাজা টমু জেতাং বাংলাদেশ একটা র হুবিবা লাভ কোরে প্রথম ব্যাট করে। একসময় গিয়া ও উইকেটে ৩০০ রান করেছিল, কিন্তু শেষ

পর্যন্ত ৩৮৭ করে সকলে আউট হন। তরুণ খেলোয়াড় প্রবীর সেন এর মধ্যে ১৪২ রান করেন, নির্মল চ্যাটার্জীও খুব চমৎকার ব্যাট করেন। হোলকার প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৩৬ রান করে ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৬। এর ভিতর মুস্তাফি আলির ব্যাটিং অতুলনীয় হয়েছিল এবং নিয়ালকার ও রমেশ প্রতাপ ভাইল খেলেছিলেন। কিন্তু কমল ভট্টাচার্যের ব্যারামক বোলিংএর মুখে হোলকার দল ঠাড়াতে পারে নি।

বাংলাদেশে তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ভালই দল গাওয়া গেছে। এর পরে বাংলাদেশ মাস্তাজ বা হাইদারাবাদের সঙ্গে খেলবে। আশা করি তরুণের মুখে তরুণ খেলোয়াড়দের আরও সুখি, সুযোগ দেখা হবে।

কর্ণ-বিন্দু
সকল প্রকার
কান পাকার
মহোষধ

ডাক্তার এ. কে. চৌধুরী
দাদের ততি
উৎকৃষ্ট মালম
জালা ময়না
কয় না

খোস
পাড়ার
মানভীম
পাড়ার খোস
পাড়ার পরিষ্কার
মহোষধ

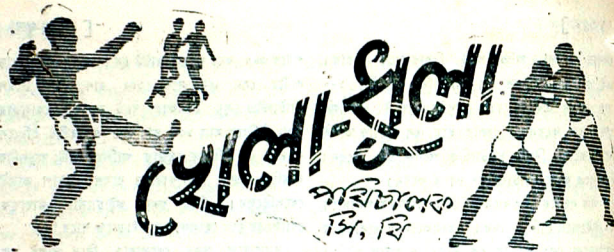
ক্রিয়-নাশিনী
সর্ব প্রকার ক্রিমি রোগের অব্যর্থ ঔষধ
পুথক
জোলাপ
পরিমাণ করুন
নাগে না

জগদ্বন্দ্ব
দিল
সকল প্রকার
জুরের মহোষধ

সুতিকা-নাশিনী
হুরারোণ্য সুতিকারোগের
ভক্তিব তত্যাচর্ম্য মন্ত্রোষধ
সোল এজেন্ট

সুপ্রী-অয়েন্টমেন্ট
স্ত্রী ও মনুষ্যের
অব্যর্থ মহোষধ

হোসাদ এস. সি. চৌধুরী এও সাদার
৫০ নং আর্মহাউস স্ট্রিট কলিকতা



পূর্ব-ভারতে টেনিস প্রতিযোগিতা

কলিকাতায় সাউথ ক্লাব পরিচালিত উক্ত প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। খেলাটিতে ভারতের এবং ভারতে অবস্থিত মিত্রশক্তির কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন। মার্কিন খেলোয়াড় **হল্‌ সারফেস** এ বছরেও তাঁর গত বৎসরের অশ্রুিত গৌরব বজায় রেখেছেন। তিনি প্রতি সহজেই ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় **গাউস্‌ মহম্মদকে** ৬-১, ৬-২, ৬-২ গেমে পরাজিত করেছেন।

ডবলস্‌এ কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গাউস্‌ মহম্মদ ও ইফতিকার আবেদ হল্‌ সারফেস ও লেড্‌স্‌টারকে ৬-৭, ৬-৬, ৬-৬, ৬-৭, ৬-০ গেমে হারিয়ে দিয়েছেন। খেলাটি খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

এ বছরে ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা অঙ্গীকৃত হবে না বলে শোনা গেছে।

ক্রিকেট

রণজি ট্রফি

পশ্চিম-ভারত বিভাগে **বোম্বাই দল** মহারাষ্ট্র দলকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়েছেন। বোম্বাই দল ৭৩৫ রান করেন, তার মধ্যে দলের নেতা **বিজয় মার্চেন্ট** একাই ৩৫৯ রান করেন আউট না হয়ে। এটা তার ব্যক্তিগত রেকর্ড। এর পূর্বে রণজি ট্রফিতে বরোদার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে খেলে বিজয় হাজারী ৩৬৬

রান করেছিলেন। বিজয় মার্চেন্ট এবার তাকে ছাড়িয়ে গেলেন।

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে ২৯৮ রান করেন।

দক্ষিণ ভারত এলাকায় **হায়দ্রাবাদ দল** ১৯৬ ও ১০৯ রান করে **মধ্যপ্রদেশ** ও **বেরার দল**কে (১৬৬ ও ৯০ রান) মাত্র ১০ রানে হারিয়ে জয় করেছেন। এরা এবার মাস্তাজের সঙ্গে ফাইনাল খেলবেন আগামী ২৮, ২৯, ৩০শে জাহ্নাবীরিতে সিকান্দাবাদে। এই খেলার বিজয়ীদের সঙ্গে বাঙ্গলা দল কলিকাতায় ফেরতবারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খেলবেন।

মাজাজ ও মহীশূর দলের খেলায় এক ইনিংসেই ফলাফল স্থির হয়ে গিয়েছে। মাস্তাজ ৩৬৫ রান করেছেন, মহীশূর ৩৫৯ রান করেন। মাত্র ৬ রানে মহীশূর পরাজিত হওয়ার স্বীকার করেছে।

জীবন বীমা কর্তৃক—

ইণ্ডিয়া এমিকেবল

প্রভিডেন্ট ইন্সিউরেন্স লিঃ

(স্থাপিত—১৯৩১)

হেড অফিস—৫ ও ৬ হোয়ার স্ট্রাট, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

মিঃ এ. রায় চৌধুরী

১৩৫০]

বাংলা দলের কৃতিত্ব

বাংলার ক্রিকেট দল শক্তিশালী হোলকার দলকে যেভাবে হারিয়ে দিয়েছেন, তাতে অনেকেই 'একটু আশ্চর্য্যপ্রসূত' হয়েছেন। **হোলকার দল** ভারতের ৪ জন ব্যতনামা খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে সি, কে, নাইডু, মুস্তাক আলী, জে, এন, ভায়া, নিমলকার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। গত বৎসর এই হোলকার দল ইন্দোরে বাংলাকে হারিয়ে দিয়েছিল। এবারে বাংলা দল খুব স্বন্দরই প্রত্যুত্তর দিয়েছে।

বাংলা দলের এই সাফল্য তরুণ-খেলোয়াড় **পি, সেনের** ব্যাটিং ও **কে ভট্টাচার্য্যের** বোলিংয়ের জন্ত সম্ভব হয়েছে। শ্রীমান সেন এ বছরে প্রথম আদেশিক খেলার স্থান পেয়ে খেলেই কৃতিত্ব দেখিয়ে নিম্নলিখিতভাবে ১৪২ রান সঞ্চয় করেছেন। কে, ভট্টাচার্য্য প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৪টি রান দিয়ে ৬ উইকেট গতম্ব করেছে।

খেলার ফলাফল—

বাংলা দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৭ রান (পি, সেন ৪৭, অমিত চ্যাটার্জি ৪৭, নিমল চ্যাটার্জি ৭১)

হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ১০৬ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৬ রান (মুস্তাক ৭০, নিমলকার ৭৭) বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে কেউ আউট না হয়ে ২১ রান করে। বাংলা দল ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়।

বোম্বাইয়ের পরাজয়—

এবারে বোম্বাই দল যেক্রম ভাবে খেলতে আরম্ভ করেছিলেন তাতে সকলেই একরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন বোম্বাইয়ের রণজি কাপ বিজয়ের। কিন্তু ছুড়ীয়া জমে আমাদের ধারণার অদল বদল হয়ে গেছে। যদিও এই পরাজয়ের মূল আছে "ম্যাটিং উইকেটে খেলার অনভিজ্ঞতা ও দল গঠনে অদূরদর্শিতা।"

এটি পশ্চিমবঙ্গের ফাইনাল খেলা এবং ইহা রাহেগাটে অঙ্গীকৃত হয়। বিরোধিতা করেন **পশ্চিম ভারত রাজ্য দল**। বোম্বাই টেসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করেন ও ২৫৫ রান করে সকলে আউট হয়ে যান।

[খেলাধুলা]

এর মধ্যে মুন্ডীর ২২৮ বিশেষে উল্লেখযোগ্য। মার্চেন্ট মাত্র ৫৩ রান করেই আউট হন। পশ্চিম-ভারত রাজ্যদল ৪ উইকেটে ৩৬৩ রান (পূর্ণিমা ১৭৪, ওমর বা ১৩৬) করবার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিম ভারত রাজ্য দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলের উপরই জয় লাভ করেন।

মেয়র ফাও ক্রিকেট—

মেয়র ফাও সাহায্য করে আগামী ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে জাহ্নাবীরী কলিকাতার মোহনবাগান মাঠে বাঙ্গলা একাদশ ও অবশিষ্ট দলের বে খেলার কথা ছিল, একদিন খেলা হবার পর সুপ্রিয় জন্ত খেলা বন্ধ হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় বাংলার সকলে আউট হয়ে ১১৬ রান করেন। অবশিষ্ট দল তিনজন আউট হয়ে ৫৩ রান করেন। সুচবিহারের মহারাজার অধিনায়কবে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ খেলবেন কথা ছিল :

এই প্রতিষ্ঠানেরই

পৃষ্ঠপোষকতা করুন

ইহাই ভারতের প্রাচীনতম

জীবন বীমা অফিস

বোম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ

স্থাপিত ১৮৭২

পারস্পরিক সহযোগিতার একটি খাটি প্রতিষ্ঠান

চিফ এজেন্টস—

দস্তিদার এণ্ড সন্স

৮, রাইভ স্ট্রাট, কলিকাতা।

কুচাধিহারের মহারাজা (ক্যাপটেন); কে, বোস; পি, নেনেই এন, চাটার্জি; কে, ভট্টাচার্জি; এম, মুস্তাকি; এ, জুম্মার; এম, ব্যানার্জি; এ, চাটার্জি; বি, মিজ; এম, সেন এবং জুব দাস। রিজার্ভ: জে, দাসগুপ্ত; হুদীল বহু ও এম, মিজ। অবশিষ্ট দলে ডি, ডি, হিঙেলকর; সি, এস, নাইডু; এইচ, আর, অধিকারী; হুট্টে ব্যানার্জি; জি, কিশোরীদাস; চুদীলাল; রামপ্রকাশ এবং এন, চৌধুরী।

আগামী ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় রাজ্য দলের সঙ্গে ভারতীয় অবশিষ্ট দলের পুন-রায় একটি বেলা হবে একগুহির হয়ে। পাটাওড়ীর নবাব দলের রাজাদলের এবং প্রফেসর দেওয়ার অবশিষ্ট ভারতীয় বিনিয়ুক্ত্য করবেন। রাজাদলের হয়ে খেলবেন: পাটাওড়ীর নবাব (ক্যাপটেন); লে, কং, সি, কে, নাইডু; এল, অমরনাথ; ডি, এস, হাজারী (সিনিয়র); এইচ, আর, অধিকারী; আর, বি, নিখলকার; সি, এস, নাইডু; সৈয়দ আমেদ; আমীর ইলাহি; মুস্তাক আলী; পৃথিরাজ ও কিম-টার। অবশিষ্ট দল:—এম, ডি, বি, দেওয়ার (ক্যাপটেন) বিজয় মার্কেট; ভিহু ন্যামকড; এম, এন, ব্যানার্জি; এম, ভবলু, সোনি; রাম গি; হিঙেলকর; কে, সি, ইয়াহিম; সি, টি, শারওয়ার্টে; কে, এম, রঙ্গনেকর ও জে, বি, পট্ট।

রেড ক্রস এবং বেঙ্গল রিলিফ ফাউন্ডেশন সাহায্য করে লক্ষ্যে গণ্ডগরের একাদশ দলের সঙ্গে রায় বাহাদুর রামকুমার ভাগবতের একাদশ দলের গত ২৫শে কাছারী যে বেলা হয়ে গেছে তাতে রায় বাহাদুরের দল ৭ উইকেটে ৩০৭ রান করে ডিক্লারার করেন। গণ্ডগরের দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৭ রান করেন। রায় বাহাদুরের দল এক ইনিংস এবং ২৮ রানে জয় লাভ করেন।

ভারোত্তোলনের নতুন রেকর্ড স্থাপন:—

ইটিনিয়া অধিবাসী লুহারের ই হাউ, ক্রিন এবং জার্ক (Two-hands-clean-and-jerk) এর রেকর্ড

কায়েরার ২৮ বৎসর বয়সের মহম্মদ গাইসা ১৬৯ কিলোগ্রাম ওজন তুলে ভঙ্গ করেছেন। এখন এইটাই হেভিওয়েটের নতুন রেকর্ড হ'ল। লুহারের স্ট্রেক্ট ছিল ১৬৭৭ কি: গ্রাম।

পাতিয়ালা নিখিল ভারত অলিম্পিক

প্রতিযোগিতা:—

আগামী ১০ই, ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী পাতিয়ালায় খেলা হবে। বাঙ্গালার 'রাষ্ট্রেতবল' দল গঠন:— হুদীল চাটার্জি (ক্যাপটেন), রমেন গাঙ্গুলী, প্রভাত হাফিজী, করুণা চাটার্জি, বৈজনাথ বহু, নিরঞ্জন সেন-গুপ্ত, হারিক দাস, বিমল ঘোষ ও হুধাংত গাঙ্গুলী।

বাঙ্গালার তলিবল দল:—

হুদীল চাটার্জি (ক্যাপটেন); পরিতোষ চক্রবর্তী; এম, এম, সোনি; বিহু তোয়ারী; লালমোহন গাঙ্গুলী; জামা দত্ত; রঞ্জিত বোস এবং নারায়ণ দাস।

উপরের দল ছাড়া বাঙ্গালার হয়ে শীঘ্র পাতিয়ালা রওনা হবে।

ফুটবল খেলোয়াড়ের ক্লাব পরিবর্তন

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড় আলারাও এবং সোমানা ভবানীপুর ক্লাবের হয়ে খেলবার অজ ছাড়পত্র সহ করেছেন। এরিয়ানের অধিত গড় গড়ি এবং বেঙ্গল আগাম রেলের অনিল গড় গড়িও ভবানীপুরের হয়ে খেলবার অজ অস্বত্বিত চেয়েছেন।

বার্ট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

কলিকাতার যোদ্ধাগণের সাকল্য

লাহোর বার্ট ইনস্টিটিউট ছিল বিরটি মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। কলিকাতা হইতেও অনেক যোগদান করছেন। গত ২৫শে কাছারী যে প্রতিযোগিতা হয়েছে তার ফলাফল:—

ফেমার ওয়েট:—এ, এম, জোহা (কলিকাতা) সি, স্টাট (আর, এ, এক, "ভবলিউ") কে প্রথম রাউণ্ডেই নক আউট করে জিতেছেন।

লাইট ওয়েট:—ই, লার্ডেন (কলিকাতা) এম, টমাস (ইউ, এ, এ, এক) কে, পরেটস্‌এ হারিয়েছেন ওয়াটার্স ওয়েট:—পি, কে দে (কলিকাতা) কর্পোরাল বাবানু (আর, এ, এক, "ইউ") কে দ্বিতীয় রাউণ্ডে নক আউট করে জয়ী হয়েছেন।



চলতি ছবির সমালোচনা

ছন্নবেশী—ভিন্নায় পিকচাসের নতুন বাঙলা ছবি "ছন্নবেশী" উত্তরা, পূর্ববী, পূর্ব ও আলোয় মুক্তি-লাভ করেছে। উপেক্ষ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন স্বর্গত: অজয় ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের ভার ছিল প্রমোদ দাস ও শঙ্কু সিংএর ওপর। গানের জুই দিয়েছেন হুমায় শতীল দেববন্দী। বিভিন্ন ভূমিকায় পদ্মা, শান্তি গুপ্তা, পূর্ণিমা, সদ্কা, জহর, শৈলেন, ইন্দু, ছবি প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

বোটারির পি-এ-ডি অবনীশ মিত্র আর তার নববিবাহিতা স্ত্রী স্নেহা—এরাই হল গল্পের নায়ক আর নায়িকা। স্নেহাওয়ার স্ত্রী থাকে এলাহাবাদে। তার স্ত্রী প্রশান্ত বহু সোখানকার একজন নামজাদা ব্যাটলার। এর-ছ-বনে—প্রশান্ত আর তার স্ত্রী লাবণ্য, স্নেহাওয়ার বিয়েতে আসতে পারেনি। প্রশান্ত শ্রালক হরিপদকে গিবে পাঠিয়ে যে তার একজন সর্গগুণসম্পন্ন ড্রাইভার চাই। কিন্তু এরকম ড্রাইভার হরিপদ পায় কোথায়? যে সময় অবনীশ রাজী হয় ড্রাইভারের ছন্নবেশী এলাহাবাদে গিয়ে একটু মজা করবে। গৌরহরি নাম নিয়ে অবনীশ এলাহাবাদে এসে ড্রাইভারের চাকরী নিল। প্রশান্ত ভারী গুণী—গৌরহরি পাড়ীও ভাল গানায় আর বাফালাপ জানে চমৎকার। কিন্তু প্রশান্ত জানল না যে গৌরহরিই তার ভায়ারাভাই অবনীশ। গৌরহরি আসার ছদিন পরেই স্নেহা আসে এলাহাবাদে আর প্রশান্ত লাবণ্যের প্রেরের উত্তরে জানায় যে অবনীশ পরে আসবে। এই খানেই জুই হয় প্রহসন নাটকের আর তাতে যোগ দেয় অবনীশের সহপাঠী এলাহাবাদের

প্রোফেসর বিনয় সেন। প্রশান্তের পরিবারের সহিত বিনয় সেনেরাও বিশেষ ভাবে পরিচিত। স্নেহা আর গৌরহরি মধ্য বেলা দেশাটা স্বপন প্রশান্ত আর লাবণ্য খাপা খাপা চোখে দেখে সেই সময়ে বিনয় প্রশান্তকে এসে জানায় যে অবনীশ তাকে লিখেছে গৌরহরি



শ্রীমতী বনমালা

আকবর চিত্রের নায়িকা

যেন স্নেহাওয়ার সঙ্গে না বেশে—গৌরহরি স্বভাব চরিত্র ভাল নয় আর স্নেহাওয়ারও গৌরহরি সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। একথা শুনে প্রশান্ত লাবণ্য চটে আত্ম, কিন্তু গৌরহরিকে তাড়াতে পারেনা—হরিপদর গাতিয়ে। এদিকে গৌরহরি প্রশান্তর মেয়েকে সাক্ষী রেখে স্নেহাওয়ার সঙ্গে ঐহা সঙ্গীত গাইল—এ খপার পাওয়ার পরও গৌরহরিকে তারা ক্ষমা করে। কিন্তু

বেদিন সকালে স্থলেবার খরের সামনে প্রশান্ত গৌরহরির "গো" লেখা কমাল গেল সেদিন সে আর তাকে দেখা করেনি কেলেঙ্কারী ভয়ে। গৌরহরির হ'ল চাকরী থেকে বরখাস্ত। বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে গৌরহরির আর স্থলেবা পালাল কানপুরে। এমন সময় খবর হল হরিপুর অবনীশকে নিয়ে এলাহাবাদে আসছে। বিপদে পড়ে লাভণ্য আর প্রশান্ত-অবনীশের কাছে তারা কী করে মুখ দেখাবে! কিন্তু তারা জানত না, যে আসছে সে অবনীশ নয় স্থবিল-বিনয়ের বন্ধুর ছোট ভাই, কেলকাতার ফিজিলের প্রোফেসর। নকল অবনীশ ঠেকেন এসে সকল কথা শোনে। বিনয় তাকে বুঝিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে আসে। বিনয়ের বাড়ী এসে অবনীশ পড়ে লাতে আর মুখিলে-সোত হচ্ছে



দেবীকারাগি

হামারী বাতের একটি দৃশ্য

বিনয়ের মাঝাতো বোন বহুধা আর মুখিল যে তাকে আসল অবনীশ ভেবে বহুধা ধরে বসেছে তাকে বোচানি পড়তে হবে অথচ স্থবিল বোচানির স্বরবর্ণ পর্যন্ত জানেনা। দু'বে থাকলে কি হয় স্থবিল বহুধাকে সত্যিই ভালবেসেছে। বিনয়ের ভাবের বন্ধ মি: বোসের হাতে বহুধার ছবি দেখে বহুধার কাছে স্থবিল তার নিজের পরিচয় দেয় এবং বহুধার কাছে মি: বোসের পরিচয় জানতে চায়। এর উত্তর দেয় বহুধা স্থবিলকে মি: বোসের আজ্ঞার নিয়ে গিয়ে। স্থবিল বোঝে

সমাজের জঞ্জাল দিয়ে যে মানুষ গড়তে চায় সে ভালবেসে বন্দী হয় না। এরপর ঠিক হয় স্থবিল আর বহুধার বিয়ের। লাভণ্য ভাবে তার বোনের ছড়া-কথা-স্থলেবার বর্তমানে অবনীশ আবার নিয়ে করছে। নকল অবনীশ আর বহুধার পাকা দেখার আশীর্বাদে দিন। আশীর্বাদ প্রায় শেষ হয়ে গেছে এমন সময় স্থলেবা এসে হাজির গৌরহরির সঙ্গে। তখনই প্রকাশ পায় গৌরহরির হচ্ছে ছদ্মবেশী অবনীশ আর নকল অবনীশ হচ্ছে স্থবিল-এখানেই হয় প্রহসন নাটক ও গানের শেষ।

ছবিখানি যথেষ্ট কিছু আলোচনা করবার আগেই বলে রাখি যে বহুধার অজয় ভট্টাচার্য্য আজ আর আমাদের মধ্যে নেই এবং তিনি এখন সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে। এই ছবিখানি অজয় বাবুর পরিচালক জীবনের দ্বিতীয় ও শেষ ছবি।

"অশোক" এর পর এ ছবিতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন এবং তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তবে আরও অনেক কিছুই আমরা হয়ত তাঁর কাছ থেকে পেতাম। পূর্ন দীর্ঘ হাসির ছবি হিসাবে ছবিখানি ভালই হয়েছে তবে এই রকম ছবিখানি হাসির ছবির মধ্যে মি: বোসের মত চরিত্রকে স্থান দেওয়ার কোন কারণই বুঝে পেলো না। ছবির আরম্ভ ও শেষ ভালই এবং নতুন ধরণের। শট্টান দেববর্মার সঙ্গীত পরিচালন মন্দ নয় তবে তাঁর হৃদয় অহুয্যারী আরও অধিক নৈপুণ্য আশা করা বোধ হয় অজায় হবে না। আলোকচিত্র ও শব্দ এখা চলনমই।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমই মি: বোসের ভূমিকার ছবি বিখ্যাসের নাম উল্লেখ করতে হয়। তারপর নাম করতে হলে সকলোরই নাম করতে হয়। কারণ বিশেষ ভাবে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীই নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। তবে team work ভালই হয়েছে।

ঔড়িওর বাইরে

বোম্বাইয়ে নৃত্য প্রমোদ কর—

জানা গেল বোম্বাইয়ের সরকার বাহাদুর নবাবের দিন থেকে প্রমোদ করার হার বাড়িয়েছেন, নীচে ক্রয়ের পরিমাণের ভালিকা দেওয়া গেল:—চারি আনা পর্যন্ত আসনের কর এক আনা; চার আনার বেশী হইতে আট আনা অবধি আসনের কর দুই আনা; আট আনার বেশী এবং এক টাকা পর্যন্ত আসনের কর চার আনা; এক টাকার বেশী এবং দুই টাকা পর্যন্ত আসনের কর আট আনা; দুই টাকার উপর এবং চার টাকা পর্যন্ত আসনের কর এক টাকা; চার টাকার বেশী এবং পাঁচ টাকা পর্যন্ত আসনের কর এক টাকা আট আনা, এবং পাঁচ টাকার উপর হইতে দশ টাকার আসনের কর দুই টাকা এবং দশ টাকার উপর হইতে প্রত্যেক পাঁচ টাকার কর দুই টাকা আদ্যোদ কর হিতে হ'বে। একে বোম্বাই সরকারের নবাবের একটি দান হিসাবে বোঝা যেতে পারে।

ফেমাস ল্যাবোরেটরী—

বিচুদিন পূর্বে জানা গিয়েছিল, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বহুশাখার "ফেমাস" গাইন ল্যাবোরেটরীতে আন লোপে অনেক ছবির 'নেগেটিভ' এবং 'পজিটিভ' ফ্রিম পুড়ে গেছে; কিন্তু তারপর আর কোন সংবাদ আমরা পাইনি। কিন্তু সম্ভ্রুতি ধবর পাওয়া গেল 'ফেমাস' গাইন ল্যাবোরেটরী'র মালিক মিষ্টার সিরাজ বোম্বাইয়ের মহালঞ্জী রেস কোর্সএর কাছে নিজের জমিতে আধুনিক লাক্ষণ্যায় শাঙ্কিয়ে একটি নতুন ল্যাবোরেটরী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এও জানা গেছে বোম্বাইয়ের গবর্নর বাহাদুরই ঐ ল্যাবোরেটরীর ভিত্তি বসাবেন। এক্ষণ অবস্থার মধ্যেও যে তিনি এই বৃহৎ ব্যাপারে নামতে সাহসী হয়েছেন তার জ্ঞ 'উকে' আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাহাদুর, প্রতিমা—

সম্ভ্রুতি বোম্বাইয়ের মোহে শিল্প, বাহাদুর বহুশীল তারকা প্রতিমা দাশগুপ্তা, নিজের 'তাহরকা' গভীর মধ্যে আটক থাকতে আর রাজি নন। তিনি পৃথকভাবে নিজের প্রযোজনায় ছবি তুলবেন এবং তার জ্ঞ অমুমতি পত্র (licence) ও নাকি পাওয়া গেছে বলে 'জানা' গেল। শ্রীমতী প্রতিমা নিজে নিজেতে বেশ দিলেও তাঁর নন্দ বৈশম্য পারাই (মিস্ জুবেন্দা হক) প্রথম ছবির মালিকার ভূমিকায় দেখা দেবেন। ছবিখানি কারবার ঔড়িওতে তোলা হবে এবং পি, এন, অরোরা বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী, ছবিখানির ম্যানেজারের কাজ করবেন। আশা করি তাঁর বহু বাস্তবের পরিণতি হবে।

ভারতে প্রেক্ষাগৃহ—ভারতে ভারতে কতগুলি ছবির প্রাচীর তার গণনা করা যায়। যে বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় ভারতে সর্বসমেত ১৩৫১টা ছবির প্রাচীর আছে; তার মধ্যে মাত্রাঙ্কে ২৪৫টা, বোম্বাইয়ে ২২৩টা, বাঙ্গালায় ১৯২, বৃহৎপ্রদেশে ১৩৬টা, পাঞ্জাবে ৯৭টা, মধ্যপ্রদেশ ও বেহারে ৭৩টা, গুজ ও বেঙ্গলপ্রদেশে ৪৭টা, বিহারে ৪৭টা, আসামে ৩৬টা, উত্তর পশ্চিম মীরাভ প্রদেশে ১০টা, উড়িষ্যা ১০টা এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহে ২১৯টা।

চিত্রগৃহ হস্তান্তর—হারিসন রোড এবং সেন্ট্রাল এন্থ্রাক্স মন্দিরস্থ প্রভাত সিনেমার পূর্বের মালিক শ্রীযুক্ত বিজয়নন্দ ভাণ্ডা ওয়েল্টার ফিল্ম কর্পোরেশনকে লীজ স্বর বিক্রয় করেছেন। নতুন মালিক ওর নামকরণ করেছেন প্রভাত চিত্র।

তারকার বিবাহ—সম্ভ্রুতি: ভারতের কনিষ্ঠতম তারকা, শ্রীমতী মলিনী জয়বের বিয়ের ফুল এতদিন বাদে ফুটল। পৌত্তাখানান পূর্ণাটী হচ্ছেন নীরঞ্জন দেশাই; ইনিই শ্রীমতী মলিনীকে আবিষ্কার করেন। উপস্থিত শ্রীমতী, লক্ষী প্রোডাকশনের, একটি ছবিতে দেখা দেবেন। ছবির পরিচালনা করবেন প্রযোজক চিন্মলাল জিবেরী।

ঐ ডিওর মধ্যে

আই ফিলিকচাস—আই ফিলিকচাসের 'আর্থা' 'সেন্সর' বোর্ডের স্বেচ্ছামতি পেয়েছে। 'আর্থা'র অভিনয় করেছেন বীরাঙ্গ, পাদা, প্রমোদ, রেখা রায়, করিম এবং কৃষ্ণা।

পরিচালকবৃন্দ তাঁদের নৃতন ছবি 'সাঁওরান' এর কাজ শেষ হবার শুরু করেন বলে জানা গেছে।

ভারক-পরিচালক ছবি বিশ্বাস—ছবি বিশ্বাসের পরিচালনার নিউ সেকুদী প্রোডাকশনের নৃতন ছবি 'বৈদ্যভৈরব'র নৃতন নামকরণ হয়েছে 'প্রতিকার'। এই সামাজিক ছবির নায়কের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস নিজেই নাববেন। গল্পটি প্রেমেন মিজের লেখা এবং শতীল দেববর্ধন এতে সুর যোগ্যে করবেন। অপরাপর ভূমিকায় দেখা যাবে পরেশ ব্যানার্জি, শৈলেন চৌধুরী, ফণী বর্ধন, বন্দনা, রেবা বহু এবং আরো অনেককে।

বোম্বাইয়ে নীরেন লাহিড়ী—'দম্পতী'র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী বোম্বাইয়ের একটি প্রতিষ্ঠানে নৃতন হিম্মি ছবি পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিয়ে রওনা হয়েছেন। ছবিটি সম্ভবতঃ সামাজিক এবং এতে অভিনয় করবেন পাহাড়ী সাত্তাল, বনমালা, মুবারক প্রভৃতি।

বয়ে টকিজের উত্তম—বয়ে টকিজের নৃতন শিক্ষামূলক ছবির পরিচালনার ভার পেড়েছে স্থানীয় মজুমদারের উপর। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'পেশা হিসাবে সেবা শুশ্রূষা' (Profession of nursing) এবং এটি রচনা করেছেন অমিয় চক্রবর্তী। এর নায়িকা হলেন লীলা চিট্টনীশ্বর এবং নায়ক জয়রাম। অনিল বিশ্বাস সুর সংযোজন করবেন এবং তাঁর জী আশালতাকেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

পরিচালক প্রেমেন মিত্র—প্রেমেন মিজের পরিচালনায় 'বিদেশিনী' দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এতে ঐ ডিওর তেতরের অনেক ব্যাপার দেখান হয়েছে। জীবন

বয়সকে চিত্র পরিচালকরূপে, বীরাঙ্গকে ঐ ডিওর আপিসে এবং রঞ্জিত রায়, কাহু বন্ধ্যো (এঃ) মৃণেন, শতীল ও শ্রেষ্ঠবনকে ঐ ডিওর মধ্যে শিল্পী হিসাবে দেখা যাবে। নায়িকা, এক দরিদ্রের স্ত্রীরা এবং শিক্ষিতা কস্তার, ভূমিকায় শ্রীমতী কানন দেবীকে দেখা যায়।

চিত্ররূপা লিঃ—দেবকীবাসুর তত্ত্বাবধানে, অপূর্ণ মিজের পরিচালনায় 'সন্ধি'র কাজ বেশ ভালভাবেই অগ্রগতি হচ্ছে তা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। শৈলেন লাল বাবুর লেখা বইখানি অসীম, দেববালা, বিমান, মৃণাল-কান্তি, পদ্মপতি, শবৎ, ফণি প্রভৃতি উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী বৃন্দের প্রচেষ্টায় ভালই হবে মনে হয়। এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর ছবিখানি পরিবেশনের ভার নিয়েছেন।

ছায়া চিত্রগৃহে 'ভাসের দেশ' ও 'বধুবরণ'—পার্বতী দেবীর প্রযোজনায় ও শ্রীশাস্ত্রিদের ধোমের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক 'ভাসের দেশ' ও বধুবরণ এলিট সিনেবার ছয় রাত্রি বেশ সাক্ষরতার সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে। অনেককেই আগ্রাসর অভ্যন্তরে টিকিট সংগ্রহ করতে না পারায় ক্ষুব্ধ হতে হয়েছিল। জনসাধারণের অহরহাধে কর্তৃপক্ষ ২৯শে জাহায্যী সন্ধ্যায় এবং ৩০শে জাহায্যী দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ছায়া চিত্রগৃহে পুনরাবিনয়ের আয়োজন করে দৃষ্টবাদভাঙন হয়েছেন। নাচে, পানে, অভিনয়ে সব দিক দিয়ে এগুণ প্রযোজনা এদেশে সচরাচর দেখা সম্ভবপর হয় না।

নৃতন প্রতিষ্ঠান—কয়েকটি শিল্পের পুজারী 'মু' মালক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। প্রতিষ্ঠাতা-গণের মধ্যে শ্রীঅবলম্বাণ হাজরা ও শ্রীঅশোক কুমারের নাম করা যেতে পারে। এঁদের সভোরা 'স্বয়-দীপাদী' নামে নৃতন ধরণের নাটক অভিনয় করবেন। নাটকটি লেখা এঁদেরই একজন সভা শ্রীমোহিনী চৌধুরী এবং তার বিষয় বস্তু হচ্ছে বাহুয়ের জীবনের খাত প্রতিখাতে এবং এরা একইকো নাচে, পানে ফুটিয়ে তোলবার ব্যবস্থা করেছেন।

শাহানুশাহ আকবর—চিত্রবাণী লিঃ এর পরিবেশনে শাহানু শাহ আকবর শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করবে।- প্রোথাইয়ে এই চিত্রটি মহামাভ গভর্ণর বাহাহুর উদ্বোধন করেছিলেন। হিন্দু, মুসলমানের একতাই চিত্রটির প্রধান উদ্দেশ্য। 'পড়শী'র মত একেও আমোদ কর থেকে মুক্ত করলে দেশের সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে সাহায্য করা হবে।

হামারী বাত—বয়ে টকিজের হামারী বাত গত ২৯শে জাহায্যী একযোগে 'জ্যোতি' এবং 'চিত্রার' মুক্তিলাভ করেছে। অনেকদিন বাদে দেবিকাকে দেখা গেল। জ্যোতি চিত্রগৃহটিকে মনোমত করে সংস্কার করা হয়েছে।

পোশাপুত্র—একযোগে 'বিনার', 'বিজলী' ও 'ছবিবরে' 'পোশাপুত্র'র চতুর্থ সপ্তাহ চলেছে। শিশির বাবুর নিকট যতটা আশা করা গেছিল, ততটা না হলেও মোটের উপর ছবিটি উপভোগ্য হ'য়েছে। বেগুকা ও প্রভার অভিনয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। অজ্ঞাত ভূমিকায় চলনগই।

প্রেস শো বাতিল—একমাত্র 'মেটো' সিনেমা ছাড়া অজ্ঞ বিদ্যাতী চিত্রগৃহগুলো 'প্রেস শো' বন্ধ করে কেন যে দিয়েছে তার কারণ জানা যায়নি। আশা করি এ' চিত্রগৃহগুলো 'ফ্রিম জার্মালিটি এসোসিয়েশন'কে উপযুক্ত মুক্তি প্রদান করবেন। এসোসিয়েশনও যেন জনসাধারণকে তা জানাবার সুবিধা দেন।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস :- ইষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট বিল্ডিংস

বোম্বে

স্থাপিত :- ১৯১৩

চলতি বীমা ২ কোটি টাকার উপর

মোট সম্পত্তি ৪৩ লক্ষ টাকার উপর

চীফ এজেন্টস্—

মোঃ এও চৌধুরী

১০ নং ক্লাইভ রো

কলিকাতা

ফোন :-

ক্যালকাতা—২০৫৪

কলিকাতার অগ্রন
সম্মুখিত আকর্ষণ।

প্রত্যহ
পরিপূর্ণ
প্রেক্ষাগৃহে
একযোগে
চলছে

মিনার
বিজলী
ছবিঘরে

প্রত্যহ ২১, ২২, ২৩ টাটায়

—পরিবেশক—
ভ্যারাইটি ফিল্মস

৬৮, ধর্মতলা ষ্ট্রিট,

—কলিকাতা—



প্রত্যহে
নিমিত্ত লোনে
জীবন প্রমোদ
বিমানের
স্বপ্নে সার্বভৌম
প্রভা চিত্র
দেখালা
আরও অনেক

ভ্যারাইটি পিকচার্স
পোষ্যপুত্র

বাঙালি গার্হস্থ্যজীবন নিত্যনৈমিত্তিক হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ,
রাগ-অসুখ, হিংসা-মেঘ, প্রেম-পরিণয়, বাস্তব চিত্র
প্রভৃতির যে অভিনয় চলছে তাই বাস্তব চিত্র
“পোষ্যপুত্র” ছবিপানি সংগঠনের প্রধান শৈলী
হাসি ও কান্নার সুনিশ্চয় সুখ কোরে রাখে।
এক অপূর্ণ আবেশে মুগ্ধ কোরে নামকরা
এ ছাড়া বাঙালির বাদ্যযন্ত্র নামকরা
শিল্পীকে এই চিত্রে দেখতে পাবেন।
ছবিপানি আপনি একলা দেখলে
আপনার পরিবারবর্গের ওপর
অবিরাম করা হবে।

সবাই বলছেন : “একপ
সবাই সুন্দর চিত্র বহুদিন
দেখা যায় নি।” সমবায়ের
মতের সঙ্গে আপনায়ও
মত মিলে কিনা তা
আজই পরীক্ষা করুন।

পরিচালক :
সত্যীশ দাশগুপ্ত
সঙ্গীত :
দুর্গা সেন

১৩৫৮]

ভবিষ্যৎ

(৪১৬ পৃষ্ঠার পর)

বয় বলিল—আমাকে বললেন ঘরের চাবি খুলে
গিঁতে। বললেন, আপনার আত্মীয়...দেখা করতে
এসেছেন। তাই...

আত্মীয়!...মন গরুণ ভুলিল, কহিল,—কেউ নয়।...
আদিত্য চাহিল বয়ের পানে, বলিল—আমি না
গকল...এবার থেকে যে-কোনো লোকই আহুক...
আমার নিকট-আত্মীয় বলে পরিচয় দিলেও খবরকার ঘর
খুলে বসতে দেবে না।

বয় বলিল—জী।
তারপর বয়ের নিজস্ব।
আদিত্য কাগজ-পত্র হাতড়াইতে লাগিল, কোনো
বই বা লেখা-খাতা খোঁয়া খেল কিনা...

না। খাতা-বই সব ঠিক আছে...শুধু একখানা
ফটোগ্রাফ পাওয়া যাইতেছে না! আদিত্যর ফটো...
সংনাম! পত্রিকা তার ফটো তুলিয়াছিল—সংনাম-কাগজে
রাখিবার জন্ত...সেই ফটো!

সে-ফটো কাগজ রাস্তেও সে দেখিয়াছে। ঠিক
করিয়াছিল, ডাকিলেই হইতে ফিরিবার সময় ফটোখানির
নীচে বেশ লাগাইবে। ক’টি কথা লিখিয়া জাহ্নবীকে উপহার
দিয়া যাইবে। আশ্চর্য! সে-ফটোগ্রাফে এ-লোকটার
কি কাজ!...

সন্ধ্যার একটু আগে অবসর দেখ-মন লইয়া বারান্দায়
ঠিকেরায়ে পড়িয়াছিল...চোখ বুজিয়া গল্পের পুঁঠ
ঢাতিতেছিল—মুন্সুল ব্যারিষ্টারকে কেন্দ্র করিয়া সেই
গল্প! ছাটটার...হঠাৎ আবেশ ডাকিল মুন্সুলের
কণ্ঠসরে!

মুন্সুল বলিল—এই যে মশায়...আছেন। জাহ্নবী...
চোখ বুজিয়া আদিত্য ধড়বড়িয়া উঠিয়া বলিয়া দেবে,
যাহনে মুন্সুল...আর তার পিছনে বারান্দায় আসিয়া উঠিল
জাহ্নবী এবং সীতা।

জাহ্নবী বলিল—আপনার হয়েছি কি? অসুখ?

[ভবিষ্যৎ

আদিত্য বলিল—না।

জাহ্নবী বলিল—তবে আমাদের ওখানে সন্ধ্যা যে...
সারা দিন?

বয় বলিল, কৌশল করিয়া দাঁও একটু ছোঁবল! কিন্তু
অভিমান বা রোষের বিন্দুশাশিও মুখে বাহির হইল না।
সে বলিল,—কাজ করছিলাম!

জাহ্নবী বলিল—কি কাজ?
আদিত্য বলিল—গল্প লিখবো তারি পুঁঠ ভাবছিলাম।
সীতা আগাইয়া আসিল, তার হুঁচটোবে নিমুদ্র ভাবে...
সীতা বলিল—বলুন আদিত্যবাবু...লেখবার আগেই সে
গল্প শুনবো। আপনার সঙ্গে এত জানাশোনা, তার মন্ত
বড় প্রতিভেলজ...এর পর পাঁচজনকে কাছে অহঙ্কার
করে! একথা বলতে পারবো যে, লেখবার আগে ও-গল্প
আমাদের আপনি শুনিয়াছেন।

আদিত্য মুহূর্ত হাত করিল...কোনো জবাব দিল না।
জাহ্নবী বলিল—পায়ের ব্যথা কম...রিকশ করে
বেড়াতে বেরিয়ে ছিলুম। আমি একা রিকশ, ওরা ছজনে
অবঙ্গ হেঁটে...কেড়াতে বেড়াতে মুন্সুলবাবু বললেন,
আদিত্যবাবুর হোটোলে গিয়ে তাকে শারপ্রাইজ দিলে
কেমন হয়? আমি বললাম—চমৎকার। তাই...

হায়রে, জাহ্নবীর আগমনে আশুন নিবিয়া আদিত্যর
মনে যে বসন্ত-নাশুরী-বিকারের আভাস জাগিতেছিল সে
মাধুরী নিমেষে ফরিয়া গেল! আদিত্য যার নাই, সেজ্ঞ
জাহ্নবী তার চিন্তাও করে নাই...মুন্সুল বলিয়াছে, সার-
প্রাইজ দিবে, তাই আসিয়াছে! মুন্সুলের কথায় আসা!
উভত নিশ্বাস কোনামতে রুদ্ধ করিয়া আদিত্য
চাহিল অজ দিকে। সীতা বলিল—দেখাবেন না আদিত্য-
বাবু আপনার লেখা খাতা...আপনার বাহ্যজিকিণ্ট?

আদিত্য বলিল—কিছু লিখিনি এখানে এসে।
মুন্সুল বলিল—চায়ের ফরমাশ করুন আদিত্য বাবু...
আদিত্য ডাকিল—বয়...

চা পান শেষে হইল। বিলতে মুন্সুল দেখা করিয়াছিল
ছাত্রজীবন ইংরেজ সাহিত্যরচনার সঙ্গে; তাঁদের গল্প

বলিল, নানা আলোচনা হইল। তারপর জাহ্নবী বলিল—
রাত হুলা...আমরা বাই। চলুন মুকুল বাবু...

মুকুল বলিল—হ্যাঁ...

সকলে উঠিল। গীতা বলিল আদিত্যকে—আপনি
আসবেন না বৃষ্টি আমাদের সঙ্গে? আহুন...যে-গল্পের
প্লট ভাবছিলেন, যেতে যেতে আমাকে বলতে হবে...
আমি ছাড়বো না—আই হ্যাভ্ ডেম্ অন ইউ!

অগত্যা বাহির হইতে হইল।

কুঞ্জে আসিল চিত্তাহরণের গৃহে।

চিত্তাহরণ সমুখে...গম্বীর ঘর!

আদিত্যকে দেবীমাজাজ যেন ছ'খানা ঘন মেঘে
সংঘর্ষ...তখন বাজের হুঙ্কার!

চিত্তাহরণ কহিলেন—আদিত্য!

সে বরে আদিত্য আর নাই। কোনোমতে চিত্তাহরণের
পানে চাহিল। চিত্তাহরণ কহিলেন—তুমি এত-বড়
স্বাউনডেল! গেট্ আউট...ইয়েস...মাও...আমার

বাড়ীতে আর কখনো তুমি আসবে না! নেভার! হঃ...
তোমার সঙ্গে আমি দেবো আমার যেমের বিবাহ!
নেভার!

বিনামেঘে বজ্রপাত হইলে মাঘ্য না কি শুভিত হয়...
সাহিত্যে এমন একটা কথা পড়িয়াছি। চিত্তাহরণের বজ্র-
বাক্যে সকলে তেমনি শুভিত। এবং তাদের সেই শুভিত
ভাবকে আরো বহুগুণ বর্ধিত করিয়া চিত্তাহরণ কহিলেন
জাহ্নবীকে উদ্দেশ্য করিয়া—ওর সঙ্গে বিশেষ না...কোনো
সম্পর্ক রাখবে না...একটু আগে ওর যে-পরিচয় পেয়েছি...
রেক্তপার ভিলেন!

জাহ্নবীর মুখ বিবর্ণ...চেতনা যেন অবলুপ্ত। মুকুল-
গীতা নির্বাক নিম্পন্দ!

চিত্তাহরণ চাহিলেন আদিত্যর পানে, বলিলেন—মাও
...সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া ফটকের দিকে নির্দেশ!

যেন বাজেরের যাহ্ন...সে যাহ্নর ঘোরে যন্ত্র-চালিতের
মতো আদিত্য চিত্তাহরণের গৃহ হইতে নিজস্ব হইয়া
গেল।

(ক্রমশঃ)

‘মেঘদূত’ প্রণীত “সমস্লামূলক উপন্যাস।...

ছাঁব

মূল্য ১০০

—“আনন্দবাজার পত্রিকা”

“নৃতন ধরণের উপন্যাস, লেখক শক্তির
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।”

—“শনিবারের চিঠি”

“প্রবাসী”, “বীণালী”, “সপ্তরশ্মি” প্রভৃতি
কর্তৃক বিশেষরূপে উচ্চ প্রশংসিত।

“মেঘদূত” প্রণীত “আগামী” (পল্লবিতান)
শীঘ্রই বাহির হইবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ সর্বত্র অথবা

ডি, এম, লাইব্রেরী, শ্রীশঙ্কর লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

Distributor :

Sudhir Bose, 16, Beadon Street, Calcutta.

কণ্টিনেন্টাল

ব্যাঙ্ক অব এশিয়া লিঃ

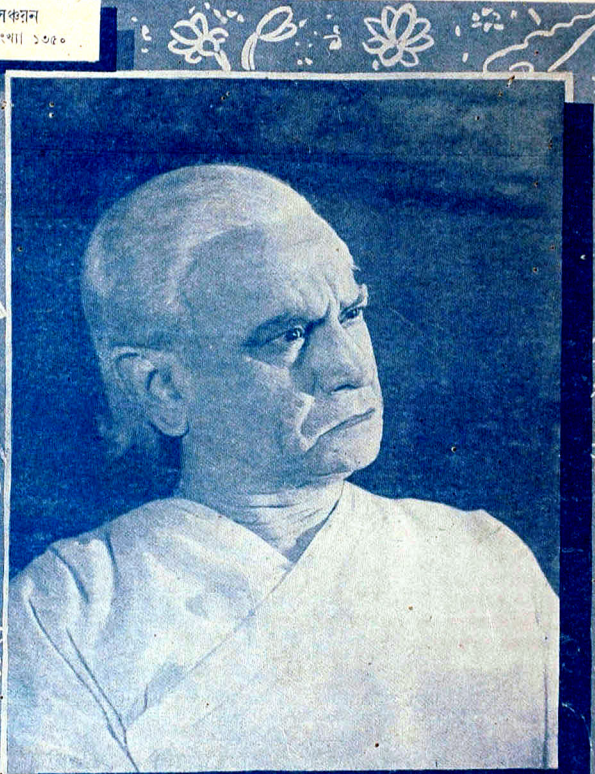
হেড অফিস—১২ নং ব্রাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কালি ৫৮৯০

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
অথবা সমূহ

১। সাউথ কলিকাতা	৭। মাদারীপুর
২. রাঙ্গাবাহারী এজেন্সি	৮। চরমুগিয়া
২। ঢাকা	৯। শ্রীমঙ্গল (সিলেট)
৩। নারায়ণগঞ্জ	১০। শিলং (আসাম)
৪। মিরকাদিম	১১। ভোলা (বরিশাল)
৫। লোহজঙ্গ	১২। কুমিল্লা (ময়ূর)
৬। গোপালদি	

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত
“গোষ্ঠ্যপত্রে”
শিশির কুমার



শনিবার ২৯শে জানুয়ারী হইতে প্রথমারম্ভ !

সর্বজন মনোরঞ্জনার্থে বঙ্গ টকীজের নবতম নিবেদন

দৈনিকান্বী ও জয়রাজ

অভিনীত প্রণয় ও স্বরচল প্রাগতিশীল চিত্র

হামায়ী যাত

কাহিনী ও প্রযোজনা

অমিয় চক্র বর্ত্তী

পরিচালক — ধরমশ্যী

স্বরকার — অনিল বিশ্বাস

— রিশিট চরিত্রে —

শাহ নওয়াজ, ডেভিড, প্রভা, মমতাজআলি ও সুরাইয়া

চিত্র পরিবেশকঃ মনিসাভা জ্যোতি

প্রেক্ষাগৃহ — ২-৫০, ৪-০০ ও ৮-১৫

প্রতিষ্ঠা — ২-৫০, ৪-০০ ও ৮-১৫



বান্দলায় নৃতন লাটসাহেব—মি: রিচার্ড ক্যাসির নিয়োগ ভারতবর্ষের কাছে স্বগ্রহণ হয় নি। যে “খেতাদগ-অষ্টেলিয়া”য় ভারতবাসীরা স্বায়িভাবে বসবাস করলে যে দেশ কল্পিত হয়, সেই দেশেরই একজন ভারতের একটি বিশেষ অংশে কল্পিত করবেন—এ বেনে অপনান থাকে চাপানো। যাক, মি: ক্যাসির উপর কারও ব্যক্তিগত বীতশ্রদ্ধা থাকতে পারে না। অষ্টেলিয়ান গভর্নমেন্ট ভারতকে জীতির চক্ষে দেখুক, না দেখুক তাতে বায় আসে না। তেমন সময় এলে সমস্ত জোনিয়নকেই ভারতকে সন্মান করতে শিখতে হবে। আগাত: মি: ক্যাসি যেন ব্যক্তিগত ভাবে ভারত ও তাঁর কর্মস্থান বাংলাদেশের উপর জীতি বর্ষণ করেন, কারণ এর বর্তমান চর্ছনা মোচনের জড় বিতর্ক হিশাবেই উাকে এখানে আনা হ’য়েছে। তিনি যেন এখানে “নিরবচ্ছিন্ন শান্তি”র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তবেই ভারতের সঙ্গে অষ্টেলিয়ার সম্প্রীতি বৃদ্ধি হবে।

ভারতরক্ষার বিধানের সংশোধন—এই নৃতন অভিজ্ঞাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হ’য়েছে, যে প্রোট্রিটেনে আটকবন্দীরা যে সমস্ত সুবিধা পায়, এখানকার বন্দীদেরও তাই প্রেরণা হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবার আশা নেই, কারণ পাল্লামেন্টের কাছে বায়বিকবন্ধ বদ্ধ কোন স্বরাষ্ট্রগণের এর প্রয়োগ করবেন না, যারা করবেন তাঁরা জনমতের দ্বারা চালিত নন।

হুগের কথা ছয়মাসের বন্দী আটক করতে পারা যাবে না, কিন্তু ছয়মাস পরে নৃতন আদেশ দিতে বাধ্য কই। বন্দীদের কেন আটক করা হয়েছে তা জানানোর যে বিধান র’য়েছে সে যুক্তি ধারা জনমনে তাঁরই আটক রাখবার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করবেন। সতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে বিনাবিচারে বন্দী থাকার চর্ছাপা তাদের সম্মানভাবেই রইল।

নিরাশ্রয় নারীরক্ষার প্রয়োজনীয়তা—অনেকের

জালায় বহু নারীর স্বাভাবিক গার্হস্থ্য এবং সমাজ-জীবন আজ বিপর্যস্ত হ’য়ে পড়েছে। বহু নারীও তাই অনাথ ও নিরাশ্রয় হ’য়ে পড়েছে। তাদের নেই গৃহল, নেই অভিভাবক। এদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার কাজ বড় সোজা নয় কারণ এদের সংখার গিয়েছে ভেঙ্গে, এদের স্বামী গৃহ হস্তুতা মরে গেছে, নরহত্যা হারিয়ে গেছে। অসহায় ভরুগীদের নিয়ে চলেছে ভীষণ গোপন ব্যবস্থা। হুগের বিষয় গভর্নমেন্ট সরকারী কর্মচারী ও পুলিশকে এ বিষয়ে—অবহিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের তৎপরতা সম্বন্ধে আমাদের উৎসাহ হয় না। “মহিলা আশ্রয়শালা সমিতি” ও শ্রীমুক্তা বিজয়লক্ষী পণ্ডিত অবস্থার গুরুত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। আমাদের দাবী গভর্নমেন্টের দ্বা-বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল, বেরীতে তা করার চেষ্টা নেই তাঁরা পৃচ্ছতার সঙ্গেই করেন।

ক্যাথলিক মেডিকেল স্কুল ও আর্ট স্কুল—যে সময় জাতির বহুদূর স্বদেশে জনবিশেষের উদ্যোগীতা মহাকাঙ্ক্ষিত সাধন করতে পারে সে সময়ের ক্যাথলিক ধর্মঘট বড় কল্যাণকর নয়। স্বদেশের বিষয় ধর্মঘটের অবসান ঘটেছে। ক্যাথলিক ধর্মঘট নূতন নয়—এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ছাত্রগণ অজ্ঞান আত্মার বা মজা করার জন্য ধর্মঘট করেন না। তাদের ভায়সরয় দাবী অপরূপ থাকলে তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য। মীমাংসা করা হয়েছে, (১) ধর্মঘট সম্পর্কে কাকেও শাস্তি দেওয়া হবে না। (২) যে ৭ জন ছাত্র-ছাত্রীরা ওপর বিহীনতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হবে এবং (৩) ছাত্রদের অভিযোগ সহ্যস্বীকার করে বিবেচিত হবে। গভর্নমেন্ট জারিয়ে দিয়েছেন ভবিষ্যতে অস্বাভাবিক ব্যাপারে দণ্ডবিধান করলে যেন তাকে প্রতিশোধ বলে না মনে হয় কারণ “অভিভাবক বা পিতা যদি কোন বালককে মাজা দেন তাকে অভিশোধ বলা যায় না।” ছাত্রদের শাস্তি দেবার অধিকার অবশ্যই মুক্তদের আছে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই ধর্মঘট কেন ঘটে? শিক্ষকেরা যদি ষেহ দিয়ে ছাত্রদের শাস্তি অর্জন করেন তাদের স্কুল জীবনের বিচার করেন তবেই তা প্রশংসার হতে পারে। কলিকাতা আর্ট স্কুলের গোলযোগ অস্বাভাবিক এবং অসীমায়িত হলেও অবস্থান কমিটি তখনও তার রিপোর্টই দাখিল করেনি। আর্ট স্কুলের ব্যাপারটা যাতে শীঘ্র মেটে কর্তৃপক্ষ সে চেষ্টা করেন কি?

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ এগ্রিকালচারাল-ইকনমিক্স—এই প্রতিষ্ঠানটির ৪র্থ অধিবেশনে ভারতের কৃষিশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনাকালে স্তার মলিলাল নানানুভিত্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। নিদারুণ বাতাসমত্তা প্রতিকারের প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষিশিল্পের পুনর্নির্মাণ ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। বহু বৎসরের দ্বাশ্রম অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে হবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতে দারিদ্র্যের কোন প্রতিকার হয়নি। কারণ শুধু কৃষিশিল্পের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আসল

সমস্যা হচ্ছে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার অধিকাংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। যেনে প্রশিক্ষণের প্রসার হওয়া একান্ত আবশ্যিক, কারণ এদেশে কৃষির সম্ভাব্যতার প্রয়োগ খুব নৈহা। অর্থ বন শিল্পের উন্নতির ফলে জীবিকার অনেক নতুন সুযোগ খুলবে। মুক্তান্তর কালেও এই প্রশ্ন উঠবে। ভারতকে কৃষি-প্রধান দেশ করে রাখবার নীতিই যে দারিদ্র্যের ও আত্মবিশ্বাসের কারণ একথা স্বরূপ। প্রশিক্ষণের প্রসারকেই ভবিষ্যৎ আর্থিক পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যদিও বর্তমান অবস্থায় কৃষির উন্নতির জন্য এই প্রাধান্য দরকার।

আন্তর্জাতিক লেবার অফিসের সম্মেলনক ব্যবহার—আন্তর্জাতিক লেবার অফিস দুইভিক্সমসঙ্গে চাপা দিতে চেয়েছিল এমন সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু নিঃ একলকার ও হোল্ডসওয়ার্থের দৃঢ়তায় তা সম্ভব হয়নি। ডিরেক্টর মহাশয় দুইভিক্সের মূলকারণ সম্বন্ধে রিপোর্টের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কোন সম্ভাব্য না করাই এবং মৌখিক সহায়তই প্রকাশ করেই কাজ সমাধা করতে চান। মার্কিন ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরা দুইনতালে ভাল দিচ্ছিলেন। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত ঘৃণীত হলেও অবিকাংশ সভাই ভোট দেননি। তাঁদের এই উদ্যোগীতার কারণ কি এবং আন্তর্জাতিক লেবার অফিস ন্যায়েরই বা সার্থকতা কোথায়?

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—দিল্লীতে এ বৎসর বিজ্ঞান-কংগ্রেস বসেছিল। নানানিক দিয়ে এ অধিবেশন স্বরূপের হয়েছিল। অধিবেশনের আগে কংগ্রেসকে রয়াল সোসাইটির একটি সভায় পরিণত করা হয়। ইংলণ্ডের বাইরে সোসাইটির অধিবেশন ২৮১ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম। রয়াল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এ. ভি. হিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মিঃ চার্লিস, ফিল্ড মার্শাল বাটস, স্তার হেনরী ডেল, ও স্তার রিচার্ড কোপলী বাগ প্রেরণ করেন। ডাঃ হোমী ভায়া ও স্তার শান্তিব্রজ ভট্টনগর সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

এই ঘটনায় রুটিশ এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সমতা ঘনীভূত হবে সন্দেহ নেই। বড়লাট কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন ও বহু বিশিষ্ট ইংরাজ ও ভারতীয় সভা অলঙ্কৃত করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বড়লাট বলেন যে, ভারতের বিপুল কৃষি ও শিল্পের বিকাশে, যাঁদের উন্নতি ও সামাজিক সমৃদ্ধিতে বিজ্ঞানকে সাহায্য করতে হবে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি মিঃ জে গার্ডি বলেন, ভারতের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সম্ভাব্যতার প্রথম স্বীকৃতি নেই, যেমন আছে স্বাধীন দেশের। সত্যএব দেখা যাচ্ছে, রয়াল সোসাইটির সহযোগিতাই কেবল বৈজ্ঞানিকদের কাম্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও চাই। কিছুদিন পূর্বে জওহরলাল নেহেরু বৈজ্ঞানিকদের মনোবৃত্তি করে Nation Planning এর বলিষ্ঠ চিহ্ন প্রদর্শনেন, কিন্তু তাঁর সে চিহ্নের ফলাফল তাঁর সঙ্গে সেরেই কারাক্ষ হইবে।

প্রচার কার্য—ভারতীয় এসেমব্লীর সভ্যবৃন্দে যে চার জন পশ্চিমে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁরা কিভাবে প্রচার করছেন তার নমুনা সম্ভ্রান্ত আরো কিছু পাওয়া গেছে। কচা ছিল তাঁরা রাজনৈতিক আলোচনা পছন্দের কারণ। কিন্তু পণ্ডিত জয়দেবগোবিন্দ মিশ্র রাধিকপাদীর বনেন যে তিনি রাজনীতি বুঝ করেন, কারণ তাঁর ব্যবসায় ও সংবাদপত্রের কাজে তিনি রাজনীতি পর্যালোচনা করার সময় পান না। তাঁর মতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করা সমীচীন নয়, কারণ তাতে বিপদ ঘটতে পারে। ডোমিনিয়ন স্টেটস দিতে অবশ্যই মাফের শ্রীকৃত হয়েছেন, তাই অনেক। শুভিত হতে হয় এ ব্যক্তির বৈদগ্ধ্য দেখে।

শোক-সংবাদ—মোলানা আবুল কালাম আজাদের জমী আক্রে বেগম দীর্ঘকাল পীড়ার পর মারা গেছেন। তিনি ছুপালের নারী সমাজের একজন বিশিষ্টা কণ্ঠী ছিলেন এবং তৎকালীন লেডিস ক্লাব, রেডক্রস প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা রাষ্ট্রপতিক ও আক্রে বেগমের শোক সম্বন্ধে পরিবারবর্গকে সম্বোধনা জানাচ্ছি।

শ্রীমুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী **শ্রীমুক্ত রমণিজী** সীতারাম পণ্ডিত অনবরমে ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করেছেন। লক্ষ্মী থেকে তাঁর যতদূর এলাহাবাদে এনে বহু দোকানের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর সংস্কার করা হয়। শ্রীমুক্ত পণ্ডিত ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে বিশ্বমন্ডলীকে বিবাহ করেন, ১৯২৬ সালে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন, ১৯২৮ সালে বাটলার কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী পদে সম্মান করেন, ১৯৩০ সালে রাজকোষের জজ কারাক্ষ হন। ১৯৪২ সালের আগস্টে তিনি আবার জজ হন ও স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে মুক্তি পান। আমরা নেহরু পরিবারকে গভীর সম্বোধনা জানাচ্ছি।

শোক-সংবাদ—বর্গীয় জ্ঞানকীনাথ বহুর পত্নী শ্রীমুক্তা প্রভাবতী বহু পরলোক গমন করেছেন। এই বিধবাসী মহিলা সকলের জ্ঞানীস্বামী ছিলেন। তিনি ছিলেন রত্নপ্রসাব। স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের যে সকল সম্মান প্ররোভাণে স্থান পেয়েছেন, তাদের মধ্যে অগ্রণী শ্রীমুক্ত স্বভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের ইনিই মাতা। তাঁর অজ্ঞাত পাঁচ পুত্রও জীবনে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছেন। কিন্তু এত স্বদেশের মৃত্যুও রাজনৈতিক কারণের জ্ঞানীর শেষ জীবন তির্যক্ততা ভরা ছিল। স্বভাষচন্দ্রের বিষয়কর কাব্যাবলী ও শরৎচন্দ্রের স্বামীজীবন নীকে আত্মমসখা শাস্তি দিতে পারে নি। ভগবানের তিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই পুণ্যমোক্ষ রমণীর আত্মার শান্তিবিধান করেন।

ব্রহ্মদেশে মিজাপুরের সাফল্যের সুখপাত—কিছুদিন থেকে মায়, পাখাড় অঞ্চলে বহু যুদ্ধ চলার পর মিজাপুর একই চাপ দিয়েছেন এবং প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেছে। প্রবল প্রতিরোধ সম্বন্ধে তাঁরা মন অবিকার করেছেন। মধ্য রণাঙ্গনেও তাঁরা এগিয়েছেন। মায়, উপরীপে জাপ বিমান বহরের উপর মিজাপুর এক তাঁরা আক্রমণ চালিয়ে ১৫টি বিমানকে ধ্বংস করেন। মায়, পাখাড়ের ছইদিক থেকেই মিজাপুর অগ্রসর হচ্ছেন। সুবিধে এলাকারও সংগ্রাম হচ্ছে। তছাড় প্রত্যাহা বহু বিমান ব্রহ্মদেশে গিয়ে জাপানী বাহিনীতে বোম্বার্ডণ করছে। লর্ড মাইন্ট ব্যাটেন কি তাঁর অভিযান সফল করলেন নাকি?

বিদেশী খবর

সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা লাভ।—

বিশ্বত ১লা জাহুয়ারী থেকে সিরিয়া—লেবাননের বাহুকা ততের ওপর যে রবি উদ্ভিত হয়েছে তা তার স্বাধীনতার প্রতীক। বলা বাহুল্য এ প্রসংগে আমাদের মরমে অপসিগীয় আনন্দের সাড়া এনে দেয়, কারণ হুজাপ্রাণ্যবশতঃ আমরা আজও পরাধীন। আমাদের দেশে যে হুজা ওঠে সে হুজায় দীপ্তি কখন নয়। ২২শে ডিসেম্বর ফরাসী জেনারেল ত্রফে এই স্বাধীনতা অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু ফরাসী করেন নি। এই ছুটে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে প্রকৃত আত্মত্যাগ ও আরব রাষ্ট্রসমূহের একতার বলে। সে ছুটির দাবীকে “স্বাধীন হুজা” মনন করতে সক্ষম হয়নি। রক্তপাতের মধ্যেই তাদের স্বদেশ মুক্তি পেয়েছে। এ বিষয়ে অবজ্ঞা ইহু-মার্কিন আগ্রহ কাজ করেছে, কারণ মহাপ্রাচ্যে তারা কোন পোলাণ্ডো চান না। বুটিন তার সামরিক নিরপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ছাড়াও ব্যাপারটির গুরুত্ব দৃষ্টিগত করে ফরাসীদের উপর চাপ দিয়েছেন এ প্রকারে কথা। সিরিয়া-লেবাননের স্বাধীনতা অক্ষয় হোক আমরা এইটুকুই চাই।

জার্মানি ও জাপানে আতঙ্ক—নববর্ষে একসের কব্ধিগণের যে বক্তৃতা করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে তারা বেশী ভিত্তিযিত হয়ে পড়েছেন। হিটলার বলেছেন—শৌর্য্যে ও ধৈর্য্যে সকলকে সৈন্যদের সমকক্ষ হতে হবে। পূর্বে রূপায়ণের জন্ত যে সব ভোক্তাজোড় হয়েছিল, তা ইউরোপের অজ্ঞান স্থান রক্ষার জন্ত নিয়োগ করতে হয়েছে, এজন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে দুর্বল হয়ে। ডাঃ গোয়েবলস আশঙ্কা করেন যে ইউরোপের অংশ হিনিগ্ন নেবার জন্ত মিত্রপক্ষ চেষ্টা করবে। ইতালীর বিধায়তাকতার জন্ত জার্মানি তার সমর-সামর্য্য সঙ্গী করতে বাধ্য হয়েছে। অপরের ওপর ভরসা করে লাভ নেই। বিমান আক্রমণ জার্মানিকে একাবদ্ধ করেছে, বসন্তকালে ইহু-মার্কিন শক্তি পশ্চিম

থেকে আক্রমণের চেষ্টা করবে—ভবিষ্যতের জন্ত জার্মানি লড়াই চালাবে।

জেনারেল তোছো বলেন—জাপানীরা একে চুড়ায় অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। বর্তমান যুদ্ধের ওপরই ইহুজর পূর্ব-এশিয়ার জয়-প্রত্যক্ষ এবং উত্থান-পতন নির্ভর করছে।

বেথা যাচ্ছে একটা জীঘন যুদ্ধ আসার। মার্কিন প্রচার বিভাগ বলেন, প্রতিপক্ষের অস্ত্রসম্পদ ও মনোবলের আর যতটোই এমন কোন লক্ষণ নেই। তবে জার্মানি তার অধিকারের ১/৫ হারিয়েছে আর জাপান হারিয়েছে ১/২০ অংশ। তাদের মধ্যে আর্হাণ্ড আছে, লোকবল আছে, এবং জয়সম্ভারও আছে।

রুশিয়ার অগ্রগতি—বর্তমান শীতকালীন অভিযান জার্মানবাহিনীকে এক বিপর্যায় এনে দিয়েছে। হোয়াইট রাশিয়া থেকে রুক্ষসাগর পর্যন্ত জার্মানি বাহিনী সফটপার, পলায়নপর। নীপার ভীরে ৫ লক্ষ সৈন্য বাঁধা পড়তে পারে। প্রিপেট জলাভূমির দক্ষিণদিক থেকে রাশিয়া পোলাণ্ডোর ১০০৯ সালের সীমানা অতিক্রম করেছে। দক্ষিণদিকে ভাহুতিন নীট্রের দিকে অগ্রগতি হচ্ছেন অপূর্ণ পরকৌশল দেখিয়ে। তিনি হরতো বালিন-ওলো রেগলাইন বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন। কমান্ডার একত চাকলা দেখা যাচ্ছে। অসামরিক অধিবাসী বোয়ারিয়া ত্যাগ করছে। রাশিয়া পোলাণ্ডোর ভিতর সাকল্যাত্ত করায় পোলাণ্ডোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি নুতন করে উঠেছে। পোলাণ্ডোর স্বাধীনতা রক্ষার জন্তই এ যুদ্ধে হুজপাত হয়। রাশিয়া যে সবদেশ জার্মানকবলমুক্ত করবে তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে এ প্রশ্ন ততহোলে স্থির করা হয়েছে, যদিও তার বিবরণ আমরা জ্ঞাত নই। তবে রাশিয়া বোধহয় ইংলেণ্ডে স্থানান্তরিত গণতন্ত্রের দাবী ঘোষণাস্বত্ব স্বীকার করে নিতে চায় না। সে অধিকৃত দেশসমূহে নুতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবার পক্ষপাতী। ইতিমধ্যেই আভদার সঙ্গে আমেরিকান সলাদপত্রের কুটনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রাজ্ব বলেছে মিঃ উইকি যেন সোভিয়েটের ব্যাপারে হাত না

দিতে আসেন। পোলাণ্ডোর মধ্যে রাশিয়ান যতই প্রবেশ করছে এই সমস্যা ততই ঘনীভূত হচ্ছে। ইংলেণ্ডের পোলিশ গণতন্ত্রের এ পর্যন্ত সোভিয়েট বিরোধী কার্য-কলাপের দ্বারা মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করে এসেছেন। তারা সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পোলদের নিষেধ করে ১৯৪২ সালে পোলদের বিরুদ্ধে নিয়ে যান। মার্শাল ট্যানিন সোভিয় পোলিশ জনসাধারণের মতকেই বেশী প্রাধান্য দিতে চান, লগ্নানহিত গণতন্ত্রকে ভয় নান।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের যোগ্যতা—কংগ্রেসে ঋণ ও ইজারা সম্পর্কিত রিপোর্ট দাখিল করবার সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যোগ্য করেছেন ১৯৪৪ সালেই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে। মিত্র পক্ষের ক্ষমতা ও সমরোপকরণ প্রেরণের সুবিধা সম্যকভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। যাতে সম্ভবিত সৈন্য বাহিনী সব দেশের উৎপাদনের পূর্ণ সম্ভাব্যবাহার করতে পারে সে চেষ্টা করা হচ্ছে। ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অসুচারে ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে যে সমস্ত সরবরাহ পাঠান হচ্ছে জাপান তার প্রতিক্রিয়া ঝুইয়ে নুতনত পারবে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় প্রতিদানে কোনরূপ ঘৃণা না দিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রদের কাছ থেকে ভাল রকম সরবরাহ পাবে। ঋণ ও ইজারার পারস্পরিক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষকে ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ডলার সাহায্য দান করা হয়েছে।

হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার

(উত্তর পাড়া)

(প্রেরিত সংবাদ)

গত ১লা জাহুয়ারী (১৯৪৪) উক্ত পাঠাগারের হুজায় বার্ষিক “প্রতীতি দিবস” উৎসব লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা কশাশিলী শ্রীমুক্ত সৌরভ মোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌর-হিত্য সম্পন্ন হইয়াছে। “সঞ্চয়ন” পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমুক্ত বিল চন্দ্র দত্ত অগ্রণু কতিপয় সাহিত্যিক ও

শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এই উৎসব অহুতানে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠাগারের সভাপ্রদেয় ভরত্ব হইতে সভাপতি মহাশয়কে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। সভাপতি মহাশয় পাঠাগার পরিচালনা সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিয়া একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। ইহার পর সঞ্চয়ন পত্রিকার দ্বয়োপা সম্পাদক শ্রীমুক্ত বিল চন্দ্র দত্ত মহাশয় “পাঠাগারে শিশু সাহিত্যের স্থান” বিষয়ে একটা সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অজ্ঞাত সমিতিরূপক কামোপযোগী বক্তৃতা করেন। সভায় সঙ্গীত, হাত্ত কোহুক ও আগুতির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

সভাশেষে পাঠাগারের সভাপণ কর্তৃক শ্রীমুক্ত শরীত্ব নাথ সেনগুপ্তের “গিরাজকোনা” নাটক অভিনীত হয়। রায়চুল্লভ—শ্রীরামকৃষ্ণ পাল, জগৎশেষ—শ্রীলক্ষণ চন্দ্র পাল, বীরজাহর—শ্রীহুজিত চট্টোপাধ্যায়, মীরণ—শ্রীতারক নাথ পাল, মোহনলাল—শ্রীব্রদাস দাস, স্বাধীর চাঁদ—শ্রীসরোজ কুমার দে, মীরমদন—শ্রীরামকৃষ্ণ রায়, আলোনা—শ্রীরমেশ নাথ চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া “বিরাজের” ভূমিকায় শ্রীহুজিত চট্টোপাধ্যায়, “গোলাও হোমেনের” ভূমিকায়—শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, ও “ওমাইসের” ভূমিকায়—শ্রীপ্রাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় অতি উজ্জ্বলের অভিনয় কলা প্রদর্শন করেন।

১৯৪৪ সালের পাঠাগারের কার্য নির্বাহক সমিতির সভাপণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল।

সভাপতি—শ্রীমুক্ত রামকৃষ্ণ পাল, সম্পাদক—শ্রীমুক্ত প্রাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীমুক্ত লক্ষণ চন্দ্র পাল, গ্রন্থাগারিক—শ্রীমুক্ত তারক নাথ পাল, সহঃ—শ্রীমুক্ত রমেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমুক্ত ভরদাস চক্রবর্তী।

যুদ্ধের বাজারে সোণা ও সোণার গণনা

যুদ্ধের বাজারে অজ্ঞাত বিলাস সামগ্রী অপেক্ষা স্বর্ণ-লঙ্কার ক্রয়ের প্রতি জনসাধারণের অধর দৃষ্টি প্রসংগনীর সদহে নাই। স্বর্ণালঙ্কারের কম ব্যয় ভবিষ্যতের সঞ্চয় এবং

এই জজই লোক স্বর্ণ ক্রয়ের উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু হার্ডিনের জ্ঞান স্বর্ণক্রয় করিতে হইলেই সকল স্থান হইতে অলঙ্কার ক্রয় করা সমীচীন নহে, সাধারণতঃ স্বর্ণ-লঙ্কার ভাল হয় গিনি সোণায়। আসল স্বর্ণখুন্টা 'গিনির' দামও যুব-বৈশী এবং ছুপায়া। সোণার অভিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে বহু অলঙ্কার ব্যবসায়ী যেরূপ তৈয়ারী "মেগগিনি"কেও আসল গিনি বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহা এক পক্ষে যেমন প্রভাবিত করিবে পক্ষে অসম্ভব। একজ বিখ্যাত স্থান হইতে অলঙ্কার ক্রয় করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার প্রকৃত ভাল জিনিষ ক্রয় করিতে চান এবং নির্দোষ কলা-কৌশল স্বকৃৎকাজ ও অপূর্ণরূপ পরিকল্পনা গড়ন করেন তাঁদের পক্ষে বাব্বারার বিখ্যাত জুয়েলার্স মেসার্স এম, বি, সলকর এণ্ড সন্সের দোকানেই যাওয়া সর্বদিক দিয়া ভাল।

সম্পাদকের দপ্তরে বাণী অর্চনায় উৎসবের কয়েকটি খবর :-

হাজরা স্পোর্টিং ক্লাবের—উত্তোপে ৫নং হাজরা রোডস্থ প্রান্তরে বাগদেবীর ১০ম বার্ষিক পূজাও উৎসব বেশ ভাল ভাবে সম্পন্ন হ'য়েছে। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ বহু এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতিত্ব কর'রেছিলেন। সম্পাদক, শ্রীমদল প্রসাদ বহু এবং তাঁর সহকর্মী বৃন্দ শ্রীচরণ গাঙ্গুলী, কিশোর বহু, এবং ছোটদের মধ্যে মণি, পুঙ্ক, রবি, নারায়, দেবেন, স্বর্গ্য, গুই, অনীতা, মল্লিকা, নীলিমা ও অনিমা বহু নিয়ন্ত্রিতগণের অধ্যক্ষতা কর'রেছিলেন।

শ্রীমদল সঞ্চয়ের—৪নং শমুখাপ পণ্ডিত ষ্ট্রীট বিজ্ঞান-গার ভবনে সার্বভারত সন্মেলন উৎসব ছাত্রীস্বদের দ্বারা সম্পন্ন হ'য়েছে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান কর'রে উৎসবটি মুগ্ধ করে তুল'রেছিলেন।

৩৮, মদনরোডস্থ—**ভবানীপুর স্পোর্টিং ক্লাবের** শ্রীপক্ষী উৎসব বেশ আকর্ষণমক্কেই সমাপ্ত হ'য়েছে।

বীণাপাণি স্মৃতি সঞ্চয়ের—সভাস্বদের দ্বারা বীণাপাণির পূজা ১৩ বি, রসারোড, কালিঘাটে অমৃষ্টিত হ'য়েছিল। এদের আখ্যান পত্র স্বদের একটি কবিতায় দেখা।

২৬নং চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটস্থ **কাকলী সঞ্জে** বাণী অর্চনা স্রষ্ট্র ভাবে সম্পন্ন হ'য়েছে। স্বয়ীস্বদের উপস্থিতিতে উৎসবটি পূর্ণাঙ্গ লাভ কর'রেছিল।

"মানমমেলার" শাখা বসন্ত বহুরোডের **উমেশ মণিমেলার** বাণীর আরাধনা করেছিলেন। ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা পরিচালিত দেবীর পূজা প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছিল; এর জন্ত শ্রীমান অনিল সেন ও সমীর দত্ত প্রশংসার যোগ্য।

অমৃত্য বসুস্বদের মত এবংসংসর ও **সন্ধানী লাইব্রেরী** ১নং পল্লান যথেষ্ট সেনে বীণাপাণির পূজা যথাযথিত ভাল করা হ'য়েছে। পরে সন্ধ্যায় পানের জললা বৈশ উপভোগ্য হ'য়েছিল। শ্রীরাধেন্দ্র নাথ ধর এবং শ্রীপীঠীক সিংহ নিমন্ত্রিতদের অধ্যাক্ষতা করেছিলেন।

অভিনয় সঞ্চয়ের—সভাপাণ কর্তৃক ২৫-এ-বি, বাবুরাম শীল সেনে বাবুবাণিনীর অর্চনা স্বচাক্ষরূপে সম্পন্ন হ'য়েছে।

আর্য সঙ্গীত বিভাগীঠের—সভাপাণ ১৯২৯ ল্যানমডউন এক্সটেনশন "বীণাপাণি হল" বসন্ত পক্ষী উৎসব পালন করেছেন। এদের সম্পাদক ইউ, সি, মুখার্জি মহাশয় উৎসবটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে ক্রটি রাখেননি। সন্ধ্যায় পানের আসরে অনেকগুলি ব্যক্তির সমাবেশ হ'য়েছিল।

৩৫নং পণ্ডিতগারের **পণ্ডিতগার ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন** বাণী বন্দনার আয়োজন খুব খট করেই করেছিলেন। পূজার দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বালকগণের বিচিত্র অমৃষ্টিতা বেশ উপভোগ্য হ'য়েছিল। পরের দিন সন্ধ্যায় শ্রীহর্ষা যথেষ্ট তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের পানে ও ব্যক্তিগত বাজনার আসর সর্বাঙ্গ স্বন্দর হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীমুক্ত বাবু অমূল্য কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়। শ্রীশৈলেন দত্ত, কুমারী আরাধনা ব্যানার্জি, শ্রীমতি সাবিত্রী ঘোষ, বীণা বোস প্রভৃতির গান এবং

গুণ্ডার ফিরোজ গীর ভবলা লহরা, স্বনীল রায়ের বাণী, কুমারী, অনীতা হালদারের প্রাণকণ্ড ও প্রোঃ লক্ষণ ভট্টাচার্যের সোভার বাজনা প্রশংসনীয় হয়েছিল। এই সর্বাঙ্গ স্বন্দর অমৃষ্টিতায় সফলতার জয় এদের যুগ্মসম্পাদক শ্রীচরণ মজুমদার, এন, কে, জি (পত্রিকা), মহাসম্পাদক-গণ, শ্রীঅম্বিত সেন, চুর্ণাবাস ঘোষ, সুবোধ মিত্র এবং সভাপতির মধ্যে শ্রীপ্রভাস মিত্র, পরিতোষ বহু, তরেন বৈ, মণি মল্লিক, স্বশান্ত মিত্র, স্বনীল রায়, মুকুল ওহ, রবিন গিহ ও মাস্টার অশোক মুখার্জির নাম করা যেতে পারে।

জুনিয়ার স্পোর্টিং ক্লাবের সভাস্বদ কর্তৃক ২২ এ, মাঘ চটাচিঙ্গ সেনে বাগবাণিনীর ১০ম বার্ষিক পূজা সম্পন্ন হ'য়েছে। এদের ভালপত্তে পুণি আকারে লিখিত নিমন্ত্রণ পরতী পুরাকালের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং কল্পস্বদের উন্নত ঠক্টর পরিচায়ক।

কালিঘাট, ১১৪/৪/১ হাজরা রোডস্থ **স্বধী সন্মিলনীর** ভারতীর পূজা ও উৎসব স্বচাক্ষরূপে সম্পাদিত হ'য়েছে। এদের প্রতিমার মূর্তি স্বকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, থেংলেই মনে হয় মায়ের অধিষ্ঠান হ'য়েছে। এদেরই একজন সভা ভাষার শ্রীপ্রমোদ চ্যাটার্জি নিজে মূর্তি গড়েছিলেন। সন্ধ্যায় পানের জললাও উপভোগ্য। স্বদ্বাদের মধ্যে মধেন চৌধুরী, রবিন ভট্টাচার্য, গোবিন্দ মুখার্জি ও কুমারী অবলা ভট্টাচার্যের নাম করা যেতে পারে।

রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতির উত্তোপে পূর্বের দ্বারা এ বৎসরও ৮১ নং রামকৃষ্ণপুর সেনে বাগদেবীর অর্চনা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণপুর এথলেটিক ক্লাবের (হাওড়া) সভার পূর্বের মত এবারও সর্বস্বতার আরাধনা করে ছিলেন। শ্রীগৌরীশঙ্কর দত্ত এম, এ, বি, এল ক্লাবের সফল সাংগঠকদের অধ্যাক্ষতা করেন।

সকল উৎসব-নিমন্ত্রণে যোগদান করা এবং সকল অমৃষ্টিনের নাম দেওয়া সম্ভবপর না হওয়াতে ক্ষমা প্রার্থনা করি—

—সম্পাদক।

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টিংস—

বেঙ্গল অলিম্পিকের এক্ষণ বাৎসরিক স্পোর্টিংস গত ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জাহ্নবীর তারিখে অমৃষ্টিত হ'য়েছে।

এবারে কতগুলি বিষয়ে বাব্বারার ও ভারতের স্পোর্টিংসের ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপিত হ'য়েছে।

৫০০০ মিটার 'ওয়ার্কিং' এ—এ, দত্ত (২৬ মিঃ ৪১/৫ সেঃ) ভারতের নতুন রেকর্ড করেছেন।

'হপ', স্পেট এণ্ড জাম্প' এ—পি, গড্ডজ (৪৪ ফুট) বাব্বারার পূর্বের রেকর্ড ভেঙেছেন।

১৫০০ মিটার দৌড়ে (৪ মিঃ ১৪২/৫ সেঃ) ডি, জি, পার্সিভেল বাব্বারার রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

৪০০ মিটার দৌড়ে (৫০/৩/৫ সেঃ) জি, ই, হাউইট এবং ১০০ মিটার 'হার্ভেল' এ সি, এইচ, জে (৫৯২/৫ সেঃ) বাব্বারার উপস্থিত রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

২০ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন লেঃ, ডি, জে, পানিভেল (আর্মি)

৬১ পয়েন্ট পেয়ে দল হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন "কলিকাতা ওয়েট ক্লাব"।

মহিলাদের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন **মার্গারেট নিকোলাস** (কলিকাতা ওয়েট ক্লাব) ২০ পয়েন্ট পেয়ে।

মহিলাদের দল হিসাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কলিকাতা ওয়েট ক্লাব ৪৩ পয়েন্ট পেয়ে।

স্থানভাবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না।

বাংলার আধুনিক শ্রেষ্ঠ স্রষ্ট্রী ও সাহিত্যরসীর অপূর্ণ সন্মাবেশ দোল সংখ্যা "সঞ্চয়ন"

বিজ্ঞাপনের হার বাড়বে না।

বিশেষ বিবরণীর জন্য চতুর্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য



ধনঞ্জয় জ্যোতিষী—লেখক, ত্রীশূল চন্দ্র রায় ত্রীপালিশিং কোম্পানি, ২০০-৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা, দ্বিতী ১।

আলোচ্য বইখানিতে মোট ৫টি গল্প আছে, “ধনঞ্জয় জ্যোতিষী”, “সাহিত্য-সামগ্র্য বিস্মৃতি”, “লক্ষ্যভ্রষ্ট”, “অধ্যাপকের ভ্রম” এবং “সম্পাদকের বিপদ”। এখকের উদ্দেশ্য হাজরদের স্মৃতি করা। রাজশেখর বহু (পরশুরাম) মহাপুরুষকেই তিনি এখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। “সাহিত্য-সামগ্র্য বিস্মৃতি” গল্পটির মূর্ত মোটের উপর এই; কোনো কবিনামা ব্যক্তি এক কাব্যব্যতিক্রম কুমারীর কাছে খন খন কাব্য-গোচনা করিতে আসিত; বাড়ীর সকলেই তাহার সহজে একটা ভ্রমাক উচ্চ ধারণা করিয়া বসিলেন। অবশেষে একদিন তাঁহাদের পরিচিত কোনো বৃদ্ধ হইরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হঠাৎ আসিয়া পড়ায় উক্ত কবিনামা ব্যক্তিটি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পালাইয়া গেল। “লক্ষ্য-ভ্রষ্ট”র মূর্তে হাজর জমিবার প্রচুর সভাবনা আছে। “অধ্যাপকের ভ্রম”ও সেইরূপ। ইহাউত্তেই, বাহা নাহবেগ মনে ইহং আখ্যাত দিয়া হাজরস আনে, তাহা সীমা-লম্বন করিয়া প্রায় ট্যাঁকিডিতে পাড়াইয়াছে, পাঠক হাসিবেন কি কাঁদিবেন ঠিক করিতে পারেন না। এই সব গল্প তাই স্থানে স্থানে হাসির গল্পের সঙ্গী গজী অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। “সম্পাদকের বিপদ” কাহিনী ইহং দীর্ঘায়িত। কোনো বড় সরকারী চাকুরিয়ার বেতার অর্ধ শিক্তি পূর পিতামহীর ওকালতির জোরে পিতামাতার অনিচ্ছা

সত্ত্বেও বিবাহ করিল, এবং শেষে পত্নীর নির্বন্ধে নিজের বেকার-বশা গৃহচাঁদার জ্ঞান মাসিক পত্রিকা সম্পাদক হইয়া বসিল। সেই স্বত্তে স্বন্দর নামের অধিকারিণী কোনো এক লেখিকার সঙ্গে পর বিনিময়ের মধ্য দিয়া তাহার গভীর প্রেম জন্মিল। কিন্তু ভাগ্য বিপদ। সম্পাদকের পত্নী পিত্রাশয় ইহত্তে সহসা আসিয়া লেখককে গল্পনা দিয়া জানাইলেন, যে উক্ত লেখিকা এবং তাঁহার স্বামীর নৃতন প্রেমপাত্রী আর কেহই নহেন, স্বয়ং সম্পাদকেরই মাথাখতর। সেই সত্ত্বেই মাসিকপত্র-খটিচ দেনার ভাগ্যদায় বিল এবং তাহার কাগজের মারফতে কোনো ব্যক্তির মানহানির অভিযোগ সমেত উকিলের চিঠি আসিয়া বেহুদ সম্পাদককে অধিকতর বেহুদ বানাইয়া দিল।

গল্পগুলি সবই প্রায় এই ধরণের। স্থগভীর হাজরস স্মৃতির একটা স্রবোণ প্রত্যেকটিতেই আছে। বাবার খাত স্থগীতদের একজন এই পুস্তকের মধ্যে “প্রসন্ন জ্যোত্স্নাধারার জায় একটি স্থগিত হাজরাধা” মাত হইয়াছেন; অপরাধ “অনাবিল আনন্দ” পাইয়াছে। স্বতরাং পাঠকেরা স্বয়ং পড়িয়া দেখুন; দানও যুং বেশী নয়।

লেখকের ভাষাটি সরল এবং স্বচ্ছ। কোনো জুল নজরে পড়িল না। লেখক রস-সাহিত্যে নবাগত নছেন; তাঁহার লেখা বিবিধ সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটি তাহাষ্ট কাহিনী-অধির সর্বপ্রথম সকলন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর সাফল্যের কালনা করি।



কলিকাতা সিলে ম্যাজিস্ট্রাইট
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৪/৬, টাওয়ার রোড, কলকাতা-৭০০০০৯
[দোল, কানুন, ১৩৫০]

সম্পাদকের বক্তব্য

বড়লটের প্রথম রাজনৈতিক বক্তব্য—

কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের দূরত্ব অবিশেষে লর্ড ওয়াডেল তাঁর বচনবিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁর বক্তব্যের সকলেই নিরাশ হয়েছেন। একদিকে স্বৈরচিত্তের পদ মালবাকীর মীমাংসার চেষ্টা, অপর দিকে সেই চিরচিরিত পাশকাটানো গুলি—খচল অবস্থার সম্মান বোধহয় হৃদয় পরাভূত। লর্ড ওয়াডেল লর্ড লিনলিগের মতই ভারত ও ব্রিটনের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও কল্যাণের পদ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না, কারণ—সেজ্ঞ যে স্বল্পদয়তা ও সহ্যহৃৎটি আবশ্যিক ভার ক্রান্তি অত্যা অত্যা হয়েছিল—কিন্তু কেন যে ক্রীপস গভীর ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে তা তিনি মোটেই বিবেচনা করেননি। বঙ্গোপদ্রোহের সছযোগিতা, ইহং একজন অক্ষম আর একজন সক্ষমের সঙ্গে যোগেগিতা করতে পারে না, কারণ সামঞ্জস্য না থাকলে তা স্বাভাবিকভাবে বিকলিত হ’তে পারে না। অতল স্বপ্নের সমাধান ও নেতাদের মুক্তির প্রেরণ, যে জবাব

তিনি দিয়েছেন তা আরও সহ্যহৃৎহৃৎ। একথা অবশ্য সত্য যে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা কখনই ক্রান্তিগলপটে কমা ভিক্ষা করতেন না।

ফলস্বরূপ ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন না হোলে বৃত্ত বড়লটই আশ্রয় আর যান, ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের কোন আশাই নেই। কেবল ভারতের অধিকারের রক্ষণ ছদ্ম আঁকলেই ভারতের প্রতি সভা সহ্যহৃৎহৃৎ প্রকাশ করা হয় না। সেদিন লর্ড লিনলিগের বলেছেন ইংরাজ শাসন ভারতকে দিয়েছে অমূল্য সম্পদ—স্বাধীনতার দাবী। সত্যকথা—কিন্তু আনন্দিক সভ্যতার।

সে স্বাধীনতাকে ব্যাহত করবার জ্ঞান আরও দিয়েছে সাম্প্রদায়িক নির্মোচন, সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ, মুসলীম লীগের প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের বৃষ্টিকট প্রেরণ। এ সহজে লর্ড ওয়াডেল বলেছেন, স্বইজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ারতেও অল্পকণ অবস্থা অত্যা তারা স্ব-লেশহীন। কিন্তু তাদের যখন আভ্যন্তরীণ গোলামোণ মীমাংসার সময় হ’য়েছিল, তখন গোলামোণ বাহ্যাবার বা মোটাবার জ্ঞান সেখানে কোন কৃত্রিম পক্ষ ছিলনা।

আর্যগণের ইতিহাস এর জলন্ত উদাহরণ।

বাড়ির পাশের বস্তুতে অনেক রাত পর্যন্ত পশ্চিমা
প্রমিক এবং গোয়ালদেবের একটানা স্বপ্নের গান এবং
চোলাফেরে ঘুমটিতে ঘুম আসিতেছিল না। উহার
এখন নিদ্রা হইয়া উঠিয়াছে; ধামিতে বলিলে অপমান
করিয়া তাড়াইবে। নিরুপায় হইয়া মশারির হিত্রচিত্ত
জানাপার আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। জালে
ধরা চাঁদা মাছের মত, একটি নিম্পেষ শাখাজালের
ফাঁদে লটকিয়া চাঁদও নিরুপায়ভাবে তাহারেবের দরমানে
স্বীত শুনিতেছে। বর্ষার ব্যাংগের ডাকের মত, তাহারেবের
অধারিত শব্দ-ধারা স্নিগ্ধিয়া স্নিগ্ধিয়াও মধ্যে মধ্যে
প্রচণ্ড উৎসাহে বিভূষিত হইয়া উঠিতেছে। সারারাত
আর ঘুমাইতে বিবে না দেখিতেছে।

আমি ব্যাংগের ডাক এবং তদ্রূপকারী যে কোনো
শব্দ শুনিতে বড় ভালবাসি। তবে সে কেবল বর্ষার
কোনো খেপখপীর ধারাঘুরিত
গ্রন্থিতে। চারের আলোর
বান-ডাকা বাসন্তী আকাশের
নীচে নয়। এ শহরে বর্ষা-
কালে সবদিন ব্যাং ডাকে না;
বর্ষি সেই কয়টি নিম্নবসব দিনে

নগর-জ্যোৎস্না পশ্চিমা প্রমিকদের কর্তব্যর ভাড়া
লইতেন তবে ঐ সব হৃদয়ের হ্রাসভার কিছু লঘু
হইত; আর আমার মতো কয়েকজন নদ্র-রীতপিত্তাস্বর
কানও তৃপ্তিলাভ করিত। কিন্তু তাহার ভত্তা ছাড়া
অল্প কাহাকেও বড় একটা ভাড়া করেন না এবং
তাছাড়া কেবল তাহারেবের নিবান-বন্দেব দৌন-গড়ে।

ভাবিতে ভাবিতে কখন চিত্তার আল জট গুলিয়া
এলোমেলো হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আর এখানে
নয়; একবার আমার বিদ্যুৎ প্রাচীন জগতে ঘুরিয়া
আসি। সেখানে আজ প্রাচীনগণের মুখে ব্রহ্মব্যবাহারের
মত জ্যোতিষাবিকাশ করিয়া পদমধু-রক্তিম, পূর্ণচন্দ্র-
মণ্ডলিত শালবীণীর অস্বাভাবিক উদ্ভিত হইয়াছে। মিথ্যা
হাস্যসিরাগানের এই বিকৃত পর্ষাতে অর্জুনিম শযায়
বিস্তৃত রাজা কাটা হইতেছি। আর নয়, এংর উঠিয়া পড়া
থাক।

তারপর, কি করিয়া জানি না, বহু সংকীর্ণ, বহির্
নির্জন পথ, বহিয়া, শূন্য অস্বীপূরীর দক্ষিণ তোরণের
পরপার্শ্বে আসিয়া পৌছিলাম। পুরবাসীরা পিল্লবীনের
প্রকাশক-বীকিকায় মদনোৎসবে - গিয়াছে। বহু
সংস্কার এবং বহুভূতির কথা মনে পড়িল। আমার
অস্বীকৃত কৈশোর-সঙ্গী তারা। দেখা হইলে আর
কি চিনিতে পারিবে। পথের শুভ্র ধূলায় মদন-বন্দেব
চাকার দাগ বিকস্ম, বিকল জনতার অসংখ্য পদচিহ্ন
ঢাকিয়া গিয়াছে; তাহার উপর জীব বৎসরের স্থগিত
নিমেষকের মত স্রাবাপাতার আশ্রয় ক্রমশঃ বিস্তার
হইতেছে। দেবী করিয়া ফেলিয়াছি। কালের অনস্মৃতি-
মুখিনী নদীজলে উজান বাহিয়া প্রাচীন অস্বীকৃত
পংখিতে দেবী হইয়া গিয়াছে। নিরুৎসাহ পদে অশোক-
বীদিকার পথ ধরিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, যখন

এই অস্বীপূরীর সহিত আমার
বিচ্ছেদ ঘটে, তখনও উদয়ন-
করার বস আমার কিশোর-
মনে অকণিমা আনিয়া বিত।
মনে হইল আজ ঠিক সেই
দিনে ফিরিয়া আসিতে দেবী

করিয়া ফেলিয়াছে।
মাথার উপরে শীর্ণপল্লব তরুণাণে একটা কেল্লি
বার বার ডাকিয়া মরিতেছে। সেই পুণাতন ডাক,
যাহা খালপাদের ঘুমিগলিন উপকণ্ঠে কলিকাতার মন-
কল্লিত আকাশকে তাহার আদিনি যৌনের কথা মনে
করাইয়া দেয়। অজমন্ডল হইয়া পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ
একটা অস্পষ্ট গোষ্ঠানির আভাঙ্গ কানে আসিল।
চাহিয়া দেখি, একটা মাতাল পথপাশের পথিকার
পড়িয়া আছে; অপর একজন, তদপেক্ষা ঠিক
প্রকৃতির, তাহাকে উঠাইয়া বসাইবার জন্য বার বার
বুধা চেষ্টা করিতেছে। যতদিন অস্বীকৃত জ্বিমা,
বসন্তোৎসবের এই কালিমায় দিকটা চোখে পড়ে নাই,
নিশাপ কিশোরের চোখে পড়িয়াও কথা নাই। অবদিত
হৃদয়ে মিকটে গেলাম। মাতাল ছটীটির ক্রলপ নাই;
বিড় বিড় করিয়া মনমন্তব গাহিতেছে। ভাবিলাম,

১৩৫০]

মুহুর্তি এবং হৃদয়াকর, বাহার। আমার স্বপ্নায় অস্বী-
কৃতের প্রিয়তম বন্ধ ছিল, তাহাদিগকে না জানি আজ
কি মুহুর্তি দেখিব। এই ছটি মাতালের মুখে তাহারেবের
ধাকড়া শাদুগ দেখিয়া হৃদয় মন ভাৱাক্রান্ত হইয়া
উঠিল।

পিল্লবীনের গহনে, যেখানে বৌদ্ধ নাস্তিকদের
প্রাচীন চৈতনের চারিপার্শ্বে তরুশ্রেণীর বিরলতা, রাজা
জম্বোবের আদেশে অশোক-বীণী রোপিত হইয়াছিল;
বায়জী শাক্যমুনির পরিত্যক্ত মুতিবেদীর পূর্বে প্রতি-
বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় স্বর-দেবতার পুশরচিত্ত প্রতিমা
উঠিত হইত। ধীরে ধীরে কখন সেখানে গিয়া
পৌছিলাম। উৎসব-ভূমি শান্ত, নির্জনপ্রায়। মাথার
উপরে পূর্ণিমার চন্দ্র, বসন্ত-বনলসীর অমৃতভাসিকের
সৌখ্য-কলস। উৎসবশ্রান্ত কয়েকটা জাগ্রত বোকা
ধাকিয়া ধাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। পীতশেষ মাশী-
কলসের তীর মধুর গন্ধ দীক্ষিত তরিকুম্বের সৌরভে
মিশিয়া সমস্ত স্থানটিতে একটা অসহনীয় মরিহতা ব্যাপ্ত
হইয়া দিয়াছে। বীকিকার তরুপার্শ্বে বাহার প্রজবৎসে
খিলিত কবরীভারে শায়িতা, উৎসবমন্ততায় তাহারেব
মুখ হইতে লোহ-কুম্বের পাণ্ড পরাগ মুড়িয়া গিয়া, অতি-
শীঘ্র জীবদেহের কদম্বাভা প্রকটিত হইয়াছে। বারমুখা
মাঝিকার কথা মনে পড়িল, আমার অস্বীকৃতবাসের বালো
এবং কৈশোরের গাহার অপূর্ণ কবি প্রতিভার কথা
যথোক্ত তরুণদের মুখে শুনিলাম, মহাকবি সোমেন্দ্রের
নিম্ন প্রেমসী ছিলেন। ইহারেব মধ্যে ভিত্তিও কি
ঘড়েন। অধিক ভাবিতে আর সাহস হইল না। এই
পরিভ্রমণ প্রাণী বারশ্রীনের আশেপাশে কয়েকটি
জৌর, দরিত্র বিট দীক্ষিত, প্রবৃত্তিমুখে, নিম্নিত অস্বাভাবিক
মহা-বিজড়িত কণ্ঠে কি যেন বকিতেছে।

অনুরে ব্রহ্মি লতা-কুঞ্জগুলির দিকে চাহিলাম।
গোপাল এনে প্রায় নিশেদ, কেবল দুই একটির মধ্যে
মুগ্ধের শিকড়ের অশুট কলঙ্গনি জাগ্রত তরুণ কামি-
গানের অন্তিম জানাইয়া দেয়। বসন্তের মুহুর্তি সখীরে
কথা পাতার দীর্ঘখসিত মমবৈর সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব জানপন-

[প্রাচীন জগতের দোল

জনের উচ্চাষ মদনসঙ্গীতের ক্ষীণ রেশ বহিয়া আসে।
অনেকগুলি শৃগাল হুসলা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি
খিপ্রহর।

কতক্ষণ এই স্বপ্ন-নগরীর স্মৃতিতোৎসব বসন্ত বন-
ভূমিতে নিঃশব্দ ঝাঁড়াইয়া চিত্তার গহনে ভুবিয়া-জ্বিলায়



গোপাল মুর্তি (কাঠফলক)
পঞ্চদশ শতাব্দী, কানসট,
মাদরহ
(অষ্টোত্তম বিষ্ণুর মূর্তি)

সৌন্দর্য তথাপি, জন না স্বর
সৌন্দর্যের স্থান বাহিয়া কুল প্রর করিলাম, "বহু
ভালো লাগে।" বহুভূতি সমুদ্রে এগায় নাই। সে
কি আমার মনোভাব বুদ্ধিতে পারিলাম। আমার
কথায়, অভিমান ও স্বরাখসিত কণ্ঠে হৃদয়াকরকে

বিশিষ্ট। "সখা, আমি তো তবনি তোমায় বলিয়াছিলাম। সোমদেব শুধুনা যত্নবৃত্ত হইয়া উঠিয়াছে; আমাদের অসংযমকে ও আজকাল দৃশ্য করে। দেখিলে না তবন, যখন আমরা পথ-পার্শ্বে বসিয়া মদনদেবের স্তব পাঠিতেছিলাম, ও নিকটে আসিয়াও বিনা সজ্ঞাশেষে চলিয়া গেল। দেখ না, এতদিন কোথায় ছিল, হঠাৎ আজ উৎসব রাত্রিতে পারসীক স্নেহের বেশে, নগরে আসিয়া হাজির হইয়াছে। যেন ও অবস্খী নগরীর কেই নয়।"

পারসীক স্নেহের বেশ! আমার শয়নকালীন পায়জামা আর ডিলাহাতা পাঞ্জাবীকেই উহার পারস্ত দেশীয় পোষাক ভাবিয়াছে। ব্যাপারখানা বুঝাইয়া বলিতে যাইতেছি, এমন মনেয় স্বহৃদ্যরক আমাকে বাধা দিয়া বিলাস নরনে কহিতে লাগিল, "দেখ বহুবুত্তি, আজ এই সংযমের অবতারকে অগ্নি ছাড়া হইবে না। চলো আমাদের যখন শিল্পী বস্ত্র কট্টারে লইয়া যাই; সেখানে একবারে থ' বানাইয়া ছাড়িয়া দিব, দেখিবে তখন ইনি কোন ব্রতের ভ্রাতী।

ইহারা আমাকে আর কোনো কথা কহিতে দিল না। একবারে তাহাদের বস্ত্র গুহে লইয়া হাজির করিল। দেখিলাম ভারত-প্রবাসী গ্রীক শিল্পীটি গৃহের সম্মুখস্থ উদানে মদনোৎসব উপলক্ষে প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছে। গ্রীক এবং ভারতীয় রীতির সম্মিশ্রণ ভালো করিতে পারে নাই। কিশোর এরসের পেশীল হস্তে ফুলমহুটি নিত্যই বেমানান হইয়াছে। বহুবুত্তি অর্পিত হারে করণ্যাত করিয়া ডাকিল, "মদনিকে।" থানিক পরেই দরজা খুলিয়া গেল। শিল্পী ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া, আমাকে দেখিয়া ভাঙ্গা প্রাণতে কহিল, "নরন অতিথি? মদনিকা তো আজ সারাদিন ঘরে নাই; কখন ফিরিবে বলিয়াও যায় নাই। পরিচর্য্যার ক্রটি হইবে যে।"

স্বপ্নের মধ্যে বোকা যান না এবং আশঙ্ক করা যায় না এমন কোনো ভাবাই নাই; হস্তরাং আমি অতি স্থূললিপি আইয়োনিয় গ্রীক ভাষায় হেলিও দোরসকে,—তাহার নাম কেহ না বলিয়া বিলেও সহজেই তাহা জানিতে

পারিলাম,—হেলিওদোরসকে বলিলাম, "দেখা যিনি, বেশী খাতির করিবার প্রয়োজন নাই; আমি এতদিন বিশ্রাম লইব; তবে একটি কথা তোমায় বলিয়া দিই। তুমি পরীষ মাহুয়, ছ পয়সা রোজগারের চেষ্টায় জঘন্যপে আসিয়াছ; কেননা মিছামিছি ছেলে বখাইয়া বদনাম কিনিতেছ। দেবপিতা জেউসের দোহাই, বহুবুত্তি এবং স্বহৃদ্যরককে খাড়া হইতে নামো।"

বলিতে বলিতে লক্ষ্য করিলাম, যখনটা ঈষৎ রাগিয়া গিয়াছে। আমার কথা শেষ হইতেই বলিতে যত্ন করিল। "ভয়, আপনি অবস্খীতে ছ দণ্ডের অতিথি;—অনর্থক এখানকার বলি ব্যবস্থা লইয়া মাথা খামাইতেছেন। আজ দোলের রাত্রিতে ইহারা একটি আসব পান করিয়া আনন্দিতে হইয়াছে; তাহাতেই আপনি যৎপরোনাস্তি চটয়া গিয়াছেন; আমাদের দেশের দোলের কাণ্ডকারখানা দেখিলে না জানি কি করিতেন।" লোকটার কথা কহিবার ভঙ্গীটা কিছু নূতন রকমের ঢেকিল। তাহার মাথা নাড়ায়, চক্কারকার চঞ্চল পড়িতে, হাতের নানা শাশ্ববহির্ভূত মুদ্রায় যেন সবাক ছবির স্তম্ভ হইতে লাগিল।

লোকটা বলিয়া চলিল।—তাহার নিরক্ষর শ্রমিকজন-স্বলভ চিত্রময় আইয়োনিয় যাবনী-ভাষা নিরন্তর তুরি কহিতে কহিতে, ক্রমশঃ পূর্ণিমা-পল্লিতে অবস্খীর বৃষ্ণ-পটকে মুদ্রিয়া দিয়া, অবশেষে কেবল একটি বস্ত্র বর্গ্য-করোচ্ছল যখন-নগরীর বাগি চিত্রে পরিণত হইল।

তনিতে লাগিলাম,—অথবা দেখিতে লাগিলাম; শীতের অশ্ব হইয়াছে। দূর পাখাদের চুড়ায়, বরফ গলিতেছে; মাঠে মাঠে ভিজা মাটিতে, শেহালা-জড়ানো বড়ো বড়ো পাখদের ধারে থাকে বিভিন্ন বর্ণের স্তম্ভ মুদ্রিয়াছে। নগরে আজ পথে পথে আনন্দিতে জনতা। গ্রীক বণিকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা নানাদেশের সেবিন পোষাকে, প্রাণপতির মত একিক ডলিকি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ভূম্যাদিকারী বংশের সম্ভানেরা সানাতন শোভন, সংযত ব্রহ্মবাস পরিচ্ছদে, অশ্ললগী কেশজালে সাদা-ফুলের মালা জড়াইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে।

দাইওনিসদের মন্দির প্রাঙ্গণে যাহাদের ভীড়, তাহাদের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর মজুরের দল, ধনীগৃহের ক্রীতদাস এবং বৈয়োগারিণ ঈক্ষুরের দল। তাহাদের অনেকেই পুরাত্ন হইতেই অপরিসিত মত্তপান করিয়াছে। আজ তাহাদের দেহতা মৃত্যুলোকের চয়ন্যমাসব্যাপী নিদ্রা হইতে জাগিবেন; পৃথিবীর বিষয় জড়িমা দূর করিয়া,

শেষ করিতে দিল না। যার, যার শব্দে মন্দির সীমানা হইতে দূর করিয়া দিল।

দাইয়োনিশ-মন্দিরের সংস্কারযুক্ত, বিদগ্ধ পুরোহিত এতদূর মুগ্ধ হইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতেছিল; গ্রহর ও বিতাড়ন পর্বের শেষে, বিষয় যতগতান্তিতে কহিল, শ্বকর-পালের মধ্যে মুক্তা ছড়ানো এই মিশররীগের



গোষ্ঠলীলা (পোড়মাটির ফলক)

সমুদ্র শতাব্দী—বরুণের, বীরভূম

(শান্ততোম নিউজিয়ের সৌভাজে)

আমাদের স্বাধীলোকে শীতনিম্নিত প্রাণের উদ্বোধন করিবেন। প্রাঙ্গণের একস্থানে একটি মিশরী পুরোহিত বক্তৃতা-জমাইয়াছে। তাহার তাস্রর্ষ পেশীকটীন বহুল ভাবের আবেগে যন যন পল্লিতে হইতেছে। সে বলিতেছে, "হে ভ্রাতৃ হেলেনীয়গণ, তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি শরিজ নীলনদজাত পদ্মকলা স্বর্গদেব; তিনি পরমসুন্দর চিরযৌবন হোয়ারস; সহস্র বৎসর পূর্বে যখন তোমরা বর্ষ ছিলে, তখনই আমাদের জান্নী পূজ্যগণ সেই প্রাণ দেবতার শ্রমিকল জাগরণমান গাহিয়া গিয়াছেন। অজান এবং হুরায়ত্তার আরোপে, অর্বাচীন দাইওনিস নামের আরোপে তোমরা আর মহাপার্পে লিপ্ত হইয়ো না।" উত্তেজিত ভক্তজনতা তাহাকে আর বক্তৃতা

আইয়োনিয় গ্রীক শিল্পী কহিতে লাগিল, "ভয়! তোমাদের অবস্খীতে আজ দিনের বেলায়, দেব-মন্দিরের ধারদেশে কোনো অমঙ্গলের চিহ্নই দেখি নাই; হা, কয়েকটি চপল নাগরিক হয়তো বাঙ্কিবেশবৎ লক্ষ্য করিয়া গলাধাকারি দিয়াছে, কেহ বা ধার্ষ-বাক্ক, গুঢ়া-সমিতি দেবস্তুতি গাহিয়াছে; কিন্তু তাহা ঐ পর্য্যন্তই। তোমাদের কাম-কলা অতিশয় হৃদ্য, স্বন্দর এবং ব্যাপক হওয়ায় কোথাও অশ্লীলতা দেখিতে পাই নাই; তোমাদের নাগরিকেরা অহরহে অভ্যস্ত করিতেই জানে না। কিন্তু আমার বদেষায় নাগরিকেরা অতোটা মুহুর্ভাঙ্গার অধিকারী নয়; তাহাদের উচ্চায় জীবন উচ্চায় আনন্দের শান্তি মানিতে চায়। যদি দাইওনিসদের উৎসবদিনের অবাধ স্বাধীনতা না থাকিত, আমার ভাবিতেও ভয় হয়,

আমাদের অবশ্য পুত্র সন্তান বৎসর কী ভয়ঙ্কর উজ্জ্বলতায় আত্মপ্রকাশ করিত।

হোলিওদেরস তাহার কথাটিজি আঁকিয়া চলিল। দেহিলাম, সন্ধ্যা নামিতেছে; নগরীর প্রাসাদে, কুটীরে দীপ জলিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নে দ্বন্দ্বী নাগরিকেরা দ্বিধা স্বপ্নবিশ্রান্ত কণ্ঠে কন্দের গান গাহিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ নবিতা লোহিত নমন, যৌবনময় দাঁড়ানিসমূহের অমূল্যরূপে চিত্রব্যাঘের চর্মণীত আসনে বসিতে হইতেছে; পশ্চাতে দেবতার আপানক-সঙ্গিনীর দল; তাহারা মুক্তকেশ, নয়প্রায় দেখে মণাল হাতে লইয়া নাচিতে নাচিতে পৃথিবীর শীতাহত যৌবনের পুনজাগরণ পান গাহিয়া চলিতেছে। বলিষ্ঠ যুবক বল্লভায়ায় শরীরের সৌন্দর্য্য পূর্ণ প্রাকটিক করিয়া, অঙ্গপু, সঙ্গিন বনদেবতার মূর্তিতে, মণপ-বিক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বরূপেবতার বিবিধ্য করি আকাশ কাঁপাইতেছে। অমৃত শোভাযাত্রা! অমৃত দেবতার অমৃত ভক্তগুণী!

দেবিতে দেখিতে রাজির তিমির আসিয়া সন্ধ্যালোকে নগরকে প্রাণিত করিল। নগরীর গাহারা শান্ত, স্বপ্নে অধিবাণী, তাহাদের গৃহে গৃহে অর্গল পড়িয়া গিয়াছে। পথে বিদেশীয় ব্যক্তিরগণকে শান্তিরক্ষকেরা সাবধান করিয়া দিতেছে, গৃহে বাও; সময় হইয়া আসিল, এইবার পাগলের দল ছুঁবার গতিতে বাহির হইবে; আজ তাহাদের কেহই সংযত করিতে পারিবে না; সম্রাটের হোমাইও তাহারা মানিবে না।

মনে হইল, আমিও সেখানে বিদেশীয়দের দলে উপস্থিত আছি। হোলিওদেরদের বর্ণনায় হোলিওদেরস-নিজেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; আমার সমুখে কেবল ভিত্তিমালোকে যখন নগরী, ঘুরে, নগরের উপত্য-দেশে শ্রমিকপঞ্জীর দিশা হইতে শুক্ল গুরু সন্ত্রাস্তনি। ঐ তাহারা আসিতেছে!

পথের ধারে ধারে ব্যত্যয়ন-গুলিয়া গেল। অগ্নিদেব কৌতুকহীনের ভিত্তি। পিতামাতা বালক-বালিকাদের রূঢ় শাসন করিয়া শয়নকক্ষে পাঠাইতেছেন। কারন যাহা

এখনই নগরের পথে লোকচক্রের সমুদ্রে আরক্ত হইবে তাহা দেববিশ্বক হইলও শিশুর দর্শনীয় নয়। হুঁহুই কিশোরের দল, যাহারা কাহারো শাসন মানি না, আক নগর-প্রান্তের শৈলকূলে মিলিত হইয়াছে, সেখানে থাকিয়া দাঁড়ানিস-ভক্তদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা সন্ধ্যা করিবে। জমশ: বাস্তবনি প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল। বীয়ে ধীরে অসংখ্য হস্তবিশ্রুত কপ্পিত চকল মশালের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা, নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শোভাযাত্রার দল নিকটেই আসিয়া পড়িল। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকে নিম্নশ্রেণীর ক্রীতদাস, মুক্তদাস এবং স্বাধীন নকরের দল। গ্রীক মিস্ত্রি দলও ইহার মধ্যে কম নয়। ভালো ঘরের অপদার কলারাদের দলও ইহাতে যোগ দিয়াছে। কলেক্টরারীটা তাহারা করিতেছে বেশী। শোভাযাত্রীদের সাক্ষ একটু বেলা ধরনের, কিন্তু দারুণ মন্তায় এবং একাগ্রতায় তাহারা অমৃত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নির্যাতিতেরা মৃতদেবতা দাঁড়ানিসের মধ্যে আপনাদের নির্জিত জীবনকে একান্ত বলিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের বিলাপের গান, তাহাদের কণ, উন্নত আর্তন, বকের উগর অবিরাম করাধাত ধ্বনি, এমনই এক বাস্তবতম সৃষ্টি করিয়াছে যে দর্শকের চক্ষুর সামনে এই প্রাকৃতিক দেবকান্দনীর অন্তর্নিহিত বিলাপ মুগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

শব চেয়ে জীষণ মাতিয়াছে নারীর দল। গোলকি মন্তরে বৎসরের এক চ্যাবর চেলে মৃতদেবতার আবেশে মহা রাক্ষসে সংগাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া দেবসঙ্গিনীদিগের ভাবে আধিষ্টা এই অর্জন, মুক্তকেশী স্ত্রীলোকেরা উন্নতর মতো বিলাপ শুরু করিয়া দিল। সহসা ছোকরার মধ্যে জাগ্রত দায়ানিসেসর আবেশ হওয়ায়, চতুর্দিকে বর্ণ পাপিবিদারক আনন্দে ধ্বনি উঠিল; মরণবিজয়ী দেবতা জাগিয়াছেন! আনন্দ করো! আনন্দ করো!

তারপর সে কি অমৃত দুগ্ধ। দ্রুততর তালে বাজনা রাজিয়া চলিয়াছে। শোভাযাত্রার মধ্যস্থলের দল

মিথুনো উদ্দাম নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে; তাহারা যেন কুতূহলি। সহজ অবস্থায় মাধবের পা যে অতো দ্রুত চলিতে পারে তাহা! না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। নাচিতে নাচিতে একটু লোক সহসা আসিয়া এক দেব সঙ্গিনীকে আক্রমণ করিল; শোভাযাত্রীদের কেহ কোনো বাধা দিল না; হতভাগ্যের দল ভাবিতেছে, ইহার মধ্যে দেবতার আবেশ হইয়াছে। শক্রনিমিত্ত দাঁড়ানিস বাজ তাহার আশ্রয় মধ্যে স্বর্গীয় বীর্যের সঞ্চার করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটিও অবশ্য তাহার উন্নত গ্রহণর সহ করিতেছে; আনন্দে তাহার চকু হইতে জল পড়িতেছে; সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে; নিম্ন নগর ক্ষত হইতে অবিরত করিয়া পড়া রক্তধারাকে সে গ্রহণের মধ্যেই আনিতেছে না। আজ তাহার আশ্রয় শোণন হইতেছে; মুক্তার পরপারে সে দেবতার ত্রিভঙ্গী লোকের অমৃত প্রণার ভোগ করিতে পারিবে।

এই জনসংঘের মধ্যে সকলেই যে আনিত তাহা নহে। উচ্চস্রাজের নিকট চিত্রের লোকগুলিই সর্ব-পেক্ষা অধিক নির্লজ্জতা দেখাইতেছে। দেবাবেশের নাম করিয়া তাহারা অবশ্যে পথের মধ্যে অবর্ণণীয় আচরণ করিয়া যাইতেছে। একবারে নিরাচরণ পুত্র! তাহাদের ছাগচর্শের ছদ্মবেশ তাহাদের উপযুক্তই হইয়াছে।

গ্রীকশিল্পী বলিয়া চলিল, "ভদ্র! আর অধিক বর্ণনা দিও আপনাকে সংকুচিত করিতে চাহিনি। আর ভোর চলিল, আহ্নন, উঠুন, উত্তানেন গিয়া..."

গায়ে হাত দিয়া আমার ছোটভাই ডাকিতেছিল, 'উঠুন, উঠুন, সেদা, সেদা হইয়া গিয়াছে।' তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলাম ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট অতীত হইয়াছে।

আবার কবে ঘরে ঘরে জ্বলবে আলো জ্বলবে!

ক্রীটপেন্সেলস্ মল্লিক বি, এল,

আবার কবে ঘরে ঘরে জ্বলবে আলো জ্বলবে। রাষ্ট্রা দিয়ে মাধবগুলা বুক দুপিয়ে চলেবে। চালের কথা ভাবতে চোখে সরবে না ক'রুণা লাগবে না আর রাষ্ট্রা মাঝে 'কিউ'এ দিতে ধুপা সিন্ধি গাও ও আশা পি দেব ঘুচবে কবে চাকরী কন্ট্রোল-সুপ দোকানদারের গামবে গলা থাকি, উজ্জল আলো অন্ধকারের কানছটোকে মলবে আবার কবে ঘরে ঘরে জ্বলবে আলো জ্বলবে!

আনহারী ক্ষুণ্ণীভিত্তের ধামবে কবে কান্দা গৃহস্থদের ঘরে ঘরে চড়বে আবার রাষ্ট্রা দুয়ের বাহা কচি ছেলের পড়বে পেটে দুগ্ধ ভরা পেটে হাসবে তারা করবে লোকে মুগ্ধ গায়ে গায়ে মড়াইগুণ্ডো উঠবে ভরে বাজা দেবের লোকে পুষ্ট হবে স্ত্রী পয়সারে বাজুলা মায়ের জামল কোলে শোনার ফসল ফলবে আবার কবে ঘরে ঘরে জ্বলবে আলো জ্বলবে!

আলু পটোল সস্তা হবে সস্তা হবে ডিমটা মটর ছটি ধান্যকপি টোম্যাটো আর গিমটা লাউ কুমড়া পেস্তা সিজের দরটা কিছু করবে শশা কলা পাতিলেবু বাকারোতে জমবে সেভন ও ব্লক ব্রেডের মূল্য হবে আড়াই পয়সা দোকানেতে থী মিলবে গণ্য আর ভগদা হুন্সী জমবে দুধে দেখে ধনীরা দুধর গলবে আবার কবে ঘরে ঘরে জ্বলবে আলো জ্বলবে!

এদুগ্মানেতে বিদেশীদের ভিড়টা কবে কমবে ইংরেজেরা বিলেত যাবে, বকেও'লা বকে' কার্গী যাবে আফ্রিকাতে, চাইনীজেরা চায়না মাফিকেরা আমেরিকায় ধরবে যেতে বায়না ফিরবে গবে আশ্রমদেশে, হেথায় শুভ থাকবে বাজুলা মা'কে গাল ভরে যে মা' মা' বকে ডাকবে মায়ের দুখে ভাইয়ের দুখে পরাণ যাদের গলবে আবার কবে ঘরে ঘরে জ্বলবে আলো জ্বলবে!!

ভারতের মহাপুত্র্য তীর্থক্ষেত্র বারাণসী শুষ্ক হিন্দুদের তীর্থস্থান নয় বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়েরাই প্রধান তীর্থক্ষেত্র বলে আখ্যাত পরিচিত। হিন্দুদের কাছে এই হল বিশ্বনাথের বিহারক্ষেত্র। এখানেই ভগবান বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। আবার এখানেই জৈন তীর্থঙ্করদিগের স্থান বলেই জৈন সাহিত্যে কথিত আছে। মুসলমানদের নিকট বারাণসীকে ভারতের মক্কা বলিলে বোধ হয় অতুল্য হয় না। এখানেই মুসলমান নৃপতিদের হিন্দু সৌর-শিল্প ও চাকর্য্যক বিশ্বমণীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। হিন্দুদিগের সৌর শিরগুণি ভূপাতিত করে মসজিদ প্রভৃতি কি করে স্থাপন করা হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা এই বারাণসী দ্বায়েই পাই। পৃথিবীতে যত প্রাচীন নগরী আখ্যাত বিজ্ঞান তাহার মধ্যে বারাণসীই শ্রেষ্ঠমান অধিকার করেছে। আজকাল বারাণসী কাশী নামেই খ্যাত কিন্তু কাশী কোনও নগরীর নাম নয়। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায় যে কাশী হল একটি রাজ্যের নাম আর এই রাজ্যের রাজধানী বারাণসী নামেই খ্যাত ছিল ও বর্তমানেও আছে। খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন কাশীকে একটি দেশ বলেই বর্ণনা করেছেন। খ্রীষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাং বারাণসীকে পো-লো-নি-সে বলেছেন। তাঁহার মতে কাশী রাজ্য ৬৬৭ মাইল পরিমি ছিল কিন্তু বারাণসী নগরী সৈমধ্যে ছিল ৩ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। হিউয়েন-সাং বর্ণিত বারাণসী বর্তমানে অনেক দূর বর্ধিত হয়েছে। বারাণসী নামের উৎপত্তি বিস্ময় করলে দেখতে পাই যে ইহা অসী ও বাসনা নদের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলেই ইহাকে বারাণসী বলা হয়। বর্তমান বারাণসী বা কাশী পঞ্চা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বাসনা ও দক্ষিণে অসী

এই বাজারে জমি বাজে ফেলে না রেখে
আনাজের চাষ করুন,
লাভবান হবেন।

“বারাণসী ও সারনাথ”

(ঐতিহাসিক গবেষণা)

সুদীররজন দাস এম. এ.

প্রবাহিত। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু বারাণসীর অনেক নাম দেখতে পাই—হ্রদাসী, স্বরুজনা, পুষ্পবতী, বালিনী প্রভৃতি। কিন্তু সব সময়ই বারাণসী নাম বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই বারাণসী নাম থেকেই বারাণস ও বর্তমান ইংরেজী নাম বেনারসের উৎপত্তি। আবুল ফজল (খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দী) বলেন বারাণসী সাধারণতঃ বানারস নামেই খ্যাত। ইহা বারুণা ও অসী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। জাতক সাহিত্যভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে কাশী রাজ্যের দূরত্বের পরিমাণ ছিল ৩০০ মাইল। হিন্দুধর্মশাস্ত্রকারণও অজ্ঞাত গ্রন্থকারণের মতে বারাণসী ‘আর্যাবতী’ বা ‘মধ্যদেশের’ অন্তর্গত ছিল না বলেই নির্দেশ আছে কিন্তু রাধ-শেখরের কাব্যমীমাংসা নামক গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে পুরুষেশ বারাণসীর পূর্বে অবস্থিত (তর বাদ্যগন্ধাঃ পরতঃ পূর্বে দেশঃ)। বৌদ্ধ সাহিত্যে কিন্তু বারাণসী ও অজ্ঞাত বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি মধ্য-দেশের ভিতর বলেই গণ্য হয়েছে কেননা এই সব স্থানগুলিতেই বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন ও নির্গাঁ লাভ করেন।

কাশীবাদীর প্রথম উল্লেখ আমরা অথর্ব বেদে পাই। এখানে কোশল ও বিদেহবাসীদের সঙ্গে কাশীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। বিদেহরাজ জনকের সময় কাশীরাজে অজাতশত্রু নামে এক রাজা ছিলেন। এই অজাতশত্রুর বংশ পরিচয় জানবার আদ্যর্পের কোন উপাদান নেই। পুরাণের মতে কাশীরাজ্যের পুরুষ বংশেরই অন্তর্গত। গ্রাণে আমরা কাশী রাজ্যের যে সকল নাম পাই তাহদের মধ্যে দিবদাস ও প্রতরদানের

[১৩৫০]

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পর ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজবংশ কাশীরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মহাভারতে কথিত আছে যে মধ্যমধিপতি জরাসন্ধ কাশীরাজ্য অধিকার করেন কিন্তু তাহার পতনের পরে কাশী আবার স্বাধীনতা লাভ করে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাশীরাজ পাণ্ডবদিগের বহু হিয়াবে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

খৃঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে এক নতুন রাজ-মৈত্রিক সম্ভার উদ্ভব হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে সোঙ্গসো মহাজনপদের নাম পাই। এই ১৬ষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে কাশীরাজ্যই অত্যন্ত পরাক্রমশালী বিক্রমবৎসম্পন্ন ছিল বলেই বর্ণিত আছে। আমরা জানিতে পারি যে কোন কোন সময়ে কাশীরাজ সকল জনপদের অধিপতি হবার জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। জাতকে কাশী ও কোশলরাজ্যের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। কোন কোন সময়ে কাশীরাজ কোশলরাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করে কাশীরাজ্যকে বন্দী করেন। কাশীরাজ্যের এই প্রত্যাপ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এর পরেই কাশী কোশলরাজ্যের অন্তর্গত হয় এবং কাশী তার স্বাধীনতা কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে বর্ধধরাজ্য জন্মে জন্মে পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে এবং হর্ষাকুল নৃপতি বিধিসাধের সময় মগদের সমৃদ্ধি ও পরাক্রম আরও বেড়ে যায়।

কোশলরাজ ভয়ে তার কন্ডাকে বিধিসাধের নিকট বিবাহ দিয়ে সৈমজতা স্থাপন করেন এবং কাশীরাজ্যকে যৌতুক স্বরূপ তাহার কন্ডাকে দান করেন। তাই কাশী আবার মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অজাতশত্রু তাহার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এই হত্যাকাণ্ডে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কাশীরাজ্য পুনঃ অধিকার করেন। এর ফলে চৈত্র রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ চলে। বহু যুদ্ধের পর আবার চৈত্র রাজ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থাপিত হয়। প্রসেনজিৎ তাহার কন্ডাকে অজাতশত্রুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সন্ধি করলেন। এবং ইহার ফলেই কাশী রাজ্য আবার মগধ রাজ্যের

[বারাণসী ও সারনাথ]

অন্তর্গত হয়। হর্ষাক বংশের পরে যথাক্রমে শৈবগনাপ, নন্দ ও মৌর্যবংশের রাজগণ কাশীরাজ্যের উপর রাজত্ব করেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের স্তম্ভলিপি এখনও আমরা সারনাথে দেখতে পাই। এই লিপির বিবরণ সারনাথ প্রবন্ধে লেখা হবে খৃঃ পূর্ব ১ম শতাব্দীতে কাশী আবার বোধ হয় কোশলী রাজ্যের অধীনে ছিল বলে মনে হয়। ইহার প্রমাণ পাই আমরা চৈত্র রাজ্যের লিপি হতে। খৃঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে কাশী আবার কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সারনাথে কুশান নৃপতিদের অনেক লিপি পাওয়া গেছে কিন্তু কুশানদের রাজত্ব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণ কাশী রাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে কাশী গুপ্তবংশী বংশীয় নৃপতি হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে কিছু সময়ের জন্য কাশীর বিশেষ কোন ইতি-হাস পাওয়া যায় না। খৃঃ ৮ম শতাব্দীতে যশোবর্ধন বোধ হয় কাশীরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এর পরে বাংলা প্রদেশ বাংলা বংশীয় রাজগণ কাশীর অধিপতি হন। খৃঃ ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে প্রতিহার বংশীয় নৃপতিগণ কাশী প্রাচ্যে তাহাদের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। প্রতিহার রাজ্যের পতনের পর চৌদার্য্যক লক্ষ্মণ প্রভৃতি মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠেন এবং কাশীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু চৌদার্য্যক-গণের প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হন না। চৌদী রাজ্যের পতনের পর মাংজ্ঞায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই অরাজকতার ভিতর থেকেই গুহাবাল নৃপতি চম্বলবংশ পূর্ণ ভারতে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। এদের রাজধানী এখন বারাণসীতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু কনোজ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী কনোজে স্থানান্তরিত করা হয়।

শেষ গুহাবাল রাজা জয়চন্দ্রের রাজত্ব কালেই মুসলমানগণ মধ্য-পূর্ণ ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। মহম্মদ ঘোরী জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে কনোজ অধিকার করেন আর কাশী জয়ের তার পড়ে

কুতুবউদ্দিনের উপরে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতেই জানিতে পারি যে এই কুতুবউদ্দিনই কাশী জয় করে বহু ধন শত অর্থাৎ লুণ্ঠন করেছিলেন। হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয় আর সেই সকল স্থানেই মসজিদ প্রকৃতি স্থাপনা করা হয়।

মুসলমানদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কাশীর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। খৃঃ ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে কাশী দিল্লীর মুসলমান নৃপতিদিগের হস্তে চলিয়া যায়। খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে এটি সারকিও রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এর রাজধানী ছিল যোমপুরে। ১৪৪৯ সালে দৌলীবংশীয় নৃপতিগণ কাশী রাজ্যের উপর রাজত্ব করেন। এর পরে কাশী আবার মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। সেরাশ ও জমায়নের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাহার ফলেই কাশী কোন সময়ে স্বাধীনগের অধীনে ছিল। কিন্তু তার পরেই আবার মোগলরা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েছিল। অবশেষে মোগল কুশের প্রধান নৃপতি জামানের সাহায্যে কাশী জয় করেন এবং খৃঃ ১৫৬৬—১৭২৫ পর্যন্ত কাশী মোগল সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কোন সময়েই এটি রাজধানী বা প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়নি। স্বতরাং মুসলমানদের আগমনের সময় থেকেই কাশী একটি রাজনৈতিক কেন্দ্রে হিসাবে কোন পরিচয় আমরা পাই না।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কাশী আবার পুনর্জীবন লাভ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা আবার ফিরে আসে। হিন্দুগণ বারানসীতে আবার দেব মন্দির প্রকৃতি নির্মাণ করতে লাগলেন। রাজা মানসিংহ বানমন্দির ও বানসরোবর নির্মাণ করালেন।

বাজারে শাক-শজী না কিনে নিজের
জমিতে উৎপন্ন করুন, এতে
দেশের ও নিজের
উপকার হবে।

রাজা চৌদরখম্ব বিশ্বনাথের মন্দির পুনঃ নির্মাণ করালেন কিন্তু ইহা আর বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আকবরের পৌত্র সাহাজাহানের সময়ে আবার মুসলমানগণের ধ্বংসকার্য আরম্ভ হয়। কিন্তু এই ধ্বংসকার্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়। আওরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার মসজিদ নির্মাণ করান। আজও গিয়ানবাগী মসজিদ বিশ্বনাথের মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার কা- কার্যও অজ্ঞাত হিন্দু স্থাপত্য সৌশিলের নির্দশ রূপ। কথিত আছে যে এই মসজিদ প্রাচীন বিশ্বনাথের মন্দিরের ভায়গায় নির্মিত হয়েছিল। শুধু বিশ্বনাথের মন্দির কেন আরও অনেক মন্দির এরূপে ধ্বংস স্থাপে পরিণত হয়েছিল এবং এই ধ্বংস স্থাপের উপরেই বহু সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এইরূপে আরও যে কত মন্দিরের সমাপ্তি হয়েছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কাশীতে ঋতু ও কলার দিক থেকে যে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া কঠিন। এই ধ্বংস কার্যে যে সব মুসলমান নৃপতিগণ বিশেষ আগ্রহণ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন, ইব্রাহিম লোদী, সাহাজাহান ও আওরঙ্গজেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধ্বংস লীলার ভিতরেও বারানসী তাহার ঋতু ও সংজ্ঞাতিক বাঢ়িয়ে রেখে- ছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও সংজ্ঞা সাহিত্যে বারানসীর স্থান অকুণ্ঠনীয়। শুধু সাহিত্যে কেন ধর্মের দিগ থেকেও বারানসীর স্থান কম নয়। রামানন্দ, কবির, ভুল্লসীরা প্রকৃতি ভক্তগণ বারানসীর সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উপরন্তু নানক, চৈতন্য প্রকৃতির ধর্মবিশ্ববদের সহিত বারানসী জড়িত ছিল। কবির বারানসীকেই তার স্থানধার উপরুক্ত স্থান বলে মনে করেছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে যদিও মুসলমান রাজত্বকালে বারানসীর উপর দিয়া প্রবল ধ্বংসের স্রোত বহে গিয়েছিল তথাপি তাহার ঋতু ও সংজ্ঞাতিক ধ্বংস করতে পারেনি। কিন্তু মুসলমান রাজত্ব আর বেশী দিন স্থায়ী হইল না।

তাই অষ্টাদশ ও পরবর্তী শতাব্দীতে বারানসী আবার হিন্দু রাজার অধিনে আসিয়া পড়ে। বর্তমান কাশীরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্বামসুদ্রাম ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা নবাবের নিকট হইতে কাশীরাজ্য জমিদারী হিসাবে গ্রহণ করেন। তাহার পুত্র বলভদ্রসিং কিন্তু অযোধ্যার নবাবের অধিনে থাকতে অস্বীকার করেন ও স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলেই নবাবের সহিত কাশীরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কাশীরাজ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গের সহিত নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষমকা- হইয়াছিলেন।

এই সময়েই যে মহারাষ্ট্রগণ (বখারী) বঙ্গদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিল তাহারাও কাশীরাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। তাহাদের উদ্বেগ ছিল বারানসীর পূর্ব দৌরব ফিরাইয়া আনা। যে সব মন্দিরগুলি মুসলমান নৃপতিগণ ধ্বংস করিয়াছিল, সেগুলির পুনরুদ্ধার সাধন করাই ছিল তাহাদের একমাত্র কামনা। এই কাসিক বাসনা নিয়াই তাহারা অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করিয়াছিল রোহিল্লাদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে কিন্তু (১৭৫৫ খৃঃ) বারানসী বা কাশীরাজ ইংরেজ বণিকগণের অধিনে আসিয়া পড়ে এবং মহারাষ্ট্রগণ অনেক আবেদন নিবেদন জানাইয়াও প্রথমে বারানসীর পুনরুদ্ধার কার্যে রূতকালা হইতে পারেন নাই। ইংরেজগণ এই অসুস্থতি দিতে সব সময়েই অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার ফল তাহারা অসুস্থতি পাইলেন এবং বারানসীর প্রাচীন ঐশ্বর্য ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াসী হইলেন। বর্তমান বারানসী রা কাশী মহারাষ্ট্রগণকেই কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। বর্তমানের বিশেষ ঐষ্ট্র্য মন্দিরগুলির ভিতর প্রায়ই তাহারা নির্মাণ করাইয়াছেন। অনেক কিশ্বনাথের মন্দিরও তাহাদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। ১৭৭৭ খৃঃ ইন্দোলের রাণী অহোলা বাঈ এই বর্তমান বিশ্বনাথের মন্দির নির্মাণ করান। অপরূপার মন্দির, কাল ভৈরবের মন্দির, সাকী বিনায়কের মন্দির, জেলাকোষের মন্দির, প্রকৃতি মহারাষ্ট্র সেনাপতি ও নৃপতিগণের দ্বারাই

নির্মিত হইয়াছে। উপরন্তু মহারাষ্ট্রগণ গঙ্গার তীরে অনেক ঘাটও নির্মাণ করাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সিক্রিয়া ঘাট, ভৌঁসালা ঘাট, অহোলা ঘাট, প্রকৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোট কথায় বলতে-ইংলে- ইহা বোধহয় প্রকৃতি হইবে না- যে বর্তমান বারানসী তাহাদের রক্তি।

১৭৭০ খৃঃ বলভদ্র সিংহের মৃত্যুর পরে কাশীরাজ্যের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। চৈত সিংহ (বলভদ্র সিংহের অর্ধে পুত্র) এবং মোহিপ সিংহ (কস্তুর পুত্র) এর মধ্যে ঋতু উপস্থিত হইল। কিন্তু মোহিপ সিংহ নালক থাকায় চৈত সিংহ সিংহাসনে লাভ করিতে সমর্থ হন। সেই সময় ঐষ্ট্র ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড়লট বাহাদুর ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বড়লটের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়া চৈত সিংহের সহা বিবাদ উপস্থিত হইল। হেস্টিংস নিজে বারানসী আসিলেন। চৈত সিংহও নিজে হেস্টিংস-এর সহিত দেখা করিলেন এবং তাহাকে ২০ লক্ষ টাকা ও কোম্পানীকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বড়লট বাহাদুর ৫০ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসিলেন। চৈত সিংহের অত টাকা দিবার ক্ষমতা না থাকায় তাহাকে বাধ্য হইয়া অস্বীকার করিতে হইল। ইহার ফলে হেস্টিংস চৈত সিংহকে একটি ছুর্গের মধ্যে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শীঘ্রই এই সংবাদ রাধার সেনাদের কাণে পৌছিল এবং প্রভুত্ব সৈনিকগণ কাল বিলম্ব না করিয়া গঙ্গা নদী অতিক্রম করিল এবং ইংরেজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ লিপ্ত হইল। ইতি মধ্যে কাশীরাজ ছুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া গঙ্গানদী পার হইয়া গেলেন। যে স্থান দিয়া নদী পার হইয়া ছিলেন তাহা আজও চৈত সিংহবাট নামে খ্যাত। ইংরেজ সৈন্যগণ রাজার সৈন্য গণের আক্রমণে বিশেষকৃতি গ্রহণ হইয়া পড়িল এবং অনেক কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিল। কিন্তু হেস্টিংস শীঘ্রই অবস্থা আরও আশে আনিয়া ফেলিলেন এবং বহু ইংরেজ সৈন্য আসিয়া পড়ায়, রাজার সৈন্যগণ আর যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক সৈন্য বন্দীও

হইল। ইহাতে চৈতসিংহ সমুহ বিপদ বৃদ্ধিতে পারিয়া শিক্ষিয়া রাজ্যে পলায়ন করিলেন। কাশীরাজ্য ইংরেজগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল এবং অনেক চৌধুরী ফলে বন্দকবন্দিতে প্রবেশ করিল। ছেইসং মোহিণ নারায়ণ সিংহকে কাশীর রাজ্য গভীতে বসাইয়া দিলেন। মোহিণ সিংহও তাহার পরবর্ত্তি রাজগণ জমীদার হিচাবে ইংরেজদের সহিবে কাজ করিতে লাগিলেন। তাহাদের আভ্যন্তরগণ স্বাধীনতাও ছিল না। বড়লাট বাহাদুর জর্জ মিট্টে মোহিণ নারায়ণ সিংহকে তাহার জমীদারীর মধ্যে কাছা শাসন চালাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। কিন্তু বারাগমী নগরী ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই রহিল। নূতন কাশী রাজ্যের রাজধানী হইল রামনগর। রামনগর গঙ্গার অপর তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান কাশীর রাজ্য আদিয়া নারায়ণ সিংহের পুত্র। তিনি এখনও নাবালক থাকার সিংহদনে আরোহণ করেন নাই।

বারাগমী বা কাশীর ইতিহাস এইখানেই শেষে হইল। এবার বারাগমীর জগৎ বিখ্যাত মন্দির গুলি ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী ঘাটগুলির কথা বলিব। বারাগমীর শ্রেষ্ঠতা রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ পাণ্ডা যায় না। ইহার শ্রেষ্ঠতা শুধু ঋতুগতিক থেকেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বারাগমীর বিখ্যাত ঘাট গুলির সৌন্দর্য্য যে কোন দর্শককে মুগ্ধ করে। এখানে আমরা প্রধান ঘাটগুলির একটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুগণ এই ঘাট গুলিতে গঙ্গাস্নান করা বিশেষ গুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করে। প্রথমেই আমাদের বলিয়া রাখা উচিত যে প্রায় সমস্ত ঘাট গুলিই রাজপুত ও মহারাজ্যের নেতাদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। বারাগমীর দক্ষিণে প্রধান ঘাট হল গাণ্ড ও অঙ্গীর সমুদ্র হলে অবস্থিত

অঙ্গী ঘাট। অঙ্গী সমুদ্র বারাগমীর পঞ্চ মহাভীরের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। ইহার পরেই তুলসীশাখ ঘাট আরো দেখিতে পাই। হিন্দু নারায়ণ গচরিতা কবি তুলসী দাসের নাম আজও ভারতে অমর হইয়া রহিয়াছে। তার নাম অঙ্গুসারেই এই ঘাটের নামাকরণ হইয়াছে। তারপর জানকীঘাটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার পরে কাশীরাজ চৈত সিংহের নাম অঙ্গুসারে চৈত সিংহ ঘাট আজও বিজ্ঞান। ইতিহাসের দিক দৃষ্টে ইহা একটি অগ্নিগ্ন হান। কথিত যে আছে এই স্থান দিয়াই রাজা চৈত সিংহ দ্বর্গ হইতে পলায়ন করিয়া গঙ্গানদী অতিক্রম করিয়া ছিলেন। দণ্ডি ও হুহমান ঘাটে আমরা অনেক লক্ষ্যীদেবের আস্তানা দেখিতে পাই, ইহার পরই কাশীর মহা-শশান ক্ষেত্র হরিশঙ্কর ঘাট। এই ঘাটের উপরই এক ভোম বাস করে। কথিত আছে রাজা হরিশঙ্কর তার সমস্ত রাজ্য মুনি বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া নিজের যে ভোমের নিকট রিক্ত করিয়া ছিলেন এই ভোম তাহারই বংশধর। এই শশান ক্ষেত্রেই হরিশঙ্কর বহু যোগধা করিতেছে। তাহার পরে পেশোয়া নির্মিত রাণা-ঘাট ও অছোলা ঘাট দেখিতে পাই। ইহার পরই বারাগমীর মহা-গুণ্য স্থান দশাশমেধ ঘাটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাই পঞ্চ মহাভীরের দ্বিতীয় তীর্থ ক্ষেত্র। কথিত আছে এখানেই অশ্বমেধ দশভীত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ যে ঘাট নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা আজও মান মন্দির নামে পরিচিত। ইহার উপরে বারাগমীর বিখ্যাত গ্রন্থ, নক্ষত্র পরিদর্শনার্থ যন্ত্রগৃহ অবস্থিত। এখানে ভোরভীরেরে নিজস্ব তৈয়ারী অনেক যন্ত্রের স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পাশেই আমরা সময় নির্ধারণের গ্রন্থ নক্ষত্র প্রকৃতির গতিও অবস্থানের সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার পরেই হল মনিকর্ণিকার ঘাট ইহা পঞ্চ মহাভীরের তৃতীয় ক্ষেত্র। ইহার পরে শিক্ষিয়া নির্মিত শিক্ষিয়া ঘাট ও ভোগলা নির্মিত ভোগলা ঘাট। তাহার পরেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট আছে, এখানেই পঞ্চানদীর সমুদ্র

হল ছিল। বন্দাবন ঘাট, দ্বর্গাঘাট, লালঘাট, প্রকৃতির পর-রাজঘাট। রাজঘাট ঐতিহাসিকদের নিকট একটি অগ্নিগ্ন হান। সম্রাট এখানে অনেক প্রাচীন লক্ষ্যশিল্পের আবিষ্কার হইয়াছে। এখানও পঞ্চানদী গর্বা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা থেকেই প্রাচীন ইতিহাস তৈয়ারী করিবার অনেক মাল্য মঙ্গলা পাওয়া যাবে বলিয়া মনে হয়। এখান থেকেই ডাকফির সেতু আরম্ভ হইয়াছে। এই সেতু থেকে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে আদি কেশব ঘাট অবস্থিত। ইহাও বারাগমীর লক্ষ্যস্থল। বিজ্ঞান। এবং পঞ্চ মহাভীরের পঞ্চম ক্ষেত্র লোহা ঘাট। কথিত আছে যে গহবরাল নৃপতিগণ এই ঘাটেই গঙ্গা দান করিয়া জ্ঞানদ্রুপকে দান করিতেন। এখানও আমরা বারাগমীর মন্দিরের কথা বলিয়া এই লক্ষ্যস্থল বিবরণ শেষ করিব। বারাগমীর মন্দিরের কথা ৬৩ বেশী যে তার বিখ্যাত বিবরণ এখানে হয়ে উঠবে না। আমরা শুধু বিখ্যাত মন্দিরগুলির কথা বলিব। প্রথমে আমাদের বলিয়া নেওয়া দরকার যে বারাগমীর এই মন্দিরগুলি মোটেই প্রাচীন নহে। বেশীর ভাগ মন্দিরগুলি মধ্য যুগের তৈয়ারী। প্রাচীন মন্দিরের সত্যের কাণ আমাদের সজ্ঞাত নাই। মুসলমান পণ্ডিতগণের ধর্ম্ম লীলাই তাহার জন্ম দায়ী। বারাগমীর মন্দিরগুলি যে মধ্যযুগেরই সৃষ্টি তার প্রমাণ পাণ্ডি যিহু মুসলমান সম্মিশ্রিত সৌধ শিল্পগুলিতে। গুরাগেও দ্বন্দ্বাজ সংকট সাহিত্যে বারাগমীর অনেক মন্দিরের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পৌরাণিক বর্ণিত কোন মন্দিরের সহিত বর্ত্তমান কাশীর মন্দিরের কোন সামঞ্জস্য বা স্বরূপতা নাই। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাংয়ের অমণ রোজ হইতে আমরা অনেক মন্দিরের বর্ণনা পাই। তিনি বলেন কাশীরাজ্যে প্রায় ৪০০টি বৌদ্ধ বিহার ছিল। যেসমস্ত বিহারে প্রায় ৩০০০ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। যে মন্দিরের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে গাণী রাজ্যে প্রায় ১০০টি দেবমন্দির আছে এবং ৬৩ মন্দিরে প্রায় ১০ হাজার ভক্ত বাস করিত। এই

ভক্তদিগের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগই শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার বারাগমীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই সহরে প্রায় ২০০টি দেবমন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরগুলি সাধারণতঃ পাথর দিয়াই তৈরী হইয়াছে। ঐতিহাসিক ত্রিপুর ১০০ ফিট উচ্চ একটি দেব মন্দির কথাও বলিয়াছেন। পুঃ ১২৯ঃ ও ১৩০ঃ শাক্যীর অনেক লিপিতে বারাগমীর দেব মন্দিরের কথা বর্ণিত আছে কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দিরের কথা বা অজ্ঞাত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঘাটগুলির উল্লেখ এই লিপিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে মনে হয় যে প্রায় সমস্ত মন্দির ও ঘাট ইহার পরেই নির্মিত হইয়াছে। বিশ্বনাথের আবাসস্থান বলেই বারাগমীর বিশেষ পরিচিত। কাজেই প্রথমেই আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরের কথা বলিব। প্রাচীনকালে ইহা একটা চিত্তাকর্ষক মন্দির ছিল বলিয়াই মনে হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাংয়ের মতে এই মন্দির প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ ছিল। ১১৯৪ পুঃ কুতুবউদ্দিন আইবাক এই মন্দির দ্বন্দ্বিত করতেন এবং ধর্ম্ম শূণ্যের উপরেই আওরংজিব মসজিদ তৈয়ারী করান। এই ধ্বংসের পরে প্রায় ১০০ বৎসর যাবৎ বিশ্বনাথের কোন মন্দির ছিল না। শিলালিপ কোন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত ছিল। পুঃ ১৮শ শতাব্দীতে এই মন্দির পুনঃ নির্মাণ করাইলেন; ৬ বৎসর সেন্টেম্বর মাসে মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য শেষ হইলে শিব লিপ্সু আনাইয়া প্রভীতা করা হয়—এই মন্দির অতি ছোট বলিয়াই মনে হয়। ইহার বর্গক্ষেত্র মাত্র ৫০ ফিট। মণ্ডপের বর্গক্ষেত্র প্রায় ১৪ ফিট ও মন্দিরের চূড়া প্রায় ৩০ ফিট উচ্চ। বর্গক্ষেত্র সিং এই চূড়াকে স্বর্ণ দ্বারা আবরণ করাইয়া বিশেষ দৃষ্টগোচর করিয়াছেন। শিল্পের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা একটি হিন্দু ও মুসলমান সম্মিশ্রিত সৌন্দর্য্যের অলঙ্কার দৃষ্টান্ত। বিশ্বনাথের দক্ষিণে অম্বপুর্বার মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটিও উচ্চাদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। ইহার

জাতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সফল করত

‘ভিক্ষু বণ্ড’

ক্রয় করুন।

আরও দক্ষিণে সাক্ষী বিনায়কের মন্দির। স্থলনিবাগী মন্দির পরিবারের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল। জ্ঞানবাগী মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে আদি বিখনাথের মন্দির আজও বিস্তৃত। লোকো বিশ্বাস করে যে এইখানে আদি বিখনাথের মন্দির অবস্থিত ছিল। তারপর পেশোয়া নিশ্চিত কাল তৈরবের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবগ্রহ ও দণ্ডপানীর মন্দির ইহারই অতি নিকটে। ইহার পরে গঙ্গার তীরে বিষ্ণুমাধবের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটিও সর্দার পরিবার কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছিল। আদি মন্দির কিন্তু বিষ্ণুবাগিনীর ঘাটের উপরে অবস্থিত ছিল। এই মন্দিরটি বোগল নৃপতি আওরংজেব স্বেচ্ছা করিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাস্বত্বের উপরে মসজিদ তৈয়ারী করান। এই মসজিদ আজও বিষ্ণুমাধব মসজিদ নামে খ্যাত। ইহার পরে চূর্ণাঙ্গারের মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। এখানে অনেক বাদরের বাগ তাই ইহাকে লোকে বাদরের মন্দির বলে। বর্তমান মন্দির নাটোরের মহারাণী রাণী ভবানীর দ্বারা ১৮শ শতাব্দীতে নিশ্চিত হয়েছিল। অসী নদীর তীরে সপ্ত মোচনের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে

তুলসীদাস ও বীর হুহমানের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা করা হইয়া ছিলেন। ইহা ভিন্ন বারাণসীর উত্তরে আরও অনেক মন্দির আছে, ইহার মধ্যে বড় গর্গেশ ও লাট তৈরবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌধাখাতে গোপাল মন্দির ও কবির চৌধা মন্দিরে কবিরের স্মৃতি আজও বিস্তৃত। গ্র্যাণ্ডট্রাক রোডের উপর আরও একটি কবিরের স্মৃতি মন্দির আছে। কথিত আছে যে এখানেই দ্বিতীয় কবিরকে তাহার পালিত পিতা পাইয়াছিলেন। ভেলা পুরাতন জৈন-দেব পার্শ্বনাথের মন্দির আছে। এইগুলিই বিশেষ বিখ্যাত মন্দির। ইহা ভিন্ন আরও অনেক দেব মন্দির আছে। এইগুলি বিশেষ খ্যাতিমান। ইহা ভিন্ন আরও অনেক দেব মন্দির আছে। উহাদের বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয় এই মন্দির গুলি প্রায় সবই হিন্দু মন্দির। কোন বৌদ্ধ মন্দির এখানে নাই। বৌদ্ধ মন্দিরের কথা সারনাথ প্রদেশে বলিব, এই সব মন্দিরের সংখ্যা বর্তমানও ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। অসুনা নিশ্চিত মন্দিরগুলির মধ্যে ভারত মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(কম্বা)

প্রিয়ার প্রতি

শ্রীশান্তি ওহ

জীবন পারে আবার কি দেখা হবে?
কামনার কায়া তখনো কি মাথি, রবে?
মনে হয় দেখি সেই দূর লোক
প্রেমের কিরণ ঝলে তব চোখে
তেমনি শান্ত স্নিগ্ধ প্রাণোৎসবে!

হে অসীর সাথী! তোমারি স্মরণে
দক্ষিণ বায়ু করিছে বহন

তোমারি স্মৃতি আমারি হৃদয় ঝলে;

নীলাকাশে হেরি তোমারি বসন
মোহিনী-মায়ায় করিছে বয়ন
স্বপ্ন-কামনা শিশির-অশ্রু-ঝলে!

চলে গেছে দূরে, তবুও তোমারি বাণী
পরানে আমার কাঁপে সে কী গান বানি!

শুভ হৃদয় আজো আছে চাতি,
আজিও তোমারি স্মৃতি অবগাহি

ব্রাহ্ম জীবনে চরম শান্তি মানি।

আধুনিক অতিথি

(গর)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণ করলো কলকাতা থেকে ওসমান এল একবারে
অনিমিত্তে সঙ্গে নিয়ে। আমি নাকে বোরখা নিতে
দেখি নি, থোমটা টানতে দেখি নি, পুরুষের একটা
খাড়াফান পাড়ীতে তুলে টেনে নিয়ে এসেছে এতদূর
অন্তরালের কোমলতা আর ছায়ার লাবণ্য স্নানিয়া সব
তার মুখে গেছে, উড়ে গেছে বাইরের উচ্চাঙ্গল আলো
ও পথের পর-পৌকোষে।

কিছু এছাড়া উপায় কি ছিল ওসমানের! একা
পুরুষ ওসমান কি করে দেখা করতে এতদূর আসবে যেনে
মাঘ রস্তার গন্ধে? কলকাতায় সম্ভব ছিল, পাঁয়ে যদি
কেউ কিছু মনে করে! এদিকে স্ত্রী ছাড়া কাঁকেই বা সে
সঙ্গে আনতে পারে? রুম্মানুর কোন সহকারীকে বললে
স্বচ্ছ দপের যে কোন মেয়েকে সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়া
যেত, কিন্তু সেদিক দিয়ে ওসমান নিরুপায়। ঘর-বোরখা
থোমটা ছেড়ে পথ চলার কষ্ট আমি না সহিতে পারি, অল্প
একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রেলপাড়ী চেপে ওসমানের দূর
দেশ ঘুরে আশাটা তার সহিত না। প্রস্তাব জনেই
আমি না। কীদন্ত, অতিকটে যে গেয়ো ভাষা ওসমান তাকে
প্রায় ভুলিয়ে এনেছে সেই ভাষায় কলহ করত, রাগ করে
হয়তো চলে যেত বাপের বাড়ী, বাপ ভয়ের কোম ও
পরামর্শে সঙ্গীভূত হয়ে হয়তো কঠিন প্রতিশোধ নিত।
বাড়ীতে পৌঁছেই আমি না রস্তার ঘরে আশ্রয় পেল।
রামপাল 'বিদ্যায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল, তাকে
ভাঙিয়ে দেওয়া হল ঘর থেকে। রস্তা ভংগসা করে
ওসমানকে বলল, 'ওকে আবার আনলেন কেন?'
'একটু বেড়াতে এল।'

কলকাতা থেকে মুসলমান অতিথি এসেছে শুনে
বাড়ীতে যে চাকর্য্য দেখা দিয়েছিল, রস্তার কথায় সেটা
কিছু চাপা পড়ে গেল। রস্তা গোড়াতেই সকলকে
আনিয়ে দিল, অতিথিরা এ বাড়ীতে থাকবে ও না
থাবে না।

'কি করবে তবে?'

'সে যা হয় করব' ঘন আমি। শব্দকে ভেঙ্গে-আনো
দিকি ভূমি একবার!'

শ্রীমালার বৌ একটু তফাৎ থেকে বলল, 'কি সব
খিচুটিছাড়া কাণ্ড বাবু পেরন্ত ঘরে! বাপের জন্মে এমন
দেখিনি আর!'

শ্রীমালার মিনতি করে বলল, 'যা না দিদি এবার
কলকাতায় হুই? দেখাই তো, এবার রেহাই দে
আমাদের।'

শ্রীমালার শব্দে যমক দিয়ে বলল, 'ধাক্কা ধাক্কা, ওসব
কথা। রস্তা নিজেই যাবে'খান আজকালের মধ্যে। ওকি আর
জানেনা কলকাতায় যত খুদী পুরুষ মানুষ ভেত্রে মোছন-
মান ভেত্রে টেঁচ করে, কিছু আসে যায় না, পাঁয়ে
একটুতে ঢাক বাজে। রামপাল চটে চটে উঠেছে, এই
তবে না ভর হুচ্ছে মোদের! ওদের কথা হরিস নি দিদি।'

ওসমানদের থাকবার ব্যর্থতা হল গারের জোতদার
হাকিম আলির বাড়ীতে। শব্দই ব্যবস্থা করে দিল,
শাফকের মারকতে। বাড়ীতে অতিথি এসে হাকিমের
মুখ হাসিতে ভরে যায়, কি দিয়ে অতিথির মান
রাখবে ভেবে পায় না। তবু পোড়ায় সে একটু ঝিঝা
করেছিল।

'মাছটা কেমন তা মাগুম হয় না ঠিক। বিবির
মোটে পর্দা নাই ওসমান!'

শব্দ বুঝিয়ে বলেছিল, 'কলকাতার লোক যে আমি
সাব'। কলকাতায় কি পর্দা আছে? আর মোটে
একটা কি ছুটে দিন তো থাকবে।'

চারিদিক ঘেরা বাড়ীর অন্ধরে গিয়ে পরিচিত
পারিপার্শ্বিক আমি না হাঁক ছেড়ে বাঁচল। অন্ধরে
অন্ধরে যেয়েদের পর্দার বিচ্ছেদ সচেতন করে তুলতে
ওসমান আজকাল তাকে দিবারাজী জপায়। হাকিমের

অন্ধরের নিবৃত্ত পদ্য আর সব কুলে গিয়ে সে পরম
আগুছে আড়াশ খুঁজে নিল।

রক্তার সঙ্গে গুণমানের ভাল পরিচয় ছিল না,
কিন্তু একদিন কেবল অল্পসময়ের জন্ত দেখা
হয়েছিল। সুমিরিয়ার ব্যাপারটা সে ভাল করে বুঝতে
এসেছে।

‘হীরেশবাবু বলে নি?’
গুণমানের চোখে বিভ্রান্ত দেখা গেল। ‘হীরেশবাবু?
চোখের বসে লিখছিলেন, মুখ তুলে আমাকে দেখে বললেন,
কে? গুণমান? কি জাই? আগে এমন করে
বলতেন, জান-পরহান হ’বার আগে। এই তো যেদিন
আমার ঘরে গেলেন, দোকতের মত কথা বললেন, স্ত্রীর
সাথে আলাপ পর্যায় করিয়ে দিলাম। কাঁটা দিনে
স্নেহ তুলে গেলেন সব। বাবুলোক ওরা, বাউ গিয়ে
দোস্তি করেন আর দশ বশি রোজ বাড়ে খিলাপ করেন,
সেলাম না দিলে গোশ হয়। আমি স্টান বেড়িয়ে
এলাম।’

তবে, অজ্ঞের কাছে কম ও বেশী সব কথাই
প্রায় সে শুনেছে। কিন্তু সব শোনা কথা একজু করে
তাল গোলা পাকিয়ে হুর্সোঁধা হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা
তার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা করতে পারছে না। তারপর
রক্তাও এলা গিয়ে বসে গেছে মেরেশকে নিয়ে, এটাও
হুর্সোঁধা ঠেকছে তার কাছে।

রক্তা তাকে সব শুড়িয়ে বলল, তুনে গুণমান উত্তেজিত
হয়ে উঠল। ‘কেইবাবু এমন বুদ্ধি করলেন? চেঁড়া
দিয়ে গুন করতে চাইলেন?’

‘গুন না ছাই। সব ওর চালাকি। একবারটিকে উ
গুন কথাটি তার মুখে শুনেছে? সবাইকে বলেছেন,
দল বেঁধে শোভা যাত্রা করে গিয়ে হেরথ বেটাকে শাস্তি
দেবেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, জবাব দিয়েছেন, আমার
মনের মত শাস্তি দেবেন। আমি ভেবেছি, তবে আর
কি, হেরথ নিকশ হল। আজ টের পাছি গুণমান ভাই,
ওসব সাথ কেইবাবুর মোটেই ছিল না। নিজে গুন হবার
মন্তব্য ছিল ওনার। চেপায় এসে কেমন যেন হয়ে

গেছলেন। একেবারে যেন ভিন্ন মানুষ। দিনরাত জু
ছাড়া-ছাড়া কথা কইতেন।’ আমি ভাবতাম—বুধি উপায়
ঠাওরাচ্ছেন হেরথকে নিকশ করবার।’

হেরথের প্রতি রক্তার গভীর বিতৃষ্ণা অমুভব করে
গুণমান আশ্চর্য হয়ে গেল। রক্তার বক্তব্যের মধ্যে
কিন্তু এই বিতৃষ্ণার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না।
হেরথকে গুন করবার বললে নিজে গুন হয়ে হেরথকে
ভয়ানক শাস্তি দেবার পরিকল্পনাও যদি কখনো করে
পাকে, এই উদ্ভট অস্বাভাবিক মহত্বের ভাঙ্গর চাপে
রক্তার তো শঙ্কাভাজিতই আরও গদগদ হয়ে উঠবার কথা।
চিন্তিত হয়ে পড়লে গুণমানের মুখে, বিশেষ করে
তার চোখে, চিরদিন একটা আশ্চর্য শাশ্বতাবের ছায়া
পড়ে। এমন সেটা নজরে পড়ায় রক্তা চটে গেল।

গুণমান হীরে হীরে বলল, ‘তা বোধ হয় নয়।
কেইবাবু অজ কথা ভাবছিলেন। তার পক্ষে মিছামিছি
একটা গুন করা—’

রক্তা তাঁর দৃষ্টিতে গুণমানের চোখের দিকে তাকিয়ে
কুজ বিভ্রণ-বিতৃষ্ণার হয়ে বলল, ‘মিছামিছি! হেরথ
আমার ব্যাপকে গুন করে নি?’

জবাবে গুণমান গুচ মুচতার হয়ে বলল, ‘তা জানি।
বড় আপশোষের কথা।’ ভাবলে বড় খা লাগে মনটা।
তবে কি না, দেশ আর দেশের কাছে যদি না লাগে তো
হেরথকে গুন করে লাভটা কি বলেন? নিছক গুন
বলে লোকে জানবে, বলবে যে গুনবারাণি করে
বেড়ায় কেইবাবুরা, ওরা বজ্জাত লোক। সুমিরিয়ার
একটা হেরথকে মারলেই কি চলবে আমাদের, কাঁটা
বনের একটা কাঁটা তুলে? কেইবাবু আলবাম এমন
একটা উপায় ঠাওরাছিলেন যাতে কাঁটাটা তুলতে
গিয়ে বহুত লোকের পায়ে কাঁটা কুটিয়ে বিতে
পারেন।’

কাঁটাবনের উপমাটা রক্তার শোনা ছিল। কার
কাঁড়া শুনেছে মনে নেই। এই একটা শোনা কথা
সঙ্গে আরও অনেক আনো কথা তার মনে পড়তে
লাগল। কিন্তু চিন্তাকে গুপথে বেতে না দিয়ে বজ্জ

‘অবচেতন মনের যৌন ভাগিদে আজকের মানুষ কেন মানুষের উদ্ভাষণ্যাত্র—

হুয়ড-প্রমথের পুথিতে আমরা পড়েছি, মানিকবাবুর উপস্থানে

যেন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাতি। তাই বলে মনোবিকলনের

মন্তব্য উপস্থানের ফ্রেমে এঁটে মানিকবাবু

বাঙ্করে চাউনেন না। কারণ পুথিগত বিজ্ঞের

পক্ষপাতী তিনি মতি নন, তা ছাড়া

প্রধানতই তিনি পাকা ঔপন্যাসিক।

তার লেখা তাই সেরা দরের সাহিত্য,

মনস্তত্ত্বের তথ্যমাত্র নয়।

সবচেয়ে অবাধ লাগে কত ব্যাপক

ক্ষেত্রে কি অনায়াসে তার আনাগোনা!

‘পদ্মানদীর মাঝি’ বা ‘পুতুলনাচের

ইতিকথা’ আর ‘চতুর্কোণ’ বা

‘অমৃতকু পুত্রা:’, ‘সহরতলি’ আর

‘দিবসাত্তির কাব্য’, ‘প্রাগৈতিহাসিক’

আর ‘অতসীমামা’—এ সমস্ত বই-এর লেখক

একই ব্যক্তি কেমন করে হয়? জেলেদের

জীবনের রূঢ় বাস্তবতা আর কোলকাতার সৌখিন

‘ফুরফুরে মেয়ে, মজুরদের নোরা বস্তি আর কোমল স্তনের

মধ্যবিত্ত রোমাটিক আবহাওয়া—সর্বত্রই তিনি সমান সহজ

আর সমান নিখুঁত। আর সর্বত্র চেয়ে দেখছেন সামাজিক মেকি

চলমাটা খুলে—মানুষগুলো এলোমেলো, ব্যাপছাড়া আর ভাঙচোরা।



লিখবার জন্ত কী কালি মানিকবাবু ব্যবহার করেন এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়।

মানিকবাবু ব্যবহার করেন—পার্ক ইন্ক। বলেন—“পার্ক ইন্কে লিখে দেখছি

কালি বেশ ভাল। দামী বিদেশী কালির বদলে এই

কালি ব্যবহার করতে কিছুটা অসুবিধা বোধ করছি না।”

মন্তব্য গুণমানের

Sanco's CASTOL



Best Scented & Medicated Castor Oil
Conducive to luxuriant growth of Hair.



শোভন দেশের প্রসাদনে
—বর্ধে—গন্ধে অকুলনীয়
সুপরিশুদ্ধ নারিকেল তৈল।

ডিপোহ্রা

Products of
SANCO CHEMICAL WORKS
11 GANGAPRASAD MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA.

১৩৫০]

জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাপকে যদি কেউ গুন করত ভাইগান?'

'ওসমানের জোখে আবার বিদ্ভাতের স্বলক খেল গেল। সোজা হয়েই সে কসেছিল, আরও গিনা এবং শব্দ হয়ে গেল দার দেহ।

'বাপকে যদি গুন করত? হারামিকে জবাই করে ফাঁসি যেতাম।'

'জবাই করতেন? ফাঁসি যেতেন?'

ওসমান মুগ্ধে পড়ল, শিথিল হয়ে গেল। যেয়ো অশিক্ষিত মন যেন তার অচেনা অজানা পথের মক্কেল পুলকে বিশ্বাস করে সেই গুল ভেঙ্গে বাদে পড়ে গেছে। রীতিমত চোট যেন লেগেছে তার দেহে।

'না জবাই করতাম না, ফাঁসিও যেতাম না। খুনের বাড়ি শাস্তি দিতাম, নয় ত যেভাবে হোক গুন করতাম। নিজে না পারি, শুভাককে, ডাকাতকে টাকা দিয়ে গুন করতাম।'

শোনামাত্র রম্ভা যেন একেবারে বদলে গেল। আশ্বাস করে বলল, 'দিন না একটা শুভা বা ডাকাত ঠিক করে আনাকে?'

না, সেটা সম্ভব নয়। এ গায়ে বা গায়ের কাছাকাছি জগমান কাকে চেয়ে যে হেরেখক গুন করার জন্ত রম্ভাকে লোক এনে দেবে! কলকাতা হলে সহজ হত।

'কলকাতা থেকে আনিবো দিন? অনেক টাকা দেব। হীরেনবাবুকে জানালেই এক হাজার চ'হাজার বা দরকার হয় পারিয়ে দেবোনা।'

না, তাও সম্ভব নয়। হেরেখক গুন করতে কলকাতার কোন গুনে কোন লোভে এখানে আসবে না। হেরেখের মত লোককে গুন করার কুঁজি অনেক। বাইরের লোক এসে কাজটা করলে সহজে দর পড়ে যাবে।

অপরূপে মুসলমান পাড়ায় ওসমান একটি মিটিংএর আয়োজন করেছিল। নিজেই সে পাড়ার কয়েকটি লোককে বলে এসেছিল। জ্যেতবেই প্রায় জিজ্ঞাসা করেছিল সে কোন পার্টর লোক, কোন বিষয়ে সে বলবে? ওসমান বলেছিল সে কোন পার্টর লোক

[আধুনিক অতিথি

নয়, এই যে সব ভাঙ্গা কুড়ের তার-ভাইরা কষ্ট পাচ্ছে কিসে তার প্রতিভার হতে পারে সে বিষয়ে কিছু বলবে।

নতুন পড়ে ছাওয়া মাটির পলস্তারা দেওয়া একটি দাঁড়ীতে মনস্তর সায়ের বাস করেন। তার বয়স-চল্লিশের ওপরে। দেহটি বেশ জমকালো, মুখখানা ভারি। সামনের প্রশস্ত বারান্দায় কাম্পা চেয়ারে' হেলান দিয়ে আলপোলায় ঘুমপান করতে করতে তিনি একটি উদ্ভূ ববরের কাগজ পড়ছিলেন। ওসমানকে সমাদর করে বসিয়ে তিনিই জেরা করেছিলেন সকলের চেয়ে বেশী; ওসমান যে কি বাক কিছুতেই যেন তিনি বুঝতে পারছেন না।

'কাকে লিয়ে কি করবেন?'

'চাখী মজদুরকে ভুল সমঝে দেব। চাখী মজদুর লিয়ে কেপিটাগিলি বাস্তিলা করবে।'

'হিন্দু মুসলিম চাখী মজুর?'

'আলবৎ!'

'হিন্দু মুসলিম মিলনের বাত বলবেন মিটিংয়ে?'

'না। লেকচার দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মিলন হবে না—হতে পারে না। আমি যা বলব সমঝে নিলে আপুগে মিলন হয়ে যাবে।'

'কংগ্রেস, লীগ এসবের কি হবে?'

'কংগ্রেস, লীগ, কমুনিষ্ট, লেবার সব এক হয়ে যাবে। কপাটা সমঝে গিন। পাটি বাদে'র তরফের তারা সব চাখী মজদুর। কেপিটাগিলি মার খেলে একটার বেশী পাটি কাকে লিয়ে থাকবে?'

ওসমান বিদায় নিলে মনস্তর বিস্তৃত দুটিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তার গায়ে এসে তার লেবারদের এ ছোকরা কি বোঝাতে চায় কে জানি। বড় আপশোষ হয় মনস্তর সায়েরের সহরে থেকে একটি মুসলমান ছেলের মাথা এমন বিগড়ে গেছে যে স্পষ্ট করে কিছু ভাবতে পারে না, বুঝতে পারে না, এটা তার ব্যক্তিগত ক্ষতির মত মনে হয়। নিজের বিশ্বাস নিয়ে যে চলবে, সেই তো মাছর! এ ছেলোটর বিশ্বাস নেই। কোন বিশ্বাস নেই। এ এক আজব কীর, না

হিন্দু না মুসলমান। ইয়া আত্মা, এরা ভারতের
স্বাধীনতাকে 'অপরাধ'—চলিশ কোটি হিন্দু-মুসলমানকে
শেষ করে রাখবে!

আজকাল ভাষিতে মনস্কর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।
অপরাজে আমিনা ও রক্তাকে নিয়ে ওসমান নিষ্টি-
করতে গেল। বটপাছ তলার হাজির হবার আগেই
দেখা গেল নিউয়েকে কেউ আসে নি, আট দশটি ছোকরা
কিত্ত, কিত্ত, খেলছে। দেখেই ওসমানের মেজাজে আঘাত
ধরে গেল। কাকে অপরাধী মনে করে কি ছাড়াই
ওসমান বাহাত বলা যায় না, কারণ তার মুখ দেখেই
আমিনা তরুণী লতার মত চুটি হাতে তার বা হাতটি
জোরে চেপে ধরল।

'হেঁজু দে। কোন শালা শূয়ারকা বাচ্চা বেইমানি
করেছে যেনে আসি।' কিন্তু আমিনা তাকে চেনে,
এ অবস্থায় তাকে সে কি ছেড়ে দিতে পারে! এদিকে
রাগটা ওসমানের, আজ বড় বেশী চড়ে গিয়েছিল।
বহুরার আমিনা তাকে হাত ধরে আটকাতে গিয়েছিল,
আজ 'পারল না। ওসমান হেঁচকা টান দিয়ে হাত
ছাড়িয়ে দিল আর আমিনা সেই টানে মুখ ধুড়ে পড়ে
গেল মাঠের ঘাসে।

রক্তা নড়ল না, আমিনাকে তুলবার চেষ্টা করল না।
'ছি তাই সাব, ছি!'

আমিনার বিশেষ কিছু হয়নি, একটু ব্যাধা দেগেছে,
আর নীচের ঠোঁটটা সামান্য কেটে গিয়ে একটু রক্ত
পড়েছে। আমিনাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রক্ত
দেখে ওসমান মাথা হেঁট করল। হেরথকে পর্যন্ত ভুলে
গিয়ে রক্তা মুমূর্ষুভাবে তাকিয়ে রইল ছুজনের দিকে
শিহরণ বহঁয়ে বহঁয়ে করে সমস্ত শরীর তার ছত্র ছন্ন করতা
লাগল। আমিনাকে নীচের ঠোঁট চুষতে দেখে রক্তা
সচেতন হয়ে উঠল, আগর শিহরণ ও রোমাঞ্চ খটতে না
পারায় শরীরটা তার ক্রমশ করতে লাগল।

'কিরে চলুন ভাই সাব।'

চলতে আরম্ভ করে রক্তা ও আমিনা এগিয়ে গেল,
ওসমান একটু পিছিয়ে পড়ল, হুত দর্শক। আমিনা

মুখ কাতর কণ্ঠে রক্তাকে বলল, 'মাখায় কাপড় দেব রিহি।
নায়েয়ে মরে যাব। ওকে একটু বলা।'

'বলতে হবে না। তুমি মাখায় কাপড় দাও।'

'না, রিহি। ওকে একবার পুছ করে দাও।'

'পুছ করতে হবে না।'

রক্তা নিজেই চিবুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে আমিনার
মুখ আড়াল করে দিল। হাত দিয়ে ঘোমটা একটু ফাঁক
করে ধরে পথ ধরে আমিনা চলতে লাগল।

রোদের তেজ তখন শুষ্ক ঘানিকটা করে এসেছে, বেলা
ছুরোয় নি। গুনে ভাড়া করে হেরথকে নিকেশ করার
উপায় জেনে মনটা রক্তার উৎসাহী হয়ে আছে, দেহের
অস্থিরতা তাকে সেই উৎসাহ নিয়ে পরিকল্পনা করতে
দিচ্ছে না। তলপেটে একটা উৎকট বিতৃষ্ণা নড়ে চড়ে
ঠেলে উঠে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।
বাড়ী গিয়ে একবার বসি করতে হবে। সেটা সামান্য
ব্যাপার কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার তাকে সজাগ
করে দিয়েছে। হত্যার মত ভয়ানক একটা বাস্তব
ঘটনাকে সম্মত করতে চেয়ে চারিদিকের আর সব
বসবস্তা সে ভুলে গিয়েছিল। এই গায়ের মেয়ে সে,
তাকে দেখলেই আজকাল গায়ের ছোটবড় অনেকগুলি
চেনা লোকের গভীর চিন্তাক্ষণা দেখা দেয়, জেনেও সে
যেন কটা দিন তা জানতে পারেনি, জানতে পেরেও
গাছ করে নি। আজ পদে পদে সে অস্বস্তি বসতে
লাগল, ছেড়ার ফাঁকে ঘেমেছি চোখ আর ঘরের বাইরে
পুরুষের চোখ বিস্ময়িত হয়ে তাকে দেখছে, একত্রিত
মাছেরের গা টোপাটোপি করে হাসছে, কেউ ছড়া কাটছে,
কেউ হুস করে ডাকছে 'রক্তা বিলো—!'

পাণালির মত চেহারাটা কি হয়েছে তার কবিন
চুলে ভেল না দিয়ে আর সময় মত চান না করে ভাত
না খেয়ে?
ওসমানদের নিয়ে সেদিন আরেকটা মুঞ্চিল হল।
হাফেজ আলি রবিনয়ে গভীর ছুপের সঙ্গে ওসমানকে
জানাল যে তাদের সে আর ঘরে থাকতে পারবে না।

[শেষাংশ ১৮৬ পৃষ্ঠায়]

মুন্ডের প্রান্তে ভারতবর্ষের যে অবস্থা ছিল, বর্তমানে
খাম্বাশাশকার দিক দিয়া তাহার অনেকটাই উন্নতি
হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিপদ এখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই।
ভারতের পূর্বসীমান্তে জাপান উজ্জতারা। আরাকানের
লড়াইয়ে মীমাংসাজনক কোনো কিছু ব্যাপার ঘটে নাই।
ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গণ এখনো বেলা হয় নাই; এবং
কেবলমাত্র আকাশ-মুন্ডের মাফল্যে কোনো পক্ষেরই
নিশ্চিত জয়ের সম্ভাবনা বোধকরি নাই। সম্মিলিত
বাহিনী আজও রোমের এপারে; প্রায় অর্ধেক ইটালিতে
জার্মানরা অপরাধমত ভাবে মোতায়েন রহিয়াছে।
রাশিয়ার হৃদ পূর্বসীমান্ত এ-পর্যন্ত সোভিয়েট বাহিনীর
হাফে আসে নাই। অত্বের কথা ধরে থাক, স্বয়ং চাঙ্কিল
আহার একটা ভাষ্যমে বলিয়াছেন যে চুয়াশিশ সালের
মধ্যেই যে সম্মিলিত শক্তি একটা বড় কিছু জয়লাভ
করিতে পারিবেন এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী কিনি করিতে
চান না; চুয়াশিশ সালের মধ্যেই মুন্ড জয়লাভ এখনো
অনিশ্চিত। স্বতরাং মনে হয় ভারতবর্ষের ছুর্ভোগ এখনো
যেনক বাকি আছে।

এক্ষেত্রে ভারতীয় নারীদের কতব্য কি তা লইয়া
আলোচনা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

আমাদের দেশে মেয়েরাও যে মুন্ড যোগ দিয়াছেন
তাঁহার কিছু কিছু নির্দেশনে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য
এবং ইতিহাসে পাওয়া যায়। যোদ্ধা নারীর কথা
বর্ণিত আছে। মহাভারতে নৃপিতথের নারীরাশ্বের
বধা আছে, মহাবীর অর্জুনকেও সেখানে বিব্রত হইতে
হইয়াছিল। অশ্বমেধ পৌরাণিক ইতিহাসে ব্যতীত
অপরোক্ষত আধুনিক ইতিহাসেও ভারতীয় নারীদের
বীর্য কাহিনীর অভাব নাই। চান্দবিন, রাণী কর্ণবতী,
রাণীর রাণী লক্ষ্মীনাথের নাম শিশুও জানে। স্বতরাং
অধিক নজির লওয়া না দেখাইলেও চলে। তবে যে
বীরদের প্রকাশ কেবল মাত্র মুন্ডক্ষেত্রেই দেখা যায় না;

মুন্ডক্ষেত্রে নানা কাজের মধ্যেও দেখা যায় তাহার কোনো
অবকাশ প্রাচীন কালে বিশেষ ছিল না। অথচ শোনা
যায়, বীরপত্নীসম নিজেদের তুলের দড়ি পাকাইয়া স্বামীর
পশুকে ছিল পরাইয়া দিয়াছেন, শতছত্ত শত হতবীর



বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতীয় নারীর কতব্য

আশঙ্কায় মুক্তাপণবদ্ধ পতির শানিত বস্ত্রা নিজের মুণ্ড
উপহার দিয়াছেন; কিন্তু সেকালে যুদ্ধের এমন উত্তেজনা-
সর্বতো প্রসারী বিস্তার ছিল না। এখনকারকালে পশুপ
যুদ্ধও সেই প্রাচীন উদ্ভাসনা বিশেষ নাই। স্বতরাং
বর্তমান ভারতীয় নারীদের কতব্য একটু কঠিনতর হইয়া
দাঁড়াইছে।

তরুণ বর্তমান যুদ্ধে এমন বহু কাজ আছে যাহা
ভারতীয় নারী অনায়াসেই করিতে পারেন। বহুসংখ্যক
ভ্রমরমণী এ সকল কাজে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু অবিশিষ্ট
প্রাচ্যমনোভাবাপন্ন নারীদের এ সব ক্ষেত্রে দেখা যায়
না। অথচ কোমলস্বভাবা মেহমতী রমণীর কতব্যের
মধ্যে পড়ে এমন কাজের কিছুমাত্র অভাব নাই। যে
সকল নারীর গৃহ-ভার কম অথবা একেবারেই নাই,
তাহারা অনায়াসেই আত্ম-সেবার স্রত গ্রহণ করিতে
পারেন।

বর্তমান যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, বিদেশের মেয়েরা কী
পরিশ্রমে আপন আপন স্বদেশের জন্ত আত্মত্যাগ
করিতেছেন। রাশিয়ায় তাঁহাদিগকে প্রথম প্রথম
একভাবে দৃষ্টি যুদ্ধের কাজে লগাও হইত না বটে, কিন্তু

অনুনা তাঁহাদেরই আগ্রহাতিশয্যে রাষ্ট্রনিয়ামকেরা তাঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজেও ভুক্তি করিতেছেন। তাঁহারা এখন কেবল ইঙ্গিপাতালের নাস' নম, অথবা কলিগ্রি বৈষ্ণবশ্রমিক নম; পদ্ধতিক চ্যাক-বাইশীর এবং বিনান চালনার ভারও তাঁহাদের অনেকে লইতেছেন। ইঙ্গিনিগাজের অল্পত যুদ্ধে রাশিয়ান নারীগণ যে অল্পত সৌখ্য দেখাইয়াছেন অগতের ইতিহাসে তাহা চিরদিনই বিশ্বস্বের স্মৃতি করিবে।

কুবল রাশিয়ায় নহে, চীনেও নারীরা পুরুষ-সৈনিকের সমস্ত কার্যভারের অংশ গ্রহণ করিতেছেন। সামরিক চিকিৎসাকেন্দ্রে তা প্রায় তাঁহাদের একচেটিয়া ব্যাপার। ইহা ছাড়া বিনান চালনার ভারও তাঁহারা অনেক গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। এই ভীষণ যুদ্ধে চীন এখনও তাহার লোকশিক্ষা প্রসারের কমপদ্ধতি স্থগিত রাখে নাই; কারণ জনমত-পঠন যুদ্ধের দেশের একটি প্রধান আবশ্যক কাজ; চীনা শিক্ষিত নারীরা সাগ্রহে এই কাজ হাতে লইয়াছেন। পেরিলা সৈন্তদিগের আশ্রয় এবং আহার দানের চীনা রমণীরাই ব্যবস্থা করিতেছেন; জাপান-অধিকৃত অঞ্চলেও ইহারা গোপনে গোপনে নিজ নিজ সামর্থ্য-স্বস্তারের দ্বারা চীন-সৈন্তদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রস্বস্তারের কিছু কিছু অংশ জোগাইতেছেন।

ইতালীও এবং আমেরিকাতেও নারীরা বলিয়া নাই। স্রাজ তাঁহাদের বিলাসের দিন অতীত হইয়াছে। এমন কোন কারখানা বা ব্যবস্থাপাণ নাই যেখানে তাঁহারা অংশে না করিয়াছেন এবং প্রায়শ্চিত্ত ভাবে কাজ না করিতেছেন। এমন কি, যে হিটলার একদা নারীদিগকে আপন আপন গৃহস্থালীর গভীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে

চাইয়াছিলেন, তিনিও লোকাভাবে এখন আবার উদ্ভূত পাইয়াছেন।

আমাদের দেশে নারীদের অবস্থা সমুখে যুদ্ধের কমে আশ্মনিয়োগের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এখনও বেকার অথচ সক্ষম পুরুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে কিছুমাত্র কম নয়। তবুও তাঁহারা অনেক কাজ করিয়া মুখ্যভাবে বর্তমান যুদ্ধের এবং শৌণভাবে দেশের সেবার আশ্মনিয়োগ করিতে পারেন।

যে সকল মেয়েদের সংসার-ভার কম এবং এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার আচর অবসর আছে তাঁহারা সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের দেশের জনশিক্ষা সমিতি পঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে অশিক্ষিতা গ্রামবাসিনীদের সচেতন করিয়া তুলিতে পারেন। তাহাদিগকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর দিলে এবং সংযমক কেশের মহান আর্পে তাঁহাদের সমুখে তুলিয়া ধরিলে, দেশের এই নিম্নেষ্ঠে জগৎসমূহ ভার অনেকটা লঘু হইবে সম্ভব নাই। নৈরায় এবং দারিদ্র্যজনিত 'আলস্ত-জড়তা'য় আপাতদৃষ্টিতে সামান্য অথচ কার্যক্ষেত্রে পরম উপকারী বহু পথ আমাদের দেশে উৎপত্তি। শিক্ষিত রমণীরা অনায়াসে সেগুলির সমুদে ইতর সাধারণের দৃষ্টি পুষিয়া দিতে পারেন।

অপচয় নিবারণ এবং অধিকতর কাজ উৎপাদন এই দুইটিই আমাদের চির-দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে বহুলপ্রচারে অর্পণ্য রাখে। না বাইয়া ফেলিয়া দিলেই যে বাজারে অগচ্ছ হয় এমন নহে, —আমাদের দেশের মজুর শ্রেণীও যে অত্যধিক আহার করে একথা একদল স্বদেশ প্রেমিকের কাণে যেতোই কট লাগুক না, এমন নিছক সত্য। এক সের চালের ভাত যে ব্যক্তি একদিনে খাইয়া শেষ করে তাহার অন্ন জোড়ানো করিন। অথচ সাধারণ স্বাস্থ্যের পল্লীবাগানের কেহ কেহ যে একপা আহার ব্যতীত ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ জানা আছে। তাহার যদি ভাত অতো বেশী না খাইয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর অথচ অন্ন পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ করে, এবং বাসা দেশের বহু পণ্ডিত জমিতে তাহা ফলাইবার চেষ্টা করে,

রাস হইলে চালের সমস্তা যে কমে তাহা নয়, দেশের লোকের স্বাস্থ্যও ফেরে। শিক্ষিত মেয়েরা যদি গ্রাম-বাসিনীদের কাছে এ বিষয়ে কিছু হাতে কলমে শিক্ষা দেন তাহা হইলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যে শুধু একটা বড়ো রকম সাহায্য করা হয় তা নয়, দেশের ভবিষ্যৎও কিছুটা স্বাস্থ্যকরিত হয়। সহরের মেয়েরা তো এই বাজারেও নানান ফ্যাশন লইয়া ব্যস্ত; তাঁহারা সকলে আর একটা ফ্যাশন চালু করুন না! নিজ নিজ বাড়িতে, বারান্দায়, রাসে, উঠানে ফল ও সবজির চাষ শুরু করিয়া দিন; হাতে তাঁহাদের নিজদের আর্থিক উপকার নগণ্য হইলেও বহু গরীব এবং মধ্যবিত্ত সংসারের একটা আয়ের পথ পুষিয়া বাইবে সম্ভব নাই। কুমড়ার বদলে আলু, আলুর বদলে বিড়া এইভাবে একটা প্রতিক্রিয়া স্রবত বিনিময় প্রণালীও স্থাপিত হইতে পারে; সামাজিক দিক দিয়া তাহারও একটা মূল্য আছে।

শান্ত উৎপাদন ভিন্ন দেশী উপায়ে হতা-কাটাও একটি জনহিতকর কাজ। আমাদের দেশের কলগুলি নানা কারণে বন্ধের চাছিন। মিটায়া উঠিতে অপারক হওয়ায় বাজারে কাপড় এখন প্রায় অমিশ্রণ। কয়েদের নেত্রী এখন জেলে, স্বতরাং হতা কাটিয়া এবং বন্ধের পুষ্টি পুষ্টির খাতায় নাম উঠিবার আশ্বাস এখন (আশা করি) অনেক কম। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সাহায্যে আবার স্বদেশী কাপড়ের আন্দোলন পুরাদমে চল তাহার উপায়ও শহরের শিক্ষিতা মেয়েরা হইতে পারেন। ইহাতে বস্ত্রসমস্যা-নিবারণের জ্ঞান স্রবত সরকারকে অনেকটা অব্যাহতি দেওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গৃহিণীই ব্যক্তিগত ভাবে গৃহস্থালীর যতগুলি মিতব্যয়িতা এবং দুর্দশতার সহিত সম্পাদন করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় গৌণ কিন্তু অমোঘ সহায়তা করিতে পারেন। বাজারে এখন ঔষধ-পথ্যাদির সমস্ত অনেক দ্রিমিত্যে করিয়া যায়। এইরূপ, বহু আবশ্যক জিনিষ ঘায়র মূল্য এখন পূর্ণাঙ্গীপেকা চালগুণ কি আটগুণ, দশগুণতা এবং বস্ত্রের সহিত বাসন্ত হইলে দীর্ঘতর কাল

ধরিয়া স্থায়ী হয়। তাহাতে বাজার দরও অনেকটা কমাতে সাহায্য করা যায়।

উপরিবিধিত কমগুলি সকল মেয়ের ভালো না লাগিতে পারে। কারণ মাহুগের প্রকৃতি কিছুটা রোম্যান্টিক এবং আভ্যন্তরীণ চায়। তাঁহাদের জ্ঞান রেজকশের সাহায্য দেখাযুক্তি; এ, আর, পি, অপ্রতি নানা দিক খোলা রহিয়াছে। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে nursing এবং এ, আর, পি, মধ্যে কিছু বিশেষ ধরণের ভালোজীব রহস্য-ময়তা আছে; কিন্তু বাহারা জীবনের অধিকাংশ কাল পরাণ সম্ভ্রালে কাটায়াছেন, কিংবা আপনাদের যিদ্ধ গৃহ-সৌখ্য বাইরের জগৎকে ভালো করিয়া চিনিতে পারেন নাই অথচ নিরাপদ ভাবে তৎপরভাবে আলোক লাভ করিতে চান, তাঁহাদের কাছে বহুসংসারের সম্পর্কনাই রোমান্টিক এবং আভ্যন্তরীণরসাকুল বৈ কি! আজ প্রত্যেক দেশের নারীরাই নিজদের ক্ষুদ্র গভী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ইহাতে সকলেরই কিছু, কট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় নাই।

আমাদের রক্ষণশীল, পুত্রবির জগৎসংসারে অনেকেরই একটা অল্পত রাগনা আছে যে বাড়ির বাইরে ভালো মেয়েদের জগত্যা নাই। ইহা যে কতোদূর অবমানজনক ধারণা তাহা তাঁহারা কর্তব্যে ভাষিয়া দেখেন না। তাঁহাদিগকে অন্য যাহাচিত্ত বন্ধনবস্ত্রের একটা কাপা অংশ করাইয়া দিতে চাই যে "খোমটায় স্ত্রীলোকের স্বভাব ঢাকা পড়ে না।" আর ইহা ছাড়া, ভালো পরিবারের মেয়েরা যদি এই কাজগুলি গ্রহণ না করেন তবে ক্রমশঃ অব্যাহতি চরিত্রের মেয়েদের হাতে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ

কালো হরফ

(কাব্য গ্রন্থ)

অমল ঘোষ

কবিতা ভবন, ২০২, রাগবিহারী এডেনউ
মুদ্রা চার আনা।

যুদ্ধে নিশ্চিত জয়লাভের জন্য
ব্যাশনাল সেভিংস্ সাটিফিকেটস
ক্রয় করুন।

গুলি নিম্নলিখিতই চলিয়া যাইবে। তাহাতে কতি
উাহাদেরই।

যে ভাবেই হোক, যুদ্ধের শাস্তি যতদিন না ঘটতেছে
দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরুষদের মতো মেয়েদেরও
মাথা খামাইতে হইবে। নিশ্চেষ্ট আরামের দিন আজ
আর নাই। জাপানের উচ্চতর অস্ত্র ভারতের পূর্ব সীমান্তে

এখনও ভয়ঙ্কর বিশাল ছায়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।
যতদিন পর্য্যন্ত না অন্ধদেশ অধিকৃত হয়, ততদিন
বাংলার তথা ভারতের নিরাপত্তার আশা অর্ভাৎ কী
রহিয়া যাইবে। সৌণ অথবা সুরা ভাবে বুদ্ধচেষ্টার
সহায়ক কই কাজ এখনও অলীক স্বপ্নরসে অথবা অযথা
হুসিভ্যায় বহুমূল্য সময় এবং জীবন ব্যতিপাত করিবেন।

আধুনিক অতিথি

(৪৮২ পৃষ্ঠার পর)

একটা রাজি ও রাখতে পারবে না। বাড়ী থেকে জীবনে
কখনো সে অভিব্যক্তি ছাড়িয়ে দেয়নি, তা যে নিজের
হোক বা শত্রুরই হোক। কিন্তু ওসমানদের আজ ঘরে
রাগলে গিয়ে সে আর বাস করতে পারবে না।
তার মনের কথা বুঝে তাকে যেন মাক করে
ওসমান।

সে যে সত্যই অস্তুরে গভীর হুংবোধ করছে, লজ্জায়
কান্ডার হয়ে পড়েছে সেটা স্পষ্টই বুঝা গেল। ওসমান
সমবেদনা জানিয়ে বলল, 'আপনার কষ্টের কি? মনে
হুংবোধ রাখবেন না।'

হাফেজ আলি বসিক ইতস্ততঃ করে সমস্যাভে জানাল যে
একটা উপায় আছে। ওসমান যদি মনস্তর সায়েবের
কাছে মাপ চেয়ে আসে—

'মাপ চাইব? কিসের লজ্জা মাপ চাইব?'

হাফেজ আলি বিরত ভাবে হাতের তালুতে গাল
ঘনতে লাগল, জবাব দিতে পারলেন না।

সেদিন রাতে নিজের ঘরেই রক্তা তাদের শোবার
বাস্তব করল। হাত তিনেক উঁচু একটা আলগা বেডাক

ঘরের মাঝখানে বাড়ী করে দিল, একপ্রান্তে ঠেকে রইল
ঘরের এককিরের বেড়ায় অজ্ঞানসত্তে দরজার সমান কী
রয়ে গেল। আলগা বেড়ার একপাশে শুল ওসমান ও
রামপাল, অপরপাশে শুল আমিলা ও রশ্মি। আলগা
বেড়ার 'অসম্পূর্ণ' আড়াল তাই যথেষ্ট হয়ে রইল এক
জোড়া পুরুষ ও একজোড়া স্ত্রীলোকের মধ্যে। ওসমান
আমিলা আর রামপাল রশ্মির মধ্যে থাকলে বেড়াটি
ছপাশেই অবশিষ্ট বোধ জাগিয়ে রাখত।

রশ্মির ঘুম আসছিল না। কয়েকরাত্রি এমনিই হচ্ছে
তার, ঘুম আসছে যাকসারজি পেরিয়ে। ওসমানের হুং
আজ্ঞান সে শুনল। আমিনার নিশেধে উঠে যাওয়া সে
ঠের পেল। ছুয়ার ঘূলে রোয়াকে ঠাঁড়িয়ে দুজনের ফি
ফিস আলোপের প্রত্যেকটি শব্দ রাজির শুকতায় স্পষ্ট হয়ে
তার কানে আসতে লাগল। 'ছ'জেনেই যে বাংলায়
সারাদিন কথা বলেছে এখনকার আলোপের ভাষাটা এতই
অন্তরকম। স্বর, টান, উচ্চারণ, শব্দ সমস্তই গানিকতা
ভিন্নরশণের। কিন্তু আশ্চর্য্য রকম মিষ্টি। হুমতে শুনে
কখন যে রক্তা ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রচলিত কাহিনী হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ, বৌদ্ধী
সুতবজ্জি এবং সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সিদ্ধার্থের চিত্তে
জান্নতর খট্ট এবং মানবের এই অবজ্ঞাস্তায়ী হুংব দূর করি-
বার কোন উপায় আছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি
উৎসুক হন। কাহিনীটি সত্য অথবা মিথ্যা বাহাই হউক
না কেন হুংব হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই যে সিদ্ধার্থের
মানো তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। দীর্ঘ-
কাল পরিয়া বহু সাধনার পর বুদ্ধদেব বুদ্ধিলেন যে
বেহাষী মানবের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরি-
ত্রাণ লাভের উপায় নাই। দেহের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ
যথার্থই অবিচ্ছেদ্য। স্বতরাং পুনর্জন্ম রহিত করিতে না
পারিলে মানবকে এই চিরস্থন্ন হুংব ভোগ করিতেই হইবে।
সম্ভাব্য মানবকে এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে
হয় কেন? মানুষ বাসনার দাস বলিয়া। বাসনাকে
মাড়য় কিছুতেই পরিচ্যাপ্ত করিতে পারে না। পার্থিব
হুংব সন্তোষের প্রতি তাহার আসক্তি বড়ই প্রবল। একই
ধীনে মানুষের সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। দেখে চলিয়া
যায় কিন্তু অপূর্ণ বাসনা মনের মধ্যে থাকিয়াই যায়। সেই
অপূর্ণ বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে আবার জন্ম
পরিগ্রহ করিতে হয়। বুদ্ধদেব তাই বলিয়াছেন :—

ভসিয়ার পূর্বকথা পজা
পরি সপ্ততি সগো ব বামিতো,
সকল জোজন গার সত্তকা
হুংবমুপেত্তি পুন পুনং চিরায়।

অর্থাৎ জালবন্ধ শবকের জায় বাসনাসক্ত মহা বারংবার
পড়িতে থাকে। পক্ষ ইন্দ্রিয় এবং পক্ষ বিষয় এই দশ
প্রকার শৃঙ্খলে আসক্ত হইয়া দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ হুংব
প্রায় হইয়া থাকে।

জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংযত ভাবে জীবন যাপন করিলেই
যে মানুষ এই হুংব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে
সেই হুংব হইবে। জিতেন্দ্রিয় হইলে চিত্তের অনেকটা উৎকর্ষ
লাভ হয় সত্য কিন্তু তাহাই হুংব বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট
সহ। হুংবের মূল যে তৃপ্তা বা বাসনা তাহার সম্পূর্ণরূপে
উচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে মানুষ কিছুতেই স্বাধীন শাস্তি বা

বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধ

(ঐতিহাসিক আলোচনা)

শ্রীমদগীশনাথ চক্রবর্তী এম. এ.

কাব্য-বেদ-পুরাণতীর্থ

নির্দোষ লাভ করিতে পারিবে না। মানুষকে হুংব-
ভোগ করিতেই হইবে। তাই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

যথাপি মূল অধুপদবে দলহে
জিহো পি কক্খো পুনরেষ কহতি,
এবম্পি তমহাহসয়ে অনুহতে
নিমত্ততি তুচ্ছমিহ পুন পুনং।

অর্থাৎ যেমন মূল অধুপদ ও দূর থাকিলে বৃক্ষ ছিন্ন
হইলেও পুনরায় অধুপদ ও বৃদ্ধিত হয় সেইরূপ তৃপ্তা
সমুচ্ছিন্ন না হইলে হুংব পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া থাকে।
বুদ্ধদেব তাই স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিলেন যে, 'তৎ হুংবমো
সমুৎকং জিনাতি' অর্থাৎ তৃপ্তার ক্ষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়হুংবকে
জয় করিতে পারা যায় এবং তাহাই নির্দোষ বা মুক্তি
লাভের প্রথম ও প্রধান সোপান।

নির্দোষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কিন্তু মতভেদ দেখা
যায়। নির্দোষ বলিতে আমরা জন্মরাহিত্য বা বেহের
চিরস্থন্ন ধর্মকেই বুঝি। নির্দোষের যথার্থ স্বরূপ তাহা
নয় বলিয়াই অনেক মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের
মতে অনাসক্ত চিত্তের শাস্তিময় অবস্থার নামই নির্দোষ।
বুদ্ধদেব এই নির্দোষের কথাই বলিয়াছেন। তিনি
বলেন—সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হইয়া চিত্তের যাহা কিছু
দীনতা ও কলুষ তাহা সূৰ্জন করিতে পারিলেই মানুষ
এই স্বাধীন শাস্তি বা নির্দোষ পদের অধিকারী হয়। তাই
তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

স্বহং বত জীবাম বেরিনেহু অবেরিনো,
বেবিনেহু মহমসুহ বিহরাম অবেরিনো।

স্বহং বত জীবন আতুরেষ অনাতুরা,
আতুরেষ মহমসেসে বিহরাম অনাতুরা।
স্বহং বত জীবন উম্মকেসে অহম্ভুকা,
উম্মকেসে মহমসেসে বিহরাম অহম্ভুকা।
স্বহং বত জীবন মেসং নো নমি কিঞ্চন,
সীতিভক্তা ভবিস্সাম দেবা আভসসরা যথা।

অর্থাৎ বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরহীন হইয়া স্থখে জীবন যাপন করি, আমরা বিব্রত তাবাগর মহাশয়গণের মধ্যে এস বিষয়শূন্য হইয়া বিচরণ করি। আতুরগণ (অর্থাৎ সোত, বেগ, মোহ, বান প্রভৃতির দ্বারা রিষ্ট) মধ্যে আমরা অনাতুর (কেশরহিত) হইয়া স্থখে জীবন যাপন করি; এস আমরা আতুর মহাশয়গণের মধ্যে অনাতুর হইয়া জীবন করি। (পরশম জগৎ) আসক্ত মহাশয়গণ মধ্যে এস আমরা অনাগস্ত হইয়া স্থখে জীবন যাপন করি; এস আমরা আসক্ত মহাশয়গণের মধ্যে আসক্ত-বিনীন হইয়া বিচরণ করি। আমাদের মধ্যে যাহাদের রাগাদি কিছুই নাই তাহারা স্থখে জীবন যাপন করে। দীপ্তিমান্ বৈরাগ্যের দ্বায় এস আমরা সীতিপায়ী হই।

এইভাবে সর্বপ্রকারে সর্ববিধ আশঙ্কিশূন্য হইয়া চিত্তের সর্ববিধ মানি বা মাগি বর্জন করিয়া মাহু

যখন চরম ও পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারে তখন সে বুদ্ধ বা জ্ঞানী হয় এবং শাস্ত্রময় নির্মাণ লাভ করিতে পারে। কিন্তু চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে আশঙ্কিশূন্য করিতে হইলে, যাহা কিছু কল্পন সঙ্কলই পরিহার করিয়া চিত্তের শুভালোকে এবং জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা চিত্তকে তাহার উপযোগী করিতে হইতে হয়। এই শিক্ষা ও সাধনার কয়েকটি পদ্ধতি স্তর আছে। নির্মাণ লাক্ষের জন্ত সুগত বাসনা জড়িত মাহুকে অষ্টাঙ্গিক মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি?—সম্মাদিট্টি, সম্মাসম্মে, সম্মাদাচা, সম্মাভম্মে, সম্মাআজীবা, সম্মাবারো, সম্মাসতি এবং সম্মাসংখমি এই আটটি। অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সম্যক সত্ত্ব, সম্যক চিত্ত, সম্যক ধর্ম্মাণ্ড, সী জীবিকা, উত্তম চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক জ্ঞান বোধিলাভের জন্ত প্রথম চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। তাহার পরে তজ্জন্ম সম্যক প্রকারে দৃষ্টি ওয়া চাই। গাফা, কাফা, চেট্টাই জীবিকা প্রকৃতি বস্তু এমনতর হওয়া চাই যাহা চিত্তকে শুদ্ধ করে জ্ঞানকে সহায়তা করে। এই জন্ত কিছু হইয়া বৌদ্ধ রসে আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহার পর বোধিলাভের জন্ত সাধনা। বোধিলাভের জন্ত সাধনদ্বীপ, মাহু নামই বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব বহু জন্মের সাধনা বহু তপস্কার বহু পরিশ্রমের পর তবে বুদ্ধ হইতে পারে।

“চরিয়া পিটক” এবং অন্যান্য জাতক গ্রন্থ পাঠের সময় যে বোধিলাভ করিতে হইলে বোধিসত্ত্বকে দশ পারমিতা পূর্ণ করিতে হয়। এই দশটি পারমিতা যথাক্রমে দশটি বিশেষ গুণকে বুঝায়। সেই দশটি বিশেষ গুণ বিশেষ ভাবে অধিগত করিতে না পারিলে বোধিসত্ত্ব পক্ষে বোধিলাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। এই দশটি পারমিতা এইঃ—দান পারমিতা, সীলপারমিতা, নৈবদ্য পারমিতা, অদিট্টান পারমিতা, সত্ত্ব পারমিতা, মেত্তা পারমিতা, উপেক্ষা পারমিতা, বাস্তি পারমিতা, বিসিয় পারমিতা এবং প্রজ্ঞা পারমিতা।

এই দশটি পারমিতার প্রকৃত অর্থ কি? বুদ্ধ, ধর্ম্ম সাধন আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকে সর্গদা মনে প্রতিতে হইবে যে পাখি কোন বস্তুরই উপর কোন ধরার আঁকাজা রাখিতে চসিবে না। কারণ আঁকাজা বাসনাই সকল অনর্থের মূল। তাহাকে জানিতে হইবে যে ভিক্ষুর জীবন জনহিতার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন। তবল পাখি সম্পদ নয়, আপনার দেহ এমন কি আপনার প্রাণ পর্যন্ত জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত বা সন্তোষ রানের জন্য দান করিতে হইবে। তাহার পর সীল বা মনোভাব। প্রাণিস্থ, অদন্ত বস্ত্র গ্রহণ, চৌধ্য, মস্তপান, বয়ল ভোজন, আমোদ-প্রমোদ, বেশভূষা প্রভৃতির উপর মনোনিবেশ সম্যকরূপে বর্জন করিয়া যাহা কিছু চরিত্রের ক্ষেত্র কল্যাণকর তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর চাই ত্যাগ। স্বহৃদোপের যাহা কিছু সঙ্কলই ত্যাগ করিয়া ক্লান্ত সাধন। তাহার পর উজ্জল মহামহেশ্বের সাধনা। তাহার পর সত্যনিষ্ঠা। জীবনে যত ছত্র কষ্ট ও যতই বিঘ্ননা ভোগ করিতে হউক না কেন দৃষ্টি, সত্যভক্তি হইলে চলিবে না। তাহার পর চাই পাখি বহুত্ব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অস্বপুষ্টি। জগৎ ও জীবন মাহু সকল প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এই মূল ভালরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া স্বপ, দুঃখ, নিন্দা, প্রতি প্রতিষ্ঠা সর্ব বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর চাই সহিষ্ণুতা, উৎসাহ এবং প্রজ্ঞা। চিত্তে জয়িয়া স্বহৃদে যেমন আপনার বিজিত লাভ

করে সেই বোধিসত্ত্ব-মার্গচারী ভিক্ষুকে বহু বহু সহ্য করিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া, বহু সাধনা করিয়া তবে বোধিলাভ করিতে হয়। চরিত্রের যাহা কিছু কল্পন, যাহা কিছু মাগি সমস্তই বর্জন করিয়া, পরিত্রা লাভে দেহ ও চিত্তকে বিভক্ত করিয়া জ্ঞানালোকে তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া ভূষিতে হয়। তবেই তিন যথার্থ বোধিসত্ত্ব নামের যোগ্য হয়।

এক জন্মেই এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর হয় না। মাত্র একটি পারমিতা ঠিকমত পূর্ণ করিতে বোধিসত্ত্বের বহু জন্ম কাটিয়া যায়। এইভাবে দশটি পারমিতা পূর্ণ করিতে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এক একটি পারমিতা পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে বহু সাধনার প্রয়োজন। তাই বোধিসত্ত্বের জীবন অতি কঠোর তপস্কার্য পূর্ণ। এই তপস্কার্য সিদ্ধিলাভ করা বড়ই দুষ্কর। জাতকের কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে এই পারমিতা পূর্ণ করিতে গৌতম বুদ্ধেরই পাঁচশত পঞ্চাশ বার জন্মগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এত জন্মের এত পরিশ্রমে, এত সাধনায়, এত ক্লান্ত সাধনে তবে বোধিসত্ত্ব বোধিলাভ করিতে পারে—তবেই বুদ্ধ হওয়া যায়। বুদ্ধ হইলে তবেই মাহু নির্মাণলাভের অধিকারী হয়। মাহু এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াই ছাত্র ভোগের অধিকারী হয়। সেই ছাত্রকে সমূল উচ্ছেদ করিয়া শাস্ত শাস্ত নির্মাণ লাভ করিতে হইলে ঠিক এতখানি সাধনারই প্রয়োজন।

ক্ষণপ্রভা

‘কিংসুক’ (পাটনা)

যে জীবন অতি ক্ষীণ, ক্ষণপ্রভা হইতে ক্ষণস্থায়ী, দুর্দল ভূগণে চেয়ে, কীট হ’লে অম-স্বাধীন,—তারই কত সমারোহ, কত গর্গ, কত পরিপাতি, ছদ্মবীর আভিজাত্যে মিছীদের কত আশঙ্কান।



অতীত

কী দিয়েছ মোদের কুমি তোমার মোরা পুঞ্জ কেন ?
চোখ রাগিয়ে দিচ্ছ ধুক দণ্ডুণ্ডের কষ্টা যেন ।

শাও লিখে গেছেন তুমি তোমার পূর্ণপূর্ণগণ,
ক'রে গেছেন অনেক রকম নিরনিষেধ প্রবন্ধন,

তাতে মোদের লাভ কি তুমি ? একটা কথা অংশ তার
দেছেন মোদের ? পেয়েছি কি আমরা কোন অধিকার ?

তপ করেছেন, সর্গে গেছেন, ছিলেন তাঁরা ধর্মপ্রাণ,
ঈশ্বরের ধর্মশালায় কোণে মিলেছে কি মোদের স্থান ?

এহিক স্থখ কী পেয়েছি তাঁদের অমুগাহের জ্ঞে ?
করেছেন কি রক্মা তাঁরা বিপদে দুর্ভাগের দিনে ?

আত্মরক্ষাই করুতে তাঁরা পারেননিক অপের বলে,
দেশকে স্বাধীন রাখতে তাঁরা পারেননিক তপের ফলে,

দেবীমুক্তি মঠ বা দেউল অত্যাচারীর হস্ত হতে,
রাখতে তাঁরা পারেননিক, পঙ্খ ছিলেন বীরজগতে ।

তাঁরা মোদের কি করেছেন ? মোরাই বরং লাঠির জোরে,
বাঁচিয়ে তাঁদের রেখেছিলাম গ্রামকুটীর বন্ধে ধ'রে ।

হিন্দু নামে চলিছি মোরা, হিন্দুজাতির শার যা পুঁজি
একটি কথাও পাইনি মোরা দেখছি আপন জীবন পুঁজি ।

তাঁদের যুগা নাথায় ধ'রে আমরা নিরক্ষরের দল,
যুগিয়ে দিতাম তাঁদের পুজায় চালকলা আর গঙ্গাজল ।

তাঁদের ব্রত তাঁদের প্রথা ছিলনাক মোদের জ্ঞান,
তাঁদের দেউল অন্ধিনাতে মোদের ছিল চুকেত মানা ।

মোদের গৃহে নিত্য বিপদ, শরণ নেব কাহার জোড়ে ?
জয়ের তাড়ায় দেহতা নিজের পেলাম খুঁজে নিলাম গ'ড়ে ।

ওলাই চণ্ডী শীতলা মা ধর্মস্ফোরক সত্যপীঠ
মা মনসা বাবলী আর পাঁচাত্তর মা ঘরী

উজ্জ্বল তাই মানত করি, দরগাতে নিছি মাজার খোজা
তোমাদের বৈদ্যপুত্র হ'তে এদের কারেও পাইনি মোরা ।

হাল চয়ে আর নৌকা বেয়ে মাছ ধ'রে গাই ছাগলপেলে
বরাবরই বেঁচে আছি পায়ে মাথার ধর্ম ফেলে !

তোমরা কিছু দাওনি যেতে তোমাদের-বুধ অনেক বড়,
পেটের দায়ে তোমারা বরং অকাজ কুকাজ অনেক কর ।

বিপদ বামা লাঠির বলে ঠেকিয়ে গেছি একে একে,
তোমাদেরও বাঁচিয়ে গেছি চোর ডাকাতে হস্ত থেকে ।

হাডভাঙ্গা গাটুনির ফলের বখসা নিলে নানান ভালু,
চিরদিনই চোরের মত আছি মোরা তোমার ঊর্ধ্বে ।

বেগার যে বিই, চাইনাক দাম, তোমার দেহতা দানার নামে
নুকের কবির যুগিয়ে পেলাম চিরদিনই ভাইয়ে বামে ।

সে সব কথা ভুলব নাক ! দান আদানের এই ছনিয়ায়
কী দিয়েছ মোদের যাতে পড়ব জুটে তোমার দুপায় ?

হাল-বকরা হিসাব-নিকাশ কত দিনই আরম্ভলু হবির ?
বিখ্যা ভয়ে যা করেছি সত্যোদয়ে আর তা নয় ।

পঙ্কের পদ্ম

(গল্প)

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সুখের সংসার—

স্বামী অমিতাভ কোন অফিসের বড় অফিসার,
পিতৃপুত্রের তৈরী বউবাঁজীর মন্ত বড় বাজী, নিজের
কেনা পাড়ী ; স্ত্রী সান্বিতী সংসারের আদর্শ গৃহিণী,
খাদ্য বধু, আদর্শ মা । একটা মাত্র কজা সুপার্বার সেদিন
মাত্র বিবাহ হয়েছে খুব বড় ঘরে । অমিতাভের মা
এতটুকু বয়সে এ বাড়ীতে এসে পর্যন্ত নিজের কাজ
করে এসেছেন । সান্বিতীকে ঘরে এনে তাকে গৃহিণীর
রাজ শিখিয়েছেন, এখন তার উপর সকল দায়ীত্ব অর্পণ
করে তিনি নিশ্চিন্তমনে ঠাকুর সেবা নিয়ে রয়েছেন ।

সান্বিতী আদর্শ বধু, এখন সে আদর্শ গৃহিণী । সংসারের
সকল নিকে তার আত্মীয়স্বজন দাসদাসী, কন্ডচারীসকল
সব মিলে একটা বিরাট সংসার, বিশাল রাজ্য । যার
যা অভাব অভিযোগ সকল বাস্তা পৌছাবে সান্বিতীর
হাড়ে এবং সে সর্বের প্রতিবিধান করবে সান্বিতী । অতি
বড় কিসিস যেমন তার চোখে পড়ে, অতি ছোট
যাপারও তেমনি তার চোখ এড়ায় না ।

সুপার্বার বিবাহ হয়েছে নামকরা বড় ঘরে—শিক্ষিত
পরিবার হলেও সেখানে বেশ বোঁড়ামী বর্ধমান আছে ।
মীল অল্লীর বহু-বিচার সে বাড়ীতে বড় বেশী রকম,
মাত্র পনেরো বর্ষের বালিকা সুপার্বী আধুনিকতার
মধো মাছ হলেও সে বাড়ীতে গিয়ে একশো বছর
পেছিয়ে পড়েছে । সান্বিতীর মনে এই একটি কষ্ট,—তবু
সে শাসনা প্রায় সুপার্বী আর সব রকমেই স্বামী । বর্ধমান
স্বস্তার সঙ্গে সে যেরূপে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে
এবং এই একশো বছর পেছিয়ে যাওয়াতে তার বিন্দুমাত্র
গুণ নাই ।

গরীবের মেয়ে সান্বিতী—

কিন্তু নিজের অতীতের কথা সে ভুলে গেছে—
কোনদিন ভুলেও সে জানায় না তার পিতৃপুত্রের কথা ।
সুপার্বী পর্যন্ত মায়ের পিতৃপুত্রের পরিচয় পায়নি ।
সান্বিতী এমনভাবে জন্মাবধি এখানেই রয়েছে, এর
বাইরে কোথাও সে কোনদিন ছিল না, কারও সঙ্গে তার
পরিচয় নাই ।

অনেক কালের কথা—

অমিতাভের মা যখন কাশীতে ছিলেন, সেই সময়ে
এই অসামান্য সুন্দরী মেয়েটাকে তিনি দেখতে পান ।
বছর পনেরো বয়স তার । মেয়েটাকে দেখেই মা মুগ্ধ
হন এবং তার সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সে
ঈশ্বরী স্বভাবি বিধবা এবং বৃদ্ধা দিদিমা এই পিতৃমাতৃ-
হীনা মেয়েটাকে নিয়ে কাশী বাস করছেন ।

মা অতিরিক্ত যুগী হয়ে মেয়েটার সঙ্গে ছেলের
বিবাহের ঠিক করে ফেললেন ।

বৃদ্ধা দিদিমা বহুকাল গত হয়েছেন—সান্বিতীর এক-
মাত্র এ সংসার ছাড়া আর কোথাও কেউ নাই । মহা-
শান্তি এবং স্বখে দিন যায় ।

এই শান্তি সুখের সংসারে হঠাৎ একদিন এসে
ধাড়াপেল জ্ঞানার্জন মিত্র—

মৈত্রী এবং মোটা একখানা কাপড় তাঁর পরিধান,
যেমন ময়লা তেমনি ঘ্রি, পায়ে একজোড়া ছোঁড়া চটি,
গায়ে একটা ফুফা—

বাইরে হতেই সোরগোল শোনা যায় ; তিনি ভিতরে
চুকেত চান, বারোয়ান চুকেত দেয় না । জোখে অশ্রি-
শব্দ হয়ে জ্ঞানার্জন চাঁৎকার করেন, “জানি বোটা আমি
কে—এখন তোরা চাকরী ঘূটাতে পারি ?”

বারোয়ান হাসে । “এ ভিক্ক লোকটাগ'লম্বা চণ্ডা
কথা তনে বাড়ীর চাকর বাকরো সেখানে জমা হয়—
তাঁরা টিকারী দেয়—হাসে ।

জ্ঞানার্জন পেট হতেই চাঁৎকার করেন—“বুড়ি—
কোথায় রে কুই, একবার এদিকে আয়,—”

সাবিত্রী বিতলে সে আওয়াজ শুনতে পায়। বুকটা কেঁপে ওঠে; পুজার থালা ঠাকুর ঘরে নিয়ে যেতে হাত কেঁপে থালাটা মনু কন করে পড়ে যায়,—সাবিত্রীর মুখখানা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

“বুড়ি—”

আবার আসে আহ্বান—

সাবিত্রী জানালার কাছে সরে যায়। গেট হতে জনাৰ্দ্দন তাকিয়ে তাকে দেখতে গেলেন, সেখান হতেই চাঁৎকার করলেন—“একবার দেখ,—তোমার বাড়ীতে আমার কিনা এত আপমান-সইতে হয়? জামাই গেল কোথায়,—এ শুলোকে যে সঙ্গে সঙ্গে সায়েস্তা করা দরকার।”

দরজায় দাঁড়িয়ে বহনাকে মন্ত বড় একটা সেলাম জানিয়ে ধারোয়ান রামভক্ত জিজ্ঞাসা করলে—“বুড়া লোকটাকে সে কি আসতে দেবে না ভাগিয়ে দেবে?”

সুন্দরের সনম্বর

!!!!!!

যে কোন রকমের

সুন্দর ফটোর জন্য

সুন্দর ষ্টুডিওই

এক্সট্রা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আর্টিস্ট : কে, সি, থালা

১৩৯১, রসা রোড, ভবানীপুর

(হাজরা রোডের মোড়)

ফোন : সাইথ ৫৪৫

সাবিত্রী একমুহূর্ত ভাবলে, তারপর বললে, “আসতে দাও—”

তার মনে হচ্ছিল পায়ের তলায় পুরিস্থি সরে যাচ্ছে; পড়ে যেতে যেতে সে জানালাটাকে চোঁপে ধরলে।

“বউ মা—সাবিত্রী”

শান্তভীর এই আহ্বানে বধু কেঁপে উঠলো একবার মাত্র মুখ তুলে অক্ষকর্তার পানে তাকিয়েই সে মুখ নামালো।

অক্ষকর্তী শুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা শুনতে পাচ্ছি এ কথা সত্য?”

বধু নীরব।

অক্ষকর্তীকে সে চেয়ে, আজ কুড়ি বৎসর সে এই মাঘবস্তীর কাছে অহোরাত্রা রয়েছে। তিনি সামাজিক, ধার্মিক, খুব সরল ও কোমলমনা হলেও তাঁর মধ্যে বংশমর্যাদার দাব্বিকতা ষোলখানা বর্নমান, নিজের বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন।

হয়তো তাঁর মনেও সন্দেহ আগছিল। তিনি যা শুনছেন সে সব মিথ্যা কথা; জনাৰ্দ্দন কেবল টাকা আদায় করতে এসেছেন তাই মিথ্যা একটা কল্প প্রচারের ভয় দেখাচ্ছেন। সাবিত্রীর মুখ হতে সত্য কথা তিনি শুনতে চান; সাবিত্রী একবার বলুক জনাৰ্দ্দনের কথা মিথ্যা,—সঙ্গে সঙ্গে তিনি চারজন ধারোয়ান নিয়ে লোকটাকে উপযুক্ত প্রহার দিয়ে বাড়ীর বার করে দেবেন। সাবিত্রীকে নীরব থাকতে দেখে তাঁর সন্দেহ বেড়ে ওঠে, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, “কথা বল—উত্তর দাও।

“কি কথা মা—?”

সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায়।

অক্ষকর্তী বলেন, “উনি তোমার বাপ, তোমার জন্মের আগেই উনি মাত বহুরের জন্মে জন্মে যান। তোমার মা নাকি এখানকার বিখ্যাত বাইজি মণিকা বাই, যার জন্মে—”

সাবিত্রী শুনতে পারে না—

“উঃ মাগো—”

সঙ্গে সঙ্গে মুচ্ছিতা হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল অক্ষকর্তার পায়ের তলায়।

জারজা কন্ডা সাবিত্রী—

জনাৰ্দ্দন এখনই হাজার পাচকে টাকা চান, না দিলে তিনি সব কথা সকলের কাছে বল দেবেন, এমন কি স্বপূর্ণার খবর বাড়ী পর্যন্ত।

অমিতাভ নিমন্ত্রণ হয়ে শোনে।

অফিস হতে ফিরে সে দেখেছে মুচ্ছিতা স্ত্রীকে, নাকে দেখেছে ঠাকুরঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতে। অমিতাভ গম্ভীর হয়ে ওঠে, উপস্থিতকার মত সে কণ্ঠব্যাপ্তি করে ফেলেন।

জনাৰ্দ্দন জোর করেন, “টাকা দিতেই হবে বাবাঝি না দিলে সহজে যাচ্চিনে। বেকাসে কারও কাছে এ সব কথা বলে ফেলব সেই ভয় নচেৎ তোমার মত বড়লোক জামাই বাড়ীতে ছই মাস থেকে গেলে, শরীরটা ভালো হতো ছাড়া মন হতো না।”

“ধারোয়ান—”

অমিতাভ হাঁক দিতেই চারজন ছুটে এসে।

অমিতাভ জনাৰ্দ্দনকে দেখিয়ে বলে, “এই সময়তানটার জ্ঞান হতে ছই বা আছা করে দিয়ে পথে বার করে দিয়ে এসো এখনি—”

“মা বাবাঝি—”

জনাৰ্দ্দন আঁতকে উঠেন, ধারোয়ানরা তাঁকে চোঁপে ধরে।

হাঁকতে হাঁকতে জনাৰ্দ্দন বলেন, “কাছটা ভালো করছোনা বাবাঝি, তোমাদের মত বন্দী থরে একটা জারজ নেয়ে বউ হয়ে এসেছে এ কথা রাষ্ট্র হলে মুখ দেখাতে পারবে না। তোমার শাওড়ি ছিল রাজশের থরের বিধবা মেয়ে, আমার সঙ্গে সে বাণী আসে, তারপর ওই মেয়ে হয়। তোমার শাওড়ি তারপর হয় বাইলি—আজও সে এই কলকাতাডেই বাস

করছে। এ সব কথা রাষ্ট্র হলে তুমি মুখ দেখাতে পারবে না, তোমার মেয়ের খবর বাড়ী এ কথা গেলে কি হবে সেটাও ভেবে দেখ। এত কলেজকারী করার চেয়ে মানে মানে আমায় পাঁচটা হাজার টাকা দিয়ে দিলে—”

অমিতাভ হাজার ছাড়ে—হকুম তামিল কর, রামভক্ত, লজ্জম সিং—

জনাৰ্দ্দন চাঁৎকার করে গালাগালি দিতে শুরু করলেন ধারোয়ানরা তাঁকে টেনে নিয়ে চললো।

স্বামীর পায়ের তলায় আছাড় গেয়ে পড়লো সাবিত্রী, আশ্রকণ্ঠে বললে, তুমি একি সর্বনাশ করলে গো—কেন শুকে মারতে ছকুম দিলে; উনি যে এখন চারিষিকি এ কলঙ্ক রাষ্ট্র করে বেড়াবেন—লোকে যে যা না তাই বলবে। সব চেয়ে বড় কথা—আমার স্বপূর্ণার কি হবে,—আমার মেয়েকে তারা একদিনও জায়গা দেবে না—আমার মেয়েও যে আমার রণা করবে গো।”

অমিতাভ নিমন্ত্রণ তার মাথায় হাত বুলাতে-পাকে। সাবিত্রীর চোখ দিয়ে হু হু করে জল করে—

“মা আমায় ত্যাগ করলেন। মিথ্যা কথা বলতে পারলুম না কারণ আমার পরিচয় আমি জানি। আমার শাবা ওই লোকটাই, মা বাইলি, এ সব কথা জানা সন্দেহ তোমাদের বলিনি—এ আমার অমার্জনীয়

জীবন বীমা করুন—

ইণ্ডিয়া এমিকেবল

প্রজিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিং

(স্থাপিত—১৯০১)

হেড অফিস—৩ ও ৬ হোয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—

মিং এ, রায় চৌধুরী

অপরাধ। আমি সব ছাড়তে পারি। কিন্তু তুমি—তোমায় ছেড়ে আমি কি করে থাকবো—আমি কোথায় যাব গো—?”

অমিতাভ তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, “কেপেছো সাবিত্রী—আমিই বা তোমায় যেতে দেব কেন? তুমি যেখানেই জন্মাও, যেই তোমার বাপ মা হোক, তানিয়ে তো আমার সম্পর্ক পড়ে ওঠেনি। আমার সম্পর্ক তুমি মানুষটার সঙ্গে—যে আজ কুড়ি বছর ছায়াবৃত্ত মত আমার সঙ্গিনী হয়ে আছে, আমার ভালো মন্দ উন্নতি অবনতির সঙ্গে যে জড়িয়ে গেছে—তাকে আমি একটা দিনের জন্য ছাড়তে পারিনে রাণি।

“তুমি এত মহৎ, সেগো তুমি এত বড়—”

সাবিত্রী অমিতাভের পা ছুঁখানা চোখের জল ভিড়িয়ে দিলে—।

ঠাকুর খবের দরজা ঝুলে বার হতে গিয়ে অন্ধকৃতি থমকে দাঁড়ালেন—

“অমিতাভ! অঙ্গুরন হয়ে এসে প্রণাম করলে—
“সাবরা চলে ব্যাক্ষা মা—”

মা নিস্তব্ধ, বিম্বল করত পাবনে মা ঠাঁর একমাত্র পুত্র জারজা বধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করছে।

নির্ভরযোগ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান নর্দার্ন ব্যাক লিং

হেড অফিস:—৫৬, হেয়ার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

শাখা:—সম্মলপুর, মেদিনীপুর, পাবনা, হাওড়া, বালিশা ও কদমতলা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:—

মিঃ এ. রায় চৌধুরী।

“অমিতাভ বললে, “আদেদে দিয়েছে। আজই থেকে কোথাও চলে যেতে। হোক সে জারজ, তবু তাকেই যখন ধর্ম সাক্ষী করে গ্রহণ করেছি মা, তাঁর ভার আমায় বইতেই হবে, তাকে তার বাপ মায়ের পাশে পথে একা ছাড়তে পারিনে। আজ সবাই থেকে যেনে নিতে পারতো মা, যে লোকটার সব কথা মিথো বলে সবাই উড়িয়ে দিতো—যদি তুমি ওই মানুষটাকে যেনে নিতে পারতে—”

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অন্ধকৃতি বলে উঠলেন, “যেনে নেব—তুই বলছিস কি থোকা—পতিতা মায়ের গর্ভে যে জন্মেছে—”

বাধা দিয়ে অমিতাভ বললে, “পাকে যে পদ্ম জন্মায় মা সে কি তোমার ঠাকুরের পায়ে পড়ে না, অর্থাৎপ মাথায় ওঠে না? কেবল ওর জন্মটাই দেখলে মা, কুড়ি বছর তোমার কাছে যে রইলো, সেই কুড়িটা বছর দেখলে না মা? যাক, তোমার বংশমর্যাদাই বজায় থাক মা, আমায় আমার কর্তব্য পালন করতে অস্বস্তি দাও। আমায় শুধু সেই আশীর্বাদ কর মা আমি যেন—”

মা হাতখানা পুত্রের মাথার উপর রাখলেন—মাতৃ কণ্ঠে লগলন, “হ্যাঁ, সেই আশীর্বাদই করছি থোকা, আমার বংশমর্যাদা যেন তোর হারাই উজ্জ্বল হয়, আমার ছেলে যেন কোনোদিকমতে আদর্শচ্যুত না হয়।”

সাবিত্রীর দিকে ফিরে আকর্ষণে তিনি বললেন, “সত্যি কথা—পাকে যে পদ্ম ফোটে তা ওঠে দেবতার মাথায়। বউমা, আমি বিচলিত হয়ে গেছিছিম, কিছু মনে করো না। যাও তোমার নিজের কাজ কর গিয়ে। আজ স্বপূর্ণার আসার কথা আছে, সে যেন যুগ্মফল মা জানতে পারে আমার সোনার বসারের ওপর দিয়ে কড় বয়ে গেছে।”

সাবিত্রী হুই হাতে অন্ধকৃতিকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখখানা ঢুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো,— অন্ধকৃতির চোখও শুষ্ক ছিল না।

ইন্ডি

(সমষ্টিয়া-ধূলক উপন্যাস)

স্বী অমল ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভবিষ্যত যথেষ্ট যাই তুমি বল, শুধুলা মানতে আমি কিছুতেই রাজী নই, কারণ Pythagoras বলেছেন, if human endeavour বাধা দিয়ে তীব্র ব্যর্থ উত্তর হল প্রাইভেসার থেকে ভারনোকার, ডায়নোসার থেকে মেগালোসারস, মেগালোসারস থেকে ডিনোথিরিয়াম, ডিনোথিরিয়াম থেকে তোমাদের ইলিসিয়ান মহাপুরুষের সব বক্তব্যেরই সমান মূল্য, অতএব চূপ কর, বিজ্ঞির সঙ্গে প্রশ্ন হল অর্থাৎ স্পষ্ট জবাব হল, অর্থাৎ প্রাইভেসারস তাদের শারীরিক জায়গার মারতে গৃহস্থি, তোদেরা ঐ the same eternal ifএর বিচিত্র কাণ্ডকারখানা: মানে বেচে থাকবার ব্যাপারে যখনি তারা টের পেলে, অভিশপ্ত শারীরিক Sloth তাদের জীবন যুদ্ধের প্রধান অন্তরায়, সেই যুদ্ধেই দেহগত ভাবে তারা হির কবির নিলে, যদি ঐ একমাত্র কারণের জন্য তাদের মরতে হত, তবে পরম্পর গুটোপ্তি করেই মরবে। লড়াইতে বেয়েইছিল, তাই হুঁ একটা যুগের মধ্যে দেখতে দেখতে তাদের পোটা speciesটাই একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, প্রামাণ্য হল, জীবজগতের ওপর ঐ প্রচণ্ড ক্ষমতা ঐ almighty and eternal ifএর। আবার তোমাদের elysianদের বেলায় ঠিক একই অবস্থা, যে যুদ্ধে তারা টের পেলে, যদি mental slothই তাদের জীবনে স্বস্থাপদ ভোগদখলে বিপত্তি ঘটায়, তবে বিপত্তি নিয়ে বেচে থেকে লাভ কি? মোক্ষলাভকে

উপায়ও আবিষ্কার হল, দলে ডীল অনেকেই, কারণ elysianরা জানত, একলা মরার সুখ নেই, Slothজ্বলোর সংখ্যা বাড়তে শুরু করল। কিন্তু মজা হচ্ছে মোক্ষটা অর্থাৎ যুগুটা তাদের সাধারণ মানুষের মত বেশ matured হয়েছিল। তবে জীবনে sloth mindএর eccentricityর দিক দিয়ে স্বস্থাপদ বংশবৃদ্ধির ধার দিয়েও তারা যায়নি, কারণ ঐখানেই তাদের, ifএর আপত্তি। যেমন ডিনোথিরিয়ামরা তাদের গুতোপ্তি করে মরায় আপত্তি জানায়নি। ঐ শুধু তাই কি, শব্দর, বৃষ্টি, লাওৎসে সকলেই প্রায় ঐ একই পথেবর পবিক। যাই হোক, কথা হচ্ছে, the same attribution of the eternal ifএর লীলা বেলা চারিধিকৈ! মনে হয় Absoluteএর সৃষ্টিটা যেনে একটা আগাগোড়া “If” তাই গুটা অস্বীকার করা যায় না। এ যেনে negation of negation যুদ্ধের শুল্ক। তাই বক্তব্য হচ্ছে, জীবনে ও জগতে একমাত্র ifকে দিয়েই যত ঘটন আর ঘটন ঘটছে, সবটাই যেনে একটা প্রকাণ্ড গোলমালে ব্যাপার। যেনে বুকেও বুকেতে পায়রা যায় না। তবু if দিয়েই আজ অস্তরোধ করছি if you please keep quier তাহলে তারি যুগী হয়, ওসব Pythagorian, Dionosaurianদের পাচিয়ে আর অনর্থক Cerebral energyকে নষ্ট কোর না। তবে স্বাধীন চিন্তায় যেটুকু বোঝ, সেইটুকুই বলে যাও, ভনি, শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। জানি তাতে নোতুন নোতুন ifএর আমদানী করতে হবে অনেক। তবে সেটা নোতুন বদেই আপত্তি কোরো না, বলব, general fecundityতে তুমি ওস্তাদ, কিন্তু যে যুদ্ধেতে Dormancyর স্বপক্ষে তবু জাহ্ন তুমি পুরোনা If শুলোকে তাদের কবর থেকে ফুলে আনবে সেই যুদ্ধেতে বোলবো তুমি Sloth a disnosowr. থাকে লক্ষ্য করে উপদেশবাণি বর্ণন হ'ল, সে কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণ চটেছিল, তাই প্রতিপক্ষকে চূপ করতে বুঝে, বলে উঠল, বক্তব্য তোমার বুকে উঠতে পারিনি বল কম চাইছি, কিন্তু বুকেতে আমার দেবী হয়নি, নিজেব মতামত ছাড়া আর কারো মতকে তুমি প্রাধান্য দিতে চাও না; কিন্তু এই একশুয়েমির জন্তে লোকে

তোমার উদ্দাম ছাড়া আর কিছু বোলাবে না। উত্তর হল, তাতে কী, এক পাগলের বিচার ত আর এক পাগলেই চিরকাল করে আসছে। তবে অস্তর সংগে একের তথ্য বক্তব্য ব্যবহার; ধর, যেমন তুমি ও আমি, প্রথম তুমি চেষ্টা করলে তোমার বক্তব্যকে বেশ ফলাও করে আমার চোখে তুলে ধরতে, কিন্তু পারলে না। কারণ বক্তব্য ও ব্যবহারগত সাবুজ তুমি আমার চেয়ে ভিন্ন, তাই উত্তরেই হল, আমিও তোমাকে শোনাতো, চাইলুম নিজেরটাকে, কিন্তু পরিণাম সেই একই হল, কেউ কাঁধকে কিছু বোঝাতে পারলুম না। এতে প্রমাণ হচ্ছে তোমার পারদর্শী ঠিক আমার নয় যা আমারটা তোমার নয়, কিন্তু উভয়েই বুদ্ধলব্ধ, আমার পাগল বটে কিন্তু একই ভিন্ন ধরণের। তারপর একটু হেসে নিয়ে বলে, ঠিক তাই নয় কি?

কিছুকাল নীরবেই কাটল; প্রতিপক্ষ কি একজন জবাব দেবে তাই ভাবছিল, হঠাৎ যেন কেমন মজীয়া হয়ে বলে উঠল, কোন categoryতে যে তোমার ফেলব, একজন তাই ভাবছিল, এখন মনে হচ্ছে তুমি শুধু cynic নও, একটা পাকা nihilistও বটে, নিজের মধ্যে একজন বিপ্লবীকে রাষ্ট্রবিনা জাগিয়ে রেখে যেটাকে তুমি সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে ফেপিয়ে তুলছ, কিন্তু ওটা রোগ, a real pathological case।

মাসের ওপর দেহটাকে লম্বা করে দিয়ে ধাঁহাতের কহুইয়ের ওপর মাথাটা তুলে ধরে সে বলে উঠল, চড়ুয়ের বাসা থেকে, পায়রা'র খোপ, পায়রা'র খোপ থেকে বেজীর গভ, বেজীর গভ থেকে ডালে, তার থেকে আবার ivory towerএ অনবরত মাছুষকে বুজিয়ে মাছুষের দেখি একটা প্রচণ্ড তৃপ্তি আছে, যার জন্তে নিজেকে বা অন্তরে মসৃণাকারে তার কিছুকাল আপত্তি নেই; প্রথম প্রথম নিজের বা অপরের ব্যাখ্যা করে যখন সে দেখে, শুনে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি, তখন সে জুংসই একটা খোপ টিক করে তাতে নিজেকে বা অপরকে বেশ cap to cap fit করে দেয়, তাহে কী চমৎকারই না হল, এইবার সত্য সত্যই মাছুষের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল বটে; Poor, miserable! বোঝা উঠিত যে মাছুষ খুন করে প্রেমের ব্যাপারে তার Romantic হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়, আবার একই লোক শংকরের নাস্তিকবাদে জগৎটাকে ন্যায়ময় বলেই, পুর মূহুর্তেই একটা আশু epicure হতে পারে, কারণ জীবনটায় probabilityর দ্বাধাই বৈধ, তাই Static অবস্থায় তাকে কোনো categoryতে ফেলা চলে না, হয়ত কোনো কোনো জীবন বাইরে থেকে মনে হবে যুবই Dornant, কিন্তু গুলো তারো মধ্যে বিচিহ্নতা মেলে, তাই এদেরও খোপবন্দী করা চলে না। একটা গুণের প্রকাশ্যধিকাই যদি তাকে বিবিধ categoryতে ফেল তবে ভাল হবে, কারণ Life is dialectically changing, হয়ত সেই গুণকেই একবিন দেখবে অশ্রদ্ধাচক্রে পড়ে সে বুকের মতই শাস্তি-পাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে। যেমন অশোক করেছিল।

অপর পক্ষ একজন নিঃশব্দ হয়েই বক্তা তাম্রছিল, তাই উপস্থিত জবাব বুঝে না পেয়ে একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে, যাক তত্ত্বধার এইখানেই ইতি হোক; জিগোস করি এখন উঠতে চাও কি না! জবাব হল, ঐ কথাই একজন তোমার যুখ থেকে শুনাবো বলে আশা করছিলাম। প্রশ্ন হল, কি রকম? উত্তর হল, ঐ রকম একটা কিছু আমিও ভাবছিলাম কি না!

এতক্ষণ যারা কথা কহিছিল তাদের প্রথমটি হল অনিল, স্বচরিতার বড় ভাই, আর দ্বিতীয়টি হল আমাদের শংকর। প্রতিদিনের অভ্যাস মতই বিকেলবেলায় শংকর চলেছিল স্বচরিতার বাড়ীর দিকে, এমন সময়ে পক্ষে অনিলের সংগে দেখা এবং তারই পরামর্শে ওরা এসে বসেছিল একটা নিজস্ব পার্কের মধ্যে, তারপর যা কথা-বার্তা চলেছিল, সেটা আমরা আগেই জানেছি।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করে স্বচরিতা যখন দেখল অনিল এরা না, তখন মনে মনে বেশ একটু বিরক্তিই সে বোধ করলে। ওর ধারণা পুরুষ তার বাইরের আবরণটাকে বহই করিন করে তুলুক, ওটা তাদের একটা পোষাক ছাড়া আর কিছু নয়। যেটা তাদের আসল জগৎ সেটা তাদের অজ্ঞাতসারেই একদিন পরা পড়ে যায়। শংকরের মধ্যে স্বচরিতাও যেন ঐ রকম একটা কিছু আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কারের ইতিহাসটা একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলে, দেখা যাবে স্বচরিতার দিকে শংকরের যেন কিসের একটা চান আছে। যেটাকে অশ্রীকার করতে না পেরে বোঝাই সে এখানে ছুটে আসে। ইয়া এই ছুটে আসার মধ্যেই শংকরের আসল রূপের পরিচয় স্বচরিতাও তখনই দেখে নিজে থেকে একলা পেয়েছে, তখন একটা হাসিকে সে কিছুতেই গোপন করতে পারেনি, যেটা নদীর কাছে চিরদিনই ফুটে উঠেছে, পুরুষের গোপনতম রহস্যের সন্ধান পাবার পর। স্বচরিতাও জানত, শংকরকে সে ভালবাসে। কিন্তু বাইরে সেটা কোনোদিনই সে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। কিসের যেন বন্ধ মাকে মাকে তার মধ্যে জেগে উঠে তাকে সাক্ষাৎ করেছে, বনরদার, যা ভাবছ সেটা তোমার সত্য, নাও হতে পারে। কিন্তু ঐ বন্ধকে সে প্রত্যেক মুহুর্তেই ধর করেছে; বলেছে কিছুতেই তা হ'তে পারে না। সে একাধার তার। তাই সেদিনও সভ্যে পাঁচজনের সামনে তাকে অপমান করাই যখন সে তার নিজের কথাই বলে গেল, মনে মনে একটা গভীর বেদনা বোধ করলেও তখন নিজেকে সে এই বলেই শাসনা দিয়েছে যে ওটা পুরুষেরই একটা চিরন্তন চালাকী, মনে মনে কিছুতেই সে ওকে

অশ্রীকার করতে পারে না। তার প্রমাণও সে পেয়েছে পরের দিন যখন শংকর এসে বলেছে নিজের ভাববকে সে কিছুতেই ভ্যাগ করতে পারে না। তাই রূঢ়তার পরিচয় যদি সে দিয়ে থাকত, তবে সে দ্ব্যমিত, ওটা নাকি তার ইচ্ছাকৃত নয়। স্বচরিতার অভিযাশা এর চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। তাই মনে মনে সে শুধুই হয়েছে, রাগ করে বলেনি, শংকরকে সে অশ্রীকার করে। বাইরের অশ্রীকারের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক কথাই তার মনে ছেতে লাগল, যেন একদিন সে জড়ী হয়ে উঠেছে, আর সে যেন মাঝা মাঝা করে এসে বলেছে, আমি দ্ব্যমিত, রূঢ়তার পরিচয় যদি দিয়ে থাকি, তবে আজ তার মার্জনা হোক।

হঠাৎ স্বচরিতার মনে হল, কে যেন তাকে ডাকছে। দেখেছিল, বুঝি শংকরই এসেছে, তাই মনের চক্কলতা দমন করতে না পেরে বাস্তবাবেই সে দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু দেখলে তারই বয়সী একটা মেয়ে যাকে সে সত্যি সোনিম বেরেছিল, শংকরের সংগে। সমস্ত মুখের উপর হঠাৎ একটা শূন্য হাসি ফুটিয়ে ব্যস্ত হয়ে ও বলে উঠল, কী আশ্চর্য, আপনি, কী ভাগ্যি আমার! তারপর দ্বিতীয় কথা না বল ন্যায়তাত্ত্বিক একরকম হাত ধরেই সে drawing roomএ এনে বসালে, তারপর কৌতুকের হাসিতে গারা মুখটা উজ্জ্বল করে, নীরবেই দেখে যেতে লাগল সেই অপকল্প স্বন্দরী মেয়েটাকে, স্বচরিতাও একজন যার মূলের ওপর মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, বন্ধ, তুমি জিগোস করলে, উপযাচক হয়ে আপাত করতঃ অপর বলে, কিছু মনে করছেন না ত? কিন্তু না এসে পারলুম না, ধরে বসে বসে যখন একঘেয়ে লাগছিল, তখন ভাবছিলাম, কোথায় যাই! হঠাৎ আপনাব কথা মনে পড়ল, জেগেবার কাছ থেকে টিকানাকা। মাঝেই জেগেছিলুম, তাই সটান চলে এলাম আর কি।

স্বচরিতা হেসে জবাব দিলে, কৈমিসহটা যদি না দিতেন, তবে হয়ত কিছুই মনে করতাম না, কিন্তু এখন বিলম্ব করছি। গলিতাও হাসতে হাসতে তা দাবনি মনে

১০ টাকায়

১৮ পাউন্ড উৎকর্ষ দার্জিলিং গ্রেড চা
(পাতা-গুড়া-ব্রোকা)

বিশদ বিবরণ সাক্ষাতে বা পরে জাহান।

বার্ড টি কোম্পানি

২৭১২, ক্যানিং স্ট্রিট ও ১৩৭, নোবোজার স্ট্রিট

অপরা
দি এসোসিয়েটেড ব্যান্ড অফ ত্রিপুরার

যে কোন শাখায়।

করতে থাকুন আপতি নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনাকে আজ কিন্তু আমার ভয়ংকর ভাল লাগছে।

স্বচরিতা বলে, তাই নাকি? কী সৌভাগ্য আমার।
ললিতা বলে, আমার কিন্তু লোকের মোটেই ভাল লাগে না, ভয়ানক গালাগাল দেয়।

স্বচরিতা বলে, লোকদের জন্তে আমার চুং হয়, কিন্তু কি করব বলুন, উপায় ত নেই, আমি কিন্তু আপনাকে প্রথম দেখা থেকেই ভাল বেলে ফেলছি আর একথা আমি লোকদের সামনে হাজার বার করেই বলব।

ললিতা কৌতুক করে বলে উঠল, love at first sight না কি, না talionic principle অহুসারে an eye for an eye এর বদলে love for love কোনটা? তারপর ছ'জনেই হো-হো করে হেসে উঠল।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে স্বচরিতা বলে, দেবজি ভাই-বানোরে আপনারা কেউই কম নন, ছ'জনেই একবারে

সমান বাচস্পতি! উত্তর হ'ল, অর্থাৎ অজ্ঞ বাক্যকে আমরা মানুষের ক্ষয়কে জয় করি, এই ত?

স্বচরিতা বলে, ওকথা কিন্তু মানতে রাজী নই আমি। প্রশ্ন হ'ল, কেন?

জবাব হল, বাক্যব্যয়ত অনেকেই করে, কিন্তু মানুষের ক্ষয় জয় করবার ক্ষমতা তাদের কতটুকু? তাই যদি হত, তবে School teacher আর পটলওয়ার যানঘন্যমানিকের আমি সব চেয়ে বেশী দ্বন্দ্বী হিতুম। ললিতা হেসে উঠে বলে, ওরত একটা practical values থাকতে পারে!

জবাব হল, সে valueটা পটলওয়ারা, জ্ঞেতার নয়, ওপরের ঘূলাটা বক্তার নয়, শ্রোতার।

ললিতা বলে, কৈফিয়তটা Paradoxical, কিন্তু কৃতার্থ হয়েছি, প্রার্থনা করুন বর দিই।

হঠাৎ সোফা থেকে উঠে পড়ে স্বচরিতা বলে, দেবী শ্রী হয়েছেন, ঐ টুকুই যথেষ্ট, তবে প্রার্থনা করি, চায়ের জোগাড় করতে যে টুকু সময় লাগবে, সেইটুকু যেন ক্ষমা করেন।

উত্তর হল, তথাস্ত।

চা খেতে খেতে ললিতা জিগ্যেস করলে, মেজদার সংগে আলাপ আপনার কতদিনের?

উত্তর হল, মাস ছয়েক!

ললিতা বলে, ভারি খুশী হলুম, তার মতন কর্প প্রকৃতির মানুষের সংগে আপনি আলাপ করতে পেরেছেন দেখে।

কি একটু ভেবে নিয়ে স্বচরিতা বলে উঠল, ওর কর্পশতাকেই হয়ত আমার ভাল লেগে থাকবে।

একটু হেসে ললিতা বলে, আপনার রুটির তারিক করছি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, ওরকম লোককে একবারে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মেয়ে সহ করতে পারবে না। আজ সেই বিশ্বাস দেখছি আপনিই প্রথম ভেঙে দিলেন।

হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে, স্বচরিতা জিগ্যেস করলে, ওর কর্পশতাকে আপনি ঠিক কী বলে বোঝাতে চান

একটু খুলে বলবেন কি? কারণ স্পষ্ট উল্লেখকই যদি আপনি কর্পশতার নামান্তর বলে মনে করেন, তাহলে Sugar-coated quinine এর মত মিথ্যার ওপরাটা নিয়েই আমাদের সম্বন্ধ থাকতে হয়।

ললিতা যেন এবার একটু সহায়কুতিতক হয়েই বলতে লাগল, মেজদাকে আমি ভাল করেই জানি বলে, আপনার মুক্তিগুলো আজ আমার ভারি ভাল লাগছে, কিন্তু জিগ্যেস করি, তার বক্তব্যের style কেই আপনি ভালবাসেন, না তার অর্থনৈতিক লাতটাকে? অবশ্য এটা আমার কাছে অস্বীকার চর্চা, কিন্তু সন্দেহ হয় style কেই হয়ত আপনি বড় করে দেখেন।

কিছু বিশ্বয়ের সংগেই স্বচরিতা বলে উঠল, ঠিক বুঝি না।

শান্ত পরেই ললিতা জবাব দিল, আপনার একটু আগের কথাই তার প্রমাণ দেবে, একটু আগেই না আপনি বলছিলেন, মানুষের ক্ষয়কে ঘোটা জয় করে, সেটা বাক্যের অভিরিক্ত একটা কিছু? না হলে পটল-ওয়ার বক্তব্যের মূল্যই আপনার কাছে প্রশ্ন হয়ে উঠত?

স্বচরিতা প্রতিবাদ না করে এবার বলে, হয়ত তাই, ওর style কেই হয়ত আমার ভাল লেগে থাকবে।

উত্তরে কি ভেবে নিয়ে ললিতা বলে, ভারি খুশী হলুম আপনার কৈফিয়ৎ শুনে।

[ক্রমশ:]

হসন্তিকা

(৩)

আপেক্ষিক তত্ত্ব

সাপ কেন হাসের পা জড়ায়

এ তত্ত্ব বলবে কে আমার?

এক কৌটী উমানাশী সেও বাজায় বাশী

পুঙ্খের জলে কেন গুগলি গজায়?

শুক সারিকের সেনা বারিকে পাকড়ায়।

জোর লাঠি খেলা চলচে আখড়ায়;

চুপি চুপি হয়ত উড়িয়ে দেবে চুপি,

সবই ত ঠারই কারচুপি

সেই রকমত শুনি এ পাড়ায়,

বা' হোক মন্দের ভালো,

অন্ধকারেও সিলিকি মারচে আলো

তবে ওজাদার যা বলচে নিজেদের কেতার

বিশ্বাস করা খুবই অজ্ঞার,

কারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব, রাজনীতি মনস্তত্ত্ব

জোর বার সত্য বলেই ত সব প্রমাণ করচে মশাই;

কারণ ওটাই নাকি আজকালকার মন্ত দাওয়াই

অতএব আশ্রয় দাবা জমাই।

—আরণ্যক

বাতায়ন

জ্যোতির্বিজ্ঞান শ্রেণী

উর্ধ্ব নীল আকাশের নিরীহতা ধুপু করে

হিংস্র বিহঙ্গম।

ভাবালু চাঁদের স্বপ্ন-পরিধিতে মুগ্ধ নয়

হাবার জঙ্গম।

অন্নময় কোষে আজ ক্ষুধার পতাকা আনে

লব্ধ কোলাহল।

তাদেরই সংহতি আজ একাকার করে দেবে

প্রাণের সম্বল।

স্বপ্ন সন্ধ্যার এই বাতায়ন ফেলে তাই

পথে গিয়ে মিশি,

বিগমিত অস্তিত্বের অভিমান চূর্ণ করি।

চুর্ণগতি নিশি

কেটে ত যাবেই প্রাণ-সূর্যের আলোকের প্রথর চূড়ায়।

ভ্রমের ত যাবেই

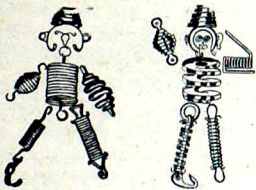
সংসারের বাঁধ এই, সম্মিলিত মুক্তি আজ

উচ্ছ্বাস পাবেই।

আমাদের গান তাই উদ্ভাষিত ক্ষয়কে জয় দেবে।

প্রাণের চকিত বস্ত্রে আলোকিত, অস্তিম প্রলয়ে ॥

LEADING SPRING
Manufacturer of
INDIA



CALCUTTA SPRING
—MFG. COY.—

84/A, Clive Street, Calcutta.
PHONE: CAL: 5175

কথাগুলি “অসত্য বর্ধের ডাকাতের দল” আমার কর্ণকূহরে
বঙ্কত হইতে লাগিল। কিন্তু কি হইবে ছাই সে সব
লইয়া, সে হুতি আঙ ও গভীর রক্তনীতে আমার মনে
ভিক্ত করিয়া আসে এবং সেই কারাশ্রম অপেক্ষা ক্রেশ-
দায়ক আমার আর কিছুই নাই।

তত্ত্ব ও ক্রমশ ক্রমশ সেই লখন্য অবস্থায় আমি সান্ত্বিত
রাছো ডুবিয়া গেলাম। পৌছিল্য আমার বিগত-
জীবনের হৃদয়মন্দিরের উজ্জ্বল দ্ব্যারে। আমার দীর্ঘ
চাষিবৎসর কারাবাসের মধ্যে আমি সর্বদাই আমার
অতীতকে ফিরিয়া পাইতেছিলাম, স্মরণপথের পথিকরূপে
আমি পুরাতন আমার পরিত্যক্ত জীবনপথ পরিক্রমণ
করিয়া আসিলাম। আমি এই সকল অতীত হৃদিকে
নিমগ্ন হই নাই নিজে ইহারা আসিল অনাহত।
অকস্মাৎ ইহার উদয়—সুদীর্ঘ জন্ম জিনিষ হইতে, কিন্তু
ক্রমে ক্রমে দলে তারি হইয়া ইহারা চিত্রটিকে সম্পূর্ণ

আকারে তুলিয়া ধরিত নির্মূর্ত ও স্পষ্টরূপে। আমি
এই সকল প্রাচীন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিতাম,
তাহাদের তাৎপর্য্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতাম
ও তাহাদের ক্রমাগত মনোমত করিয়া বশোভন
করিতে থাকিতাম। ইহাই ছিল আমার বেলা ও
আশঙ্কা। আঙ তাই শুইয়া শুইয়া আমার বিগত
শৈশবের একটি অসিবিহিত বিস্তৃত কাহিনী মনে পড়িয়া
গেল। তখন আমার বয়স নয়। সে বয়সে মনে
পাকিবার হাজতো কথা নয় কিন্তু শৈশবস্থিত আমার কাছে
ছিল অমূল্য রত্ন। মনে পড়িল—

আমাদের দেশের বাড়ীতে, তখন আগষ্ট মাস
পড়িয়াছে। দিনটি পরিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক কিন্তু তখনই
ঠাণ্ডার আশঙ্ক বিতেছিল ও প্রবল বাতাস বহিতেছিল।
গ্রীষ্ম অবধান প্রায়। মস্তকের গুলে মারা শীত বরিয়া
একথেকে ফ্রোণ পড়ার মস্তক কাছে আসিল বসিয়া।
দেশের মাটি ছাড়িয়া পড়িতে বাইতে আমার বড়ো দুঃখ
হইত। আমি গম ভান্ধিবার উরত সমতলভূমি ছাড়াইয়া
পর্ব্বতের খাদের দিকে চলিতে লাগিলাম। নামিতে
নামিতে খাদের নীচের দিকে কোণপূর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ
করিলাম। তাহার মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়াই আমার
কানে গেল জমি চাষের শব্দ—দেখিলাম ত্রিশ হাত দূরে
এক চাষী চাষ করিতেছে। আমার জানা ছিল যে এই
অসমতল স্থানেও চাষ হয় এবং চাষীর অধিক বিশেষ বেগ
পাইতেছে—কিন্তু একেব্রে কে চাষ করিতেছে তাহা
দেখিবার আমার উৎস্রুকা রহিল না—আমি আমার আপন
ভাবনায় বিতোর হইয়াছিলাম। আমি বাদাম গাছের
ডাল ভান্ধিতে বাস্তু ছিলাম—ডাল বিয়া ছুটি বানাইয়া
ব্যাং ভাড়া করিব। অঙ্গদিকে গুবরে গোক ও অজ্ঞাত
পক্ষ দেখিতেও মত ছিলাম, কারণ এই রংবাহার কীট
গুলিকে আমি সঞ্চয় করিতে আনন্দ পাইতাম। ছোট
ছোট কিংবদন্তি কাল ছাপ দেওয়া টিউবিকুলিকে
দেখিতেও আমার ভীষণ নয়। কিন্তু আমার ভয় ছিল
শাপের। সেখানে বেশী ব্যাংয়ের ছাতা ছিল না।
ব্যাংয়ের ছাতা-পাইতে হইলে বার্ক-বনই সবচেয়ে ভাল—

চলিলাম সেইদিকে। বন জঙ্গল অপেক্ষা আর কিছুই
বোধহয় জগতে আমি অধিক ভালপাই নাই। সেখানকার
ব্যাংগের ছাতা, সেখানকার বুনো ট্রেবলী, পোকামাকড়,
নানারকম পাখী, কোঁপের মধ্যে হেজহেজ ও কাঠ-বেরালী
বার শুকন পাতার ভিত্তে সোঁদা গন্ধ আমার কাছে ছিল
স্বতীয় প্রিয়। সেই বার্ক-বনের আশ্রয় যেন আমার
নামিকায় আঙও বর্ধন্যম হইয়াছে। এই বনের বিভিন্ন
অজ্ঞাতা আমার অরণে অমর হইয়া গেছে। সেই শব্দ-
শেষনীয় অরণ্য মধ্যে সহসা শুনিলাম যে যেন স্পষ্ট
রবে বলিল “নেকড়ে বাঘ”। আমি ভয়ে আর্দ্রানত করিয়া
উঠলাম ও শব্দায় জ্ঞান হারায়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার
করিতে করিতে এক দৌড়ে সেই বেলা জায়গায়, যেখানে
চাষাটা চাষ করিতেছিল, সেখানে উপনীত হইলাম।

লোকটি আমাদেরই চাষী ম্যারী—লোকে তাহাকে
এই নামে ডাকিত। লোকটি দৃষ্টদৃষ্টি ভারুকীটালের
মামুষ। বয়স পঞ্চাশ। অনেকগুলি পুরুষের তাহার
হাড়ান লাড়িতে। আমি তাহাকে জানিতাম কিন্তু পূর্বে
কখনও কথা কহি নাই। আমার তারসঙ্গে সে ঘোড়া
গাথাইলে, বন্ধ নিশ্বাসে আমি এক হাতে তাহার হাল ও
অন্যহাতে তাহার আশ্বিন চাপিয়া ধরিলাম। সে দেখিল
আমি অতীব ভয়ানক। ঠাংকাইতে ঠাংকাইতে বলিলাম
“একটা নেকড়ে বাঘ”। সে মাথা উঁচাইয়া নিম্নে
চারিদিক চাহিয়া দেখিল যেন আমার কথা তাহার প্রায়
নিশ্বাস হইয়াছে। “কোঁপায় বাঘ”? আমি কপিত
কণ্ঠে বলিলাম “একটা চীৎকার...কে যেন চীৎকার
কর...নেকড়েবাঘ”। “সব বাজে ছাঃ নেকড়েবাঘ”—
ও তোমার কন্ঠনা—কোথেকে বাঘ আসবে?” সে
আমাকে সাঁহস দিতে লাগিল, কিন্তু আমি তখনও
ঈপ্সিতেছিলাম এবং বজ্রস্পৃষ্ট তাহার জামা ধরিয়া
ফ্যাকাসে মুখে পাড়াইয়াছিলাম। সে আমার দিকে
চাহিয়া একটু হাসিল—দেখা গেল সে আমাকে লইয়া
বিপর্য্যস্ত ও চিত্তবিস্তার হইয়াছে।

“কিছে তুমি যে ভয় পেয়েছ—ওঃ হে” বলিয়া সে
মাথা নাড়িতে লাগিল। “এস এস থোকা আমার কাছে

এস” বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া আমার পাশে টোকা
মাড়িল। “এস ভয় কি ভয়বান তোমার সহায়। আমার
মুখের কোণে দুইটি ভয়ে কৃষ্ণিত হইতেছিল এবং তাহা
তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাহার মোটা কাল কাল
নংওয়ালা আঙিলাগা আঁহুল দিয়া মুহূর্তব্যে আমার
কপিত ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল। বলিল “কি হনো?”
মায়ের মত মিষ্টি হাসি হাসিয়া বলিল “নীলা এস আমার
কাজে এস”।

অবশেষে আমার বোধগম্য হইল যে নেকড়েবাঘটাগ
সত্যই আসে নাই এবং সেই চীৎকার শুয়া কিন্তু তবু তাহা
এত স্পষ্ট শোনা গেল। এ রকম উদ্ভট কবনার অভাৱ
আমার ছিল পূর্বেও লক্ষ্য করিয়াছি। ভয়ে ভয়ে এবং
জিজ্ঞাসু মনে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম “তাহলে
এখন আমি বাই”। সে তেমনই হাসিতে হাসিতে বলিল
“নিশ্চয়ই—তুমি যাও, আমি দেখতে থাকব তুমি চলে
যাবে। নেকড়েটাকে কিছুতেই আমি তোমার দিকে
খেতে দেবনা। তখননা আছে, তো। যাও দ্রুত
দৌড়”। তার বচনামৃত করিত হইতেছিল যেন মাতৃস্নেহ।

আমি হাঁটিতে লাগিলাম প্রতিদপনকপদেই পিছন
ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। ম্যারী তাহার খোঁড়া
লইয়া দ্বন্দ্ব হইয়া পাড়াইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল,
এবং যতবারই আমি পিছন ফিরিলাম আমার দিকে
মাথা নাড়িয়া সাঁহস দিতে লাগিল। সত্যপণিতে কি,
আমার ভয়গাওয়া সে দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া আমার
বড়ো লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু হইলে হইবে কি,
খাদের মাঞ্চবরাবর যে খামার আছে সেখানে না পৌছান
অবধি আমার ভয় দূরীভূত হইল না। সেখানে আসিয়াই
আমার ভয় চুটিয়া গেল। দেখি অকস্মাৎ আমাদের
কুকুর ভল্টচক্ক দৌড়িয়া আমার দিকে আসিতেছে।
তাহাকে পাইয়া আমি আরও নিরাপদ হইলাম এবং
শেষবারের জঙ্ঘ ম্যারিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার
আগমন পথ অস্মরণ করিয়া দৃষ্টি চালনা করিলাম।
তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু অহতত করিলাম
সে এখনও সেইরূপ পাড়াইয়া পাড়াইয়া মাথা নাড়িতেছে

কণ্ঠিনেটাল

ব্যাক অব এশিয়া লিং

হেড অফিস—১২ নং ক্রাইস্ট স্ট্রিট, কলিকাতা।

ফোন : ক্যাল ৫৮৯০

পৃষ্ঠপোষক—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শাখা ১ম

১। সাউথ কলিকাতা	১৭। মাদারীপুর
২০। দাশবিন্দু হাউস এডমিট	৮। চরমুগরিয়া
২। ঢাকা	৯। শ্রুতামগজ (সিলেট)
৩। নারায়ণগঞ্জ	১০। শিলাং (আসাম)
৪। মিরকাসিম	১১। ভোলা (বরিশাল)
৫। সোহজদ	১২। বুদাবন (মথুরা)
৬। গোপালদি	

সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্য্য করা হয়।

ও বিধমবুধ হাজ করিতেছে। আমি হাত নাড়িয়া তাকে নিশানা দিলে সে সরেছে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাহার খোড়া কালাইয়া দিল।

এই ঘটনা ঘোত সহসা আমার মনগহনে এক নিমেষে নির্গত হইয়া আসিল—জানিনা কেন, কিন্তু সে ঘটনার পুনরুক্তি যে কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। সহসা সংজ্ঞা লাভ করিলাম ও উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম আমি সেই স্বপ্ন-স্থতির সংস্পর্শে ভগ্নমণ্ডল নিঃশব্দে হাসিতেছি। আবার কিছুক্ষণ সেই ভাবনা।

সেদিন বাজী ফিরিয়া কাছকেও আমার সেই “জুসাসহিক” কার্যের ইতিবৃত্ত বলি নাই। প্রকৃতপক্ষে যারিকৈও আমি শীঘ্রই বিদূত হইলাম। পরে তাহার সহিত এখানে শুধানে সাক্ষাৎ হইয়াছে কিন্তু কথা কহি নাই কোন বিষয়ে। আজ এই দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে, সাইবেরিয়ার কারাগারে তাহার সহিত সেই জীতিবিদ্যার সাক্ষাতের ছবিটি ইলবলে এক নিমেষে ভাস্বর হইয়া উঠিল! নিতান্ত অবহেলায় যে বস্ত্র এতদিন আমার ক্ষুর-কন্দুরে পড়িয়া ছিল, আমার অজানিতে, তাহাই আজ আব্বানমাত্র হস্তি হইতে জাগিয়া উঠিল। সেই দীন চাণীর নমস্তায্য মাতৃদেহবিগলিত হাসি আজও আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে সে কেমন করিয়া আমাকে অভয় দিয়াছিল এবং মাঝা নাড়িয়া বলিয়াছিল “ওঃ কিছু না, কিছু না—ছোট খোকা ভূমি ভয় পেয়েছ।” তার দেই মাটি মাখান আঙ্গুল দিয়া

সাবধানে আমার কস্তিতওঠে স্পর্শ করিয়াছিল তাহাও বিদূত হইবার নাহে। স্বভাবত গুরুত্ব অবস্থায় সকলেই অসহায় বালককে আশ্বাস দিত কিন্তু, সেই নিজন-সাক্ষাতে নিশ্চয়ই আরও কিছু রহস্ত লুপ্তায়া ছিল। যদি আমি তাহার আপন পুত্র হইতাম তাহা হইলেও বোধ করি ইহা অপেক্ষা অধিক যেরূপবশ হইয়া আমাকে অভয় দিত না। কিন্তু কেন সে একরূপ কোমল ব্যবহার করিল? সেকি শিশুদের স্বভাবত ভালবাসিত? তাহার সহিত বিজনে আমার মিলন হইয়াছিল, জনশ্রুত মাঠে এবং একমাত্র কেবল ভগবানই দেখিয়াছেন সে কী গভীর আশ্রিত ও যেরূপত হৃদয়ে, কী অপরিণীম নারীহৃদয় কোমলতা দ্বারা আমাকে শাস্ত করিয়াছিল—অথচ সে একজন সামান্য, জ্ঞানালোকবর্জিত, অমার্জিত বাসিন্দা দাস, যাহার না ছিল কোন আশা আকাঙ্ক্ষা, না ছিল বাক্তি স্বাধীনতার বিস্মৃতা বারণা। কী প্রক্রিয়ায় এমন হইতে পারে তা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।

বিভাদনা হইতে নঃমিয়া আমি চারিদিকে চাহিলাম। আমার সহসা অস্বস্তি হইল, আমি এই সকল অস্বস্তি ভূতাপাদের পত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে চাহিতে সক্ষম। পলকমাত্র আমার অন্তরের সেই জাগা, সেই বুনা ও ক্রোধ যেন বাহুবিন্দায় কোথায় অস্থিত হইয়া গেল। আমি পায়চারি করিতে লাগিলাম, অনেকের মুখোদধি হইল। ঐ যে চাণী যাহার মুখে দোখীর ছাপ যারা বহিয়াছে, ভাস্করগণ্য মদের “খোরে” গানের ভঙ্গিতে চাঁৎকার করিতেছে জানিনা সে হয়তো যারি হইতেও পারে! আমিতো তাহার অশুভাঙ্গীকে দেখিতে পাইতেছি না।

শ্রীমুক্ত “ম” এর সহিত আমার সেদিন সন্ধ্যায় আবার সাক্ষাৎ হইল। হায় তাহার আমার মত, স্থতির সম্বল যে একেবারেই ছিলনা যাহাতে, এই “অসত বন্ধর ডাকাত দল” কে সে এক নবীন দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতে পারে!

দোল সংখ্যা

বাংলার প্রাচীন শিল্প-কলা

প্রাচীন-পূর্ণা



শ্রীমারম্ভী (পাথরের)

পূঃ ১০ম শতাব্দী

হৃদয়বন, ২৪ পরগণা

(যান্ত্রিক মিউজিয়ামের সৌজ্যে)



নারীমূর্তি (পোড়ামাটির)

পূঃ ১ম-২য় শতাব্দী

বানগড়, দিনাজপুর

(যান্ত্রিক মিউজিয়ামের সৌজ্যে)

দক্ষিণায়নের

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের

নূতন কাব্যগ্রন্থ

দ্বিপ্রহর (যন্ত্রস্থ)

সমবায় পাবলিশার্স

৩৩২, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।



ভবিষ্যৎ

(উপন্যাস)

শ্রীমতীন্দ্র মোহন খুশোপাধ্যায়

বিশ্রামে যেন বসপাত হইয়া গেছে।

চিন্তাহরণের রক্ত মূর্তি দেখিয়া মুকুল এবং সীতা নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সীতা চাহিল মুকুলের পানে। মুকুলের চোখের দৃষ্টিতে মুহু ইঙ্গিত—সে-ইঙ্গিতের মধ্য বসিতে সীতার বিলম্ব হইল না। হৃৎকেন্দ্রে তখন মুকুল-অভিনেতার মতো বঙ্গবল হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

হৃদয়ার ভূমিয়া গিরিবালা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আদিত্যকে তিনি দেখিলেন—পাণ্ডু বিবর্ণ মুখে বেজাহতর মতো নিশব্দে বাহির হইয়া গেল।

আসিত্য চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইবার পর পাচ-মাত মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর জাহ্নবী কোনো মতে পা ছুটীকে টানিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। চিন্তাহরণ বাহুমন্ডার রেলিঙে ভর দিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গিরিবালা ঊঁর কাছে আসিলেন, বলিলেন,—
বাণীর কি?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তাহরণ চাহিলেন গিরিবালায় পানে; তারপর চারিদিকে। জাহ্নবীকে বারান্দায় দেখিলেন না। নিশব্দে তিনি স্বামনের ইজিচেয়ারে বসিয়া একটা সিগার ধরাইয়া মুখে ধিলেন।

গিরিবালা কহিলেন—কাকে অমন করে ধমকালে?

গভীর কণ্ঠে চিন্তাহরণ কহিলেন—আদিত্যকে।

—ঐ সব কটু কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দিলে?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

চিন্তাহরণ বাহিরের পানে চাহিয়া গভীর-কণ্ঠে বলিলেন—তার পর মানে, ওর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ হবে না—হতে পারে না।

গিরিবালা একেবারে কাঁটা। ঊঁর মুখে কথা সরিল না।

চিন্তাহরণ কহিলেন—ওর আজ যে-পরিচয় পেয়েছি... এত বড় সুকাউণ্ডুল।

গিরিবালায় বুকখানা ঝকু করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন—কি এমন পরিচয়, শুনি?

চিন্তাহরণ চাহিলেন চারিদিকে—তারপর বলিলেন—জাহ্নবীর শোমবার দরকার নেই। তাকে এ সব কথা বলো না যেন।

গিরিবালা বলিলেন—সে বিচার পরে হবে। এখন তিনি কি এমন ওর পরিচয়।

কণ্ঠ মুহু করিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন—ওর কাছে শুনেছো তো, শিলিগুড়িতে ওদের বাড়ী ছিল—বাণীর মস্ত কারবার ছিল—দার্কিলিংয়ে হামেশা আসা-যাওয়া করতো।

এতখানি ভূমিকা গিরিবালায় ভালো লাগিল না—এ সব কথা তিনি জানেন। যা জানেন না, তা শুনিতে অধীরতার গীমা নাই। একটু অসহিষ্ণুত্বে তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, সে তো শু নিজেই বলেছে—এর মধ্যে তোমার নতুন আবিষ্কার করার কিছু দেখছি না তো!

চিন্তাহরণ বলিলেন—হঁ—দাঁড়াও—অত ব্যস্ত হলে চলবে না।

গিরিবালা বলিলেন—বলো, তোমার যা বলবার আছে।

চিন্তাহরণ বলিলেন—পাচ-সাত বছর আগে উনি এসেছিলেন এই দার্জিলিং সহরে। চান্দমারী মহল্লায় আস্তানা নিয়েছিলেন। সেই চান্দমারীতে থাকতো একজন আবগারী-দায়েগা...তার নাম ছিল মনসা হালদার। মনসা হালদারের এক ভাগনী ছিল...ভাগর বয়স—বিধবা। তার সঙ্গে গুরু এতখানি অন্তরঙ্গতা হয় যে শেষে বাধা হয়ে সেই মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছিল। বৌ নিয়ে চান্দমারীতে চার বছর ছিলেন—ঐ মনসা হালদারের বাড়ীতেই। ছোট একখানা চায়ের দোকান গুলেছিল। তারপর একটি ছেলে হয়—আর একটি মেয়ে হয়। মনসা হালদারের ওদিকে পেশন্দ হয়ে যায়। চায়ের দোকানের আয়ে গুরু আর গুরু বৌয়ের আর ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ চুষটি হয়ে ওঠে। মনসা হালদার তখন ওকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দোসরা বাসা টিক করতে বলে। সেই বলার ফলে স্বীকে আর ছেলেমেয়েকে মনসা হালদারের খাড়ে চাপিয়ে বাবুজী দেন লখা!—এ-মুখে হমনি

বাংলার সর্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ

এসিয়ায়েন্স লিমিটেড

স্থাপিত ১৮৯১

চাঁদার হার নিয়ন্ত্রণ

লাভজনক হারে এজেন্সীর জন্য আজই
আবেদন করুন

হিন্দু মিউচুয়াল হাউস

১৪, ব্র্যাডান ষ্ট্রট, কলিকাতা।

আর। তাদের বোজ-খপরও রাখেননি। এখন সেই মনসা হালদারের ভাইপো ঐদৈবৎ কবে বুঝি ওকে আমার বাড়ী থেকে বেরুতে দেবে। পাছু নিয়ে গুর হোটেলে গিয়ে তল্লাশ নেছে। সেখানে বুঝি শুনেছে, আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা, তাই সে ভুললোক এসেছিল আজ আমার কাছে—গুর পরিচয় বলে দিয়ে আমাকে হাশিয়া করতে!—বুঝলে?

বটলার-ভাণ্ডা উপহাসের কাহিনী শুনিলে বিশ্বাস করিতে যেমন প্ররক্তি হয় না—অথচ সে গেলে রস প্রচুর, এ যেন ভেনমনি! গিরিবালা কহিলেন—ভুললোক এই গর বলে গেল, আর শোনবামাত্র তুমি এ গল্প বিশ্বাস করে ওকে যা-তা মন্ত কথা বলে শেয়াল-কুকুরের মতো বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে!

চিন্তাহরণ বলিলেন—এ কথা শোনবার পরেও তুমি ওকে জামাই-আদরের সধর্মনা করতে বলা!

গিরিবালা বলিলেন—সধর্মনা না করো, তা বলে অপমান করবে। এ গল্প সত্য, কি মিথ্যা—তার কোন সন্ধান না নিয়েই?

চিন্তাহরণ বলিলেন—একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি!—আহা, বুঝেছা না, আদিভার উপর ভরলোকের কি এমন জাত-কোষ থাকতে পারে যে তার জন্ম ভুললোক—এসে এমন একটা বিব্রী গল্প বানিয়ে বলবে তার নামে?

গিরিবালা কয়েক চুপ করিয়া রহিলেন—স্বামী ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিলেন; তার পর অবিচল শব্দ বয়েই বলিলেন—জাতকোষ আছে কি না, তার খপর নিয়েছো তুমি?

চিন্তাহরণ চমক করিয়া জবাব দিলেন—আমার প্রয়োজন?

রাগে গিরিবারার সর্বাপ জলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ের কথা পাকা—কুড়ি, পরে বিয়ে হবে, তার নামে অজানা কে এসে এত বড় অপবাদ দিয়ে গেল, আর তুমি সে অপবাদ বিশ্বাস করে খাড়া হয়ে তাকে বিদায় দিলে?

—নিশ্চয়!—আমার এক মেয়ে। সে যার-তার মেয়ে নয়। বড় ঘরে তার বিয়ে দেবার মতো সামগ্রী আমার আছে। মেয়ে দেখতে ভালো। যার নামে লোকে এস-ব কথা বলবার স্বযোগ পায় এবং সে সব কথা এমন গল্পান মুখে বলতে পারে—তার সংসর্গ যে ইতর, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না! তবে? কাজ কি আমার ভুলোশালের মধ্যে গিয়ে! লোকের মুখ তো চাপা দিতে পারবো না! আমি এখন নিষ্ঠুর পাজ গুঁজে বিয়ে দিতে চাই, যার নামে কেউ একটা কথা বলতে পারবে না!

গিরিবালা বলিলেন—মাফকের মতো কথা এ নয়!—তাছাড়া তোমার মেয়ের সঙ্গে এতদিন এমনভাবে মেলা-মেশ করেছে—বাড়ীতে জামাইয়ের মতো আদর-যত্ন করছি আমরা—সত্যিই যদি তোমার ঐ ভুললোক যা বলে গেছে, যদি তাইই হয়, তা হলে এমন করে হঠাৎ যে ওকে আজ তাড়িয়ে দিলে—ও যদি তোমার মেয়ের নামে পাচটা কথা রটনা করে বোঝায়, তাহলে কোন্ বোনেন্দী বড় ঘরে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে, তুমি?

চিন্তাহরণ বলিলেন—আমার মেয়ের নামে যদি কেউ তেমন-কিছু গল্প রটায়, লোকে তা বিশ্বাস করবে?

—কেন করবে না?—আদিভার নামে এ রটনা তুমি যদি বিশ্বাস করো, তাহলে তোমার মেয়ের নামে রটনা লোকে কেন বিশ্বাস করবে না, বলতে পারো?

গিরিবারার কথা চিন্তাহরণের মনকে বেশ একটু ঝোঁকা মিল। যাহা করিয়াছেন, সে-কাজকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া শ্রম দিয়া মন নিশ্চিন্ত ছিল। এখন গিরিবারার কথা শে-কাজের চারিফি করিয়া এত বকমের কলহর! চিন্তাহরণ বলিলেন—তুমি কি বলতে চাও, তুমি?

গিরিবালা বলিলেন—ভুললোক যে এস-ব কথা বলে গেলে, তোমার উচিত তাকে ধরে রেখে আদিভাকে ভাঙ্কিয়ে এর মোকাবেলা করানো। তার দি না করালে, বেশ, আদিভাকেই তো শাস্ত মোজাজ বলাতে পারতে যে বাপু, এমনি কথা উঠেছে তোমার নামে, এ সধর্মে

তোমার কি বলবার আছে?—মাফকের মতো চিনতে ভুল করে, এমনও তো হয়!

গিরিবারার কথায় চিন্তাহরণের মন আছত সাপের মতো ফণা গুটাইয়া নিভীপ পড়িয়া ছিল; কথার শেষটুকু শুনিবামাত্র নিভীপ মন আবার ফৌপ করিয়া ফণা ফুলিল।

চিন্তাহরণ বলিলেন—সে নিশ্চয় বলতো, মিথ্যা কথা মশাই!

গিরিবালা বলিলেন—তার মুখ থেকে সে কথা না শুনেই তুমি ডিক্কী-ডিসিমিস করতে চাও?

চিন্তাহরণ বলিলেন—আজ্ঞা, আসিতা যদি সত্যই দেখি হয়—এত-বড় অপকর্ম করে তারপর আমার বাড়ীতে এসে অকৃষ্টিভাবে আশা-বাণী করতে তার যদি না বেধে থাকে—তার উপর আমার একটি-বাড় মেয়ে—তাকে বিয়ে করে আশায়ে থাকবার এত-বড় স্বযোগ—এ স্বযোগ সে হাড়বে, ভাবে? তোমার মেয়েও যখন এতখানি মন পড়েছে ওর উপর—

এই পর্যন্ত বলিয়া চিন্তাহরণ চাহিলেন গীর পানে—

চুই চোখে বিজয়-উল্লাসের প্রদীপ টুটি তরিয়া।

গিরিবালা কোনো কথা বলিলেন না; কি ভাবিতে ছিলেন—

তাকে নিরন্তর দেখিয়া চিন্তাহরণের মুক্তি অনেকখানি শক্তি লাভ করিল। চিন্তাহরণ বলিলেন,—গেঁমু! থেকেই আমার এ বিয়েতে আপত্তি! গোন্ধ-কুকুর কিনতে গেলেও মাফক দেখে তাদের পেড়িও—বংশ! আর মেয়ের বিয়ে দেবো যার সঙ্গে, তার বংশের পরিচয় দেবো না!

গিরিবালা বলিলেন—এত যদি হানো, এ পরিচয় তোমার অন্তরে আগে নেওয়া উচিত ছিল। তুমিও তো এ বিয়েতে মত দেবে! তোমার অন্যতে বিয়ের কথা পাকা হয়নি।

চিন্তাহরণ ঝাঁজিয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমার মত তোমরা নিলে কৈ? দায়ে পড়ে আমাকে মত দিতে হয়েছে। তোমার মেয়ে ধরলে গৌ—তুমিও মেয়ের

গোয়ে-নিজের গৌ মেশালে! মন ছলে আমি...আমার একটা পোশাকিনশন আছে সমাজে! এর পর লোকে জিজ্ঞাস করবে, কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে যে? তার জবাব কি যে দৈবে ছাই, আজ পর্যন্ত ভেবে ঠিক করতে পারবুম না!

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া উদাস কণ্ঠে গিরিবালা বলিলেন—খুব অজ্ঞায় কাজ করেছে। কি যে হবে...

উদ্বেগের গভীরতায় গিরিবালা কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। তাঁর মুখে হতাশার স্বগভীর ছায়া ফুটিল।

চিন্তাহরণ তাহা লক্ষ্য করিলেন; লক্ষ্য করিয়া চিন্তাহরণ হইলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন স্ত্রীর ধানে।

গিরিবালা কোনো জবাব দিলেন না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বারান্দার রেলিংয়ের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কাদের বাড়ীতে পিয়ানোয় কে একটা গম্ব বাজাইতেছিল...বিলাতী স্বর! স্বরে বেদনা যেন উচ্ছলিয়া পড়িতেছে!

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিয়া গেল...কাহারো মুখে কথা নাই। তারপর সহসা গিরিবালা ফিরিলেন...ফিরিয়া চিন্তাহরণের পানে দৃষ্টির একটা কথাও নিম্নেপ না করিয়া নিশ্শব্দে গিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

ঘরের মধ্যে কোঁচে বসিয়া জাহ্নবী নিবিষ্ট মনে কুম-কাটিতে পশমের জাম্পার বুনিতেন। গিরিবালা

তার পানে চাহিয়া শামনের কোঁচে বসিলেন; বসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। জাহ্নবী তাঁর পানে চোখ তুলিয়া চাহিল না...নিবিষ্ট মনে জাম্পার বুনিতেন লাগিল।

অনেকক্ষণ এমনি ভাবে কাটিল। তারপর গিরিবালা ডাকিলেন—জাহ্নবী...

জাহ্নবী স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল।

গিরিবালা বলিলেন—সব শুনেছিস তুই?—ওর কণ্ড?

জাহ্নবী কোনো জবাব দিল না...মাথা তুলিয়া মায়ের পানে চাহিলও না।

গিরিবালা বলিলেন—এমন কাপ-পাতকা বাহু... চিরদিন একভাবে কাটিলো! বাহু এসে যদি বলে, কাকে কাণ নিয়ে গেল তো কাণে হাত না দিয়ে কানের পিছনে ছুটবেন। কেউ যদি এসে বলে, তোমার পরিবার কাকে লুকিয়ে চিঠি লিখেছে...তার কথায় বিশ্বাস করে স্ত্রীর গর্দান নেওয়া বিচিত্র নয়! অন্যায় আর কাকে বলে?

এত কথাতেও জাহ্নবীর দিক হইতে সাড়া মিলিল না।

গিরিবালা বলিলেন—তোকে সব বলছি যা...ব অজ্ঞায় কাজ করেছেন উনি। কোথাকার কে এসে কাণে বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে...সে-লোকটা যে কি ধাতের, কি তার মতলব...আগে তার খোঁজ নাও...

“মুত্তন ধরণের উপস্থান, লেখক শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।”

—“শনিবারের চিঠি”

“The author's power of storytelling and characterisation promises for him a bright future.”.....

—G. B. Hindusthan Standard

“মেঘদূত” প্রণীত “আগামী” (গল্পবিতান)

শ্রীযুৎ বাহির হইবে।

না, থাকবে আশ্রয় লাগলো!...তোকে যা বলি, করতে হবে! নাহলে বাড়ীর বদ নাম হবে মা!

১০

ওস্তিতের মতো আশ্রিত ওদিকে সেই যে চিন্তাহরণের গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইল, পথে কোথায় চলিয়াছে, মনে চলিয়াছে, সে সঞ্চকে তার যেন কোনো চেতনা ছিল না। চেতনা জাগিল হিম-ভিড়ের ধারে আসিয়া।

চেতনা জাগিবারমত মনে হইল, যা ঘটিয়াছে, তা গত্য? না, স্বপ্ন দেখিয়াছে?

স্বপ্ন যে নয়, তাহা বুঝিতে এতটুকু বিলম্ব হইল না! কিন্তু এত বড় অকথা চিন্তাহরণ কেন বসিলেন? চোর-দমনায়ের মতো এমন করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া বেড়া! সে কি করিয়াছে...কি এমন ভুলভিত...যার জন্য তাকে সুকোউল বসিতে চিন্তাহরণের বাহিল না? আসিয়া নিজের ঘরে বসিল।...বৈকাল হইতে বাহা যাহা ঘটয়াছে, স্মৃতিপথে টানিয়া জড়ো করিল... বিব্রম করিতে লাগিল...

জাহ্নবী আসিয়াছিল তার গৃহে...সন্ধ্যার ঠিক আগে। এহা আসে নাই...সন্দেশ মুকুৎ এবং সীতা। জাহ্নবী বলিল, বিরুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ত্রুপরে বাহু বেড়াইতে বাহির হয় না, বাহির হয় বৈকালে! জাহ্নবী তাহা হইলে বৈকালেই বাহির হইয়াছে! বাড়ী হইতে যখন বাহির হইয়াছিল, তখন আশ্রিতার উপর চিন্তাহরণের মনোভাব খুব-সম্ভব এমন বিরুদ্ধ এবং উগ্র ছিল না!...খাতিরে সে তত্ত্ব মনোভাবের ‘ফুলিঙ্গ জাহ্নবী’ নির্ভয় লক্ষ্য করিল। এবং লক্ষ্য করিলে এমন অগোচরে সে আশ্রিতার গৃহে সবারূপে আসিয়া উদয় হইতে পারিত না! উদয় হইলেও বাক্যে বা ভঙ্গীতে হয়তো অহযোগ-অভিযোগ প্রকাশ করিত! তা সে করে নাই। সীতা বা মুকুলের ব্যবহারেও চিন্তাহরণের উগ্রতার আভাস জাগে নাই। সীতা যে সরল, সহজ ভঙ্গীতে তার সঙ্গে আশা করিয়াছিল, সে ভঙ্গী হইতে আশ্রিতার উপর তার প্রসার লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। স্তব্ধতা...

জাহ্নবী বাহির হইয়া আসিবার পর বাড়ীতে এমন কিছু ঘটয়া গিয়াছে, যার জন্য চিন্তাহরণ রাগে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন! তার সঙ্গে জাহ্নবীর বিবাহ বিতে চিন্তাহরণের ইচ্ছা ছিল না, একথা আদিত্য জানে এবং অতীতে তাঁর এ অনিচ্ছা কোনো দিন এতটুকু রূঢ় ভাবে তাকে আঘাত করে নাই!

হঠাৎ কি এমন ঘটয়াছে যে...

তাহার কুল-কিনারা পাইল না। মাথার মধ্যে যেন হাজার হাজার শব্দ জলিতেছে...মশালের সে আশ্রয় প্রচণ্ড দাহ!

বয় আসিয়া বলিল—থানা... বিশ্বাস ফেলিয়া আদিত্য বলিল—থানার দরকার নেই। বয় বিদায় লইল।

ডুমি-কম বেয়িয়ায় বাজিতেছিল বিলাতী অর্কেস্ট্রা... উদ্দামতার স্বর! সে স্বর অসহ্য বোধ হইল! অশচ উপায় নাই!

আদিত্য একথানা বই গুলিয়া বসিল। একটা লাইন পড়িতে পারিল না। পাগলের মতো মন কোথায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে...সম্পূর্ণ উদ্বেগজনীন...লক্ষ্যহীন!...

কত দিক দিয়া কত কথ সে ভাবিতে লাগিল... কিন্তু কোনো কথাই মনের উপর বসিতে পারে না! মন যেন সেই রক্ত ভেরবের মতো সব কথা, সব চিন্তাকে আঘাতে জর্জরিত করিয়া ধরে ধৈর্য্য দাখ! মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি পাখাণের সেই পাগল ফকিরকে...আশ্রিতার মনও আজ সেই পাগল ফকিরের মতো সব-কিছুকে “সুটা ছায়” বলিয়া দূরার মতো উৎকণ্ঠ করিয়া দিতেছে!

মাথায় যেন বোলতাত চাক! হাজার হাজার বোলতাত ধংশে যাতনার সীমা নাই! জর্জরিত অংগের দেহ-মন লইয়া আশ্রিত্য নিরুপায় শয্যায় আশ্রয় লইল। নিজের কখনা...নিজা আসিয়া যদি মিত্র কর-পার্শ্বে সর্ব বাতনা মুজাইয়া যায়!

সারা রাত্রি নিশ্চেতনের মতো নিজায় কাটিল। এমন ঘুম আদিত্য বহুকাল ঘুমা নাই!

দূম ভাঙ্গিল সকালে হারের মল করামাতের শব্দে।
উঠিয়া হার খুলিয়া আদিত্য দেখে, সেই গলার কক্ষটার
জড়ানে, গায়ে ওড়ারকোটি চড়ানে মৃতি...সঙ্গে একজন
নেপালী দাই। দাইয়ের কোলে একটি শিশু-কন্যা এবং
দাইয়ের হাত ধরিয়া পাড়াইয়া আছে ভীক চোখে শীর্ণমুখি
একটি বালক। বালকের বয়স চির চার বছর।

লোকটার স্পষ্টা দেখিয়া আদিত্য রাগে জলিয়া
উঠিল। আলাপ নাই, পরিচয় নাই...সকালে আসিয়া
ভ্রম্মলোকের হারে হুলা করে!

চোখে এবং কণ্ঠে বিরক্তি ভরিয়া ক্রুদ্ধিত করিয়া
আদিত্য বলিল—কি চাই?

বের-বিজড়িত কণ্ঠে সে বলিল—মশাইকে চাই!

বিরক্তি ছাপাইয়া বিশ্বয় বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে
হইল, এই লোকটাই না তার ফটোগ্রাফ, চুরি করিয়া
লইয়া গিয়াছে?

এই প্রতিষ্ঠানেরই

পৃষ্ঠপোষকতা করন

ইহাই ভারতের প্রাচীনতম

জীবন বীমা অফিস

বোম্বে মিউচুয়াল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিম্.

স্থাপিত ১৮৭১

পারস্পরিক সহযোগিতার একটি ঐতিহ্য প্রতীক

চিফ এজেন্টস—

দত্তিদার এণ্ড সন্স

৮, রাইড ট্রাট, কলিকাতা।

আদিত্য বলিল—এ সময় ভ্রম্মলোকের সঙ্গে মাহু
দেখা করতে আসে না!

লোকটা বলিল—ভ্রম্মলোক যদি সব সময়ে বাস
থেকে গা ঢেকে বাইরে বেরতে থাকে?

হুচোখে আশ্চর্য জলিয়া উঠিল। আদিত্যর মনে
হইল, মারি বা কি লোকটার মুখে জোর-মুখি...
কোনোমতে মনের রাগ মনে চাপিয়া বলিল—আমাকে
কি দরকার চটপট বলে-বিদায় নিম্ন। আশানার সঙ্গে
বলে আলাপ করবো, সে অবসর আবার দেই।

লোকটা তখন দাইয়ের হাতের গ্রাস হইতে ছোট
ছেলোটিকে টানিয়া আনিয়া বলিল—এ ছেলোটিকে
চেনেন?

বালকের পানে চাহিয়া আদিত্য চমকিয়া উঠিল।
এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই; এমন করিল। বালকের মুখখানা
যেন পরিচিত...ও মুখে যেন...

বিশ্বয় এবং প্রশস্ততা কণ্ঠে আদিত্য বলিল—না।

লোকটা অবিচল নেত্রে আদিত্যর পানে চাহিয়া
রহিল; তারপর বলিল—মনসা হালদারকেও বোধ হয়
মনে দেই?

মনসা হালদার!...বাস্তব জগতে যতগুলি লোক ছিল
পরিচিত, তাদের মধ্যে মন একবার ক্রমসংকীর্ণে মূরিয়া
সন্ধান লইল...না, মনসা হালদার নামটার সঙ্গে পরিচয়
হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। উপভাস এবং নাট্যজগতে
সন্ধান লইল। যেমন নাম, নিশ্চয় কল্যাণকোলের কোনো
টাইপ-কারেরটার। কিন্তু বহুদিনের যুগ হইতে
আধুনিক যুগের গল্প-উপভাস যা কিছু পড়িয়াছে, সেগুলার
পূর্ণ-চরিত্রগুলো চোখের সাহায্যে দিয়া বায়োম্যাটারের
ছবির মতো উদয় হইয়া জায়গা মিলাইয়া গেল...জায়ে
মধ্যেও—মনসা হালদারের সন্ধান মিলিল না...তবে
কি দীনবন্ধুর সেই নাটকে...গায়ে গুড় মাখিয়া সেই
গুড়ের উপর তুলার পাখ অঁকা? মন বলিল, না, সে
তো মবীন ভপস্বিনীর জলধর।

আদিত্য বলিল—না, মশাই, মনসা হালদারের নাম
জীবনে কখনো শুনিনি।

লোকটার নির্ণয়ময় দৃষ্টি আদিত্যর মুখ হইতে
স্রুতে চায় না। আদিত্যর উত্তর শুনিয়া লোকটি
বলিল—এমন না শোনাই সম্ভব! কিন্তু পাঁচ বছর
খাণ্ডে...এই মনসা হালদারের আশ্রয়ে দিবা সন্ধ্যা
পেতে বসেছিলেন! তার বিধবা-ভার্যাকে বিবাহ করে...
মশাই-আদরে বাস!

আহা! সকালে উঠিয়া এমন ইতর আলাপ।
বাসিত্য বলিল—পাগলামি করবার জায়গা পানি
দে! যান্ টলে। সাহায্য-চাহায্য কিছু মিলবে না।
মদ্যাবাক্ত করে ভিন্সা আদায় করবে আমার কাছ থেকে,
সে পাত্রই আমি নই!

লোকটা বলিল—ভিক্ষে করা আমার চোদগুরুম্বের
বড়ার না। সে বর বোনেন্দী ঘরের বাচ্চা বলে পরিচয়
দিয়ে মশাইয়ের শুধু...

—ববন্ধার! বলিয়া হুচোখ রক্তবর্ণ করিয়া আদিত্য
গর্জিয়া উঠিল। বলিল—বেরিয়ে যাও! যাও,
বলছি...মাছলে বেরা দিয়ে এখনি...

বাধা দিয়া সে বলিল—বেরিয়েই যাবো। এখানে
আমি থাকতে আসিনি...তবে আপনার এ ছুটি বাচ্চাকে
এখানে রেখে তার পর বেরিয়ে যাবো!

‘এই পর্যন্ত বলিয়া লোকটি চাহিল সন্ধ্যার সেই
নেপালী দাইয়ের দিকে। চাহিয়া তাকে বলিল হিন্দী-
ভাষায়—মেসটিকে বিজ্ঞানায় শুইয়ে ছেলোটাকে ছেড়ে
দিয়ে ভুই চলে আস। যার জিনিষ, সে দেবে।
আমাদের কি দায়! হুঁ!

তার কথায় সম্পূর্ণ নির্দিকারভাবে কোলের সেই
শিশু-কন্যাকে লইয়া দাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।
নিরুপায় আকাশে পাড়াইয়া আদিত্য এ দৃশ্য দেখিল...
নিষ্পন্ন নিরুপায়! বাথার মধ্যে একরাশ চকী-বাতিতে
কে যেন আশ্রয় দিয়াছে...আশ্রয়ের একরাশ ঢাকা
যেন সবগেই ঘুরিতেছে!

শীলোক এবং শিশুর পানে হাত দেওয়া যায় না...
শিশুকে বিজ্ঞানায় শোয়াইয়া দাই বাহির হইয়া
গেল। সে বাহিরে গেলে সার্বকর্তার আনন্দে

হুচোখের দৃষ্টি ভরিয়া লোকটা বলিল—আমার নাম
কলি হালদার। মনসা হালদারের ভাইপো আমি।
এখানকার ডিটিলারীতে কাজ করি। আমার বিধবা
পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে ছেলেমেয়ে-গুড় তাকে
তাগা করে ক’বছর নিকশেদে হয়েছিলেন! ভেবেছিলেন,
এর মধ্যে বংশলোপ হয়ে এ-ব্যাপটাদের সব সাক্ষর
গেছে, তাই আবার এখানে এসে উদয় হয়েছেন।
বৈবাহ্য সেই পথে দেখা। বাড়ীতে ফটো আছে তো...
তাই থেকে মশাইকে পেয়ে সেদিন চিনতে দেবী হয়নি...
বুধলেন!

এইখানে কথা থামাইয়া ছোট ছেলোটিকে আদিত্যর
দিকে ঠেলিয়া সে আবার বলিল—যা রে বুনা;
বাপের কাছে যা। আমার...বলে, নিজের জোটে না
হুঁবেলা পেট পুরে খেতে, তার উপর কে পিসতুতো
বোন! এদের উপর বিধকোড়া...সেই পিসতুতো
বোনের ছু ছোটো ছেলেমেয়ে...নিম্ন মশাই, ছেলেমেয়ে
নিম্ন। এদের মাকেও পারিয়ে দেবো। যানে, আমার
রাজু দ্বিদি। চলে আস, দাই।

কথা শেষ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষামাত্রা না করিয়া
কলি হালদার বীর-পদভরে গমনোজ্ঞত হইল; দাই
তার বোম্বা নামাইয়া তিলমাত্র বিলম্ব করে নাই, পুর্বেই
বাহির হইয়া গিয়াছে।

কলি হালদারকে গমনোজ্ঞত দেখিয়া আদিত্য
বলিল—আপনি ভুল করছেন মশাই! আমি সত্যি
মনসা হালদার বা আপনার ঐ রাজুদ্বিদি
চিনি না।

তার দিকে না ফিরিয়াই শ্বেত-মিশ্রিত উচ্চ হাস্তে
বারাণা প্রকম্পিত করিয়া কলি হালদার প্রস্থান করিল।
আদিত্য মস্ত-শুস্তিতের মতো তার পানে চাহিয়া
রহিল—নিরুপায়...নিষ্পন্ন!

শ্রমো হুয়া মাত্রভিন্দো হু...টিক যেন তাই।
চকিতে সন্নিহিত ফিরিল ছুটি নিরীহ শিশুর কন্ডনে।
আদিত্য চাহিয়া দেখে, ছলনে তার-বরে কান্না জড়িয়া
দিয়াছে।

কর্তব্য নিন্দার কথা ফেলিল—উজ্জীলারিতে কাজ করে? নাম, কালি হালদার! কিন্তু এখন ইহাদের একজন—যার ক্ষেতাই হোক, নিরীহ নিরপরাধ শিশু!

আদিত্য আসিয়া তাদের তুলাইতে বলিল। কুলিতে কি তারা চায়? আদিত্য ডাকিল,—বয়...

ইয় আসিল।

আদিত্য বলিল,—খাবার আনো—চকোলেট—বিস্কট।

বুয় চকোলেট-বিস্কট আনিয়া দিল। খাটে ছ'জনকে বসাইয়া তাদের পাশে-বসিয়া আদিত্য সেগুলি দিল। ভজনের মুঠা ভরিয়া। মুখে বিস্কট দিতে তারা থাকিল।

আদিত্য ভাবিল, এখন এ-বিপদ হইতে মুক্তি মেলে কি, করিয়া? চিন্তায় মন সমাচ্ছন্ন—এমন সময় ধারে আসিয়া ঝাড়াইল জাহ্নবী—যেন মলিন ছায়া! মুখে হাসির যে-দীপ্তি বিরাজ করিত, কালো মেঘ মুখে নামিয়া সে-দীপ্তি যেন মুছিয়া দিয়াছে!

জাহ্নবী ডাকিল,—আদিত্যবাবু...

আদিত্য চাহিল তার পানে। জাহ্নবী বলিল—ও... না, থাক...

কণার সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রাৎ-চমকের মতো জাহ্নবী চকিতে চোখের আড়ালে মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

(জমাৎ)

—জাতীয় কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত—

উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস:

৩ ও ৪, হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা

—শাখাসমূহ—

ঢাকা, কালিঙ্গপু, শিলিগুড়ি,
শান্তিপুর, বালি, রাজসাহী, বগুড়া, কলকান্দিয়া,
ভারকেশ্বর, রাণাঘাট, বড়বাঙ্গা, হাওড়া, শ্রীবাঙ্গার ও
সুত্রগড় (শান্তিপুর)

ম্যানেজিং ডায়েরেক্টর:

মিঃ এস. কে. চক্রবর্তী

ফোন:

কল্যাণকাটা—৬১১

দার্মিঞ্জি, বাড়গ্রাম ও
বেলুড শাখা লিডই
খোলা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা বনাম শ্রীযীহোবালীলা

(প্রবন্ধ)

জে, এশ, আমেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে আমরা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন অবধা ব্রজলীলার বর্ণনা পাই। এই লীলার শ্রেষ্ঠাংশ আদি লীলা। এই আদি লীলা তিন ভাগে বিভক্ত, যথা:—

১। ব্রজবালকদের সহিত—সখালীলা।

২। মাতৃস্বামীয়া গোপীদের সহিত—বাৎসল্য-লীলা।

৩। ব্রজ বৃন্দের সহিত—মধুরলীলা বা প্রেমলীলা।

এই শেষোক্ত লীলা অবলম্বনেই বৈষ্ণবকবিগণ কত মনোহর প্রদর্শন রচনা করিয়াছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্ত কবিগণ এই লীলা-গীতি রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে বহু-কালাবধি রাধা-কৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে যাত্রা, কীর্তন ও কথকথা ইত্যাদির অভিনয় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যের বিষয়, অজ্ঞাপি এই লীলার বিষয়বস্তু অনেকেরই অবিদিত, ইহার প্রকৃত রসাস্বাদন, কবিরাম ক্রমতা বা যোগ্যতা অনেকেরই নাই। এই অক্ষমতার প্রধান কারণ, আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। আমরা আজও খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা মতবাদের দ্বারা চালিত। ব্রজলীলার নিম্নাবাদ কথা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে ধোয়াধোপ করিতে আমরা অনেক সময়ে তিলমাত্র কঠাবোধ করি না। এই লীলার মাধুর্য উপলব্ধি করা দূরের কথা, বরং অনেকে ইহাকে পাণ্ডব মার্ক-নামিকার কুৎসিত কাম ক্রীড়া ভাবিয়া উপহাস বা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই তাহারা করণ্যার পাজ। বৃন্দাবনের দ্বিবিয় ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের যে প্রণয় লীলা, জগতের সর্বদাবধি প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে মধুর মঞ্চ, অবধা জীবের হৃদীর আরাধ্যাবধি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের যে তীর্থ আকাশ্য তাহা কেবল এই ধর্মপ্রধান ভারতের নয়, সর্বদেশের ও সর্বজাতির ভক্তবৃন্দের একই চিত্তাধারায় প্রভাবিত হইয়া

আসিয়াছেন। নর-নারায়ণের নিত্য প্রণয়লীলার বিষয় ইহদী ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়।

ইহদীরা অতি পুরাতন ও সভ্য জাতি। তাহাদের ধর্মগ্রন্থান, ইতিহাস, সাহিত্য-ইত্যাদির বিষয়ে জানিতে হইলে বাইবেলের প্রাচীন বিধান (Old Testament) আমাদের বহুবিধভাবে সাহায্য করে। এই Old Testament এর দ্বাবিশং পুস্তক, The Song of Solomon অর্থাৎ স্থলোমন গীতা, স্বপণ্ডিত, স্ককবি ও বহুদর্শী ইহদী সম্রাট স্থলোমনের রচনা। এই প্রেমগীতাবধি মাধুর্য্যে ও পদ-লালিত্যে বাইবেলের অজ্ঞাত সকল গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট ও নূতনতর। ইহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। এই প্রণয়-সঙ্গীতসম্বলিত স্থলোমন গীতায় আমরা শ্রীকৃষ্ণ লীলা বা ব্রজলীলার অল্পকণ লীলার সন্ধান পাই। অতএব ইহাকে শ্রীযীহোবা (ইহুদীদের ভগবান) লীলা কিংবা জীকৃশালেম (যেখানে স্থলোমন রাজার নির্মিত মন্দির ছিল, যে মহাস্থান বৃন্দাবন বা কাশী ইত্যাদির জায় ইহদী ও আধুনিক খৃষ্টানদিগের ভীর্ষস্থান) লীলা নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহা সত্য যে এই লীলা-সম্বলিত গীতি-কবিতার সারকথা সাধারণ ইহুদী বা খৃষ্টানের নিকট অবোধ। কিন্তু এই লীলাই ভক্তগণের হৃদয়ের ধন; তাহারা ইহার মধুর সুস্বাদন ও ইহাকে প্রণয়-ভক্তিভাবে গ্রহণ করেন। এই পুস্তক (The Song of Solomon) সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে যাইয়া Dr. J. R. Dummelow. D. D. তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Bible Commentaryতে লিখিয়াছেন—“Two points strike every careful reader of the poem: the extreme difficulty of determining its meaning as a whole and deciding as to the class of poetry in which it is to be placed; and the fascinating beauty of its details..... The Jews admitted it into the canon on the

supposition that it depicts the relations between Jehovah and His people.....The Christian church followed the same general line, explaining the song as an allegory of the love between Christ and the church or Christ and the soul."

আলোচ্য বিষয় ত্রীকৃষ্ণের ও শ্রীযীহোবার লীলাধর্য রহভাবে অঙ্কন। শ্রীভগবান (Krishna, Jehovah or Jesus) ও পরমভক্ত বা ভক্তমণ্ডলীর (Church) সহিত তাঁহার নিতালীলা; ভগবান হইলেন নায়ক ও ভক্ত-মণ্ডলী তাঁহার নায়িকা, উভয়ের মধ্যে বর-বধুর মিলন। ইহাই লীলার আধ্যাত্মিক ভাবধারা।

বিভূতভাবে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর গৃহীত করিব না। কেবল দুই লীলার বিষয়বস্তু বুঝাইবার জন্য The Song of Solomon হইতে কোন কোন স্থান, তুলনামূলক বৈকল্প পদাবলী বা গীতার দ্বারা ও ইংরাজী ও বাংলা গুণ সঙ্গীত হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :-

তুলনা

(ক) ভক্তলীলার নায়ক—শ্রীমহানন্দ।

ত্রীকৃষ্ণলীলায় লীলার নায়ক—"Black but comely"

(খ) 'এখানে গোপাল, সেখানে মেঘপাল।

(গ) এখানে ভক্তবাল্যাপণ, সেখানে "daughters of Jerusalem (or zion)"

(ঘ) এখানে রাজনন্দিনী, সেখানে "Prince's daughter."

(ঙ) এখানে নিকৃষ্ণ মিলন, সেখানে উজ্জান মিলন।

Quotations

(১) I am black, but comely
O ye, daughters of Jerusalem.

(s.s. chapter I. 5)

কাল্য হইল যোবর জপমালা—চণ্ডীদাস

(২) Tell me, O thou whom my soul loveth,
Where thou feedest, where thou makest

To rest thy flock at noon—(s.s. I. 7)

• ক্রমছাড়ি যবে চল গোচারণে

নলিনসুন্দর পদে তোমার

শিলা তৃণাকুর বাজিছে ত্যাকিয়া

হৃদয়ে বেদনা বাড়ে সবার

গীতা—১০৩১১১ (অম্বুদার)

(৩) Thy cheeks are comely with rows

of jewels,

Thy neck with chains of gold (s.s. I-10)

মনিময় মকর মনোহর কুলমণ্ডিত গণ্ডমুদার।

—জয়দেব

(৪) He shall be all night betwixt my breasts.

(s.s. I, 13)

• কোমল কমল পদ রাখি মোরা ধীরে

ভয়েতে কর্কশ কৃপে পাছে ভায় লাগে।

গীতা ২।৩১।১২

কিশলয়শয়ন নিবেশিতয়া

চিরমুগ্ধসি মমৈব শয়ানম্। —জয়দেব

(৫) His left hand is under my head,

And his right hand doth embrace me

(s.s. II. 6)

"রইব বাধা বাহ ডোরে।" —রবীন্দ্রনাথ

"ভুজু ভুজু বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন

যেন কান্দন মণি জোড়।" —গোবিন্দদাস

"ভুজু ভুজু বাধি উরে উরজায়ে

হিয়ার উপরে হিয়া"

"শিতান হইতে মাথাটি বাহুতে

রাখিয়া শুভল কাছে" —চণ্ডীদাস

(৬) I will rise now and go about the city;
In the streets and in the broad ways,
I will seek him whom my soul loveth:
I sought him but I found him not.

(s.s. III. 2)

গেক্সা বসন, বিভূতিভূষণ, শঙ্খের কুণ্ডল পরি,
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখান নিষ্ঠুর হরি।

মথুরা নগরে প্রক্তি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হ'রে
কান্দ ঘরে যদি মিলে গুণনিধি বাধিব বসন দিয়ে।

—জ্ঞানদাস

(৭) Until the day break and the shadows
flee away, turn my beloved (s.s. II, 1)

একতনু হয়ে মোরা রজনী পোয়াই

সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই।

রজনী প্রভাত হইলে কাতর হিয়ার,

দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ বাহিরায়।

—চণ্ডীদাস

এ লভিমু সখ তব হৃদয় হে হৃদয়,

ধন্য হ'ল অঙ্গ মম গুণ্য হ'ল অন্তর।

—গুণী সঙ্গীত

(৮) The watchmen that go about the city
found me; to whom I said, saw you, whom
my soul loveth?

(s.s. III.-3)

একত কহত সখি

বোলাত বোলাত রে

হুমুরি পিয়া কোন দেশ রে

পিয়া বিহু সগরি নৈরাশ রে

—বিজ্ঞাপতি

(৯) Thy two breasts are like two young
does that are twins which feed among the
lilies.

(s.s. II-16)

কচুয়া গিরি কনক কটোড়ি

শোভিত হিয়ার মাঝে —চণ্ডীদাস

(১০) Turn away thine eyes from me for they
have overcome me (s.s. V-6)

বন্ধন নয়নে চিত হরি মিলি মোর। —বিজ্ঞাপতি

(১১) How beautiful are thy feet with shoes,
O prince's daughter, the joints of thy
thighs are like jewels, the work of the
hands of a cunning workman (s.s. VII.-1)

চরণে যাবক' হৃদয়ে পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর। —বিজ্ঞাপতি

এই মিলন-লীলা নব বিধানের (New testament)
অতি সুদৃষ্টান্তে উল্লেখিত হইয়াছে; যথা :-

"Can the children of the bride chamber
mourn, as long as the bridegroom is with
them?" (Mathew IX-15)

গুণ এখানে নিজেকে বর ও তাঁহার শিষ্যদের
children of the bride chamber অর্থাৎ বাসর-ঘরের
কুমারীদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যীশুগুণ আরও
অনেক স্থলে নিজেকে বর ও তাঁহার ভক্তগণকে
বধুরূপে তুলনা করিয়াছেন। এদেশের গুণ-ভক্তগণও
এই লীলা তত্ত্বভাবে উপাসনা করেন। যথা :-

(১) গুণ, থাক মম সনে

গুণ, দেখে, হৃদে, মনে

পশ্চাতে, সমুখে মম

অন্তরে বাহিরে মম

গুণ সখা প্রিয়তম। —গুণী সঙ্গীত

(২) আমার প্রেম বর্তন
তোমায় যতন
কর'খ সর্বকালে।
তোমার প্রেমেরসে
ভক্তগণে মাতাও সকলে।
—দুর্গ সঙ্গীত

নামের কীর্তনও উভয় সমাজে দেখিতে পাই, যথা :-

How sweet name of Jesus sounds

In a believer's ear

—Songs and solos. (Ira. D. Sanrey)

ললিতা প্রাণের সখি, মম বিধো কাণে।

মরা দেহ পড়ে অহু রুক্মিণা তনে।

—বিজ্ঞাপতি

চণ্ডীদাস বলে—

রাধারে না হয় বাম।

লোকমুখে শুনি তোমার মহিমা

শরণ-সুন্দর নাম।

—চণ্ডীদাস

ওকি নাম কুনিজাম

প্রাণ জুড়াল,

কে জানে এ-নামেতে

এত অমৃত ছিল। —ঐতিহাসিক

তোমারি নাম ব'লবো,

আমি ব'লবো নানা ছিলে —ধর্মগীত

হিন্দু, ইহুদী বা খৃষ্টান ভরপূর্ণ যে একই আধ্যাত্মিক

ভাবধারা দ্বারা পরিচালিত তাহা, ইহার দ্বারা প্রতীকমান

হয়। উপস্থিতিমিত উদ্ধৃত স্বনামগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রমাণিত হয় যে মূলতঃ কুমলীলা ও কীর্তনাবলীলা বা বীতলীলা একই। ইহা কামগন্ধশূ, ইহা ভগবৎ প্রেমের মধুর লীলা, পার্থিব দেহের সহিত দেহের মিলন নহে। ইহা জীবাশ্বার সহিত পরমাশ্বার মিলন। এই লীলা যে কেবল এদেশের রুমতরুগণেরই ধ্যানের বস্তু তাহা নহে, ইহা পশ্চাত্য প্রধান বৃহৎ-ভরুগণেরও বিশ্বের প্রধান অঙ্গ ও সমাদরের বস্তু।

বিজ্ঞানের হত্যা

—দশা মুখোপাধ্যায়

আজি চারিদিকে বেখেড়ে সমর,

বৃষ্টি প্রলয়ের পর্যাধি জ্বলতে চুবে যায় এই ধরা।

কুনি বিজ্ঞানে বাড়ে জ্ঞানের পরিধি

এ বারতা গেয়ে ধরণীর স্বরী

সেই বিজ্ঞানে হত্যা কারণে নিয়োজিত করি এরা।

ছিল ভালো মোরা ছিহু অসভ্য,

চাখিনা হইতে আর হুগভা

সহজ লভ্য ফল জল ভাল, ভাল সে মাটির ধর।

পোমা টপেডো চাখি নাক আর,

নাহি চাখি প্রাক্ত নেভেল পাওয়ার

বিমান কামান ইউরোপে ভয়ে প্রাণ কাপে ধর ধর।

একে হয়ে আছি জ্বিয়ে মরা,

তার উপর যদি প্যাস ছাড়ে তারা

পারিব না প্রকৃত যোগ্য পরিয়া গণেশ সাজিতে ছায়।

মাষ্টার্ড গ্যাস মোলোয়েম অতি,

চুঁলে পরলোকে কয়েম বসতি

আঁখির পলকে পরম পলকে পোড়া প্রাণ বাহিরায়।

ইয়েলো রে-তে লোহা গলে যায়,

পাইলট যত করে ছায় ছায়

প্যারাসুট সহ তুতলে লাফায় বাঁচাইতে নিজ প্রাণ।

রেশ কামানের গোলায় আঘাতে,

মাছের রেশ জুটায় ধ্বংসে

রিংস্ট্রীপ দেখে স্বয়ং বিধাতা ভয়েতে কম্পবান।

চায় বিলোপিতে দাতার সৃষ্টি,

করে বোম্ব হতে বোমার রুটি

মানব গোষ্ঠি ত্রাতি ত্রাতি করি করে সদা চিৎকার।

বলে রক্ষা করগো আজি ধরায়ম,

করণায় দূর করে দাও ভয়

বৈজ্ঞানিকেরে কুনি দয়া করে কর প্রকৃত সাহায্য।



সোভিয়েটের রাজ্য ব্যবস্থা

গিরীন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ,

সোভিয়েট দেশের আর্থিক সংগঠন সম্পর্কে আমাদের নানা ভ্রান্ত ধারণা আছে। স্বাধীনস্বামী দলও সাধারণের এই অজ্ঞতাকে নানা ভাবে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে আর্থিক সংগঠনের স্বরূপ কি হবে সেটা না জানায় ও সোভিয়েট দেশের প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ সঞ্চক্ষে সঠিক ধারণা না থাকায় জনসাধারণের এই সব ভুল হয়। ফলে এক দল লোক সোভিয়েটের ও অজ্ঞাত সাধারণ দেশের আর্থিক ও রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে হয় মিল আশা করে, নয়তো মনে করে যে সবই যখন এখানে রাষ্ট্রের হাতে—তখন সুকৃত্য ভাবে রেশনিং ও সকলকে সমান টাকার মাথে আয় নিষ্ঠারূপ করে দিলেই তো সব চুকে যায়—এখানে আবার অর্থনৈতিক সমতার অবকাশ কোথায়?

একটি সাধারণ ভুলই হচ্ছে যে, হয়তো সোভিয়েটে প্রকৃত উৎপাদনের সমতার আগেই নানা পরিকল্পনা গ্রাহ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সমতা মিটিয়ে ফেলতে হয়। হয়তো শ্রীপারের বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনা কাজে লাগাতে যাবার আগেই অজ্ঞাত দেশের মত সোভিয়েটেও কোটি কোটি টাকা (হয় টায়ার আদায় করে, নয় ধার নিয়ে) জোগাড় করতে হয়। কোনও দেশেই তো টাকা ছাড়া কাজ হয় না। তাই সকলেই সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাস্য করে, “আজ্ঞা সোভিয়েটে তো বড় বড় পাঁচশালা বন্দোবস্ত করে—কিন্তু তার জুজ এত টাকা ঐ পণ্ডীত দেশ কোথায় পেল? বাইরে কেউ তো আর বাণিশ্যকে টাকা ধার

দেবে না?” ধনতান্ত্রিক দেশে ধারণা যত নিতুলই হোক না কেন সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকার সমতা সত্তি আগে আসে না। এখানে উৎপাদনের পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকরী করে তোলবার উপযুক্ত শ্রমিক ও বসদের ব্যবস্থা হয়ে যাবার উপরেই বড় বড় কলকারখানা বসানো নির্ভর করে। অর্পণচিহ্ন বা রাষ্ট্রিক ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা আছে না আছে তাতে কিছুই এসে যায় না।

টাকার কথা যদি আগেই না এল তবে সোভিয়েটে আর্থিক সমতা ই বা কেন? আর এখানেও ব্যাঙ্কে যেখানে দরকারই বা কিসে ও অজ্ঞ সব ধনতান্ত্রিক দেশের মত টায়ার ও স্বর্ণ নিয়ে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা হয় কেন?

সোভিয়েটেও এগুলোর দরকার আছে। এখানেও টাকাই হচ্ছে আর্থিক কাঠামোর গোড়ার কথা—সকলের বাহিন্যাও দেওয়া হয় টাকার অঙ্কে এবং লোকেরাও আমাদের মত হাতে বাজারে দোকানে সেই সব টাকা খরচ করে নিজেদের ইচ্ছামত। রাষ্ট্র থেকে একবার টাকা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল বাহিন্যা ইত্যাদির আকারে, তারপর জনসাধারণ আবার সেই টাকাটা খরচ করে নানা ভাবে। দোকানে হাতে জিনিষপত্র কেনা, রাষ্ট্রকে স্বর্ণ দেওয়া, টায়ার দেওয়া ও রাষ্ট্রিক সেভিস ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া ইত্যাদি বহু উপায়ে জনসাধারণের হাতের টাকাটাই আবার ফিরে যায় রাষ্ট্রের কাছে। আমাদের দেশে বা অজ্ঞাত ধনতান্ত্রিক দেশে সেভিস

ব্যাঙ্ক টাকা জমা দিলে বা হাট বাজার করলে সে টাকা সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে যায় না। কিন্তু সোভিয়েটে সব ব্যাঙ্ক ও প্রধান হাটবাজার রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসার সবই রাষ্ট্রের হাতে চলে আসে। কাজেই রাষ্ট্র থেকে জনসাধারণের মধ্যে আর জনসাধারণ থেকে রাষ্ট্রের হাতে যে টাকাটা চলা ফেলা করে তা মোটে পরিমাণে মিল হতে হবে। তা না হলে বৃদ্ধি হতে হবে যে আর্থিক কাঠামোর কোথাও অসম্পত্তি রয়েছে, হয়তো কেউ খরচ না করে টাকা জমাচ্ছে। জনসাধারণের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ থাকায় উৎপাদন পরিকল্পনার সামান্য অদল বদল হলেই উপরের আয় ব্যয়ের পরিমাণের তারতম্য ঘটবে। উৎপাদন পরিকল্পনা বললে হয়তো শোককে মনে দিতে হবে বেশী, নইতো হাটে বাজারে সন্তোষ পণ্য বেশী ছড়িয়ে পড়বে। তাতে জনসাধারণের খরচের আশংকা থাকবে বেশী, কিংবা হয়তো দুইই একসঙ্গে হতে পারে। উৎপাদন পরিকল্পনার রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাই সন্তোষ আর্থিক অসম্পত্তিও দূর করতে হয়। দরকার হলে বাজারে কমবেশী টাকার আমদানিও করতে হয়। আর্থিক পরিকল্পনাকে সর্বদাই সূক্ষ্মজালভাবে উৎপাদন পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ বাইয়ে চালাতে হয় এবং উৎপাদন পরিকল্পনার পরিবর্তনের সঙ্গে অতীতকেও বদলাতে হয়। সারা দেশের বেতন ও মজুরির খাতে খরচের হিসাব প্রণয়ন করতে হয়। এই খরচের হিসাব পদ্ধতিতেই খামারের চাষীদের আয়ও ধরতে হয়। কলকারখানার মজুরদের মত এদের আয়ের অঙ্ক অত নিম্ন নয়। হ'লেও বেতন-মজুরির হিসাব থেকে তা বাদ দেওয়া যায় না। সেই সঙ্গে হিসেব করতে হবে হাটে বাজারে জনসাধারণের উপস্রুক "সন্তোষ পণ্য" কত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার। তখন এ টাই-এর ভেতর কোন অসম্পত্তি দেখা গেলে তিন রকম ভাবে টাকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

- (১) জনসাধারণের উপর প্রত্যক্ষ কর্তার বদলিয়ে,
- (২) রাষ্ট্রিক ঋণ বা সেভিংস ব্যাঙ্ক জমার হার বদলিয়ে,

নয়তো (৩) হাটে বাজারের রাষ্ট্রিক দোকান কিংবা সমবায় ভাণ্ডারে জিনিষ পত্রের দাম বদলিয়ে।

এই সমস্ত বাপ-খাওয়ানোর সমস্তাই হচ্ছে সোভিয়েটের "আর্থিক সমতা"। সেখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অত্যন্ত প্রধান জটিল সমস্যাই হচ্ছে এটা।

উপরের তিনটি উপায় আপাত দৃষ্টিতে খুবই সহজ মনে হবে—কিন্তু কাব্যতা: মোটেই তা নয়। পুরোপুরি সাম্যবাদী সমাজ হলে এ সমাধানগুলো এমন প্রথম মনে হ'ত না—কিন্তু সোভিয়েটে এখনো মার্জের মতে "সমাজ-তত্ত্বাবাদের প্রথম ধাপে" রয়েছে। হুতরাং এই সমাজ-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু সংমিশ্রণও থাকতে বাধ্য। এখনো সম্পত্তির আয় সম্পত্তিগত অসাম্য বরাদ্দ হয়েছে সন্দেহ নাই। তাই বলে সরকারের আয়ও সে দেশে এক সমান নয়। সেখানে কাজের প্রকৃতি, পরিমাণ ও মাত্রার উপরে বেতনের হার নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে 'লাভের' আশাই হচ্ছে ব্যবসায় বাণিজ্যের একমাত্র নিমন্তব্য। সোভিয়েটে তা নয়। কিন্তু কাজ ও বেতনের মধ্যে যে সাধারণ অর্থনৈতিক প্রেরণা থাকে তা এখনো সোভিয়েটে বর্তমান। প্রত্যেক কালের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে সজ্জিত ভাবে অহুপ্রেরণা দেবার বন্দোবস্তের দিকে ক্রমশঃ বেশী নজর দেওয়া হচ্ছে টিক। কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে অর্থনৈতিক প্রেরণার বিকটা মোটেই অবহেলা করা হয় না। ব্যক্তিগত আর্থিক প্রেরণার চরম বিকাশের জ্ঞান আয়ের ভারতমাই সব নয়। আয়ের ভারতময়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছাধারী (অন্ততঃ কিছুটা) আয়ের বন্দোবস্ত না করলে চলবে না। আয়-ব্যয়ের স্বাধীনতা থাকায় কি পরিমাণ টাকা জনসাধারণের হাতে থাকল—আর কতটাই বা রাষ্ট্রের হাতে ফিরে এল—এর উপর কাজ নজর রাখতে হয় রাষ্ট্রকে। যদি আয়করের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে উৎপাদনের প্রেরণার কিছু ব্যাধাত ঘটেছে কিংবা সেভিংস ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রিক ঋণে যে পরিমাণ টাকা আনা থেকে আত্মত তার কমবেশী হচ্ছে। আয় কর বা ঋণের পরিমাণ বদলাতে ভাল মনে

হয়তো বাজারের জিনিষ পত্রের দামেরও ভারতম্য টবে। যে কোনো পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে হলে এই সব নানা দিকের পর্যালোচনা করা চাই। এগুলোই হচ্ছে সত্যিকারের সমস্যা।

আমাদের ধারণা যে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে অসাম্য বন্ধ করতে হলে পুরোকে চেয়ে প্রত্যক্ষ করের সার্বকতা বেশী। কিন্তু সোভিয়েটে এর উল্টোটাই প্রচলিত। সেখানে পুরোকে তুলনায় প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ সামান্য। এককর আর উত্তরে বলা চলে যে সোভিয়েটের সামাজিক অসাম্য খুবই কম বলে এখনো প্রত্যক্ষ করের প্রয়োজনীয়তা কম। আর সোভিয়েটে খুব বড় বড় ধনী না থাকায় কোণ্ড এককনের কাছে থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিরাট অঙ্কের কর আদায় করাও সম্ভব নয়। এ ছাড়াও সোভিয়েটের আর্থিক কাঠামোর দরুন এখানে পুরো কর বনামো এ হয়েছে বেশী।

সোভিয়েটে বাজেটে জাতীয় আর্থিক সংগঠন খাতে বিরাট ব্যয় করা হয়। অল্প দেশের বাজেটে এর তুলনা করা চলে এমন কোনও বিভাগই নেই। ধনতান্ত্রিক দেশে সাধারণ সময়ে শিল্পসংগঠনের দায়িত্ব থাকে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর। সোভিয়েটের ক্ষেত্রে এই শিল্প সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের। তাই পুরো বাজেটের প্রায় দুই তৃতীয়াংশই এই খাতে ব্যয়িত হয়। শুধু মনু নতুন শিল্প গড়ান এই বিভাগের কাজ নয়, শিল্পপরিচালনা মেরামতী, গবেষণা প্রকৃতি সব নিয়েই এর কাজ। সোভিয়েটে বিশ্লেষণের দিক পরেই এ খাতে নিম্নুটাকার বেশ পরিমাণ খুব বেশী ছিল না; তখনকার দেশেরকার খরচ ও ১৯৪৩ সালের প্রায় অর্ধেক মাত্র। রাজস্বের খাতে বিপরীত দিকে থাকত রাষ্ট্রিক ব্যবসা ও শিল্প থেকে পাওয়া লাভ ও রাষ্ট্রিক ঋণ। কর ব্যবস্থার অনেকটাই ছিল পুরানো জার আমলেরই মত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাত্রাও ছিল প্রায় সমান। আগের জার আমলের চেয়ে তখন প্রত্যক্ষ করের অংশ ছিল অনেক বেশী। তদানীন্তন করের মধ্যে প্রধান ছিল চাষীদের উপরকার "রুমিকর"; কি রাষ্ট্রিক কি বেসরকারী সব

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর উৎপাদন অধাপাতে লাইসেন্স; ব্যক্তিগত আয়ের উপর আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফা ও আয় কর। পুরোকে করের মধ্যে ছিল আবগারী ও শুদ্ধ কর। তখনই রাজস্বের প্রায় অর্ধেক আদায় হ'ত শিল্প লাইসেন্স থেকে। বর্তমানে যেটাকে সোভিয়েটে উৎপাদনের হারে কর (Turnover tax) বলে তার উৎপত্তিই হয়েছে আগের শিল্প লাইসেন্স থেকে। এই ট্যাক্সকে পুরোকে কর হিসাবে গণ্য করা হয়।

পাঁচশালা বেসরকারী জাতীয় আর্থিক সংগঠনের খাতে অনেক বেশী বেশী করে টাকা বাটাবার বন্দোবস্ত হয়। ১৯২৭-২৮-এর চেয়ে ১৯৩০ সালে চারগুণ বেশী টাকা এই বিভাগে ব্যয়িত হয়েছে। ১৯২২ সালে হয়েছে দশগুণেরও বেশী। আশু আশুকার বিষয় হচ্ছে যে এত বিরাট ব্যয়-রুটির পাঁচভাগের একভাগ মাত্র আদায় হ'ত আয়কর প্রকৃতি প্রত্যক্ষ কর থেকে—আর রাষ্ট্রিক ঋণ থেকে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রাজস্বের আয় বাড়বার প্রধান বিষয় ছিল সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের লাভ-রুদ্ধি ও বৃদ্ধিহু বেসরকারী ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী করে সরকারী ঋণ কেনা। ১৯৩০ সালের পরে রাজস্ব রুটির সর্বপ্রধান উপায় হয় 'উৎপাদনের হারে' কর। এই বৎসারে প্রচলিত কর ব্যবস্থার সংশোধন করা হয় এবং আগের প্রায় ৭০টি নানা বিভিন্ন কর ও খরচের সংখ্যা হ্রাস করে মাত্র ৫৩য় গাড় করা হয়। আগে কর ও "অ-কর" রাজস্ব। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর—এই সব নানা বিভিন্ন নামকরণ ছিল। নতুন অবস্থায় আগের সব জটীল নামকরণ তুলে দিয়ে মাত্র ছুটি পুষক নাম রাখা হয়—সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ও 'জনসাধারণের স্বাধীনকে ভালভাবে বাটাবার ব্যবস্থা' থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব। প্রথমটীতে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে 'উৎপাদনের হারে কর'। আগের যুগের আবগারী ও লাইসেন্সের কর চুটোই এর ভেতরে পড়ে গেল। দ্বিতীয়টীতে থাকল ব্যক্তিগত আয়ের অংশ থেকে রাষ্ট্রকে ঋণ দেওয়া। আয়কর উত্তরাধিকারিত্বের কর প্রকৃতি প্রত্যক্ষ কর—আর কতকগুলি সামান্য সামান্য ট্যাক্স

ও লাইসেন্স করা। ১৯৫২ সালে মোট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০ মিলিয়র্ড রুপল—তার মধ্যে ১৭-১৮ মিলিয়র্ড আসে উৎপাদনের হারে কর থেকে; ১৯৫৬ সালে ৬৭ মিলিয়র্ডের মধ্যে ৫০ মিলিয়র্ড এবং ১৯৫৯ সালে ৭৮ মিলিয়র্ডের মধ্যে ১০৬ মিলিয়র্ড।

উৎপাদনের হারে কর সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন যে ঐ কর বসান হয়েছিল বলেই পাঁচশা পরিবর্তন বায়ু সঞ্চালন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মোটেই তা নয়। পাঁচশা পরিবর্তনের ফলেই এত আয়বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। ঐ পরিবর্তন অল্পখাটী শিল্প সংগঠনের কাছে ক্রমশঃ বর্ধিত হারে টাকা বাটানোর ফলে বেথতে বেথতে প্রমিত সংখ্যা হ হ করে বেড়ে গেল। ১৯২৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যেই প্রমিতসংখ্যা গণিত বেড়ে গেল। আগে যেখানে বেকার দেখা যেত এখন সেখানে দেখা গেল শ্রমিকের অনটন। এবং প্রথম পাঁচশা পরিবর্তনের আগের চেয়ে চারগুণ বেশী টাকা মাহিনা বাতেন, ব্যয়িত হতে লাগল। চারগুণ মাহিনা বৃদ্ধি মানেই হচ্ছে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও বেড়ে যাওয়া। তা পূর্বাধিক চারগুণ কর ফলও অস্বস্তি তিনগুণ তো বাড়বেই।

ক্রয় ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শোভিয়েট দেশে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। প্রথম পাঁচশা পরিবর্তনের প্রথমে বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে বেশী নজর দেওয়া স্থির হয়। কাজেই, তখন জনসাধারণের দৈনিক প্রয়োজনীয় সস্তোগ সামগ্রী বেশী করে উৎপাদিত হত না। লোকের ক্রয়ের ক্ষমতা বেড়ে গেলেও উপযুক্ত পরিমাণ সস্তোগ সামগ্রী বাজারে মিলত না। দোকান পত্র হাট বাজার খাঁ খাঁ করত—আর তার সামনে থাকত অগণ্য কয়েজুর ভীড়! এ দৃশ্য দেখে বাইরের পর্যটকেরা রটনা করে যে শোভিয়েট দ্রুতিক বেগী দিয়েছে। অনেক বলতে থাকে যে শোভিয়েট সরকার তখন কাঁপাই নীতি (inflation) অবলম্বন করার ফলেই এমন হয়েছিল। সে সময়ই বিশ্বা প্রচুর মাত্র। ঐ প্রমিতদের মাহিনা বেড়ে যাওয়ায় টাকার প্রচলন অবশ্যই বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু

সেটুকু চাফুকী বাড়বার অবশ্যজ্ঞানী ফল মোটেই কাঁপাই নীতি নয়।

হচ্ছে করলে শোভিয়েট রাষ্ট্র তৃণন ব্যক্তিগত জমার হারি বৃদ্ধি করতে পারতেন। রাষ্ট্রিক সেজিমস ব্যাঙ্ক, সব জমার আকারে ব্যক্তিগত জমার পরিমাণ বাড়লে আপনা আপনি লোকের হাত থেকে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা কমে আসত। যে টাকাটা বেশী মাহিনার আকারে আকারে রাষ্ট্রের খর থেকে জনসাধারণের হাতে আসত তাই আবার ফিরে যেত রাষ্ট্রের কাছে, প্রত্যেকের আর খুশীমত যেমন তেমন করে টাকা খরচের উপায় থাকত না। ক্রয় ক্ষমতা বাড়লেও বায়ের ক্ষমতা পড়ত না। রাষ্ট্র থেকে তেমন ভাবে প্ররোচিত না করলেও স্বাভাবিক ভাবেই ক্রয় ক্ষমতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক জমার পরিমাণ কিছু বেড়েছিল। কিন্তু তা সামান্য। তদানীন্তন অবস্থায় অল্প অল্প এর চেয়ে বেশী কিছু আনা করাও যায় না। তা'হলে চলতি টাকা ও ব্যবসায়িক বাজারের ভার জায়া বজায় রাখবার জঙ্কে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করা যেত। ব্যক্তিগত আয়করের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে জনসাধারণের বাড়তি ক্রয় ক্ষমতার বেশীর ভাগই আবার রাষ্ট্রের হাতে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু একটা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে এ পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না।

শোভিয়েটে তখন পাঁচশা পরিবর্তন আর্যক করার প্রচেষ্টা চলছে। আগের সামাজিক অবস্থার চিরস্মরণ ভেতর থাকলে বা জনসাধারণের সহজ ও প্রসারিত যোগ না থাকলে কখনই পরিবর্তনকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। এর জঙ্কে সরকার নান্যভাবে মাহিনা বৃদ্ধির প্রেরণার ভেতর দিয়ে প্রত্যেকের উৎপাদনশক্তি বাড়ান। দৈনিক মাহিনার বদলে কাজের পরিমাণ অল্পপাত মাহিনা। বোনাস, ক্রমশঃ বাড়তি মাহিনা। নিম্ন কাসিকরের বেশী মাহিনা—এই সব নানা উপায়ে প্রমিতদের কাছে উৎসাহ দেওয়া হত। যারা মজা গ্রাম থেকে সহরে আসছিল তাদের ব্রহ্মশূলভাবে কারখানায় জীবনের সঙ্গে পরিচিত করা। উৎপাদন বাস্তবায়নের সঙ্গে রাষ্ট্রের

সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ভাল করে হারিকুরী শেখবার জঙ্কে এই সব নানা পন্থা অবলম্বন না করলে চলত না।

অনেকের মনে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এ সমস্ত উপায় তো দন্যাত্মিক দেশের চলতি ব্যাপার। শোভিয়েট কেন এ সব পদ্ধতি অহুসার করবে? তাতে মাস্তাবাদের ধরনামা করা হয় না? মোটেই তা নয়। মাস্তাবাদ সব সময়েই সম্ভব ঘটনা অহুপাতে কার্যপন্থা নির্ধারণ করতে শেখায়। রাশিয়াতে শোভিয়েট বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সব লোককে কমানিষ্ট করে তোলা সম্ভব হইল। দেশে তখন অল্পদ্রুত বৈদেশিক আক্রমণে তখন দেশে সব উৎপাদন বাবদা ধ্বংস পেয়েছে। এমন ব্যবস্থায় জনসাধারণকে বাঁচাতে হ'লে—একমাত্র উপায় হচ্ছে দেশের শিল্প-সম্ভারের প্রসার। যেন তেন প্রকারেণ এমন কি প্রতিজ্ঞা পন্থীদের সাময়িক কিছু স্থবিধা দিয়েও দেশে শিল্পের প্রসার করতে হত।

তাই ঠাট্টানের মধ্যে তদানীন্তন শোভিয়েটে দেশে ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রচেষ্টা যাতে কোনও মতে বাহ্যত না হয়, তার দিকে প্রচুর দৃষ্টি রাখা হ'ত। এবং সকলে একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য যে যুব বেশী আয় কর পাইলে লোকের উৎপাদনের উৎসাহ কিছুটা কমে যাবে। সেজঙ্কে শোভিয়েটের তদানীন্তন আর্থিক সমাজজ্ঞান সমাধান করতে আয়কর দেওয়া হয় না।

তখন অবশিষ্ট থাকে মাত্র একটা পন্থা। চাহিদা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে সস্তোগ পন্থা—বিশেষতঃ বিলাস কিংবা আশা বিলাস সামগ্রীসমূহের দাম বাড়িয়ে দিয়ে কিছুটা ভারসাম্য বজায় রাখার সম্ভাবনা ছিল। শোভিয়েট সরকারকে বাধ্য হয়ে তাই করতে হল। জিনিশের গুচরা দাম বাড়িয়ে দিলেই তা বানানার খরচ আর বিক্রির দামের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য হয়। সেটা সম্পূর্ণই যেন রাষ্ট্রের হাতে যেতে পারে। দাম বাড়ানোর অন্তই ছিল “উৎপাদনের হার” কর। উৎপাদনের হারে কর বসালে কারখানা থেকে মাল বেরলেই তার দাম বেড়ে গেল এবং জনসাধারণও বেশী

দামে তখন মাল কিনবে। কিন্তু তখনকার সম্ভ্রান্ত পরিবর্তন শোভিয়েটে এই পন্থা ধার্য্য সম্ভ্রান্ত পূর্ণ সমাধান হল না। ফলে বাধ্য হয়ে শোভিয়েট সরকার সাময়িকভাবে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

পন্থারবোর দ্রুতিকের সঙ্গে কাঁপাই নীতির সম্পর্ক না থাকলেও স্থানিকভাবে পরিবর্তন মাহিক ধন দামের দামনা না করে অনেক প্রতিষ্ঠানের চেষ্টাকারিতার ফলে এই সমস্যা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। সরকারী পরিবর্তনায় থেকেই ধন দামের কোনও ব্যবস্থা নাই এমন ক্ষেত্রেও অশস্ত্রনামা প্রতিষ্ঠানই টাকা ধার দিত। স্বতরাং সমগ্র দেশব্যাপী ধনদান সমাজকে কেন্দ্রীভূত করবার জঙ্ক এর পরে ১৯৩০ সালে এক নতুন আইন রচনা হয়। সরকারী তহবিল থেকে একদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তারে সাহায্য করা হইল—আর দিকে কল কারখানা—বা অজ্ঞাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিজ্ঞান ফাও থেকেও শিল্প প্রসারে সাহায্য দেওয়া হ'ত। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক থেকেও অনেক শিল্পের সাহায্য হইত। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন অল্প সরকার ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাস্টই গুটিয়ে দিত। লম্বা মেয়াদে ধন দেবার সময় এই সমস্ত ব্যাঙ্ক যুবই যাবৎসকালের গুটিয়ে দেখে তাকেই ধার দিত। বিপদ এদিক থেকে আসেনি। প্রথম পাঁচশা পরিবর্তন করার জঙ্ক তখন প্রত্যেক কলকারখানা পরিচালকের মাথা গরম। পাঁচ কাঁচামালের সস্তোগ খটে এই ভয়ে তারা সবাই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী মাল কিনে জমা করতে থাকে এত সব কেনার টাকা তারা অল্প মেয়াদে বাণের কাড় থেকে ধার করত। কিন্তু এর ফলে কাঁচামাল আরও দ্রুতগাণা হয়ে গোট। পরিবর্তনই বাস্তবায়ন করে দেবার উপক্রম হল। নিম্ন প্রমের মাহিনা ও কাঁচামালের দামও এই সঙ্গে চড়তে থাকে। কাজেই ১৯৩০এর আইনে (১) হস্তী ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল (২) কোনও অ-ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শঙ্কর টাকা লেনদেন থক্কা করা হল (৩) রাষ্ট্রিক ব্যাঙ্ককেই একমাত্র আদ্য মেয়াদে ছর দেবার কড়ী স্থির করা হল এবং সেই টাকাও বিশেষ কাজের জঙ্ক দেওয়া

[୧୭]

১৯৪১ এর জুন মাসের পর থেকে জাফাঙ্গির মাকে সোভিয়েট মরণ-রান সাংগামে লিপ্ত। এখন আবার নতুন করে অনেক জায়গায় রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছে। ঐ বৎসর ১৯ই জুলাইতেই মস্তোভে কলী, ময়দা, চিনি, চর্বি, মাংস, মাছ প্রভৃতি নানা জিনিসের রেশন হয়। নতুন করে জাতীয় আদরকা তহবিল খোলা হয়। সেখানে পণ্য দিয়ে কিংবা টাকা দিয়ে চান দেওয়া যায়। ডিসেম্বর মাসে এক নতুন যুদ্ধের প্রবর্তন করা হয়। দু' মূহ হায়ে আয় করাই হ'ল—এই নতুন যুদ্ধ কর। ১৯ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত (যেদের পরে ৫৫) প্রত্যেক নাগরিককেই এই কর দিতে হবে। শুধু বোতা ও তাদের পরিবারের লোকেরাই এক করের হাত থেকে

রেহাই পাবে। শ্রমিক-করাগী, লেখক, কৃষক, সবাইকে বাৎসরিক ১৮০০ কুবলের বেশী আয় হলে শতহা ৭ অংশ ও ২৪০০ কুবল পর্যন্ত শতকরা ১১ ভাগ কর দিতে হবে। পকাশোভী বা ব্যক্তিগত ভাবে চাষ করলে যাই করুক না কেন, প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে ১০ থেকে ৬০০ কুবল করে কর দিতে হবে। যারা সামরিক কালেক্স অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে—তাদের ক্ষেত্র চেয়ে ৫০ ভাগ বেশী কর দিতে হবে।

কিন্তু যতদূর মনে হয় সোভিয়েটের বিরাট বায়ের ভদ্র-টুকু বোধহয় এক ব্যবস্থায় সংঘটিত হবে না। সম্ভোগ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ও উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গ-বল করে এই চাহিদা মেটানোই সম্ভবশাখা মনে হয়।

দিগন্ত-আধার

বিমল চন্দ্র ঘোষ

খোলা জানালার কাছে চ্যুড়া বেবদাক পাছে সুপ, সুপ,
পাখার আওয়াজ,

রাতজাগা বাহুরেণ ৬, দু'র গলাসাগরের হাওয়া—
হু হু বয়। কথা কম কারা ?

পদশব্দ, কিস্মদ্বন্দ্ব, গলাখাকরানি,
ও বাড়ির ছায়ে কার চুড়ির ইয়ার।

কালো মেঘ ভড়ি মেরে লাক মেঘ চাদের ওপায়
চৈতন্য কুণ্ডলি গর।

দিগন্তে গোকর পাড়ী ছুইচাকা যাত্রী যায় মোঠোগান গেয়ে
কাঁচ কাঁচ শব্দ শুধু দূর থেকে হুহু'রে মিলায়।

ভুতুড়ে মাছ মাখ আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে, হাতে লঠন,
কড়িবাঁধা হকোটার মাখায় আঙন জলে দাঁকাটা তামাক

ভুত ভুত শব্দের কড়া সৌরভ
ভেসে আসে। আসে পাশে বন ধানবন

চকল জোনাকীরা জলে।

দেয়ালে রকাকালী, উইপোকা বেয়ে গেছে বাঁকা বরাভয়,
বাড়ন্ত ভাঁড়ারের গলাবাঁকী খেমে গেছে

গৃহিণীরা ঘুমে অচেতন
লুকেচুরী বেলে শুধু মেঘ আর চাঁদ।

সাবার, গভীর রাত একখানি শাদা হাত ছেঁড়া বিছানায়

আসে পাশে বংশবৃদ্ধি সগো-র-উজানে যেন আগাছার মত,
হয়তো সেখানে আছে অবজাত শিশু-মহীকৃষ্ণ

কাণ্ডজানহীন।
চাঁদ এসে আবার আকাশে

কালো পানী নীল বহু ইতস্তত গগন প্রাঙ্গণ।
অবোধ বাতাসে দোলে লাউচামা শশাকত উজ্জত আখের

সুসংশা
হুয়ে হুয়ে। দেহা যায় খোড়োচাল মোড়োলের বাড়ী—

কাদালেপা উঠানের মাঝে ছুঁতে বানেন মরাই—
গোয়ালের চাল দিয়ে উড়ে যায় মাঁচালের ধোঁওয়া—

বাতের প্রবেশ মত
গভীর দিঘির পাড়ে বসে থাকে বিরহী ভোঁরোড

জলতলে শোক করে বাহুয়ে মেঘের।
বাড়ীর চৌকনী ঘিরে মরা-বাগ্গচিরের বেড়া

মন লতা পাতা ঢাকা। মদ্যিধান কিছু ফাঁকা হলে পড়া
বাশের আগড়।

খোলা জানালার কাছে অকারণে জেগে আছে
জাতিবার মন

সুপ সুপ পাখার আওয়াজ
রাতজাগা বাহুরেণ পেচকের। তফকের তক্ত তক্ত

শব্দ শোনা যায়।
ও বাড়ীর ছায়াবুজ। চাঁদ নেই, দিগন্ত আধার।

ইতালী অভিযান

[জরাজ্বল ও অতীবীক্রে দক্ষিণ ইতালীতে মিত্রপক্ষ যে বিশ্বয়কর আক্রমণ চালাইয়াছিলেন ও তাহা যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, তিনজন বিশিষ্ট লেখকের একত্র আলোচনার সেই আলোচনা।

—সম্পাদক]

(১) **দ্বন্দ্বাভিযান**—by Edmund Stevens.

দক্ষিণ ইতালীতে মিত্রপক্ষের অভিযান উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলী অভিযানেরই পরবর্তী অধ্যায়—সামরিকগণ ও জনসাধারণ যেন ইহাকে second front-এর ব্যাপক আক্রমণ বলিয়া মনে না করেন। এই সাবধানবাণী স্বরণ করিলেই ভবিষ্যৎ ব্যাপকতর আক্রমণ সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইবেন।

Second front কহাকে বলে, সে সম্ভার উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে পূর্ণ বৃশ্ণস হইতে ৫০৬০ ডিগ্রিস সৈন্ড আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে ইউরোপীয় ভূভাগের এইরূপ ভীততর অভিযানই second front। ইহা দ্বারা জরাজ্বল সামরিক লক্ষ্য স্থলগুলি একসঙ্গে বিচলিত হইয়া উঠিবে। ইতালীর পদতলের অভিযান মাত্র প্রথম পদবিক্ষেপ।

ইতালীতে জাফাঙ্গির ডিভিসন আছে ১০-১৬র মধ্যে। ইহার দুই তৃতীয়াংশ আছে উত্তর ইতালীতে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং ইতালীয়গণকে অল্পভাগ হইতে বিরত করিবার জন্য। ইতালীয় সৈন্তের সংখ্যা তাহাদের যুদ্ধ পটুদের মত সকলেরই জানা আছে। এক সময় ভাবা গিয়াছিল যে যুদ্ধ তাহাদের মাহু-দ্বিঘিতে প্রবেশ করিলে বৃষ্টি তাহারা নৈশুগা দেখাইবে কিন্তু সিসিলীতে সে আশা নিমূল হইয়াছে এবং সেখানে শান্তি ও বাজের জয় মাছয় সর্বাপেক্ষা ব্যাকুল, একাধারে বৃষ্টি সৈন্ড। তাহা, shock troop-এর

সেখানে ঐক্য আশা সফল হইবার নয়। অন্তত্ব জাফাঙ্গিরই ইতালীতে প্রধান সামরিক বাহ্যস্বরূপ।

এ পর্যন্ত শোনা গিয়াছে যে নাৎসীরা দক্ষিণ ইতালী ইতিমধ্যেই পরিচালণের সম্বল করিয়াছে এবং সিসিলী হইতে পলায়মান নামজারা wehrmacht সৈন্তবলের অবশিষ্ট ৬টি ডিভিসনকে স্বয়ং ও বোমাবিস্তৃত রেল-পথগুলির সাহায্যে উত্তরদিকে সরাইয়া লইতেছে। এই সমস্ত খবর ভ্রান্ত না হইলে, ইহা মনে করা অবশ্যত হইবে না যে উপকূলভাগস্থিত হুটু আদরকা গৃহগুলি একবার বিপর্যয় হইলে, আমাদের সৈন্তের কেবল জাফাঙ্গিরের নাইন, ছেলে ছলানো কান্দ ও বণ্ডুজের সমুদ্রীন হইবে।

ঐ সকল কায়দাকান ইংরাজ সৈন্তদের ভালভাবেই জানা আছে। হাজার হাজার আগাছা বাইবার অস্তিত্বই ইহাকে বর্তমান কর্তব্যের উপযুক্ত অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে যেমন ইহার নির্ভীক কমান্ডার জেনারেল জুবার বার্নার্ড এল মন্টগোমারির ইউরোপীয় ভূভাগে মিত্রপক্ষের সঙ্গেতে পরাপর্পণের প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচন হইয়াছে পরম সমীচীন। অষ্টম আর্মির গঠন-নৈশুগা ইহার স্থিতিস্থাপকতা। নানা ডোমিনিয়ন ও কেশানির সৈন্ড-বিভাগও অনেক সময় ইহার আহুকল্যে আশ্রিয়াছে, ইহার হইতেছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের সাহসী সৈন্তসমূহ। সিসিলীর পরে কানাডিয়ান সৈন্তরাও ইহাতে যোগ দিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত অব্যব পদবিন্টনে ও বহুবিধ হুসাহসিক কন্ডের ঘূর্ণবিন্টনে অষ্টম আর্মির কেন্দ্রীয়, সামরিক উৎকর্ষতা স্থান্য আছে।

সমস্ত আশ্রাড ডিভিসনের প্রতীক এখনও বন্ডমের উপরে জেমিয়াম টিলের ফলক। এই দুর্ভব "মরু মূদিক" তিন বৎসরের ভীত মরুদুর্ভে দুর্গের পথ সম্বন্ধে অতিক্রম করিতে শিখিয়াছে। এই বাহিনীর বীরদের নিকট সমরক্ষ প্রথম আশ্রাড ডিভিসন। হোম কন্ডিল্লির প্রকাশ্য ডিভিসন ও হাইল্যাও একপাশে ডিভিসনের জায় ইহাদের ট্যাক ও আক্রমণকারী পরিসরকর একাধারে বৃষ্টি সৈন্ড। তাহা, shock troop-এর

কাজ করিয়াছে এবং এল এলামেইনের পর যেডিটাবে-
নিয়ান এলাকার সকল বড়ো যুদ্ধেই সর্বাঙ্গীণ অগ্নিক
সংখ্যায় প্রাণ দিয়াছে।

বর্তমানে কার্যকরী বাহিনীর অপরিহার্য পরিমাণ
হইতে ইহাও দৃষ্টিতে হয় যে মিত্রপক্ষ শত্রুর পূর্ণাঙ্গ
বাধা আশা করেন না (অষ্টম আশ্মিতে এখন চয়
ডিক্সনের অধিক সৈন্য আছে কিনা সন্দেহ)।
মিত্রসৈন্যের কমান্ডার ইম চীফ, জেনারেল জোয়াইট,
ডি, আইসেনহাওয়ারের নিকট এ ছাড়াও আঁও
চারিটি সৈন্যদল আছে যথা লেঃ জেনারেল মার্ক ক্লার্ক
পরিচালিত পঞ্চম ও জর্জ, এস, প্যাটন (জুনিয়র)
পরিচালিত সপ্তম আমেরিকান আর্মি ও ইতিমধ্যে
মৌকাযোগে যে সমস্ত আমেরিকান সাল-সরঞ্জাম
অবতরণ করিয়াছে, জেনারেল কেনেথ এ্যাণ্ডারসনের
নেতৃত্বে রুটিন প্রথম আর্মি এবং নবচিহ্নায় ও নবরূপে
পুনর্গঠিত জেনারেল জিরোর অধীনে অসংখ্য ফরাসী
সৈন্য ও কলোনিয়ান সৈন্য।

জাশ্বাধারা যে দক্ষিণ ইতালীতে কালক্ষেপ করা
ছাড়া কিছু করিতে চায় না তাহাতে এ পর্যন্ত
যটনাবলীর স্বপ্নের প্রাচ্যে। প্রায় ও সহজ আক্রমণ-
যোগ্য পথ ও রেলপথ, মিত্রপক্ষের জলে ও আকাশে
পূর্ণ অধিপত্য, পদাঘাতগে নিরোধী ভাবনা ইতালীয়
জন্মদায়ক, এই সমস্ত বাধা লইয়া অধুনা ক্ষীণ জাশ্বাধারা
যুদ্ধ-বাহন্য ইতালীর পদভাগের পূর্বদিকে আঘাত
করিয়া নির্ধাণ করিতে ও যোগান সরবরাহ দিক রাস্মিতে
কোন ক্রমেই পারিবে না।

অপর পক্ষে মিত্রপক্ষের সরবরাহ ব্যবস্থাও নাৎসী
জাশ্বাধারা কেন্দ্রভাগে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে।

সত্যায় শব্দর ও মজরত জুতা

সুখের তরোনে প্রাণের কোথ

৭০, হারিসন রোড, কলিকাতা

মিত্রপক্ষের জাশ্বাধারা পর জাশ্বাধারা demolition
squadএর তৎপরতা ইতালীর পদভাগগুলি এখনই
বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে যে তাহা আর শীঘ্র কাজে
লাগানো সম্ভবপর নয়, এই জগৎ উত্তর ইতালীর
পাদদেশে পৌছানোর পক্ষেও মিত্রপক্ষ মন্বাত্মক আঘাত
হানিতে পারিবে না।

এই দিক দিয়া দেখিলে ইতালীর অধুর্ভে পদাঘণ
ভগ্নাভেদর আশা ও ব্যাপক কণ্ঠ-পঙ্কতি একটি অক-
বিশেষ। বোধহয় এই ব্যাপক অভিযান জেনারেল
আইসেনহাওয়ারের সৈন্যদল ছাড়াও, তর্জনীহেলনে
বলকানের দিকে কাঁপাইয়া পড়িবে ইরাক ও সিরিয়া-
স্থিত সেই রুটিন সৈন্যদেরও আকর্ষণ করে।

(২) সমুদ্রাভিযান—by Capt. Frederick L. Oliver

যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় ইউরোপীয় ভূভাগে মিত্র-
পক্ষকর্তৃক bridgehead স্থাপনই যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ।
জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে ইতালীর পদাঘণের
উপর রুটিন ও কানাডিয়ান সৈন্যের অবতরণ, যুদ্ধ
জাহাজের পাহারা, জেট বড় ও মধ্যমাকারের সৈন্যবাহী
জাহাজ বাধা সম্পাদিত হয়। সৈন্য নাবাহার
যে সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ জাহাজ যুদ্ধরতই নিশ্চিত হইয়াছে
তাহা সহজেই আক্রান্ত হইবার যোগ্য।

নিরাপদ সেতুপথভরণের দুইটি নিপন—যুদ্ধজাহাজ ও
ইউ-বোটে আক্রমণ এবং উপকূলস্থিত কমান্ডপ্রেষ্ট।
প্রথম নভেম্বরে (১৯৪২) উত্তর আফ্রিকা অবতরণের
পথ নির্ধারণ কৃত করিয়া ১৩টি ইউ-বোটে ক্ষণে করা
হয়। ইতালী অভিযানে ইতালীয় ইউ-বোট ও যুদ্ধ-
জাহাজ হইতে আশঙ্কিত অঙ্গ বাধা পাওয়া গিয়াছিল।

ইতালী নৌ-বাহিনীর অবস্থা রহস্যময়, তবে তাহা
যাহাতে হইবে দেখা না দিতে পারে সেজন্য প্রকৃত
পাকিয়া মিত্রপক্ষ ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিতে পারেন
বলিয়া মনে হয়। ইহার নৌবল ৫-৭ যুদ্ধজাহাজ,
১০ লক্ষ জাহাজ, ৯০টি ডেস্ট্রয়ার ও টরগিডো-বোট,
৭০ সাবমেরিন এবং বহুসংখ্যক মোটর-বোট। টোরগিডো

ও অজ্ঞাত স্থানে জলসুড়ে ইহার সংখ্যা অনেক কম
হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সিসিলী বিজয়, জেনোয়ায়
ও এজাক্স পোতাশ্রয় বোমাবর্ষণ, দেশীয় বিপ্লবজার
জন্ম পূর্ব হইতেই দুর্বল মনোবলের আশে অধঃপতন
হইয়াছে। ইতালীয় নৌবাহিনী Spezia, Genoa-ও
এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপরিত্তাগের পোতাশ্রয়ে অবস্থিত
করিতেছে। উপকূলভাগের কমান্ডপ্রেষ্টে পঙ্ক করিবার
ভার দেখায়া হইয়াছে নৌবহরের উপর। উহার ভারি
কমান্ডের বাধাযো ও বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় এই
স্বায়ত্বকার উপকরণগুলি চুম্বনের করিতেছে।

Bridgehead স্থাপনের পর কি কর্তব্য হইবে তাহা
নির্ধারণ করে নাৎসী প্রতিজ্ঞার উপর। এমন পরি-
স্থিতিরও উদ্ভব হইতে পারে যাহাতে বর্তমানে
strategyর সমগ্র চিত্রটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইতে পারে।
আমরা এখনও জানি না দক্ষিণ ইতালী আক্রমণই প্রধান
ও প্রকৃষ্ট আঘাত হইবে কি না। কিন্তু আক্রমণের
আশংকা লক্ষ্যস্থল নয়। ইহা উত্তরে আলপ্‌স দ্বারা
রক্ষিত এবং ইহার আঘাতের সম্ভাব্য। ইতালী বিস্তৃত
হইলে একটি দুই-সৈন্যদল সেখানে মোতায়েন করিতে
হইবে এবং তাহার সরবরাহ পথ হইবে দীর্ঘ ও ভ্রমণ,
ও স্বাভাব্য আক্রমণ এবং পোটোলেরও টান পড়িতে
পারে। এই সকল দিকগুলি মিত্রপক্ষকে ভাবিতে
হইবে।

ম্যোগোশাভিয়া, এলবেনিয়া ও গ্রীক পরিলারা মিত্র-
পক্ষকে সাহায্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ। জেনারেল
মিখাইলোভিচ, মিনি ম্যোগোশাভিয়ার যুদ্ধ-মন্ত্রী ছিলেন,
২০০,০০০ জন অগ্রদায়ী উপর কর্তৃত্ব করেন এবং ইহার
অধিকাংশই ম্যোগোশাভিয়ার লোক। যেহেতু প্যালা-
টাইন, সিরিয়া ও সাইপ্রাসে মিত্রপক্ষের অনেক সৈন্য
আছে, পূর্বদিক ও দক্ষিণ দিক হইতে বহুদূর উপদ্বীপ
আক্রমণের সম্ভাব্যতা বহুল পরিমাণে আছে।

বর্তমানে দক্ষিণ ইতালী অভিযান ও সেখানে কর্তৃত্ব
প্রদত্ত বহুদূর অভিযানের কেন্দ্রভূমি হিরাঁবে দ্বা যাহাতে
পারে। যদি দক্ষিণ ফ্রান্সে তখন কোন উদ্বেগ থাকিত

তবে কসিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ দখলের পক্ষেই চেষ্টা করা
হইত।

(৩) বিমানাভিযান—by Daedalus.

লিবিয়া ও টিউনিশিয়ার যুদ্ধে উদ্ভাবিত ও প্যাটে-
নরিয়া ও সিসিলীর যুদ্ধে পরিবর্তিত যুদ্ধকৌশলই ইতালী
অভিযানে কাজে লাগান হইতেছে। এ সম্বন্ধে বিমান-
বাহিনীর চারিটি কর্তব্য আছে। প্রথম কাজ নিকটে ও
অস্থিান চালাইবার স্থানে শত্রুর বিমানকেন্দ্রগুলি ধ্বংস
করা ও আকাশে অধিপত্য বিস্তারের জন্য কাঁটী-
গুলিকে বিনাশ করা।

দ্বিতীয় কাজ সেই সম্বন্ধে অভিযানের স্থান হইতে
২০০০০ মাইল পর্যন্ত শত্রুর সরবরাহ-পথকে বিচ্ছিন্ন
করা। ইহার মানে পোতাশ্রয় উড়াইয়া দেওয়া, রেলপথ
কেন্দ্র, সড়ক ভাঙার ও গুলি, গুলি পূর্ণ পথঘাট, সেতু
ও বিদ্যুৎ উৎপন্নকার কারাগারসমূহ ধ্বংস করা।

তৃতীয় কাজ অভিযানকারী সৈন্যদের উপর একটি
নিরাপদ ছাড়া ধরিয়া থাকা। চতুর্থ কাজ সৈন্য কর্তৃক
অধিকৃত বিমানকেন্দ্রসমূহকে যত শীঘ্র সম্ভব কাজে
লাগানো, কারণ এই সকল স্থান হইতে শত্রুর সরবরাহ
পথের আরও অগ্রদিকের বিনাশ সাধন করা সম্ভব।

প্রথম দুইটি কাজ একেজে সিসিলীর যুদ্ধের সময়
আগষ্ট মাসে হ্রাস করা হয়। তাহার কিছু পরেই তৃতীয়
ও চতুর্থ কাজ করার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায়
প্রধান চাপ পড়ে স্বল্পসৈন্য ও নৌবহরের উপর এবং
বিমানবাহিনী ইহাদের সহযোগিতা ও সমন্বয় করে।
তাহার পরের কর্তব্য নির্ণয় করিতে ইতালীর কতখানি
মিত্রপক্ষ অধিকার করিতে চান ও করিতে পারেন তাহার
উপর।

মেঘমূর্ত্ত প্রগতি

আগামী

(ছোট ছোট পত্রের সমাবেশ)

শীঘ্রই বাকি হইবে।

নেপলস ও ফিগারার পর্যন্ত ফরাসিদের প্রসার
কচিত করে যে অন্ততঃ দক্ষিণ ইতালীর এক তৃতীয়াংশ
অধিকার করিবাক অভিলাষী। এমনও হইতে পারে যে
রোম ও অন্তর্গত ইতালী লণ্ডা হইবে। এই দুই
ক্ষেত্রেই মিস্ত্রি শক্তির বিমানবহরের কাড়ে নূতন সজ্জা-
বনার ব্যয় মুক্ত হইয়া যাইবে।

সিসিলীতে জার্মান পরাজয়ের পর দক্ষিণ জার্মানির
ও অষ্ট্রিয়ার বিপদের হুচনা হইল। দক্ষিণ ইতালীতে
অগ্রগতি সেই বিপদকে খনীভূত করিবে। মিউনিক
ও ভিয়েনার দূরত্ব ৫০০ শত মাইল কমিয়া যাইবে। দুই
ঘণ্টার মধ্যে ইনসব্রাক ও ব্রাগেনফাটের গুরুত্বপূর্ণ রেল-
কেন্দ্রগুলি পৌঁছান যাইবে। কুহর এলাকায় বিমানাক্র-
মণের ফলে টাইরলার হাইড্রো-ইলেকট্রিক কারখানা
টাইহার কারখানা, ক্যাসিফিয়ার ম্যাগনেসিয়াম কারখানা
এবং উত্তর ও দক্ষিণ অষ্ট্রিয়ার, দক্ষিণ ব্যাভেরিয়ার এবং
ব্যাভেনের অসংখ্য কারখানা ও যন্ত্রোপকরণকেন্দ্র বকল
হইয়া পড়িবে।

অষ্টরিকের বন্ধনে বিমানবহরের কাণ্ডাবলী আরও
ব্যাপক হইতে পারে। বারি ও ব্রিসেনির মধ্যভাগের

বিমানকেন্দ্রগুলির কর্তৃত্ব ও আকাশে আধিপত্য গ্রীসের
সংযোগ-পথ ছিন্ন করিবার জজ যথেষ্ট। আফ্রিয়াটিক
জাহাজ চলা বন্ধ হইবে। ডালমেশিয়ার উপকূল ও
আলবেনিয়া বন্ধ করা প্রায় মুশ্বিল হইয়া পড়িবে।

আবার দক্ষিণ ইতালী হইতে পশ্চিম দিকে বিমান-
বহরের লক্ষ্যস্থল হইবে কসিকা ও সার্ডিনিয়া। এই দুইটি
দ্বীপকে অধিকার অথবা বিপন্ন করিতে পারিলেই
ফরাসী উপকূল আক্রমণ করিবার কথা ভাবা যাইবে।

জার্মান Luftwaffe এই সকল গতিবিধি বর্ণ-
করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মিত্রপক্ষ যে
শক্তি সংহত করিতে পারেন তাহা তাহাদের সার্ডিনিয়া
ও বন্ধনের বিমানবাহিনী অপেক্ষা বহুগুণ বলশালী।
অতীত নিদান বিমান কৃতির পর দক্ষিণ জার্মানির ও
অষ্ট্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শিল্প দকার জজ ফাইটার
নিদ্রাক্রমে করিতে যাইলে উত্তর পশ্চিম ইউরোপ শিথিল
হইবে। হিটলারের হাত হইতে ইতালী বিচ্যুত হইলে,
যদিও তাহা জার্মান-সৈন্যকে তেমন স্পর্শ করিবে না,
বিমান যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়ের স্বরূপাত
হইতে পারে।*

ইতালী অভিমানের কয়েকটি দৃশ্য

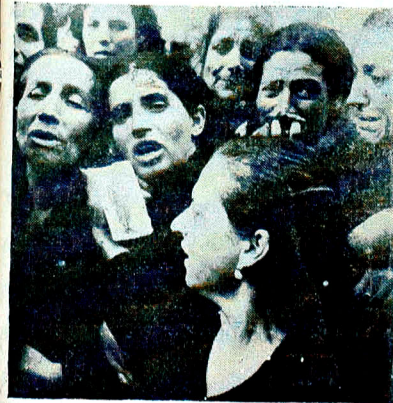
যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইতালীতে বন্দী



আমেরিকান সৈনিকগণ কর্তৃক দক্ষিণ
জার্মান বন্দীর দলগুলি মধ্য রাস্তা
দ্বিধা একটি সামরিক বন্দিকারায়
চলিতেছে। মিত্রশক্তি কর্তৃক ইতালীর
প্রধান দুখণ্ডে অভিযানের প্রারম্ভে
যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিকদল কর্তৃক জার্মান-
গণ পরিবেষ্টিত ও দূত হয়।

(যুক্তরাষ্ট্রের সমর-সংজ্ঞার সংবাদ-
কেন্দ্রের সৌজঙ্গে)

ইতালীর পুত্রশোকতুরা জনবিরহ



ইতালীর রোক্তমান্য জনমিগ (এক
জনের হস্তে মিহত পুত্রের ছবি)
জার্মান কর্তৃক মিহত পুত্রবিশেষের
জজ নেপলসে ক্রন্দনরত। ইতালীয়ান
স্বকরণ যখন মগর গৃহমরত জার্মান-
সৈন্য হস্ত হইতে গৃহরক্ষার জজ অস্ত্র
ধরিয়াছিল, তখন জার্মানগণ উহা-
দগিকে গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া
আক্রমণরত মিত্রশক্তির (পক্ষম
আশ্রি) জজ রাধিহুঁ দিয়াছিল।

(যুক্তরাষ্ট্রের সমর-সংজ্ঞার সংবাদ-
কেন্দ্রের সৌজঙ্গে)

প্রগতির যুগে আপনার পুরোধা কটির আসনানের স্থান নেই

এ যুগের উপযুক্ত আসনানের চাহিদা

একমাত্র

“আসবাব”ই

মেটাতে পারে।



Sign of Quality

এক সেট আসবাবের ফার্নিচার সত্যি আপনাকে আনন্দ

দেবে, প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটাবে, তাছাড়া অতিথিরাও

আপনার কটির প্রশংসা করবেন।

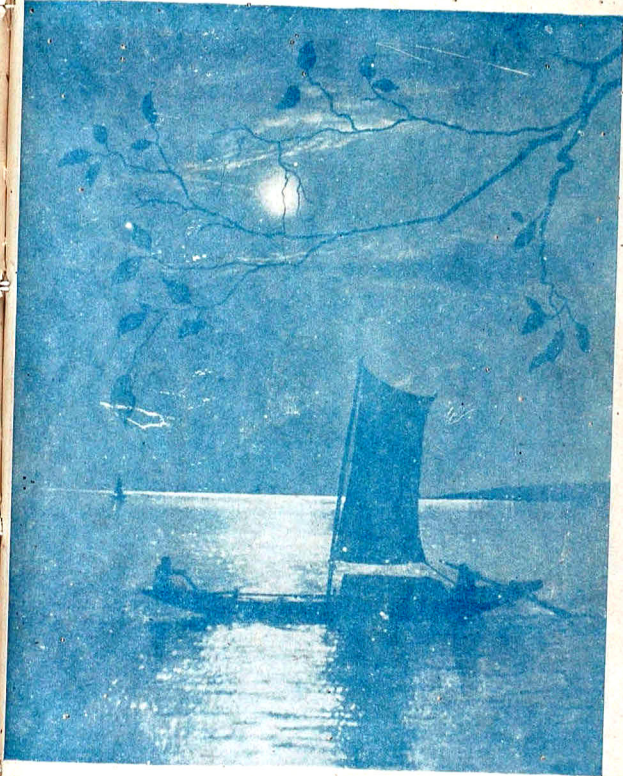
শো-রুম ও অফিস :-

৭৬, রাসবিহারী এভিনিউ
(রসা রোডের মোড়)

কারখানা :-

পি ৪৯৭, এস, আর, দাস রোড

বিবাহে যোতুকের ও অফিসের ফার্নিচার সব সময় তৈরী থাকে।



দিনের শেষে



"হামারী বাত" চিত্রে
শ্রীমতী ও মমতাজ আলি



চলতি ছবির সমালোচনা

হামারী বাত—বগ্ধে টকিজের নতুন ছবি 'হামারী বাত' যাকগের সহিত চিত্রা ও জ্যোতি সিনেমায় দেখান হচ্ছে। অমিয় চক্রবর্তীর কাহিনীকে অবলম্বন করে ছবি-খানি পরিচালনা করেছেন বরমশী। সঙ্গীত পরিচালনার ভার ছিল অনিলা বিশ্বাসের ওপর। চিত্র গ্রহণ করেছেন আরি, ডি, মথুর ও পরিচালক বরমশী স্বয়ং শব্দগ্রহণের

কেন্দ্র করেই ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। কোন এক ফিঙ্গা কোম্পানীর বৃদ্ধ সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত উমাশঙ্কর এক কথা বিশ্বাস করতেন রাজী নন। তবে সেই কোম্পানীর ম্যানেজার স্বরেশবাণু বুকেছিলেন যে নতুনদের যুগে পুরাণ সব কিছুই অচল—তাই তিনি পণ্ডিত উমাশঙ্করকে বরখাস্ত করে প্রোডাকশন ম্যানেজার পিয়ারীলালের ভাইপো প্রাণনাথকে মিউজিক ডাইরেক্টররূপে নিয়োগ করেন। এ ঘটনায় বৃদ্ধ উমাশঙ্কর গুরুতর আঘাত পান।



উমাশঙ্করের একমাত্র কন্যা আসে ইন্ডিও ম্যানেজারের কাছে বাপের হয়ে ওকালতি করতে কিন্তু প্রথম দেখা হয় ইন্ডিও ম্যানেজারের সঙ্গে নয় ইন্ডিয়ার নতুন মিউজিক ডাইরেক্টর প্রাণনাথের সঙ্গে। প্রাণনাথকে ইন্ডিও ম্যানেজার মনো করে বীণা তার কাছেই সকল কথা বলে কিন্তু পরে সে জানতে পারে যে সেই হচ্ছে নব-নিয়ুক্ত মিউজিক ডাইরেক্টর। বীণার সঙ্গে পড়ে আলাপ হয় ম্যানেজারের—বীণা গায় ইন্ডিওতে চাকরী। কিন্তু উমাশঙ্কর

হামারী বাতের একটি দৃশ্যে খেবিকারারী ও জয়রাজ তার নিয়েছিলেন। ৬৭ বির বিভিন্ন ভূমিকায় খেবিকারারী, অমত করার বীণা চাকরী গ্রহণ করে না। এদিকে জয়রাজ, ডেভিড, শা নওয়াজ, মমতাজ আলী, রাজকুমারী বৃদ্ধ উমাশঙ্কর চাকরীর চেষ্টায় ঘুরে বেড়ান। প্রাণনাথ আসে বীণাকে বোঝাতে যে বীণার উচিত চাকরী নিয়ে পিতার কষ্ট লাঘব করা। বীণা উমা-থে বিবাহে নতুনই চিরকাল জয়লাভ করে—ইটিকে শব্দরকে রাজী করিয়ে চাকরী নেয় ইন্ডিওতে। ইন্ডিও

ম্যানেজারের কুনজর পড়ে বীণার গুণর। বীণা আর প্রাণনাথের মধ্যে বীরে বীরে ভালবাসা জমে ওঠে। হুডিও ম্যানেজারের কুনজর এড়াবার জন্তে ও তার স্বামী অরুণোদর দক্ষার সঙ্গে বীণা তার প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে হুডিও ম্যানেজারের সামনে কিছ হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হয় প্রাণনাথ। প্রাণনাথ ভুল বোকে বীণাকে। বীণা আসে প্রাণনাথের ভুল ভাবতে এবং সেখানে সে ভীষণভাবে আঘাত পায় ও তার ফলে তাকে যেতে হয় হাসপাতালে। পরে সেই প্রতিবেশী ও হুডিও ম্যানেজারের স্বী এসে ভুল ভাঙে প্রাণনাথের। প্রাণনাথের মিলনে হয় বীণার সঙ্গে আর বন্ধ উমাশঙ্করও বোকে যে নতুন আর পুরাতনের মধ্যে নতুনই চিরকাল জন্ম হয় কারণ তার পুরাণ স্তরের চেয়েও নতুন স্বরকেই সকলে বেশী ভালবাসে। বীণা আর প্রাণনাথের মিলনে আনন্দের সঙ্গে যোগ দেন উমাশঙ্কর ও তার বন্ধ প্রোক্তকসন ম্যানেজার পিয়াবীলাল। এইখানেই হয় ছবির পরিসমাপ্তি।

বধে টিকিঞ্জের অল্প সব ছবি অপেক্ষা এ ছবির কাহিনী একটু নতুন ধরণের কিন্তু ছবির চিত্রনাট্য রচনা ভাল বলা চলে না এবং তার ফলেই ছবির গতি সব জায়গায় সমান নয়। চিত্রনাট্য রচনার দিকে আর একটু লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। তবে ছবির চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ

বধে টিকিঞ্জের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে। অনিল বিশ্বাসের সঙ্গীত পরিচালনা ভালই এবং গানগুলি ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই দৈবিকারাগীর নাম উল্লেখ করতে হয়। তার সুনন্দর, সংযত ও ভাবাবেগপূর্ণ অভিনয় সত্যই প্রশংসনীয়। নায়কের ভূমিকায় জয়রাজ সুনন্দর অভিনয় মৈথুণ্য দেখিয়েছেন। অপরূপের চরিত্রে বেভিজ, শশী, নন্দরাজ ও মনতাজ আলীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নবাগতা অভিনেত্রী সুরিয়ার অভিনয় দেখে মনে হয় তার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। ছবির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু যে বধে টিকিঞ্জের অল্প ছবির মতন এতে সস্তা দরের কোন বকম হাতকৌতুক স্থান পায়নি। ছবিখানি সকল দিক থেকে বধে টিকিঞ্জের সুনাম রক্ষা করেছে।

পোখপুজ—ভার্মাট ফিল্মসের দ্বিতীয় ছবি “পোখপুজ” মিনার ছবিখর ও নিজস্বীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। অম্বুজা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন সঙ্গী দাসগুপ্ত। গানের সুর দিয়েছেন হুগী সেন। শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ করেছে গৌরদাস ও প্রবুজ কর। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন রেখকা, পার্বিতী, শিশিরকুমার, শৈলেন, জহর, বিদান ব্যানার্জি প্রভৃতি।

অম্বুজা দেবীর “পোখপুজ” এর কাহিনী দর্শক ও পাঠক সমাজের কাছে নতুন নয় বলেই কাহিনী দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না।

আজকের দিনে “পোখপুজ” এর কাহিনী একটু Back dated হয়ে পড়ে। পরিচালনার মধ্যে সঙ্গী দাসগুপ্ত বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি তবে তাঁর চিত্রনাট্য রচনা চলনসায়। আলোক চিত্রগ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ নিষ্ঠ ত নয়। হুগী সেনের সঙ্গীত পরিচালনা সাধারণ শ্রেণীর।

অভিনয়ের কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই “শিবাবীর” ভূমিকায় রেখকা রায়ের নাম করতে হয়। তাঁর সুনন্দর সংযত ও ভাবাবেগ পূর্ণ অভিনয় আমাদের বিশেষ ভাল লেগেছে। স্ত্রীমাকারের ভূমিকায় শিশিরকুমার সঞ্চল কোন আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ একদিন তিনি ছিলেন মঞ্চ ও পর্দার গুরুদের কিন্তু আজ আর তাঁর সে প্রতিভা নেই, প্রতিভা হয়ত তাঁর মধ্যেই আছে, বোধ হয় বার্ষিকের জন্তে সেটা সূচিয়ে ভালবাবর শক্তি আর তার নেই। আমাদের মনে হয় প্রযোজকদের এবার তাকে ছুটি দেওয়া উচিত। “ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে” শিশিরবাবুরও দেখানো ছবির শেষ দৃশ্যের অভিনয় অপরূপ। অপরূপের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, পার্বিতী, প্রজা, জহর বাপুলী প্রভৃতির অভিনয় মন্দ নয়। গানগুলি মন্দ নয়।

বলে শুনা যাচ্ছে। এঁদের একজন হচ্ছেন প্রতিমা দাসগুপ্তা ও অপরজন হচ্ছেন জীলাদেশাই। প্রতিমা দাসগুপ্তা ও তাঁর অংশীদার কিশোর সাহু এই প্রচেষ্টায় অনেকদূর অগ্রগতি হয়েছেন।

কপূরচাঁদ লিঃ—কপূরচাঁদ লিঃ কারদার প্রোডাকশনের চারখানা ছবির পরিবেশন বহু লাভ করেছে, যথা—“কাহন”, “গীত”, “সংযোগ” ও “বাহারী”, “কাহন” সম্ভ্রতি বোম্বাইয়ে মুক্তিলাভ করেছে।

দল পরিবর্তন—রাণীবালা, রতীন বন্দোপাধ্যায় “রঙমহল” গম্ভীর ছেড়ে “মিনার্ভা” দলে নাম লিবিচ্ছেন। “মিনার্ভা”য় সরস্বতীও যোগদান করেছে। বর্তমানে “মিনার্ভা” সম্ভারায় বেশ শক্তিশালী হয়েছে। “রঙমহলে” রাধাবাণী (বেভিজ) যোগদান করেছে।

হুডিও কথা

নাম বদল—শৈলজানন্দ কাণী ফিল্মসের হয়ে যে ছবি পরিচালনা করছেন তার নতুন নাম দেওয়া হয়েছে “অভিনয় নয়”। ছবিখানির পূর্বে নাম দেওয়া হয়েছিল “বিপণ্যায়”।

ইউরেকা পিকচার্স—গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইন্দুপ্রী হুডিওতে এঁদের দ্বিতীয় ছবি “দোঁটানী”র মহরর সম্পন্ন হয়ে গেছে। স্বীয় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন মণি বন্দ্য। প্রথম ভিতরে সেটে গ্রাম লাহাকে দেখা যায়। এঁদের প্রথম ছবি “স্বামীর ঘর” দর্শকদের মোটেই পুণী করতে পারেনি, আশা করি এ ছবিখানিকে দর্শকদের প্রিয় করার জন্ত প্রযোজকগণ বিশেষ চেষ্টা করবেন। আমরা এঁদের আগামী ছবির সাফল্য কামনা করি।

ঠুড়িয়ার বাইরে

দাপক সিনেমা—“নাট্যভারতী”র স্থলে নতুন চিত্রগ্রহ “দাপক সিনেমা”র উদ্বোধন উৎসব গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে শ্রীরাষ্ট্রের “শঙ্কর পার্শ্বতী” দেখান হচ্ছে। ছবির প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করেছেন সাধনা বহু ও অরুণ।

মহিলা প্রযোজক—বাংলার চুইজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী বোম্বাইয়ে চিত্রপ্রযোজনার কাজ আরম্ভ করবেন জয়দেবী এর পরিচালক হীরেন বসু—“অমর গীতি” ও “কবি

আর্ট ফিল্মস্

৫৮, চৌরঙ্গী রোড
দি, কক, ২২২



আর্ট ফিল্মস্ এর প্রথম অর্থ—“দ্বন্দ্ব”

এক অভিনয় কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত আত্মদর্শন.
দ্বিতীয় চিত্র নিবেদনের পরিচয় শীঘ্রই পাইবেন.
সঙ্গীতে সন্ধ্যা, অভিনয়ে উন্নত এবং পরিচালনায়
নিষ্ঠ ত এই চিত্রখানিকে আপনি নিচুতাই
অভিনন্দিত করিবেন।

খবর পাওয়া যায়নি, তবে সস্ত্রীত খবর পাওয়া গেছে তিনি প্রধান পিকচারের হয়ে একথানি হিন্দী ছবি পরিচালনা করেছেন। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রাগিনী, নাজমল হোসেন, গিয়ানী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পণ্ডিত অমরনাথ। ছবির নাম দেওয়া হয়েছে “দাসী”।

ছবির চরিত্রলিপি হয়েছে এইরূপ: বিমলা—চন্দ্রাবতী, হুইটফিল্ড—ছবি বিশ্বাস; কল্যাণী—সুনন্দা; অশোক—জহর গাঙ্গুলী; শিবনারায়ণ—অশীষ চৌধুরী; গোপীনাথ—নরেশ মিত্র প্রভৃতি। গানের স্বর দিচ্ছেন পঞ্চজ কুমার মল্লিক।

তলোয়ার প্রোডাকসন—এঁদের নতুন হিন্দী ছবি “অজিয়া”র কাজ প্রায় শেষ পৃথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছবির শ্রেষ্ঠাংশ অভিনয় করেছেন রমলা দেবী। অপরাধের ভূমিকায় অমর, রূপলোনা, কল্যাবতী, স্কন্দর প্রভৃতি রূপ দিয়েছেন।

পরিচালক নীতিন বসু—পরিচালক নীতিন বসু বোম্বাইএর অগ্রিম ঠেড়িতে তাঁর দ্বিতীয় ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্ম মতিলাল ও লীলা দেশাই মনোনীত হয়েছেন। অপরাধের ভূমিকায় জগদীশ শেঠী, ইয়াকুব, রাজকুমারী ওজা, শা নওয়াজ প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

নিপ্রদাস—এম, পি প্রোডাকসন শরৎচন্দ্রের “বিপ্রদাস”এর চিত্রস্বয়ং জয় করেছেন। নাম ভূমিকায়

শিশির ভাঙ্করীকে নামান চলে কাঁদা সে বিষয় কর্তৃপক্ষরা এখন বিবেচনা করছেন। আমাদের মনে হয় শিশির বাবুর বয়স হয় গেছে এখন আর তাঁকে আবার দৃষ্ট দেওয়া কেন আর ক্যামেরার সামনেও তিনি বোধ হয় অচল হয়ে পড়বেন।

শুভ মহরৎ—গত ২ই ফেব্রুয়ারী কালী ফিল্ম ঠেড়িতে রূপা লিঃ এর নতুন ছবির শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন সুকুমার দাসগুপ্ত। প্রথম দিনের সেটে মলিনা ও রবি রায়কে দেখা যায়।

বসে টকিজ—পরিচালক হুম্মী মজুমদার এদের প্রচারমূলক ছবি “পেশা হিসাবে সেবা”র কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় জয়রাজ ও লীলা চিৎখী অভিনয় করেছেন। গানের স্বর দিচ্ছেন অনিল বিশ্বাস। সঙ্গীত পরিচালক বিশ্বাসের স্ত্রী আশাবাণী একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ দেওয়ার জন্ম মনোনীত হয়েছেন।

পরিচালক ফণী মজুমদার—ভারত পিকচারের অগম্যন্ত হিন্দী ছবিখানি সম্পূর্ণ করার ভার পড়েছে পরিচালক মজুমদারের ওপর। বাঙলা “রাজকুমারের নির্দাসন” চিত্রের কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য চিত্রের কাহিনী পঠিত হয়েছে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের নতুন ছবি “গৃহলক্ষ্মী”র কাজ পূর্ণার্জনে আরম্ভ হয়েছে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্ম চন্দ্রাবতী, পদ্মা, অশীষ, রতীন, জহর প্রভৃতি-মনোনীত হয়েছেন।

চাঁদের কলঙ্ক—প্রমথেন বড়ুয়ার পরিচালনায় “চাঁদের কলঙ্ক”এর কাজ নিয়মিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় বড়ুয়া ও যমুনা অভিনয় করেছেন।

উদয়ের পথে—পরিচালক বিমল রায় নিউ-থিয়েটার্সের আগামী বাংলা ছবি “উদয়ের পথে”র কাজ প্রায় অর্ধেকের ওপর শেষ করেছেন। গানের স্বর দিচ্ছেন রাইচাঁদ বড়াল।

চিত্ররূপা লিঃ—অপূর্ণ মিত্রের পরিচালনায় এঁদের আগামী ষোড়শী ছবি “সন্ধি”র কাজ নিয়মিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। প্রধান অংশে অশীষ ও বিদ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। পরিচালক মজুমদার এখন নায়িকা নির্বাচন করে উঠতে পারেননি।

মেরা বহীন—পরিচালক হেম চন্দ্র নিউথিয়েটার্সের হয়ে তাঁদের প্রচার কার্যমূলক হিন্দী ছবি “মাই সিটার” মেরা বহীন এর কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির কাহিনী Blood Bank (ব্লাড ব্যাঙ্ক)এর ওপর লিখিত। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় চন্দ্রাবতী, সাগল, অমর মল্লিক প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

নিউ সেলুলী প্রোডাকসন—ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় এঁদের বাংলা ছবি “প্রতিকার”এর কাজ নিয়মিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কুমার শতীল দেববর্মা। নায়িকার ভূমিকায় রূপ দেবার জন্মে থেংকা রায় মনোনীত হয়েছেন। অপরাধের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী, পরেশ ব্যানার্জি, রেবা বসু প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

খবর পাওয়া যায়নি, তবে সস্ত্রীত খবর পাওয়া গেছে তিনি প্রধান পিকচারের হয়ে একথানি হিন্দী ছবি পরিচালনা করেছেন। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রাগিনী, নাজমল হোসেন, গিয়ানী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন পণ্ডিত অমরনাথ। ছবির নাম দেওয়া হয়েছে “দাসী”।

ছবির চরিত্রলিপি হয়েছে এইরূপ: বিমলা—চন্দ্রাবতী, হুইটফিল্ড—ছবি বিশ্বাস; কল্যাণী—সুনন্দা; অশোক—জহর গাঙ্গুলী; শিবনারায়ণ—অশীষ চৌধুরী; গোপীনাথ—নরেশ মিত্র প্রভৃতি। গানের স্বর দিচ্ছেন পঞ্চজ কুমার মল্লিক।

তলোয়ার প্রোডাকসন—এঁদের নতুন হিন্দী ছবি “অজিয়া”র কাজ প্রায় শেষ পৃথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছবির শ্রেষ্ঠাংশ অভিনয় করেছেন রমলা দেবী। অপরাধের ভূমিকায় অমর, রূপলোনা, কল্যাবতী, স্কন্দর প্রভৃতি রূপ দিয়েছেন।

পরিচালক নীতিন বসু—পরিচালক নীতিন বসু বোম্বাইএর অগ্রিম ঠেড়িতে তাঁর দ্বিতীয় ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্ম মতিলাল ও লীলা দেশাই মনোনীত হয়েছেন। অপরাধের ভূমিকায় জগদীশ শেঠী, ইয়াকুব, রাজকুমারী ওজা, শা নওয়াজ প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

নিপ্রদাস—এম, পি প্রোডাকসন শরৎচন্দ্রের “বিপ্রদাস”এর চিত্রস্বয়ং জয় করেছেন। নাম ভূমিকায়

শিশির ভাঙ্করীকে নামান চলে কাঁদা সে বিষয় কর্তৃপক্ষরা এখন বিবেচনা করছেন। আমাদের মনে হয় শিশির বাবুর বয়স হয় গেছে এখন আর তাঁকে আবার দৃষ্ট দেওয়া কেন আর ক্যামেরার সামনেও তিনি বোধ হয় অচল হয়ে পড়বেন।

শুভ মহরৎ—গত ২ই ফেব্রুয়ারী কালী ফিল্ম ঠেড়িতে রূপা লিঃ এর নতুন ছবির শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন সুকুমার দাসগুপ্ত। প্রথম দিনের সেটে মলিনা ও রবি রায়কে দেখা যায়।

বসে টকিজ—পরিচালক হুম্মী মজুমদার এদের প্রচারমূলক ছবি “পেশা হিসাবে সেবা”র কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় জয়রাজ ও লীলা চিৎখী অভিনয় করেছেন। গানের স্বর দিচ্ছেন অনিল বিশ্বাস। সঙ্গীত পরিচালক বিশ্বাসের স্ত্রী আশাবাণী একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ দেওয়ার জন্ম মনোনীত হয়েছেন।

পরিচালক ফণী মজুমদার—ভারত পিকচারের অগম্যন্ত হিন্দী ছবিখানি সম্পূর্ণ করার ভার পড়েছে পরিচালক মজুমদারের ওপর। বাঙলা “রাজকুমারের নির্দাসন” চিত্রের কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য চিত্রের কাহিনী পঠিত হয়েছে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এদের নতুন ছবি “গৃহলক্ষ্মী”র কাজ পূর্ণার্জনে আরম্ভ হয়েছে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ের জন্ম চন্দ্রাবতী, পদ্মা, অশীষ, রতীন, জহর প্রভৃতি-মনোনীত হয়েছেন।

চাঁদের কলঙ্ক—প্রমথেন বড়ুয়ার পরিচালনায় “চাঁদের কলঙ্ক”এর কাজ নিয়মিত ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় বড়ুয়া ও যমুনা অভিনয় করেছেন।

উদয়ের পথে—পরিচালক বিমল রায় নিউ-থিয়েটার্সের আগামী বাংলা ছবি “উদয়ের পথে”র কাজ প্রায় অর্ধেকের ওপর শেষ করেছেন। গানের স্বর দিচ্ছেন রাইচাঁদ বড়াল।

চিত্ররূপা লিঃ—অপূর্ণ মিত্রের পরিচালনায় এঁদের আগামী ষোড়শী ছবি “সন্ধি”র কাজ নিয়মিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। প্রধান অংশে অশীষ ও বিদ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। পরিচালক মজুমদার এখন নায়িকা নির্বাচন করে উঠতে পারেননি।

মেরা বহীন—পরিচালক হেম চন্দ্র নিউথিয়েটার্সের হয়ে তাঁদের প্রচার কার্যমূলক হিন্দী ছবি “মাই সিটার” মেরা বহীন এর কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির কাহিনী Blood Bank (ব্লাড ব্যাঙ্ক)এর ওপর লিখিত। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় চন্দ্রাবতী, সাগল, অমর মল্লিক প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

নিউ সেলুলী প্রোডাকসন—ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় এঁদের বাংলা ছবি “প্রতিকার”এর কাজ নিয়মিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কুমার শতীল দেববর্মা। নায়িকার ভূমিকায় রূপ দেবার জন্মে থেংকা রায় মনোনীত হয়েছেন। অপরাধের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী, পরেশ ব্যানার্জি, রেবা বসু প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

হিন্দুস্থান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

—লিমিটেড—
স্থাপিত—১৯২৮

হড অফিস: ৫৩ ও হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা

—শাখা সমূহ—

বদরগঞ্জ, কাটোয়া, ভবানীপুর, বরগড়া (উড়িয়া),
চক্রদরপুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ এস, এন, রায়চৌধুরী

দৈনন্দিন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন



উচ্চাঙ্গের ট্যালেট পাউডার বা বোম্বোনেট ড্যালকাম
পাউডারের মূল্য থাকে অল্পেপ সাধা ট্যাক। এটি সকল

উদ্দেশ্যে
আমাদের
প্রস্তুত ট্যাক
যেমন বিশেষ উপযোগী
তেন নই স্থলভ।



মোটর গাড়ীর
টায়ার, ডিউর ও
নামাবিশ বরবরের
অব্যাহিতে ব্যবহারের
জন্য আমাদের ছেক চক অদ্বিতীয়।

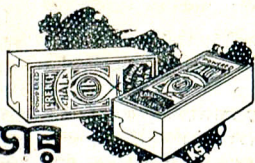


জমির ক্রমে ও নৃত্যনীর জন্ত বোটে ফেঞ্চ
চক নিতাই ব্যবহৃত হইতেছে। পরীক্ষা করিলে
আপনি নিশ্চয়ই
সন্তুষ্ট হইবেন।



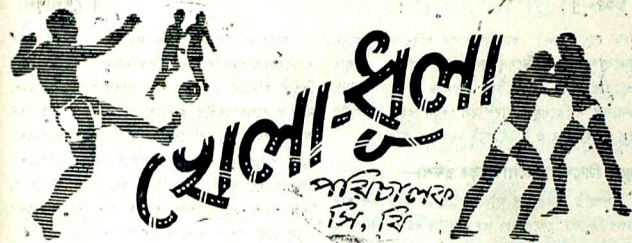
পুষ্টি
আসবাব ও
উচ্চমানি পরিষ্কারের জন্য
ফেঞ্চ চক
ব্যবহার করিলে
আপনার শ্রমের
লাভ বন হইবে, রূপসজ্জায় ট্যাক পাউডার চির-
পদ্মসা ও কম লাগিবে। দিনই সমাপনের ব্যবহৃত হইতেছে।

সি নে মা
আটি হুগানের
ও রঙ্গ মফের
স চি নে তা
অ ভি নে জী গনের
জঙ্গ প্রসাধনে ও
রূপসজ্জায় ট্যাক পাউডার চির-
পদ্মসা ও কম লাগিবে। দিনই সমাপনের ব্যবহৃত হইতেছে।



ফেঞ্চ চক
ট্যাক পাউডার

ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাই কোং লিঃ
৩১, ডায়ালসন লেন, কলিকাতা, ফোন-বি.বি. ১৩৩৭



হকি—কলিকাতায় হকি খেলার মরসুম শুরু
হ'য়েছে। স্থানীয় নাম করা বহু খেলোয়াড় গুরু সংক্রান্ত
কালে ব্যস্ত থাকায় খেলার ঠাঁও ম্যাটেই ভাল হ'চ্ছে
না। তা'ছাড়া লীগে নামা ওঠার পালা বন্ধ হওয়ার
প্রতিনিধিতার তীব্র উৎসাহ কমে গেছে।

বাংলা এ বছরে আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায়
যোগ দিয়েছে। ১৪ জন খেলোয়াড় নিৰ্বাচিত হ'য়ে
বোম্বাইয়ে প্রেরিত হ'য়েছেন। তাদের মধ্যে—ডব্লিউ স্বর্জি
(রোজাস) ই রচেন, সি. ট্যাদার্সেল (ক্যাপ্টেন) আই,
মিড, জে মারিবাডি, ক্যাপ্টেন স্বইনি, চিরঞ্জিত
রায়, পি জেমস, জি জ্যাকসন, জি নিম, টার্নল, মহম্মদ
নইম, এ মিত, পি মল্লিক মিটার এম কে সিংহ টিমের
ম্যানেজার হিচাবে যাত্রা করেছেন।

সম্ভরণ—এ বছরে ইতিমধ্যে হুইমিং ফেডারেশনের
বার্ষিক প্রতিযোগিতা অস্থগিত হবে লাহোরে। দিন
এখনও ঠিক স্থির হয়নি তবে জানা গেছে যে আগামী
আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিযোগিতা শুরু
হবে।

মুষ্টি প্রতিযোগিতা—আগামী মার্চ মাসে বেঙ্গলী
বল্লী এন্থ্রোপোলিসের উদ্বোধন ব্যঙ্গালী মুষ্টি-খোজাদের
উৎসাহ ও কার্যকলাপ বাড়বার জন্তে এক প্রতি-
যোগিতার আয়োজন করা হ'য়েছে। প্রত্যেক ব্যঙ্গালী
মুষ্টি খোজাই এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে বলে
আশা করা যায়।

টেনিস—এসাহাবায়ে নিখিল ভারত টেনিস প্রতি-
যোগিতা শেষ হ'য়েছে। যদিও বহু নাম করা খেলোয়াড়
যোগদান করেন নি তা সত্ত্বেও অহুহানের কোন কট
হয় নি। মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহের বিশেষ
অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রতিযোগিতায় মিস্ এল,
উডব্রিজ ৬-১, ৬-০ গেমে মিসেস ম্যাগুদরীকে পরাজিত
করেন। মিগড ভাবদস—ইফজিকার আমেদ ও মিস্
উডব্রিজ ৬-৪, ৭-২ গেমে ডবলিউ, সি. চ্য ও মিসেস্
রোমাসকে পরাজিত করেন। পুরুষদের সিঙ্গেলস্ হল
সার্ফেস ৬-২, ৬-৪, ৬-০ গেমে গউল মহম্মদকে পরাজিত
করেন। পুরুষদের ডবলস্—গউল মহম্মদ ও ইব্রাহিম
হোসেন ৬-০, ১১-৯, ৬-০ গেমে ইফজিকার আমেদ ও
গ্রেম পাঙ্কীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

ক্রিকেট
বোম্বাইতে প্রদর্শনী ক্রিকেট—বোম্বাইতে রেভ-
জন্স ফাণ্ডের সাহায্যকরে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হ'তে
১৪ই ফেব্রুয়ারী ৪ দিন ব্যাপী একটি ক্রিকেট খেলা
হয়। এই খেলায় সার্বিসেস্ একাদশের সঙ্গে
ভারতীয় একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সার্বিসেস্
দলের পক্ষে ইংলণ্ডের টেট ক্রিকেট খেলোয়াড় জার্নিন ও
ছাউজিফ যোগদান করেন। খেলা খুব উপভোগ্য
হয়েছিল। ভারতীয় দলের পক্ষে পাঙ্কীয়ে তরুন
খেলোয়াড় গুল মহম্মদ ১৪৪ রান করে নট আউট থাকেন।
সার্বিসেস্ দলের পক্ষে ছাউজিফ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায়

১৩৮ রাণ করেন। ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন মুস্তাক আলী ও সার্ভিসেস্ দলের পক্ষে জাভিদ। খেলায় ভারতীয় দল ৬ উইকেটে জয়লাভ করে। খেলার ফলাফল সার্ভিসেস্ একাদশ দল ৩০৩; ৩৪২, ভারতীয় দল ৭ উইঃ ৫৫২ ও ৪ উইকেটে ১৪৭ রাণ করে।

মুখে ক্রিকেট খেলোয়াড়ের চরিত্র—

সম্প্রতি এক খবরে জানা গেছে যে প্রায় একশোর উপর ক্রিকেট খেলোয়াড় এই মহামুখে নয় মৃত আর না হয় শব্দশব্দ বন্দি শিবিরে অবস্থান করেছেন। তার মধ্যে নাম করা খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া গেল। এরা মারা গেছেন—বেডলে ভেরিটি, কেনেথ ফার্নেস্, জি, জি, মেকলে, আর, ই, সি বাটার ওয়ার্থ, আর, এইচ, সি, হিউম্যান্, জি, বি, লেগি, সি টি এগাস্টম্, ডব্লিউ, কে, উইনল প্রভৃতি ইংরাজ খেলোয়াড়।

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের মধ্যে আর, জি, গ্রেগরী ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের মধ্যে এ, বি, সি, ব্যাটন ও এ, ডব্লিউ তিসবোই। এ ছাড়া অনেক খেলোয়াড়ের আবার পাড়াই পাওয়া যায়নি।

তা ছাড়া যারা বন্দি শিবিরে তাদের মধ্যে পি, আই, আচার ও (কলিকতা), ডব্লিউ, ই, বোউশ, এক, আর, রাউন, বি, ডব্লিউ, রট, বি, ডি, ক্যারিস্ প্রভৃতি ইংরাজ খেলোয়াড় ও ডব্লিউ, ডব্লিউ, ওয়েড, আর এইচ, ক্যাটারল প্রভৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার এবং বি, এ বাবেট ও এ, আর, মলোনের (অস্ট্রেলিয়া) নাম করা যেতে পারে।

রঞ্জি ট্রফি সেমি-ফাইনাল

বাংলা ও মাদ্রাজ—

এটা খুব আনন্দের কথা যে বাংলা পুনরায় প্রায় ৪ বৎসর বাধে রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল খেলবে। ১৯৩৬—১৯৩৯ সালে বাংলা দল দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে হারিয়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

আলোচ্য খেলাটি খুব উজ্জ্বলের হয়নি। বোলারগণই সাক্ষ্যের পরিচয় দিয়েছেন যদিও নিম্নলিখ চ্যার্টজি বান্দ্যার দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রাণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে গোপালন ও রিচার্ডসন অতি শ্রমের খেলা দেখিয়ে ৭৬ ও ৬২ রাণ করেছেন। বাংলা দলের এস, মুস্তাক চমৎকার সিক্টিং করেছেন। বোলার হিসাবে কে, ভট্টাচার্য্য; এম, বান্যাক্জি ও বি, মিজ বাংলা দলের তরফ হতেও রাম সিং মাদ্রাজের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসা দাবী করতে পারেন।

খেলার ফলাফল—

বাংলা দলের প্রথম ইনিংস—২৩৫ রাণ। এ কন্সর ৮০, কে, ভট্টাচার্য্য ৬৭; রাম সিং ১০৪ রাণে ৭টি উইকেট পান।

মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস—১০২ রাণ। রাম সিং ৩৬, বিমল মিজ ২৩ রাণে ৩টি ও এম, বান্যাক্জি ২৭ রাণে ৪টি উইকেট পান।

বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস—২৬৬ রাণ; নিম্নলিখ চ্যার্টজি ১১২, অমিত চ্যার্টজি ৫৩, রাম সিং ৯০ রাণে ৭টি উইকেট পান।

মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—২৬৫ রাণ; এম, জে, গোপালন ৭৬, এম, রিচার্ডসন ৬২, কে ভট্টাচার্যি ৮৩ রাণে ৭টি উইকেট পান।

ইন্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস্—২৯ বাৎসরিক ইন্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস্ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী টাল্‌বাস্টে সাক্ষ্যের সন্মত অহুতি হ'য়েছে। সেট জেভিয়ার্স কলেজ ৩৪ পেয়ে টিম চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স কলেজ ও মেডিকেল কলেজ দুদলই ২৫ পেয়ে টিম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সেট জেভিয়ার্স কলেজের জি, কার্ণেট ১৮ পেয়েট সগ্রহ করে। মোহনবাগানের ফুটবল খেলোয়াড় টি, আও ১৪ পেয়েট পেয়ে সেকেন্ড হয়েছে।

নিম্নলি ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

শ্রীপরিতোষ বয়

পাতিয়ালায় অখিল ভারত অলিম্পিক অস্থান সাক্ষ্যের সন্মত শেষ হয়েছে। পাতিয়ালায় খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন বিষয়ে কৃতকার্য হয়ে মোট ১২৯ পেয়েট পাওয়া যায় তার পোরাবজী টাটা কাপ লাভ করেছেন। বোম্বাই দল ৩৯ পেয়েট পেয়ে দ্বিতীয় ও ৩০ পেয়েট পেয়ে পাঞ্জাব তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বাংলার খেলোয়াড়গণ একমাত্র ৫০০০ মিটার লম্বা ছাড়া কোন বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেনি। উক্ত লম্বা বিষয়ে দু'জন বাঙ্গালী খেলোয়াড় ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেছেন। তারোত্তলনে বাংলা দল প্রথম হয়েছে। কপাটি ছাড়া অজ্ঞাত খেলা ও কুস্তিতে তারা কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। পাতিয়ালায় খেলোয়াড়দের সাক্ষ্যের পশ্চাতে রয়েছে তাঁদের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত্য। তাছাড়া তারা এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যও পান। কিন্তু বাংলার খেলোয়াড়দের মধ্যে অধ্যবসায় ও অক্লান্ত্যের যেমন অভাব, তেমনই সরকারের ওদারীশ্য ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ে আলিগড়, লাহোর পার্শ্বপূর্ণ প্রকৃতিতে এই ব্যামামের বাধাত্মক শিকার ব্যবস্থা আছে। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ছুটিতেও এ বিষয়ে অর্থ ও উৎসাহী হতে হবে।

বস্তমান অস্থানে ৯টি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি বিষয়ে ভারতীয় রেকর্ডের সমান হয়েছে। উক্ত ৯টি বিষয়ের মধ্যে ছ'টি বিষয়ে পাতিয়ালায় খেলোয়াড়রাই ও ৩টি বিষয়ে বোম্বাইএর সাইকেল চালকগণ রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নিম্নে নতুন ভারতীয় রেকর্ডের তালিকা দেওয়া হ'ল। স্থানান্তরে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

৩০০০ মিটার দৌড়—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময়—৮ মিনিঃ ৪৮ঃ সেকেন্ড।

হাটুড়ী ছোড়া—সাকিশা সিং (পাতিয়ালা) দূরত্ব—১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চি।

১০০০ মিটার সাইকেল—(প্রথম ছিটে) কড্ডার (বোম্বাই) সময়—১মিনিঃ ২৪ঃ সেকেন্ড।

৪০০ মিটার হাডল—(দ্বিতীয় ছিটে) প্রতীম সিং (পাতিয়ালা) সময়—৫ঃ৬ঃ সেকেন্ড।

১০০ কিলো মিটার সাইকেল—কড্ডার (বোম্বাই) সময়—৩ মিনিঃ ৪০ সেকেন্ড।

২০০ মিটার হাডল—(দ্বিতীয় ছিটে) প্রতীম সিং (পাতিয়ালা) সময়—২ঃ২১ সেকেন্ড।

উক্ত লম্বা—কুননাম সিং (পাতিয়ালা) উচ্চতা—৬ ফিট ২ঃ১৮ ইঞ্চি।

১০০০ মিটার সাইকেল—(প্রথম ছিটে) আমিন (বোম্বাই) সময়—১ঃ৬ মিনিঃ ১০ঃ সেকেন্ড।

১৫০০ মিটার দৌড়—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময়—৪ মিনিঃ ৪২ঃ সেকেন্ড।

১১০ মিটার হাডল—ভিকাস (বোম্বাই) সময়—১ঃ৪ঃ সেকেন্ড (ভারতীয় রেকর্ডের সমান করিয়াছে।)

[শ্রীপরিতোষ বয় স্বয়ং পাতিয়ালায় ভারতীয় খেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিরতিতে তিনি অলিম্পিক তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন।]



ফার্ডটেনপেনের
ডাল কালি



তালীগঞ্জ কেমিক্যাল ওয়ার্কস
তালীগঞ্জ — কলিকাতা

একালে লিখতে হলে
ফার্ডটেন পেন চাই-ই



স্বদেশী খবর

টেকটাদ তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত—অন্যতমের হিন্দুসমাজের সভাপতির মিছিলে লাঠিচালনা যথেষ্ট তদন্ত করবার জ্ঞান ভূতপূর্ণ ছাইকাটের জ্ঞান স্থার টেকটাদ, দায়িত্ব জ্ঞান গঙ্গারাম শোনি এবং এডভোকেট বস্টীদাসকে নিয়ে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ শোভাযাত্রার লাইসেন্সের মত কোনজগতে ভঙ্গ করা হয়নি—নামজ্ঞর করার আদেশ যথারীতি যোগদান করা হয়নি, মিছিলকারীদের মিছিল ভেঙ্গে দেবার মত উপযুক্ত সময় দেওয়া হয়নি এবং অব্যবস্থাপন বলা প্রয়োজন করা হয়েছে। যথারীতি লাইসেন্স নেওয়ার পরও এই লাঠিচাঙ্গ করা হয়।

এর পূর্বে এ খবর যথেষ্ট আমরা বিশেষ কোন মন্তব্য করিনি কারণ প্রকৃত তথ্য ভিত্তি তা করা সম্ভবী নয়। এখন দেখা যাচ্ছে অসংগত পুলিশকর্মচারীদের হটকাড়িতা এবং তাদের কাব্যকারীতাস উপর কর্তৃপক্ষের অগণ্য দিশাশ, এই অপ্রিয় ঘটনার জ্ঞান দায়। দাকি কোর্ট মহানীর দল যে শোভাযাত্রায় যোগদান করেনি একথা বলা যথেষ্ট লাঠিচালনার কোন তাৎপর্য বোঝা গেল না। এই সব পুলিশসমূহ বীরদের প্রতিকার যথেষ্ট পাঞ্জাবের অর্পণচিত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী স্থার মনোহর লাল যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা কাম্যে পরিণত হয় নি। বোধহয় তিনি দেখেছেন যে সেই জনতার মত তিনিও অসহায়।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট কি উত্তর দেন তা লক্ষ্য করবার বিষয় কিন্তু আরও একটা বিষয় সমগ্র ভারতবাসীর দৃষ্টি এড়ায়নি। অন্যতমের যখন লাঠি চলেছিলো তখন করাচীতে মুশলিম লীগের শোভাযাত্রার ক্ষিপ্র তুলছিলেন কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের প্রচার বিভাগ। ভারতবাসীর মনে যাতে এই ঐশ্বর্য্য মূলক নীতির ছাপ না পড়ে গভর্নমেন্টের সে বিষয়ে সতর্ক যত্নবান হওয়া উচিত।

তপশীল জাতি সম্মেলন—কানপুরে তপশীল জাতি সম্মেলন—যে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হয় তাতে সভাপতি রাওবাছির শিবরজি এম, এল, এ (কেন্দ্রীয়) দাবী করেন যে তপশীল জাতি হিন্দুসম্প্রদায় হতে পৃথক এবং তারা ভারতের স্বাধীন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা হিন্দুদের কাছ থেকে দুর্ভেদ্য সত্যকে ভাবে বদলায় কলঙ্ক। তাদের দাবী যেমন নিম্নে তারা যে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। সভাপতির কথা শুনে তে আমরা মনোহর হলাম। তপশীল সম্মেলন অবস্থাই ভারতীয় জাতির জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ—যুগ সকলেই সানন্দে স্বীকার করেন কিন্তু তাদের হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক করে দেখবার প্রয়োজন হল কেন? যতদিন বিদেশী শাসন আছে চাকরীর বাজারে এ কথাই জবাবী হতে পারে, কিন্তু হিন্দুসমাজের শুণীকৃত আত্মজ্ঞানের মধ্যেও যে অথও একা অগুরুত্ব রয়েছে তা' থেকে তপশীল হিন্দুদের

নিচত করিতে পারেন। এই চাকরীর মোহ। যে যুগ চলে গেছে তার মধ্যে হিন্দুর মনোভাবের বিপর্যয় পরিবর্তন এসেছে। কয়েকজন পুরাতনপন্থী ছাড়া নবযুগের অশুভ্রতাবর্জিত আন্দোলনে হিন্দুসমাজ বিপুল ভাবে সাড়া দিয়েছে। শিকার মায়ামর্শে ও স্বাধীনতার চক্কে আত্মানে, বর্ণহিন্দু, তপশ্বীলহিন্দু, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-বুদ্বান কি একাকার হয়ে যায়নি? যে কুফর এসেছে আজ সেকি এই সুরা পাতা, শুকনো ভালপালার জ্বাল উড়িয়ে নিয়ে যাবে না? সমস্ত চুমুরার করে সেয়া খেতে যাবে তা হিন্দুসভাতার, ভারতীয় সভাতার অসীম মজীহ।

সত্য বটে ছুই সহস্র বৎসর ধরে যে সমাজ তাদের ওপর করেছে অত্যাচার, করেছে প্রকৃত, তাদের বিধাস করা করিম। ডাঃ আদেবদর সত্যই বলেছেন যে এই তপশ্বী জাতির উন্নতি বিধানের কাজ বরাজ সানার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আচার অষ্টানবহল বর্তমান প্রাণহীন হিন্দুধর্মই জাতির দূর্বৃত্তির মূল কারণ। অবমাননার প্রচার উচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়নি এও সত্য। কিন্তু কালস্রোতে শিক্তিত মুক সম্প্রদায়ের মনোজগতে অপরিণীম পরিবর্তন হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই এক নবীন ছবি। আজ কোন রাজ্য নৃক কি তার সহযোগী তথা-কথিত অশুভ্রকে বন্ধ বলতে পশ্চাৎপদ হয়, তাকে স্পর্শ করতে গুলকমাত্র কুস্তিত হয়, তার ধরে নিমগ্ন রাখে না? অর্থনৈতিক ব্যবস্থারের কথা আলাদা সব সমাজেই তা আছে, কিন্তু, শিক্ষার, দীক্ষার কর্মে ও চিন্তায় যেখানে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে রাও বাহাদুর শিবজীর মত বিচলিত হবার মত কারণ আমরা খুঁজে পাইনা। হিন্দুজাতির পূর্বে পরীক্ষার সময় আগত হয়েছে প্রায়শ্চর্ষি নিজ অন্তর থেকেই স্বীয় কল্যাণের পথ সন্ধান করবে হিন্দুজাতি—ডেডাভেড, উচ্চনীচবোধ কি সেই বজায় তুর্বেয় মত ভেসে চলে যাবে না? যদি না যায় তো জাতি হিসাবে হিন্দু মৃত্যু অনিবার্য, প্রায় নিশ্চয়।

শ্রীযুক্ত নাইডুর উপর নিবেদন—

শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর উপর এক ব্যাপক আবেশ জারি করায় আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। জনবহুরা যেহে ভারতবর্ষের কোনস্থানে, কোন জনগণ ও কোন মোভাম্যাক্রিয় যোগ দিতে পারবেন না এবং সংবাদপত্রে লিপি দিতে পারবেন না। অর্থাৎ শাস্তিহীন নবযুগের মত অন্তঃপুরচারিত্রী হয়ে থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক সংবাদপত্রের উপর এমন বরণের আবেশ দেওয়া হয়েছে যে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন কথা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

শ্রীযুক্ত নাইডুর ও ভবস্বাস্থ্য, কোন propaganda করার মত সমর্থ্য তাঁর নেই, অভিপ্রায়ও নেই। তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। কিন্তু দেশবাসী তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনাবার জন্ত উৎস্রীব, সেজন্ত স্বাধীনতা দিবসে তিনি তাদের এক বাণী দেন। বাসু আর কি গুটিন সাম্রাজ্য উলমল করে উঠল। মায়ামুজেলমা মাছেও ভেবেছিলেন শ্রীযুক্ত নাইডুর পলু হয়ে জেনগল। কিন্তু বেকলেন, কিন্তু এরই মধ্যে একী ছুঁবে।

শ্রীযুক্ত নাইডুর বিশ্বাসীর কাছে সুপরিচিত-ভারতের রাজনৈতিক অলম্বন সমাধানে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধিমানি সাহায্য করতে পারে তা কাউকে বলে দিতে হবে না। সম্ভ্রতি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর স্থলে তিনি এসেছিলেন বাংলার সেবাকায় পদধর্ম করতে ও উৎসাহ দিতে। গভর্নমেন্টের আদেশের ফলে রাজনৈতিক জনহিতকর কার্যেও তাঁর বাণীনিপতি হয়ে না। দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট যেন জনমতের দিকে কোন পুষ্টি দিতে চান না। এ ব্যাপারে তিক্ততা ও স্রোত প্রবাহার স্থিতি কিম্বা হলে? যে ইংলও ব্যক্তিগতীয়তা দেখালেন ভারত গবর্নমেন্ট। কংগ্রেসকে “বে আইনি প্রতিষ্ঠান” বলেও প্রকাশ্যে গভর্নমেন্ট তাই যেন বলতে চান, কিন্তু এও তাঁরা জানেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে বাঁমাধা একদিন করতে হবে।

ভারতরক্ষা আইনের কার্যকারিতা—

ভারতরক্ষার নামে যে সব আইন সম্ভ্রতি দেশে চলছে তার প্রকৃত রূপ কি তা অনেকবার বলা হয়েছে। বিচারপতিরা যাহা স্থবিচার করবার জন্ত আমাদের প্রজ্ঞা অর্জন করেন, তাঁরা যে এই আইনের নামে কিরূপ অসহায়তা আমরা জানি। বিচারপ্রার্থীদের প্রতি কৃপা পালনের ক্ষমতা তাঁদের নেই যেন। সম্ভ্রতি এলাহাবাদ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছেন “It seems to me that those Defence of India Rules have paralysed us and we have got no power”। বিচারালয়ের উপর জনসাধারণের আস্থা তাহোলে কোথেকে আসবে? যেহেতু আরা রাহের এডভোকেট পণ্ডিত বৈজ্ঞান্য হাঙ্গাম হতে উদ্ধৃত মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন, পুলিশ তাহাকে কারাগারে রাখবেই যেন তেন প্রকারে। গুটিন justice নিয়ে কিছুদিন আগেও অনেককে শঙ্কা করতে দেখেছি, আবার আজও দেখছি, যুগেতে পারি না কোনটা সত্যি।

“India against the storm” —

হুইলার প্রণীত এই পুস্তকটি আমেরিকায় ভারতবর্ষ যুদ্ধের প্রচার বা অপ্রচারের আর একটি উদাহরণ। ইতিপূর্বে বহুগুণ আমেরিকায় ভারতের অবস্থাকে অত্যন্ত সহজ ও লঘু করে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কিন্তু সত্য চাপা থাকে না, তাই বর্তমান পুস্তক সম্বন্ধে “নিউইয়র্ক ফোয়ার্ড ট্রিবিউন” যে মন্তব্য করছেন তা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না।

“এই পুস্তকে—গোলমালে অবস্থা আরও গোলমালে করা হইয়াছে। উহা বিবেশ, হিংসা, বারতা ও পরাজয়ের একটা চিত্র। পরাজয় প্রত্যেকেরই, যিনি বইটি পড়িলেন তাহারও। যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি এবং উহার নেতৃবৃন্দের প্রতি বিশেষতঃ গান্ধীজীর প্রতি হুইলারের ঘৃণা ও অবিশ্বাস। কাহা কোনও সন্দেহ বাদ দিয়া যেখানে সেখানে হইতে গান্ধীীর রক্তা ও বক্তৃতা আর উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার কোন

কোন কাজের উল্লেখ করিয়া হুইলার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহার বক্তব্য বাড়িয়া করিয়াছেন এবং কংগ্রেসকে ভণ্ড ও ঠগীদের একটা দলগুণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ভারতের শুধু অশিক্ষিত জনগণ নয়, সমস্ত জাতি ও শ্রেণীর ভারতীয়ের উপর গান্ধীজীর এমন প্রভাব যেম তাহা ব্যাখ্যা করিতে হুইলার অসমর্থ। অশিক্ষিত হুইলারের চোখে কংগ্রেস যদি একবারেই ব্যর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রথম ভ্রাতাঘটনা বলীয়া তালিকা পাঠ করিয়া পাঠকও নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, ভারতের গবর্নমেন্টও সমগ্রমাণে ব্যর্থ, কারণ যে গবর্নমেন্ট শাসিতবার সম্ভ্রতি ছাড়া শাসন করে সে গবর্নমেন্ট গবর্নমেন্টই নয়।

উটের পিঠে শড়—বাংলাদেশ আর যে সমস্ত লক্ষ্য দেশ নয়, আর্থিক দৃষ্টিতে তার শ্রীমান, স্বীকৃত। কিন্তু নান্দিক দিয়ে এর ওপর যে চাপ পড়ছে নতুন করে তাতে প্রবাদ প্রচলিত putting the last straw on the camel's back-এর আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। সত্য বটে এ, আর, পি ও সিভিল সার্ভাইসের কল্যাণে বেকার সমস্তার একটু সুরাহা হয়েছে, কিন্তু কলকাতার মত শহর ছাড়া দেশের অজ্ঞা অংশের অধিবাসীদের চেমন কোনই স্থবিধা হয়নি বরং সব কিনিবো প্রভাস দাম দিয়ে নিষ্কষ্ট ধরণের কিনিব কিনিবো তার সর্বস্বাস্থ্য হয়ে গেছে। এও ওপর “রেলকর্তৃপক্ষ রূপা করে ২৫ পাশেট ভাড়া বৃদ্ধি করবেন তাদের অসামান্য লাভ থাকা সত্ত্বেও। ভাক টিকিটের দামও তদৈবক হবে। এর ওপর বিপুল বিক্রয় কর ও কৃষি-আয়কর বাংলাদেশের ওপর নতুন করে চাপল। রেল ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে স্বজন্মে বলা যায় যে এ বাজারে যাত্রীর সংখ্যা আরও কমাতে গেলে সকলকে আরও গলদঘর্ষ হতে হবে। কারণ অজ্ঞা বাসিন্দা সব বন্ধ। মূল্য বৃদ্ধি কোরে কখনও মুদ্রাস্ফীতি কমানা যায় না—তার ফল হয় বিপরীত। গবর্নমেন্ট ভাণ্ডারকে প্রণাম, আপাততঃ গমনাগমনের একটু স্থবিধা হলেই যথেষ্ট। কিন্তু রেল

লন, কি ডাক টিকিটই বসন, শোনে কোণ চলতি
বহুরে বাংলা গভর্ণমেন্টের দাঁড়িতি হয়েছে ১০ কোটি
১০ লক্ষ টাকা।—খরচের বড় বড় অঙ্ক জটিল জমিত ও
কল্লী অবস্থার জ্ঞান ব্যয়িত হয়েছে।—গণচা করতে কেউ
করেননি, দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ফল ভেঁমন ভাল হোল
না যে কেন এইটাই আশ্চর্য।—কিন্তু দাঁড়িতি ছোক
আর মাই ছোক এন, এল, এ বের মাইনে ও এলাউএস
নাড়তে কোম জানি বোর হয় নেই।

উমেশ শতনামিকী—সে কংগ্রেসের পুণ্য নামের
সঙ্গে শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা জড়িত,



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গঠন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে খার বধি আর
কল্প হিলেও বিকিবিকি বিষে পানিত হচ্ছে, সেই
জাতীয় কল্যাণের পবিত্র প্রতিদানকে যিনি কল্প দিয়ে
ছিলেন, পিতার মত অপরিণীত ব্রহ্ম, কাতরতা ও প্রেরণা
দিয়া তার শৈশব উজ্জ্বল করে দিয়েছিলেন, সেই প্রাজ্ঞ-
স্বর্গীয় ব্যক্তি উমেশচন্দ্র। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি
হিসাবে এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপ্রস্তুত ব্যারিষ্টার,
জাতীয়রা যে অনির্বাণ অমল প্রজ্জ্বলিত কুরে দিয়ে
গেছেন, তা আমাদের আজও অনাগত কালেও মুক্তিযে
সহুগাহিত করবে। ইলবাট বিলের আন্দোলনে প্রথম

প্রকাশ পেয়েছিল এই পাশ্চাত্য বীভীনীভিত্ত
অভ্যন্ত নেতার আভ্যন্তরীণ স্বদেশ-প্রেম।
জাতীয়তাবাদের সে তীব্র বিক্ষোভের জনগণ-
মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম জীবনে
ভারতে ও শেষ জীবনে ইংলণ্ডে ভারতের
জন্ম তিনি সত্য সাধনা করে গেছেন। তাঁকে
আমাদের পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর
জন্ম শতবার্ষিকীতে। *Manojit Chakraborty*

প্রজন্মদেশের মুক্ত—কিছুদিন আগে মিত্র-
পক্ষ যে চাপ দিয়েছিলেন এবং সাফল্যলাভ
করেছিলেন তার উত্তরে জাপানীরা প্রবল
আক্রমণ শুরু করেছে। ভারতে প্রবেশ
করবারই যেন তাদের ইচ্ছা। মিত্রপক্ষ
সংজ্ঞার বাধা দিচ্ছেন, আক্রমণ প্রতিহতও
হয়েছে কিন্তু অবস্থা অনিশ্চিত। লর্ড মাউন্টবাট-
টেনের রণ-কৌশলের এইবার পরীক্ষা হবে।

বিদেশী পবন—

আমেরিকার মুক্তোত্তর প্রাচ্যে সম্বন্ধে
ডাঃ আদামান্ডিস পলিজইডেস—ডাঃ
পলিজইডেস গ্রীষ্ম থেকে ৩৫ বছর পূর্বে
আমেরিকায় আসেন ও সেখানে সম্পাদক,
শিক্ষক ও সমাজ সেবকের কাজ করেন।

ছোট, বড় আমেরিকার সব লোকের সঙ্গেই তাঁর
আলাচনা হয়েছে—ও তিনি সেখানকার জনমত
ভাল করে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ১৯টি
ভাষায় কথা বলেন এবং আমেরিকার ৪৮টি রাষ্ট্রে
বক্তৃতা-সফর করেছেন। সেজ্ঞ এই মতামত মূল্যবান
হওয়া স্বাভাবিক।

ডাঃ পলিজইডেস বলেন—আমেরিকা গত দুই
বছর যা ছিল তার চেয়ে আজ অনেক বেশী পরিমাণে



ডাঃ পলিজইডেস

internationalist। Totalitarian আক্রমণের বিরুদ্ধে
ও Democracyর পক্ষে আমেরিকার মুক্ত। আমেরিকার
পৃথিব্যে, গৃহে, গৃহে, ব্যবসায়িকের মুক্তোত্তর কালের
কর্তব্য সম্বন্ধে ও শান্তি-প্রস্তাব সম্বন্ধে আলাচনা করে।
প্রায় ৪০টি জাতির সমন্বয়ে উদ্ভূত এই একটি জাতি যে
শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করছে, তাই বিশ্বয় ছড়িয়ে
দেবার ইচ্ছা এদের। অজ্ঞান দেশের লোকজন ও
তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা জানবার জন্য এরা উৎসুক।

আজকের স্বপ্নকে কালকের বাস্তবে পরিণত করার জন্য
এরা সাধনা করছেন।

হের হিটলারের বক্তৃতা—কমতাপ্রাণিত একাধার
বার্ষিক উৎসবে হের হিটলার জার্মান জাতিকে বলেন—
একথা অনিশ্চিত যে বর্তমান যুদ্ধে একটি নাজ পক্ষই
জয়লাভ করবে হয় জার্মানি নয় রাশিয়া। প্রথমবার্গ অর্থ
ইউরোপে সফল, দ্বিতীয়বার্গ অর্থ ক্ষয়। ফলস্বরূপ হাই
হোক ইংলণ্ড তার প্রতিষ্ঠা হারিয়েছে। এখনকার
সবচেয়ে বড় কথা বর্তমানে যুদ্ধে প্রেরণিত কার। যদি
রাশিয়াই হয় তবে সে জার্মানি জাতিকে ক্ষয়-
করেই ক্ষান্ত হবে না। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরে
বুটেনের সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার
মত শক্তি থাকবে না। বুটেন ও আমেরিকাকে তাদের
নিজদের দেশেই বসাসেতিকাধারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা
করতে হইত ব্যস্ত থাকতে হবে।

ইউরোপের কথা বরাই জার্মানি জাতির সমতা—
জ্ঞানানাল সোশালিস্ট সম্ভারাই এই আত্মরক্ষার কল্পে।
কিন্তু সমতা ব্যতী কঠোর হোক আমরা কখনই নিরস্ত
হব না। প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অগ্নি বোমা বর্ষণ করে
শত্রুর আমাদের মনোবল ক্লান্ত করতে পারবে না—তাতে
জাতির শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সফটের যনখটা সঙ্কেও
অবিচল নিষ্ঠা ও ধৈর্যের দ্বারা জার্মানি জাতির গৌরব-
মণ্ডিত বিজয়ে এই সংগ্রামের অবসান হবে।

বক্তৃতার মধ্যে বিক্ষোভের সে নিঃসংযত নেই,
আছে সফট-বিহ্বলতা।

সিনর মুসোলিনীর বক্তৃতা—নতুন ইতালীয়
বাহিনীর কর্তব্য নির্দেশ করে সিনর মায়কদের বৈঠকে
সিনর মুসোলিনী এক বক্তৃতা বলেন—৪ই সেপ্টেম্বরের
সুর্ভাষী আত্মদাম্পণ দ্বারা কেবল ইতালীয়দের প্রবন্ধনা
করা হয়নি, মাছুমির প্রতি গভীর অপরাধ করা হয়েছে।
এই জন্মেই ইতালীয় বাহিনীর পতন ঘটে। সেনা-
বাহিনী পুনর্গঠনের কালে বণসজ্ঞারের স্বভাবের চেয়েও
নৈতিক বলের শোচনীয় অবস্থা দেখা যায়। কিন্তু

মাক বে বাহিনী গঠিত হয়েছে তার পশ্চাদপসরণের পক্ষ কক্ষ, তাকে একত্ববাদের সমুদ্রীন হতে হবে, বাহির-পক্ষের জন্ত তাকে সংগ্রাম করতে হবে। রোম সরকার

মিত্রপক্ষের কল্পপক্ষণ



ষ্টালিন, স্তালভেন্ট ও চার্চিল

তার তাদেরই নিজে হবে। কপাওলা ভ্রমতে মন্দ জুগুপ্স না ফলে পরিসিত হোক আর নাই হোক।

রুশ-যুগোশ্লাভ মৈত্রীর প্রস্তাব—মার্শাল ষ্টালিনের কাছ থেকে নববর্ষের বাধী পাওয়ার পর যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান মন্ত্রী শিমিয়ে পুবিচ রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীমূলক যে সন্ধি প্রস্তাব করেছিলেন, মার্শাল ষ্টালিন তার উত্তরে বলেন—এখনও সময় আসেনি। বোধ হয় রাশিয়ান সৈন্য যে সব দেশে প্রবেশ করবে তাদের সঙ্গেই রাশিান সন্ধি করবেন। তাহা হলে যুগোশ্লাভিয়াকে এখন অপেক্ষা করতে হবে।

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বিভিন্ন সোভিয়েটের স্ব স্ব ক্ষমতা লাভ—য: মলোটভ সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বত্বাধীন সাধারণতন্ত্রগুলি বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে স্বাধীনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে বলে নিখিল

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব করেন তা মঞ্জুর হয়েছে। প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রের সৈন্য থাকবে। সমগ্র ইউনিয়নের অবস্থা একটি পররাষ্ট্র দপ্তর থাকবে।

এতে সমগ্র সোভিয়েতবাহিনীর সংগঠন পুত্রর হবে। আজকাল বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সোভিয়েট সঙ্গে মিত্রত্ব স্থাপনের ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে, যার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে খিটলার বিরোধী কোয়ালিশন গড়ে উঠেছে। এই বন্ধবহুল ইচ্ছাকে আরও স্বাধীনতা দেবার জন্তই বাসনা। কিন্তু ১৯৪৮-৮৯ রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েও রাশিয়ার শক্তি কমবে না কারণ সোভিয়েট জনগণের সহযোগিতা ও নিষ্ঠা অসাধারণ। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে ডেমিনিয়ামগুলি একপ্রকারে স্বাধীনতা পায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন হওয়া বোধ হয় আরও অসম্ভব। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট ৩০ বৎসরের মধ্যে রাশিয়ান বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় সহমতি সৃষ্টি হয়েছে, তারতরফে ব্রিটিশ শাসনের ছইশত বৎসরে তার তিস্যাত্তও হয়নি।

কিন্তু এই শাসন শক্তির ব্যাপারে ষ্টালিন রাজনৈতিক চাফুরের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি বুকেছেন যে প্রধান শক্তিরের আজ রাশিয়াকে আমল দিতে হবে। যখন বুটেন ভারতের জাতীয়তার দাবী শিখিয়ে দিতে জান, এই নীতি অবলম্বন করে ষ্টালিন জাতীয়তাবাদীদের স্রীতি অর্জন করলেন। এই বৈশ্বিক কার্য যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে রাশিয়াকে বৈশী শক্তি দেবে। একটি মাত্র আঘাতে মার্শাল ষ্টালিন ফ্যাসিষ্টদের ও সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র আখাত ছেনেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ—প্রায় একমাস হোল মার্কিন সৈন্যরা মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করেছে এবং

ইতিমধ্যে রয়, পমুর, কোর্দাভালিন প্রভৃতি বড় বড় দ্বীপ দখলিকার করে জাপানীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখেও অসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মনে হয় এবার মার্কিন সৈন্য জমে জমে বাস জাপানের দিকে অগ্রসর হবে। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পরই কারোলাইন ও গুয়াম দ্বীপপুঞ্জ। ইতিমধ্যেই কারোলাইনের, জাপানীদের সৈন্যের ঝাঁট জুকু দ্বীপে ভীষণ বিমান আক্রমণ চলেছে। সর্বত্রই জাপানীরা জমে জমে পিছু হটেছে। মনে হয় মার্কিন সৈন্যরা এবার দ্বীপ পদক্ষেপে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাবে এবং জাপানীদের বিশাল দ্বীপময় সাম্রাজ্য জমে জমে তাদের হস্তান্তর হবে।

ইতালীর যুদ্ধ—ইতালীতে এখন ঘোর যুদ্ধ চলছে ক্যাসিনো সহরের মধ্যে। প্রবল আক্রমণের মুখেও মিত্রসৈন্যেরা অটল আছে এবং একটি একটি করে অগ্রসর হচ্ছে। আনজিওতে কেসেলরিং দিফল আক্রমণ করেন সেখানকার beach head অটুট আছে। রোমে অনেক বাস বোমা বহিত হয়েছে এবং তার পতন আসার। ওদিকে জার্মানীতে সহস্র সহস্র টন বোমা ফেলে মিত্রপক্ষ তার হুমকি প্রচেষ্টা থব্ব করে দিচ্ছেন।

শৌক-সংবাদ—

ভারতের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তার রাতে, ৬৩ বৎসর বয়সে রে: ভূবন-মোহন বসুর কন্যা, তাঁহার ডেরাজুনহ বাসভবনে ইলেক্ট্রিক ভোগ্য করেছেন। বিবাহের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল হুমারী চন্দ্রমুখী বহু।

তিনি একাধারে প্রথম ভারতীয় মহিলা গ্রাজুয়েট এবং বৈদ্যুণ কলেজের প্রথম ভারতীয় প্রধান অধ্যাপিকা ছিলেন।

১৯৬০ সালে বাঙ্গালার মহানন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং অতীত পর হতেই ডেরাজুনহ বাস করেন। প্রবেশিকা পাশ করবার পর তিনি বি, এ এবং এম, এ পাশ করেন। এর পর তিনি কলিকাতায় বি, এ এবং

এম, এ পাশ করেন। এর পরই তিনি বৈদ্যুণ কলেজে প্রধান অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন।

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে ইনিই সর্বপ্রথম মহিলা কন্যা।

ব্যবসায়ী মহেশ ভট্টাচার্য—বালুয়ার বিখ্যাত ব্যবসায় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কাশিধামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হরমুন্দরী ধর্মশালায় দেহ রেখেছেন।

মহেশচন্দ্রের পিতা পণ্ডিত ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ১৯২৩ বৎসর বয়সেই মহেশচন্দ্রকে পরের বাড়ী রেখে লেগোপাড়া শিখতে হয়েছিল। ২১ বৎসর বয়সে দেশ ত্যাগ করে কলিকাতায় অর্থীকর্মে জন্ম এসে ৭ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি কলেজ ষ্ট্রীটে একটা ছোট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান খোলেন। অনেক কষ্ট এবং দুঃখের মধ্যে আজ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে ঐ দোকানের শাখা স্থাপিত হয়েছে। কুবিহার ঈশ্বর-পাঠশালা এবং কাশীর হরমুন্দরী ধর্মশালা তার উচ্চ মন এবং অসংখ্য ঔষধালয়গুলি তাঁর সাহায্যের পরিচয় দেয়।

পরলোকে কস্তুরীবাঈ—মহাত্মা গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী গত ২২ই ফানন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটে গুণ্য শিবচন্দ্রদ্বীপে পুণ্য আশা দ্বার প্রাঙ্গণ-বন্দী শালায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিছুদিন থেকে তিনি ছুরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর মুক্তির জন্ত সমগ্র ভারত শাসকবর্গের কাছে বার বার প্রার্থনা জানিয়েছে, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধমুক্ত করা যায়নি। বন্দীশালায় স্বামীর কোলে রাখা রেখে তাঁর প্রাণবায়ু বেরোয়। শয্যাপার্শ্বে তাঁর বড়ছেলে হীরালাল, ছোটছেলে দেবদাস ও হীরা-লালের কন্যা উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মা কী এবং কস্তুরীবাঈ প্রায় একই বয়সের। ১৩ বৎসর বয়সে তাঁদের বিবাহ হয়। এই দীর্ঘদিন তিনি স্বামীর সেবার এবং দেশের কাছে সংহতিপ্রীতির প্রকৃত কর্তব্য পালন করে গেছেন। উন্মুক্ত জী হারিয়ে

হাওয়ায় বিচলিত হবেন না। আমরা জানি কারণ তিনি বৈরাগ্যবান ও সাধক। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা, জননী বিরোধের ব্যথা আমাদের বাজবে। তবুও শোক না করে আমরা এই আত্মবলিদানের প্রতীকারে জনমন্দির মহাব্যথাগিয়ে তুলতে সাধনা করব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কস্তুরীবাঈয়ের জীবন উৎসর্গ বিফল হবে না।

বিলাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক—৫০ বৎসর পূর্বে বিলাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ গড়ে বৎসরে ৭৫০ ছিল, পরে ঐ সংখ্যা গত মহাবুদ্ধে বেড়ে ৩০০০ থেকে ৪০০০ এ দাঁড়ায়। কিন্তু এই বৃদ্ধি এর অনেক উন্নতি দেখা গেছে। উপস্থিত গড়ে ঐ সংখ্যা ১২০০০ এ দাঁড়িয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অপূর্ণ নিদর্শন! বিবাহের পবিত্রতার হুম্বর পরিণতি!

অমল-সুকুমার মিলন—গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ার দত্ত বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের

বিত্তীয় কন্ডা অমলার সহিত শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রের শুভ-বিবাহ শ্রীযুক্ত দত্তের রূপচাঁদ মুখার্জি লেনহ বাস-ভবনে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সূচস্পন্দ হয়েছে। বিবাহ আসরে সহরের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত দত্ত ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বক্ষিমচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কানাইচন্দ্র দত্ত ও অভ্যাগতদের বিশেষভাবে আদর আপ্যায়ন করেন।

অলঙ্কার শিল্পে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা—অলঙ্কার শিল্পে বাংলার নিজস্ব শিল্পী ভারতের সর্বত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বাঙ্গালীর এই শিল্প সাধনা ভারতীয় কৃষ্টির প্রতীক। কিন্তু আজ বাংলাদেশে তথা ভারতে যাহারা এই শিল্পকে শ্রীমণ্ডিত করে রূপ পরিকল্পনা ও নির্মাণ কৌশলে শ্রীবৃদ্ধি করেছেন সুবিখ্যাত জুয়েলাস্ মেসার্স এম, বি, সরকার, এণ্ড সন্স তাদের অগ্রতম। এঁদের রূপ পরিকল্পনা যেমন অল্পম কাঙ্ক্ষ ও তেমনি হুম। স্বর্ণের বিগুহতায়ও এই প্রতিষ্ঠান অতিশয় নির্ভরযোগ্য।

“যুদ্ধোত্তরকালে উন্নতিমূলক যে সব পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্যই হইতেছে জনসমষ্টির জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতিসাধন করা”

তার জে, পি, শ্রীবাস্তব

ত্যাশানান সেভিং সার্ভিসেস
ক্রয় করুন।